আহমদ শরীফ রচনাবলী
৪

আহমদ শরীফ রচনাবলী
৪

আহমদ কবির সম্পাদিত

আগামী প্রকাশনী

প্রথম প্রকাশ ফাল্গুন ১৪১৬ ফেব্রুয়ারি ২০১০
প্রকাশক ওসমান গনি আগামী প্রকাশনী ৩৬ বাংলাবাজার
ঢাকা-১১০০ ফোন ৭১১ ১৩৩২, ৭১১ ০০২১
প্রচ্ছদ কাইয়ুম চৌধুরী
বর্ণ বিন্যাস কম্পিউটার মুদ্রণ শিল্প, ঢাকা
মুদ্রণ স্বরবর্ণ প্রিন্টার্স ১৮/২৬/৪ শুকলাল দাস লেন, ঢাকা
মূল্য : ৫৫০.০০ টাকা

Ahmed Sharif Rachanaboli 4 : Collected works of Ahmed Sharif
Published by Osman Gani of Agamee Prakashani
36 Bangla Bazar, Dhaka-1100 Bangladesh.
First Published : February 2010

Price : Tk 550.00 only

ISBN 978 984 04 1294 5

সূচিপত্র

বাঙালাভাষা-সংস্কার আন্দোলন ১ – ৪৬

ইদানীং আমরা

বাঙালীর চিন্তাচেতনার বিবর্তনধারা

আবদুল করিম সাহিত্যবিশারদ

এবং আরো ইত্যাদি

ভূমিকা

আহমদ শরীফ রচনাবলী চতুর্থ খণ্ডে অন্তর্ভুক্ত গ্রন্থের সংখ্যা পাঁচটি – *বাঙলা ভাষা-সংস্কার আন্দোলন* (১৯৮৬), *ইদানীং আমরা* (১৯৮৬), *বাঙালীর চিন্তাচেতনার বিবর্তনধারা* (১৯৮৭), *আবদুল করিম সাহিত্যবিশারদ* (১৯৮৭), *এবং আরো ইত্যাদি* (১৯৮৭)। বোঝাই যায়, এ খণ্ডটি গ্রন্থগুলোর প্রকাশকালের ধারাবাহিকতা বজায় রেখেছে।

চতুর্থ খণ্ডের পাঁচটি গ্রন্থে মূলত বাঙালি, বাংলা ভাষা ও বাংলা সাহিত্যের বিভিন্ন প্রসঙ্গ আলোচিত হয়েছে। সঙ্গে আছে দেশ ও জাতি নিয়ে ডক্টর শরীফের সমকালীন ভাবনা ও অভিমত। *বাঙলা ভাষা-সংস্কার আন্দোলনে* উনিশ শ সাতচল্লিশ পরবর্তীকালে পাকিস্তান রাষ্ট্রের কাঠামোর তৎকালীন পূর্ববাংলার বাংলা ভাষা সংস্কারের নামে তাহজীব-তমদ্দুন ওয়ানাদের নানা ষড়যন্ত্রের এবং এর প্রতিক্রিয়ার বিবরণ রয়েছে। 'ইদানীং আমরা' গ্রন্থের বিষয় সমকালীন বাংলাদেশের শিক্ষা, সংস্কৃতি ও রাজনীতি এবং কিছু ব্যক্তিগত অনুভব। *বাঙালীর চিন্তাচেতনার বিবর্তনধারা* ডক্টর শরীফের মননচর্চার একটি উৎকৃষ্ট নিদর্শন। বিষয়টি তাঁর দীর্ঘদিনের অধ্যয়ন, গবেষণা, বোধ ও উপলব্ধির কর্ষণ। আবদুল করিম সাহিত্যবিশারদ বাংলা একাডেমীর জীবনী গ্রন্থমালার সূচনা-পর্যায়ের একটি বই। আহমদ শরীফই পিতৃব্যের জীবনী প্রণয়নের যোগ্যতম ব্যক্তি। এ-দায়িত্ব তিনি সাগ্রহে সম্পন্ন করেন। বাংলা, বাঙালি, বাঙালির ধর্মান্দোলন, শিক্ষা, সংস্কৃতি, জাতীয়তা, গণমানবমুক্তি ইত্যাদি চিন্তাবিদ আহমদ শরীফের প্রিয় ভাবনাগুলো আলোচিত হয়েছে *এবং আরো ইত্যাদি* বইতে।

চতুর্থ খণ্ডটি প্রকাশেও ডক্টর আহমদ শরীফের দুই পুত্র ডক্টর নেহাল করিম (ফৈজী) ও যাহেদ করিমের (স্বপন) উৎসাহ ও সহযোগিতা স্মরণ করছি। আর খণ্ডটির প্রকাশরূপ দানের জন্য আগামী প্রকাশনীর স্বত্বাধিকারী ওসমান গনিকে জানাচ্ছি ধন্যবাদ।

রচনাবলীতে আহমদ শরীফের বানান অক্ষুণ্ন থাকে নি।

আহমদ কবির

বাঙলাভাষা-সংস্কার আন্দোলন

আহমদ শরীফ রচনাবলী-১

উৎসর্গ

বেরুবাড়ি মামলার নির্ভীক কৌসুলি
সুপ্রীম কোর্টের প্রখ্যাত আইনজীবী
মেঝো ভাই
প্রয়াত এডভোকেট আহমদ সোবহান

সরকারি রাজনীতি ও কূটনীতি যে কত অভাবিত উপায়ে অভীষ্ট সিদ্ধির ব্যবস্থা করে, কত সূক্ষ্ম ও পরোক্ষ পন্থায় মানুষের মন-বুদ্ধি-চিন্তা-চেতনাকে বিপথে চালিত ও বিকৃতি দান করে, তা সমকালে সাধারণ মানুষ কল্পনাও করতে পারে না। ফলে জনগণ হয় অসুস্থ চিন্তা-চেতনার ও বিপথ বিভ্রান্তির শিকার।

১৯৪৭ সনেই বাঙলাকে অন্যতর রাষ্ট্রভাষা করার দাবি কোন কোন বুদ্ধিজীবীর মুখে গুঞ্জরিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই সরকার এ বিষয়ে সচেতন ও সতর্ক হয়ে ওঠে। তখন থেকেই শহরে শহরে সরকার মুৎসদ্দী বাঙালীর ও বুদ্ধিজীবী সরল বাঙালীর মাধ্যমে বাঙলাভাষার উৎসগত, বর্ণগত, বানান-গত এমনকি লিখনভঙ্গিগত নানা ত্রুটির কথা প্রচারের ব্যবস্থা করে। এ প্রচার জনগণকে সহজেই প্রভাবিত করে অন্য এক মনস্তাত্ত্বিক কারণে। সেটি এই : বাঙালী মুসলমানেরা জন্মাবধি দেখছিল—জমিদার হিন্দু, মহাজন হিন্দু, শিক্ষিতেরা হিন্দু, চাকুরেরা হিন্দু, উকিল-ডাক্তার-ব্যবসায়ীরা হিন্দু; অফিস হিন্দুর, প্রশাসনও হিন্দুর। স্কুলকলেজের বাঙলা বইগুলোতেও ছিল হিন্দুর লেখা ও হিন্দুর কথা। ফলে অর্থে বিত্তে বেসাতে ও শিক্ষায় বঞ্চিত মুসলিমমনে হিন্দুর প্রতি ঈর্ষা, ক্ষোভ ও বিদ্বেষ ঘন হয়ে ওঠে।

এ কারণে পাকিস্তান হয়েছিল তাদের কাম্য। মুসলিম লীগের আহবানে নির্দ্বিধায় মুক্তিসনদরূপ পাকিস্তান আদায়ের সংগ্রামে তাই সর্বাগ্রে ঝাঁপিয়ে পড়েছিল বাঙালীরাই । তারপর কোলকাতার, নোয়াখালীর ও বিহারের দাঙ্গা হিন্দু-বিদ্বেষ করেছিল তীব্র। এখন এখানে মুসলিম ও পাকিস্তানপন্থী প্রায় সমার্থক, —কখনো কখনো এবং কারুর ক্ষেত্রে অভিন্নার্থকও। তাই সদ্য প্রতিষ্ঠিত পাকিস্তানের শত্রু ছিল কেবল হিন্দুই। এমনি সময়ে যখন হিন্দুর লালিত হিন্দুয়ানীর বাহক বাঙলাভাষার নানা ত্রুটির কথা সুকৌশলে ছদ্ম আন্তরিকতায় উচ্চারিত হল, তখন ইসলামী শাস্ত্রের, জীবনদৃষ্টির ও সংস্কৃতির স্বাতন্ত্র্যের যুক্তিতে প্রাপ্ত পাকিস্তানে প্রায় সবাই এ সব ত্রুটি সংশোধনের প্রয়োজনীয়তা স্বীকার করেই নিল। কারণ এদের অন্তরে ভাষাপ্রীতি ছিল না—ক্রিয়াশীল ছিল হিন্দুবিদ্বেষ।

এ প্রচারণার ফলে শিক্ষিত সরল বাঙালীর মনেও বাঙলাভাষার রাষ্ট্রভাষা হবার যোগ্যতা সম্বন্ধে সংশয় জাগে। এবং রাষ্ট্রভাষার যোগ্য করার লক্ষ্যে বর্ণ, বানান, শব্দ, বাক্‌ধারা ও লিখন পদ্ধতি সংশোধন বা পরিবর্তন করা আবশ্যিক—এ ধারণাও তাদের মনে দৃঢ়মূল হচ্ছিল। সবটাই ঘটছিল আমাদের চোখের সামনেই। তবু আজ ভেবে অবাক হই— ১৯৪৭ সন থেকে ১৯৬৮ সন অবধি কিঞ্চিন্ন্যূন সুদীর্ঘ বাইশ বছর ধরে সারাদেশের শিক্ষিত বাঙালী ভাষার এ সংস্কার সংশোধনের পক্ষে কিংবা বিপক্ষে নিজেদের জড়িয়ে ফেলেছিল।

সরকারি অভিসন্ধিজাত একটা বানানো সমস্যা কি ভাবে গোটা জাতির শিক্ষিত সমাজের চেতনাকে সুদীর্ঘ কাল আচ্ছন্ন করে রাখে, তার সাক্ষ্য এ বাঙলাভাষা-সংস্কার আন্দোলন।

কালের পরিপ্রেক্ষিতে তাদের যুক্তিও ছিল প্রবল : বাঙলা হিন্দুর ভাষা; অতএব বাঙলা পৌত্তলিক হিন্দুর শাস্ত্রের, সমাজ চিন্তার, জীবনচেতনার, সংস্কৃতির, সাহিত্যের ও দর্শনের বাহন। অপরিবর্তিত অবস্থায় ইসলামী শাস্ত্রের, ইসলামী জীবনভাবনার, সংস্কৃতির ও সাহিত্যের

বাহন হতেই পারে না এ ভাষা। কেননা এ ভাষার বর্ণে, শব্দে, বাক্‌ধারায় রয়েছে হিন্দুয়ানীর ছাপ। এ ভাষা অবিকল গ্রহণ করলে পাকিস্তানের আদর্শ ও উদ্দেশ্য—দুটোই হবে ব্যর্থ।

এভাবে মুসলিমদের শাস্ত্রের, সমাজের তমদ্দুনের তাহজীবের, জীবনদৃষ্টির, ঐহিক পারত্রিক আদর্শের ও লক্ষ্যের স্বাতন্ত্র্যের দোহাই উচ্চারণ করে বাঙলাকে অঙ্গে ও অন্তরে ইসলামী রূপ দেয়ার গরজে—গোড়া থেকেই হিন্দুর মনে-মুখে-মস্তিষ্কে লালিত বাঙলাভাষার বর্ণের, বানানের, বাক্‌ভঙ্গির ও লিখনপদ্ধতির পরিবর্তনের আশু আবশ্যকতা দেখায় তারা। কেননা, এ পরিবর্তন বা সংস্কারসাধনের আগে একে রাষ্ট্রভাষা রূপে গ্রহণ ও ব্যবহার জাতীয় লক্ষ্যের ও স্বার্থের পরিপন্থী।

কোলকাতার ভাষা, বর্ণ, বানান অবিকৃত রাখলে পাকিস্তান প্রতিষ্ঠাই যেন বৃথা হয়ে যায়। এদের অনুক্ত অভিপ্রায় ছিল, — এভাবে বর্ণে-বানানে-শব্দে, বাক্‌ভঙ্গিতে ও লিখনপদ্ধতিতে পার্থক্য সৃষ্টি করে অল্পকালের মধ্যেই হিন্দুরচিত বাঙলাগ্রন্থের সঙ্গে পূর্ব-পাকিস্তানীদের চিরকালের জন্য চাক্ষুষ ও মানস বিচ্ছেদ ঘটানো।

বাঙলাকে রাষ্ট্রভাষা করার দাবি ও সংগ্রামের পাশাপাশি যুগপৎ বাঙলাভাষা সংস্কারের পক্ষে-বিপক্ষে যে-বাদ-প্রতিবাদ চলে, সে বিতর্ক বিবাদে যোগ দেন সেকালে সরকারি চাকুরেরাও। ইসমাইল আবুল হাসনাত, মিজানুর রহমান, ডক্টর কুদরৎ-ই-খুদা, ডক্টর মুহম্মদ এনামুল হক, ফেরদৌস খান প্রমুখ চাকুরেরা যেমন ছিলেন, ডক্টর মুহম্মদ শহীদুল্লাহ থেকে বিভিন্ন পেশার স্বল্পপরিচিত কিংবা অপরিচিত বহু শিক্ষিত লোকও তেমনি সংস্কারের নানা প্রস্তাব ও পরামর্শ দিয়েছিলেন।

সবটাই ছিল একটিমাত্র যুক্তিভিত্তিক : বাঙলাভাষা বর্তমান রূপে শেখা-শেখানোর, পড়া-পড়ানোর, লেখা-লেখানোর পক্ষে জটিল এবং শ্রমের ও সময়ের অপচয় সাপেক্ষ এবং গণশিক্ষার কিংবা গণসাক্ষরতার পক্ষে দুরতিক্রম্য বাধা। তাছাড়া টাইপের ও মুদ্রণের ক্ষেত্রে জটিলতার সমস্যা তো রয়েইছে। কাজেই ১. স, ষ, ণ, ক্ষ, ব প্রভৃতি নানা বর্ণ বর্জন, ২. স্বরচিহ্ন তথা 'কার' বর্ণের ডানে লিখন ৩. ব্যঞ্জনবর্ণ চিহ্ন তথা ফলা বর্জন, ৪. বর্ণের উপরকার মাত্রাবর্জন ৫. আরবী হরফ কিংবা, ৬. রোমান হরফগ্রহণ—আবশ্যিক। এগুলো ছাড়াও দাবি ছিল হিন্দু পুরাণ সম্পৃক্ত উপমাদি অলঙ্কার ও বাক্‌ধারা বর্জন এবং আরবী, ফারসী শব্দের বহুল ব্যবহারে পরিভাষা গঠন ও ভাষার অঙ্গে ইসলামী লাবণ্য দান প্রভৃতি এবং উচ্চারণ-অনুগ শব্দের বানান সংস্কার। কিন্তু সে-দিন অসুস্থ আচ্ছন্ন মনের মানুষের সংখ্যাই ছিল বেশি, নইলে বলা যেতো কোন কালের কোন অঞ্চলের কোন মানুষের উচ্চারণে বানান নির্ধারণ করা হবে। কেননা উচ্চারণ প্রতি মুহূর্তে মুখে মুখে অদৃশ্য অশ্রুত ভাবে বদলাচ্ছে এবং তার ফলেই সৃষ্টি হয়েছে আঞ্চলিক বুলি। একই ভাষা কয়েক শ বা হাজার বছর পরে বিভিন্ন অঞ্চলে বিকৃত হয়ে ভিন্ন ভিন্ন ভাষা রূপেই গড়ে ওঠে, বৈদিক ভাষা প্রাকৃত ও অবহট্ট হয়ে যেমন আজকের বাঙলা-ওড়িয়া-বাঙলা-আসামী-মৈথিলী-হিন্দী মারাঠী-গুজরাঠী হয়েছে। লিখিত কৃত্রিম সংস্কৃত ভাষা যেমন ভারতীয়দের রসুনের মতো অভিন্নমূল শাস্ত্রিক-সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যচেতনায় গোষ্ঠীবদ্ধ রেখেছে, তেমনি লিখিত কৃত্রিম বাঙলা ভাষাই বাঙলা বিহার উড়িষ্যা আসামের বাঙলাভাষীদের বুলির দুর্লঙ্ঘ্য বাধা সত্ত্বেও অভিন্ন জাতিসত্তা বোধ তথা জ্ঞাতিত্ব চেতনা জিইয়ে রেখেছে। সেদিন এ যুক্তি মতলববাজ সংস্কারবাদীদের মনে ঠাঁই পায়নি।

সরকারি এজেন্টরা কুমতলবে আর সরলবুদ্ধি শিক্ষিতজনেরা হিতবাঞ্ছাবশে নানাভাবে ভাষা-সংস্কারের প্রস্তাব-পরামর্শ দিয়েই তাঁদের দায়িত্ব পালন করেছেন। কিন্তু ভাষাবিজ্ঞানের

কিংবা লিপিবিদ্যার অন্ধি-সন্ধি সম্বন্ধে তাঁদের সামান্যতম জ্ঞানও ছিল না। ফলে এলোপাতাড়ি অযৌক্তিক অবৈজ্ঞানিক নানা সংশয় জাগিয়ে ও সমস্যা সৃষ্টি করেই তাঁরা রাষ্ট্রভাষা হিসেবে বাঙলা চালু করার পথে ফলপ্রসূ বাধা সৃষ্টি করেই সিদ্ধকাম হলেন।

কিন্তু যাঁরা সর্বনাশকর অভিসন্ধি ঠেকানোর ও ব্যর্থ করার জন্য এগিয়ে এলেন, তাঁদের পক্ষে তা ছিল জাতীয় অস্তিত্ব সম্পৃক্ত সংগ্রাম। সরকারি রোষজাত বিপদের ও ক্ষতির ঝুঁকি নিয়ে প্রকাশ্যে এগিয়ে আসার মতো দেশ-ভাষা-ও জাতিপ্রেমিক লোক সেদিনও ছিল। তাই সরকারের ম্যাকিয়াভেলীয় নীতি সফল হয়নি। ১৯৬৮ সন অবধি এক্ষেত্রে সরকারি প্রয়াস ও ষড়যন্ত্র চলছিলই। সরকারী কৃপালোভী ছদ্মবেশি দালালেরও ছিল না অভাব। তবু ১৯৬১ সনের অভ্যুত্থানের সময়ে গণমন ও গণদৃষ্টি বিষয়ান্তরে নিবদ্ধ হওয়ায় এ আন্দোলন চুপসে যায়। সংস্কারের দাবিও ভিন্ন প্রতিবেশে চাপা পড়ে বটে, তবে মুসলিম জাতীয়তার অনুরাগীদের মনে ওই ব্যাধি আজো নির্মূল হয়নি। 'রাষ্ট্রপতি'র 'প্রেসিডেন্ট' হওয়ার কিংবা সড়ক-সরণি রোড অ্যাভিন্যু হওয়ার মধ্যেই রয়েছে সে-রোগের আলামত ও সাক্ষ্য। সম্প্রতি সরকারী দপ্তরে ও ইসলামী ফাউণ্ডেশন-প্রকাশিত গ্রন্থে এ ব্যাধি আবার প্রবলতার আভাস দিচ্ছে।

তেরো শতকের গোড়া থেকেই ইসলাম অঙ্গীকার করেই দেশজ মুসলিমেরা হয়তো স্বসত্তার স্বাতন্ত্র্য সুস্পষ্ট করার ও রাখার গরজে স্বগোষ্ঠীর আচার, আচরণ ও ঐতিহ্য পরিহারলক্ষ্যে, স্বশাস্ত্রজাত ও স্বশাস্ত্রসংলগ্ন রীতিনীতির ও আচার-সংস্কৃতির অনুশীলনসূত্রে মুখের বুলিতে ও লিখিত ভাষায় স্বাতন্ত্র্যসৃষ্টির প্রয়াসে ভাব ও বস্তুনির্দেশক বিশেষ বিশেষ শব্দ প্রয়োগে সচেতন থাকে। এমনি চেতনার প্রসূন হচ্ছে জল-পানি, থালা-বাসন, গাড়ু লোটা-বদনা, ধুতি-লুঙ্গি, কুর্তা-কামিজ-জামাকাপড় প্রভৃতি। একই চেতনার প্রভাবে এই সেদিনও বাঙলাদেশ 'বেতার' হল 'রেডিও বাঙলাদেশ' আর লোপ পেল 'জয় বাঙলা' জিগির।

এমনি সচেতন-অবচেতন অনুশীলনে ও প্রয়োগে হিন্দুস্থানী ভাষা পরিণামে দাখিনী ও উত্তরী উর্দুভাষার রূপ নেয় ফারসী শব্দের বহুল প্রয়োগে ও আরবী লিপির ব্যবহারে। এখনো উর্দু-হিন্দির পার্থক্য মূলত নির্ভর করে আরবী ও নাগরী লিপির ব্যবহারে এবং ফারসী ও সংস্কৃতজ শব্দের স্বল্পতায় ও আধিক্যে। হুগলী-হাওড়া-কোলকাতা বন্দর এলাকায় বিদেশাগতদের বংশধরেরাও হিন্দুস্থানী আর বাঙলা ভাষার মিশ্ররূপ তৈরি করেছে কথায় ও লেখায়। পাদরী লঙ যে-ভাষাকে ভাগীরথীর মাঝি-মাল্লার বুলি বলে শনাক্ত করেছিলেন এবং যে-ভাষায় হুগলী-হাওড়ার কবিরা কাব্য রচনা করে তাকে ঐতিহাসিক গুরুত্বে প্রতিষ্ঠিত করেছেন, সে-ভাষা এখন 'দোভাষী রীতি' নামে অভিহিত। এবং চট্টগ্রাম-ঢাকা-মালদহ পাণ্ডুয়া-মুর্শিদাবাদ-হুগলী প্রভৃতি সব তুর্কী-মুঘল প্রশাসন কেন্দ্রের স্থায়ী বাসিন্দাদের মাতৃভাষা আজো হিন্দি বা হিন্দুস্থানী। এ হিন্দি যদিও বিচ্ছিন্নতার দরুন বিকৃত, তবু তার সঙ্গে স্থানীয় বাঙলাবুলির মিশ্রণে তৈরি সর্বত্র এক মিশ্র (হিন্দুস্থানী ও বাঙলা) ভাষা চালু রয়েছে তাদের মুখে মুখে।

আস্তিক মানুষ শাস্ত্রানুগত জীবনযাপনে আগ্রহী বলেই তাদের মন–মননে শাস্ত্রজ ও শাস্ত্রানুগ বিশ্বাস-সংস্কার, নিয়ম-নীতি ও আচার-সংস্কৃতি প্রাধান্য পায় তথা মুখ্য হয়ে ওঠে। ফলে ব্যবহারিক জীবনের নানা ভাব-চিন্তা-কর্ম-আচরণে তা-ই প্রকাশ পায়। এজন্যই পৃথিবীর ধর্মসম্প্রদায়গুলোর কেবল জীবনযাত্রা পদ্ধতিতে নয়, কেবল শিল্প-সাহিত্যাদি কলায় নয়, জন্ম-জীবন-মৃত্যু সম্বন্ধে ধারণায়ও থাকে পার্থক্য ও বৈচিত্র্য। ভাব-চিন্তার মন-মননের বাহন ভাষাও তাই দেশ-জাত-বর্ণ-ধর্ম ও অবস্থানভেদে অল্প-বিস্তর ভিন্ন হয়ই।

শাস্ত্রানুগত্যবশেই মুসলিমেরা কেবল আরব ও আরবীকে নয়, ইরানকে ও ইরানীভাষাকেও এমনকি আরবী হরফে লিখিত বলে ফারসী শব্দবহুল উর্দুকেও ইসলামী ভাষার মর্যাদা ও গৌরব দান করে। কিন্তু তাদের মাতৃভাষা বাঙলাকে তারা হিন্দুর ও হিন্দুয়ানীর দান বলে জানে এবং মনেও মানে।

বিদেশাগত মুসলিমের বংশধর কোলকাতার উকিলের সন্তান উর্দু ভাষী নওয়াব আবদুল লতিফ তাই নিঃসংকোচে দ্বিধাহীন চিত্তে বলতে পেরেছেন যে বাঙালী (বাঙলাদেশবাসী) মুসলিমের মাতৃভাষা উর্দু। আর ছোটলোক মুসলমানের (তথা গোটা বাঙলার দেশজ মুসলিমের) ভাষা বাঙলা। মধ্যযুগের মুসলিম-রচিত বাঙলা সাহিত্য সম্বন্ধে অবহিত ছিল না বলেই গাঁ-গঞ্জের বাঙালীর সঙ্গে ভাষিক-সাংস্কৃতিক সম্পর্কবিহীন মুঘল আমলের উর্দুভাষী অভিজাতদের মুর্শিদাবাদ কোলকাতাবাসী বংশধরের অবিসম্বাদিত নেতৃত্বে চালিত অল্পশিক্ষিত—এমনকি ইংরেজী শিক্ষিত গাঁ গঞ্জের দেশজ মুসলিমেরাও মেনে নিল যে মুসলিমদের ভাষা উর্দু এবং হিন্দুর ভাষা বাঙলা। এবং এখানেই শেষ নয়, —ফারসীমিশ্রিত যে-বাঙলা মুঘল আমলে চালু ছিল, তাও ব্রিটিশ শাসকগোষ্ঠীর, খ্রিস্টান মিশনারীর ও হিন্দু ব্রাহ্মণপণ্ডিতের সুপরিকল্পিত ষড়যন্ত্রের ফলেই সংস্কৃত সাধুভাষার রূপ পেল বলেই তাদের ধারণা। ফলে এ ভাষা দেশজ মুসলিমের পক্ষেও পরিহার্য বলে বিবেচিত হল।

যেহেতু মাতৃভূমির চেয়েও আশৈশবের মাতৃভাষার প্রতি মানুষের মমতা অনেক বেশি, [কেননা ভাষা হচ্ছে জীবনানুভূতির বাহন; তাই ভাষাই জীবন] সেহেতু কেউ কেউ বাঙলাকেই মুসলমানদের মাতৃভাষা বলে উচ্চকণ্ঠে ঘোষণা করলেন— নেতাদের ও অধিকাংশ বুদ্ধিজীবীর ওই প্রতিকূলতা সত্ত্বেও। বাঙালী মুসলিমদের সেই মানস দ্বন্দ্ব ও ভাষাবিতর্ক লঘুগুরুভাবে প্রায় ১৯৩০ সন অবধি চলেছিল। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে, ১৩২৫ সনের আশ্বিন সংখ্যা আল-ইসলামে আবদুল করিম সাহিত্যবিশারদ-ই প্রথম প্রকাশ্যে নির্ভীকচিত্তে উচ্চকণ্ঠে ঘোষণা করেন যে বাঙলা বাঙালী মুসলিমের কেবল মাতৃভাষা নয়, জাতীয় ভাষাও।

সাহিত্যিক ঐতিহ্য সম্বন্ধে অজ্ঞতার দরুন মুসলিমেরা যখন স্বদেশে প্রবাসী হয়ে স্বসত্তার স্বরূপ, স্বদেশের ঠিকানা ও স্বভাষার সন্ধান করছিল, তখন আবদুল করিম সাহিত্যবিশারদই প্রাচীন পুথিগুলো সকলের চোখের সামনে তুলে ধরে জানালেন—মুসলিমদের স্বদেশ এ বাঙলাদেশ, তাদের স্বভাষাও বাঙলাভাষা এবং তারা দেশজ মুসলিমদের বংশধর বলেই তারাও রক্তে মাংসে মেদে-মজ্জায় ডালেভাতে নিখাদ নিখুঁত বাঙালী। এ দ্বন্দ্ব-বিতর্কের অবসানে আবদুল করিম সাহিত্যবিশারদেরই প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ দান সবচেয়ে বেশি। তাঁর অনলস প্রয়াসে ও শ্রমে এবং অবিরাম সাধনায় মধ্যযুগের মুসলিমদের বাঙলা-সাহিত্য চর্চার সংবাদ কারো অজানা রইল না। ফলে প্রতিপক্ষদের যুক্তির জোর গেল উবে, মনের জোরও হল শূন্য। সাহিত্যবিশারদের এ আবিষ্কার ও তাঁর প্রবন্ধাবলী এদেশের মুসলিম মনে 'বাঙালীসত্তা' জাগার সহায়ক যে হয়েছে, তা আজকাল বোধ হয় কেউ অস্বীকার করে না। তাই এক প্রবন্ধে আবদুল হক বলেন, "রাষ্ট্রভাষা আন্দোলনের পেছনে সমাজের সর্বাত্মক এবং অনমনীয় সমর্থনকে অন্যতম উপাদান হিসাবে প্রেরণা দিয়েছে বাঙলা ভাষা ও সাহিত্যে বাঙালী মুসলমানের উত্তরাধিকার-স্বত্বের চেতনা। এই চেতনা সমাজে যাঁরা সঞ্চারিত করেছেন, তাঁদের মধ্যে সর্বাগ্রগণ্য আবদুল করিম সাহিত্যবিশারদ—এই অর্থে যে, পুথি-সংগ্রহ এবং এ সংক্রান্ত গবেষণায় বাঙালী মুসলমানদের মধ্যে তিনি ছিলেন অগ্রণী এবং মহত্তম কর্মী। এই চেতনার ঐতিহাসিক ধারাবাহিকতা বিশেষ ভাবে আবদুল করিম সাহিত্যবিশারদেরই অবদান। তাঁরই

আজীবন সাধনার ফলে আহৃত বিপুল তথ্যপুঞ্জ সমাজ-মানসে ঐ চেতনার জন্ম দিয়েছে এবং আত্মঘোষণার এক অনমনীয় সঙ্কল্প সঞ্চারিত করেছে।"[২]

মুসলিমদের জীবনে আরবী, ফারসী, উর্দু, বাঙলা ও ইংরেজী ভাষার পরিহার্যতা-অপরিহার্যতার গুরুত্ব, মর্যাদা ও গ্রহণ-বর্জনের মাত্রা সম্বন্ধীয় যাবতীয় বিতর্ক চলছিল কিন্তু মুসলিম-প্রকাশিত বাঙলা সামরিকপত্রের মাধ্যমে এবং বিতর্কের বাহনও ছিল বাঙলাই। তাছাড়া তাদের পরিবারে তো নয়ই, গাঁয়েও কেউ ছিল না উর্দুভাষী কখনো। তবু সব সময়েই আরবী-ফারসী শব্দের বহুল ব্যবহার এবং বানান নির্ধারণ বিষয়ে বিতর্ক আর আলোচনাও পেয়েছিল গুরুত্ব।[৩] লক্ষণীয় এই যে বাঙালী মুসলমান আজো যেমন তাদের জাতিপরিচয় সম্বন্ধে নিঃসংশয় হতে পারেনি, তেমনি, আরবী, ইংরেজি, ফারসী-উর্দু সম্বন্ধে কিংবা আরবী-ফারসী শব্দে প্রয়োগের মাত্রা ও বানানের রূপ সম্বন্ধে তাদের দ্বিধা-দ্বন্দ্বের ও মন-মতের বৈচিত্র্যের অবসান ঘটেনি এ মুহূর্তেও । আজো তারা কি মুসলিম বাঙালী, বাঙালী-মুসলিম, বাঙলাদেশী মুসলিম, মুসলিম বাঙলাদেশী কিংবা দেশ-কালহীন কেবলই 'মুসলিম' তার মীমাংসা করতে পারেনি। কারণ ইসলামী ভ্রাতৃত্ববোধের প্রভাবে মুসলিমেরা দেশকালহীন এক মানসজগতে কেবল স্বধর্মীর বৈশ্বিক সমাজে বাস করে। ফলে তারা থাকে স্বদেশেও প্রবাসী— যে মাটিতে দাঁড়িয়ে আছে তা তার সারা জীবন নিয়ন্ত্রণ করলেও তাকে সে মনের মধ্যে আপন বলে গ্রহণ করে না। তাই বাস্তব-অবাস্তবের দ্বৈত বা দ্বৈধ সত্তায় (Split personality) বা দ্বিধাগ্রস্ত ব্যক্তিত্বে ভোগে। তাই সামরিক-বেসামরিক প্রতি সরকারের আমলেই এ প্রশ্ন এক এক রূপে মাথা চাড়া দিয়ে ওঠে, আবার চাপা পড়ে কিন্তু অবিসম্বাদিত মীমাংসায় উত্তরণ ঘটে না কখনো।

১৯২৬ সনের কোলকাতার সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার পরে মুসলিমদের স্বসত্তার ও স্বস্বার্থেও স্বাতন্ত্র্য চেতনা বেড়ে যায় এবং ১৯৩০-৩২ সনের গোলটেবিল বৈঠকের ব্যর্থতার ফলে শিক্ষাক্ষেত্রে অগ্রসরমান মুসলিম মনে স্বাতন্ত্র্যচেতনা ও স্বার্থসংরক্ষণবুদ্ধি প্রবল হল। আর এ সময়েই তাদের মনে জাগল 'পাকিস্তান' নামের পৃথক বাসভূমির স্বপ্ন। সে-স্বপ্ন বাস্তব দাবির ও আন্দোলনের রূপ নিল মুসলিম লীগের ১৯৪০ সনের লাহোর অধিবেশনে।

পাকিস্তান আন্দোলনের শুরুতেই মুসলমানেরা তাদের দাবির যৌক্তিকতা সন্ধানে উদ্যোগী হয়ে ধর্ম, ভাষা, সংস্কৃতি, জীবনাচার প্রভৃতি ক্ষেত্রে হিন্দু-মুসলিমের পার্থক্য খুঁজতে থাকে। তখন হুগলী-হাওড়া-কোলকাতার উর্দুভাষী বাঙালীর হিন্দিমিশ্রিত বাঙলায় রচিত বটতলার 'দোভাষী' সাহিত্যই তাদের ইসলামী ভাষা-সাহিত্যের নিদর্শন বলে তারা প্রচার করতে থাকে। ঢাকায় বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র-শিক্ষকের 'পূর্বপাকিস্তান' পত্রিকায় এবং ১৯৪৪ সনে ফজলুল হক হলে 'পূর্ব পাকিস্তান সাহিত্য সংসদের' উদ্যোগে অনুষ্ঠিত সাহিত্য সম্মেলনে মুসলিম বাঞ্ছিত ভাষা-সাহিত্য-সংস্কৃতি ও জীবনাচার সম্বন্ধে আলোচনা ও প্রচার শুরু হয়। কোলকাতায়ও 'আজাদ' অফিসকেন্দ্রিক 'পূর্বপাকিস্তান রেনেসাঁস সমিতি'র উদ্যোগে দৈনিক ও সাময়িক পত্রিকায় এবং সাহিত্য সম্মেলনে একই লক্ষ্য ঘোষিত হয় এবং মুসলিম জাতির সর্ব প্রকার স্বাতন্ত্র্য ও স্বার্থ সম্বন্ধে প্রচার প্রচারণা প্রবল ও তীব্র হতে থাকে। 'পাকিস্তান' নামে একটি বই লিখলেন মুহম্মদ হবীবুল্লাহ বাহার এবং অপরটি সাংবাদিক মুজিবুর রহমান খান। তখন আর তাঁদের কথায় ও লেখায় কৃষ্টি-সংস্কৃতি ছিল না, ছিল 'তমদ্দুন-তাহজীব'।

এ সময় থেকে আবার আরবী-ফারসী শব্দের নতুন ও বহুল প্রয়োগে মুসলিম লিখিয়েদের উৎসাহিত করার চেষ্টা চলে। 'পূর্ব পাকিস্তান সাহিত্য সংসদে'র দ্বিতীয় বার্ষিক অধিবেশনে সভাপতির ভাষণে সৈয়দ এমদাদ আলী কল্পিত বিরুদ্ধ পক্ষকে লক্ষ্য করেই যেন হুঙ্কার ছাড়েন,

"প্রয়োজনমত আবরী-ফারসী শব্দ আমরা আমদের রচনায় ব্যবহার করিবই।... ধর্মীয়, সাহিত্যিক এবং রাজনৈতিক কারণে আমাদের তরুণদের কিছু উর্দু শেখা উচিত।"[৫]

পাঁচের দশকে আবুল মনসুর আহমদ তাঁর 'আয়না,' 'ফুডকনফারেন্স' প্রভৃতি রচনায় এবং হবীবুল্লাহ বাহার 'আজাদ' পত্রিকায় 'শেফাউলমুলুক' ছদ্মনামে তাঁর 'হিং ও হালিম' নামের ব্যঙ্গ বিদ্রূপাত্মক রচনার আরবী-ফারসী শব্দে ও হিন্দুস্থানী বাক-ভঙ্গির মিশ্রণে এক খিচুড়ি বাঙলা গদ্য বানাতে থাকেন। এ প্রসঙ্গে উল্লেখ্য যে, বাহারের এ রচনাকেই আদর্শ করে উর্দুওয়ালারা আরবী বা রোমান হরফে উর্দুর সঙ্গে পরিণামে বাঙলাকে অভিন্ন করে তোলার লক্ষ্যে বাঙলা বর্জনের আন্দোলন করিয়েছিল তাদের বাঙালী মুৎসদ্দীদের দিয়ে। বর্ণ, বানান, লিখনভঙ্গি শব্দ পরিবর্তন প্রয়াসের মূলে প্রধান লক্ষ্য ছিল কোলকাতার হিন্দুর ভাষা ও গ্রন্থ থেকে পূর্ব পাকিস্তানীর চাক্ষুষ ও মানস বিচ্ছেদ ঘটানো।

আবুল মনসুর আহমদের ও হবীবুল্লাহ বাহারের উক্ত গদ্য রসরচনায় মুজিবুর রহমান খান মুসলিমদের তমদ্দুনের ছাপ লক্ষ্য করেছেন, তাঁর ভাষায় "কাব্যে আমাদের তমদ্দুনের পরিচয় কিছুটা আমরা পেয়েছি। [সম্ভবত বটতলার পুঁথিতে ও নজরুল ইসলামের রচনায়] কিন্তু এদিক দিয়ে আমাদের গদ্য রচনার দারিদ্র্য অত্যন্ত বেশি। ...আমাদের গদ্য রস-রচনায় এবং ব্যঙ্গ চিত্রেই যা কিছু আমাদের তমুদ্দুনের ছাপ ভাষাতে আত্মপ্রকাশ করেছে।"[৬]

সংখ্যাগুরু হিন্দুর শাসন-শোষণ-প্রতিদ্বন্দ্বিতা-প্রতিযোগিতাভীরু সংখ্যালঘু মুসলিমেরা স্বধর্মের, স্বজাতিসত্তার, স্বভাষার, স্বসংস্কৃতির ও স্বজীবনাদর্শের স্বাতন্ত্র্যের দোহাই দিয়ে পৃথক রাষ্ট্র দাবি করেছিল। তখন উর্দুকে তারা তাদের শাস্ত্রের, সাহিত্যের ও সংস্কৃতির বাহনরূপে করে নিয়েছিল কেবল রাজনীতির চাল হিসেবে নয়, কোরআন-হাদিসের উর্দু হাশিয়া দেখে কিছুটা প্রতীতি ও আবেগ-তাড়িত হয়েই উর্দুকে তামদ্দুনিক ভাষা হিসেবে মনে মনে বরণ করেছিল। তাই লাহোর ব্যতীত পাকিস্তানের কোনো অঞ্চলেরই ভাষা না হওয়া সত্ত্বেও উর্দু পেল পাকিস্তানে অবিসম্বাদিত রাষ্ট্রভাষার স্বীকৃতি ও মর্যাদা। নইলে খোলা চোখে দেখলে এবং নিরপেক্ষ যুক্তিবুদ্ধি দিয়ে বিচার করলে বাঙলা ভাষার পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা হওয়ার যোগ্যতা ও ন্যায্যতা স্বীকৃত হত। কেননা, সারাওয়াকী, পশতু, বালুচি, সিন্ধি প্রভৃতি ভাষা ছিল সেদিনও অবিকশিত। মুসলিম ভ্রাতৃত্বে ও ঐক্যে অভিভূত বাঙালী মুসলিমের মনে সেদিন এ দাবি জাগেনি, চাকরি ক্ষেত্রে প্রতিযোগিতায় উর্দুওয়ালাদের কাছে [আসলে তখন উত্তর প্রদেশের শিক্ষিত ধনী-মানীরা এবং প্রতিদ্বন্দ্বিতায় অন্যান্য ক্ষেত্রেও ভাষাগত দুর্বলতার দরুন ঠকবার ভয়ে বাঙালীরা সেদিন বাঙলাকেও অন্যতম রাষ্ট্রভাষা করার দাবি জানিয়েছিল। এবং সেটা রোধ করার জন্যেই ষড়যন্ত্র চলছিল নানাভাবে। তখনই বর্ণ বর্জন, বানান সংস্কার, লেখার ধরন পাল্টান, হরফ পরিবর্তন, কুফরী শব্দ পরিহার প্রভৃতির জন্য নানা মতলবে ছদ্ম আন্দোলন শুরু করানো হয়। কেউ কেউ সরল বিশ্বাসে, কেউবা ইসলামী জোশবশে, কেউবা বেতনভুক্ত সরকারি দালাল হিসেবে দেশব্যাপী কেবল কাগজে কলমে ও বক্তৃতায় নয়, আরবী ও রোমান হরফে বাঙলা লেখা শেখানোর স্কুলও বাসায় সরকারি টাকায়, সেকালের কেন্দ্রীয় সরকারের মন্ত্রী ফজলুর রহমানের প্রবর্তনায়। এ সূত্রে উল্লেখ্য যে, ১৯৫১ সনে মৌলানা মুহম্মদ আকরম খানকে চেয়ারম্যান করে তেইশ সদস্য বিশিষ্ট 'পূর্ববঙ্গ শিক্ষা ব্যবস্থা সংস্কার কমিটি' গঠিত হয়। —উদ্দেশ্য ইসলামী আদর্শভিত্তিক শিক্ষাব্যবস্থা চালু করা। এ কমিটি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে কেবল মাতৃভাষার মাধ্যমে শিক্ষাদানের সুপারিশ করলেও আরবী হরফ ও কোরআন পাঠ প্রাথমিক স্তরেই চালু করার এবং চতুর্থ শ্রেণী থেকে উর্দু শেখানো বাধ্যতামূলক করার ব্যবস্থা করে সরকার।

কাজেই যাঁরা বাঙলা ভাষাকে অন্যতম রাষ্ট্রভাষা হিসেবে পেতে চেয়েছেন, বাঙলা ভাষার ভাবী রূপ-স্বরূপ সম্বন্ধে তাঁদের মত ও মতলব অভিন্ন ছিল না। ব্রিটিশ আমলের কোলকাতায় চালু লিখিত সাধু কিংবা চলতি রীতির ভাষা অবিকৃতভাবে অনুসরণের পক্ষে যেন খুব কম পাকিস্তানীই ছিলেন। তখন পাকিস্তানী ও ইসলামী জোশ এতো প্রবল যে, ভিন্নমতের স্থিতধী বুদ্ধিজীবীরা মুখ খুলতে শঙ্কা-সংকোচ বোধ করেছেন। নইলে সেদিন বলা যেত : ১. আরবীও ইসলামপূর্বকালের ভাষা, আজো তা' ইহুদী-খ্রিস্টানেরও তমদ্দুন-তাহজীবের ভাষা—মুসলিমদের একার নয়, ২. তমদ্দুন-তাহজীবের জন্ম ও লালনক্ষেত্র মন-মনন—ভাষা নয়। আরো বলা যেত, ৩. যখন পৃথিবীর বিভিন্নদেশের ভাষায় লিখিত মানব-জ্ঞানকে আয়ত্ত করার জন্য আজকের মানুষ বহু ভাষা শেখার ও নানা ভাষা থেকে অনুবাদ করার প্রয়াসী, তখন হিন্দুয়ানীর স্পর্শভীরুতার দরুন নিজের সম্পদ বর্জন করা মূঢ়তা। বলা যেত ৪. ইহুদী, খ্রিস্টান ও পৌত্তলিক ঐতিহ্যের ও তমদ্দুনের ধারক-বাহক আরবী যদি রাতারাতি ইসলামী তাহজীবের ধারক, বাহক আর প্রচারক হতে পারে; তাহলে কোলকাতার লেখ্য বাঙলাই বা পূর্ব পাকিস্তানের ইসলামী তমদ্দুনের ধারক হতে পারবে না কেন? বলা যেত ৫. আবিষ্কারে, উদ্ভাবনে ও রচনায় অক্ষমকে ও অজ্ঞকে কারো কাছে ঋণী হতেই হয়। এবং সমর্থ ও স্বয়ম্ভর হওয়া অনুকরণে লব্ধ ও অভিজ্ঞতায় অর্জিত শক্তি থেকেই সম্ভব।

কাজেই আবুল মনসুর আহমদ যখন বলেন—পূর্ব পাকিস্তানে সাহিত্যের ভাষা হবে ঢাকা-ময়মনসিংহে চালু বুলি-ঘেঁষা কিংবা তমদ্দুনওয়ালারা যখন বলেন, ভাষার 'এবারত' হবে ইসলামী আর লেবাজ হবে আরবী-ফারসী শব্দবহুল, কিংবা বুঝে না-বুঝে সংস্কার-বাদীরা যখন ১. দুই স ষ, এক য, এক ণ বর্জন করতে বলেন, অথবা ২. যুক্তাক্ষর বর্জন করে বিশ্‌শ, বিগ্যান, শরণ, শামী লিখতে পরামর্শ দেন, ৩. বর্ণের ডানে স্বরচিহ্ন 'কার' বসানোর, ৪. ফলাবর্জনের, ৫. বর্ণের উপরকার মাত্রা বর্জনের ও ৬. যুক্তাক্ষর প্রভৃতি বর্জনের বুদ্ধি যোগান আর হিন্দুয়ানী বর্ণমালা বর্জন করে আরবী কিংবা রোমান হরফ গ্রহণের সুবুদ্ধি বাতান, তখন কিছু প্রজ্ঞা ও শুভবুদ্ধিসম্পন্ন ছাত্র, শিক্ষক, সাংবাদিক ও বুদ্ধিজীবী প্রতিবাদে মুখর হলেও জনসমর্থন তাঁরা বিশেষ পাননি, কারণ প্রতিবাদীদেরকে সরকার ও ইসলাম-পসন্দ পাকিস্তানীরা যুক্তবঙ্গের চর বলেই সন্দেহ করত। অবশ্য প্রগতিবাদীদের চট্টগ্রামে ১৯৫০ সনের ১৯৫১ সনের সংস্কৃতি সম্মেলনে, ১৯৫২ সনের কুমিল্লা সম্মেলনে এবং ১৯৫৩ সনের ঢাকা সম্মেলনে প্রতিবাদীকণ্ঠ শোনা গেছে। তাছাড়া বুঝে না বুঝে সরল বিশ্বাসেও কেউ কেউ সর্বপ্রকার সংস্কার সমর্থন করতে এগিয়ে আসেন। মনে রাখতে হবে সরকার নিয়োজিত ভাষাসংস্কার কমিটি এবং ১৯৬৭ সনে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের একাডেমিক পর্যদের প্রস্তাব অনুযায়ী উপাচার্যের সভাপতিত্বে গঠিত ভাষা কমিটি প্রভৃতির কোন কোন সদস্যের মতে এবং কমিটির সামগ্রিক সুপারিশে বর্ণ, বানান, বাকভঙ্গি, হরফ ও বাকধারা বদলানোর সমর্থন ছিল।

বাক্‌ধারা সম্বন্ধে কবি খান মোহাম্মদ মঈনুদ্দীনের প্রস্তাব ছিল এরূপ : 'দাতা কর্ণ' বদলে 'দাতা হাতেম' ; 'বিদ্যাদিগগজ' স্থলে 'এলেমের জাহাজ', 'অনেক সন্ন্যাসীতে গাজন নষ্ট' না বলে 'অনেক পীরে মোজেজা নষ্ট', 'বাঘের মাসী' বদলে 'বাঘের খালা' ব্যবহার করাই বাঞ্ছনীয়।

ঢাকায় আসার আগেই ১৯৪৭ সনের জুলাই মাস থেকেই কোলকাতার পত্রিকায় রাষ্ট্রভাষা সম্বন্ধে চিন্তা ভাবনা প্রকাশ পাচ্ছিল চিঠিপত্রের ও প্রবন্ধের আকারে। সে-সময়েই কোলকাতার পত্রিকায় কবি ফররুখ আহমদ, আবদুল হক প্রমুখ বাঙলাকে রাষ্ট্রভাষা করার দাবি জানান, সে-দাবি কিছুকাল পরে ডক্টর মুহম্মদ এনামুল হকও উচ্চারণ করেন। এদিকে ঢাকায় আবুল

হাসনাত ও আবুল কাসেমই প্রথমে বাঙলা ভাষার গুরুত্ব সম্বন্ধে সচেতন হয়ে এর বহুল প্রচার ও উৎকর্ষ লক্ষ্যে বানান সংস্কারের কথাও বলতে থাকেন। অল্পদিনের মধ্যেই বোঝা গেল এবং প্রমাণও পাওয়া গেল যে ফররুখ আহমদ, আবুল কাসেম, আবুল মনসুর আহমদ, শাহেদ আলী, মিজানুর রহমান, ইব্রাহিম খান, খান মুহম্মদ মঈনউদ্দীন, তালিম হোসেন, মুফাখখারুল ইসলাম প্রমুখ এবং 'আজাদ গোষ্ঠী'র অনেক নবীন-প্রবীণ লেখকই ছিলেন কোলকাতার হিন্দু বাঙলার থেকে পৃথক আরবী-ফারসী মিশ্রিত ইসলামী বাঙলা বা পাকজবান পাকবাঙলা ভাষা নির্মাণের পক্ষপাতী ও প্রয়াসী। এঁদের মধ্যে সৈয়দ আলী আহসান অন্যদের পাকজবান তৈরির কাজে উৎসাহিত করলেও তিনি স্বয়ং কোলকাতার বিশুদ্ধ হিন্দুয়ানী ভাষা-ভঙ্গি কখনো ছাড়েননি। আর শওকত ওসমান মাদ্রাসা শিক্ষার প্রভাবে শৈল্পিক-উৎকর্ষ সন্ধানে এবং আলাউদ্দিন আল-আজাদ বাস্তব সংলাপের চমক সৃষ্টির লক্ষ্যে আরবী-ফারসী শব্দ ও আঞ্চলিক বুলি প্রয়োগপ্রবণ ছিলেন।

অন্যদের তো কথাই নেই স্বয়ং ডক্টর মুহম্মদ শহীদুল্লাহও বানান সংস্কারের পক্ষে ছিলেন।[৮] তিনিও ভাবেননি যে বাঙলা ভাষা কেবল পূর্ববঙ্গের বা পূর্ব পাকিস্তানের ভাষা নয়, পশ্চিমবঙ্গ, উড়িষ্যা, বিহার ও আসামব্যাপী কয়েক কোটি বাঙলাভাষীরও রিকথ এবং সম্পদ। এমনি আঞ্চলিক, খণ্ড ও বিচ্ছিন্ন চিন্তা-চেতনার প্রভাবে এক সময় বুলিগত সামান্য পার্থক্যকে গুরুত্ব দিয়ে চৌদ্দ শতক থেকে উড়িষ্যা, সতেরো শতক থেকে আসামী ভাষা, বাঙলাভাষা থেকে পৃথক হয়ে যায়। তা কিন্তু এ বিরাট এলাকার জনগণের ভাব ভাষা সমাজ সংস্কৃতির ও আর্থ-রাজনৈতিক স্বার্থের ক্ষতিই করেছে,— অভিন্নতার ও ঐক্যের প্রসাদ থেকে ওই তিন অঞ্চলের লোক জীবন-জীবিকার, মনন-চিন্তনের, সংহত শক্তির ও সামর্থ্যের সম্ভাব্য বৃহত্তর ক্ষেত্রে বঞ্চিতই হয়েছে। রাজনীতিকদের খপ্পরে পড়ে বানান সংস্কারের হুজুগে কয়েক বছর ধরে প্রায় সব নবীন প্রবীণ পণ্ডিত এবং সৌখিন সংস্কারক বিভ্রান্ত ছিলেন, তাই নিরপেক্ষ মনে তাঁদের কেউ সমূহ ক্ষতির সম্ভাবনা চিন্তাও করতে পারেননি, চোখে আঙুল দিয়ে তাঁদের পরামর্শের ও প্রয়াসের অসারতা দেখাতে, নইলে সেদিনেও উচ্চকণ্ঠে বলা যেত : হরফের আধিক্যই বা জটিলতাই গণশিক্ষার ও সাক্ষরতার প্রসারের পথে বাধা নয়। য়ুরোপীয় কোন ভাষাতেই শব্দের বানান ও উচ্চারণ অভিন্ন নয়। তবু য়ুরোপে কি সাক্ষরতা ও গণশিক্ষা দ্রুত বিস্তার লাভ করেনি? হরফ কমালে কি মানুষের মনীষা সৃজন ক্ষমতা বাড়ে? ভাষার বর্ণ শব্দ ও লিখনভঙ্গি বদলালেই কি দেশ অর্থে সম্পদে শিল্পে বাণিজ্যে ঋদ্ধ হয়ে উঠবে?

ভাষা সংস্কার প্রয়াসের বা আন্দোলনের ইতিহাস আলোচনা আমাদের উদ্দেশ্য নয়, এতোকাল পরে যখন সব থিতিয়ে গেছে, সব আবেগ উত্তেজনা ষড়যন্ত্র অভিসন্ধি যখন নিঃশেষ, তখন ১৯৪০ থেকে ১৯৭০ সন অবধি ত্রিশটি বছর ধরে বাঙালী মুসলমান ভাষাবিষয়ে কি অস্বচ্ছ ও অসুস্থ মনের পরিচয় দিয়েছিলেন তা' দেখার বোঝার জন্যই আমাদের ভাষা-সংক্রান্ত মত, মন্তব্য, উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য সম্বন্ধে এ স্মৃতিচারণ। পূর্বলব্ধ [Preconcieved notion] চিন্তা-চেতনা, বিশ্বাস-সংস্কার ও দ্বেষ-দ্বন্দ্ব যে মানুষের জ্ঞানবুদ্ধিকে ও হিতচেতনাকে বিকৃত করে, তারই নিদর্শন এ ভাষা সংস্কার আন্দোলন। সমকালে এমনি সমস্যার উদ্ভব ও ভুল সিদ্ধান্ত অনেক অনর্থ ঘটায়। পাকিস্তান বা পূর্বপাকিস্তান একটা স্বাধীন সার্বভৌম রাষ্ট্ররূপে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল বটে। কিন্তু উর্দু বা বাঙলা কোনটাই কেবল এ রাষ্ট্রের ভাষা ছিল না। রোমান হরফে উর্দু লেখার প্রস্তাব হিন্দু বিদ্বেষজাত আত্মবিনাশী অপবুদ্ধিরই পরিচায়ক। তাই রব উঠেছিল : বর্ণ বদলাও, বানান বদলাও, বদলাও শব্দ, পালটাও বাকধারা, পালটাও ভাষার নাম, দেশের নাম, পালটাও জাতির নাম যাতে বাঙলাদেশের, বাঙালীর ও বাঙলাভাষার নামনিশানাও হয়

অবলুপ্ত। আমরা যে কয়টা ভাষার সঙ্গে প্রত্যক্ষে-পরোক্ষে অল্পবিস্তর পরিচিত, সেগুলোর প্রায় কোন শব্দেরই বানান ও উচ্চারণ একরকম নয়। তার কারণ ল্যাটিন, জার্মান, ফরাসী, ইংরেজি প্রভৃতি ভাষার বর্ণমালা ধ্বনি প্রতীক নয়— সেজন্যই প্রায় অধিকাংশ বর্ণেরই উচ্চারণ এক এক ধরনের এবং প্রায় প্রতি শব্দেই অনুচ্চারিত কিছু বর্ণ শব্দের আদ্যে, মধ্যে ও অন্তে অকারণেই রক্ষিত হয়। শব্দের উচ্চারণ অনুসারে লিখলে talk, tough, thought, can, lieutenant, colonel প্রভৃতি tak, taf, thot, kan, leftenant, kornel হওয়া উচিত। তবু এ সব বানান সংস্কারের কথা আমেরিকানেরাও ভাবে না।

বাঙলাদেশে মুসলমানের মাতৃভাষা বাঙলার মতো শাস্ত্রের ভাষা আরবী জানাও আবশ্যিক। সেক্ষেত্রে বাঙলা-আরবী উভয় ভাষাই তুল্য মূল্যের। কিন্তু ইসলাম ও ইসলামী তমদ্দুন-পসন্দ বুদ্ধিজীবী সংস্কারকেরা বা ইসলামী রাষ্ট্রের শাসক কখনো সরল বানানে কোরআন-হাদিসের পাকিস্তানী সংস্করণ বের করে শিক্ষার্থীর শ্রম ও কষ্ট লাঘব করার কথা ভাবেননি। আরবীর জিম, জে, জোয়াই, জাল দোয়াত, ইংরেজি J. Z. [কখনো কখনো S] আমাদের কানে একইভাবে ধ্বনিত হয়। কিন্তু কেউ একটা রেখে অন্যগুলো বর্জন করার কথা বলে না। এরা বলে আরবী-ইংরেজী তো আমাদের ভাষা নয়, কাজেই আমাদের স্বদেশেও আমাদের প্রয়োজনে তার বর্ণ বানান সংস্কারের অধিকার নেই। এ যুক্তি কিন্তু তারা বাঙলা ভাষার ক্ষেত্রে মানে নি। বাঙলা ভাষা-সাহিত্য কি আমাদের একক সম্পত্তি? আমাদের বিদ্বিষ্ট মনের ও অসুস্থ মানসিকতার পরিচয় বহন করেছে আমাদের ভাষা-সংস্কার আন্দোলন, অন্যদিকে পাকিস্তানী 'শাসকগোষ্ঠীর' এক্ষেত্রে লক্ষ্য ছিল বাঙালী সত্তার বিনাশ বা বিকৃতি সাধন করে ঔপনিবেশিক শাসন-শোষণ দীর্ঘস্থায়ী করা।

অতএব ভাষার বর্ণ, বানান, শব্দ ও বাক্ধারা বদলানোর সব প্রয়াসই ছিল বিকৃত বুদ্ধির অসুস্থ মানসিকতার পরিচায়ক। সরকারি ষড়যন্ত্রমূলক আন্দোলনের সব উদ্যোগ-আয়োজন, ভাব-চিন্তা-কর্ম যথা-সময়ে বৃথা বলে প্রমাণিত হয়েছে, ব্যর্থ হয়েছে সব প্রয়াস। বুঝে না-বুঝে জেনে না-জেনে যাঁরা সংস্কারবাদী ছিলেন, তাঁরাও যে নিশ্চয়ই ষড়যন্ত্রের শিকার হয়েছিলেন তা উপলব্ধি করেছেন পরে।

বাস্তব কোন সমস্যার বা সঙ্কটের কারণ না হয়েও রাজনীতিক চালের অবলম্বন হয়ে কিভাবে একটি স্বীকৃত চিরকালীন বিষয় একটি গুরুতর জাতীয় সমস্যার ও তাৎক্ষণিক আন্দোলনের এবং আশু সমাধানের দাবিদার হয়ে ওঠে তা বাঙলা বর্ণ ও বানান সংস্কার আন্দোলনে আমরা প্রত্যক্ষ করেছি। নইলে পৃথিবীর যাবতীয় ভাষার বর্ণে-বানানে-উচ্চারণে নানা জটিলতা বৈচিত্র্য রয়েইছে। তা নিয়ে অবসর সময়ে সদুদ্দেশ্যে মাথাও ঘামানো যায়, তবে ঐতিহ্যের রিকথের এবং ভিন্ন দেশে ও জাতিতে তার বিস্তৃতির দরুণ সংস্কার করা সম্ভব ও বাঞ্ছিত হয় না। কেননা তাতে বর্ণের ও বানানের এবং হরফের আকৃতি খোল-নলচে সবটাই বিপর্যস্ত হওয়ার সমূহ সম্ভাবনা। যেমন ইংরেজি বর্ণমালার প্রায় প্রতিটি বর্ণই ক্যাপিটাল ও স্মল এবং হস্তলিপিতে তিন অবয়বে বিরাজমান। এবং উচ্চারিত হয় না তেমন বর্ণ ও বর্ণসমষ্টি প্রায় অধিকাংশ শব্দে থাকেই। সবচেয়ে জটিল হচ্ছে একই বর্ণের উচ্চারণ বৈচিত্র্য —'C' কখনো 'চ' কখনো 'ক' ; 'U' কখনো 'আ, কখনো 'উ' ; 'E' কখনো 'ই' কখনো 'এ' ; 'gh'-'ফ', [Rough Tough] ইত্যাদি। আরবী বর্ণমালার একটি বর্ণ শব্দের আদ্যে, মধ্যে ও অন্তে তিনরূপ গ্রহণ করে। মঙ্গোলীয়, চীনা ও জাপানী হরফ এবং য়ুরোপীয়দের রোমান হরফ চিত্রপ্রতীক বর্ণমালার বিবর্তিতরূপ বলে এইসব বর্ণ ব্রাহ্মী তথা বাঙলা বর্ণমালার মতো ধ্বনিপ্রতীক হতে

পারেনি বলেই ওইসব ভাষার বর্ণ-বানানের জটিলতা মোচন করতে হলে চালু বর্ণমালা বর্জন করে নতুন ধ্বনি প্রতীক বর্ণমালা তৈরি করতে হবে।

আবুল হাসনাত প্রমুখ অনেকেই কিছু বর্ণ বর্জনের আন্দোলন সযুক্তি জোরদার করার চেষ্টা করেন। কিন্তু মনে রাখতে হবে, সংস্কৃতজ শব্দের বানানেই কেবল শ, ষ, স, ণ, ন, [ঙ, ঞ, ণ, র, ম] এবং জ, য, ব —ব (ওয়) ক্ষ ব্যবহৃত হয়, কেননা এসব বর্ণ শব্দের উৎপত্তি ব্যুৎপত্তি ও মূল অর্থ-নির্দেশকও বটে, যেমন, 'সা'— পিপাসা-সু/, জিজ্ঞাসা/সু, জিগীষা/ষু, [স-ষ হয়েছে পূর্ব বর্ণে 'ঈ' রয়েছে বলে] উপচিকীর্ষা-এ 'স'-অভিপ্রায়/ইচ্ছা নির্দেশক; তেমনি 'ক্ষা'-ও, যথা বুভুক্ষা/ক্ষু, কাঙ্ক্ষা/ক্ষু, মুমুক্ষা/ক্ষু ইত্যাদি।

যাহোক, আবুল হাশেম, কাজী মোতাহার হোসেন প্রমুখ অনেকেই সেদিন বর্ণ ও বানান সংস্কারের বিরোধী ছিলেন। কোন কোন বর্ণ বর্জনের পক্ষে থাকলেও ডক্টর মুহম্মদ এনামুল হক, মুহম্মদ আবদুল হাই ও মুনীর চৌধুরী শেষাবধি হয়তো হাওয়া চেতনা বশে অথবা সরকারি মতলব উপলব্ধি করেই ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় নিয়োজিত কমিটির সদস্য হিসেবে ক. বাঙলা বানান-সংস্কার ও সরলায়ন খ. বাঙলা-ভাষার ব্যাকরণ সংস্কার ও সরলায়ন এবং গ. বাঙলা বর্ণমালা সংস্কার ও সরলায়ন বাঞ্ছনীয় নয় বলে দৃঢ়তার সঙ্গে ঘোষণা করেন ২৪.২.৬৮ তারিখে। এঁরা এভাবে ভিন্নমত পোষণ করায় সরকারি ষড়যন্ত্র বিশ্ববিদ্যালয়েও তথা শিক্ষাঙ্গনেও ব্যর্থ হয়।

ভিন্নমত পোষণের লিখিত যুক্তিগুলোর শেষে উপসংহারে তাঁরা বলেছেন, "অতএব, আমাদিগকে বাধ্য হইয়াই সামগ্রিক ভাবে প্রস্তাবগুলি হইতে ভিন্নমত পোষণ করিতে হইল। অধিকন্তু আমরা মনে করি যে, বাঙলা লিপি ও বানান সরলায়ন ও সংস্কারের কোন আশু প্রয়োজন নাই। এইরূপ কাজে হাত দিলে নিশ্চিতরূপে ভ্রান্তি বিভ্রান্তিতে পরিণত হইবে এবং পূর্ব পাকিস্তানের বাঙলা ভাষার দ্রুত উন্নয়ন বিশেষভাবে ব্যবহত হইবে।"[১] তাঁদের এ ভিন্নমত প্রকাশের পেছনে হয়তো রাজনীতিক হাওয়াও সাহস যুগিয়েছে; তখন জনগণের বাজারের 'ভাও' বদল হচ্ছিল।

আর ক্বচিৎ কেউ ইসলামী জোশ বশে হরফের মাধ্যমে মুসলিম ঐক্যের অযৌক্তিক ও নির্বোধ বাঞ্ছাচালিত হয়ে আরবী হরফ গ্রহণের কথা বললেও অন্যেরা সরকারি দালাল হিসেবেই আবরী হরফ গ্রহণের সুপারিশ করেছে, তেমনি আন্তর্জাতিকভাবে মোহে দ্রুত লিখন-মুদ্রণ সম্ভব করার যুক্তিতে কেউ কেউ রোমান হরফ গ্রহণের পক্ষে কথা বললেও সাধারণভাবে সরকার-সেবক-মতলববাজেরাই রোমান হরফ চালু করার সুপারিশ করেছিল। পেশায় মুদ্রাক্ষরিক এক সরলপ্রাণ উদ্যোগী পুরুষ 'শওজা বাঙলা' লেখা চালু করার জন্য দরিদ্র হয়েও প্রায় আত্মোৎসর্গ করেছিলেন। তিনি বর্ণশীর্ষের মাত্রাকে বাহুল্য মনে করে শ্রম ও সময় বাঁচানোর লক্ষ্যে মাত্রাবর্জনের পক্ষপাতী ছিলেন।

বর্ণ-বানান-ভাষা সংস্কার আন্দোলন যেহেতু সদিচ্ছা-সদ্বুদ্ধিজাত ছিল না, ছিল না স্বচ্ছ ও সুস্থ মানসিকতার প্রকাশ, কেবল হিন্দু ও হিন্দুয়ানীবিদ্বেষ এবং করাচিওয়ালাদের শাসন-শোষণ কায়েম রাখার অপবুদ্ধিই ছিল এ অপকৌশল গ্রহণের মূলে, সেহেতু এ নিষ্ফল আন্দোলন কয়েক বছর পরেই বৃথা ও ব্যর্থ বলে পরিত্যক্ত হল। আজ বাঙলা বর্ণের, বানানের ও ভাষার অবয়বে ওই আঘাতের আঁচড়মাত্র দেখা যায় না—যদিও ইতিহাসের উপকরণ হিসেবে অত্যুৎসাহীদের রচনার নিদর্শন, অপপ্রয়াসের নমুনা রয়ে গেছে।

তথ্য নির্দেশ

১. সাময়িক পত্রে জীবন ও জনমত : মুস্তাফা ইসলাম, পৃঃ ৩১১ — ৩২৭
২. সাহিত্য ও স্বাধীনতা : সাহিত্যবিশারদ স্মরণে, ১ম সং ১৯৭৪।
৩. সাময়িকপত্রে জীবন ও জনমত, পৃঃ ৪১৮—৪৪, পৃঃ ৮৮।
৪. ৫, ৪, ৪২ সনে অনুষ্ঠিত কোলকাতা মুসলিম ইনস্টিটিউট হলে "মুসলিম রেনেসাঁ সম্মেলন"।
৫. মাসিক মোহাম্মদী, বৈশাখ সংখ্যা, ১৩৫১।
৬. ঐ, কার্তিক সংখ্যা, ১৩৫০ সাল।
৭. ১৯৪৯ সনে পূর্ববঙ্গ সরকারি ভাষা কমিটির ১৯৫৮ সনে প্রকাশিত রিপোর্ট, পৃঃ ১০৩।
৮. ক. বাঙলা একাডেমী পত্রিকা, ৪র্থ বর্ষ, ৩য় সংখ্যা।
৯. এঁদের লিখিত 'ভিন্নমত' মুনীর চৌধুরীর 'বাঙলা গদ্যরীতি' গ্রন্থে ১৯৭-২০২ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

পরিশিষ্ট

রাষ্ট্রভাষার প্রশ্নে পূর্ববাংলার বুদ্ধিজীবীদের মতামত

৩, ৬, ৪৭ তারিখের সরকারি ঘোষণা অনুযায়ী পাকিস্তান প্রতিষ্ঠা সুনিশ্চিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই বাঙালী বুদ্ধিজীবীর মনে যে আকাঙ্ক্ষা ও আশঙ্কা জেগেছিল তা' প্রবন্ধাকারে অভিব্যক্ত হল সে মাসেই।

২২.৬.১৯৪৭/২৯.৬.৪৭ দুই কিস্তিতে দৈনিক ইত্তেহাদে আবদুল হক লিখিত 'বাংলা ভাষা বিষয়ক প্রস্তাব' প্রকাশিত হয়েছিল। [আবদুল হক, ভাষা আন্দোলনের আদিপর্ব, পৃ. ৩৪, ১ম সং ফেব্রুয়ারি ১৯৭৬, মুক্তধারা, ঢাকা] উদ্ধৃতি—

> 'বাঙালীর জাতীয়তাবোধ এখনো পরিপূর্ণভাবে স্ফুরিত হয়নি। তাঁর জাতীয় মর্যাদাবোধ এখনো অত্যন্ত কাঁচা, তাঁর পূর্ণ জাতীয় ব্যক্তিত্ববোধ এখনো অপ্রতিষ্ঠিত। এই কারণেই বাঙালীরা সাধারণতঃ বুঝতে পারেন না যে নিজ বাসভূমেও ইংরেজ তথা অবাঙালীদের সঙ্গে তাদেরই ভাষায় কথা বললে জাতীয়তাবোধের দিক থেকে নিজেকে ছোট করা হয়, নিজের অমর্যাদা করা হয়, নিজের ব্যক্তিত্ব বিসর্জন দেওয়া হয়', [ঐ] পৃ. ৯/৩৪-৩৫]

৩০.৬.১৯৪৭ তারিখের আজাদে সম্পাদকীয় পৃষ্ঠায় আবদুল হকের 'পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা' শীর্ষক প্রবন্ধে বলা হয় : [রাষ্ট্রভাষা নির্বাচনের] বিশেষ ভাবে ভেবে দেখতে হবে, ... কোন ভাষায় পাকিস্তানের সবচেয়ে বেশি সংখ্যক লোক কথা বলে, পাকিস্তানে সব থেকে শ্রেষ্ঠ ভাষা কোনটি, কোন ভাষায় সব থেকে শ্রেষ্ঠ সাহিত্য সৃষ্টি হয়েছে এবং কোন ভাষা ভাবপ্রকাশের পক্ষে সব থেকে বেশি উপযোগী। ... যে দিক থেকেই বিবেচনা করা যাক না কেন, পাকিস্তানে রাষ্ট্রভাষা হিসেবে বাংলা ভাষার দাবীই সবচেয়ে বেশি। [ঐ, পৃ. ১২/৩৫] ... পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা হবার যোগ্য একমাত্র বাংলা ভাষাই। [ঐ,পৃ. ১৪/৩৫] এবং উর্দু রাষ্ট্রভাষা হলে পূর্ব পাকিস্তানের পাঁচ কোটি লোক সরকারী চাকুরীর অনুপযুক্ত হয়ে পড়বে। [ঐ, পৃ. ১৫/৩৬] এবং আমাদের সাহিত্যিক এবং সাংস্কৃতিক উন্নতি শুধু ব্যাহত হবে না, রুদ্ধ হয়ে যাবে। [ঐ, পৃ. ১৬/৩৬] ... অন্যান্য স্বাধীনতার সঙ্গে সঙ্গে আমাদের ভাষাগত স্বাধীনতাও পাওয়া দরকার। [ঐ, পৃ. ১৭/৩৭]।

আবদুল হকের আরেকটি মন্তব্য :

> ভাষা সাহিত্য ও সংস্কৃতি ভাবনার ভিত্তিতে একটা বিশেষ মানবগোষ্ঠী হিসাবে স্বাতন্ত্র্যবোধ, নিয়তিচেতনা, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক স্বার্থবোধ ... জাতীয়তাবাদের এইসব লক্ষণ রাষ্ট্রভাষা আন্দোলনের অন্তর্গত ছিল। অবশ্য এই জাতীয়তাবাদ খুব স্পষ্ট ছিল না এবং স্বতন্ত্র রাষ্ট্রকামনাও এর অন্তর্গত ছিল না। কিন্তু ভাষা, সাহিত্য ও সংস্কৃতির প্রশ্নে এই অনুভব

বাঙালী শিক্ষিত মুসলিম সমাজে খুব দ্রুত ব্যাপ্ত হয়েছিল, এবং এটাই ছিল রাষ্ট্রভাষা আন্দোলনের জনপ্রিয়তার কারণ। ... রাষ্ট্রভাষা আন্দোলনই ছিল বাঙালী জাতীয়তাবাদের প্রথম সরব প্রকাশ। পুরনো সম্প্রদায় ভিত্তিক অনুভব থেকে এর উদ্ভব হলেও, এই অনুভবের মধ্য দিয়ে ক্রমে ক্রমে বাঙালী মুসলমানদের অসাম্প্রদায়িক বাঙালী জাতীয়তাবাদে উত্তরণ সম্ভব হয়েছে।

[ঐ, পৃ ৫৪-৫৫]

২৬.৬.১৯৪৭ তারিখে সাপ্তাহিক মিল্লাতের সম্পাদকীয় : পূর্ব পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা যে বাংলা ভাষাই হইবে, ইহা বলাই বাহুল্য। [ঐ, পৃ ৩৮| ... মাতৃভাষার পরিবর্তে অন্য কোন ভাষাকে রাষ্ট্রভাষা রূপে বরণ করার চাইতে বড় দাসত্ব আর কিছু থাকিতে পারে না। [ঐ, পৃ ৩৯]।

২০.৭.১৯৪৭ তারিখে দৈনিক ইত্তেহাদে মাহবুব জামাল জাহেদী 'রাষ্ট্রভাষা বিষয়ক প্রস্তাব' শীর্ষক প্রবন্ধে পূর্ব পাকিস্তানের বাঙলা এবং পশ্চিম পাকিস্তান উর্দু রাষ্ট্রভাষা রূপে গ্রহণের আপসমূলক পরামর্শ দেন।

১৩৫৪ সালের আশ্বিন [সেপ্টেম্বর-অক্টোবর] সংখ্যা সওগাতে কবি ফররুখ আহমদ 'পাকিস্তান : রাষ্ট্র ভাষা ও সাহিত্য' প্রবন্ধে বলেন :

গণতান্ত্রিক বিচারে যেখানে সমগ্র পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা বাংলা হওয়া উচিত সেখানে পূর্ব পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষাকে পর্যন্ত যাঁরা অন্য একটি প্রাদেশিক ভাষায় রূপান্তরিত করতে চান, তাঁদের উদ্দেশ্য অসৎ [ঐ. পৃ. ৩৯] ... বাংলা ভাষার পরিবর্তে অন্য ভাষাকে পূর্ব পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা হিসাবে গ্রহণ করলে এই দেশে ইসলামী সংস্কৃতিকে হত্যা করা হবে। [ঐ, পৃ. ৪০]।

নারায়ণগঞ্জ থেকে প্রকাশিত ১৩৫৪ সালের কার্তিক (নভেম্বর) সংখ্যা 'কৃষ্টি' পত্রিকায় ডক্টর মুহম্মদ এনামুল হক 'পূর্ব পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষার পরিপ্রেক্ষিতে উর্দু ও বাংলা' নামের প্রবন্ধে বলেছিলেন, 'উর্দুকে পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা রূপে স্বীকার করিয়া লইলে বাংলা ভাষার সমাধি রচনা করিতে হইবে এবং সঙ্গে সঙ্গে পূর্ব পাকিস্তান বাসীরও জাতি হিসাবে গোর দেওয়ার আয়োজন করিতে হইবে।' [ঐ, পৃ. ৪০]। তিনিও পূর্ব পাকিস্তানের জন্য বাংলা এবং পশ্চিম পাকিস্তানের জন্য উর্দুর সুপারিশ করেছিলেন। তাঁর মতে উর্দু রাষ্ট্র ভাষা হলে 'পূর্ব পাকিস্তানের রাষ্ট্রীয় সর্বনাশ ঘটিবে ... উর্দুর সড়ক ধরিয়া আসিবে পূর্ব পাকিস্তানবাসীর মরণ, —রাজনৈতিক, রাষ্ট্রীয়, সাংস্কৃতিক ও অর্থনৈতিক মৃত্যু'। [ঐ, পৃ. ৪০]। (মনীষা মঞ্জুষা, পৃ. ৫/২৪, ১১০/১১৬)। ডক্টর হকের 'বাংলা ভাষায় রাষ্ট্রীয় অধিকার' প্রবন্ধটি একই লক্ষ্যে লিখিত। [ঐ, পৃ. ৮৯-১০৪]।

১৩৫৪ সালের অগ্রহায়ণ সংখ্যা সওগাতে ডক্টর কাজী মোতাহার হোসেনও তাঁর 'রাষ্ট্রভাষা ও পূর্ব পাকিস্তানের ভাষা সমস্যা' নামের প্রবন্ধে বাংলা-উর্দু দুটোকেই রাষ্ট্রভাষা করার পরামর্শ দেন এবং পূর্ব পাকিস্তানে বাংলাকে আর পশ্চিম পাকিস্তানে পশতুকে বা উর্দুকে প্রাদেশিক রাষ্ট্রভাষা করার প্রস্তাব করেন। এবং দৃপ্তকণ্ঠে সতর্ক বাণী উচ্চারণ করেন, 'বর্তমানে যদি গায়ের জোরে উর্দুকে বাঙালী হিন্দু-মুসলমানদের উপর রাষ্ট্রভাষা রূপে চালাবার চেষ্টা হয় ... শীঘ্রই তাহলে পূর্ব-পশ্চিমের সম্বন্ধের অবসান হবার আশঙ্কা আছে।' [আবদুল হক, পৃ. ৪১]

১৩৫৪ সালের পৌষ সংখ্যা (ডিসেম্বর-জানুয়ারি) সওগাতে মোহাম্মদ ওয়াজেদ আলী তাঁর 'শিক্ষার কথা' প্রবন্ধে পূর্ব পাকিস্তানে শিক্ষার বাহন হিসেবে বাংলার দাবি স্বীকার করলেও রাষ্ট্র ভাষা রূপে উর্দুকেই সমর্থন করেন। তাঁর ভাষায় : 'উর্দু নিঃসন্দেহে হবে নিখিল পাকিস্তানে আন্তঃপ্রাদেশিক রাষ্ট্রভাষা এবং কেন্দ্রীয় গভর্নমেন্টের সরকারি ভাষা [আবদুল হক, পৃ. ৪১]। এ মত সওগাতের চৈত্র সংখ্যার সম্পাদকীয় নিবন্ধেও পরিব্যক্ত ও সমর্থিত হয়েছিল। পাকিস্তানী জোশের বশে সওগাত ইংরেজীর স্থলে উর্দুর প্রবর্তনই কামনা ও সমর্থন করেছে —'ইরেজীর স্থলে উর্দুই অদূর ভবিষ্যতে পাকিস্তানের সাধারণ ভাষা [Lingua Franca] হইবে এবং হওয়া উচিত। [আবদুল হক, পৃ. ৪২] । সওগাতের ১৩৫৫ সালের বৈশাখ সংখ্যার সম্পাদকীয় নিবন্ধে মোহাম্মদ আলী জিন্নাহর রাষ্ট্রভাষা বিষয়ে ঘোষণার সমর্থন রয়েছে। [আবদুল হক, পৃ. ৪২]

১৯৪৭ সনের জুলাই মাসে 'গণ আজাদী লীগ' নামের দলটিও দাবি করে — 'বাংলা হইবে পূর্ব পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা।' [আবদুল হক, পৃ. ৪৩/বদরুদ্দীন উমর, পূর্ববাংলার ভাষা আন্দোলন ও তৎকালীন রাজনীতি, পৃ. ৩/ কমরুদ্দীন আহমেদ, Social History of East Pakistan, পৃ. ৯৮-৯৯]। জুলাই মাসের শেষের দিকে ডক্টর জিয়াউদ্দীনের উর্দুকে রাষ্ট্রভাষা করা বিষয়ক বিবৃতির উত্তরে ডক্টর মুহম্মদ শহীদুল্লাহ বাঙলাকে প্রধান এবং উর্দুকে দ্বিতীয় রাষ্ট্র ভাষা করার প্রস্তাব করেন। আরবী ইংরেজীর গুরুত্বও তিনি স্বীকার করেন। এরপরে ১৯৪৭-এর সেপ্টেম্বর মাসে তমদ্দুন মজলিস প্রকাশিত পুস্তিকায় ডক্টর কাজী মোতাহার হোসেনের প্রবন্ধ 'পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা বাংলা না উর্দু' এবং আবুল মনসুর আহমদের 'বাংলা-ভাষাই হইবে আমাদের রাষ্ট্রভাষা' প্রবন্ধটি প্রকাশিত হয়।

সংস্কার সম্পর্কিত প্রস্তাব ও মতামত

[১]

১৯৪৭-এ ভারত ভাগ হওয়ার আগেও বাংলা ভাষার সংস্কার প্রসঙ্গে কোন কোন বুদ্ধিজীবী মতামত ব্যক্ত করেছিলেন। ১৯৪৪ সনে ডক্টর মুহম্মদ এনামুল হক 'বাংলা ভাষার সংস্কার' শীর্ষক একটি পুস্তিকায় বলেছিলেন "বাঙলা-বর্ণমালা সংস্কার দুঃসাধ্য ব্যাপার নয়। বাঙলা সংযুক্ত অক্ষর দোতালা-তেতালা রূপে সুসজ্জিত অক্ষরেরও সংস্কার সম্ভব হইতে পারে। কিন্তু, বাঙলা-বর্ণমালার সংখ্যা কমানো যায় কিনা, তাহাই ভাবিবার বিষয়। কেননা, বর্ণমালা বা সংযুক্ত অক্ষরে দৈহিক আকৃতি-সংস্কার এক ব্যাপার, বর্ণমালার সংখ্যা হ্রাস করিয়া সংস্কার অন্য ব্যাপার। বাঙলা-ভাষার বর্ণমালার আকৃতি-সংস্কার যুগে যুগে হইয়াছে। প্রাচীন হস্তলিখিত বাঙলা পুঁথি দেখিলেই তাহা বুঝিতে পারা যায়। এই সেইদিনও ছাপার কাজের সুবিধার জন্য স্বনামখ্যাত "আনন্দ বাজার পত্রিকা" বাঙলা ছাপার অক্ষরের, বিশেষ করিয়া সংযুক্ত অক্ষরের আকৃতি সংস্কার করিয়াছেন। কিন্তু বাঙলা-বর্ণমালার সংখ্যা কমাইবার চেষ্টা আজ পর্যন্ত হয় নাই। যাহা আজ পর্যন্ত হয় নাই, তাহা যে হইতে পারে না বা কখনও হইবে না, তাহা বলার

মত ধৃষ্টতা আমাদের নাই। তবে, তাহা এখন সম্ভবপর কি না, সে প্রশ্ন মনে দারুণভাবে জাগ্রত হওয়া স্বাভাবিক।

এইখানে, এক ভাষার বর্ণমালাকে অন্যভাষার বর্ণমালায় লেখার অর্থাৎ প্রত্যক্ষয়ীকরণের (transliteration) কথা উঠিতে পারে। যে–ভাষায় মৌলিক বর্ণ বা আসল-হরফ কম সে-ভাষায় অধিক সংখ্যক বর্ণযুক্ত ভাষাকে লিখিয়া দিলে, তথাকথিত বানান ও বর্ণবিভ্রাট কমিয়া যায় বলিয়া কাহারও ধারণা থাকিতে পারে। বোধ হয়, এইরূপ কোন ধারণার বশবর্তী হইয়াই খ্রিস্টীয় শতাব্দীর শেষার্ধে, বাঙলার কতিপয় মুসলমান আরবী হরফে বাঙলা লিখিতে শুরু করিয়াছিলেন। এই জাতীয় কয়েকটি পুঁথি দেখিবার সৌভাগ্য আমাদের হইয়াছে। তাহাতে বাঙলা-ভাষায় লিখন-রীতির যে-দুর্ভোগ ঘটিয়াছে তাহা বলিবার নয়। বাঙলায় ইহা চলিল না। এই সেই দিনও (মাত্র আট-দশ বৎসর আগে) চট্টগ্রাম হইতে মৌলবী জুলফক্কার আলী সাহেব আবার বাঙলা হরফের পরিবর্তে আরবী-হরফে বাঙলা লিখিবার চেষ্টা পান এবং স্বয়ং অর্থ ও সামর্থ্য ব্যয়ে একখানা পত্রিকা বাহির করিয়া আপন খেয়াল পূর্ণ করিবার চেষ্টা করিলেও, কেহ তৎপ্রতি ভ্রুক্ষেপ করে নাই। বিশেষ কোন যুক্তি-তর্কের অবতারণা না করিয়াই বলিতে পারা যায়, এইরূপ ব্যাপার বাঙলায় চলে না। কারণ, কেহই এখন নূতন করিয়া বাঙলায় হিন্দী এবং উর্দুর অপ্রীতিকর বিবাদ সৃষ্টি করিতে রাজী নহে বলিয়াই মনে হয়।

বাঙলাকে আন্তর্জাতিক ভাষার পর্যায়ে উন্নীত করার জন্য, কেহ কেহ বাঙলা-ভাষাকে Romanize বা ইংরেজি হরফে লেখারও পক্ষপাতী। কিন্তু আজ পর্যন্ত এ বিষয়ে কোন মন্তব্য প্রকাশের আবশ্যকতা আছে বলিয়া, আমাদের মনে হয় না। তবে, বাঙলাকে Romanize করিলে বাঙলা-বর্ণমালার সংখ্যা কমিবে না; কেননা বিশিষ্ট চিহ্ন ব্যবহার করার ফলে, বর্ণমালার সংখ্যা তাহাতে যথেষ্ট বাড়িয়া যাইবে।"

[মুহম্মদ এনামুল হক, বাংলা-ভাষার সংস্কার, ১৯৪৪]

[২]

১৯৪৭-এ পাকিস্তান রাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠার পর থেকেই বাঙলা ভাষার সংস্কার নিয়ে নানা রকম কথাবার্তা শুরু হয়, বিশেষত নতুন পাকিস্তান রাষ্ট্রের আদর্শ ও মূল্যবোধের সঙ্গে সঙ্গতি রেখে ভাষা-সংস্কারের গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তার কথা বলা হয়। এই পরিপ্রেক্ষিতে ১৯৪৯ সালে পূর্ববঙ্গ সরকারি ভাষা কমিটি গঠিত হয়। ভাষা কমিটির রিপোর্টে বলা হয়— পূর্ব বঙ্গের বাঙলা ভাষার নাম হবে 'সহজ বাংলা'। এই সহজ বাংলার রূপনীতি কি হবে এবং তা' জনস্বীকৃতি কিভাবে লাভ করবে তার জন্য বিভিন্ন পদক্ষেপ নেওয়ার সুপারিশ করা হয়। রিপোর্টে বাংলা বর্ণমালা, বানানরীতি ও লিপির নিম্নবর্ণিত সংস্কার প্রস্তাব গৃহীত হয় :

(i) (a) Of the present Bengali alphabet only অ, আ, ই, উ, এ, ও — these six vowels be retained and others be omitted as superflous. With these list of six vowels, another new vowel of the shape like অ্যা be added to represent the oblique sound of এ-e as in often found in Bengali words, like, অ্যাকা, অ্যাক, দ্যাখো, ঠ্যাং, ব্যাং, etc., bringing the list of vowels up to a maximum limit of seven, as follows ঃ অ, আ, ই, উ, অ্যা, ও ;

(b) All the 7 (seven) vowels of "Shahaj-Bangala" be allowed to retain the 'Kar'

(Harket) forms with certain modifications as shown below, in order to make them fit in with the modern mechanical devices for writing, printing, typing, ect... and be added to the right side of the consonants they follow :

Full forms	Kar-forms	Remarks	Examples
অ	'O' Zero	Meaning nothing—laking	হ, কহ, কখন
আ	া	Unmodified old form	খা, নাহা, বাগান
ই	ী	Old ী-কার for the new ই-কার	
উ	ু	Unmodified old form, coming to the bottom at the right side of a consonant.	শু, বুট, বহুল
এ	১	Old এ-কার put in reverse position to suit the modern condition.	ক ১, ক১, বল১ন
অ্যা	্যা	It is not য-ফলা and আ-কার, It is a new sign for এ or ১-কার।	অ্যাক, ঠ্যাং, দ্যাখা
ও	া	Second half of old ো-কার	শী, কীন, কঠীর

(ii) Of the present Bengali alphabet only the following 31 (thirty one) consonants be retained and the others be omitted as unnecessary :

ক	খ	গ	ঘ,	প	ফ	ব	ভ,
চ	ছ	জ	ঝ,	ন	ম	শ	ছ,
ট	ঠ	ড	ঢ,	র	ড়	য়	ল,
ত	থ	দ	ধ,	হ	ং	ঁ	

(ii) No consonants be allowed to change or modify or multilate their original shapes in the proposed system of writing, all being used in the independent shapes as shown in the list of consonants in subsection (ii) above.

(iv) In order to make all the consonant appear in their original shapes and forms, all the conjoint letters be disjoined and the contsituent elements be placed side by side with usual signs of "Hash" ("Hashanta" coresponding to Arabic jazam) added to those elements not moved by vowels.

(v) All the "Falas" like ্য, ্র, ´, ণ, ন, ম, ল, to be omitted by an adjutsment of spelling to answer phonetic requirements in the manner shown in the discussion on "Spelling System Simplified." [Vide Appendix A (1)]

(vi) Spelling system of 'Shahaj –Bangla" be made phonetic as far as practicable and the pronouncation of the elite, i,e. "Shishta Uchcharon" be accepted as the standard pronounciation to avoid local variations replete with folk-phonology. [Vide Appendix A (1)

1. That the model chart of "Shahaj-Bangla" as prepared by the "Language Reform Sub-Committee" vide reproduction copy of the chart at Appendix (G) be adopted in full as a guide to all whom it may concern.

উপরিউক্ত প্রস্তাবসমূহের সংক্ষিপ্ত রূপ হলো

(ক) স্বরবর্ণ ৭টি —অ আ ই উ ও এ এ্যা

স্বরবর্ণমালা থেকে বাদ যাবে ঈ ঊ ঋ ৠ ঐ ঔ ৯ ৯ ৯

ব্যঞ্জনবর্ণ — (৩১টি)

ক	খ	গ	ঘ
চ	ছ	জ	ঝ
ট	ঠ	ড	ঢ
ত	থ	দ	ধ
প	ফ	ব	ভ
ন	ম	ছ	শ
র	ড়	য়	ল
হ	ং		

ব্যঞ্জন বর্ণমালা থেকে বাদ যাবে

ঙ ঞ ণ ঢ় য় ব (অন্তস্থ) য, স, ৎ ক্ষ :

আকার-ইকার —(৬টি) া ী ু ে ৗ ্যা

আকার-ইকার বাদ যাব ি ু ে ো ৈ ৌ

সবগুলো আকার-ইকার চিহ্ন ডান পাশে বসাতে হবে।

(খ) বানানের নিয়ম :

অক্ষরগুলো গোটা গোটা থাকবে। যুক্তাক্ষর থাকবে না। যুক্তাক্ষর ভেঙে হস্ চিহ্ন দিয়ে লিখতে হবে। কোন ফলা চিহ্ন থাকবে না। উচ্চারণ ও লিখন যতদূর সম্ভব এক হবে। দৃষ্টান্ত : —এ্যাক, বীশ্‌শ, দুক্‌খ, পদ্‌দা, ব্যালা, শুদ্‌থ, রূপ, বীত্‌ত, উর্‌ধ, বীদ্‌দান, শুর্‌জ, বীগ্‌গ, গল্‌প, মীশ্‌ট, কীন্‌তু, প্‌রান, চন্‌দর, গ্‌লানী, প্‌রায়, রুগ্‌ন, তর্‌ক, ছুর্‌তী।

(গ) রচনার নিয়ম :

আমরা বীশ্‌শাস করী জ১ দুনীয়ার শকল জবান হইত১ আমাদ১র 'শহজ বাংলা' ব১শী বীগ্‌গান শমমত হইব১। খীকা খুকী জুবক জুবতী ব্‌রীদ্‌ধ বরীদ্‌ধা ক১হ কীন শময়১ই বানান ভুল করীব১ না। ছাপা টাইপ১র কাজ ন১হায়াত সহজ হইব১। ছাব১ক ও বর্‌তমান নীয়ম১ শীখ্‌খীত ছাত্‌র ছাত্‌রী ও অন্‌নান্‌ন ল১খক ল১খীকারা মাত্‌র ঘনটা খান১ক এই নমুনা চর্‌চা করীল১ এবং দীন দুই পড়ীত১ ও লীখীত১ অভ্যাশ করীল১ আজীবন বানান ভুল হইত১ র১হাই পাইব১। অবীলম্‌ব১ শকল১ই নতুন নীয়ম১ লীখীত১ ও পড়ীত১ শুরু করুন।

[৩]

বাঙলা বানান ও লিপি সংস্কার করার জন্য বাঙলা একাডেমী বিশেষজ্ঞদের নিয়ে একটি উপসংঘ গঠন করে। উপসংঘের সভাপতি ছিলেন সৈয়দ আলী আহসান; আর সদস্যরা হলেন ডক্টর

মুহম্মদ শহীদুল্লাহ, ডক্টর কাজী মোতাহার হোসেন, আবুল হাসানাত, মুহম্মদ আবদুল হাই, মুহম্মদ ওসমান গনি, মুহম্মদ ফিরদৌস খান, মুনীর চৌধুরী এবং মোফাজ্জল হায়দার চৌধুরী। এঁরা যে সুপারিশ পেশ করেন তা' ১৯৬৩ সালে প্রচারিত হয়। সুপারিশে বাংলা বানান ও লিপি সম্পর্কে যে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় তা' নিম্নরূপ :

১. সংস্কৃত, অসংস্কৃত সর্বত্র ঙ স্থলে ং ব্যবহার করিতে হইবে। যথা, সংগীত, গংগা, ডংকা, রং-এর, বাংগালী, ভাংগন ইত্যাদি। বর্ণমালা হইতে ঙ বাদ যাইবে।

২. ইংরেজি j আরবী ج এবং সংস্কৃত জ য বর্ণের বাঙলা ভাষায় j উচ্চারণবিশিষ্ট ধ্বনির জন্য জ হইবে। ইংরেজি z এবং আরবী ذ ز ظ ض বর্ণের বাঙলা ভাষায় উচ্চারণবিশিষ্ট ধ্বনির জন্য সর্বত্র য হইবে।

৩. ণ এবং ন স্থলে কেবল ন ব্যবহার করিতে হইবে। ণ বর্ণমালা হইতে বাদ যাইবে।

৪. ইংরেজি Sh এবং আরবী ش উচ্চারণবিশিষ্ট ধ্বনির জন্য সর্বত্র শ হইবে। ইংরেজি S এবং আরবী ث ص س উচ্চারণবিশিষ্ট ধ্বনির জন্য সর্বত্র স হইবে। ষ বর্ণমালা হইতে বাদ যাইবে। তবে প্রচলিত বানানের যেখানে যেখানে স আছে সেখানে বিকল্পে স রাখা যাইতে পারে।

৫. ই, ঈ এবং তাদের প্রতীক ি ী স্থলে কেবল ই এবং ি ব্যবহার হইবে। কেবলমাত্র বিদেশী শব্দে প্রতিবর্ণীকরণের ক্ষেত্রে বিকল্পে ঈ এবং ী ব্যবহার হইতে পারে। তবে প্রচলিত বানানে সেখানে ঈ বা ী আছে সেখানে বিকল্পে ঈ রাখা যাইতে পারে।

৬. উ এবং ঊ এবং উহাদের চিহ্ন ু এবং ূ এর মধ্যে শুধুমাত্র উ এবং ু থাকিবে। কেবলমাত্র বিদেশী শব্দের প্রতিবর্ণীকরণের ক্ষেত্রে বিকল্পে ঊ এবং ূ ব্যবহার করা যাইতে পারে। তবে প্রচলিত বানানে যেখানে ঊ এবং ূ আছে, সেখানে বিকল্পে ঊ এবং ূ রাখা যাইতে পারে।

৭. বর্ণমালা হইতে ঋ, ঌ বাদ যাইবে। ঋ এর পরিবর্তে রি হইবে। তবে ৃ কার থাকিতে পারে যেমন, মৃগয়া, কিন্তু পদ মধ্যে র-ফলা হ্রস্ব ইকার দিয়াও লেখা যাইতে পারে।

৮. বর্ণমালা হইতে ঐ, ঔ এবং উহাদের চিহ্ন ৈ এবং ৌ বাদ যাইবে না। তবে বিকল্পে অই এবং ওউ লেখা যাইতে পারে, যেমন শৈবাল—শইবাল।

৯. বর্ণমালা হইতে ঞ বাদ যাইবে। ঞ্চ, ঞ্ছ, ঞ্জ স্থানে ন্‌চ্‌ নছ্‌, ন্‌জ্‌ লিখিতে হইবে, যেমন বান্‌ছা ঝন্‌ঝা ইত্যাদি।

১০. বর্ণমালা হইতে ৎ বাদ যাইবে।

১১. জ্ঞ ক্ষ থাকিবে তবে তাহা গ্যঁ, ক্‌ খ এর প্রতীক রূপে এবং তাহা গ্যঁ, ও ক্ষিয় রূপে পড়িতে হইবে।

১২. গু, রু, শু, হু, হৃ, স্থানে গু, রু, শু, হু, হৃ লিখিতে হইবে।

১৩. বিসর্গ বাদ যাইবে। শব্দ মধ্যবর্তী ঃ এর স্থানে ব্যঞ্জনবর্ণের দ্বিত্ব হইবে যেমন দুখ্‌খ। শব্দান্তের ঃ এর পরিবর্তে হ্‌ হইবে, যেমন আহ্‌ ইত্যাদি।

১৪. ব্যঞ্জনবর্ণের ক্ষেত্রে ্র র'ফলা এবং র্ রেফ থাকিবে।

১৫. প্রচলিত বাঙলা বানানে যেখানে ্য ফলা ব্যঞ্জনবর্ণে দ্বিত্ব বোঝায় কেবলমাত্র সে সব স্থানেই দ্বিত্ব বুঝাইতে হইলে ্য ফলা রক্ষিত হইবে। কিন্তু যে সব স্থানে

উচ্চারণ পরিবর্তিত হয়, যথা—বাহ্য, সে স্থলে ধ্বনি অনুযায়ী য ফলা থাকিবে না, যেমন বাজ্ঝ উজজ্বল।

১৬. যুক্তাক্ষরে কোনও অক্ষরের চেহারা পরিবর্তিত হইবে না যেমন ক্র।

১৭. দ্বিত্বের জন্য বা ফলা থাকিবে না।

১৮. দ্বিত্বের জন্য ম ফলা থাকিবে না।

১৯. ল ফলা থাকিবে না।

২০. অন্য যুক্তবর্ণগুলি হস্ চিহ্ন দ্বারা অথবা গায়ে গায়ে লাগাইয়া প্রত্যেক অক্ষরকে পূর্ণরূপে লিখিতে হইবে।

অনেক সদস্যই অবশ্য পরে এই সব সিদ্ধান্তে অবিচল থাকেননি, বরং ভিন্নমত পোষণ করেছেন। উল্লেখ্য, এঁদের সুপারিশসমূহে ১৯৪৯ সালে গঠিত সরকারী ভাষাকমিটির সুপারিশের অনুসরণ রয়েছে।

[৪]

পূর্ববঙ্গ সরকারী ভাষা কমিটির সুপারিশ প্রকাশিত হওয়ার পর বিশেষজ্ঞমণ্ডলী বাঙলা ভাষার লিপি ও বানান নিয়ে বিভিন্ন সময়ে তাঁদের মতামত ব্যক্ত করেন। মতামত সমূহের অংশ বিশেষ নিম্নে প্রদত্ত হলো।

ক. ডক্টর মুহম্মদ শহীদুল্লাহ

১। বাংলা অক্ষর

.... আমরাও বাংলার উচ্চারণ সকল সময় স্মরণ রাখিয়া বর্ণমালা সংস্কার প্রস্তাব করিব। প্রথমে স্বরবর্ণের কথা আলোচনা করা যাউক। সরকারের নিযুক্ত বাংলাভাষা সংস্কার সমিতি প্রস্তাব করিয়াছেন যে, বাংলা বর্ণমালায় স্বরবর্ণ থাকিবে সাতটি অ আ ই উ ও এ অ্যা। দেখা যাইতেছে ইহাতে প্রচলিত স্বরবর্ণমালা হইতে দীর্ঘ ঈ, দীর্ঘ উ, ঋ, ঌ, ঐ, ঔ বাদ দেওয়া হইয়াছে। ইহা বিচারসংগত হইয়াছে কিনা, আমরা তাহার আলোচনা করিব।

ঋ, ঌ পালি ও প্রাকৃতে নাই। আমরা বাংলায় সংস্কৃত শব্দগুলিতে তাহাদের ব্যবহার করি যথা— ঋণ, তৃণ ইত্যাদি। সংস্কৃতে একটি মাত্র ঌ কারযুক্ত শব্দ আছে — কঌপ্ত; বাংলায় ইহার প্রয়োগ নাই। বাংলার উচ্চারণে এই শব্দগুলি রীণ, ত্রিণ, ক্লিপ্ত। অবশ্য সংস্কৃতে ইহাদের অন্যরূপ যথার্থ উচ্চারণ আছে। যেমন বাংলায় দীর্ঘ ঋ কারযুক্ত শব্দ না থাকায় তাহা বর্ণমালা হইতে পরিত্যক্ত হইয়াছে, সেই কারণে ঌ পরিত্যাজ্য। অধিকন্তু বাংলায় ঋ ঌ এর উচ্চারণ রি লি; এই জন্য তাহাদিগকে বর্ণমালা হইতে বাদ দেওয়া কর্তব্য। পালি ও প্রাকৃতে কতিপয় শব্দে সংস্কৃত ঋ স্থানে রি বানান দেখা যায়। যেমন— সংস্কৃত ঋতে, পালিতে রিতে; সং ঋদ্ধি, প্রা রিদ্ধি; সং ঋণ, প্রা রিণ; সং ঋষি, প্রা রিসি ইসি।

বাংলায় দীর্ঘ ঈ, ঊ উচ্চারণ আছে বটে। কিন্তু বাংলা বানানে ইকার ও ঈকার এবং উকার ও ঊকারের কোনও পার্থক্য নাই। দিন—দীন ইহাদের একই উচ্চারণ; এরূপ কুল—কূল ইহাদের একই উচ্চারণ। আমি অধ্যাপক সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়ের সহিত একমত যে বাংলা বানানে সংস্কৃতের সর্বদা দীর্ঘ আ, ঈ, ঊ, এ, ও, যেরূপ হ্রস্বও হয়, তদ্রূপ সংস্কৃতের সদা হ্রস্ব

অ, ই, দীর্ঘও হয়। আমরা যেমন বর্ণমালায় দীর্ঘ অ, এবং হ্রস্ব আ, এ, ও না দেখাইয়া কেবল অ, আ, এ, ও রাখিয়াছি, সেইরূপ আমরা ই, ঈ, উ ঊ স্থানে কেবল ই, উ রাখিব। আমরা ইহাদিগকে হ্রস্ব ই, হ্রস্ব উ না বলিয়া কেবল বলিব ই উ। ঐ ঔ দ্বিস্বর (diphthong)। তাহাদের বাংলা উচ্চারণ ওই, ওউ। এইরূপ দ্বিস্বর বাংলা ভাষায় উনিশটি যথা —

অএ (হয়), অও (হও), আই (খাই), আউ (লাউ), আএ (হায়), আও (খাও), ইই (দিই), ইউ (জীউ), উই (দুই), এই (খেই), এউ (ঢেউ), এএ (ছেলেয়) এও (সেও), অ্যাএ (দেয়), অ্যাও (ম্যাও), ওই (বই), ওউ (বউ), ওএ (দোয়), ওও (দোও)। ১৭টি দ্বিস্বর বাদ দিয়া শুধু দুইটি দ্বিস্বরের জন্য বর্ণ চিহ্ন রাখা নিষ্প্রয়োজন। এই জন্য বর্ণমালা হইতে ঐ ঔ বাদ দেওয়া যাইতে পারে।

বাংলায় একটি বিশেষ স্বরধনি আছে ইংরেজির man-এর a র তুল্য। দেখা দেখি, —এই দুই শব্দ উচ্চারণ এক নয়। আমরা প্রথমটির জন্য লিখিব দ্যাখ্যা, দ্বিতীয়টির জন্য দেখি। এই উচ্চারণ বাংলার বিশেষত্ব। ইহার জন্য আমরা অ্যা স্বর বর্ণমালার যোগ করিতে বাধ্য। এখন তবে বাংলার স্বর দাঁড়াইল—অ আ ই উ ও এ অ্যা। একারের বিকৃতি বলিয়া আমরা অ্যা বর্ণ এ বর্ণের পর রাখিয়াছি। ব্যয়, ন্যায়, ব্যবহার প্রভৃতি শব্দেও এই অ্যা আছে।

আমরা আকার দিই ব্যঞ্জনের পরে, একার দিই আগে আর ও কার দিই আগে পাছে, —কা কে কো। ইহাতে প্রথম শিক্ষার্থীদের যথেষ্ট গোলযোগ ঘটে। এই জন্য বাংলাভাষা সংস্কার সমিতি সমস্ত আকার, ইকার, প্রভৃতি স্বরবর্ণযোগ ব্যঞ্জনের পরে দিতে প্রস্তাব করিয়াছেন। যথা — ক কা কী কু কৌ ক১ ক্যা। আমরা ক'য় দীর্ঘ ঈকার, ক'য় হ্রস্ব উকার না বলিয়া শুধু বলিব ক'য় ই, ক'য় উ। এখানে দ্রষ্টব্য এই যে, ওকারের জন্য আমরা ছাপার সুবিধার জন্য ঔকারে প্রথম একার চিহ্ন বাদ দিয়া কেবল পরের চিহ্নটি রাখিয়াছি এবং একারের জন্য একটি নূতন চিহ্ন ব্যবহার করিয়াছি। ছাপার সুবিধার জন্য আপাতত উল্টা একার ব্যবহার করা যাইতে পারে। গু, শু, রু, রূ ইত্যাদি স্থলে সোজাসুজি গ্‌ু, শ্‌ু, র্‌ু র্‌ূ হইবে।

সংস্কৃতে দীর্ঘ স্বরের উপর প্লুত স্বর আছে, কিন্তু তাহার জন্য যেমন স্বতন্ত্র বর্ণ নাই। আমরাও সেইরূপ দীর্ঘস্বরের জন্য কোনও স্বতন্ত্র বর্ণ রাখা সাধারণত আবশ্যক মনে করি না। তবে অনুলিখন ইত্যাদিতে আবশ্যক বোধ করিলে International phonetic seript-এর প্রথা অনুযায়ী স্বরচিহ্নের পর কোলন চিহ্ন দ্বারা দীর্ঘত্ব সুচনা করা যাইতে পারে, যথা আরবী দীঃন = ধর্ম। যদি কেহ আপত্তি করেন যে বাংলায় দিন ও দীন, কুল ও কূল ইহাদের এক উচ্চারণ হইলেও পৃথক পৃথক অর্থ আছে, এই জন্য পৃথক বানান রাখা কর্তব্য। তাহার উত্তরে বলা যাইতে পারে যে কাল শব্দ দ্বারা গতকল্য, আগামীকল্য, সময় এবং কৃষ্ণ বর্ণ এই চার অর্থ বুঝায়। তিল শব্দে তিল ফল এবং তিল চিহ্ন বুঝায়, তীর শব্দে শর এবং কিনারা বুঝায়; চাল শব্দে ঘরের চাল, রাঁধিবার চাউল এবং দাবা খেলার চাল বুঝায়। মহিষী শব্দে মহিষের স্ত্রী এবং রাজার স্ত্রী বুঝায়, সংস্কৃতের গো শব্দের ১৮টি, হরি শব্দের ২৪টি এবং সারংগ শব্দের ৩০টি পৃথক অর্থ আছে। কিন্তু এক বানান সত্ত্বেও যখন অর্থবোধের ব্যাঘাত হয় না, তখন কুল, দীন প্রভৃতি বানানে কেন গোলযোগ ঘটিবে? মনে রাখিতে হইবে আমরা শব্দগুলি বাক্যে ব্যবহার করি, পৃথক ব্যবহার করি না। তাহাদের পৃথক ব্যবহার বৈয়াকরণ ও আভিধানিকের কাজ।

এখন ব্যঞ্জনবর্ণের কথা। ব্যঞ্জনবর্ণ হইতে ঙ ঞ ঢ় ণ য ষ স ঃ বাদ দেওয়া যাইতে পারে। হিন্দীতে পঞ্চ পঙ্ক প্রভৃতি স্থানে পংচ পংক প্রভৃতি লেখা প্রচলিত। রাঙা, ভাঙা প্রভৃতি রাংআ, ভাংআ, কিংবা রাঁগা , ভাঁগা ইত্যাদি রূপে লেখা যাইতে পারে। যে কারণে বাংলার বর্গীয় ব ও

অন্তঃস্থ ব এক আকৃতি করা হইয়াছে, ঠিক সেই কারণে জ য স্থানে জ, ণ ন স্থানে ন এবং শ ষ স স্থানে শ লেখা যায়। পালি ও প্রাকৃতে ইহার নজির আছে। কতকগুলি প্রাকৃতে য স্থানে জ হয়, যথা—সংস্কৃত যম, প্রাকৃতে জম, সং যন্ত্র, প্রা জন্ত, সং যাতি, প্রা জাই ইত্যাদি। পৈশাচী প্রাকৃতে ণ স্থানে ন হয় যথা, সংস্কৃতে গণ, পৈশাচী প্রাকৃতে গন, সংস্কৃতে রণ, পৈশাচী প্রাকৃতে রন ইত্যাদি। মাগধীপ্রাকৃতে শ ষ স স্থানে কেবল শ, যথা সং শেষ, মা প্রা শেশ, সং সীতা, মা প্রা শীদা, সং সখী, মা প্রা শহী ইত্যাদি। মাগধী ভিন্ন অন্য প্রাকৃতে ও পালিতে শ ষ স স্থানে কেবল এক স হয়। অশোক লিপি, পালি, প্রাকৃত বা অপভ্রংশ কোথায়ও তিনটি শ ষ স নাই। বিসর্গ (ঃ) অশোক লিপি, পালি, প্রাকৃত বা অপভ্রংশে নাই । সং দুঃখ শব্দ ঐ ভাষাগুলিতে হয় দুক্‌খ্। আমরা বাংলাতে এই রূপই লিখিব। আঃ. বাঃ, প্রভৃতি স্থানে আমরা লিখিব আহ্ আহ্ প্রভৃতি। গূঢ়, গাঢ় আষাঢ় প্রভৃতি শব্দগুলি গুড়হ গাড়হ আশাড়হ রূপে লিখিলে চলিতে পারে। বাঙলা ভাষার ঢ় এর এত কম ব্যবহার যে বাদ দিলে কোনও অসুবিধা হয় না। বেদে ও পানিতে ঢ় প্রায় এই রূপেই লিখিত।

বাংলায় স এর প্রকৃত উচ্চারণ কতক স্থলে পাওয়া যায়; যেমন —আস্তে বল, এখানে স এর প্রকৃত উচ্চারণ ; এইরূপ সালাম, ইসলাম প্রভৃতি শব্দে আছে; কিন্তু আসতে বল, এখানে স এর উচ্চারণ শ। এখন এই প্রকৃত স এর জন্য স বজায় রাখা যাইত; কিন্তু বাঙলায় স এর প্রচলিত উচ্চারণ শ হওয়ায় গোলযোগের সম্ভাবনা থাকে। এরূপ স্থলে মধ্যযুগে মুসলমানী শব্দে ছ লেখা প্রচলিত ছিল এবং এখনও অনেকে লেখেন, যেমন—ইচ্ছা, ছৈএদ, ছোলেমান, মোছলমান ইত্যাদি। কিন্তু এই ছ = স (s) এবং ছ = ছ (আছে, ছয় ইত্যাদি শব্দের) এই দু'য়ের প্রভেদের জন্য প্রথম ছ' এর নীচে বিন্দু দিয়া একটি অক্ষর সৃষ্টির প্রয়োজন। এইরূপ বিদেশী নামের জন্য Z ধ্বনি স্থলে জ এর নীচে বিন্দু দিয়া আর একটি অক্ষরের প্রয়োজন হইবে। হিন্দীতে এইরূপ হইয়া থাকে। আপাতত আমরা ইংরেজী s উচ্চারণের জন্য স এবং Z উচ্চারণের জন্য য ব্যবহার করিতে পারি।

২। বানান

আমরা সংস্কৃতের অনুসরণে বাংলা বানানে বিষম বিভীষিকা সৃষ্টি করিয়াছি। বাংলা অক্ষরের সংস্কার দ্বারা বানানের সংস্কার অনেকটা হইবে; হ্রস্ব দীর্ঘ স্বরের এবং ষত্ব ণত্বের ধাঁধা কাটিয়া যাইবে। এখন বাকি থাকে যুক্তাক্ষরের কথা। পালি ও প্রাকৃতে উচ্চারণ অনুযায়ী বানান করা হয়। বাংলাতে তাহাই হইবে। কতকগুলি উদাহরণ দিতেছি। সং পক্ষী; পা প্রা পক্‌খী; সং ক্ষীর; পা প্রা খীর ; সং লক্ষ্য, পা প্রা লক্‌খ; সং শক্য, মাগধী প্রা শক্‌ক; সং বিল্ব, পা প্রা বিল্ল, সং পক্ক, প্রা পক্‌ক ; সং লক্ষ্মী; পা প্রা লক্‌খী; সং লক্ষণ ; পৈশাচী প্রা লক্‌খন; সং ঈশ্বর, পা প্রা ইস্‌সর ; সং সরস্বতী ; পা সরস্‌সতী। আমরা যদি বাংলাতেও এইরূপ ধ্বনি অনুযায়ী বানান লিখি তাহাতে কাহারও আপত্তি হইতে পারে না।

বাংলা ভাষায় যুক্তাক্ষর অনর্থক জটিলতা সৃষ্টি করে। এই যুক্তাক্ষরের জন্য টাইপ রাইটার, লিনোটাইপ এবং ছাপার কাজে বড় বিঘ্ন হয়। তাহার উপর ত্র, ক্রু, ক্র, ত্র, ক্ষ, হ্ন, ঞ, হু, হ্ম, দ্ধ, দ্ধ ইত্যাদি যুক্তাক্ষরগুলি প্রথম শিক্ষার্থীদের রীতিমতো গোলক ধাঁধা সৃষ্টি করে। বর্তমানে বাংলা ছাপার জন্য চারশ'র অধিক টাইপের দরকার। যুক্তাক্ষরের পরিবর্তে হসন্ত এবং

ধ্বনিসম্মত বানান ব্যবহার করিলে লেখাপড়া ও ছাপার কাজ Roman script অপেক্ষা সহজ হইবে। কতকগুলি উদাহরণ দিই। উর্দ্ধ = উর্ধ, বক্তা = বক্তা, যন্ত্র = জন্ত্র, ব্রাহ্মণ = ব্রামহন, জ্ঞান = গ্যান, বিজ্ঞ = বিগ্গঁ, পদ্ম = পদ্দঁ, শ্মশান = শঁশান, সৈন্য = শইন্ন ইত্যাদি।

৩। ভাষা

এখন ভাষার কথা। সকলেই জানেন ভাষা ভাবপ্রকাশের জন্য, ভাব গোপনের জন্য নয়। এইজন্য শিষ্ট সমাজে যে ভাষা প্রচলিত আছে, তাহাই সাহিত্যের ব্যবহার করা কর্তব্য। অভিধান হইতে অপ্রচলিত শব্দ ব্যবহার করা চলিবে না। প্রয়োজনীয় শব্দ সমাজের যে কোনও স্তর হইতে সংগ্রহ করা চলিবে। পূর্ববঙ্গের সুপ্রচলিত কোনও শব্দকে বাদ দেওয়া হইবে না। যেখানে উপযুক্ত ভাব প্রকাশের জন্য শব্দের অভাব হইবে সংস্কৃত, আরবী, ফারসী বা ইংরেজী হইতে শব্দ চয়ন করা চলিবে, যদি সেগুলি সহজবোধ্য হয়। প্রতিশব্দ গদ্য রচনায় বর্জন করিতে হইবে। ইংরেজীতে hand, food, water, fire প্রভৃতি বহু শব্দের প্রতিশব্দ না থাকিলেও ভাব প্রকাশের কোনও অসুবিধা হয় না, বাংলাতেও হইবে না। Basic English এ যদি ৮৫০টি শব্দের সাহায্যে ভাব প্রকাশ চলে, তবে বাংলায় শব্দ সমষ্টি কমাইলেও ভাব প্রকাশের কোন অসুবিধা হইতে পারে না।

এইরূপ বাংলার অক্ষর বানান ও ভাষার সংস্কার করিয়া আমরা 'সহজ বাংলা'র প্রচলন করিতে চাই। ইহার ফল এই হইবে যে, যেখানে কেবল বর্ণ পরিচয়েই দুই মাস লাগে, সেখানে দুই মাসে নির্ভুলভাবে বাংলা লিখিতে পড়িতে পারা যাইবে। ফলে অল্প আয়াসে ও অল্প সময়ে বাংলাদেশ হইতে নিরক্ষরতা দূর করিয়া প্রত্যেক বাংলাভাষীকে স্বাধীন রাষ্ট্রের জ্ঞানবান নাগরিক রূপে গড়িয়া তোলা সম্ভবপর হবে। আমরা নীচে বিদ্যাসাগর মহাশয়ের কথামালার প্রথম গল্পটি উদ্ধৃত করিয়া সহজ বাঙলায় তাহার রূপ দেখাইব।

সাধু বাংলা

একদা এক শৃগাল দ্রাক্ষাক্ষেত্রে প্রবেশ করিল। দ্রাক্ষাফল অতি মধুর। সুপক্ক ফল সকল দেখিয়া ঐ ফল খাইবার নিমিত্ত শৃগালের লোভ জন্মিল। কিন্তু ফল সকল অতি উচ্চে ঝুলিতেছিল; সুতরাং ঐ ফল পাওয়া শৃগালের পক্ষে সহজ নহে। লোভের বশীভূত হইয়া, ফল পাড়িবার নিমিত্ত শৃগাল যথেষ্ট চেষ্টা করিল; কিন্তু কোনও ক্রমে কৃতকার্য হইতে পারিল না। অবশেষে ফল প্রাপ্তির বিষয়ে, নিতান্ত নিরাশ হইয়া এই বলিতে বলিতে চলিয়া গেল, দ্রাক্ষাফল অতি বিস্বাদ ও অম্লরসে পরিপূর্ণ।

সহজ বাংলা

অ্যাক শময় অ্যাক শীয়াল আঙুর১র খেতে ঢুকীয়া ছীলা। আঙুর ফল খুব মীঠা। পাকা পাকা ফল দ১খীয়া ওই ফল খাইবার জনন শীয়াল১র লীভ হইলী। কীন্তু ফল সকল খুব উঁচুত১ ছীলী; কাজ১ই ওই ফল পাওআ শীয়াল১র পক্খ১ শহজ নয়। লীভ১র বশ১ ফল পাড়ীবার জন্ন শীয়াল অন১ক চ১শটা করীলী; কীন্তু কীনও রকম১ কাজ হাশীল করীত১ পারীলী না। শ১শ কাল১ ফল পাওআ শম্বন্ধ১ নীতান্ত নীরাশ হইয়া এই বলীত১ বলীত১ চলীয়া গ্যালী আঙুর ফল বড়ী বীরশ আর ব১জায় টক।

আমাদের প্রস্তাবিত সংস্কার সিলহেটি নাগরীর সহিত আশ্চর্যজনক রূপে মিলে। বলা বাহুল্য সিলহেটি নাগরী ইংরেজ রাজত্বের পূর্ব হইতেই সিলহেটে সাধারণ মুসলমান সমাজে প্রচলিত আছে। সিলহেটি নাগরীতে স্বরবর্ণ —আ, ই, উ, এ, ঐ, ও। আকার, ইকার প্রভৃতি যোগ ব্যঞ্জনবর্ণের পরে হয়। ইকার দীর্ঘ ঈ কারের মত লেখা হয়। ব্যঞ্জনবর্ণে ঙ, ঞ, ণ, য, অন্তঃস্থ ব, ঢ, স ষ ঃ নাই।

যদি অ আ ই উ প্রভৃতি স্থানে তিব্বতী অক্ষরের ন্যায় অ আ অি অু প্রভৃতি ব্যবার করা যায়, তবে অক্ষর সংখ্যা কমিয়া যায়। এ বিষয়ে বিজ্ঞগণ বিবেচনা করিবেন।

[বাংলা হরফ, বানান ও ভাষা সংস্কার প্রিন্সিপাল আবুল কাসেমের 'আমাদের ভাষার রূপ' (১৯৩৭) গ্রন্থ থেকে গৃহীত।' বাইটিতে যে বানান ছিল তা প্রচলিত রূপে পরিবর্তিত করা হয়েছে।]

...এক্ষণে আমি বানানসংস্কার সম্বন্ধে বাঙলা একাডেমী পত্রিকায় (৪র্থ বর্ষ ৩য় সং) যাহা বলিয়াছি, তাহার অতিরিক্ত কিছু বলিব। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় সংস্কৃত শব্দে কোনও সংস্কৃত ব্যাকরণ বহির্ভূত বানান সংস্কার ইচ্ছা করেন না। আমি যদিও সংস্কৃত শব্দের বানানে হস্তক্ষেপ করিতে অনিচ্ছুক কিন্তু নিম্নলিখিত কয়েক স্থানে বানান পরিবর্তন, আমি আশা করি, আপত্তিজনক হইবে না।

১. জ ও য স্থানে কেবল জ। সংস্কৃতে এই দুয়ের পৃথক আকার ও উচ্চারণ আছে; কিন্তু বাঙলায় আকৃতি পৃথক হইলেও উচ্চারণ এক। শৌরসেনী ও মাহারাষ্ট্রী প্রাকৃতে কেবলমাত্র জ-য়ের ব্যবহার আছে। সংস্কৃত যমল, যশঃ, যামিনী, যুবা, যমুনা, যেন শব্দগুলি উক্ত দুই প্রাকৃতে বর্গীয় জ দিয়ে লেখা হয়। বাঙলার মূল গৌড়ী প্রাকৃতে এইরূপ ছিল অনুমান করা যায়।

২. ণ ও ন স্থলে কেবন ন। মাগধী, শৌরসেনী ও মাহারাষ্ট্রী প্রাকৃতে কেবল ণ এবং পৈশাচী প্রাকৃতে কেবল ন আছে। যখন বাঙলা উচ্চারণে সংস্কৃত শব্দে ণ ও ন এর মধ্যে কোনও ভেদ করা হয় না, তখন অক্ষরে ভেদ করিবার কোনও কারণ নাই। সংস্কৃত কণা, গণনা, ঘৃণ, মণি শব্দগুলি পৈশাচী প্রাকৃতে ন দিয়ে লেখা হয়। যথা : কনা, গননা, ঘুন, মনি। গৌড়ী প্রাকৃতেও এই রূপ ছিল, অনুমান করা যায়। সুতরাং এই সংস্কার ধ্বনি ও প্রাকৃত ব্যাকরণ-সম্মত।

৩. শ, ষ, স স্থানে সর্বত্র শ। অশোক, লিপি, পালি ও প্রাকৃতে য নাই। অশোক লিপি, পালি এবং শৌরসেনী ও মাহারাষ্ট্রী প্রাকৃতে কেবল স; মাগধী প্রাকৃতে কেবল শ আছে। গৌড় অপভ্রংশে এই শ ছিল, অনুমান করা যায়। সশেষ শব্দটি অশোক লিপি প্রভৃতিতে সসেষ এবং মাগধী প্রাকৃতে শশেশ রূপে লিখিত হবে।

৪. ঞ্চ, ঞ্ছ, ঞ্জ, ঞ্ঝ স্থানে ন্চ, ন্ছ, ন্জ, ন্ঝ লিখিলে উচ্চারণ সম্মত হয়। হিন্দীতে এরূপ স্থলে বিকল্পে ং লেখা হয়। বাঙলাতেও তাহা চালান যাইতে পারে।

৫. জ্ঞ, ক্ষ থাকিবে, তবে গ্যঁ . ক্ খ এর প্রতীকরূপে এবং তাহা গ্যঁ ও খিয় রূপে পড়িতে হইবে। পূর্বে ক্ষ-কে খিয় পড়া হইত।

৬. আমি অন্ত্য বিসর্গস্থানে হ্ এবং শব্দ মধ্যে বিসর্গস্থানে পরবর্ণের দ্বিত্ব প্রস্তাব করি। আঃ দুঃখ স্থানে আহ্ দুক্খ হইবে। ইহা ধনিসঙ্গত।

লিপি-সংস্কার সম্বন্ধে আমি আমার পূর্বোল্লিখিত প্রবন্ধে যাহা বলিয়াছি, তাহা পুনর্বিচার করিয়া আমি এখানে শুধু এই প্রস্তাব করি যে যেখানে সাধারণতঃ যুক্তাক্ষর ভাঙিয়া লিখিতে বলা হইয়াছে, সেখানে হসন্ত অক্ষর ক্ষুদ্রতর অক্ষরের জন্য একসেট নূতন অক্ষরের প্রয়োজন হয় এবং ছাপারও অসুবিধা হয়। ত্র ক্র প্রভৃতি সংযুক্ত বর্ণে স্পষ্ট ত্র ক্র প্রভৃতি লিখিতে হইবে।

আমি যে অ আ ই ঈ প্রভৃতি বর্ণস্থানে অ আ অি অী প্রভৃতি ব্যবহারের প্রস্তাব করিয়াছি, আমি পুনরায় তাহার উপর জোর দিই ইহা গ্রহণে কোনই অসুবিধা নাই।

[বাঙলা লিপি ও বানান সংস্কার
বাংলা একাডেমী পত্রিকা
ষষ্ঠ বর্ষ, চতুর্থ সংখ্যা
মাঘ—চৈত্র ১৩৬৯]

খ. ডক্টর কাজী মোতাহার হোসেন

... সুখের বিষয়, হ্যালে ঋ-কার রেফ ইত্যাদি ব্যঞ্জনবর্ণের নিম্নে বা উর্ধ্বে না দিয়ে লাইনো মুদ্রাযন্ত্রে এ-গুলোকে ব্যঞ্জন-বর্ণের পরে দিয়ে কিছুটা ছাপার কাজে সুবিধা করে নেওয়া হয়েছে। এটা ভাল কথা। এভাবে ধীরে ধীরে সইয়ে নিয়ে হরফের আকৃতির ছোটখাট সংস্কার করায় আপত্তি নেই। টাইপরাইটারের বদৌলতে আজকাল ড্ভ, স্থ, দ্ব, ঞ্জ, হ্ন, জ্ঞ ,ঙ্গ ইত্যাদি স্থলে দ্‌ভ, স্‌থ, দ্‌ব, ঞ্‌জ, হ্‌ন্‌, জ্‌ঞ, ঙ্‌গ লেখা আরম্ভ হয়েছে। এইভাবে যান্ত্রিক প্রয়োজনে ব্যবহার করতে করতে এ-সব কতকটা চোখে সওয়া হয়ে যাচ্ছে এবং ক্রম-বিবর্তনের ভিতর দিয়ে ছোট ছোট সংস্কার ক্রিয়া চলতে থাকবে।

[বাঙলা ভাষা সমস্যা
দৈনিক পাকিস্তান ৬ ই শ্রাবণ ১৩৭৪]

গ. মুহম্মদ ফিরদৌস খান

॥ স্বরবর্ণের সংস্কার ॥

আমি নিম্নলিখিত স্বরবর্ণ ও স্বরচিহ্ন রাখার পক্ষপাতী :

অ আ ই ঈ উ ঊ এ ও ... স্বরবর্ণ ৮টি

া ি ী ু ূ ১ ৃ (ঋ-কার) ... স্বরচিহ্ন ৮টি

(১) স্বরচিহ্নের কোন বিকৃতি থাকবে না; যেমন : রু শু, রূ হবে রু, শু, রূ।

(২) ও-কারের জন্য নতুন চিহ্নের প্রস্তাব করা হয়েছে। বর্তমানে ও-কার এমনভাবে লেখা হয় যাতে এটিকে এ-কার এবং আ-কারের সমষ্টি বুঝায়। এ আদৌ সমীচীন নয়। এ জন্যই শিশুদের কাছে ও-কারটি খুবই গোলমেলে ঠেকে।

(৩) ই-কার, এ-কার ও ও-কার চিহ্ন অক্ষরের ডান পাশে বসবে, যেমন— দিন = দীন, দেশ =দ১শ, লোক = লত্তক।

(৪) আবুল হাসনাৎ সাহেব, ডক্টর মুহম্মদ শহীদুল্লাহ, অধ্যাপক আবদুল হাই এবং আরো অনেকে দীর্ঘ স্বরকে অনাবশ্যক মনে করেন ; কারণ, বাংলা ভাষার হ্রস্ব ও দীর্ঘস্বরের

উচ্চারণের পার্থক্য আমরা বিশেষ করিনে। আমার মনে হয়, দীর্ঘস্বর বাদ দিলে বর্ণমালার সমৃদ্ধি ও গ্রহণ-ক্ষমতাকে ক্ষুণ্ণ করা হয়। বিশেষ করে অন্য ভাষা থেকে আহৃত বহু শব্দ ধ্বনিত করার ব্যাপারে অসুবিধে দেখা দেবে। এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে যে, জগতের নানা রাষ্ট্রের স্বার্থ এখন ওতপ্রোতভাবে নিবিড় সম্পর্ক গড়ে তুলতে হবে; ফলে বিদেশী ভাষার বহু শব্দ বাঙলায় অনুপ্রবেশ করবে ও তাকে সমৃদ্ধ করে তুলবে।

(৫) ঋ-কার (ৃ) রেখে ঋ বাদ দেওয়া হয়েছে; কারণ ঋ-সম্বলিত শব্দ মাত্র ১৩টি, কিন্তু ঋ-কারযুক্ত শব্দের সংখ্যা হচ্ছে ৪৩৮। উচ্চারণের দিক থেকে 'ঋ' এর কাজ 'রি' দিয়ে চালনো যায়।

(৬) ঐ এবং ঔ বাদ দেওয়া হয়েছে। এসব দ্বি-স্বরের জন্য পৃথক অক্ষর নিস্প্রয়োজন; অই, অউ দিয়ে কাজ চালানো সম্ভব। অনেক স্থলে অই, অউ-র ব্যবহারও চালু হয়ে গেছে; যেমন — কই, দই ; বউ, মউ।

ডক্টর মুহম্মদ শহীদুল্লাহ স্বরবর্ণে নতুন অক্ষর 'অ্যা' গ্রহণের পক্ষপাতী। বাঙলায় অবশ্য 'অ্যা' ধ্বনি বর্তমান। তাঁর মতে লেখা ধ্বনিমূলক হবে; 'এক' লিখতে হবে 'অ্যাক' কিন্তু একটি লিখতে হবে 'একটি'। 'এক' এবং একটি একই মূল থেকে উদ্ভূত। ও ভাবে লেখার ফলে উভয়কে বিভিন্ন শব্দ বলে মনে হবে এবং তাদের মূলগত বন্ধন ছিন্ন হয়ে যাবে। এ নিয়ম অনর্থক বিভ্রাটের সৃষ্টি করবে। এখানে আরো একটি কথা বলা প্রয়োজন মনে করছি। কোন ভাষারই বর্ণমালাকে পুরোপুরি ধ্বনিমূলক করা যায় না; কারণ (ক) দৈনন্দিন ব্যবহার ক্ষেত্রে আমরা যে সব ধ্বনি উচ্চারণ করি তার সবগুলোকে হুবহু বোঝাতে গেলে বহু শত বর্ণ সৃষ্টির প্রয়োজন। আমাদের বর্ণমালা প্রধান প্রধান ধ্বনিগুলোই শুধু ধরে রাখার চেষ্টা করে; (খ) যে কোন দেশের উচ্চারণে তারতম্য না এসে পাবে না। সারা দেশব্যাপী উচ্চারণের সমতা" বজায় রাখা অসম্ভব। কাজেই লিখবার বেলায় যথাযথ ধ্বনিমূলক হতে গেলে একই শব্দের বানান নানাভাবে লিখতে হয়। ফলে ভাষার শিক্ষা অযথা কঠিন হয়ে পড়বে। আমার মনে হয়, বানান ঠিক রেখে উচ্চারণের একটু তারতম্য বরদাস্ত করাই ভাল।

অক্ষর সংখ্যর দিক থেকে স্বরবর্ণগুলো অ-মাতৃক করতে পারলে (যেমন অ, আ, অী, অু, অৃ ইত্যাদি) আরো সুবিধে হতো (৪টা মার্চ, ১৯৪৯, ঢাকা তমদ্দুন মজলিসের সাহিত্য-সভায় পঠিত ডক্টর শহীদুল্লাহর 'সোজা বাঙলা' শীর্ষক প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য), কিন্তু তাতে বহু সংখ্যক শব্দের চলতি রূপ বদলে যাবে।

বেশ কিছুদিন পূর্বে "বিশ্বভারতী" পত্রিকায় প্রকাশিত একটি প্রবন্ধে v-চিহ্নকে অ-কার হিসেবে গ্রহণ করার সুপারিশ করা হয়েছিল। অধ্যক্ষ ওসমান গনি অ-কার গ্রহণের এই প্রস্তাব বিশেষভাবে সমর্থন করেন। তাঁর মতে :

"বাঙলা ভাষায় যুক্তাক্ষর আমদানীর একটি মাত্র কারণ হোল অ-কার চিহ্নের অভাব। ... যদি বাঙলা ভাষায় একটি মাত্র অ-কার গ্রহণ করা হোত তাহলে আমাদের বাঙলা শিক্ষার পথ বহুল পরিমাণে সহজ ও সরল হয়ে পড়তো।"

আমি বলি, অ-কারহীনতা বাঙলার দোষ নয়, বরং গুণ। যুক্তাক্ষরের কথা আগেই বলেছি। তাঁর প্রস্তাবিত এই সংস্কার বাঙলা হরফের মূল কাঠামোকেই বদলে দেবে এবং বাঙলা ভাষার শতকরা ৯৯টি শব্দের চলতি রূপকে আঘাত করবে। আমাদের ব্যঞ্জনবর্ণগুলোর মস্তবড় একটা

সুবিধে—তাদের অ-কারান্ত উচ্চারণ—সম্পূর্ণ লোপ পাবে। তাঁর মতে 'মতন' লিখতে হবে "মvতvন" "বিকশিত" হবে "বইকvসতইv" ইত্যাদি। মনে হচ্ছে, রোমান হরফকেই তিনি তাঁর আদর্শ হিসেবে নিয়েছেন। বর্তমান অবস্থায় অ-কার গ্রহণ শুধু যে অযৌক্তিক হবে, তা নয়, এতে অযথা বিভ্রম, অসুবিধে ও জটিলতার সৃষ্টি হবে।

॥ ব্যঞ্জনবর্ণের সংস্কার ॥

আমি ব্যঞ্জনবর্ণের ৩৫টি অক্ষর রাখার পক্ষপাতী (একটি নতুন সঙ্কেতসহ)। সেগুলো হচ্ছে :

ক খ গ ঘ	চ ছ জ ঝ	ট ঠ ড ঢ
ত থ দ ধ	প ফ ব ভ	র ল ড় ঢ়
য় হ স শ	ম ন ঙ ˆ	ক্ষ জ্ঞ

(১) এতে বাদ দেওয়া হয়েছে ঞ, ণ, য, ষ, ৎ, ং, ঃ

ঞ, ণ, ষ, ৎ, ঃ সম্বলিত শব্দ-সংখ্যা খুব কম। উচ্চারণের দিক থেকে 'ণ' এবং 'ন'য়ের 'য' এবং 'জ'য়ের 'ৎ' এবং 'ত'য়ের পার্থক্য আমরা আদৌ করিনে। 'ন' দিয়ে 'ঞ'র কাজ চালানো যায় (ঞ সম্বলিত শব্দের সংখ্যা ১৮৯); যেমন বঞ্চনা = বন্‌চনা, চঞ্চু = চন্‌চু ইত্যাদি। 'ঃ'-এর কাজ চালাবার জন্য প্রয়োজন মত 'হ' বা দ্বিত্ব ব্যবহার করা যেতে পারে।

'য'য়ের ব্যবহার বাঙলায় খুব অপ্রচুর নয়। প্রায় তিন-চার শ' শব্দে য ব্যবহৃত হয়। এর পরিবর্তে 'জ'-য়ের ব্যবহার অনেক ক্ষেত্রে দৃষ্টিকটু ঠেকলেও আমি 'য' উঠিয়ে দেবার পক্ষে। দুই জয়ের মধ্যে উচ্চারণগত পার্থক্য আমরা মোটেই করিনে। ইংরেজি Z ধ্বনি (কিম্বা আরবী; ধ্বনি) জ্ঞাপক একটি হরফ বাঙলায় দরকার বলে অনেকে মনে করেন। এই ধ্বনি প্রকাশের জন্য 'য'-এর ব্যবহার (কিম্বা ইংরেজি Z অক্ষরের ব্যবহার : রাজশেখর বসু তাঁর "গড্ডালিকা" শীর্ষক পুস্তকের এক জায়গায় অনুরূপ ধ্বনি প্রকাশের জন্য Z চিহ্ন ব্যবহার করেছেন) বোধ হয় বিবেচনা করা যেতে পারে।

'ঙ' রেখে অনুস্বারকে সহজেই বাদ যায় এবং চলতি বহু শব্দে 'ঙ' অনুস্বারকে সরিয়েও দিয়েছে ; যেমন রঙ, আঙটি ইত্যাদি। আবুল হাসনাৎ সাহেব 'ঙ'-বাদ দেবার পক্ষপাতী। আমার মতে 'ঙ' রাখলে বিশেষ একটি সুবিধা আছে। 'ঙ'-য়ের সঙ্গে অ-কার ই-কার ইত্যাদি স্বরচিহ্নের এবং অন্যান্য অক্ষরের সংযোগ সহজেই চলে কিন্তু অনুস্বারের বেলায় ঠিক চলে না।

(২) নতুন চিহ্ন যোগ করা হয়েছে – (খাঁটি অন্তঃস্থ-ব ; উচ্চারণ আরবী কিম্বা ইংরাজী 'w'-এর মত)। এর প্রয়োজন বাঙলায় রয়েছে; বহু শব্দে এ ধ্বনি কিছুটা বর্তমান যদিও ব-ফলা দিয়েই এর প্রকাশ চলছে। আমার হিসেবে বিশ্ব, বিল্ব, ত্বরা ইত্যাদি লিখতে হবে বিশ্ব, বিল্ব, ত্বরা কিন্তু বিশ্বের ব-ফলা ঠিক থাকবে : এতে বাঙলা বানান অধিকতর ধ্বনিবিজ্ঞান সম্মত হবে : ব-ফলা ও নতুন চিহ্নের আকার অনেকটা একই রকম হওয়াতে মানিয়ে নেবার দিক থেকে সহজ হবে।

(৩) 'ক্ষ' ও 'জ্ঞ'-কে 'ক'-মূর্ধণ্য-ষ ক্ষ" ও 'বর্গীয়-জ –ঞ ঞ্চ" না বলে পৃথক অক্ষর হিসেবে গণ্য করা হয়েছে। বাঙলায় বহু প্রচলিত প্রায় ১০০টি শব্দে 'ক্ষ' এবং ৫৫টি শব্দে 'জ্ঞ'র ব্যবহার রয়েছে।

(৪) আবুল হাসনাৎ সাহেব 'স' উঠিয়ে দেবার পক্ষপাতী। আমার মনে হয়, 'স' বাদ দেওয়া আপাততঃ ঠিক হবে না ; কারণ প্রথমতঃ, স-নিয়ে বহু শব্দ (প্রায় দু-হাজার) বাঙলায় বর্তমান; দ্বিতীয়তঃ, 'স'-য়ের আদত উচ্চারণও বহুক্ষেত্রে দৃষ্ট হয়, বিশেষ করে স-সম্বলিত

যুক্তাক্ষরে, যেমন মস্তক, বিস্তার, স্তন, স্মৃতি ইত্যাদি। 'স' রাখার আরো একটি সুবিধে এই হবে যে, একে বিদেশী শব্দের বেলায় ধ্বনিজ্ঞাপক বর্ণ হিসেবে ব্যবহার করা চলবে।

(৫) আবুল হাসনাৎ সাহেব আনুনাসিক বাদ দেবার পক্ষে রায় দিয়েছেন। তিনি লিখেছেন (বাঙলা ভাষার সংস্কার —৮০ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য) :

"বহু ভাষায় সানুনাসিক স্বরধ্বনি নাই; ইংরাজী ইহাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য। ... সম্ভ্রমাত্মক ব্যবহারে আর এক মুশকিল হইয়াছে। ইংরেজীতে পাপাচারী, দুর্বৃত্ত হইতে যীশুখ্রীস্ট, সম্রাট, প্রধানমন্ত্রী পর্যন্ত সকলের জন্যে He or They কথা ব্যবহৃত হয় আরবী-ফারসীতেও পয়গম্বর ও শয়তান উভয়ের জন্য 'বলে, করে, যায়' ইত্যাদি বলা হয়। অথচ তিনি, তাঁহারা, যাঁহারা, কাঁহারা ইত্যাদির প্রচলনে আমাদের অনাবশ্যক শ্রম স্বীকার করিতে হইতেছে।"

অন্য ভাষায় অনুনাসিক ঁ স্বর নেই, বাঙলায় আছে; অন্য ভাষায় সম্ভ্রমাত্মকভাবে সর্বনাম ব্যবহারের উপায় নেই, বাঙলায় আছে; ইহা অন্য ভাষার দরিদ্রতা এবং বাঙলার বাহাদুরি। আমি বলবো, অন্ততঃ এই ব্যাপারে ঁ –সম্বলিত বাঙলা বর্ণমালা অনুরূপ স্বরবিহনী অন্য ভাষায় বর্ণমালার চেয়ে উৎকৃষ্ট। ঁ-কে বাদ দিয়ে বাঙলা হরফের প্রকাশ-ক্ষমতা এবং ধারণ-ক্ষমতা খর্ব করা কিছুতেই ন্যায়সঙ্গত হবে না।

॥ যুক্তাক্ষরের সংস্কার ॥

আগেই বলেছি, বাঙলা ভাষায় মোট যুক্তাক্ষরের সংখ্যা ১৮৬; কিন্তু বিভিন্ন রূপ হচ্ছে (বিকৃত রূপগুলোসহ, কিন্তু ঋ-কার বাদ দিয়ে) ৪৬টি ; যথা ঃ

ক্ক ঙ্খ গ্ন ঙ্গ ঙ্ঘ ঙ্ক চ্চ ঞ্চ চ্ছ জ্জ
ঞ্জ জ্ঞ স্ট ট্র ষ্ঠ ড্ড ণ্ড ন্ন হ্ন ষ্ণ
ন্ত ক্ত ত্ত হ্ম [illegible] ন্দ দ্ধ ম্ল স্ফ হ্ন
ন্ব ধ্ব হ্ব স্ত ত্থ ক্ষ ক্য গ্র ক্র ত্র
ভ্র প্ল হ্ল ক্স ষ্ক ক্ষ

এই ৪৬টি রূপের সঙ্গে পরিচয় হয়ে গেলে বাঙলার সব যুক্তাক্ষর চেনা মোটামুটি হয়ে যায়, কারণ অন্যগুলো সম্পর্কে আর নতুন কিছু জানার থাকে না। যেমন 'গ্র' শিখলেই র-ফলার ব্যবহারও শেখা হয়ে যায়, ফলে প্র, খ্র, দ্র, জ্র ইত্যাদিকে (যেখানে র-ফলা কিম্বা সংশ্লিষ্ট বর্ণের কোন বিকৃতি ঘটে না) সম্পূর্ণ নতুন যুক্তাক্ষর হিসেবে গণ্য করার প্রয়োজন হয় না, কিন্তু ক্র ত্র ভ্র কে, যেখানে সংশ্লিষ্ট অক্ষরের বিকৃতি ঘটেছে—নতুন যুক্তাক্ষর হিসেবেই ধরতে হবে।

সংশ্লিষ্ট ব্যঞ্জনবর্ণ ও ফলা-র চেহারা সবখানে একইভাবে বজায় রাখলে বিকৃত রূপগুলো বাদ পড়ে যায়। এতে যুক্তাক্ষরের বিভিন্ন রূপের সংখ্যা এসে দাঁড়ায় নিম্নোক্ত সাতাশটিতে :

ক্ক ঙ্খ গ্ন ঙ্ঘ চ্চ চ্ছ জ্জ ঞ্জ জ্ঞ স্ট ষ্ঠ
ড্ড ন্ন ন্ত হ্ম ন্দ দ্ধ ম্ল স্ফ ম্ব স্ত ত্থ
ক্য গ্র প্ল ক্স ষ্ক

... ...

আমার প্রস্তাবিত সংস্কারে যুক্তাক্ষর মেনে নিয়েও বাঙলার কার্যকর টাইপরাইটিং সম্ভব। নীচের হিসেব থেকে বুঝা যাবে মোট ৯২টি সংকেত চিহ্নের ব্যবস্থা করলেই চলবে।

স্বরবর্ণ ... ৭টি (আ বাদ দিয়ে; কিন্তু ড়, ঢ় বাদ দিয়ে;
ড, ঢ-য়ের নীচে বিন্দু বসিয়ে ড়, ঢ় পাওয়া যাবে)।

স্বরচিহ্ন ... ৮টি (ঋ কার সহ)।
ব্যঞ্জনবর্ণ ... ৩৩টি (জ্ঞ, ক্ষ সহ, কিন্তু ড়, ঢ় বাদ দিয়ে;
ড, ঢ-য়ের নীচে বিন্দু বসিয়ে ড়, ঢ় পাওয়া যাবে)।
রেফ, র-ফলা, য়-ফলা .... ৩টি
মাত্রাহীন ছোট অক্ষর ...... ১৬টি
সংখ্যা .... ১০টি
অন্যান্য সঙ্কেত .... ১৫টি
মোট ৯২টি

সুতরাং দেখা যাচ্ছে মাত্র ৪৬টি Key বা ঘর থাকলেই চলবে। ইংরেজি টাইপ-মেশিনে ঘর-সংখ্যা ৪২।

[হরফ সমস্যা,
বাংলা একাডেমী পত্রিকা
১ম বর্ষ, ৩য় সংখ্যা, ১৩৬৪]

ঘ. মুহম্মদ আবদুল হাই

... বর্তমান কালের চলিত বাঙলার ধ্বনি ও হরফ এযাবৎ যেভাবে বিশ্লেষণ করে এসেছি সেভাবে বানান-সংস্কার করতে চাইলে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক গৃহীত নিয়মাবলীর অতিরিক্ত এ নিয়মগুলো গ্রহণ করা যেতে পারে :

(১) বিদেশী শব্দের ঈ এবং উ-র সীমিত উদ্দেশ্যে প্রতি-বর্ণীকরণে ঈ এবং উ র ব্যবহার ছাড়া দেশী বিদেশী, তৎসম ও তদ্ভব যাবতীয় শব্দেই ই-ি র এবং উ- ু -র ব্যবহার। যেমন গাভি, বুদ্ধিজিবি, নিড়, অনুসারি, অনুরূপ ইত্যাদি।

(২) 'এ্যা' ধ্বনির প্রতিলিপি হিসেবে শব্দের প্রথম অক্ষরে বিকল্পে 'এ্যা'-র সীমিত ব্যবহার। শব্দ মধ্যবর্তী 'এ্যা' ধ্বনির রূপায়ণেও া-র সীমিত ব্যবহার। যেমন একা কিন্তু ন্যাকা, দেখা কিন্তু হ্যাট্ ইত্যাদি।

(৩) 'অ' ধ্বনির প্রতীক 'অ' হরফটির দ্বারা ক্ষেত্র-বিশেষে 'অ' 'ও' 'এ' তিনটি ধ্বনিই চিহ্নিত করা হয়।

অ-কারণ, অ-যাত্রা অভাব কিংবা করা, ঘর, কলা, জল, গলানো প্রভৃতি শব্দে অ যেখানে 'অ' ধ্বনিরই প্রতীক কিংবা শব্দের আদ্য অক্ষরে অসংযুক্ত ব্যঞ্জনবর্ণের অন্তর্নিহিত স্বরধ্বনিটি যেখানে অ সেখানকার বর্তমান বানানই থাকবে।

অভিভাবক, অতি, মতি, গরু, সরু, বক্ষ, লক্ষ্য প্রভৃতি শব্দে অ যেখানে ও ধ্বনির প্রতীক হিসেবে ব্যবহৃত হয়েছে সেখানেও বর্তমান বানানই চলতে পারে, কারণ সেখানে ও-ে া না লিখলেও ই, ল, এবং ক্ষ কিংবা য-ফলার পূর্বে স্বরসঙ্গতির নিয়মানুসারে অ-র উচ্চারণ ও-ই করা হবে। অবশ্য আঞ্চলিক উচ্চারণে এগুলোকে অ অতি, গঅতিও পড়া হয় কিন্তু চলিত বাঙলায় বাঙলা ভাষাভাষী প্রত্যেকেই এর স্বাভাবিক উচ্চারণই করে থাকেন।

ধন, মন, জন এবং সাগর, মকর, মাকড়সা প্রভৃতি শব্দে শেষ বা মধ্যাক্ষরের ধ, ম, ন এবং গ, ক প্রভৃতি সংশ্লিষ্ট ব্যঞ্জনবর্ণের অন্তর্নিহিত অ-র উচ্চারণ যেখানে 'ও' সেখানেও প্রচলিত বানানই থাকতে পারে। হস্ত, শব্দ, বাল্য, বিশ্ব, পদ্মা প্রভৃতি শব্দের শেষাক্ষরে সংযুক্ত হরফ সম্বলিত অ যেখানে ওর প্রতীক সেখানেও ে া চিহ্ন না দিয়ে বর্তমান বানানই ব্যবহারযোগ্য।

ছিল, গেল, কত, মত, কর, মার, সারান, ধরান প্রভৃতি শব্দে শেষাক্ষরের সংশিষ্ট অসংযুক্ত ব্যঞ্জনবর্ণে যেখানে অ-র উচ্চারণ 'ও' হয়, শুধু সেখানে ে া ব্যবহার বিধেয়। যেমন ছিলো, গেলো, কতো, মতো, বড়ো, মারো, মারানো, ধরানো ইত্যাদি। এরকম হলে মত, মার, মারান, ধরান প্রভৃতি শব্দের শেষাক্ষর হস্ চিহ্ন ব্যবহার না করলেও পূর্ববর্তী শব্দের তুলনায় তাদের অর্থ-বৈপরীত্য রক্ষা পাবে।

প'ড়ো, ধ'রো, হ'লে, ম'লে, ম'রো প্রভৃতি শব্দের প্রথম অক্ষরের সংশ্লিষ্ট ব্যঞ্জনবর্ণের অ যেখানে অভিশ্রুত ও-র প্রতীক সেখানে অর্থ গ্রহণে অসুবিধা হ'লে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপরোক্ত সপ্তম বিধান অনুযায়ী উর্ধ্ব কমার সীমিত ব্যবহার গ্রহণযোগ্য।

(৪) ঋ এবং ৃ কার থাকতে হবে। তবে বিদেশী শব্দে ৃ-কার না দিয়ে ্র-ফলা দিয়ে লিখতে হবে, যেমন ব্রিটিশ, খ্রীস্টাব্দ ইত্যাদি।

(৫) ব্যঞ্জনবর্ণে যে কোনো রকম স্বরধ্বনি যুক্ত হোক না কেন সংশ্লিষ্ট ব্যঞ্জনবর্ণ কোনো রকমেই তাদের আকৃতি পরিবর্তন করতে পারবে না যেমন শু, ত্র, রু, ব্রু, গু ত্রান ভ্রূকুটি ইত্যাদি।

(৬) অনুস্বার লুপ্ত হবে, সুতরাং সর্বত্রই ঙ দিয়ে লিখতে হবে, যেমন— রঙ্, বাঙ্লা, বঙকিম, বঙ্গ, বাঙাল, আঙুল ইত্যাদি।

(৭) ঞ লুপ্ত হবে, কিন্তু গ্য ধ্বনিবোধক একটি স্বতন্ত্র হরফের প্রতীক হিসেবে জ্ঞ রাখা যেতে পারে। যেমন জ্ঞান, বিজ্ঞ।

(৮) ক্ষমা বক্ষ প্রভৃতি শব্দের জন্যে ক্ষ থাকতে হবে।

(৯) ণ লুপ্ত হবে। সুতরাং কন্টক, কণ্ঠ, কাণ্ড, গণ্ড, প্রভৃতি তৎসম শব্দও কনটক, কনঠ, কানড, গনড, রূপে ন দিয়ে লিখতে হবে।

(১০) ষ লুপ্ত হবে। অপ্রচলিত ধর্মীয় এবং বিদেশী শব্দে s ধ্বনির প্রতীক হিসাবে স-র সীমিত ব্যবহার ছাড়া সর্বত্রই শ ব্যবহার বিধেয়। প্রচলিত বানানের দিক থেকে এ সুপারিশটিই সবচেয়ে বিপ্লবাত্মক; কারণ এতে সে, আসে, আসা, বসে, শত, আশা প্রভৃতি যাবতীয় শব্দই শ দিয়ে শে, আশে, আশা, (hope এবং come অর্থে) বশে, শত রূপে লিখিত হবে। এবং phoneme তত্ত্ব অনুযায়ী 'শ'ই চলিত বাঙলার একমাত্র পশ্চাৎ দন্তমূলীয় মূল শিস ধ্বনি বলে ত-বর্গীয় ধ্বনির পূর্বে তার দন্ত সহধ্বনি 'স'-রও স্বতন্ত্র কোন ধ্বনি চিহ্ন ব্যবহার না করে এমনকি বাশ্তব্, বশ্তু, আশ্থা, শ্নান প্রভৃতি সংস্কৃত শব্দ এবং শ্টোভ, শ্টক, কাশ্ঠ ইত্যাদি বিদেশী শব্দও শ দিয়ে লিখিত হবে। এ বিধান গৃহীত হলে আরবী-ফারসী --- এবং ইংরেজী S এর জন্য পূর্ব-পাকিস্তানে আর ছ ব্যবহার করতে হবে না। তখন ইছলাম, মুছলমান, কেচ্ছা, ছয়লাপ, তছনছ, ছহি প্রভৃতি শব্দ ছ দিয়ে না লিখে স দিয়ে ইসলাম, মুসলমান, কেস্সা, সয়লাপ, তস্নস, সহি লেখা যেতে পারে।

(১১) আরবী ফারসীর ذ ز এবং ظ ধ্বনি এবং অন্যান্য বিদেশী শব্দের Z ধ্বনির প্রতীক হিসেবে য রেখে তৎসম ও তদ্ভব যাবতীয় শব্দেই জ ব্যবহার করা যেতে পারে। তাতে যায়, যে, যাওয়া ইত্যাদি জায়, জে , জাওয়া লিখতে হবে। অবশ্য জাহাজ, হাজার, জোর, জুলুম, জেব্রা প্রভৃতি যে সব আরবী ও অন্যান্য বিদেশী শব্দ বাঙলায় বহুল প্রচলিত এবং জ দিয়েই লিখিত হয়ে আসছে সেখানে য লেখা অবিধেয় হবে।

(১২) তৎসম শব্দে য-ফলা (্য) এবং ব-ফলা যেখানে উচ্চারণে দ্বিত্ববোধক সেখানে তারা অব্যাহত থাকবে, যেমন সভ্য, বাল্য, বাক্য, আশ্বাস, বিদ্বান, সত্বর ইত্যাদি।

(১৩) কিন্তু উদ্যোগ, উদ্বেগ প্রভৃতি শব্দে যেখানে তাদের উচচারণ পৃথক সেখানে উৎযোগ, উদবেগ রূপে পৃথকভাবে লিখতে হবে।

(১৪) শ্বাপদ, শ্বাস, স্বাদ, প্রভৃতি শব্দে যেখানে ব-ফলার কোন উচ্চারণই বাঙলায় নেই সেখানে ব-ফলা ছাড়াই শাপদ, শাশ, স্বাদ, লেখা বিধেয়। স্বত্ব, স্বত্বাধিকারী এবং সত্ত্বেও প্রভৃতি শব্দেও পূর্ব নিয়ম ব্যবহার্য কিন্তু সত্ত্বেও শব্দে ত্ত ব্যবহার না করে ত্ব-ফলা ব্যবহার করলেই হবে, শত্ত্ব, শত্ত্বাধিকারী এবং শত্ত্বেও ইত্যাদি।

(১৫) পুত্র, উজ্জ্বল প্রভৃতি শব্দে ত্র এবং জ্জ্ব না লিখে শুধু ত্র, এবং জ্ব লেখাই বিধেয়।

(১৬) ওপরে আলোচিত বিধানগুলো ছাড়া অন্যান্য নিয়মাবলী হবে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক গৃহীত এবং এ-যাবৎ প্রচলিত আধুনিক বানানের মতো।

ওপরে উদ্ধৃত বিধান অনুযায়ী বাঙলা বানান গৃহীত ও লিখিত হলে তার রূপ কি দাঁড়াবে নীচে তার কিছু নমুনা দেওয়া গেলো :

(১) কিয়ংৎক্ষণ পরেই তরণীর সংযোগ হইল। লক্ষ্মণ সুমন্ত্রকে সেই স্থানে রথ রাখিতে বলিয়া সীতাকে তরণীতে আরোহণ করাইলেন এবং কিয়ৎক্ষণ মধ্যেই তাঁহারে ভাগীরথীর অপর পারে উত্তীর্ণ করিলেন। সীতা তপোবন দেখিবার নিমিত্ত নিতান্ত উৎসুক হইয়া তদভিমুখে প্রস্থান করিবার উপক্রম করিলেন।

[বিদ্যাসাগর]

এ অংশটুকু এভাবে লিখিত হবে—

কিয়তক্ষন পরেই তরনির শঙ্যোগ হইল। লক্ষন শুমন্ত্রকে শেই শ্থানে রথ রাখিতে বলিয়া শিতাকে তরনিতে আরোহন করাইলেন এবং কিয়তক্ষন মধ্যেই তাঁহারে ভাগিরথির অপর পারে উত্তির্ণ করিলেন। শিতা তপোবন দেখিবার নিমিত্ত নিতান্ত উত্শুক হইয়া তদভিমুখে প্রশ্থান করিবার উপক্রম করিলেন।

[বিদ্যাশাগর]

(২) তথাচ সাধুর সংবিৎ ব্রহ্মের সঙ্গে তুলনীয় নয়, তার উপমা ভালেরির স্বাবলম্বী ভুজঙ্গ, যে নিজের পুচ্ছকে উপজীব্য করে অনাদ্যন্ত কাল জ্ঞানতরুর মূলে পাহারা জাগে, এবং তৎসত্ত্বেও সত্য আর সৌন্দর্যের সন্ধানে বেরিয়ে, আমরা যখন সেই শেষনাগকে পেরিয়েই বাস্তবিক অবগতির সামনে আসি, তখন সদাচারের মতো লৌকিক ব্যাপারে আমরা তার বিষদংশন সইব কোন্ লোভে? বস্তুত স্বাতন্ত্র্যবাদে এ প্রশ্নের সদুত্তর পাওয়া না গেলে বাকলির প্রজ্ঞাবাদকে আর দোষ দেওয়া চলে না; এবং তার পরে আমাদের মানতেই হয় যে সত্য কেন, যে-বস্তু সত্যের আধার, তার অস্তিত্ব সুদ্ধ আমাদেরই জ্ঞানসাপেক্ষ।

[সুধীন্দ্রনাথ দত্ত]

প্রস্তাবিত পদ্ধতিতে এ অংশটুকু এভাবে লিখিত হবে —

তথাচ শাধুর শঙবিত ব্রমেহর শঙ্গে তুলনিয় নয়। তার উপমা ভালেরির শাবলম্বি ভুজঙগ, জে নিজের পুচ্ছকে উপজিব্য করে অনাদ্যন্ত কাল জ্ঞানতরুর মুলে পাহারা জাগে; এবঙ তত্শত্ত্বেও শত্য আর শৌন্দর্জের শন্ধানে বেরিয়ে, আমরা জখন শেই শেশ নাগকে পেরিয়ে বাশ্তবিক অবগতির শামনে আশি, তখন শদাচারের মতো লউকিক ব্যাপারে আমরা তার বিশদঙশন শইব কোন্ লোভে? বশতুত শাতন্ত্রবাদে এ প্রশ্নের শদুত্তর পাওয়া না গেলে বাক্লির প্রজ্ঞাবাদকে আর দেশ দেওয়া চলে না; এবং তার পরে আমাদের মানতেই হয় জে শত্য কেন, জে বশ্তু শত্যের আধার তার অশতিত্ব শুদ্ধ আমাদেরই জ্ঞানশাপেক্ষ।

[শুধিন্দ্রনাথ দত্ত]

(৩) কৌতূহল অবসান
কাঁদিতেছে রাখালের গৃহগত প্রাণ
মাসির কোলের লাগি । জল, শুধু জল
দেখে দেখে চিত্ত তার হয়েছে বিকল।
মসৃণ চিক্কন কৃষ্ণ কুটিল নিষ্ঠুর,
লোলুপ লেলিহজিহ্ব সর্পসম ক্রুর
খল জল ছল ভরা, তুলি লক্ষ ফণা
ফুঁসিছে গর্জিছে নিত্য করিছে কামনা
মৃত্তিকার শিশুদের লালায়িত মুখ। [রবীন্দ্রনাথ]

প্রস্তাবিত পদ্ধতিতে লিখিত হলে এ অংশটুকুর রূপ দাঁড়াবে—
কউতূহল অবশান
কাঁদিতেছে রাখালের গৃহগত প্রাণ
মাশির কোলের লাগি। জল, শুধু জল,
দেখে দেখে চিত্ত তার হয়েছে বিকল।
মশৃন চিক্কন কৃশ্ন কুটিল নিশ্ঠুর,
লোলুপ লেলিহজিহ্ব শর্পশম ক্রুর
খল জল ছল ভরা, তুলি লক্ষ ফনা
ফুঁশিছে গর্জিছে নিত্য করিছে কামনা
মৃত্তিকার শিশুদের লালায়িত মুখ।
[রবীন্দ্রনাথ]

আমার ব্যাখ্যাত Phoneme তত্ত্বানুযায়ী পশ্চাৎ দন্তমূলীয় শিসধ্বনি 'শ'-ই মূলধ্বনি এবং 'ষ' ও 'স' তার allophone বা সহধ্বনি। বাঙলা লিপি ও বানান মূলধ্বনি ধর্মানুসারী করার জন্যেই 'শ' এর প্রতিলিপি শ-হরফটি রাখার আমি সুপারিশ করেছি। এ সুপারিশ মতে স্ক, স্খ, স্ত, স্থ, স্ন, স্প, স্পৃ, স্ফ, স্র, সৃ, স্ত্র ধ্বনি সমন্বিত সংযুক্ত হরফগুলোও শ্ ক, শ্ খ, শ্ ত, শ্ থ, শ্ন, শ্ প, শ পৃ, শ্ প্র, শ্ ফ, শ্র, শৃ, শ্ ত্র, ভাবে লিখিত হবার কথা বলেছি। এভাবে লিখলে ধ্বনি প্রকৃতি ক্ষুণ্ণ হবে না কারণ এ সব পরিবেশে বানান যা-ই লিখিনা কেন বাঙালী পশ্চাৎ দন্তমূলীয় মূল শিসধ্বনির পরিবেশভিত্তিক অগ্রদন্তমূলীয় 'স' উচ্চারণ করবে।

[বাঙলা লিপি ও বানান সমস্যা, সাহিত্য পত্রিকা, ৫ম বর্ষ
দ্বিতীয় সংখ্যা (শীত : ১৩৬৮) ঢাকা—১৯৬২]

৬. প্রিন্সিপাল আবুল কাসেম

আমাদের ভাষাকে উন্নত করার জন্য এই পর্যায়ে আমি সুধী-সমাজের বিবেচনার জন্যে কয়েকটি প্রস্তাব পেশ করিতে চাই। এই প্রস্তাবগুলি যে নিখুঁত একথা বলার ধৃষ্টতা আমি পোষণ করি না। এই গুলির দোষ-ত্রুটি থাকা একান্ত স্বাভাবিক। এই দোষ-ত্রুটি সুধী ব্যক্তিরা নির্দেশ করিবেন —এই আশা রাখিয়াই আমি প্রস্তাবগুলি তুলিতেছি।

বর্নমালা ও বানান সঙস্কার

একথা আজ কারো অজানা নাই যে আমাদের বর্নমালায় অনেক অদরকারী বর্ন আছে। সঙস্কৃত বর্নমালাকে প্রায় হুবহু নকল করিতে গিয়া[১] এই অঘটন ঘটিয়াছে। বহু সুধী এবঙ বাঙলা একাডেমীর নিয়োজিত বিশেষজ্ঞ কমিটি এইরুপ বহু বর্নবাদ দিবার সুপারিশ করিয়াছেন। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ও অন্যান্য প্রতিষ্ঠানের নামকরা সাহিত্যিক ও ভাষাবিদ নিয়া এই কমিটি গঠিত হইয়াছিল[২]। ১৯৬৩ সনের মে মাসে এই কমিটির সুপারিশ বিভিন্ন পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। এই প্রবন্ধের শেষভাগে এই সিদ্ধান্তের মোখতছর বিবরণ দেওয়া হইয়াছে। পূর্ব পাকিস্তান সরকার 'পূর্ব-বঙগ' ভাষা কমিটি নিয়োগ করেন ১৯৪৯ সনে[৩]। বিশেষজ্ঞদের এই কমিটির শুপারিশ ১৯৫০ সনের ১৯ শে সেপ্টেম্বরে সরকারের কাছে পেশ করা হয়। ইহাতে বাঙলা ভাষা, বর্নমালা ও বানানকে সহজ করার বিস্তৃত সুপারিশ করা হয়। ডঃ মোহাম্মদ শহীদুল্লা সাহেব এইরূপ শুপারিশগুলি ১৯৬৬ সনের ঈদ সঙখ্যা পূর্বদেশে প্রকাশ করিয়াছেন। আমি মনে করি এই সুচিন্তিত শুপারিশগুলির অনেকটি এখন হইতে কিস্তিতে চালু করা একান্ত দরকার। কিস্তিতে বলিলাম এই জন্য যে ভাষার ব্যাপারে এই দেশের বহু পণ্ডিত অত্যন্ত রক্ষনশীল ভাবাপন্ন হাজারো যুক্তিপুর্ন হইলেও তারা এক সঙগে অতটুকু 'পুরানা জিনিস' বাদ দিতে রাজি হইবেন না। ধীরে ধীরে চালু করিলে অবশ্যই তাদের গা-সওয়া হইয়া যাইবে। পহেলা কিস্তিতে আমরা তাই নীচের বর্ন, চিহ্ন ও বানান বাদ দিবার প্রস্তাব করি।

পহেলা কিস্তি

* ণ, ৎ, ং, ঊ, ৃ, ঢ়, ঋ বাদ দিয়া তার বদলে ন, ত, ঙ, উ, ু, ড়, ও র ব্যবহার।
* সঙখ্যাবাচক ও এইরুপ বিশেষণের ক্রিয়াবিশেষণের বিসর্গ বাদ দেওয়া : যেমন প্রথমত, দিতীয়ত, সম্ভবত, অতপর, পুন পুন ইত্যাদি।
* সর্বনামের ঁ বাদ দেওয়া : যেমন তাঁহার না লিখিয়া তাহার, ইত্যাদি। কিন্তু ন লোপ পাইলে যে ঁ হয় তাহাকে বাদ দেওয়া ঠিক হইবে না। যেমন : চাঁধ বাঁধ ইত্যাদি।*
* ব-ফলাযুক্ত দিত্ত শব্দের ব-ফলা বাদ দেওয়া।
  যেমন : তত্ত্ব, সত্ত্বেও প্রভৃতির বদলে তত্ত, সত্তেও ইত্যাদি।

---

১ সরল ভাষা প্রকাশ বাঙলা ব্যাকরণ, ১৯৬৩ সঙস্করণ—সুনীতি কুমার চট্টোপাধ্যায়, পৃঃ ১০।

২ এই কমিটি গঠিত হইয়াছিল লেখকের চেষ্টাতেই

৩ একুশ দফার রূপায়ন— লেখক।

* তিনি তাঁহার বাড়ি গিয়াছিলেন। এখানে আভিজাত্য ও সম্মান দেখাইবার জন্যে একই বাক্যে তিনি 'তাহার' ও 'গিয়াছিলেন' তিনটি শব্দের রূপ বদলাইতে হইয়াছে। সম্মান দেখাইবার জন্য এই রকম অনর্থক বাড়াবাড়ি মোটেই উচিত নয়। ঁ তুলিয়া দিলেও তিনি ও 'না' দিয়া যথেষ্ট সম্মান ও আভিজাত্য রক্ষা পায়।

এখানে আরও একটি কথা বলা দরকার। ইতর প্রাণী ও বস্তুর বেলায় সঙস্কৃত প্রভাবিত পণ্ডিতেরা প্রভৃতি আর অভিজাত ও সম্মানিত ব্যক্তিদের বেলায় প্রমুখ —এই দুইটি কঠিন শব্দ ব্যবহার করেন। আমার মতে ভাষায় এত জাতি ভেদ ও বর্নাশ্রম প্রথা আধুনিক যুগে বেমানান। আগে বাঙলায় গয়র দিয়া প্রমুখ প্রভৃতির কাজ চালানো হইত। এখন আমরা দলিলপত্রে চালু এই সহজ শব্দটি ব্যবহার করিতে পারি। আর যদি কেউ চান তবে শুধু প্রভৃতি শব্দটি রাখিয়া প্রমুখ শব্দটি উঠাইয়া দেওয়া উচিত। অব্যয় পদেও এইরূপ জাতিভেদ টানা মোটেই সুখকর নয়-এই গন-প্রাধান্যের যুগে।

* ম-ফলা যুক্ত শব্দের অনুচ্চরিত ম-ফলা বাদ যাইবে। যেমন : রশ্মী – রশ্মী, ভস্ম– ভস্ম ইত্যাদি।[১]

মূর্ধন্য ণ এর ধনি এখন বাঙলার নাই। বাঙলায় ইহার উচ্চারণ দন্ত্য ন এর উচ্চারন হইতে অভিন্ন।[২]

ং ছাড়িয়া ঙ রাখায় কেউ আপত্তি করিতে পারেন। কিন্তু আলাদা শুন্য ও রেখা একটানে লিখিতে যেমন অসুবিধা— তেমনি ইহাকে একটি স্বাধীন বর্ন হিসাবে নেওয়াও যায় না। আসলে ইহা স্বাধীন স্বর নয়—'অনুস্বর' মাত্র। যেমন 'রাঙা' শব্দের ঙ কে স্বাধীন বর্ন হিসাবে ব্যবহার করিয়া উহার সঙগে া যোগ করা সহজ হইয়াছে। ৎ এর মতই ং এর সঙগে এইভাবে া , ে, প্রভৃতি চিহ্ন যোগ করিলে শুধু যে বিশ্রী দেখায় তাই নয়—ৎ ও ং দুইটির হসন্ত উচ্চারন বলিয়া এইগুলিতে চিহ্ন দিলে উচ্চারনেও গোল বাধে। তাছাড়া ঙ এর উচ্চারণ উহার নামের মধ্যে আছে। ং এর যে উচ্চারণ বলিয়া এইগুলিতে চিহ্ন দিলে উচ্চারনেও গোল বাধে। তাছাড়া ঙ এর উচ্চারন উহার নামের মধ্যে আছে। ং এর যে উচ্চারণ তার 'অসুবিধা হয়। উ কার বাদ দিতে আপত্তি করা উচিত নয়। কারণ সাধারনত আমরা ু এর উচ্চারন করি না। যা উচ্চারন করি না— তার চিহ্ন রাখা অনাবশ্যক বিলাসিতা বই কি। রূপার উচ্চারনে উ-কার যে হ্রস্ব সুনীতিবাবুও স্বীকার করিয়াছেন। তদরূপ বধূ, তূলা ইত্যাদি।

দোসরা কিস্তি

দোসরা কিস্তিতে আমরা ষ, ক্ষ, ী, কয়েকটি বর্ন ও চিহ্ন বাদ দেওয়ার প্রস্তাব করি, —তারও পরে অন্যান্য বর্ন ও চিহ্ন বিবেচনা করা যাইতে পারিবে।[১]

শ, ষ ও স এর আলাদা উচ্চারন আমরা অনেক খেত্রেই করি না। সুনীতি বাবু তার ব্যাকরনের ২৫ পৃষ্ঠায় বলেন : শ, ষ, ও স এই তিন বর্নের উচ্চারন এখন বাঙলায় এক—ইঙরাজী sh এর মত। আমরা অনেকে পশ্চিমের তথা পশ্চিম বাঙলার অন্ধ ভক্ত, এবঙ সুনীতি বাবুকে একজন বড় অথরিটি বলিয়া মান্য করি। আমাদের মধ্যে যাকে অথরিটি বলিয়া আমরা মানি তিনি হইলেন আমাদের সম্মানিত ডঃ মোঃ শহীদুল্লা সাহেব। তারও মত হইল : তিনটা শ এর একটি রাখা উচিত। তার পষ্ট রায়ের পর তিন তিনটা শ রাখার পক্ষে আমাদের তথাকথিত পণ্ডিতদের কি যুক্ত আছে বুঝিতে পারি না।

শুধমাত্র ণ, ষ, ও ী এই চারটি বর্ন ও চিহ্ন কমাইতে পারিলেও আমাদের ভাষা যে একটা বিরাট বোঝা ও ঝামেলা হইতে রক্ষা পাইবে তা বলাই বাহুল্য।

[আমাদের ভাষার রূপ (১৯৬৭,
পৃষ্ঠা ৪ —৬)
প্রিন্সিপাল আবুল কাসেম
তাঁর বইতে যে বানানরীতি
অনুসরণ করেছেন তার কোন
পরিবর্তন করা হয়নি]

---

১. পরীক্ষার খাতায় —প্রথম প্রথম বাঙলা সাহিত্যে এইররুপ বানান লিখিয়া গেলে অসুবিধা হইলেও, বিজ্ঞান, ধনবিজ্ঞান, রাষ্ট্রবিজ্ঞান প্রভৃতি বিষয়ে নতুন বানান লেখা যায়। এইসব বিষয়ে ইতিমধ্যে বহু পাঠ্য বই নতুন বানানে প্রকাশিত হইয়াছে। আর এইভাবে পরীক্ষা দিয়া বহু ছাত্র পাশ করিতেছে।

২. সরল ভাষা প্রকাশ ব্যাকরন পৃঃ ২৫ ও ড: মোহম্মদ শহীদুল্লা সাহেবের প্রবন্ধ দেখুন।

১. ক্ষ এর বদলে খ ও খ্য লেখা যায় : যেমন : – ক্ষেত্র – খেত্র পরীক্ষ– পরীখ্যা।

চ. মোফাজ্জল হায়দার চৌধুরী

… … আমি বানান-সংস্কারের ব্যাপারে কিছুটা মধ্য পন্থা অবলম্বনের পক্ষপাতী অবশ্য লিপি-সংস্কার কিছুটা অবিলম্বেই কার্যকরী হওয়া বাঞ্ছনীয়। লিপি-সংস্কার বলতে আমি বোঝাতে চাচ্ছি —

(১) অপ্রয়োজনীয় কয়েকটি বর্ণ — যেমন ঞ, ণ, ৎ, ৽, ৯ ইত্যাদি বর্জন;

(২) যেসব যুক্তবর্ণ ও স্বরচিহ্ন-সংযুক্ত বর্ণ একটা নতুন চেহারা ধারণ করে— সেগুলিকে তাদের স্বাভাবিক রূপে লেখা;

(৩) যুক্তবর্ণকে , দৃষ্টিকটু না হলে, বিযুক্ত করে লেখা। যেমন, উল্টা, হাল্কা না লিখে উলটা, হালকা লেখা বাঞ্ছনীয়।

অবশ্য ১ নম্বর ও ৩ নম্বর নিয়মের সঙ্গে বানান-সংস্কারের প্রশ্নটাও কিছুটা জড়িত। আর যেখানে বানান-সংস্কারে পরিবর্তনের প্রশ্ন জড়িত, সেখানে আমাদের অত্যন্ত সতর্কভাবে অগ্রসর হওয়া প্রয়োজন। তাই আমি বাঙলা থেকে এখনই সমস্ত যুক্তবর্ণ বর্জন করতে বলি না এবং ডক্টর শহীদুল্লাহ সাহেবের পরামর্শানুযায়ী দ্বিত্ব উচ্চারণস্থলে আপাতত য-ফলা এবং ব-ফলা রাখার পক্ষপাতী।

… … … … …

আমার এ কথাগুলিকে পূর্বের বক্তব্যের সঙ্গে পরস্পর বিরোধী বলে যেন কেউ মনে না করেন। প্রকৃতপক্ষে আমার প্রস্তাবিত সংস্কার সম্পর্কে আমার আস্থা অটল কিন্তু সেটিকেও আমি ক্রমে ক্রমে (যেমন ধরুন দশ বছরের পর্যায়ক্রমে) প্রবর্তন করার পক্ষপাতী। আপাতত অবিলম্বে লিপি ও বানানের যে সংস্কার হতে পারে, তার উল্লেখ আমি একটু পূর্বেই করেছি।

প্রস্তাবিত সংস্কারগুলি কিভাবে পর্যায়ক্রমে প্রবর্তন করা যেতে পারে তার দৃষ্টান্ত আমি তিনটি বিখ্যাত কবিতার কয়েকটি পংক্তিতে প্রয়োগ করে দেখালাম।

[পরিশিষ্ট দ্রষ্টব্য]

॥ প্রস্তাবের সারমর্ম ॥

ধ্বনিবর্গীয় [Phonemic] লিপিমালাই যে কোনো ভাষার পক্ষে আদর্শলিপি।

বাঙলা ভাষার ধ্বনিবর্গ [Phoneme], আমাদের হিসাব মতে, সাঁইত্রিশটি; ব্যঞ্জনধ্বনিমূলক ত্রিশটি, স্বরধ্বনিমূক সাতটি।

বাঙলার জন্য বিজ্ঞানসম্মত লিপি হতে হলে এর প্রত্যেকটির জন্য একটি করে হরফ থাকা চাই। এই হিসাবে রোমান বর্ণমালা বাঙলার জন্য অনুপযোগী, আরবী বর্ণমালাও তাই।

বাঙলা বর্ণমালাই বাঙলা ভাষার পক্ষে সবচেয়ে উপযোগী। সেই বর্ণমালাটি বাঙলার জন্য আদর্শ বর্ণমালা হতে পারে এবং বানানের জটিলতা ও বৈষম্য দূর হতে পারে নিম্নলিখিত কয়েকটি মাত্র সংস্কার কার্যকরী করলে—

[১] প্রত্যেকটি ধ্বনিবর্গের জন্য একটি করে চিহ্ন থাকবে; ধ্বনিবর্গের প্রতীক বর্ণগুলি ছাড়া অন্য বর্ণগুলি বর্জন করতে হবে।

[২] ব্যঞ্জনবর্ণগুলিকে শুধু ব্যঞ্জনধ্বনির প্রতীক বলে ধরা হবে। [অর্থাৎ ওদের নিহিত অ স্বরধ্বনি চলে যাবে]।

[৩] বর্তমান 'ব্যঞ্জনাশ্রিত' অ স্বরধ্বনি স্বতন্ত্রভাবে চিহ্নিত করতে হবে। এই ধ্বনির প্রতীক হিসাবে নাগরী এ-কার চিহ্ন বা উর্ধ্ব কমা' ব্যবহার করা যেতে পারে।

[৪] যে স্বরচিহ্নগুলি সংশ্লিষ্ট ব্যঞ্জনবর্ণের [অর্থাৎ যে ব্যঞ্জনধ্বনির অব্যবহিত পরে নির্দিষ্ট স্বরধ্বনি উচ্চারিত হয়, সেই ব্যঞ্জনধ্বনির প্রতীক বর্ণের] বাঁ দিকে লেখা হয়, সেগুলিকেও ডান দিকে লেখার রীতি প্রচলন করতে হবে। যেমন, দ১শ, ব১শী।

(৫) যুক্তাক্ষরগুলিকে ক্রমশ বিযুক্ত করে লিখতে হবে। উপরিউক্ত ২ নম্বর ও ৩ নম্বর নিয়ম কার্যকরী করলে হসন্ত ছাড়াও 'যুক্তধ্বনি' (যেমন স্ত, ক্ত) লিখতে কোন অসুবিধে হবে না।

প্রস্তুত নিয়মানুযায়ী এই হরফগুলি বাদ যাবে :

ঞ, ণ, য, ষ, ক্ষ, ঢ়, ং, ঃ, ৎ
ঈ, ঊ, ঋ, ঌ, ঐ, ঔ

মোট পনেরোটি বর্ণ বাদ দেওয়া যেতে পারে। চিহ্নের মধ্যে বাদ যাবে ি,ৃ ও হ্রস্ব উ এবং দীর্ঘ উ এর নানারূপ, যেমন, রু, রূ,্ (হসন্ত), সম্ভবতঃ ৃ ঋকার ও বিভিন্ন ফলা (যেমন র-ফলা, ল-ফলা ইত্যাদি)।

নতুন হরফের আগমন ঘটবে মাত্র একটি —ব্ (w)

নতুন চিহ্নের আগমন ঘটবে মাত্র একটি —' (অ-কার)

এবং ে আর ো এর পরিবর্তে নতুন চিহ্ন আসবে যথাক্রমে—১ এবং ১া।

স্মরণ রাখা প্রয়োজন যে, আমার প্রস্তাবিত বানান পূর্ণভাবে কার্যকরী করলে সমস্ত যুক্তাক্ষরই পরিণামে বর্জন করা যাবে। অবশ্য আমার নীতি অনুযায়ী আপাতত যুক্তাক্ষর (তাদের চেহারাকে সরল করে নিয়ে) রাখতেও কোনো অসুবিধা নেই।

আমার মনে হয়, বাঙলা লিপি ও বানানের উপরে বর্ণিত সংস্কারই বৈজ্ঞানিক যুক্তিসম্মত ও বাঞ্ছনীয়, তবে এই সঙ্গে উপসংহারে কথিত সতর্কতামূলক নীতিগুলি স্মরণ রাখা প্রয়োজন।

পরিশিষ্ট

আমার প্রস্তাবিত সংস্কার অনুযায়ী লিপি নমুনা :

ক. প্রথম পর্যায়ে :

১। এই তো ভালো লেগেছিল' আলোর নাচ'ন পাতায় পাতায়
শালের বনের খ্যাপা হাব্‌া এইতো আমার মনকে মাতায়।

২। আজী মেঘ মুক্ত' দীন প্র'স'ন্ন' আকাশ
হাসীছে' ব'ন্ধুর মতো, উদার বাতাস।

৩। হে দারীদ্র্য তুমী মোরে করেছ' ম'হান
তুমি মোরে দানীয়াছ' খ্রিষ্টের সম্মান।

খ. দ্বিতীয় পর্যায়ে :

১। এই তা ভালী ল১গ১ছীল' আলীর নাচ'ন পাতায় পাতায়
শাল১র ব'ন১র খ্যাপা হাবা এইতী আমার ম'নক১ মাতায়।

২। আজী ম১ঘ'মুক্ত দীন প্র'স'ন্ন আকাশ
হাসীছ১ ব'ন্ধুর ম'তী উদার বাতাস।

৩। হ১ দারীদ্র্য তুমী মৌর১ ক'র১ছ' ম'হান
তুমী মৌর১ দানীয়াছ' খ্রীস্ট১র স'ম্মান।

গ. তৃতীয় পর্যায় :
১। খ-এর অনুরূপ।
২। আজী ম১ঘমুকত' দীন, পর'স' নন' আকাশ
হাসীছ১ বনধুর ম'তৌ উদার বাতাস।
৩। হ১ দারীদর্য তুমী মৌর১ ক'র১ছ ম'হান
তুমী মৌর১ দানীয়াছ' খরীসট১র স'মমান
ইত্যাদি]

[বাঙলা বানান ও লিপি সংস্কার,
বাঙলা একাডেমী পত্রিকা, কার্তিক-পৌষ ১৯৬৯]

ছ. ভিন্নমত

১৯৬৭ সালের মার্চ মাসে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের একাডেমিক কাউন্সিল বাঙলা ভাষার সংস্কার ও সরলীকরণের জন্য একটি কমিটি গঠন করে। কমিটি ১৯৬৮ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে সুপারিশ পেশ করে। কমিটির তিনজন সদস্য ডক্টর মুহম্মদ এনামুল হক, মুহম্মদ আবদুল হাই ও মুনীর চৌধুরী এই সুপারিশের সঙ্গে একমত হতে পারেননি। তাঁদের মত নিম্নে প্রদত্ত হলো।

১। ১৯৬৭ সালের ২৮শে মার্চ তারিখে অনুষ্ঠিত ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা পর্যদের (Academic Council) বৈঠকে বাঙলা ভাষার সংস্কার ও সরলায়নের জন্য যে সদস্য মণ্ডল (comittee) গঠিত হয়, তাহার বিবেচ্য বিষয় ছিল মোট তিনটি যথা—

ক। বাঙলা বানান সংস্কার ও সরলায়ন,
খ। বাঙলা ভাষার ব্যাকরণ-সংস্কার ও সরলায়ন,
গ। বাঙলা বর্ণমালা সংস্কার ও সরলায়ন।

প্রায় এগার মাস পরে (মে, ১৯৬৭ হইতে ফেব্রুয়ারি, ১৯৬৮) এই ভাষা সংস্কার ও সরলায়ন সদস্য মণ্ডল তাঁহাদের বিবেচ্য বিষয় সম্বন্ধে যে সুপারিশ শিক্ষা-পর্ষদের নিকট বিবেচনার জন্য উপস্থাপিত করিতেছেন, আমরা এই সদস্য মণ্ডলের সভ্য হিসাবে প্রেরিতব্য সুপারিশ হইতে সবিনয়ে ভিন্নমত পোষণ করি।

২। এই সুপারিশকে বাঙলা বানান ও লিপি সম্পর্কে সদস্য মণ্ডলের সিদ্ধান্ত বলিয়া শিরোনামা দেওয়া হইলেও ইহাতে বানান সম্বন্ধে দুই একটি ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত উদাহরণমূলক প্রাসঙ্গিক সুপারিশ ছাড়া, বাঙলা বানান-পদ্ধতির অসুবিধাগুলি ধারাবাহিকভাবে দেখাইয়া দিয়া তাহা দূরীকরণের কোন উপায় উদ্ভাবিত হয় নাই। বাঙলা ভাষার ব্যাকরণের সংস্কার ও সরলায়ন সম্বন্ধে কোন সুপারিশ তো ইহাতে নাই। বাঙলা লিপি সংস্কার ও সরলায়ন সম্বন্ধে সুপারিশগুলি প্রধানতঃ অধিকাংশ ভোটে গৃহীত হইলেও, তাহাতে কোন প্রকারের শৃঙ্খলা রক্ষিত হয় নাই। ১, ৩, ৫, ১০, ১৩ সংখ্যক সুপারিশগুলি বর্ণমালা হইতে কোন্ কোন্ বর্ণ বাদ যাইবে তাহার অনুমোদনমূলক। তাহাও আবার ব্যঞ্জনবর্ণ দিয়া আরম্ভ, মাঝখানে স্বরবর্ণ, আবার ব্যঞ্জনবর্ণ সম্বন্ধীয় যদৃচ্ছা সুপারিশ। অধিকন্তু, এইগুলিতে বিবেচ্য-বিষয়ের বহির্ভূত সুপারিশেরও আমদানী করা হইয়াছে।

৩। সদস্য মণ্ডলের (committee) বিবেচ্য নয়, এমন বিষয়ও এই সুপারিশগুলিতে স্থান লাভ করিয়াছে, যেমন, আরবী, ফারসী ও অন্য বিদেশী শব্দের বাঙলা প্রতিবর্ণীকরণের সুপারিশ। বলা বাহুল্য, প্রতিবর্ণীকরণের ব্যাপারটি বিবেচ্য বিষয়ের অন্তর্গত নহে। বানান ও বর্ণমালা সংস্কারের অথবা সরলায়নের ব্যাপার প্রতিবর্ণীকরণের সহিত মুখ্যত: সংশ্লিষ্টও নহে। প্রকৃতপক্ষে প্রতিবর্ণীকরণের ব্যাপার বর্ণমালা সরলায়নের পরবর্তী ব্যাপার। ইহাতে বর্ণমালা সরল না হইয়া জটিলতর হইয়া থাকে। এমন একটি ব্যাপারের আমদানী (২, ৪, ৫ ও ৬ সংখ্যক সুপারিশ দ্রষ্টব্য) কেন যে গায়ে পড়িয়া করা হইল, বুঝিয়া উঠা ভার।

৪। আমরা মনে করি যে বানান ও লিপির পরিবর্তন যদি আকস্মিক হয়, তবে তাহা ভাষার ক্ষেত্রে নতুন নতুন সমস্যার উদ্ভব ঘটাইয়া গুরুতর গোলযোগের সৃষ্টি করে। ভাষার শ্রেষ্ঠ লেখকগণের রচনায় লিপি ও বানানের কোন সামান্য পরিবর্তন সর্বজনগ্রাহ্যরূপে সূচিত হইলে, কালক্রমে বৈয়াকরণগণ হয় তাহা ভাষায় সাধারণ নিয়মের অন্তর্ভুক্ত করিয়া লন, না হয় সাধারণ নিয়মের ব্যতিক্রমরূপে গ্রহণ করেন। বর্তমান সদস্য-মণ্ডল প্রচলিত দৃষ্টান্তের উৎকৃষ্ট প্রমাণ ব্যতীত যে প্রকার ব্যাপক, মৌল ও দ্রুত পরিবর্তনের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিয়াছেন, তাহা কখনও দেশবাসীর জন্য মঙ্গলকর বা গ্রহণযোগ্য হইবে বলিয়া আমরা মনে করি না।

৫। বানানের যত প্রকার সংস্কারই সাধিত হউক না কেন, শিক্ষার্থীকে সব সময় চাক্ষুস পরিচয় ও দীর্ঘ ব্যবহারিক সাধনা দ্বারা বানান আয়ত্ত করিতে হয় ও হইবে। আরবী, ফারসী, ইংরাজী, জর্মান, রুশ প্রভৃতি কোন ভাষাতেই কেবল উচ্চারণের সূত্র ধরিয়া শুদ্ধ বানানে উপনীত হওয়া যায় না। ধ্বনিবিজ্ঞানী ব্যতীত অন্যের পক্ষে উচ্চারণভিত্তিক বানানে অভ্যস্ত হওয়া প্রায় অসম্ভব। বর্তমানে পূর্ব-পাকিস্তানে উচ্চারণকে লেখার ক্ষেত্রে অত্যধিক মর্যাদা দান করিলে, কার্যতঃ তাহাতে আঞ্চলিক উপ-ভাষাকেই প্রশ্রয় দেওয়া হইবে। উহাতে বানানের ক্ষেত্রে চূড়ান্ত নৈরাজ্যের সৃষ্টি হইবে। ভাষা শুনিয়াও বুঝিবার উপায় থাকিবে না, দেখিয়াও শিখিয়া লইবার পথ বন্ধ হইবে। ইচ্ছা করিয়া এমন একটি পরিস্থিতির সৃষ্টি দেশের পক্ষে বাঞ্ছিত বলিয়া আমরা মনে করি না; —পূর্ব-পাকিস্তানের ক্রমবর্ধিষ্ণু বাঙলা-সাহিত্যের পক্ষে তো নহেই।

৬। সদস্য-মণ্ডল যে বিশটি সংস্কারের, বলাবাহুল্য, তন্মধ্যে বিবেচ্য-বিষয় বহির্ভুত সুপারিশও বর্তমান রহিয়াছে, সুপারিশ করিয়াছেন, তাহার দুই-একটি প্রস্তাবের কোন কোন অংশ ক্ষতিকর বলিয়া মনে না করিলেও আমরা সামগ্রিকভাবে এই প্রস্তাবসমূহের পূর্ণ বিরোধিতা করি। কেন তাহা করি, নিম্নে অতি সংক্ষেপে তাহা আলোচনা করিতেছি :

ক. প্রথম প্রস্তাব : বাঙলা বর্ণমালা হইতে ঙ বাদ যাইবে ও তৎস্থলে ং অনুস্বর লিখিতে হইবে। তাহা হইলে রাঙা, আঙিনা, আঙুল, বেঙাচি, চঙের প্রভৃতি বহু শব্দ লেখার বেলায় ং অনুস্বরের সহিত কার-চিহ্ন যোগ করিয়া র‍্যাং, আংিনা, আং ুল, বেংচি, চংের প্রভৃতির মতো লিখিতে হইবে। অনুস্বরের সহিত কার-চিহ্নের যোগ বাংলা লেখার প্রকৃতি-বিরুদ্ধ। এইরূপ লেখা বাঙলায় অচল। কারণ, অনুস্বর হইতেছে ঙ বর্ণের হসন্ত রূপ। যেহেতু কোন হসন্ত বর্ণে কার-চিহ্ন যোগ করা যায় না, সেহেতু অনুস্বরেও কার-চিহ্ন যোগ অসম্ভব।

খ। দ্বিতীয় প্রস্তাব : —বিবেচ্য-বিষয়-বহির্ভূত। সুতরাং, আলোচনা অনাবশ্যক ও অবান্তর।

গ. তৃতীয় প্রস্তাব : —বর্ণমালা হইতে মূর্ধন্য ণ বাদ দিতে হইবে। তাহা হইলে বান ও বাণ; অনু ও অণু ; মণ ও মন; বীণা ও বিনা ; বাণী ও বানি; পুরাণ ও পুরান; ধরণ ও ধরন প্রভৃতি বহু সাধারণ শব্দের বানানও এক হইয়া গিয়া অর্থবিভ্রাট ঘটাইবে। এই প্রস্তাব

ধ্বনিতত্ত্বেরও সম্পূর্ণ বিপরীত। কেননা, দন্ত্য ন মূর্ধন্য-বর্ণের সহিত যুক্ত হইলেই যে সহধ্বনি (allophone) উৎপাদন করে, তাহাই মূর্ধন্য ণ। এই ণ বাদ দিলে লুণ্ঠন, লণ্ঠন, কণ্ঠ, মণ্ডা, ঠাণ্ডা প্রভৃতি কত শব্দ যে উচ্চারণ-বৈশিষ্ট্য হারাইবে, তাহার ইয়ত্তা নাই। কারণ, কন্‌ঠ, মন্‌ডা প্রভৃতির উচ্চারণ কণ্ঠ, মণ্ডা প্রভৃতি নহে।

ঘ। চতুর্থ প্রস্তাব : —বিবেচ্য-বিষয় বহির্ভূত। সুতরাং আলোচনা অনাবশ্যক ও অবান্তর।

ঙ. পঞ্চম ও ষষ্ঠ প্রস্তাব : প্রস্তাব দুইটিতে অবান্তর ও স্ববিরোধী ব্যবস্থা রহিয়াছে। এই দুই প্রস্তাবে ঈ এবং উ তাহাদের কার-চিহ্ন সহ বাঙলা বর্ণমালা হইতে বাদ দেওয়ার সুপারিশ করা হইয়াছে। অথচ, প্রতিবর্ণীকরণের ক্ষেত্রে ব্যবহারের সুপারিশ করা হইয়াছে। বর্ণমালাতেই যদি বর্ণ দুইটি না থাকে প্রতিবর্ণীকরণের সময় তাহা কোথা হইতে আমদানী করা হইবে এবং কোন পরিচয়ে? এমন প্রস্তাব শুধু অবান্তর নহে, স্ববিরোধীও বটে। এই দুই স্বর ও কার-চিহ্ন বাদ গেলে বাঙলা ভাষার কত অর্থ বিভ্রাট ঘটিবে সুপারিশের সময় তাহাও ভাবিয়া দেখা হয় নাই। ইশ্‌ ও ঈষ ; কুল ও কূল,তরি ও তরী;' দিন ও দীন; কুজন ও কূজন, ভুতি ও ভূতি; ভীত ও ভিত ; ভুঁড়ি ও ভূরি ইত্যাদি অতি সাধারণ শব্দের অর্থ-বিভ্রাট সম্বন্ধেও চিন্তা করা হয় নাই। সুতরাং উক্ত উভয় কারণেই এমন প্রস্তাব পরিত্যাজ্য।

চ। সপ্তম প্রস্তাব : — এই প্রস্তাবে ঋ, ঌ বাদ দিতে বলা হইয়াছে। দীর্ঘ-ঋ, এবং হ্রস্ব-ঌ ও দীর্ঘ ঌ বহুকাল পূর্বেই বাঙলা বর্ণমালা হইতে বর্জিত হইয়াছে। এই বর্ণগুলিতে নূতন করিয়া বর্জনের কথা হাস্যকর। এতৎসত্ত্বেও, ঋ-এর ঋণ অনস্বীকার্য। ঋতু ও ঋষি লইয়াও বিভ্রাট সুনিশ্চিত; হিন্দু-মুসলিম দাঙ্গাও বাধিয়া যাইতে পারে। ঋ-কারের ব্যবহারের তো কোন অন্তই নাই। কৃপণ-এর কৃ-কে উদার হইয়া 'ক্রী' বা 'ক্রি' ধারণে দরাজ-দিল্‌ হইতে উপদেশ দিলেও লাইনো, টেলিপ্রিণ্টার ও টাইপ-রাইটার যন্ত্র শুনিতে চাহিবে না, এমন নয়; কৃপণ-বেচারারও 'হ্রিদয়ন-তরের' 'ক্রীয়া' 'বন্ধ' হইয়া (অপম্রিতত্যু)' 'অপমৃত্যু ঘটিতে পারে।

ছ। অষ্টম প্রস্তব : —কার-চিহ্ন সহ ঐ এবং ঔ বাদ দেওয়ার সুপারিশ। প্রস্তাবিত অই অথবা অউ কোনক্রমেই মূল ঐ বা ঔ-এর অথবা তাহাদের কার-চিহ্নের সমধ্বন্যাত্মক নহে। ইহার দ্বারা যুক্ত ধ্বনিকে বিযুক্ত করিবার কোন সার্থকতা নাই। কেননা, ঐ এবং ঔ যুক্ত ধ্বনি, আর অই এবং অউ বিযুক্ত ধ্বনি। এক প্রকারের ধ্বনিকে অন্য প্রকারের ধ্বনির দ্বারা পালটাইলে উচ্চারণ বিভ্রাট ঘটিবে।

জ। নবম প্রস্তাব : —বর্ণমালা হইতে ঞ বাদ দেওয়ার সুপারিশ এই প্রস্তাবে করা হইয়াছে। এই প্রস্তাব ধ্বনি-তত্ত্বের সম্পূর্ণ বিপরীত। কেননা, ইহা দন্ত্য-ন এবং চ বর্গীয় সহধ্বনি। ইহা বাদ দিলে চ-বর্গ তাহার তালব্য বৈশিষ্ট্য হারাইবে এবং সেইজন্য দন্ত্য-ন বর্ণও তাহার তালব্য-সহধ্বনি হারাইবে। ফলে, ইহা লিখায় একরূপ ও উচ্চারণে অন্যরূপ আকার ধারণ করিয়া উচ্চারণগত বৈশিষ্ট্য রক্ষা করিবে বটে, তবে লেখায় ও উচ্চারণে সামঞ্জস্য হারাইয়া ফেলিবে।

ঝ. দশম প্রস্তাব : — ইহাতে বাদ দেওয়ার সুপারিশ আছে। খণ্ড-ৎ লইয়া কলহ করিবার কিছু নাই। কেননা, অকারান্ত ত বর্ণের তলায় হসন্ত বসাইলেই ৎ এর কাজ চলিয়া যাইবে।

এইবার আলোচনার সংক্ষেপায়নের জন্য অবশিষ্ট দশটি প্রস্তাবের সুপারিশগুলির সাধারণ আলোচনা করা যাইতে পারে। আবশ্যকবোধে দীর্ঘতর আলোচনা করা হইবে।

জ্ঞান-বিজ্ঞানের জ্ঞ, সহ্য অসহ্যের হ্য, পদ্মা-ছদ্মের দ্ম, জন্ম-আত্মের ন্ম বা ত্ম, বিশ্বাস-অবিশ্বাস কিংবা লম্ব-লম্বার ব-ফলা ইত্যাদি বর্জনীয় নহে। কারণ ধ্বনিগতভাবে এই সকল

সমীকরণ সত্য নহে। জ্ঞান-বিজ্ঞানের পরিবর্তে গ্যাঁন-বিগগ্যাঁন, সহ্য-অসহ্যের পরিবর্তে সজ্ঝ-অসজ্ঝ, পদ্মা-ছদ্মের পরিবর্তে পদ্‌দাঁ-ছদ্‌দঁ, জন্ম-আত্মের পরিবর্তে জন্‌ম-আত-তঁ, বিশ্বাস-অবিশ্বাসের পরিবর্তে বিশ্‌শাস অবিশ্‌শাশ লিখিলে বানান হিসাবে কেন সহজতর বিবেচিত হইবে আমাদের বোধগম্য নহে। দ্বিতীয় শব্দের বানানে দীতীয় লিখিত হইলে অদ্বিতীয় শব্দের বানানের কি হইবে বলা হয় নাই। তবে কি তাহা অদীতীয় হইবে?

লাইনো টাইপ প্রচলিত হইবার পর, বর্তমানে সকল স্বরযুক্ত ও যুক্ত ব্যঞ্জনবর্ণ যথাসাধ্য স্বতন্ত্র বর্ণের আকৃতিতে লেখার রেওয়াজ চালু হইয়া গিয়াছে, এই বিষয়ে সুপারিশ করার আবশ্যকতা ছিল না। প্রয়োজনবোধে যুক্তবর্ণের স্থলে হসন্ত চিহ্ন ব্যবহারের সুপারিশ সম্পর্কেও এই কথা বলা চলে। ১২, ১৩, ১৪, ১, ১৮, ২০ সংখ্যক প্রস্তাব অংশতঃ অবান্তর ও অনাবশ্যক এবং অংশতঃ স্ববিরোধী। উদাহরণস্বরূপ, ১৪-সংখ্যক সুপারিশ দেখা যাইতে পারে। যদি রেফ ও র-ফলা রাখিয়া দিবার সুপারিশ দেওয়া হয়, তবে আবার রেফ-কে ব-য়ে হসন্তরূপে লিখিবার ব্যবস্থা দেওয়া হইল কেন? মোটের উপর, এই প্রস্তাবগুলিতে ভ্রান্তিকে কত প্রকার যে বিভ্রান্তিতে পর্যবসিত করিবার ব্যবস্থা গ্রহণ করা হইয়াছে, তাহার কোন ইয়ত্তা নাই।

অতএব, আমাদিগকে বাধ্য হইয়াই সামগ্রিকভাবে প্রস্তাবগুলি হইতে ভিন্নমত পোষণ করিতে হইল। অধিকন্তু, আমরা মনে করি যে, বাঙলা লিপি ও বানান-সরলায়ন ও সংস্কারের কোন আশু প্রয়োজন নাই। এইরূপ কাজে হাত দিলে নিশ্চিতরূপে ভ্রান্তি বিভ্রান্তিতে পরিণত হইবে এবং পূর্ব-পাকিস্তানের বাঙলা ভাষার দ্রুত উন্নয়ন বিশেষভাবে ব্যাহত হইবে।

মুহম্মদ এনামুল হক
২৪.২.৬৮
মুহম্মদ আবদুল হাই
২৪.২.৬৮
মুনীর চৌধুরী
২৪.২.৬৮

[১]
রচনার নমুনা

মুসলমানী বাঙলার রূপরেখা অঙ্কন করেছিলেন আবুল মনসুর আহমদ। উনিশ'শ তেতাল্লিশ সালে কলিকাতার এক সাহিত্য-সভার ভাষণে আবুল মনসুর আহমদ মুসলমানদের মুখের বাংলাকে সাহিত্যে বর্জন না করে তাকে স্ট্যাণ্ডার্ড বাংলা ভাষা রূপে গ্রহণ করতে হিন্দু বন্ধুদের পরামর্শ দিয়েছিলেন এবং এও তিনি বলেছিলেন 'মুসলমানদের মুখের বাংলা, হিন্দুর মুখের বাংলার চেয়ে শ্রেষ্ঠ'। দৃষ্টান্ত হিসেবে তিনি নিম্ন উদ্ধৃতিটি দিয়েছিলেন —

> ফজরের আউয়াল ওয়াকতে উঠিয়া ফুফু-আম্মা চাচাজীকে কহিলেন, আমাকে জলদি এক বদনা পানি দাও। আমি পায়খানা ফিরিয়া গোসল করিয়া নামাজ পড়িয়া নাশতা খাইব। হিন্দু বাঙ্গালির মুখের বাংলার দৃষ্টান্ত : অতি ভোরবেলা উঠিয়া পিসিমা খুড়া মশায়কে বলিলেন,

আমাকে শিগগির এক গাড়ু জল দাও। আমি প্রাতঃক্রিয়া সারিয়া চান করার পর সন্ধ্যা করিয়া মাধান্নি খাইব।

(পাক বাংলার কালচার, ১৯৬৬)

পূর্ব ও পশ্চিম বাংলার কথ্য ভাষার মধ্যে একটা আপোস-ফরমুলা হিসেবে তিনি নিম্নোদ্ধৃত 'মডেল'ও প্রণয়ন করেছিলেন—

'তুলার বাজার এমন মাংগা আর দেখি নাই। তুলার অভাবে সূতার কলগুলি বন্ধ হয়ে গেছে। সূতার অভাবে জাল বোনা হচ্ছে না। পাল ছাড়া নৌকায় ক্ষেপ দেওয়া যাচ্ছে না। ফলে হাড়িপাতিল বেচা বন্ধ। কুমারদের তাতে খুবই অসুবিধা হয়েছে। দুমুঠা ভাতের আশায় তারা খান্দানী পেশা থনে বার হয়ে এসেছে। তবে ভিক্ষা করে খাবার ইচ্ছা তাদের নাই। জরু-কবিলারে খাওয়ায়ে পরায়ে বাঁচায়ে রাখবার জন্য তারা লাকড়ির পেশা ধরেছে। কাঠ কুড়াবার মতলবে তারা কুড়াল হাতে নদী পার হয়ে সুন্দর বনে যায় খুব সকালে। সারাদিন বাদে বিকাল সন্ধ্যায় কাঠ নিয়া ঘরে ফিরে আসে।

[পাক বাংলার কালচার, ১৯৬৬]

আবুল মনসুর আহমদের বিশ্বাস পূর্ববাংলার শিক্ষিত মানুষ এই রকম 'দুমিশালী' ভাষাতেই কথা বলে এবং শিক্ষিত অশিক্ষিত নির্বিশেষে সকলে এই ভাষা বোঝে।

[২]

আমাদের গোজারেশ

গোজাশ্‌তা এশায়াতে আমরা অতীতে বাংলা ভাষার নানা মোড়পরিবর্তনের কথা মোখ্‌তাসার ভাবে উল্লেখ করেছিলাম। বাংলা ভাষার ইতিহাস সম্বন্ধে ওয়াকিফহাল সকলকে স্বীকার করতেই হবে, যে শৈশবে বাংলা ভাষা মুসলমান বাদশাহ এবং আমীর ওমরাহদের নেকনজরেই পরওয়ারেশ পেয়েছিল এবং শাহী দরবারে শান-শওকত হাসিল করেছিল। রামায়ণ মহাভারত প্রভৃতি হিন্দু ধর্ম্মগ্রন্থ বাংলার পাঠান বাদশাহদের উৎসাহেই বাংলা ভাষায় অনুবাদিত হয়েছিল। ডাক্তার দীনেশচন্দ্র সেন প্রমুখ বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের ঐতিহাসিকগণ এই ঐতিহাসিক সত্য মুক্ত-কণ্ঠে স্বীকার করেছেন।

… … … … … … …

কলেমা-নমাজ, রোজা, হজ্জ জাকাতই মাশ্‌রেকো ও মাগ্‌রেবী বাংলার বাশেন্দা মুসলমানদেরও মাযহাবী আরকানা কোরাণ হাদীস ফেকাহ্‌ উছুলের জন্য বাংলা ভাষাভাষী মুসলমানদের দরদ ও গরজ কম নয়। পাক-পানীতে অজু করে মুয়াজ্জিনের আজান শুনেই তাঁরা মসজিদে গিয়ে ঈমানের পেছনে মোকতাদী হয়ে নিয়ত তাহরীমা রুকু, সিজদা, সালাম, তাকবীরের সহিত বাকায়দা নমাজ আদায় করেন। রাববানা আতেনা ফীদ্দুনীয়া হাসানাতা ও ফীল আখেরাতে হাসানাতা প্রভৃতি বলেই মুসল্লিগণ আল্লাহর দরগাহে আজীজী এন্‌কেসারীর সহিত মোনাজাত করে থাকেন। ফজর-জোহর, আছর, মাগরেব, এশাই তাঁদের পান্‌জে-গানা নমাজ। ফরজ ওয়াজেব, সুন্নত নফলই তাঁদের নানাবিধ নামাজের নাম।

মীলাদ-মওলুদ,ওয়াজ নসীহত খান-জিয়াফত আকীকা কোর-বাণীর রেওয়াজ আজও মাশ্‌রেকী পাকিস্তানে পুরোদস্তুর বজায়। মাগ্‌রেবী বাংলায় বকর-ঈদে হাঙামা হজ্জতের হুম্‌কীতেও গো কোরবাণী মওকুফ হয়ে যায় নি। উপরোল্লিখিত অন্যান্য রেওয়াজ রুসুমও সেখানে বজায় রয়েছে— তথাকথিত শুদ্ধ বাংলায় রূপান্তরিত হয়নি এবং কখনো হবে না। আব্বা-আম্মা ভাই-বেরাদর, খেশ-আকারের, দোসত দুশমন, দুল্‌হা দুলহান, ইজাব কবুল, কাবীন মোহরাণা, শাদী-নেকাহ, মোয়জ্জাল-মোয়াজ্জল, দেন-মোহর প্রভৃতি খোশমেজাজে বহাল তবীয়তে হাজারো বৎসর যাবত বিবাহ মজ্‌লিসে বিরাজমান।

বাংলা মলুকের মসনদে নানা পট পরিবর্তনে, যুগের প্রভাবে, জামানার জরুরাতে অবস্থান সংঘাতে বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের নানা পরিবর্তন বিবর্তন হয়েছে এবং হবে। বাংলা ভাষা জন্ম হতেই পাঁচ-মিশালী ভাষা। বাংলা ভাষার জাত নিয়ে নাজ করা নিছক সংস্কার —অসংগতও বলা যেতে পারে। জাতের বালাই নেই বাংলা ভাষার। সংখ্যা-গরিষ্ঠ মুসলমানদের তাহজীব তমদ্দুনের তায়াল্লুক বর্জিত বাংলা ভাষা মাশ্‌রেকী পাকিস্তানের সাধারণ মাতৃভাষা নয় এবং হবে না' হতে পারে না। এ কথা ভুলে যাওয়া হবে বোকামী।

[মাহে নও, ১ম বর্ষ ৭ম সংখ্যা আশ্বিন ১৩৫৬ সম্পাদকীয় কলামে ঐ রকম বাঙলা লেখা হয়েছিল। ঐ সময় 'মাহে নও' এর সম্পাদক ছিলেন মীজানুর রহমান।]

[৩]

জনাই খা শবে-মাত্‌র বাড়িতে পা দিয়াই চটিয়া গেল। তহশিলের খাতা পত্‌র বগলে চাপিয়া ধরিয়া বাহিরের চৌউচালা কাচারি ঘরের আড়ালে দাঁড়াইয়া অন দর মহলে কলরব শুনিতে লাগিল। শে বিশম ব্যাপার।

... ...

তাহার পরমা শুন্দরি ত্‌রিতিয়া শ্‌ত্‌রি কুলছুমের গলায় তিখ্‌ন শর ঝর ঝর করিয়া বাজিতেছিল; অপর দুইজন কেবল জবাব দিয়াই জাইতেছিল। অবশেষে তিনটি রত্‌নই জখন খা শাহেবের পক্‌খপাতিত্‌ত অবিচার এবং অধইরজের ভুরি ভরি নজির উল্লেখ করিয়া তাহার ভবিশ্‌শত অমংগল আকাংখা করিতে লাগিল তখন আর শে বাধা না দিয়ো থাকিতে পারিল না। হায়রে নারির জাত। খা শাহেবের বিচারের কৃত্‌শা! তাহার শুবিচারে আর কোথায়ও না হোক তাহার অন্‌দর মহলে যে 'রাম রাজজ' সুপ্‌রি তিশ্‌ঠিত—এবং শ্‌রিংখলা ও শান্‌তি বিরাজমান এ বিষয়ে খা শাহেবের বিন্‌দু মাত্‌র শন্‌দেহ ছিল না।

[আবুল হাসানাতের নক্‌শা। মানুষের বিচার—মাহে-নও, ৭ম সংখ্যা/আশ্বিন ১৩৫৬]

[৪]

শহর কলকাত্তায় শেফাউল মুল্‌ক্‌ তশরিফ রাখিতেছে না বহুত রোজের কথা। আর তশরিফ রাখিলে ফায়দাই বা কি? সে ছিল এক জমানা। ওজারতের তেজারত আর তেজারতের ওজারতে সুবে বাঙ্গলা ছিল সরগরম। আর আজ? তেজারত আছে তো ওজারত নাই— ওজারতের উম্মিদ হয়তো তেজারত হাত ফস্‌কাইয়া যায়।

শেফাউল মুল্‌কের এখানে থাকিয়া কি ফায়দা? হালজমানায় জুনিয়ারের নোসখাই কাফি। বাগবাজারের আশবারওয়ালা, চট্টগ্রামের কনট্রাক্টরওয়ালা—জুনিয়ারই এদের সামলাইয়া লইতে পারিবেঁ।

সেবাগ্রামের মহারাজা এক জরুরী খত ভেজিয়াছেন। হ্যাঁ, তিনি মহারাজাই— কিষাণ মজদুররা তাঁকে মহারাজাই বলে —হিন্দুস্তানের ভক্তজন তাঁর গায়েবী আওয়াজের জন্য কাণ পাতিয়া থাকে—কৃপালিনী মার্কা কংগ্রেস কমরেডদের তিনি কার্লমার্ক্স।

মহারাজা খত ভেজিয়াছেন— শেফাউল মুলক্‌কে তাঁর বড় জরুরত হইয়াছে।

মহারাজার খায়েশঃ দিল্লীর শাহী তক্ত কব্‌জ্ করিবেন। আনসারী নাই, আজমল খাঁ এন্তেকাল ফরমাইয়াছেন। মওলানা আজাদ সিয়াসত জানেন, ইউনানীতে এখনো কামিয়াব হইতে পারেন নাই। দিল্লীর শাহী তখত কব্‌জ্ করিতে তাই শেফাউল মুল্‌কের বড় জরুরত হইয়াছে।

শেফালউল মুল্‌কের 'হিং ও হালিম'
থেকে। ১৯৪৬ সালে 'আজাদ' পত্রিকায়'
হবীবুল্লাহ বাহার 'শেফাউল মুলক' ছদ্মনামে
'হিং ও হালিম' লিখতেন।]

একটি চিঠি

পাকিস্তান হওয়ার পর পূর্ব বাংলার ভাষা আন্দোলনের ক্ষেত্রে বিশেষ মন্ত্রী, আমলা ও বুদ্ধিজীবীর প্রকৃত ভূমিকা কি রকম ছিল তা বদরুদ্দীন উমরের কাছে লেখা কবি জসিমউদ্দীনের একটি চিঠিতে ধরা পড়েছে। চিঠিখানা বদরুদ্দীন উমরের 'পূর্ব বাংলার ভাষা আন্দোলন ও তৎকালীন রাজনীতি (১ম খণ্ড) গ্রন্থের (২য় পরিবর্ধিত সং,এপ্রিল ১৯৭৯) ৩২৯-৩৩ পৃষ্ঠায় রয়েছে।

স্নেহের উমর,

তোমার ভাষা আন্দোলনের ইতিহাস পুস্তকে এক স্থানে তুমি লিখিয়াছ, সৈয়দ আলী আহছান মওলা মিয়ার বাসায় একটি আলোচনায় শিক্ষামন্ত্রী ফজলুল রহমান সাহেবকে উর্দু অক্ষর প্রবর্তন করিতে বিরত করিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন। ইহা সম্পূর্ণ ভুল।

আমি তখন সরকারের তথ্য বিভাগে গিতী প্রচারের সংগঠক হিসাবে কাজ করি। এক সময় আমাদের ভূতপূর্ব ছাত্র আজিজুল হক আমকে ডাকিয়া বলিলেন,দেখুন আপনার বন্ধু প্রেস কনফারেন্স ডাকিয়া কি কাণ্ড করিতেছেন। তিনি বাংলার পরিবর্তে উর্দু বর্ণমালা প্রবর্তন করাইবেন। প্রেস কনফারেন্সে এই কথা ঘোষণা করিলেন।

শুনিয়া আমি ত আকাশ হইতে পড়িলাম। বাংগালী জাতির এমন সর্বনাশ তিনি কি করিয়া করিতে যাইবেন?

আমি ফজলুর রহমান সাহেবকে যাইয়া বলিলাম, "বর্ণমালা পরিবর্তনের ব্যাপারে আমি আপনার সাথে আলাপ করিতে চাই।" তিনি আমাকে বলিলেন, আজ রাত ৮টার পরে আপনি মওলা মিঞার বাসায় আসিবেন।

মওলা মিঞা তখন থাকিতেন ফুলবাড়িয়া রোডের একটি বাসায়। সেখানে যাইয়া দেখিতে পাইলাম শিক্ষা সম্পাদক মিঃ ফজলে করিম ও সৈয়দ আলী আহছান সেইখানে আগেই আসিয়া বসিয়া আছেন। মন্ত্রী সাহেব পূর্বেই তাহাদিগকে ডাকিয়া থাকিবেন।

কুশল প্রশ্নের পর আমি বলিলাম, "বাংলার পরিবর্তে উর্দু বর্ণমালা প্রবর্তন করিতে যাইয়া আপনি বাংগালী জাতিকে জীবন সংগ্রামে পশ্চিমাদের সংগে হারিয়া যাইবার সুযোগ করিয়া দিতেছেন।" তিনি বলিলেন,'বাংগালীরা অতি অল্প সময়ের মধ্যেই উর্দু বর্ণমালা শিখিয়া পশ্চিমা ছাত্রদিগকে ডিঙাইয়া যাইবে।"

পাশে বসিয়া সৈয়দ আলী আহছান আর ফজলে করিম সাহেব মন্ত্রী সাহেবকে সমর্থন জানাইতেছিলেন।

আমি বলিলাম, "আপনার এই কথা আমি বিশ্বাস করিনা। তাছাড়া এখনই আমাদের দেশে প্রেস নাই, বই পুস্তক ছাপাইবার কাগজ পত্র নাই। আমাদের অতীত কালের যে সব সাহিত্যিক তাঁহাদের অমর অবদান রাখিয়া গিয়াছেন তাহা উর্দু অক্ষরে রূপান্তরিত করা সরকারের সাধ্য নাই। উর্দু অক্ষর প্রবর্তন করিলে আমাদের ছাত্ররা সেইসব সাহিত্য উপভোগ হইতে বঞ্চিত হইবে।"

মন্ত্রী সাহেব বলিলেন, "সরকার ইচ্ছা করিলে কিনা করিতে পারেন। কামাল পাশা অল্পদিনের মধ্যেই তুরস্কের বর্ণমালা পরিবর্তন করিলেন।"

আমি বলিলাম "কামাল পাশার মত বড় প্রতিভা আমাদের দেশে নাই।"

তিনি বলিলেন, "অপেক্ষা করুন, আমিই এ কাজ করিব। দেখেন বাংলা ভাষায় কোন লাইনো টাইপ মেশিন নাই, টাইপ রাইটার নাই, উর্দু ভাষার আছে। উর্দু বর্ণ প্রবর্তন করিলে আমরা এইসব মেশিনের সাহায্যে পাইব।"

আমি উত্তর করিলাম—"পশ্চিম বঙ্গে তারও পূর্বে লাইনো মেশিন ও টাইপ রাইটার আছে।" ফজলে করিম বলিলেন, "আপনি ভারতের দিকে অত তাকাইতেছেন কেন?"

একে ত ফজলুল রহমান খুব নামকরা ব্যক্তি তার উপর ফজলে করিম ও আলী আহছান তাঁর সমর্থনে এই কথা সেই কথা বলিতেছিলেন। ইহা তর্কের সময় বড়ই অসুবিধাজনক। আমি আলী আহছানকে ধমক দিয়া বলিলাম "আমি কথা বলিতে আসিয়াছি আমার বন্ধু ফজলুর রহমানের সঙ্গে, তোমাদের সঙ্গে নয়।" শুনিয়া আলী আহছান চুপ করিয়া গেল। ফজলে করিম তবু থামিলেন না, আমাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "আপনি মুসলিম সভ্যতায় বিশ্বাস করেন?"

আমি বলিলাম "মুসলিম সভ্যতা বলিয়া কিছু আছে কিনা জানিনা কিন্তু পারশ্য সভ্যতা আছে, আরব সভ্যতা আছে, এমনকি বাংগালী সভ্যতাও আছে।" আমার কথা শুনিয়া ফজলে করিম আর আলী আহছান তাচ্ছিল্যের হাসি হাসিলেন।

ফজলুর রহমান সাহেবকে আমি বলিলাম "আপনি উর্দু বর্ণমালা প্রবর্তন করিতে যাইয়া বাংগালী সন্তানদিগের একটি চক্ষু কানা করিয়া দিতেছেন। রবীন্দ্রনাথ হইতে আধুনিককাল পর্যন্ত পশ্চিমবঙ্গে যে অপূর্ব সাহিত্য তৈরী হইতেছে আমাদের ছেলেমেয়েরা তাহা হইতে বঞ্চিত হইবে।"

তিনি বলিলেন "আমিও তাহাই চাই। পশ্চিমবঙ্গেরসাহিত্য কলায় আকৃষ্ট হইয়া তাহারা আর নিজের দেশের প্রতি বিশ্বাসঘাতক হইতে পারিবে না।"

এইরূপ কথায় বার্তায় অনেক রাত হইয়া গেল। সব কথা এখন ভাল করিয়া মনে করিতে পারিতেছিনা। বিদায়ের সময় আমি ফজলুর রহমান সাহেবকে বলিলাম "আজ হইতে বর্ণমালার ব্যাপারে আমি আপনার বিপক্ষে কাজ করিব।" সৈয়দ আলী আহছান ও ফজলে করিম সাহেব তখনও বসিয়া রহিলেন। ফজলুর রহমান বলিলেন, "আপনাকে একাই তাহা করিতে হইবে। কেহ আপনাকে সমর্থন করিবে না।"

ইহার কিছু দিন পর সৈয়দ আলী আহছান যদিও বাংলায় এম.এ. নয় করাচী বিশ্ববিদ্যালয়ে বাংলা ভাষার প্রধান নিযুক্ত হইলেন।

জসিম উদ্দীন

২১-৭-৭২

পুনশ্চ : এই আলোচনা সভার মওলা মিঞা উপস্থিত ছিলেন তিনি কোন কথাই বলেন নাই।

ইদানীং আমরা

উৎসর্গ

সেলিনা-শাহাদাৎ হোসেন চৌধুরী

চেমনআরা-আবুল বখতিয়ার

আমিনা-হাবিবুর রহমান

কোহিনুর-সুথকে আহমেদ

জাহানআরা-দলিলুর রহমান চৌধুরী

আত্মোপমেষু

বিদ্যা দানের ও গ্রহণের রূপান্তর ধারা

মানুষ মাত্রেরই মনে জাগে কিছু চিরন্তন কৌতূহল বা জিজ্ঞাসা : স্রষ্টা কে; সৃষ্টি কি, জন্ম-জীবন-মৃত্যুরই বা রহস্য কি! এর পরেও প্রশ্ন থাকে জগৎ কেন, জীবন কেন, এর লক্ষ্য কি, প্রয়োজন কি। তা'ছাড়াও আছে এ জগতের, এ জীবনের পরিণাম সম্বন্ধে প্রশ্ন। এ সব জিজ্ঞাসার একটা বুদ্ধিগ্রাহ্য, যুক্তিসিদ্ধ জবাব না পেলে মানুষের জিজ্ঞাসা কিছুতেই নিবৃত্ত হয় না, কৌতূহল মানুষকে তাড়িয়ে বেড়ায়, অস্বস্তিতে ভোগে মানুষ।

অকূল অজ্ঞতাসমুদ্রে জ্ঞানের দ্বীপ খুঁজে বেড়ানোর মতোই অজ্ঞ মানুষ মনোময় তত্ত্ব কল্পনা করে, প্রবোধ পাবার মতো বিশ্বাসের বীজ উপ্ত করে কল্পনা ও বিশ্বাসকে যুক্তি-বুদ্ধি যোগে সঙ্গত ও সমন্বিত করে তত্ত্ব ও তথ্যরূপে নিঃসন্দেহে গ্রহণ করে জিজ্ঞাসার সত্য আবিষ্কারে ও উদ্‌ঘাটনে আত্মপ্রসাদ লাভ করে মানুষ আবহমান কাল থেকেই নিশ্চিন্ত হতে চেয়েছে।

ফলে স্থানান্তরে ও গোত্রান্তরে কল্পনার মাত্রা ও বিশ্বাসের ভিত্তি অনুযায়ী স্রষ্টা, সৃষ্টি, জগৎ, জন্ম, জীবন, মৃত্যু এবং তার পরবর্তী পরিণাম সম্বন্ধে বহু, বিবিধ ও বিচিত্র ভাব-চিন্তা-অনুভব-উপলব্ধি স্থানিক, কালিক ও গৌত্রিক ভাবে প্রকাশ, বিকাশ ও প্রতিষ্ঠা পেয়েছে। এ সব রহস্য-চেতনার বা জিজ্ঞাসার মধ্যে কেবল কৌতূহল ছিল না, জৈব প্রয়োজনে এবং মানস-কাঙক্ষায় চাওয়া-পাওয়ার মধ্যে যে বাধাবিঘ্ন ছিল, অসহায় মানুষ অবচেতন মনেই তাতে কোন মিত্র বা অরিশক্তির নিয়ন্ত্রণ অনুভব করেছে। সর্বপ্রাণবাদ, যাদুশক্তি, ট্যাবু-টোটেম সংস্কার প্রভৃতির উদ্ভব ও বিকাশ ঘটেছে এভাবেই। দার্শনিক চিন্তার উদ্ভবও তাই দেশ-কাল-প্রতিবেশ ও প্রয়োজন সাপেক্ষ। তাছাড়া স্রষ্টা বা নিয়ন্ত্রীশক্তি স্বীকার করলেই তাঁর সঙ্গে স্বতই একটা সম্পর্ক-চেতনা জাগে। আর তার থেকেই জন্মে ভয়-ভরসার অনুভূতি, এবং সে-শক্তির প্রতি আনুগত্য ও দায়িত্ববোধ আর কর্তব্যবুদ্ধিও ক্ষতিভীরু প্রাপ্তিলোভী অসহায় মানুষের মনে না জেগে পারে না। এ দায়িত্ববুদ্ধির ও কর্তব্য-চেতনার প্রসারে ও বিকাশে অবশ্য-মান্য বিশ্বাস-সংস্কার, রীতি-রেওয়াজ, নীতি-আদর্শ, আচার-আচরণ, শাস্ত্র-সমাজ প্রভৃতি হাজারো স্বেচ্ছাবৃত নিয়ম-নিগড় মনের, রুচির, বুদ্ধির, যুক্তির এবং কল্পনার প্রসারে, বাস্তব জীবন-যাত্রার প্রয়োজনে শাস্ত্র-সমাজ-সভ্যতা-সংস্কৃতির ক্রমবিকাশের ধারায় গড়ে উঠেছে।

আমরা জানি, মানুষ মাত্রই সাধারণভাবে পরবুদ্ধি, পরশ্রম, পরজ্ঞান নির্ভর অনুকারক ও অনুসারক মাত্র। জিজ্ঞাসার ক্ষেত্রেও তারা স্ব-স্ব জিজ্ঞাসার উত্তর সন্ধানে সচেষ্ট হয় না, যার জ্ঞান-বুদ্ধি-প্রজ্ঞা সম্বন্ধে তার আস্থা রয়েছে, তেমন মানুষের কাছে গিয়েই সে তার মনে জাগা প্রশ্নের তৈরি উত্তর পেয়ে তুষ্ট থাকে। এরই নাম বিশ্বাস। কল্পনা থেকে সংস্কার আর সংস্কার দৃঢ়মূল হলেই তা বিশ্বাসরূপে পায় প্রতিষ্ঠা।

মানুষের অধ্যাত্মজ্ঞানের উৎস হচ্ছে কল্পনা। যুক্তি ও বুদ্ধি সমর্থিত কল্পনাই অজ্ঞেয়কে জ্ঞেয়রূপে প্রতিভাত করে এবং আস্থাভাজনের মুখে তা উচ্চারিত হলে সাধারণ মানুষ তা অবিসম্বাদিত সত্য বলে মেনে নেয়।

তাই অতীতে বিভিন্ন স্থানে ও কালে বিভিন্ন নরগোষ্ঠীর মধ্যে সৃস্টিতত্ত্ব, জীবনতত্ত্ব আর মৃত্যু পরবর্তী আত্মাতত্ত্ব বিচিত্র শাস্ত্রীয় মর্যাদায় প্রতিষ্ঠা পেয়েছে এবং সে-সব তত্ত্ব স্বীকার করেই এবং সে-সব তত্ত্বজ পরিণাম অঙ্গীকার করেই মানুষ জীবন ও জীবিকানীতি অনুসরণ করেছে ব্যক্তিক ও গোষ্ঠীগত যৌথ জীবন। এবং এ দুটোই করেছে তাদের জগৎ-চেতনা ও জীবন-ভাবনা নিয়ন্ত্রত-শাস্ত্র-সমাজ, নীতি-নিয়ম, পাপ-পুণ্য, লাভ-ক্ষতি সবটাই ওই উদ্ভব ও বিনাশ চেতনাজাত। ক্রমবিকাশের ধারায় বুদ্ধি ও অভিজ্ঞতা যখন বৃদ্ধি পেয়েছে, তখন মানুষ জগৎ সৃষ্টির মূল উপকরণ চিন্তায় হয়েছে তৎপর। তখন কেউ বলেছেন জল, কেউ মনে করেছেন বায়ু, কেউ বা জেনেছেন আগুন, আর কারো চোখে মাটিই মূল উপাদান। এ হচ্ছে জড়জগতের বাহ্যস্বরূপ সন্ধানীর অনুমান। আর যাঁরা তাত্ত্বিক ও আধ্যাত্মিক-স্বরূপ সন্ধিৎসু, তাঁদের দিয়েই হয়েছে অধিবিদ্যার ও অধ্যাত্মবিদ্যার উন্মেষ ও বিকাশ। বাহন হয়েছে যুক্তিবিদ্যা, আর উত্তরণ ঘটেছে দর্শনে। স্রষ্টার স্বরূপ জিজ্ঞাসা, স্রষ্টা-সৃষ্টির সম্পর্কতত্ত্ব প্রভৃতিই তাই ছিল গোড়ার দিককার জানার ও জানানোর বিষয়।

যেহেতু অধিবিদ্যা ও অধ্যাত্মবিদ্যা দুটোই কল্পনার, বুদ্ধির ও যুক্তির আপাত সঙ্গত ও সমন্বিত প্রয়াসের প্রসূন, সেজন্যে এ বিদ্যা গুরু থেকেই গ্রহণ করতে হয়। যেহেতু এতে কোন জড় বাস্তব বাহ্য প্রমাণ প্রয়োগ সম্ভব নয়, সেহেতু গুরুমুখে শোনা তত্ত্ব ও তথ্যই চরম ও পরম বলে মানতেই হত। এ বিদ্যার নাম পরাবিদ্যা বা পরাজ্ঞান তথা ব্রহ্মবিদ্যা। যেহেতু এ একান্তভাবেই গুরুর মনীষা ও মনস্বিতার ফসল, সেহেতু এ জ্ঞান বাস্তব শাস্ত্রিক সামাজিক জীবনে, সুদুর্লভ অমূল্য অনন্য জ্ঞান। ফলে গুরুও 'লাখে না মিলএ এক'। তাই সেবায়, সাধনায়, সৌজন্যে গুরুকে তুষ্ট করেই এ পরাবিদ্যা বা ব্রহ্মজ্ঞান লাভ সম্ভব। এভাবে সমাজে গুণ-মান-মাহাত্ম্য সম্পন্ন দুর্লভ ব্রহ্মজ্ঞানী গুরুশ্রেণী সমাজের মাথা হয়ে পৃথিবীর সর্বত্র বিরাজ করতে থাকে। গুরু-উস্তাদ, মোল্লা-পুরোহিত, শ্রমণ-শ্রাবক-ভিক্ষু-মুনি-ঋষি শ্রেণীর পরান্ন ও পরশ্রমজীবী নিশ্চিন্ত-নিষ্কর্মা জ্ঞান-প্রজ্ঞাধারী সিদ্ধ-সাধক মানুষের সমাজে প্রতিষ্ঠা ও প্রতিপত্তি ঘটে এভাবেই। এ শ্রেণী-সুবাদেই পরবর্তীকালে সাধু-সন্ন্যাসী-ব্রহ্মচারী-যোগী-ফকির-দরবেশ শ্রেণীরও মান-মর্যাদা ও প্রয়োজন অবিচল ও চিরন্তন হয়ে থেকেছে।

গুরু-শিষ্য, উস্তাদ-সাগরিদ, পূজ্য-পূজক, খাদেম-মখদুম, সেবিত-সেবক প্রভু-দাস সম্পর্ক গড়ে উঠেছে, শেখা-শেখা-শেখানোর বিদ্যা সুদুর্লভ ও ব্যক্তিগত সাধনায় অর্জিতব্য বলেই। সমাজে ওই জ্ঞান-প্রজ্ঞাবান সিদ্ধ সাধকদের সামাজিক ও বৈষয়িক ধন-মান-যশ-বিত্ত-বেসাত-প্রতিপত্তি বংশানুক্রমে চিরস্থায়ী করে রাখবার জন্যে এ বিদ্যায় অধিকারী-অনধিকারী ভেদও তাঁরাই সৃষ্টি করেন। বিদ্যাগুপ্তির ও মন্ত্রগুপ্তির কারণ এ-ই। তারপর জনসংখ্যাবৃদ্ধির ফলে, হাতিয়ারের উৎকর্ষে, জীবন-চেতনার প্রসারে, কৌতূহলী উদ্যোগী মানুষের পরীক্ষা-নিরীক্ষার ফলে জীবিকার প্রসারের ও জীবনোপকরণের চাহিদা বৃদ্ধির দরুন শেখার ও শেখানোর বিষয় ক্রমেই বহু, বিবিধ ও বিচিত্র হয়ে ওঠে। তখন আর পরাবিদ্যা, অমৃতত্ত্ব, মোক্ষবাঞ্ছা ও স্বর্গসুখই কেবল মানুষের ঐকান্তিক চাওয়া-পাওয়ার বিষয় রইল না। ভূমার থেকে মানব-দৃষ্টি ক্রমে ভূমির দিকে নিবদ্ধ হচ্ছিল, আকাশই কেবল আর আকর্ষণের ও আকাঙক্ষা পূর্তির অবলম্বন হয়ে থাকল না। দেবতার ও দিব্যতার পাশে এবার মাটি ও মানুষ, প্রিয়া আর পৃথিবীও গুরুত্ব পেতে থাকে। যেহেতু গোত্রীয় জীবন-পদ্ধতি দীর্ঘকাল স্থায়ী হয়েছিল, বিদ্যাও ছিল নগণ্য সংখ্যক লোকের আয়ত্তে, সেহেতু গুরু-ওস্তাদ-শিক্ষকের দুর্লভ্যতাজাত গুরুত্ব ও

সামাজিক মর্যাদা ছিল প্রায় দেবতুল্য। শিক্ষাদান পেশা হিসেবে স্বীকৃত ছিল না বলে বিদ্যাদান ও গ্রহণ ছিল অনুগ্রহের ও অনুগৃহীতের বিষয়। নিতান্ত কৃপার দান।

তাই গুরুগৃহে থেকে বিদ্যা তিলে তিলে অর্জন করতে হত সেবার, শ্রমের, ভিক্ষার্জিত অন্নের এবং গুরুগৃহে ভৃত্যের কাজের বিনিময়ে। গুরুর গ্রাসাচ্ছাদন শিষ্যনির্ভর ছিল বলেই গুরুও শিষ্যকে সহজে ও স্বল্প সময়ে বিদ্যা দান করতেন না। শিষ্যের প্রায় অর্ধজীবন অতিবাহিত হত গুরুগৃহে জ্ঞানার্জনে। বিদ্যা দানে-গ্রহণে এমনি মন্থরতা ছিল বলেই ব্যাকরণ, অলঙ্কার, ন্যায়, স্মৃতি, গণিত প্রভৃতি যে-কোন বিষয় শিখতে শিষ্যের লাগত বারো বছরের সাধনা।

আদিতে যে-বিদ্যা ছিল পরমার্থ বিষয়ক তা ক্রমে পার্থিব ও বৈষয়িক বিদ্যায় হল রূপান্তরিত। এ ক্ষেত্রে বিদ্যা বিনয় দান করবে, জ্ঞান ব্রহ্মাস্বাদ দেবে এমন আসা করা নিশ্চয়ই বাতুলতা। পরাবিদ্যার লক্ষ্য' ছিল পরমার্থজ্ঞান অর্জন, জীবন-চেতনার উৎকর্ষ সাধন এবং সমাজ সদস্য হিসেবে প্রয়োজনীয় গুণের অনুশীলন। এ ধারণা বলেই আজো আমরা বলি যে, বিদ্যা বিনয়ী করে, ন্যায়-অন্যায় ধারণা দেয়, বিবেকবান করে, বিদ্বান, সুজন জ্ঞানী গুণবান ও সদাচারী হয়,হয় দায়িত্বশীল ও কর্তব্য সচেতন।

কিন্তু যখন পরাবিদ্যা থেকে ঐহিক বা পার্থিববিদ্যা গুরুত্ব বেশি পেতে থাকে এবং বিদ্যালয়ও গুরুগৃহ থেকে যৌথ বারোয়ারী প্রতিষ্ঠানে স্থিতি পেল তখনো গুরু-উস্তাদ বিদ্যাগুপ্তি-বা মন্ত্রগুপ্তি কালের মান-যশ-ভক্তি-শ্রদ্ধা ও মর্যাদা দাবি করতে থাকেন। একদিন যা ছিল ভক্তের বা জিজ্ঞাসুর প্রতি কৃপার দান, তা পয়সায় প্রাপ্য হওয়ার পর গুরু-উস্তাদের দাবি যৌক্তিকতা হারায়।

হাতিয়ার প্রভৃতির উৎকর্ষে ও নতুনত্বে যদিও জীবন-চেতনায় ও জীবিকা-বিন্যাসে কালান্তর ঘটে, সে-অনুসারে সমাজের নিয়ম-নীতির পরিবর্তন ঘটে, তবু বিশ্বাস-সংস্কার নিয়ন্ত্রিত মানস-জীবনে ভাব-চিন্তার ক্ষেত্রে সব সময়ে সমকালীনতা থাকে না, তাই গুরু-উস্তাদের ঠাঁই মা-বাপের পাশেই সমমর্যাদায় ও গুরুত্বে আজো রয়ে গেল।

আজ বিদ্যা মানে কেবল ঐহিক ও বৈষয়িক বিদ্যাই বোঝায়। মানব মনীষার বিচিত্র আবিষ্কারে উদ্ভাবনে জীবনে সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য-সন্তোষ বৃদ্ধির লক্ষ্যে হয়েছে নানা বিদ্যার অনুশীলন, নানা ব্যবস্থার উদ্ভাবন, নানা চাহিদার সৃষ্টি ও বিস্তার। এর দরুন বিদ্যালয়েও বিচিত্র বিদ্যা শেখানোর ব্যবস্থা করতে হয়েছে, হচ্ছে, হবে। যেমন সাহিত্য, গণিত, ভূগোল, ইতিহাস, দর্শন, মনোবিজ্ঞান, সমাজবিজ্ঞান, চিত্রকলা, সঙ্গীত প্রভৃতিও আজ আর ঋজু বিষয় নয়—নানা সূক্ষ্ম শাখা-প্রশাখায় তা' নিত্য প্রসারশীল, তেমনি পদার্থবিদ্যা, রসায়ন প্রভৃতিও নানা সূক্ষ্ম শাখায় প্রশাখায় বিকাশমান, রসায়নই অর্গেনিক, ইনর্গেনিক, ফলিত,জৈব, জৈববীজাণু রসায়ন, ভেষজ ও মৃত্তিকা বিজ্ঞান অবধি আত্মবিস্তারে বিপুল। এমনি করে জীববিজ্ঞান, নৃবিজ্ঞান কিংবা বাণিজ্যবিজ্ঞানও আজ হিসাববিজ্ঞানে, বিপণনবিজ্ঞানে, ব্যবস্থাপনা বিজ্ঞানে পুজিবিনিয়োগ বিজ্ঞানে হচ্ছে প্রসারিত। এগুলো ছাড়াও চিকিৎসা, কৃষি, সমুদ্র,খনি প্রযুক্তি, প্রকৌশল, কৃৎকৌশল, স্থাপত্য, গার্হস্থ্যবিজ্ঞান, সুচিবিজ্ঞান প্রভৃতি বিদ্যাও বিচিত্র বিকাশে বিস্ময় উদ্রেক করে। এসব ঐহিক, পার্থিব, বৈষয়িক ও আর্থিক জীবন-লগ্ন এবং একালে বিদ্যাও পণ্য। বিদ্যালয়ও তাই বিপণী। অর্থের বিনিময়েই অন্যসব বেচা-কেনার সামগ্রীর মতো বিদ্যাও হয় বেচা-কেনা। নীতিটা হচ্ছে 'ফেল কড়ি মাখ তেল'। এর পরেও গুরু-উস্তাদ শিক্ষার্থীর ভক্তি-শ্রদ্ধা ফাও হিসেবেও নয়—একেবারে মৌরুসী ন্যায্য প্রাপ্য হিসেবে দাবি করেন কি করে!

যে-দেশে পরাশক্তি-নিয়ন্ত্রিত মুৎসুদ্দী-সরকার শিক্ষায় মানুষের জন্মগত অধিকার স্বীকার করে না, অন্তত নানা অজুহাতে মৌলমানবাধিকার থেকে গণমানবকে বঞ্চিত রাখে, যেখানে মানুষের স্বাধীন-চিন্তাবোধ কল্পে মানুষকে অতীতমুখী এবং শাস্ত্রানুগত রাখার সুপরিকল্পিত সরকারি প্রয়াস চলে, যে-দেশে কালের দাবি অনুগ যুক্তিবাদে, সামাজিক নীতিতত্ত্বে (cthics) আনুগত্য কিংবা আত্মমর্যাদাবোধের প্রতীক সাংস্কৃতিক নৈতিকতা (morality)) নেই, অনুশীলনের গরজবোধ পর্যন্ত নেই, সে-দেশে আমাদের বাস। তাই এদেশে সন্তান মনুষ্যত্বে মানুষ হওয়া নয়, মানুষ হওয়া মানে অর্থ অর্জনের সমর্থ ডাক্তার-ইঞ্জিনিয়ার হওয়া। Ethics-এর ও morality-র গুরুত্ব উপলব্ধির জন্যে যে-শিক্ষা প্রয়োজন তা হচ্ছে মানববিদ্যা বা Humaanties. সাহিত্য, দর্শন, ইতিহাস, সমাজে-বিজ্ঞান এবং আইন ও নীতিশাস্ত্র। এসব এ যুগে অর্থকর নয় বলে নিতান্তই অবহেলিত, অনন্যোপায় মন্দ-মাঝারি শিক্ষার্থীর পাঠ্যমাত্র। অথচ পরিবর্তিত পরিবেশে মূল্যবোধের কালিক রূপান্তর সম্ভব হত এসব বিদ্যার নিষ্ঠ চর্চায়।

আজ-যে দেশে-সমাজে শ্রেয়োবোধের ও নীতিনিষ্ঠার বা নৈতিক-চেতনার বা মুল্যবোধের ঐকান্তিক অভাব সর্বত্র দৃশ্যমান, তার কারণ এ-ই। বলা বাহুল্য শাস্ত্রানুগত্যে বা শাস্ত্রশিক্ষায় নীতিনিষ্ঠা আসে না। ন্যায়বোধ, আত্মসম্মানচেতনা ও নিয়ম-নীতির প্রতি আনুগত্যই এ নীতিনিষ্ঠার ও নৈতিকতার জনক। শাস্ত্রানুগত্যে মন-মনন কেবল যান্ত্রিকতাদুষ্ট হয় মাত্র। যে-কোন বিদ্যা জ্ঞান তথা শক্তি বা নৈপুণ্য দান করে। কিন্তু জ্ঞান মাত্রই বন্ধ্যা, যদি না তা তাৎপর্য সচেতন করে, অর্থাৎ জ্ঞান প্রজ্ঞার ও শ্রেয়োচেতনার স্তরে উন্নীত হলেই তা সার্থক হয়। যে-বিদ্যা বা জ্ঞান মননে লালন পায় না, মনীষায় ও মনস্বিতার যুক্ত হয় না, তা আবিষ্কারে উদ্ভাবনে, বিচারে বিশ্লেষণে জীবন ও সমাজ সম্পৃক্ত হয়ে বহুজনহিতে বহুজনসুখে নিয়োজিত হবার যোগ্যতা রাখে না। বিদ্যা অর্জনের লক্ষ্য অর্থোপার্জন হলেও তার সঙ্গে ব্যক্তিক ও সামাজিক জীবনের একটা আদর্শও থাকা আবশ্যিক। পেটের ক্ষুধা মেটানো প্রাণী হিসেবে মানুষের প্রাথমিক লক্ষ্য হলেও, মানুষের দেহ-মনের অশেষ সুপ্ত শক্তির বিকাশ সাধনই মানুষের চেতন-অবচেতন লক্ষ্য, এ লক্ষ্যে উত্তরণের অব্যাহত প্রয়াসের ফলেই মানুষ শাস্ত্র, সমাজ, সরকার, রাষ্ট্র তৈরি করেছে, আচারিক ও মানসিক জীবনের উৎকর্ষে মানুষ অভাবিতকে বাস্তব, অসম্ভবকে সম্ভব, অজানাকে জ্ঞাত করেছে। অন্য প্রাণী চলে সহজাত স্বভাবে, মানুষ প্রকৃতির নিয়ন্ত্রণ অস্বীকার করে, প্রকৃতিকে ও প্রতিবেশকে দাস ও বশ করে রচনা করেছে কৃত্রিম জীবন-পদ্ধতি, ভাষা, সমাজ, রাষ্ট্র, সভ্যতা-সংস্কৃতি। কাজেই মানুষের লক্ষ্য কেবল জীবিকা-সৌকর্যে নিবদ্ধ থাকতে পারে না, তার লক্ষ্য হবে মানবশক্তির চরম বিকাশ আর মানব অনুভবের, মনীষার ও মনস্বিতার পরম অভিব্যক্তি। মানব মহিমার, মনুষ্যত্বের ও মানবতার পরিপূর্ণ রূপে উত্তরণই হবে তার লক্ষ্য।

বৃত্তিক শিক্ষার সঙ্গে, জ্ঞান-বিজ্ঞান চর্চার সঙ্গে চিত্তলোকের, চেতনা-জগতের, মানবিক বোধ-বুদ্ধি-বিবেকের অনুশীলনের ব্যবস্থা থাকা দরকার। এ অনুশীলনে সাহিত্য-দর্শন-ইতিহাস-সমাজতত্ত্ব-মনোবিজ্ঞান-আইন ও নীতিতত্ত্ব সহায়ক হবে বলেই মানি।

এমনি কোন ব্যবস্থা হলেই কেবল সমাজে সৎ-অসতের, সুনীতি-দুর্নীতির, ন্যায়-অন্যায়ের, ভালো-মন্দ-মাঝারির, ইতর-মহতের ভারসাম্য বজায় থাকবে। এর জন্যে প্রয়োজন ব্যক্তিক জীবনে আত্মমর্যাদাবোধের, দায়িত্ববোধের ও কর্তব্যবুদ্ধির অনুশীলন রাখা, সামাজিক জীবনে সৌজন্যের, শালীনতার ও পারস্পরিক আস্থার অঙ্গীকারে নিষ্ঠ থাকা ও কেবল নিরাপদে বাঁচতে দেয়ার নীতির অনুগত থাকা মাত্র। মানুষের পারিবারিক ও সামাজিক সম্পর্কে সমস্বার্থে

সহিষ্ণুতার, সহযোগিতার ও সহাবস্তানের পরিবেশ রক্ষার প্রয়োজনে শিক্ষা ব্যবস্থায় এথিকস্ ও মরালিটি শেখানোর ব্যবস্থা রাখা আবশ্যিক।

কাজেই আমদের বিদ্যালয়ে সমকালীন হাওয়ার স্বীকৃতি থাকা বাঞ্ছনীয়। পুরোনো অকেজো রীতিতে গুরু-উস্তাদের প্রাপ্য ভক্তি-শ্রদ্ধায় দাবি পরিহার করে, বিদ্যালয়ে শিক্ষক-শিক্ষার্থীর, ভক্ত-ভগবানের বা পিতা-সন্তানের পবিত্র সম্পর্কের কথা বিস্মৃত হয়ে, শিক্ষাঙ্গনেরও পবিত্রতা অস্বীকার করে জীবন-জীবিকার কল-কারখানার আর দশটি প্রতিষ্ঠানের মতো ন্যায়ভিত্তিক যুক্তিগ্রাহ্য নিয়মনীতির অনুগত হয়ে শিক্ষক-শিক্ষার্থী এযুগে শান্তিপূর্ণ সহাবস্থান করতে পারেন, বেচা-কেনার বাজারে এর অতিরিক্ত কিছু প্রত্যাশা করা বাঞ্ছনীয় নয়—যুক্তিসঙ্গত নয় বলেই। শিক্ষক অতিরিক্ত সম্মান-শ্রদ্ধা পাবেন বিদ্বান বলে, কর্তব্যপরায়ণ বলে, ন্যায়নিষ্ঠ সজ্জন বলে। শিক্ষার্থীও পাবে স্নেহ তার বুদ্ধি, বিদ্যানুরাগ ও সৌজন্যের দরুন। এ হবে ব্যক্তিত্বের আর্কষণজাত সম্পর্ক।

জীবনের শারীর দিক অবশ্যই গুরুত্বপূর্ণ, কিন্তু মানুষের সব চাওয়া-পাওয়ার মধ্যে একটা দার্শনিক চিন্তা-চেতনা না থাকলে, একটা আদর্শিক প্রেরণা ও লক্ষ্য না থাকলে মানুষের যৌথ জীবনে সভ্যতা-সংস্কৃতির বিকাশ হয় না। সৌজন্যই সংস্কৃতির, মানবতার ও মনুষ্যত্বের শেষ কথা। সে-সৌজন্য অকৃতিম হলে পারিবারিক, সামাজিক ও রাষ্ট্রিক জীবনে মানুষে কাম্য ও প্রত্যাশিত কোন গুণেরই অভাব হবার কথা নয়। অর্থবিত্ত অর্জনের বিদ্যার সঙ্গে সৌজন্য অর্জনের বিদ্যার যোগ তাই জরুরী।

বিদ্যার ক্রমবিকাশ ও নারীশিক্ষা

যা জানা হয় তা-ই জ্ঞান, যা জানতে হয়, তা-ই বিদ্যা। আর যা শেখা বা শেখানো হয়, তা-ই শিক্ষা। যে-জ্ঞান তাৎপর্য বিরহী, তা বন্ধ্যা। জ্ঞানজ বুদ্ধিই প্রজ্ঞা, প্রয়োগেই বিদ্যার সার্থকতা। শিক্ষা সার্থক হয় জীবনযাত্রায় তার রূপায়ণে। এবং সর্ববিদ্যাই জ্ঞান যা অভিজ্ঞতা ও উপলব্ধি, অনুভব ও অনুমান, চিন্তা ও চেতনা আর আবিষ্কার ও উদ্ভাবন প্রসূত। আদিকালে যখন বিপুল ভুবনে মানুষ ছিল ভবঘুরে, সংখ্যায় ছিল কম, ফলমূল-মৃগয়া নির্ভর ছিল মানুষ; শ্বাপদ আর ব্যাধি-জরা-মৃত্যুর অবাধ শিকার ছিল অজ্ঞ অসহায় মানুষ, তখনো তাদের মনে জিজ্ঞাসা জাগত : সৃষ্টি কি? স্রষ্টা কে? জগৎ কি? জীবন কি? জন্ম-জীবন-মৃত্যুর কারণইবা কি, প্রয়োজনই বা কি, তাৎপর্যই বা কি সার্থকতাই বা কোথায়?—এসব প্রশ্নের উত্তর সন্ধান না করে স্বস্তি পায়নি মানুষ। আমরা জানি যেখানেই অজ্ঞতা, সেখানেই কল্পনার জন্ম, যেখানেই যুক্তির অভাব বিশ্বাসের জন্ম সেখানেই। তাই সেদিনকার অজ্ঞ অসহায় মানুষের হয়ে তাদের মধ্যে যে বা যারা বুদ্ধিমান ও কল্পনাপ্রবণ, তারা আপাত বুদ্ধি বা যুক্তিগ্রাহ্য উত্তর তৈরি করেছিল প্রশ্নগুলোর। এ জিজ্ঞাসাজাত তত্ত্ববিদ্যার নাম চিল পরাবিদ্যা। এ দিয়েই শুরু হয়েছিল আদি-কালের আদিম মানুষের গূঢ় তত্ত্ববিদ্যার চর্চা।

ক্রমে জনসংখ্যা বৃদ্ধি পেল, সে-সঙ্গে বাড়ল বুদ্ধিমান লোকের সংখ্যাও, বিকাশ হল যুক্তি-বুদ্ধির ও জিজ্ঞাসার, বিস্তার ঘটল মানুষের আকাঙক্ষারও। চাওয়া-পাওয়ার প্রয়োজনে

উৎকর্ষ ও প্রসার ঘটল হাতিয়ারেরও। সবটা মিলে স্থানে স্থানে কোন কোন গোত্রের বা গোষ্ঠীর মনের, মননের ও জীবনযাত্রার উন্নতি হল অনেক। তখন কেবল কৌতূহলে, শুধু রহস্য জিজ্ঞাসায় সীমিত রইল না মানুষের ব্যবহারিক ও মানসজীবনের প্রয়োজন। তখন মর্ত্যজীবনের সুখ ও আনন্দ তাকে করেছে অমৃত সন্ধানী। আরো পরে জনসংখ্যাবৃদ্ধির ফলে জীবিকাক্ষেত্রে যখন প্রতিযোগিতা প্রতিদ্বন্দ্বিতা আর কাড়াকাড়ি মারামারি শুরু হয়েছে, তখন মানুষের কাম্য হয়েছে মোক্ষ। আরো পরে পার্থিব ভোগে-সুখে-আনন্দে বঞ্চিত মানুষের মনে আত্মপ্রবোধচ্ছলে জেগেছে স্বর্গসুখের কাঙক্ষা।

আজকের জ্ঞান-বুদ্ধি-প্রজ্ঞাবান মানুষকে অমৃতের, মোক্ষের ও স্বর্গের লোভ দেখিয়ে আশ্বস্ত করা যায় না, তারা বাস্তব জীবনেই অশন-বসন-নিবাস-নিদানের নিশ্চয়তাজাত স্বস্তি-সুখ চায়। এসবে স্বাধিকার প্রতিষ্ঠার জন্যে তারা দুনিয়ার সর্বত্রই নেমেছে সংগ্রামে। শোষণ-পীড়ন-বঞ্চনার প্রতিবাদে প্রতিরোধে প্রতিকারে আজ বিশ্বের শোষিত জনতা মুখর সংগ্রামী।

২

মানুষ প্রাণী হলেও তার দু'টো হাতের বদৌলত সে অন্য সব প্রাণী থেকে জন্ম সূত্রেই পৃথক এবং সে-কারণেই সবার চেয়ে শ্রেষ্ঠ। এ আঙ্গিক সৌকর্য মানুষকে করেছে আত্মপ্রত্যয়ী এবং তাকে অনুপ্রাণীত করেছে প্রকৃতিকে জয় করে, দাস করে, বশ করে জীবন রচনার ও উপভোগের পরিবেশ সৃষ্টি করতে। এমনি করে সে রোদ-বৃষ্টি থেকে আত্মরক্ষা করেছে ঘর তৈরি করে, দু'হাতের প্রয়োগে সে আগুন আবিষ্কার করেছে, সেঁকে পুড়িয়ে রেঁধে আহার্য তৈরি করতে শিখেছে এবং সর্বোপরি দলবদ্ধ হয়ে একযোগে যৌথভাবে যে-কোন অসাধ্য কর্ম সাধ্যায়ত্ত করতে জেনেছে। তাই মানুষের জীবন প্রায় গোড়া থেকেই যৌথ জীবন—গোত্রীয় বা গোষ্ঠীগত জীবন। এ জীবনে পারস্পরিক আচরণ নীতি ছিল আবশিক। কারণ এক সঙ্গে বাস করতে হলে অধিকার-অনধিকারের, দায়িত্ব-কর্তব্যের, সম্পর্কের ও আচরণের কিছু নিয়মনীতি মানতেই হয়। নইলে সমস্বার্থে স্বাধিকারে সহিষ্ণুতায় সহযোগিতায় সহাবস্থান করা সম্ভব হয় না। এরই ক্রমবিকাশে গড়ে উঠেছে শাস্ত্র, সমাজ ও সরকার। সভ্যতা-সংস্কৃতির বিকাশ ঘটেছে এভাবেই।

মৃগয়ায়ও প্রয়োজন হত একাধিক লোকের সহযোগিতা, অতএব মৃগয়াজীবী মানুষ থেকেই হাতিয়ারের উদ্ভব ও বিকাশ শুরু হয়। আগেই বলেছি, আদি মানবের প্রাথমিক কৌতূহল যখন স্রষ্টা, জগৎ ও জীবন সম্পর্কে নিবৃত্ত হল, যখন জনসংখ্যা বৃদ্ধি পেল, যখন খাদ্য সংগ্রহ সহজ রইল না, যখন মানুষের আত্ম শক্তি-সামর্থ্যে বিশ্বাস বুদ্ধি পেতে থাকল, জ্ঞান-বুদ্ধি অভিজ্ঞতা বৃদ্ধির সঙ্গে আকাঙক্ষার এবং সুখস্বপ্নেরও বিস্তার ঘটল, তখন মানুষ ঐহিক জীবনের সুখ, স্বস্তি, আনন্দ, আরাম আর নিরাঁপত্তার দিকেই মনোযোগ দিল।

এমনি করেই সে রোগের প্রতিষেধক, জীবিকার নতুন নতুন ক্ষেত্র সুখের ও উপভোগের নানা উপকরণ, নিরাপত্তার নানা ব্যবস্থা উদ্ভাবন ও আবিষ্কার করে থাকে। তখন থেকেই শাস্ত্র ও পারত্রিক মোক্ষ সাধনা এবং ঐহিক জীবন-প্রয়াস আলাদা হতে থাকে। এভাবে শাস্ত্র পরমাত্মা বা ঈশ্বর বিষয়ক তত্ত্ববিদ্যা বা 'অধ্যাত্মবিদ্যা' নামে এবং ঐহিক বা পার্থিব বাস্তব জীবনে প্রয়োজনীয় জ্ঞান-বিদ্যা-কৌশল অর্জনের নাম 'মানববিদ্যা' নামে চিহ্নিত বা অভিহিত হল।

পরাবিদ্যা বা অধ্যাত্মবিদ্যা তথা শাস্ত্র ও তত্ত্ব অর্জন করতে হত গুরুগৃহে থেকে গুরুর কৃপায়। গোড়ার দিকে গুরু ছিলেন মুনি ঋষিরা। আর শিক্ষার্থীরা দাসের আনুগত্য এবং

গৃহভৃত্যের দায়িত্ব নিয়েই গুরুর থেকে বহু বছরের সেবায় ও সাধনায় বিদ্যা লাভ করত। সে-যুগে এ কালের বিদ্যালয়ের মতো বিদ্যা বিপণী ছিল না। তাই গুরু রাজি না হলে বিদ্যালাভের অন্য কোন উপায় থাকত না। বিদ্যা ও মন্ত্রগুপ্তর সে-কালে তাই গুরু ছিল অবশ্য মান্য পিতৃতুল্য ও অবশ্য পূজনীয়। বিদ্যা দানের ও গ্রহণের প্রথা-পদ্ধতি, নিয়ম-নীতি বদলালেও গুরুর সে-দাবি আজো রয়ে গেছে অসঙ্গত ভাবেই। তাই আজকাল শিক্ষক-শিক্ষার্থীতে ঠোকাঠুকি লেগেই থাকে নানা কারণে। গুরু-শিষ্য সম্পর্কের সে-দেশ নেই, সে-কাল নেই, সে-পরিবেশ ও প্রয়োজনও নেই, তাই কালান্তরে জনান্তরে সে-দাবি শিক্ষককে বৃথা অভিমানে অনধিকার চর্চায় প্রণোদনা দেয় মাত্র।

আজকের দিনে শিক্ষক-শিক্ষার্থীর সম্পর্ক পারস্পরিক দায়িত্বের, কর্তব্যের, অধিকারের ও সৌজন্যের ভিত্তিতেই গড়ে ওঠা আবশ্যিক।

৩

মানববিদ্যা বা ঐহিক বিদ্যা এখন কেবল সাহিত্য-দর্শন-ইতিহাস-ভূগোল-পদার্থ-রসায়ন-গণিত-চিকিৎসা বিষয়ে সীমিত নেই, বিজ্ঞান যেমন বিশুদ্ধ বিজ্ঞানে ও জীববিজ্ঞানে এবং অনেক শাখা-প্রশাখায় বিভক্ত, তেমনি সাধারণ মানববিদ্যাও আজ আর সাহিত্য-দর্শন-অর্থ-রাষ্ট্র-সমাজ বিজ্ঞানে নিবদ্ধ নেই। যন্ত্রের ও কৃৎকৌশলের উৎকর্ষের ফলে জীবন-জীবিকা ক্ষেত্রে ও জীবনযাত্রা পদ্ধতিতে যে পরিবর্তন ও বৈচিত্র্য এসেছে, তারই অনুষঙ্গ হিসেবে আজ সমাজকল্যাণ, গার্হস্থ্যবিজ্ঞান, বয়নবিজ্ঞান, রন্ধনবিজ্ঞান, বিপণনবিজ্ঞান, ব্যবস্থাপনাবিজ্ঞান ও বিভিন্ন প্রকারের প্রকৌশল ও কৃৎকৌশল বিজ্ঞান প্রভৃতি শতোর্ধ্ব রকমারি বিষয়ক বিদ্যা আজকাল স্কুলে-কলেজে-বিশ্ববিদ্যালয়ে-ইনস্টিটুট্যটে দানের ও গ্রহণের বা বিক্রয়ের ও ক্রয়ের ব্যবস্থা রয়েছে।

বিদ্যার এমন বিচিত্র ও বহুধা বিকাশ বিস্তার এ শতকের য়ুরোপেরই অবদান। সেখানে এবং আমাদের এ অঞ্চলেও বিদ্যার দ্রুত প্রসার ঘটে এ শতকেই। সাক্ষর ও গণশিক্ষার শুরুও এ শতকেই। য়ুরোপে সাক্ষরতা ও সর্বজনীন শিক্ষা রাষ্ট্রের প্রাশাসনিক দায়িত্বরূপে স্বীকৃত ও গৃহীত হলেও, আমাদের দেশের খুব কম লোকই সাক্ষর এবং সর্বজনীন শিক্ষা এখনো স্বপ্ন।

৪

মানব সভ্যতার উদ্ভব ও বিকাশ ঘটেছে মুখ্যত পুরুষ-প্রধান সমাজে। তাই এ সমাজের মানুষের ভাব-চিন্তা-কর্ম-আচরণ চিত্রগুলি নিয়োজিত হয়েছে পুরুষের বাঞ্ছাপূর্তি লক্ষ্যে। তার ভোগ-উপভোগের সামগ্রীরূপে বিবেচিত হয়েছে নারী। এককালে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে ও গোত্রে দাসের, নারীর ও গৃহপোষ্য পশু-পাখির মধ্যে মূল্যগত পার্থক্য ছিল সামান্যই। পৃথিবীর উচ্চবর্ণের ও বিত্তের পুরুষেরা জানত পৃথিবীটা তাদেরই ভোগ উপভোগের জন্যে সৃষ্ট, দুনিয়ার আর সব নারী-পুরুষ, পশুপাখি,তরুলতা তাদেরই প্রয়োজনে,তাদেরই প্রয়োজনীয় সেবা ও সামগ্রী যোগান দেবার জন্যেই নিয়েছে জন্ম।

এমন দেশও ছিল, কালও ছিল, যেখানে যখন দাসের ও নারীর আত্মাই স্বীকার করা হত না। যদিও জায়া-জননী-ভগ্নী ও কন্যা রূপে নারীমাত্রই চিরকাল পুরুষের স্বজন ও প্রিয়, তবু নারীর ও নারীত্বের প্রতি পুরুষের শ্রদ্ধা সহজে জাগেনি, এমনকি সবদেশে নারীদেবতা স্বীকৃত থাকলেও ঘরে-বাইরে নারী ছিল করুণার পাত্রী। আমাদের দেশে গাঁয়ের অশিক্ষিতাদের বাপের

বাড়ি আছে, শ্বশুরবাড়ি আছে, কিন্তু নিজের বাড়ি নেই, অর্থাৎ স্বামীর বাড়িকে সামাজিক ভাষায় নিজের বাড়ি বলে উচ্চারণ করা যায় না,—আজো শিক্ষিতা নারীও পূরো আত্মপ্রত্যয়ী হতে পারেনি, তারা প্রথমে পিতার, মধ্যে পতির এবং শেষে সন্তানের অভিভাবকত্ব যেন সহজাত বৃত্তিবশেই স্বীকার করে নিশ্চিন্ত হয়।

সেকালের মানুষের ধারণায় নারীর জন্মই হয় কেবল জায়া ও জননী হওয়ার জন্যেই। এর বাইরে কোথাও কিছুতেই নারীর অধিকার ও অস্তিত্ব যেন স্বীকৃত ছিল না, রাজ্ঞী ও বিদুষীরূপে পৃথিবীর কোথাও কোথাও ক্বচিৎ কদাচিৎ কিছু ব্যতিক্রম থাকলেও সাধারণভাবে একালের আগে বিশ্বের কোথাও নারী পুরুষের সমান অধিকার পায়নি, পারিবারিক জীবনে পোষ্য বলে স্বাধীনতা ছিল না তার। এমনখি বর্মা প্রভৃতি দেশে মাতৃপ্রধান সমাজের রেশ কিছু প্রথা-পদ্ধতিতে থেকে গেলেও সেখানেও জীবনের সর্বক্ষেত্রে পুরুষ প্রাধান্য প্রকট।

পৃথিবীর যাবতীয় ভাষা পুরুষ প্রাধান্যের সাক্ষ্য, নারীবাচক শব্দ তৈরি করতে হয় বর্ণযোগে ধ্বনি দীর্ঘ করে।

নারী এমন অবহেলিত ছিল বলেই উনিশ শতকের শেষ পাদের আগে শিক্ষায় নারীর অধিকার ও প্রয়োজনীয়তা সামাজিকভাবে স্বীকৃত ছিল না। এর আগে কোন পরিবারে বাপ-ভাই-স্বামীর ব্যক্তিগত আগ্রহে ও উদ্যেগে কোন কোন নারী সামান্য ও সাধারণ শিক্ষা পেত বটে, কিন্তু তা-ও সমাজ-নীতি সম্মত নয় বলে প্রশংসিত ছিল না। উনিশ শতকের ইউরোপে বিশেষ করে গ্রেট ব্রিটেনেও নারীর উচ্চশিক্ষা ছিল কল্পনাতীত। আমাদের দেশে কোলকাতার প্রগতিশীল ব্রাহ্মরাও {স্বয়ং কেশব সেনও} নারীর সামান্য শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা স্বীকার করলেও উচ্চশিক্ষার তেমন পক্ষপাতী ছিলেন না। তবু এ ব্রাহ্মরা আর খ্রীস্টানরাই উনিশ শতকের শেষ দুই দশকে মেয়েদের উচ্চ শিক্ষাদানে এগিয়ে আসেন। সেদিন এদের এ কাজ কত বড় সাহসের,সংস্কারমুক্তির ও প্রগতিশীল চেতনার বাস্তবায়ন তা আজকের দিনে বলে বোঝানো যাবে না। সেদিন মেয়েদের প্রবেশিকা পরীক্ষা দেয়ার অনুমতিও ছিল না। লেখালেখির মাধ্যমে তদবির ও আন্দোলন করেই এসব অধিকার ও ব্যবস্থা আদায় করে নিতে হয়েছে। উনিশ শতকে ১৮৮৪ থেকে ১৯০০ অব্দ অবধি ছয়জন খ্রীস্টান কন্যা—চন্দ্রমুখী বসু (১৮৮৪), নির্মলা সোম (১৮৯১), মারগ্যারেট গুপ্ত (১৮৯৯) এ তিন জন এম. এ. পাশ করেন। আর প্রিয়তমা দত্ত (১৮৮৬), লীলা সিংহ (১৮৯০) ও এলেন চন্দ্র (১৮৯৩) বি.এ.পাশ করেন।

১৮৯৭ সালে ব্রাহ্মকন্যা হেমপ্রভা বসু প্রথম এম.এ. পরীক্ষা পাশ করেন আর ১৮৮৩ থেকে ১৯০০ অব্দের মধ্যে বি. এ. পাশ করেন মাত্র দশজন ব্রাহ্মকন্যা। সে-দশজন ভাগ্যবতী মহিলার নাম : কাদম্বিনী বসু (১৮৮৩), কামিনী সেন (১৮৮৬), কুমুদিনী খাস্তগীর (১৮৮৭), সরলা গোষাল (১৮৯০), জীবন বালা দত্ত (১৮৯১), ইন্দিরা ঠাকুর (১৮৯২) {প্রমথ চৌধুরীপত্নী}, প্রিয়ম্বদা বাগচি (১৮৯২), শশিবালা বন্দ্যোপাধ্যায় (১৮৯৩), প্রেমকুসুম সেন (১৮৯৯) এবং শিশির কুমারী বাগচি (১৮৯৮)।

আর সুপ্রভা গুপ্ত (১৮৮৯), শোরাত চক্রবর্তী (১৮৯০), সুরবালা ঘোষ (১৮৯৩), সরলাবালা রক্ষিত (১৮৯৪), সরলা সেন (১৮৯৭) এবং স্নেহলতা মজুমদার কোন্ সম্প্রদায়ভুক্ত ছিলেন তা জানা যায়নি।

হিন্দু-মুসলিমরা তখনো নারীর উচ্চশিক্ষা বিরোধী।

বিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে যে-সব মেয়ের জন্ম, তারাই জীবনের সর্বক্ষেত্রে পুরুষের মতো স্বাধীনভাবে বিচরণের ও বৃত্তি নির্বাচনের অধিকার পেয়েছেন। শুধু এখানেই শেষ নয়। এ

কালেই প্রথম ঘরে-বাইরে সর্বত্র নারী-পুরুষের সমান অধিকার স্বীকৃত হচ্ছে ও হয়েছে। ফলে পরিবারে, দাম্পত্যে, সমাজে, নাগরিক অধিকারে, ভাব-চিন্তা-কর্ম-আচরণে নারী-পুরুষের সহ, সম ও অভিন্ন অধিকারবোধ নারীসত্তার ও নারীজীবনের পূর্ণবিকাশের সহায়ক হচ্ছে। এ শতকেই বিশ্বে নারীর মুক্তি পূর্ণতা লাভ করছে, সর্বত্র নারীর স্বাধিকার প্রতিষ্ঠিত হচ্ছে। পৃথিবীর অর্ধেক মানুষ নারী এ কাল থেকেই বিশ্বের জ্ঞান-বিজ্ঞান, শাস্ত্র-সমাজ-সরকার, সভ্যতা-সংস্কৃতি ও আবিষ্কার-উদ্ভাবন ক্ষেত্রে পুরুষের পাশে থেকে স্ব স্ব দানে মানব শক্তির, সামর্থ্যের ও মহিমার বিকাশ ত্বরান্বিত করছে এবং করতে থাকবে।

শিক্ষাক্ষেত্রে মূল্যবোধের সঙ্কট

ওয়ারেন হেস্টিংসের আমল থেকেই সাধারণভাবে দেখা যায় প্রায়ই নতুন কর্তা একবার শিক্ষা সংস্কারে উদ্যেগী হন। ফলে গত দু'শ বছরে আমাদের শিক্ষাপদ্ধতি বহুবার বদলেছে। কিন্তু যেহেতু মূল কাজটি হচ্ছে বিদ্যা দান ও গ্রহণ, সেহেতু এতে মৌলিক পরিবর্তন অসম্ভব এবং অনাবশ্যকও বটে। ফলে শিক্ষা-সংস্কার মানেই নিয়ম-পদ্ধতির আবয়বিক পরিবর্তন—বড়ো জোর পরিবর্ধন। সাহিত্য, গণিত, ভূগোল, ইতিহাস, উদ্ভিদ বিজ্ঞান, রসায়ন, পদার্থবিদ্যা প্রভৃতির পাঠ স্কুলেই শুরু হয়, আর দর্শন, জ্যোতির্বিদ্যা, আইন, চিকিৎসাবিদ্যাও কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়ে চিরকাল পড়ানো হয়েছে। বিদ্যার বিস্তারের ফলে এযুগে এসব বিদ্যার শাখাপ্রশাখাও আলাদা বিদ্যা হিসেবে দাঁড়িয়ে গেছে, ফলে এক রসায়ন, (Micro-Biology) জীববিদ্যা, উদ্ভিদবিদ্যা, মৃত্তিকা বিজ্ঞান, সমর-বিদ্যা, কৃষিবিজ্ঞান, সমুদ্রবিদ্যা, খনিবিদ্যা, জোতির্বিদ্যা প্রভৃতি বহুধাবিদ্যার মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত। তেমনি অর্থবিজ্ঞান, রাষ্ট্রবিজ্ঞান, ব্যবস্থাপনা কৌশলতত্ত্বে ও পুঁজিবিনিয়োগ বিজ্ঞানে প্রসারিত। ধর্মশাস্ত্রাদিও দেশদুনিয়ার সর্বত্র পঠিত হয়। তাছাড়া আধুনিক প্রগতিশীল জীবনের চাহিদা অনুসারে ঔষধ কৃষি শিল্প বাণিজ্য সম্পৃক্ত বিচিত্র বিজ্ঞান, কৃৎকৌশল, প্রযুক্তবিদ্যা প্রকৌশল-তত্ত্ব যন্ত্রের উৎকর্ষ সাধন ও কম্প্যুটারাদি নতুন নতুন যন্ত্রনির্মাণ প্রভৃতি শত রকমের বিদ্যার বিকাশ বিস্তার ও প্রশিক্ষণ চলছে। চিত্রাঙ্কন স্থাপত্য, ভাস্কর্য, সংগীতাদি থেকে রন্ধন কিংবা গৃহসজ্জাবিদ্যা প্রভৃতি বহু বহু বিদ্যা আজকাল বিজ্ঞান ও শিল্প হিসেবে হচ্ছে পঠিত।

জ্ঞান-বিদ্যামাত্রই দেশ-জাত-জন্ম-ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে মানবসম্পদ, সব মানুষের সম অধিকার রয়েছে জ্ঞানে-বিজ্ঞানে। তবু দেশভেদে, কালভেদে এবং শাসন-ভেদে জ্ঞানে বিজ্ঞানে অধিকার দানে ও গ্রহণে রাজনীতির ও অর্থনীতির নানা ছলচাতুরী ও খেলা চলে। এ ক্ষেত্রেও শাসকের ও শাসিতের স্বরাষ্ট্রের,প্রতিবেশী রাষ্ট্রের, বিভিন্ন দলের ও শ্রেণীর স্বার্থে পার্থক্য ও বৈপরীত্য থাকে। তাই আফ্রো-এশিয়ার ও লাতিন আমেরিকার অর্থসম্পদে দীন-দুর্বল রাষ্ট্রের শিক্ষানীতিও নিয়ন্ত্রিত হয় পারাশক্তির সাম্রাজ্যিক স্বার্থে। কেননা এসব রাষ্ট্রের সরকার সাধারণত নামে বেনামে যুক্তরাষ্ট্রের অর্থে অস্ত্রে ও মদদে টিকে থাকে। এ সব রাষ্ট্রে পরার্থপরমানববাদীর সরকার থাকে না, থাকে সাম্রাজ্যবাদীর অনুগত মান, ক্ষমতা ও অর্থ সম্পদলিপ্সু চালবাজ মতলববাজ লুটেরার সরকার। এমনি সরকার আশ্বাসদানে ও গলাবাজিতেই স্বল্পকালের জন্যে দেশ জয় করে। এমনি সরকার শিক্ষা বলতে কলেজ ও

বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন; উন্নতি বলতে দানের, অনুদানের ও ঋণের টাকা দিয়ে শহরের সড়ক-উদ্যানের উৎকর্ষ সাধন, শহরে অট্টালিকার সংখ্যাবৃদ্ধি, অসদুপায়ে অর্জিত অর্থ-সম্পদে ঋদ্ধ পরিবারের সংখ্যা বৃদ্ধি প্রভৃতি বোঝে।

এমনি সরকার নামে সেবক ও রাষ্ট্রের অভিভাবক,বাস্তবে শাসক ও গণ-শোষক, নামে দেশের মিত্র, কাজে জনশত্রু। বিদেশী প্রভুর ইঙ্গিতে ও অর্থে জন্মনিয়ন্ত্রণে সরকারের আগ্রহ, বিশ্বাবিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার উৎসাহ। কিন্তু বিদেশী প্রভু চায় না বলেই সরকার প্রাথমিক শিক্ষা বাধ্যতামূলক করে না। প্রভুর অভিপ্রায়ক্রমে প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ধর্ম শিক্ষাদানের, আরবী ইংরেজী শেখানোর এতো আগ্রহ সরকারের। যাতে গ্রামের নিরক্ষর পরিবারের সন্তানেরা বিদ্যালয়ে গেলেও ভাষার গুরুভারের চাপে ভীতত্রস্ত হয়ে পালায়। জ্ঞানের অপর নাম চোখ। চোখে যে দেখতে পায়, সে মনেও কিছুটা বুঝতে জানে। তাকে প্রতারিত করা তেমন সহজ নয়; যেমন সহজ অন্ধের বেলায়। তাই নিরক্ষর রূপ অন্ধ বা মুখ রাখার এমন সচেতন সযত্ন সাম্রাজ্যিক প্রয়াস।

অন্য অনেক রকম ফাঁকির ফাঁদ পাতার প্রয়াস চলে। গণমুখে শিক্ষা, জাতীয় আদর্শানুগ শিক্ষা, বৃত্তিমুখী শিক্ষা, বিজ্ঞান ও কৃৎকৌশল মুখী শিক্ষা, নীতি ও ধর্মানুগত শিক্ষা, মানব বিদ্যা ও বিজ্ঞানের সংশ্লেষমূলক শিক্ষা প্রভৃতি খেয়াল-খুশি মাফিক কিংবা প্রায়োজনিক ফাঁকা বুলি উচ্চারণে সরকারি লোকের উৎসাহ অসীম। দায়িত্ববোধ চালিত হয়ে সততার সঙ্গে কেউ কথা বলে না, তাই দেখা গেছে দেশের কয়েকজন তথাকথিত শিক্ষাবিদ বিভিন্ন সরকারের ফরমায়েস অনুযায়ী শিক্ষা কমিশন রিপোর্ট গুলো তৈরি করেছেন। এঁরা দরজীর মতো যেন outfitters and general order suppliers. স্বণ-স্বভাবও একটা গুণ বটে!

ব্যবহারিক প্রয়োজনের দিক ছাড়াও তার উর্ধ্বে বিদ্যার একটা অদৃশ্য অথচ অনুভবসাধ্য গুণ আছে। কাজেই বিদ্যা কেবল বিত্ত অর্জনের বৃত্তি-কৌশল বা সাধনী শক্তি নয়—মনের বনের মশালও বটে। তা দিয়ে ইচ্ছে করলে ঝাড়জঙ্গল পুড়িয়ে চিত্তলোকে সংস্কৃতির চাষ করা ও মনের ফসল উৎপাদন করা দুঃসাধ্য নয়। কাজেই বৈষয়িক আর্থিক উপভোগ ছাড়াও বিদ্যার একটা মানস উপযোগ রয়েছে তার গুরুত্ব ভাবুক চিন্তক মানুষের কাছে অপরিমেয় বরং মনুষ্যত্বের কিংবা মানবতারই সমমূল্যের। আগেও নানা প্রসঙ্গে বহুবার বলেছি যে বিদ্যা বা জ্ঞান নৈপুর্ন দান করে, চরিত্র গড়ে না, আর জ্ঞানের মাত্রই বন্ধ্যা—যদি না তা তাৎপর্যসচেতন করে অর্থাৎ জ্ঞান প্রজ্ঞার স্তরে উন্নীত হলেই তা প্রয়োগযোগ্য বা সার্থক হয়। নইলে যা শেখা হয় তাই শিক্ষা যা জানা যায় তা-ই জ্ঞান, 'বিৎ' জাত বিদ্যা মানে জ্ঞান। যে বিদ্যা বা জ্ঞান মননে প্রযুক্ত হয় না, যে বিদ্যা বা জ্ঞান উদ্ভাবনে ও আবিষ্কারে, বিচারে বিশ্লেষণে, বহুজনহিতে ও বহুজন সুখে নিয়োজিত হয় না, হবার শক্তি দান করে না, সে-বিদ্যা নির্লক্ষ্য ও স্থূল। ব্যবহারিক, বৈয়িক যান্ত্রিক ও বৃত্তিক প্রয়োজন সিদ্ধ হলেও তা জীবিকা সর্বস্ব। জৈবিক-মানুষের মানস চাহিদা মেটাতে পারে না বলে, মনের প্রসারের ও বিকাশের সহায়ক নয় বলে তা অনভিপ্রেত। জনসংখ্যা বৃদ্ধি, যন্ত্রযুগের প্রসার প্রভৃতি কারণে মানুষের জীবিকা কম বেশী সঙ্কটসঙ্কুল হয়ে উঠেছে।

তাই মানুষের ব্যক্তিক ও পারিবারিক জীবনে জীবিকা-চেতনা অত্যন্ত প্রবল, এমনকি প্রায় একমাত্র চেতনা রূপেই প্রকট হয়ে উঠেছে, বিশেষত দিন-দুনিয়ার পরশ্রমজীবী শিক্ষিত চাকুরে মধ্যবিত্ত সমাজে। এই জন্যেই এ শ্রেণীর মধ্যে বৃত্তিমুখী শিক্ষার খুব কদর। সন্তানকে রোজগেরে করাই মা-বাপের একমাত্র স্বপ্ন ও লক্ষ্য। সেই উপার্জনে সমর্থ করাই শিক্ষাদানের

উদ্দেশ্য। শুধু খাওয়া-পরার মতো অর্থসম্পদ নয়, বিপুল পরিমাণ অর্থসম্পদের মালিক হয়ে বিশাল শহরের বিরাট বাড়িতে বাস করা সম্ভব হলেই কেবল উচ্চবিত্তের উচ্চতম শ্রেণীর ধনী-মানীরূপে সমাজে প্রতিষ্ঠা পাওয়া যায়। ঠিকেদারি, সওদাগরি, মজুতদারি আড়তদারিই বিপুল অর্থ উপার্জনের স্বীকৃত পথ কিন্তু তা পুঁজি, প্রতারণা, শ্রম, বুদ্ধি ও অধ্যবসায় সপেক্ষ। সহজ সাধনের অন্য এক পথ হচ্ছে ভাগ্যনির্ভর ওকালতি। চাকুরে হয়ে বা না হয়েও নিশ্চিত রোজগারের আর দুটো চালু পন্থা হচ্ছে চিকিৎসা ও প্রকৌশল বিদ্যা। অসদুপায়ে এক্ষেত্রে কিছু কিছু পয়সা বানানো যাবেই– এমনি এক ধারণাবশে শিক্ষিত শহুরে মা-বাপেরা প্রাণপণ সযত্নে সন্তানকে ভাল ছাত্র বানিয়ে চিকিৎসা ও প্রকৌশল বিদ্যালয়ে পাঠায়। সন্তান ডাক্তার-ইঞ্জিনিয়ার হলে তাদের পৃথিবীতে বাসনার আর কিছু বাকী থাকে না।

কলেজের-বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রচণ্ড পণ্ডিত অধ্যাপকদেরও কাছে সাহিত্য-দর্শন-ইতিহাস, সমাজবিজ্ঞান-রাষ্ট্রবিজ্ঞান প্রভৃতির এবং গণিত, পদার্থবিদ্যা-রসায়ন প্রভৃতির তেমন কোন মূল্য নেই, রদ্দি সন্তানদের জন্যেই কেবল এসব ব্যবস্থা চালু রাখা। এগুলোর মধ্যেও মানে ভালে, মন্দ, মাঝারি বিষয়ে রয়েছে। এদিকে অর্থবিজ্ঞান ও বাণিজ্যবিদ্যার নীচে আর সব বিষয়ের স্থান, তেমনি ভেষজবিদ্যা, জৈব রসায়ন, ভূবিদ্যা ও পরিসংখ্যান বিদ্যার মান অন্য বিষয়গুলোর চেয়ে বেশি, কারণ এসব বিষয়ে চাকরীর বাজার বিস্তৃত। অতএব, একালে এ মুহূর্তে শিক্ষা মানে বৃত্তিমুখী শিক্ষা, বিদ্যা মানে চিকিৎসা ও প্রকৌশলবিদ্যা–বড়জোর বাণিজ্যবিদ্যাও। এ যুগের আগে মানুষ কখানো জ্ঞান-বিদ্যা-শিক্ষাকে এভাবে দেয়ালবদ্ধ করে ভাগ করেনি। বিশেষজ্ঞ তৈরীর নামে অবিশেষে এমন অজ্ঞ তৈরীর সচেতন ও সতর্ক প্রয়াস একালের আগে আর কখনো হয়নি, মানববিদ্যার প্রতি এমন তাচ্ছিল্যও এর আগে কেও দেখায়নি কখনো। অভাববোধ, প্রয়োজনচেতনা ও সমস্যা-সংকটই হচ্ছে আবিষ্কার-উদ্ভাবনের জনক। জগতে সভ্যতার বিকাশ-বিস্তার ও মানব-মনীষার প্রসার ও উৎকর্ষ সাধিত হয়েছে অভাবের, প্রয়োজনের প্রেরণায়, সমস্যার ও সংকটের মুখে ত্রাণের প্রণোদনায়। শাস্ত্রী, গোত্রপ্রধান, সমাজপতি এবং জ্ঞানবুদ্ধিপ্রজ্ঞা সম্পন্ন মানবকল্যাণকামী ভাবুক চিন্তকরাই নতুন উপায় উদ্ভাবন করে, নতুন সাধনাশক্তি ও বস্তু বা যন্ত্র আবিষ্কার করে প্রকৃতির শক্তি ও সম্পদ সন্ধান করে মানবজীবন করেছে আরামপ্রদ, জীবিকার্জন করেছে সহজ। কাজেই প্রথমে স্বপ্ন বা কল্পনারূপে, পরে অনুমান বা প্রত্যয়রূপে, শেষে পরীক্ষণ ও পর্যবেক্ষণ মাধ্যমে প্রয়োজনানুগ নতুন উপায় ও বস্তু উদ্ভাবিত আবিষ্কৃত ও নির্মিত হয়।

অতএব বাঞ্ছাপ্রেষিত ভাব-চিন্তা ও তত্ত্ব রূপে মানসউদ্‌গত ধারণাই যোগ্য হাতে বাস্তবরূপ গ্রহণ করে সার্থক হয়। সুতরাং, বিদ্যামাত্রেরই দৃশ্য বা অদৃশ্য উপযোগ রয়েছে। তাত্ত্বিকে ও ফলিতবিদ্যায়, যন্ত্রে ও যন্ত্রীতে, চিন্তায় ও কর্মে, উদ্দেশ্যে ও ফলে সম্পন্ন হচ্ছে বীজ বৃক্ষ ফলের মতো বৃত্তাবদ্ধ। মানববিদ্যায় সাহিত্য, দর্শন, ইতিহাস, আইন, সমাজ-বিজ্ঞান, মনোবিজ্ঞান চর্চায় মানবতার সার্বিক জ্ঞনের বিকাশ-বিস্তার সাধন না করে যন্ত্রের, কৃৎকৌশলের, প্রযুক্তিবিজ্ঞানের উৎকর্ষ সাধনে ও প্রয়োগে মানুষের নৈতিক সামাজিক সাংস্কৃতিক জীবনের মান উন্নত করা কিংবা নির্বিঘ্ন নিরাপদ রাখা সম্ভব কি?

তাই শিক্ষা বলতে মানসোৎকর্ষ সাধনের আবশ্যকিতার কথা ভুললে চলবে না। মানববিদ্যা বিজ্ঞান-ও কৃৎকৌশলবিদ্যা জাত জ্ঞানের অনুভবের ও অভিজ্ঞতার সমন্বিত রূপই একজন মানুষকে এ যুগে বাঞ্ছিত নাগরিক বা সমাজের অভিপ্রেত সদস্য হবার যোগ্য করতে পারে। উল্লেখ্য যে পরাবিদ্যা তথা স্রষ্টা ও সৃষ্টি, জগৎ ও জীবন রহস্য জিজ্ঞাসাই ছিল আদি

জ্ঞেয় বিদ্যা। তাতে লক্ষ্য ছিল জ্ঞান-অর্জন, জীবন-চেতনার উৎকর্ষ সাধন এবং সমাজ-সদস্য হিসেবে প্রয়োজনীয় গুণের অনুশীলন। এ ধারণা বশেই আজো আমরা বলি যে বিদ্যা বিনয়ী করে, সুজন করে, জ্ঞানী গুণবান ও সদাচারী করে, বিদ্যা মানুষকে সুবিবেচক করে, তার দায়িত্বচেতনা ও কর্তব্যবুদ্ধি জাগায়। তাই বিজ্ঞানের, বাণিজ্যের, প্রকৌশলের ছাত্রদের সাহিত্য, দর্শন, ইতিহাস বা সমাজতত্ত্বের যে কোন একটি বা সভ্যতা-সংস্কৃতির ইতিহাস পাঠ করানো এবং মানববিদ্যার শিক্ষার্থীদের বিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখায় অন্তত প্রাথমিক জ্ঞান দান আবশ্যক। তাহলেই কেবল একাধারে মানবমুখী ও বৃত্তিমুখী শিক্ষাজাত অভীষ্ট ফল পাওয়া যাবে।

আর একটি কথা, দেশের পড়ুয়া ও মেধাবী ছেলেমেয়েরা ওইভাবে পেশামুখী শিক্ষা গ্রহণ করে কৃৎকৌশলী Technocrat যন্ত্রী ও যান্ত্রিক বা বিশেষজ্ঞ হয়ে বাড়ির গাড়ির আরামের জীবনে আসক্ত হলে দেশের তথা মাটির ও মানুষের স্বার্থে সমাজ-সংস্কৃতি-রাষ্ট্র বিষয়ে মননের ক্ষেত্রে ভাবুক চিন্তক দার্শনিক ঐতিহাসিক সমাজবিজ্ঞানী, রাষ্ট্রতাত্ত্বিক, গণহিতকামী মনীষাসম্পন্ন নেতা দুর্লভ হয়—একথা চার্লস ডারউইন, কার্ল মার্কস, সিগমণ্ড ফ্রয়েড কিংবা আইনস্টাইন-রাসেলের নাম স্মরণে রেখেও বলা যায়।

চিন্তার, চেতনার, মানবতার, শ্রেণীবোধের ও বিবেকের প্রসারমুখী শিক্ষাকে অবহেলা করে কেবল জীবিকার্জন লক্ষ্যে বৃত্তিমুখী পেশামূলক শিক্ষাদানে উৎসাহ জাতীয় অবক্ষয়ের লক্ষণ, এর পরিণাম পরিবারের, সমাজের, সংস্কৃতির ও রাষ্ট্রের পক্ষে ক্ষতিকরই হবে। শিক্ষার প্রথম, প্রধান ও শেষ লক্ষ্য হবে মানবমুখিতা, নইলে জাগতিকতায়, জীবিকায়, সামাজিকতায় ও মানসিকতায় ভারসাম্য রক্ষিত হবে না, দেহ-মনের সমাজ-সংস্কৃতির, সমস্যা-সম্পদের, শক্তি-সহসের, রাষ্ট্র-রাষ্ট্রিকের, মাটি-মানুষের অসম বিকাশ তথা ভারসাম্যহীনতা বা অসঙ্গত অসমঞ্জস সমন্বয় অনপনেয় সমস্যা-সংকটের ও দুঃখ-যন্ত্রণার কারণ হয়ে থাকে।

আজকের শিক্ষা ভাবনা

জ্ঞান অজ্ঞতার অন্ধকার ঘুচায়, তাই জ্ঞানার্জনে মানুষ হয় চক্ষুষ্মান। অতএব জ্ঞানই চক্ষু, শক্তি ও আত্মপ্রত্যয় বলে স্বীকৃত। আর একারণেই অজ্ঞ আর অন্ধ সমার্থক। অজ্ঞমাত্রই অসহায়, তেমনি অজ্ঞমাত্রই দুর্বল। এবং অজ্ঞের এই দুর্বলতাই হচ্ছে সমাজে শোষক-শোষিত ও বান্দা-মনিব সম্পর্কের আদি উৎস।

গণমানবকে জ্ঞানের আলো থেকে বঞ্চিত রেখে শাসন-শোষণ নির্বিঘ্ন রাখার প্রয়াস শাহ-সামন্ত সমাজের মৌলনীতির প্রসূন। তার জের রয়েছে সাম্রাজ্যবাদীর মুৎসুদ্দী সামন্ত-বেণে-বুর্জোয়া-আমলাদের মনেও, যদিও কাল-প্রভাবে তারা তা উচ্চারণ করতে সাহস পায় না।

এ জন্যেই তাদের উৎসাহ উচ্চশিক্ষায়, শিক্ষার বিষয় নিয়ন্ত্রণে,শিক্ষার্থীর চরিত্র উন্নয়নে (!) ও নেতা-নাগরিক(!) সৃজনে। সবটাই ভদ্রলোকদের শ্রেণী-স্বার্থ বজায় রাখার অপকৌশল জাত। শিক্ষিত বেকার পাছে বিদ্রোহ করে, সে-আশঙ্কায় শিক্ষিতের কর্মসংস্থানে ও পেশাগত শিক্ষা নিয়ন্ত্রণে সরকার সদাব্যস্ত। পশ্চিম এশিয়ায় ও আফ্রিকায় অবাধে লোক পাঠানোর তত্ত্ব

এতেই নিহিত। সরকার নিরক্ষর গণমানবের অন্নসংস্থানে বা জীবিকার ব্যবস্থায় কখনো তেমন আগ্রহী হয় না।

এরাই আবার উচ্চকণ্ঠে ব্রিটিশ শাসকদের নিন্দা করে দেশী লোকদের শিক্ষাদানে তাদের অনীহা ছিল বলে। ইংরেজরা সাম্রাজ্যে শিক্ষার বিস্তার চায়নি বটে, কিন্তু শিক্ষার্থীকে য়ুরোপীয় কোন জ্ঞান-বিদ্যা থেকে বঞ্চিত রাখার চেষ্টাও করেনি। ব্রিটিশভারতের বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে অক্সফোর্ড ক্যাম্ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের আদলেই শিক্ষাদান করা হত। এবং ঐ বিদ্যা অর্জন করেই ভারতে জ্ঞানে-গুণে মনীষায়-মনুষ্যত্বে বহু বহু আদর্শ ও অনন্য ব্যক্তিত্ব স্ব-প্রতিষ্ঠ হয়েছিল। স্বদেশী উত্তেজনা বশে ইংরেজ আমলে দেশী ভাষায় ও সনাতন পদ্ধতিতে শিক্ষা দিয়ে কেরানীর বদলে মানুষ গড়ার জন্যে ওসমানিয়া বিশ্ববিদ্যালয়, জামিয়া মিল্লিয়া কিংবা বিশ্বভারতী স্থাপিত হয়। কিন্তু প্রতিবাদের আশঙ্কা না করেই বলা যায়, এসব শিক্ষালয় থেকে 'মানুষ' তৈরি হয়েছে ক্বচিৎ এবং শিক্ষাপ্রাপ্তদের মধ্যে বিদ্বানও বিরলতায় দুর্লভ।

লর্ড মেকলে জাগতিক বিষয়ে আরবী-ফারসী-সংস্কৃত গ্রন্থবদ্ধ জ্ঞান-বিদ্যা সমকালীন য়ুরোপীয় জ্ঞান-বিদ্যার তুলনায় নিতান্ত তুচ্ছ বলে মন্তব্য করায় আত্মসম্মানের দায়ে অপমানিত দেশী লোকেরা বিক্ষুব্ধ চিত্তে করেছিল বটে, কিন্তু মেকলের উক্তির সত্যতা অন্তরে উপলব্ধি করেছিল ও কার্যত স্বীকার করেছিল তারা টোল-মাদ্রাসার শিক্ষা বর্জন করে। প্রতীচ্য প্রভাবে যখন জীবন-জীবিকার প্রতিবেশে কালান্তর ঘটছে, নতুনে পুরাতনে দ্বন্দ্ব প্রকট হয়েছে, তখন টোল-মাদ্রাসায় শিক্ষিতরা শেষবারের মতো সনাতন প্রতিবেশ রক্ষণে মরীয়া হয়ে উঠেছিল দেশ কালবিরোধী শাস্ত্রাশ্রিত সমাধান সন্ধানে। ওয়াহাবী ফরায়েজী ও আর্যসমাজী আন্দোলনই ব্রিটিশ-ভারতে টোল-মাদ্রাসার শেষ দান। য়ুরোপীয় মিশনারীদের লক্ষ্য ছিল প্রতীচ্য শিক্ষার মাধ্যমে দেশী লোকদের খ্রীস্টান করা, কিন্তু তাদের প্রয়াস ব্যর্থ হয় ঐহিক জীবন-জীবিকার ক্ষেত্রে তা অকেজো বলেই। তাই ব্রিটিশ ভারতে শিক্ষিতরা ইউরোপীয় খ্রীস্টান-সৃষ্ট সব কিছুই গ্রহণ করছে, পরিহার করেছে কেবল যিশুর বাণী। তবু রাজনীতিকরা ম্যাকিয়াভেলীর অনুসরণে ধর্মভীরুদের খুশী রাখবার জন্যে ছদ্ম শাস্ত্রপ্রীতি দেখান এবং শাস্ত্র শিক্ষার গুরুত্ব উচ্ছ্বসিত ভাষায় নির্বাচনকালে প্রচার করেন। যদিও তাঁরা জানেন, পাপ পরিহার করবার জন্যে শাস্ত্রের যতটুকু জানা দরকার, তা দুনিয়ার মানুষমাত্রই জানে। পাপ করে মানুষ প্রবৃত্তিবশে। প্রলোভন প্রবল হলেই এবং শাসনে শৈথিল্য থাকলেই মানুষ পাপ করে—অজ্ঞতা বশে নয়। আমাদের দুর্নীতিবাজ শিক্ষিতরা কোন্ পাপ কর্মটি না জেনে করে!

আমাদের মুৎসুদ্দী রাজনীতিকরা, সরকারী শিক্ষাবিদরা ও সরকার এসব বৃত্তান্ত জানেন। স্ব-শ্রেণীর স্বার্থেই তাঁরা তবু শিক্ষা ও শিক্ষানীতির কথা ঘন-ঘন উচ্চারণ করে অজ্ঞ ও বিভ্রান্ত গণমানবকে বাক্‌জালে বদ্ধ করে বশে রাখেন,—এবং শিক্ষা বিস্তারের নামে গণমানবে শিক্ষার প্রসার রুদ্ধ রাখেন। এ অপকৌশল প্রয়োগের প্রসূন হচ্ছে : উচ্চশিক্ষার প্রসারের সুব্যবস্থার নামে কলেজে নির্লক্ষ্য অনার্স, ও স্নাতকোত্তর কোর্স প্রবর্তন, নতুন নতুন বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন, শাস্ত্রশিক্ষার জন্য বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা, আদর্শ ও আধুনিক প্রাথমিক শিক্ষার ব্যবস্থার জন্যে অবাস্তব অসম্ভব পরিকল্পনা গ্রহণ, ঘন ঘন শিক্ষা সম্বন্ধীয় কমিটি কমিশন গঠন, সেমিনার সম্মেলন অনুষ্ঠান প্রভৃতি। শেষোক্ত দুটো বিষয়ে উৎসাহ নিছক ভোট যোগাড়ের ভাঁওতা জাত। নইলে মাদ্রাসায় ইসলামী শাস্ত্রশিক্ষা যা এবং যেভাবে দেয়া হয়, তার বাইরে শিক্ষণীয় আর কিছুই থাকে না। আর বিদেশীর নির্দেশে ও অর্থে উপদেষ্টা পরিচালিত সেমিনার-সম্মেলনে এক কথাই বারবার ভিন্ন ভিন্ন মুখে উচ্চারিত হয় মাত্র। ওয়ারেন হেষ্টিংস থেকে কাজী জাফর অবধি

কমিটি-কমিশন প্রসূত সোনার ডিমের আশ্বাসও সবাই দিয়ে থাকেন। কিন্তু উদ্দেশ্য সাধু নয় বলে আজো শিক্ষা গণমানবের অন্ধগলিতে পথ পায়নি। ভূমি সংস্কারের কিংবা কৃষি ব্যবস্থার উন্নয়নের ইচ্ছে নেই, অথচ মার্কিন অর্থে কৃষিবিশ্ববিদ্যালয় গড়ে গরীবের দেয়া অর্থে ভদ্রলোকদের রোজগারের ব্যবস্থা করে দেওয়া হয়েছে।

ব্রিটিশ আমল থেকে আজ অবধি যারা কলেজে বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়েছে-পড়ছে, তারা সাধারণভাবে কোন্ আর্থিক অবস্থানের লোকদের সন্তান? তাহলে এ-যাবৎ উচ্চশিক্ষার তথা ধন-উপার্জনের পরিবর্তে সরকার অবৈতনিক প্রাথমিক শিক্ষার ও বয়স্ক শিক্ষার এবং জ্ঞানযশ-প্রতিপত্তি অর্জনের ও শোষণের অধিকার পাচ্ছে কারা? আজকের এ মুহূর্তে এ দেশের শিক্ষার সুব্যবস্থার সুফল কারা পাচ্ছে এবং অব্যবস্থার ক্ষতিই বা কাদের হচ্ছে? অতএব আজকের শিক্ষা সংক্রান্ত যাবতীয় বিষয় দু'চার লক্ষ ভদ্রলোকের বা ভদ্রপরিবারের স্বার্থ-সম্পৃক্ত। সাড়ে আট কোটি অশিক্ষিত গণমানবের সর্বপ্রকার দুঃখের নিমিত্ত শিক্ষিত শোষক ও দুর্নীতিবাজ আমলা-ঠিকাদার-কারখানাদার-দোকানদারে বাই। একটা শ্রেণীর স্বার্থকে সম্পদকে ও সমস্যাকে জাতীয় স্বার্থ, সম্পদ ও সমস্যারূপে চালিয়ে দেওয়া একপ্রকার প্রতারণা।

চট্টগ্রামের ও ঢাকার গাঁয়ে দুটো বিশ্ববিদ্যালয় ও একটি প্রকৌশল কলেজ স্থাপন করে গরীবের হাতী পোষার সখের মতো শহরে শিক্ষক রেখে এবং ছাত্রদের শহর থেকে রোজ ছুটোছুটির ধকলে ফেলে প্রাথমিক বিদ্যালয়ের মতো নয়টা একটার ক্লাস বসানোর খেলা শিক্ষা বিষয়ে রাজনৈতিক প্রতারণার নামান্তর নয় কি? কয়জন শিক্ষার্থীর জন্যে উক্ত দুই বিশ্ববিদ্যালয়ে কয়েক কোটি টাকা বার্ষিক খরচ করা হয়? আরো চারটি বিশ্ববিদ্যালয়-কলেজ প্রতিষ্ঠার অঙ্গীকার করেছেন সরকার এবং থানা কেন্দ্রে ও মহকুমা কেন্দ্রে যথাক্রমে সরকারী স্কুল ও কলেজ স্থাপনের অঙ্গীকারও রয়েছে। এগুলো তো সেই চাকুরে ও ভদ্রলোকদের তুষ্ট রাখার লক্ষ্যে তাদের স্বার্থেই করা হচ্ছে—ব্রিটিশ আমলে যেমন আমলাদের প্রয়োজনে সরকারী জিলা স্কুল স্থাপন করা হয়েছিল। অতএব উদ্দেশ্য অভিন্ন। শিক্ষার বিস্তার যদি লক্ষ্য হত, তাহলে সরকারী অর্থে স্কুল হত আজ পাড়াগাঁয়ে।

শিক্ষার বিস্তার যদি সামন্ত বুর্জোয়া রাজনীতির, সরকারের ও সরকারী শিক্ষাবিদদের লক্ষ্য হত, তাহলে বিশ্ববিদ্যালয়ের : যা বছরে ব্যয় হয়, তার সমপরিমাণ অর্থ দিয়েই সারাদেশে এক বছরের মধ্যে বয়স্কদের খবরের কাগজ পড়ার মতো সাক্ষর করা সম্ভব। এ জন্যে প্রয়োজন জনপ্রতি একখানা শ্লেট ও মন্দির-মসজিদ প্রাঙ্গণে স্কুলে বৈঠকখানায় একখানা করে ব্ল্যাকবোর্ড এবং বিকেলে এক ঘণ্টা সময়। সর্বজনীন প্রাথমিক শিক্ষার ব্যবস্থা না করে উচ্চশিক্ষার কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয় গড়া সহজ বুদ্ধিতেই অযৌক্তিক ও অসঙ্গত। আমাদের বিশ্বাস সাক্ষর করার উদ্দেশ্যে সর্বজনীন প্রাথমিক ও বয়স্ক শিক্ষার ব্যবস্থা ব্যয়বহুল হবে না। কেননা সপ্তম অষ্টম শ্রেণী অবধি শিক্ষাপ্রাপ্ত গাঁয়ের যে কোন তরুণ কিংবা পৌঢ়প্রবীণ এ দায়িত্ব স্বল্প বেতনে বা বিনা বেতনে গ্রহণ করবে এবং তৃতীয় বিভাগে এস-এস-সি/এইচ-এস-সি পাস করা বা ফেল করা বেকাররা এক কিংবা দু'বছর সামান্য বেতনে বা বিনা বেতনে সাক্ষরতা কর্মে আত্মনিয়োগ করলে যোগ্যতানুসারে তাদের সরকারী ও কার্যালয়ে চতুর্থ ও তৃতীয় শ্রেণীর এবং সৈন্য বিভাগে শতকরা ত্রিশ বা চল্লিশ ভাগ পদে নিয়োগের আশ্বাস দিলে শিক্ষকও সহজে স্বল্প ব্যয়ে মিলবে। সমাজে উচ্চ শিক্ষার প্রয়োজন সামান্যই। কেননা সবাই বিদ্বান হয় না–হবে না, হওয়ার প্রয়োজনও নেই। বৃত্তি ও কৃৎকৌশল বিদ্যা সম্পর্কেও তা প্রযোজ্য।

আমরা জানি,মনে গণহিতৈষণা নেই বলেই শাসক-শোষক শ্রেণী কোন কেজো পদ্ধতিই গ্রহণ করবে না। ১৯৩০ সন থেকে খবরের কাগজ পড়ি। তখন থেকেই গাঁ-গঞ্জের বালক-বালিকাদের প্রাথমিক শিক্ষাদানের কথা সরকারি মহলেও উচ্চারিত হয়ে আসছে; তবু সরকারের অর্থাভাব এবং অভিভাবকদের দারিদ্র্যের অজুহাতে গাঁয়ের লোককে জ্ঞানচক্ষু থেকে বঞ্চিত রাখার সচেতন সুকৌশল ও সফল প্রয়াস অব্যাহত রয়েছে। কেবল প্রবোধ দেয়ার জন্যেই মাঝে মাঝে 'হিং টিং ছট'-এর মতো 'প্রাথমিক শিক্ষার বিস্তার চাই' বলে জিগির তোলা হয়। পরীক্ষামূলকভাবে একটি গাঁয়ে, ইউনিয়নে, থানায় কিংবা জিলায়ও যদি গণশিক্ষার ব্যবস্থা হত, তা হলেও এতোদিনে দেশে নিরক্ষর মানুষ দুর্লভ হত। কিন্তু'নয় মণ তেলও মিলল না, রাধাও নাচল না'।

গাঁয়ের ছেলে যদি নেংটা হয়ে বা নেংটি পরে ঘরে-বাইরে ঘুরে বেড়াতে পারে, গাঁয়ের মানুষ যদি খালি গায়ে-পায়ে যেখানে সেখান যেতে ও বসতে পারে, তাহলে গাঁয়ের স্কুলেই বা উচ্চাসন ও পোশাক লাগবে কেন? স্কুল ঘরেই বা লজ্জার ও সভ্যতার প্রয়োজন কেন? আমাদের বাস্তব অভব্যতা ও নিঃস্বতা স্বীকার করে নিলেই এ সমস্যা হয়ে দাঁড়ায় না। কেউ কেউ বলেন পাঁচ/সাত বছরের শিশুরাও গরীব মা-বাপের জীবিকা-সহায়, তাই তাদের সন্তানকে স্কুলে তারা পাঠাতে পারে না—পারবে না। সরকার সে-সব অভিভাবককে বছর/দুবছর ১০/২০ টাকা বৃত্তি দিলেই সমস্যার সমাধান হবে। পরিবার-পরিকল্পনা নামের জন্মনিয়ন্ত্রণ অভিযানে যে বিপুল পরিমাণ অর্থ ব্যয় হয়, এ বৃত্তি দিতে তত টাকা লাগবে না। অথবা ওদের জন্যে দিনে এক ঘন্টার ক্লাস বসানো যেতে পারে।

ভাঁওতার আর এক জিগির হচ্ছে 'শিক্ষকরা শিক্ষার্থীদের চরিত্র গড়।' শিশুরা ঘরে সংসারেই পরিজনদের বিশ্বাস-সংস্কার ও অভ্যাস আয়ত্ত করে। বলতে গেলে বাইরে থেকে কেউ কৃচিৎ কিছু গ্রহণ করে। যা 'শেখানো' হয়, তাই শিক্ষা, যা জানা যায়, তাই জ্ঞান, বিৎ {জানা} চাইলে বিদ্যা মেলে। কিন্তু শিক্ষা, জ্ঞান বা বিদ্যা মাত্রই বন্ধ্যা, যদি না তা' কর্মে আচরণে প্রয়োগ করার অভিপ্রায় থাকে। অতএব বিদ্যা জ্ঞান দান করে – চরিত্র গড়ে না। চরিত্র গঠন নির্ভর করে শৈশব-বাল্যের পারিবারিক প্রতিবেশের উপর।

স্কুলে-কলেজে-বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষক-শিক্ষার্থীরা পাঠ দানে-গ্রহণেই ব্যস্ত থাকে। তাও আবার মুদ্রিত বইয়ের প্রায় আক্ষরিক অনুসরণে। শাস্ত্র-সমাজ সরকার সম্পর্কে নীতিকথা জানা-জানানোর অবকাশ কোথায়? তা ছাড়া বল-ভরসার আকর মা-বাবার, ভাই-বোনের, আত্মীয়-স্বজনের প্রভাব অস্বীকার করে ক্লাসে কয় মিনিটের জন্যে দেখা শিক্ষকের মুখে পাঠ্য বইয়ের বাইরের কথা সে গ্রাহ্যই বা করবে কেন? শিক্ষকের সঙ্গে প্রতিটি ছাত্রের মন জানাজানি হওয়ার মত ঘনিষ্ঠতা সম্ভব না স্বাভাবিক? বিশেষত কলেজে বিশ্ববিদ্যালয়ে যেসব ছাত্র আসে, তারা অতিক্রান্ত কৈশোর—তাদের পাকা মনে অভ্যস্ত স্বভাবে শিক্ষকের 'নীতিকথা' ফজুল নয় কি?

রাজনীতিকরা ছাত্র নিয়ে রাজনীতি করেন। বলতে গেলে ছাত্রই তাঁদের রাজনীতির অবলম্বন—মূলধন। এদের তথাকথিত চরিত্র নষ্ট করেন তাঁরাই। তবু শরম সংকোচের মাথা খেয়ে মুখ্যত সরকারী নেতারাই শিক্ষকদের বলেন—'ছাত্রদের চরিত্র গঠন কর।' ঘরে অভিভাবকদের কাছে তারা নিত্য মিথ্যাচার, ঘুষ, জান-জুয়া, প্রতারণা দেখছে-শিখছে এবং এতে আপাত লাভও প্রলুব্ধ হচ্ছে, সেসব বয়স্ক ছাত্রের কাছে পড়ে-পাওয়া নীতিকথা আওড়ালেই বা কি ফল হবে?

শিক্ষক-ছাত্র কি সমাজের বাইরের জীব; শিক্ষিত শহুরে সমাজ যেখানে দুর্নীতির আকর, মানুষের বৈষয়িক জীবনের দুঃখের উৎস, সেখানে শিক্ষকই বা অসামান্য প্রাণী হবে কেন? এসব নীতিকথা বুর্জোয়া রাজনীতিকরা ও সরকার জেনে বুঝেই রাজনীতিক চাল হিসেবেই আওড়ান।

সাড়ে আট কোটি অন্ধকে চক্ষুদান করলে ছদ্মহিতৈষণায় শাসন-শোষণ চলবে না তাই কর্তৃপক্ষের শিক্ষা বিস্তারে অনীহা। আমাদের বক্তব্য এই : আজকের জ্ঞান-বিজ্ঞান-বিদ্যামাত্রই যখন অভিন্ন, তখন কমিটি-কমিশন-সেমিনার-সম্মেলন প্রভৃতির সবটাই ফজুল এবং বিলাসমাত্র। এসব লোকঠকানো ব্যবস্থা বাতিল করা আবশ্যিক। এখন কেবল সাক্ষরতা রূপ চোখেরই প্রয়োজন। চোখে যোজনার, সঙ্গে সঙ্গে দৃশ্যবস্তুর প্রদর্শনীর প্রয়োজন নেই। এতে সাক্ষর ব্যক্তি খবরের কাগজ, ইশতেহার, হ্যান্ডবিল প্রভৃতি পড়তে পারবে, রেডিয়ো-টেলিভিশন মাধ্যমে দেশ-দুনিয়ার হালচালও বেশী করে বুঝবে। নিরীহ থেকে নির্বিবাদে ঠকতে তারা তখন আর রাজি থাকবে না। তাদের মধ্যে জীবনের ও জীবিকার বিস্তার ও উন্নয়ন আকাঙ্ক্ষা জাগবে, আত্মচেতনা তাদের উদ্যোগী, উদ্যমশীল ও কুশল করে তুলবে। কারণ ওরা নিরক্ষর বটে, কিন্তু নির্বোধ নয়।

অতএব, আজকে আমাদের শিক্ষা-আন্দোলনে জিগির হবে—উচ্চশিক্ষা বিস্তারে সরকারী সহায়তা বন্ধ কর। আট কোটি মানুষকে সাক্ষরতা রূপ চক্ষুদানে সরকারী অর্থ ব্যয় কর। সাক্ষরতাকে প্রতিরক্ষার ও উৎপাদন বৃদ্ধি প্রকল্পের সমগুরুত্ব দাও।

বাঙলাদেশ অনুন্নত কেন? উন্নতির উপায় কি?

কিছুকাল আগে অধ্যাপক আবুল কাসেম ফজলুর হক আমাকে দুটো প্রশ্ন দিয়ে উত্তর দাবি করেছিলেন। প্রশ্ন দুটো এই : ১. বাঙলাদেশ অনুন্নত কেন? আর ২. বাঙলাদেশের উন্নতির উপায় কি?

বলার অপেক্ষা রাখে না যে এদুটো বাঙালী মাত্রেরই। কাজেই দুটো প্রশ্নের উত্তর দেয়া সহজ নয়, এমন কি সর্বজনগ্রাহ্য উত্তর হয়তো কখনো মিলবেও না। অথচ এ প্রশ্নের সন্তোষজনক জবাব-সন্ধিৎসা রয়েছে সব দেশহিতকামীর মনে।

আমি আমার যুক্তি বুদ্ধি অনুসারে জবাব দেয়ার চেষ্টা করছি। বাঙলাদেশ অনুন্নত, কারণ বাঙালী মুসলমান যোগ্যতা অর্জনের আগেই আকস্মিকভাবে স্বাধীন পাকিস্তানভুক্ত হয়ে পূর্ব পাকিস্তানী হয়ে যায়, তারপরও আবার স্বাধীনতার মূল্য উপলব্ধির পূর্বেই স্বাধীন বাঙলাদেশ পেয়ে যায়। অর্জিত ধনে আর প্রাপ্ত ধনে পার্থক্য আছে, অর্জিত ধন যোগ্যতালব্ধ আর প্রাপ্তধন অনায়াসলব্ধ, প্রথমটির প্রতি মূল্য বা গুরুত্ব চেতনাজাত মমতা ও যত্ন থাকে, দ্বিতীয়টি কেবল অসংযত ভোগ-উপভোগের লিপ্সা বাড়ায়, অর্জিত ধন রক্ষণের ও বৃদ্ধিকরণের প্রয়াস থাকে, প্রাপ্ত ধন সে-প্রয়াস জাগায় না। পাকিস্তান ছিল প্রাপ্তবিত্ত।

আমাদের আধুনিক সমাজ, শাসন, অর্থ-সম্পদ ও রাষ্ট্রচেতনা জেগেছে প্রতীচ্য তথা ইংরেজী শিক্ষা প্রাপ্তির ফলে। অতএব উক্ত প্রশ্ন দুটোও ইংরেজী শিক্ষিত লোকেই উচ্চারিত। স্বাধীনতার আর্তিত উপ্ত হয়েছিল ইংরেজী শিক্ষিত মানুষের মনেই। সে-ইংরেজী শিক্ষা

প্রত্যাশিত পরিমাণে বাঞ্ছিত সংখ্যক মুসলিম মনে-মননে সঞ্চারিত হওয়ার আগেই প্রতিবেশী হিন্দু সমাজের নেতৃত্বে পরিচালিত স্বাধীনতা সংগ্রামের ফলপ্রসূ তোড়ে বাঙলার মুসলিমরাও ব্রিটিশের বিভেদ-বিরোধভিত্তিক শাসন-নীতির প্রয়োগে প্রথমে পাকিস্তানী এবং পরে সাম্রাজ্যবাদীদের প্ররোচনায় ও সহায়তায় 'বাঙলাদেশী' স্বাধীনতা পেয়ে যায়। কাজেই বাঙালী মুসলিমদের স্বাধীনতা স্বযোগ্যতায় অর্জিত নয়–অনেকাংশে প্রাপ্ত। কথাই বলে First deserve, then desire, কাজেই মানসপ্রস্তুতির পূর্বেই পেয়ে গেল স্বাধীনতা, এ যেন কাঙ্ক্ষা জাগার আগেই কাঙ্ক্ষাপূরণ, স্বপ্নদেখার আগেই স্বপ্নের বাস্তবায়ন।

পক্ষান্তরে হিন্দুরা ইংরেজী শিখে, স্বাধীনতার মূল্য-মর্যাদা উপলব্ধি করে বহু বহু বছর ধরে স্বাধীনতা সংগ্রাম শুরু করে এবং লঘু-গুরু নানা আন্দোলনের ও সংগ্রামের ফলে এবং দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধজাত ব্রিটিশ শক্তির বিপর্যয়ের দরুন স্বাধীনতা অর্জন তাদের পক্ষে সম্ভব হয়। কাজেই স্বাধীনতা অর্জনের, সে-স্বাধীনতা রক্ষণের এবং স্বাধীন দেশ উন্নয়নের একটা আত্মিক-চারিত্রিক গরজবোধ গড়ে ওঠে তাদের মধ্যে। এক নৈতিক-চেতনাবশে জনসেবার ও জন-জীবনে সুখ-স্বস্তি দানের দায়িত্বচিন্তা ও কর্তব্যবুদ্ধি তাদেরকে শিক্ষার, শাসনের, আর্থিক জীবন সচ্ছল করার, বাণিজ্য বিস্তারের, উৎপাদন বৃদ্ধির, শিল্প-কারখানা গড়ে তোলার প্রেরণা ও নিষ্ঠা দান করে।

মোহনদাস করমচাঁদ গান্ধীর আদর্শিক নৈতিক ও রাজনীতিক নেতৃত্বে গোটা ভারত ব্যাপী কয়েক কোটি নীতিনিষ্ঠ আদর্শে সমর্পিত চরিত্রবান স্বাধীনতাপ্রিয় জনসেবক মানুষ তৈরী হয়, কয়েক লক্ষ মানুষ আন্দেলনে ও সংগ্রামে সার্বক্ষণিক কর্মী হিসেবে আত্মনিয়োগ করে, আরো অন্তত লক্ষোর্ধ্ব বিয়ে-না করা খদ্দর-পরা স্বাধীনতাব্রতী মানুষও জীবনপণ সংগ্রামে অবতীর্ণ হয়েছিল। এ মানুষেরাই স্বাধীনতা উত্তর ভারতে বিভিন্ন দায়িত্বে থেকে ভারতকে শাসনে-পোষণে, শিল্পে-বাণিজ্যে, কলেকারখানায়, উৎপাদনে, আবিষ্কারে-উদ্ভাবনে ঋদ্ধ করে তুলতে থাকে। পুঁজিবাদী সামন্ত-বুর্জোয়া শাসনে যদিও ভারতে গণমানবের দারিদ্র্য-দুঃখ ঘোচেনি, তবু ভারত আজ বিশ্বের উন্নত দেশগুলোর একটি। শিল্পে-বাণিজ্যে-বিজ্ঞানে নয় শুধু, অর্থ-সম্পদে, অস্ত্রশস্ত্রে এবং সামরিক শক্তিতেও এশিয়ার চীন-জাপানের সমকক্ষ এবং সম্ভবত পরাশক্তিগুলোরও প্রতিযোগী।

মুসলিম লীগের এসব কিছুই ছিল না, নিরক্ষর নিরন্ন চাষী মজুরের সমাজে মূলে ব্রিটিশ সহযোগী নওয়াব-খান-পীর-সৈয়দ-সাহেব-চৌধুরী জাদাদের নেতৃত্বে পরিচালিত মুসলিম লীগের রাজনীতির ভিত্তি ও লক্ষ্যই ছিল কেবল দর কষাকষি, কেবল সুবিধে প্রাপ্তি। ভারতে সংখ্যালঘু বা উনজন হওয়ার আশঙ্কায় এর চরম লক্ষ্য ও পরম প্রাপ্তি হচ্ছে মুসলিম অধ্যুষিত অংশে স্বাধীনভাবে স্বশাসন প্রতিষ্ঠা। কংগ্রেসের মতো স্বাধীনতা-উত্তর দেশ গড়ার সর্বাত্মক পরিকল্পনা মুসলিম লীগের ছিল না, অর্থাৎ দেশ স্বাধীন হলে সে-স্বাধীনতা ভোগের জন্যে যেসব উদ্যোগ-আয়োজন ও ব্যবস্থা প্রয়োজন তা লীগ কখনো ভাবেনি, তাদের ছিল Negative বা ঋণাত্মক প্রয়াস, ফলে মুসলিম লীগের জনপ্রিয়তা ও প্রয়োজন পাকিস্তান প্রাপ্তির সঙ্গে সঙ্গেই ফুরোল।

অতএব যোগ্য হওয়ার আগেই আকাঙ্ক্ষা জাগার সঙ্গে সঙ্গেই আমাদের প্রথম স্বাধীনতা প্রাপ্তি ঘটল। তাই পাকিস্তান আমলেও দরিদ্র ঘরের সন্তান উঠতি শিক্ষিত বুর্জোয়ারা–আমলা-ঠিকেদার-দোকানদার-আড়তদার-কারখানাদার-ব্যবসাদার রূপে কেবল অর্থ-সম্পদ লুঠে ছিল নিরত। কেননা, যে আধুনিক য়ুরোপীয় শিক্ষা এ যুগের মানুষকে গণতন্ত্রী সমাজবাদী কিংবা

সাম্যবাদী করে সে-শিক্ষায় বাঞ্ছিত সংখ্যক শিক্ষিত মানুষসুলভ হওয়ার আগেই স্বাধীনতা পাকা ফলের মতোই হাতের মুঠোয় যখন এল, তখন তারা ভাবল, দেশ যখন স্বাধীন, কালও যখন নিরবধি, তখন দেশের ও মানুষের উন্নতি উন্নয়নের ঢের সময় পড়েই রইল। আপাতত 'আপনি বাঁচলে বাপের নাম' আমার 'উন্নতি দেশেরই উন্নতি'–এ আপ্তবাক্যে আস্থা রেখে আখের গোছানোই বুদ্ধিমানের ও ভবিষ্যৎ-দ্রষ্টার কাজ। তাই কেউ মানের, কেউ ধনের, কেউ ক্ষমতার লিপ্সা চালিত হয়ে ঘৃণা-লজ্জা-ভয় ত্যাগ করে শোষণে লুণ্ঠনে–পীড়নে বঞ্চনায় একে অপরের প্রতিযোগী ও প্রতিদ্বন্দ্বী হয়ে উঠল। রীতি-নিয়ম, আইন-কানুন, ন্যায়-নীতি হল লঙ্ঘিত ও দলিত। যশ-বিত্ত-মান-ক্ষমতা সবটারই অর্জন উপায় হল অর্থ-সম্পদ। তাই কাড়াকাড়িটা চলল অর্থের বাজারে এবং সম্পদের ক্ষেত্রে। মই বেয়ে সবাই উপরে উঠতে ব্যস্ত, তাই ঠেলাঠেলি ও হানাহানি বাড়ল। সরকারও গঠিত এবং শাসন-প্রশাসন পরিচালিত হচ্ছিল ওই শ্রেণীর মানুষ দিয়েই, রাজনীতিও করছিল সে-বর্গের লোকেরাই। কাজেই সরকারী প্রশ্রয় আর রাজনীতিক আশ্রয় ছিল নিশ্চিত, সেকারণে সামাজিক নিন্দাও ছিল অনুচ্চারিত। স্বাধীনতা অর্থে অন্তত একালে মানুষ বোঝে গণতন্ত্র। যে-গণতন্ত্রের জন্যে আমরা লড়াই করি, পাকিস্তানে কিংবা স্বাধীন বাঙলাদেশে তা-ই কি এ মুহূর্ত অবধি মিলল?

বাঙলাদেশেও তাই চলেছে–চলছে রাষ্ট্র শক্তির প্রশ্রয়ে এ বেপরওয়া–বেদেরেগ প্রাশাসনিক ও ব্যবসায়িক লুঠ। দেশে নীতিনিষ্ঠ বিবেকবান আদর্শপ্রবণ মাটি ও মানুষ প্রেমিক শাসক-প্রশাসক ও শিক্ষিত বৃত্তিজীবীর একান্ত অভাব রয়েছে বলেই এসব সম্ভব হচ্ছে।

সব জাতকেরই জনক থাকে। সব করণের থাকে করেন বাঙালীরা পাকিস্তানীর শোষণ ও বঞ্চনা প্রতিরোধ করতে চেয়েছিল, চেয়েছিল ন্যায্য দাবি আদায় করতে ও স্বাধিকারে স্বপ্রতিষ্ঠহতে—পাকিস্তান ভাঙতে চায়নি। ছয় দফায় অন্তত স্বাধীনতার স্বপ্ন প্রকাশিত কিংবা আভাসিত হয় নি। পাকিস্তান কার্যত ভাঙনের ক্ষমতালিপ্সু কিন্তু জনপ্রিয় পশ্চিম পাকিস্তানী নেতা জুলফিকার আলী ভুটো। তিনি স্পষ্ট উচ্চারণে দ্ব্যর্থহীন ভাষায় বললেন–জাতীয় সংসদে নির্বাচিত সদস্যদের সংখ্যাগুরু দলের দুই নেতা মুজিব ও ভুট্টো স্ব স্ব এলাকায় প্রধান মন্ত্রীরূপে শাসন ক্ষমতায় থাকবেন–অর্থাৎ কার্যত দুটো পৃথক রাষ্ট্র রূপেই পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তান স্থিতি লাভ করবে। এর পরে বাঙালীকে ঐতিহাসিক দৃষ্টিতে পাকিস্তান ভাঙার জন্যে নিন্দা বা প্রশংসা করা যায় না।

বলেছি এবারও স্বাধীনতা হল না পুরোপরি স্বার্জিত। এবারও স্বাধীনতা একাধারে লব্ধ ও প্রাপ্ত। তাই এবারও লুটপাট হল প্রধান লক্ষ্য।

তাছাড়া, এ কালে স্বাধীনতা মানে যে–স্বদেশী, স্বজাতি, স্বধর্মী, স্বভাষী–আত্মীয় শাসন নয়, রাষ্ট্রবাসীর অশন-বসন-নিদানের সুষ্ঠু ব্যবস্থায়ও স্বাধীনতা পূর্ণতা পায় না–দেহে-আত্মায়, চিন্তায়-চেতনায়, মনে-মননে, কর্মে-আচরণে অন্যের প্রতি জুলুম এড়িয়ে নির্বিঘ্নে আত্মপ্রকাশের ও আত্মবিকাশের স্বাধীনতা পাওয়া এবং আর্থ-সামাজিক জীবনে হামলামুক্ত থাকা, স্বচ্ছন্দে স্বস্তি-সুখে জীবন যাপনের প্রতিবেশ পাওয়াই হচ্ছে যথার্থ ও বাঞ্ছিত স্বাধীনতা। অজ্ঞ ও অনক্ষর এমনকি তথাকথিত শিক্ষিত মানুষের স্বাধীনতা সম্বন্ধে এ ধারণার অভাব থাকায়, তথাকথিত রাষ্ট্রিক সার্বভৌমত্বই পূর্ণাঙ্গ স্বাধীনতা বলে বিবেচিত হওয়ায় মাটির ও মানুষের উন্নয়ন ও উৎকর্ষ লক্ষ্যে আদর্শনিষ্ঠ বিবেকবান শ্রেয়োনীতিনিষ্ঠ কোন পরার্থপর নেতা, দেশ ও মানুষ প্রেমিক কোন শাসক-প্রশাসক-আমলা কিংবা ন্যূনতম মাত্রার সৎ ঠিকেদার-কারখানাদার-আড়তদার-মৌজুতদার-চালানদার দালাল-ফড়ে প্রভৃতি বৃত্তিজীবী বাঞ্ছিত সংখ্যায় এবারও পাওয়া গেল না।

কাজেই ব্যবহারিক বৈষয়িক জীবনাচারে কথায় কাজে আচরণে মানুষ প্রাত্যহিক জীবনে কেবলই পরস্পরকে ভেজালের জালে আটকাচ্ছে, এবং প্রলুব্ধ করছে ভেজাল-মহিমায়, আকৃষ্ট করছে কেড়ে খাওয়ার ও মেরে তাড়ানোর সুফলপ্রসূ তত্ত্বে। বাঞ্ছিত ন্যায়নীতির প্রয়োগ-প্রত্যাশা এখন প্রায়ই আকাশ কুসুম, কারুর কথায় ও কাজে আস্থা রাখা, কাউকে বিশ্বাস করা এখন কেবল সরল বলে চিহ্নিত বোধ-বুদ্ধিহীন মানুষেই সম্ভব। তাই আজকেও স্বাধীন বাঙলাদেশে গণতন্ত্র চালু রাখাও হল না সম্ভব। এখন জনসমাজে ও রাষ্ট্রে প্রবচনের প্রায়োগিত নীতি হচ্ছে 'জলুম' আর দুর্বলের বাঁচার সম্বল হচ্ছে 'সহন'। ক্রমবর্ধমান মুদ্রাস্ফীতির ফলে খেয়ে-বাঁচা প্রায় অসম্ভব হয়ে ওঠায়, দেহে-সাহসে প্রবল, বিবেক-রিক্ত সংবেদনহীন মানুষেরা নিঃসঙ্কোচ হত্যায়, লুণ্ঠনে, প্রতারণায় বাঁচার পথ ধরেছে। এদের সংখ্যা বাড়ছে। এভাবে দেশে-কালে-সমাজে দুর্জন দুর্বৃত্ত ও দুঃশাসক সংখ্যাগুরু হয়ে উঠছে।

এমনি করে মানুষের নৈতিক-চেতনা যখন শূন্যের কোঠায় নামবে, কাড়াকাড়ি, মারামারি, হানাহানি প্রত্যেক দ্বিতীয় ব্যক্তির জীবন-জীবিকা বিপন্ন করবে, তখন প্রবলও আর নির্বিঘ্নে-নিরাপদে 'জুলুম' চালিয়ে যেতে পারবে না। সবল-দুর্বল সবাই খুন-খারাবি প্রবণ হবে, তখন সেই আরণ্য জীবনের ত্রাস থেকে ত্রাণ লক্ষ্যে মরীয়া হয়ে নীতিনিয়মের নিগড় স্বেচ্ছায় বরণে উদ্যোগী হবে মানুষ। নেতৃত্ব দেবেন গণমানব প্রেমী শ্রেয়োবুদ্ধি সম্পন্ন সাহসী চিন্তানায়ক-যিনি নিজের ও গণমানবের স্বার্থে নিজের ও মানুষের জন্যে গণমানবের হয়ে করবেন দ্রোহ, করবেন সংগ্রাম, ঘটাবেন বিপ্লব। আমাদের সে-দিনের প্রতীক্ষায় থাকতেই হবে। শ্রেয়োচেতনাবশে যখন আমাদের শক্তিমানদের সামাজিক ও রাষ্ট্রিক দায়িত্ববোধ ও কর্তব্যবুদ্ধি জাগল না, তখন রূঢ় আঘাতজাত যন্ত্রণায় বিপর্যয়ের অভিঘাতপ্রসূত বেদনায় তাদের মানবমুখী দায়িত্ব-চেতনায় প্রবুদ্ধ করতে হবে। এর নাম বিপ্লব। সমাজ পরিবর্তন লক্ষ্যে ঘটবে এ বিপ্লব। সাফল্যে প্রতিষ্ঠিত হবে সমাজতন্ত্র। গণ-মানবের মুক্তি আসবে, দুঃশাসন-দুর্নীতি আর শোষণ-পীড়ন ঘুচবে এভাবেই।

তবে আপাতত, দুর্নীতি, দুর্ভোগ, দুর্দিন দুঃসহ দুরবস্থা সহ্যসীমার মধ্যে আটকে রাখার জন্যে চাই, মাটি ও মানুষপ্রেমী গণকল্যাণকামী পরার্থপর সৎ ও কর্মনিষ্ঠ বিদ্বান ও বুদ্ধিমান আদর্শনিষ্ঠ ব্যক্তিত্বসম্পন্ন একক বা একাধিক মানুষের নেতৃত্ব ও কর্তৃত্ব, যিনি বা যাঁরা নিজের স্বার্থে অপরের ক্ষতি করবেন না, যিনি বা যাঁরা স্বদেশের সব সৎ ও মজলুম মানুষের সুখ-দুঃখের, আশা-ভরসার, লাভ-ক্ষতির সম ও সহভাগী থাকতে সদা প্রস্তুত। বলা বাহুল্য এর জন্যে এক কথায় চরিত্রবান মানুষ প্রয়োজন। ন্যায়নীতি এবং দায়িত্ব-কর্তব্য চেতনা ও নিষ্ঠাই চরিত্র। আজ এমন প্রত্যাশিত গুণের বুদ্ধিজীবীর সংঘ, রাজনীতিকদের দল, নাগরিকদের সংস্থা, তরুণ শিক্ষার্থীদের পর্ষদ, শ্রমিকদের সমিতি এবং কৃষকদের সংহতি শিবির আবশ্যিক। এ সব সংঘ-সংস্থা-পর্ষদ-সমিতি-শিবির আপোসহীন-বিরামহীনভাবে সর্বত্র সর্বপ্রকার জুলুম প্রতিরোধ আন্দোলন চালাবে, থাকবে প্রতিবাদে মুখর, প্রতিরোধে দৃঢ়, প্রতিকারে নিষ্ঠ। আর শাস্ত্রে-সমাজে সরকারে শিক্ষালয়ে এবং আমদানি-রপ্তানির নীতিতে উৎপাদন-নির্মাণের কারখানায়, ও ক্রয়-বিক্রয়ের বাজারে সর্বপ্রকার দুর্নীতি দুর্বৃত্তির ও ভেজাল-বঞ্চনার বিরুদ্ধে সার্বক্ষণিক আন্দোলন চালিয়ে যাবে। এতে অনুপ্রাণিত হয়ে কিছু আত্মমর্যাদাবান, আদর্শনিষ্ঠ, সংযমী মানুষ সমাজের প্রতি দায়িত্বচেতন ও কর্তব্যবুদ্ধিসম্পন্ন বিবেকবান মানবসেবী মানুষ তৈরি হবে। আপাতত এসব ব্যবস্থাকেই উন্নতির উপায় রূপে বরণ করে সুফল প্রাপ্তির পরীক্ষা ও প্রতীক্ষা করা যেতে পারে। আসলে নানা বৃত্তি-বেসাতের শক্তিমান ও বুদ্ধিমান মানুষ চরিত্রবান হলেই

দেশের উন্নতির প্রত্যাশিত মাত্রা ও গতি স্বাভাবিক থাকে। কাজেই আবার বলছি আমাদের যা' অভাব তা' হচ্ছে চরিত্র। এ চরিত্রই উন্নতির উৎস বা পুঁজি। যে ভাবেই হোক কিছু চরিত্রবান নেতা শাসক ব্যবসায়ী চাই। একালে মানুষের ব্যক্তিক, সামাজিক ও রাষ্ট্রিক তথা ব্যবহারিক, ব্যবসায়িক, ও প্রাশাসনিক কর্ম ও আচরণ নিয়ন্ত্রিত হতে হবে সুনির্দিষ্ট লক্ষ্যে ও অঙ্গীকারে অর্থাৎ ব্যক্তিজীবনে মর্যাদা ও স্বাতন্ত্র্য, সামাজিক জীবনে সাম্য ও স্বাধীনতা, সাংস্কৃতিক জীবনে সংস্কারমুক্তি ও গ্রহণশীলতা, আর্থিক জীবনে সমসুযোগ ও সুবিচার, রাষ্ট্রিক জীবনে দায়িত্ব চেতনা ও অধিকারবোধ প্রভৃতি রক্ষা করার লক্ষ্যে ও অঙ্গীকারে।

কালের দাবি ও রাজনীতি

দেশের দাবি বলতে দেশের মানুষের, সমাজের, রাষ্ট্রের ও সরকারের নানা চাহিদা ও তাদের পূর্তি বোঝায়। সে-চাহিদা ও পূর্তি নিত্যকার প্রাত্যহিক সমস্যার সমাধানের বিষয়। একারণে তা কখনও চিরকালের জন্য পূরণ করা চলে না। চলমান জীবনের ও জীবনযাত্রার পথের বাঁকে বাঁকে দেখা দেয় নতুন সঙ্কট, নতুন প্রয়োজন, নতুন সমস্যা তেমনি নতুন সম্ভাবনা ও নতুন সম্পদও। কাজেই সঙ্কট, সমস্যা, সম্পদ ও সম্ভাবনা সব কিছু নিয়েই প্রবহমান জন-জীবন। এজন্যেই প্রতি মুহূর্তেই কোথাও-না-কোথাও কারও-না-কারও জীবনে, সমাজে, সরকারে কোন-না-কোন সঙ্কট-সমস্যা-চাহিদা যেমন দেখা দিচ্ছে, তেমনি নতুন সম্পদ-সম্ভাবনাও নতুন আশা, আশ্বাস ও প্রত্যাশা জাগাচ্ছে। এমনি হরণে-পূরণে, আনন্দে-যন্ত্রণায়, সমস্যায়-সম্ভাবনায় জীবন চলমান। এ যুগে দেশের দাবি তথা গণদাবি প্রতি ব্যক্তির মৌল মানবিক দাবি বোঝায়। এছাড়াও আধুনিক রাষ্ট্রে মানুষের স্বাস্থ্যের, সুখের, আনন্দের, বিলাসের,ক্রীড়ার, সৌন্দর্যোপভোগের, আমোদ-প্রমোদের, মননের, চিন্তনের এবং শাস্ত্র-সমাজ-সংস্কৃতি-সরকার সম্বন্ধীয় ভাবনা-চিন্তার প্রতিষ্ঠান-অনুষ্ঠান করার আয়োজনের অধিকার দান, উপকরণ যোগান, উদ্যান-উপবন-যাদুঘর-চিড়িয়াখানা স্থাপন, আর্থিক সাহায্য ও নৈতিক সহায়তা দান প্রভৃতিও সরকারের কাছে জনদাবির অন্তর্ভুক্ত।

অতএব দেশের মানুষের বারোমেসে দাবির এক হিসাবে অন্ত নেই। সব মানুষের দাবি মেটানো রাষ্ট্রের বা সরকারের পক্ষে আর্থিক, মানসিক, শাস্ত্রিক, নৈতিক, সামাজিক ও আদর্শিক কারণে সম্ভব হয় না। তাই চাওয়া-পাওয়ার সমস্যা কখনও ঘোচে না। তাই রাষ্ট্রে জনদাবি ও সরকারি অসামর্থ্যের টানাপোড়েনে লঘু-গুরু দ্বন্দ্ব-সংঘাত এবং ক্ষোভ-রোষ, বিবাদ-বিরোধ, বাদ-প্রতিবাদ, প্রতিরোধ-প্রতিশোধ প্রভৃতি আন্দোলন কোলাহল কিংবা সংঘর্ষ রূপে প্রায় নিত্যকার প্রাত্যহিক ঘটনা হয়েই থাকে। এ-কারণেই দেশের তথা রাষ্ট্রান্তর্গত মানুষের দাবি অশেষ ও জটিল। জল আর ঢেউ, রবি আর রোদ মূলে অভিন্ন হলেও যেমন পৃথক রূপে অনুভব ও চিহ্নিত করা যায়, তেমনি দেশের দাবি ও কালের দাবি মূলে এক হলেও কালের দাবিকে আলাদা করে চিহ্নিত করা ও তা পূরণ করা সম্ভব, এবং এ যুগে আবশ্যিকও।

ভৌগোলিক অর্থে দেশ চিরকেলে; জাত বর্ণ গোত্র ভাষা শাস্ত্র প্রভৃতির দিক দিয়েও মানুষ বদলায় না; কিন্তু মানুষের জীবন আর জীবিকা কিংবা শাস্ত্র, সমাজ ও সরকার বাহ্যত যতটা

দেশগত, তার চেয়ে অনেক বেশি কালগত। কালই পরিবর্তন, বিবর্তন, উদ্বর্তন কিংবা বিনাশ ঘটায়। প্রতি মানুষের রয়েছে স্ব স্ব মন-মতের বিচিত্র জগৎ, তেমনি প্রতি প্রজন্মে ঘটে জগতের রূপান্তর। এইভাবে মানুষ এগিয়েছে প্রবহমান জীবনে। মানুষের ইতিহাস স্থানে-কালে লঘু-গুরু দ্রুত-মন্থর গতিতে চলার ধারাবাহিক ইতিবৃত্ত মাত্র। যাঁরা যুগন্ধর বা যুগস্রষ্টা, যাঁরা নবী-অবতার, যাঁরা মহামানব বা মহানেতা রূপে গোত্রীয়, দৈশিক ও সামাজিক জীবনে মান্য ও শ্রদ্ধেয়, তাঁরা স্ব স্ব কালের স্থানের বা গোত্রের মানুষের কালের দাবি মিটিয়েই হয়েছেন শরণীয় ও স্মরণীয়।

এক বিশেষ দেশে ও কালে শাস্ত্র, সমাজ ও সরকার শাসিত জন-জীবনে প্রাত্যহিক নানা সমস্যার মধ্যে একটা সমস্যা যখন দেশে কালে প্রবল-প্রচণ্ড হয়ে সঙ্কট সৃষ্টি করে, তখন অভাব হয় তীব্র, জীবন হয় দুর্বহ, যন্ত্রণা হয়ে ওঠে অসহ্য, জীবনযাত্রায় প্রকট হয় অচল হবার আশঙ্কা। এই কালোত্থিত সঙ্কট-সমস্যার সমাধান দিয়ে গোত্রকে বা দেশবাসীকে যিনি নবজীবন দান করতেন—তিনিই ত্রাতা, নেতা, মহা-পুরুষ, নবী, অবতার বা দেবতা নামে খ্যাত হতেন পূর্বকালে।

মানুষের কালগত জীবনের ও জীবিকার ক্ষেত্রে সঙ্কট ও সমস্যা উপলব্ধি করা এবং তার সমাধানের উপায় উদ্ভাবনের বা আবিষ্কারের সামর্থ্য থাকাই হচ্ছে কালোপযোগী যোগ্যতা। এ যাঁর থাকে, দৈশিক ও কালিক নেতৃত্ব তাঁরই। জোসেফ বা ইউসুফ নবী একদিন খাদ্যাভাবজাত আসন্ন মৃত্যু থেকে তাঁর গোত্রকে ও মিশরবাসীকে বাঁচিয়েছিলেন; তাই সেমেটিকরা আজও তাঁকে কৃতজ্ঞতার সঙ্গে স্মরণ করে। একদিন মুসা আসন্ন বিলুপ্তি থেকে রাজরোষে পতিত স্বগোত্রকে বাঁচিয়েছিলেন গোপনে সদলে মিশর ত্যাগ করে। বর্ধমান মহাবীর ও গৌতম বুদ্ধ স্বাধিকার-বঞ্চিত শোষিত নিপীড়িত মানব ও মানবতাকে মুক্ত করেছিলেন দেবদ্বিজবেদদ্রোহী হয়ে। তাই তাঁরা আজও লোকবন্দ্য মহামানব।

একালে 'সঙ্কটে যাঁরা মধুসূদন' তাঁদের দেবতা, ত্রাণকর্তা, নবী, অবতার বলা হয় না বটে, কিন্তু তাঁরাই মহান নেতার বা ত্রাণকর্তার সম্মান ও শ্রদ্ধা পেয়ে থাকেন। তাঁরাও জাতিও পিতা, বা বন্ধু কিংবা দেশগৌরব অভিধায় প্রশস্তি পান। এ যন্ত্রযুগে পৃথিবী সংহ ও দৃষ্টির পরিসরে সীমিত হওয়ায় ভৌগোলিক ব্যবধান ঘুচিয়ে মানুষ মাত্রই আজ পরস্পরের নিকট-প্রতিবেশী। তাই কোন বিশেষ দেশের বা রাষ্ট্রের, এলাকার বা অঞ্চলের, জাতির বা সমাজের সঙ্কট-ত্রাণের বুদ্ধিপরামর্শ পৃথিবীর যে-কোন জ্ঞানী মনীষী থেকে নেয়া যেতে পারে, কিংবা সদৃশ সঙ্কট থেকে উদ্ধার-পাওয়া যে-কোন দেশের বা রাষ্ট্রের অনুসরণে চেষ্টা চালানো যেতে পারে। ভাত-কাপড়ের অভাবগ্রস্ত দেশের নিঃস্ব নিরন্ন মানুষকে বাঁচানোর বাস্তব পথ-পদ্ধতির প্রদর্শক হিসেবেই আজ মার্কস, এঙ্গেলস, লেনিন, মাও সে-তুঙ দেশ-জাত-নিরপেক্ষ বঞ্চিত-শোষিত বিশ্বমানবের নিত্যস্মরণীয় নেতা।

প্রাণী নির্বিশেষের যা প্রথম ও প্রধান এবং চিরন্তন সমস্যা, সে-খাদ্যের অভাব আমাদের আজও তীব্রতম। কাজেই আমাদের দৈশিক রাষ্ট্রিক এবং মানবিক কালগত সমস্যা হচ্ছে ধড়ে প্রাণ ধরে রাখার জন্যে নিতান্ত কয় মুঠো ভাতের এবং নগ্নতা ঢাকার জন্যে এক টুকরো কাপড়ের ব্যবস্থা করার। আমাদের দেশে ১৯৮৬ সনের এ-মুহূর্তেও কালের দাবি হচ্ছে ভাতে-কাপড়ে নিশ্চয়তার নিরাপত্তার দাবি। নিবাস-নিদান-শিক্ষা-স্বাস্থ্য এসব প্রত্যাশা স্বপ্ন হয়ে আপাতত মাথায় থাক!

এ শতকের গোড়া থেকেই অন্নে-বস্ত্রে সাচ্ছল্য দানের পথ-পদ্ধতি জানা হয়ে গেছে। তবু আমাদের দাবি মেটে না কেন? ঘোচে না কেন অনাহারের যন্ত্রণা? মোচে না কেন অকালে অপমৃত্যুর নিয়তি? এর জন্যে দায়ী কারা?-নিঃস্ব-নিরন্ন-নিরক্ষর-নিঃসহায় জনগণ, কিংবা রাজনীতিক, কিংবা তথাকথিত জাতীয় নেতা ও কর্মীরা। মানুষের জীবন-জীবিকার কালগত দাবি পূরণই কি রাজনীতির প্রথম ও প্রধান লক্ষ্য নয়? আমরা কি জানি না যে ভরসা করবার মতো যোগ্য নেতৃত্ব পেলে দেশের বঞ্চিত শোষিত শ্রমিক-কৃষক-ক্ষেতমজুর এবং দুঃস্থ বৃত্তিজীবীরা ঘুম-ভাঙ্গা শার্দুলের মতো কিংবা আহত সিংহের মতো স্বাধিকারের সংগ্রামে ঝাঁপিয়ে পড়বে?

গাঁয়ে গাঁয়ে সম্পন্ন গৃহস্থ থাকে দু-চার ঘর, শত শত পরিবার থাকে বিপন্ন অবস্থায়। বছরের আষাঢ় আশ্বিন কিংবা কার্তিক অবধি তাদের অনেকেরই অর্থাভাবজাত অন্নাভাব থাকে। ক্ষেতমজুর ও প্রান্তিকচাষী ছাড়াও বিভিন্ন বৃত্তিজীবী মানুষও গাঁয়ে গাঁয়ে পুরুষানুক্রমে চিরদারিদ্র্যের শিকার। ঝড়-ঝঞ্ঝা-খরা-বৃষ্টি-বন্যার কবলে পড়লে দেখা দেয় দুর্ভিক্ষ-মহামারী, উচ্ছন্ন হয় পরিবার, উজাড় হয় গাঁ। অনাহারে-অর্ধাহারে অপাহারে পুষ্টির অভাবে অকালে মৃত্যুবরণ তাদের নিয়তি। কে বাঁচাবে তাদের? কতকাল অপেক্ষায় থাকবে তারা ত্রাণকর্তার প্রত্যাশায়?

দেশের রাজনৈতিক দলগুলো জনকল্যাণের আস্ফালন ত্যাগ করে, নির্বাচন-পূর্ব কপট বড় কথা ছেড়ে, জনসেবায় আন্তরিক হয়ে গাঁয়ে গাঁয়ে গণসাক্ষরতায় যদি ব্রতী হত, তাহলে এত দিনে দেশের প্রায় সব লোকই হত দৈনিক পত্রিকা পড়ার মতো সাক্ষর ও শিক্ষিত। আর তার ফলে এদের মধ্যে যে স্বাধিকারচেতনা জাগৃত, আর্থিক মুক্তির লক্ষ্যে শোষণ-বঞ্চনার বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াবার মতো যে ক্ষোভ ও ক্রোধ-জাত শক্তি সাহস ও সঙ্কল্প দানা বেঁধে উঠত, তাতে অনেক আগেই চাষী-মজুরের নেতৃত্বে মুক্তির পথ হতে পারত উন্মুক্ত।

উন্নয়নশীল দেশে রাজনীতিক ও গণমানব

যন্ত্রের ও কৃৎকৌশলের উদ্ভাবনের ও উৎকর্ষের ফলে গোটা পৃথিবী যখন মনের, মননের ও চোখের আয়ত্তে এল, যন্ত্র যুগে যখন মানুষের জীবনের ও জীবিকার ক্ষেত্রে প্রায় সর্বাত্মক পরিবর্তন এল; যখন জীবন সমাজ ও রাষ্ট্র সম্পৃক্ত পুরোনো ধারনা ও প্রয়োজন বদলালো, যখন শাস্ত্র, সমাজ ও সরকার-অন্বিষ্ট পুরোনো জীবনাচার অকেজো ও আশু পরিহার্য হয়ে পড়ল, সে-সময়েই যন্ত্র-যুগের পরিবর্তিত জীবনপ্রতিবেশে য়রোপের প্রধান প্রতিযোগী প্রতিদ্বন্দ্বী শক্তিগুলো দ্বন্দ্বে-সংগ্রামে অবতীর্ণ হয়ে সংঘর্ষে-সংঘাতে ও অর্থে-বিত্তে-বাণিজ্যে ক্ষতিগ্রস্ত হয়ে, শিল্পে-সম্পদে দরিদ্র হয়ে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের অবসান মুহূর্ত থেকেই আফ্রো-এশিয়ার ও লাতিন আমেরিকার উপনিবেশগুলো ছাড়তে বাধ্য হল।

মনে-মননে, শিক্ষায়-বাণিজ্যে, অর্থে-সম্পদে, চারুকারু-দারুকলায়, সাহিত্যে-চিত্রশিল্পে, বিজ্ঞানে-দর্শনে নিঃস্ব কিংবা নগণ্য বা অনুল্লেখ্য উপনিবেশগুলোর কোন কোন মানুষের মনে

স্বাধীনতার বাঞ্ছা জাগলেও, তা' বাস্তবে অসম্ভব বলেই জানত। {ব্রিটিশ ভারতও ১৯৩০ সনের পূর্বে 'স্বাধীনতা' শব্দ উচ্চারণ করতে সাহস পায়নি]।

কিন্তু ক্ষয়িষ্ণু সাম্রাজ্যবাদীরা নিজেদের বোঝা লাঘবের গরজে স্বস্তিসুখের প্রত্যাশায়—আত্মসম্মান রক্ষার প্রয়োজনে ছদ্ম আস্ফালন করলেও শাসিতজনেরা চাওয়ামাত্রই আকস্মিকভাবে রাজি হয়ে গেল তল্পী গুটাতে। ফলে দেশের ভিতরে-বাইরে মানুষের শৈক্ষিক আর্থিক বাণিজ্যিক ও শৈল্পিক যোগ্যতা অর্জনের ও মানসপ্রস্তুতির পূর্বেই উপনিবেশগুলোর অজ্ঞ-অনক্ষর-অস্বস্থ মানুষেরা পেয়ে গেল স্বাধীনতা। এ নিয়ে কি করবে, কি করতে হয়, কেন করতে হয়, কিছুই না জেনে না বুঝে হতবুদ্ধি হয়েই পড়ে রইল গাঁয়ে-গঞ্জে আশাহীন ভাষাহীন মূক দীন-দুর্বল গণমানব। আর গাঁ-গঞ্জের ধূর্ত-মুৎসুদ্দি-টাউটরা ও শিক্ষিত শহুরে উকিল-ডাক্তার-ঠিকেদার-সওদাগর-আড়তদার-মৌজুতদার-কারখানাদার-দালাল-ফড়ে-দেওয়ান-পীড়ক-লুঠেরা সাম্রাজ্য শাসকদেরও চেয়ে নির্মম হয়ে সারাদেশটা লুটে-পুটে খায়—দেশের নামে, জাতির নামে এবং স্বাধীনতার অতন্দ্র প্রহরীর দায়িত্ব বহনের বুলি আওড়িয়ে, জনকল্যাণে কর্তব্য পালনের জিগির তুলে, আরো নানা ভাঁওতা দিয়ে এরাই চালায় শাসন-শোষণ, কুড়ায় ধন-মান-যশ, প্রভাব ও প্রতিপত্তি।

এ শিক্ষিত শহুরে মধ্যশ্রেণী বা মধ্যবিত্ত সমাজ তথা বুদ্ধিজীবী (INTELLIGENTSIA) নামের চরিত্রহীন কিংবা আদর্শহীন, দেশের ও মানুষের প্রতি প্রীতিহীন মতলববাজ-চালবাজ-ধাপ্পাবাজ ধূর্তলোকেরা দেশ স্বাধীন হওয়ার পূর্বে তবু দেশ স্বাধীন করার তথা দেশের স্বাধীনতা অর্জনরূপ স্বার্থের বিরুদ্ধাচরণ না করার একটা নৈতিক-সামাজিক দায়িত্ব বা বন্ধন স্বীকার করত। সেজন্যেই কথায় কথায় মন, মত ও দল বদলানো অনেক ক্ষেত্রে স্বদেশপ্রেমের অভাব কিংবা দেশদ্রোহিতা বলে ব্যাখ্যাত হবার আশঙ্কা থাকত। আর সরকার পক্ষে যারা থাকত তাদের লোকে ব্রিটিশ মুৎসুদ্দি ও জনশত্রু বলেই জানত এবং ঘৃণার চোখে দেখত।

স্বাধীনতা-উত্তরকালে তাদের আর ওই আদর্শিক প্রেরণা কিংবা নৈতিক কোন দায়িত্ব থাকে না, থাকে না কোন গণধিক্কারের ভয়, কারণ তখন দল বা মত বদলানো স্থূলদৃস্টিতে দেশদ্রোহিতা নয়, নয় গণমানবস্বার্থ বিরোধিতা। তখন প্রয়োজনে অর্থাৎ ব্যক্তিগত স্বার্থ ও লাভ-লোভ লক্ষ্যে যখন যেমন হওয়া বা করা লাভজনক, তা-ই হতে বা করতে শরম-সংকোচ দ্বিধাবোধ করে না। এ সব সুবিধাবাদী সুযোগসন্ধানী বেহায়া বেশরম চালবাজদের প্রতি গণধিক্কার থাকে না বলে দিন দিন এদের সংখ্যা বাড়তে থাকে। গণধিক্কার থাকেনা, কারণ ওদের বলা হয়েছে রাজনীতিতে ও ব্যবসায়ে কিছু কিছু চালবাজী ও ধাপ্পাবাজী আর বেঈমানী প্রয়োজন, তাই জায়েজ অর্থাৎ দূষণীয় নয়। অতএব যারা সামন্তবুর্জোয়া-সংস্কার চালিত, যারা প্রতিক্রিয়াশীল এবং গণশ্রেয়োবুদ্ধি বা বিবেক চালিত নয় যারা, তারা ধন-মান-ক্ষমতা ও প্রতিপত্তি লোভে সরকারী দলে থাকতে চায়। আফ্রো-এশিয়ায়, লাতিন আমেরিকায় সাধারণভাবে সামরিক শাসন চলে বলে, সেনা শিবিরেও ঘটে কোন্দল ঘটিত প্রতি-অভ্যুত্থান। আর মাঝে মাঝে যে গণতন্ত্র নামের বিচিত্র বেসামরিক শাসন চলে, তাতেও চলে ক্ষমতার কাড়াকাড়ি। ফলে রাজনীতি অঙ্গনে ওই পেশাধারী রাজনীতিকদেরও ঘন ঘন বদল করতে হয় দল। তারা মনে করে, দেশ যখন স্বাধীন তখন সুখে-দুঃখে দেশ স্বাধীনই থাকবে, কাজেই নিশ্চিন্তে লক্ষ-কোটি টাকা লুট করে স্বজন ও স্বপরিজন নিয়ে স্বল্পকালেই ধনী-মানী হয়ে সমাজে প্রতিষ্ঠিত হলেই বাপের নাম আর নিজের স্বস্তি স্থায়ী হয়, এতে দেশের ক্ষতিইবা কি, বরং নতুন একজন ধনী-মানী মানুষ সমাজের শোভা বাড়ায়।

আদর্শিক কোন প্রেরণা নেই বলেই, মানববাদী বা জনকল্যাণকামী নয় বলেই, দেশের মাটির ও মানুষের প্রতি মানবিক দায়িত্ববোধ ও কর্তব্য-চেতনা নেই বলেই, এ সামন্তবুর্জোয়া সংস্কার চালিত পরাশক্তির অনুগ্রহলুব্ধ ও নিয়ন্ত্রিত রাজনীতিকরা স্ব-স্ব স্বার্থে দুর্নীতিবাজ ও আপাত সুখলিপ্সু হয়। ফলে দেশে দুর্নীতি বাড়ে, সে-সঙ্গে বাড়ে জীবনে জীবিকায় আর্থিক নিরাপত্তার অভাব। আর অভাব যতই বাড়ে, নিরাপত্তা যতই অনিশ্চিত হয়ে পড়ে, বাঁচবার গরজ এবং আকুলতাও হয় তীব্র। তাতে দুর্নীতি প্রবণতাও বৃদ্ধি পায় অধিক মাত্রায়। ফলে অনুন্নত দেশে বাঁচার গরজ, প্রতিষ্ঠিত থাকার প্রেরণা এবং আর্থিক অনিশ্চয়তা এড়ানোর লক্ষ্যে প্রতিষ্ঠাপ্রাপ্তিবাঞ্ছা মানুষকে বেপরোয়া বেসামাল বেহায়া প্রতারক হবার প্রণোদনা দেয়। বাঁচার—নিতান্ত SURVIVAL-এর গরজ বোধে অনুন্নত রাষ্ট্রের মানুষ পরিণামে ন্যায়-নীতি-আদর্শ-বিবেক-সংযম-সৌজন্য বিবর্জিত প্রাণীতে পরিণত হয়। তখন ছল-চাতুরী প্রতারণাই হয় তার বাঁচার প্রকৃষ্ট পন্থা। তখন অসাধু অসংযত স্বার্থবাজ মানুষে পরিবার, সমাজ ও রাষ্ট্র হয় আকীর্ণ। জীবনে মহৎ উদার রূপের ধারণা, প্রীতি-করুণা-মৈত্রী স্নিগ্ধ অনুভব, ন্যায়-নীতি শ্রেয়োবোধ সঞ্জাত বিবেকী আত্মার হিতৈষণা এবং বহুজনহিতে বহুজনসুখে বাঁচার ও স্বাধিকারে সমস্বার্থে সহিষ্ণুতায় সহযোগিতায় সহাবস্থানের অঙ্গীকারে সংযমে সৌজন্যে সেবায় সততায় সম্প্রীতিতে বাঁচার আগ্রহ হয় দুর্লক্ষ্য। তখন কাড়াকাড়ি, মারামারি ও হানাহানি করে বাঁচাই বেঁচে-বর্তে থাক্যার একমাত্র উপায় বলে বিবেচিত হয়।

দরিদ্র রাষ্ট্রের শিক্ষিত শহুরে মানুষ তাই অতিমাত্রায় স্বার্থপর, প্রতারক, প্রবঞ্চক, ফিকিরসন্ধানী ফন্দিবাজ ও সন্দেহপ্রবণ। ঠিকেদারী, সদাগরী, কালোবাজারী, কারখানাদারী, আড়তদারীর মতো এখানে রাজনীতিও হচ্ছে দাঁও মারার পন্থা মাত্র। তাই সামরিক ও বেসামরিক সরকারের উঠতি-পড়তির সময়ে মন-মত-দল বদলানো সব বয়সেরই পেশাদার রাজনীতিকদের পেশাগত নীতি । ফলে হর-হামেশাই আমরা এমনি বেহায়া বেশরম বেপরওয়া ভাড়াখাটা রাজনীতিক অধিক সংখ্যায় দেখতে পাই। এরাই সরকার-প্রধানের আহ্বানে রাতারাতি সরকারী দল গড়ে তোলে। তাই এসব দেশে বুলির রাজনীতি আর কাজের রাজনীতি কখনো অভিন্ন থাকে না। এমনি অবস্থায় গণমানবের দুঃখ দৈন্য যন্ত্রণা ঘুচবার কথা নয়।

য়ুরোপীয়দের প্রাক্তন উপনিবেশ বিশ্বের এসব তথাকথিত স্বাধীন সার্বভৌম রাষ্ট্রে নগণ্য সংখ্যক শিক্ষিত শহুরে মানুষের আর একটি দলও থাকে। তারা বহুজনহিত ও বহুজনসুখকামী মানব-প্রেমী মানববাদী গণমানবসেবী ন্যায়বান ও হৃদয়বান মানুষ। তাদেরও একাংশ হচ্ছে কৃপা করুণা পরবশ সামাজিক সুবিচারবাদী। তাদের সদিচ্ছা থাকলেও একালে গণমানবের দুঃখ ঘোচানোর সাধ্য তাদের নেই। রোটারী-লায়ন ক্লাবওয়ালারা বিবেকহীন দুর্নীতিবাজ নির্মম শোষক হয়েও গোপনে গরু মেরে প্রকাশ্যে গণ মানবকে জুতা দান করার ঔদ্ধত্যে ধন্য। এভাবে মানুষকে অপমান ও বিদ্রুপ করার জন্যে কেউ এদের নিন্দাও করে না, বরং তারিফ করে।

আর অন্য অংশ হচ্ছে মার্কসবাদী বা বামপন্থী। এঁরা আর্থিক সুবিচারবাদী। অর্থসম্পদ উৎপাদনে-বন্টনে, আবশ্যিক চাহিদানুসারে কিংবা শ্রমবিনিময়ে, আনুপাতিক হারে কিংবা সুষম বন্টনে বাঁচতে এবং বাঁচাতে চান মানুষকে। অশনে বসনে নিবাসে নিদানে মানুষের নিম্নতম চাহিদা মেটানো লক্ষ্যেই এঁদের আন্দোলন।

এ আন্দোলনে শোষক-শোষিতে, পীড়ক-পীড়িতে, শাসক-শাসিতে দ্বন্দ্ব-সংগ্রাম, সংঘর্ষ-সংঘাত অপরিহার্য। এতে দৈহিক জ্বালা-যন্ত্রণার, জেল-ফাঁসির তথা জান-মাল-গর্দান হারানোর

ঝুঁকি সার্বক্ষণিক। তাই এ দলে লোক সহজে জোটে না এবং কমই জোটে, ফলে এঁদের সাফল্য-সম্ভাবনা প্রায়ই অসম্ভবের কোঠায় থেকে যায়। জনগণ তাই এঁদের উপর ভরসা রাখার ধৈর্য স্বল্পসময়েই হারায়।

ফলে অনুন্নতদেশে জনগণের দুঃখ কিছুতেই ঘোচে না, দুঃখ-দৈন্য, জীবন-যন্ত্রণা কেবলই বাড়ে। নিম্নবিত্তের ও নিম্ন মধ্যবিত্তের বুর্জোয়া চেতনার তরুণ-তরুণীরা প্রয়োজন-প্রেরনায় কিংবা আদর্শিক প্রণোদনায় উদ্বুদ্ধ-প্রবুদ্ধ হয়ে না হোক, অন্যায় আবিচার অত্যাচারে শোষণে বঞ্চনায় উত্যক্ত হয়ে, অসহ্য-দুঃখ-বেদনা জ্বালা-যন্ত্রণায় অতিষ্ঠ হয়ে, ক্ষুব্ধ ও ক্রুব্ধ হয়ে একদিন সংগ্রামে অবতীর্ণ হবেই—এ প্রত্যাশা দিবাস্বপ্ন নয়। তাদের গড়ার পরিকল্পনা না থাক, ভাঙার শক্তি-সাহস তারা পাবেই।

দেশ ও রাজনীতি

ক্ষমতা দখলের রাজনীতি করার লোক আমাদের দেশে অসংখ্য—এরা কেবল নির্বাচনের মৌসুমে আসরে নামে—যে-দল জনপ্রিয় বা শাসকের মদদপুষ্ট সে-দলে জুটে যায় —তোয়াজে উপঢৌকনে কিংবা হুমকি প্রদর্শনে মনোনয়ন আদায় করে, নির্বাচিত হয়ে সুদে-আসলে ক্ষয়ক্ষতি পুষিয়ে নেয়, আর ব্যর্থ হলেও নামজাদা স্থানীয় নেতা থেকে যায়। এদেরও আয়-উন্নতির পথ একেবারে রুদ্ধ থাকে না। এরা ছাড়াও আর একশ্রেণীর সার্বক্ষণিক রাজনীতিক রয়েছেন দেশে। তাঁরা বোধ হয় যোগ্যতার তুলনায় অধিক উচ্চাভিলাষী বলেই চাকরি করে অর্থোপার্জন অপছন্দ করেন, তাঁরা রাজনীতিকেই ব্রত, নেশা বা পেশা হিসেবে বরণ করেন, শহরে থাকেন, দল করেন, দল ভাঙেন, আবার কেউ কেউ ভাঙা-গড়ার ঝুঁকিই নেন না, আজ এ-দল কাল ও-দল করেন বাজারের ভাও {ভাব} বুঝে।

স্বল্প সংখ্যার হলেও আরো কিছু রাজনীতিক রয়েছেন, যাঁদের কাছে 'জানের' চেয়ে 'মান' বড়, তাঁরা কেবল নেতা হতে চান, বা থাকতে চান, এজন্যে প্রয়োজন হলে দল ভাঙবেন, দু'চারজন আত্মীয়-বন্ধু দিয়ে নতুন দল বানাবেন, তবু মানের অভিমান ছাড়বেন না।

আর সব নেতা ও হবু নেতা শহরে থাকবেন—এ ঢাকা শহরেই। এমন কি মফস্বলের লোক একবার সংসদ সদস্য কিংবা মন্ত্রী হলে–তা দু'চার সপ্তার জন্যে হলেও, ঢাকাতেই স্থায়ী আস্তানা গাড়বেন–ঐ নেতা নেতা ভাব বজায় রাখার গরজেই।

এঁরা লোভী ও লুব্ধ হলেও কিন্তু ধূর্ত। তাই এঁরা সবাই এক জায়গায় একশ্রেণীর কাছে ভিড় করে দাঁড়ান না, এঁদের কারো আবেদন জান্নাত লোভী মুসলমানের কাছে, কারো আত্ম-নিবেদন ইসলামের কাজে, কারো সেবাক্ষেত্র কারখানা, কারো প্রচার ক্ষেত্র শহুরে শিক্ষালয়, কেউ কৃষক দরদী, কেউ-বা ক্ষেত মজুরের সাথী, কেউ বা গণতন্ত্রের সহায়, আবার কেউ কেউ জনগণতন্ত্রের দাবিদার, আর সাম্যবাদী সমাজতন্ত্রী তো রয়েইছে—এদের কোন দল চীন মার্কা, কোন দল রুশ মার্কা, এমনকি কিছু কিছু ইয়াঙ্কি মার্কা কম্যুনিস্টও নাকি সুলভ। পুঁজিবাদীরা সাধারণত 'সামাজিক ন্যায় বিচার' ও শাস্ত্রীয় সমাজবাদী।

আবার সব দলেরই রয়েছে বিদেশী মুরুব্বী শক্তি। কারো আকর্ষণ মার্কিন পুঁজিবাদে ও গণতন্ত্রে, কারো স্বস্তি মস্কোর মুরুব্বীয়ানায়, কারো আনন্দ চীনের মৈত্রী স্বপ্নে, আর কারো প্রাণের আরাম দেশ-কালহীন সৌদীআরবকেন্দ্রী বিশ্ব-মুসলিম ভ্রাতৃত্বের অনুভবে। সবাই উর্ধ্বমুখ, দেশে থাকবে, দেশের খাবে, কিন্তু সেবা করবে মুরুব্বীর, রাজনীতি করবে স্ব স্ব দেবলোকের স্বার্থে।

আর কে না জানে যে আফ্রো-এশিয়ার ও লাতিন আমেরিকার উন্নয়ন-কামী ধনে মনে কাঙাল ক্ষুদ্র রাষ্ট্রগুলোর সরকার মাত্রই বৃহৎশক্তির স্বার্থে ও ইঙ্গিতে মুৎসুদ্দী রূপে শাসন-প্রশাসন চালায় অর্থের ও পদের বিনিময়ে।

উপরে যা বললাম এবং যাদের সম্বন্ধে বললাম, তা থেকে এবং তাদের মত পথ থেকে এ মুহূর্তের রাজনীতিক দলগুলোর নিষ্ক্রিয় আমস্ফালনের, ঘন ঘন সংহতি কামনার, সঙ্ঘবদ্ধ হওয়ার প্রয়োজন স্বীকার করেও কথায় কথায় বিচ্ছিন্ন হওয়ার কর্মসূচী গ্রহণ করেও নিষ্ক্রিয় থাকার এবং সঙ্ঘবদ্ধ হয়েও স্বাতন্ত্র্য রক্ষার সার্বক্ষণিক প্রয়াস, চেলাহীন নেতাদের মোর্চা গঠন, আত্ম-প্রত্যয়ের অভাবে শ্রোতা-দর্শকের অনুপস্থিতি আশঙ্কায় কেবল বায়তুল মোকাররমের বাজারে বক্তৃতা ফাঁদার আগ্রহ, যথা সময়ে সরকারের অপকর্মে পরোক্ষে সহযোগিতা করা প্রভৃতির মূল কারণ বোঝা যায়। তারা ঘরে বসে প্রতিকার প্রার্থনা করেন, গা-পাঁ বাঁচিয়ে বিবৃতির মাধ্যমে প্রতিবাদ করেন, কিন্তু ক্ষতির ঝুঁকি নিয়ে প্রতিরোধে এগিয়ে আসেন না। তাঁরা সবাই সবাইকে এগিয়ে দিয়ে লেলিয়ে দিয়ে নিরাপদে পিছু হটতে চান, সবাই সেয়ানা, সবাই আত্মরক্ষায় পটু, সবাই ধূর্ত, তাই রাস্তা থাকে খালি, মাঠ থাকে শূন্য, আন্দোলন থাকে আস্ফালনে সীমিত।

ফরাক্কার পানি সব দলই চায়, তালপট্টিরও সব দল দাবিদার, তবু সঙ্ঘবদ্ধ সংগ্রামে উদ্যোগী হয়নি কেউ। ঈদপার্বণে ঘরে ঘরে সেমাই রাঁধার মতো সবদলই আলাদাভাবে প্রতিবাদ করেছে, কিন্তু প্রতিরোধের জন্যে মিলিত হয়নি। কোন্দলে তাদের যত আগ্রহ, ঐক্যে নেই তত উৎসাহ। গত সপ্তায়ও দেখা গেল—লোভের ফাঁদ বসিয়ে প্রলুব্ধ করা অরাজনীতিক লোক দিয়ে গড়া সৈনিক-নায়ক জিয়ার নায়কতন্ত্রী সরকার এতোগুলো প্রতিবাদী রাজনীতিক দলের নাকের ডগায় উপর দিয়ে ষষ্ঠ সংশোধনী 'বাজা' দলের স্বার্থে পাশ করিয়ে নিল জিয়ার মৃত্যুর পরেও। বিভিন্ন পেশার সুবিধাবাদী সুযোগসন্ধানী লোক দিয়ে গড়া বাজাদলের এ শক্তিতো রাজনীতিক দলগুলোর নিষ্ক্রিয়তারই দান। অথচ নাগরিকরাও প্রতিবাদে মুখর হওয়ায় নায়কতন্ত্রী সৈনিক নায়ক জিয়াউর রহমানও 'জরুরী অবস্থা বিল' সভয়ে প্রত্যাহার করেছিলেন।

নৈরাশ্যজনক এতো কথার পরেও আমরা জানি দেশকে, দেশের মাটিকে ও মানুষকে প্রাণের চাইতেও প্রিয় ভাবে তেমন মানুষ সংখ্যায় কম হলেও দেশে কোন কালেই বিরল ছিল না, আজো নেই, ভবিষ্যতে আমাদের বিশ্বাস আরো সুলভ ও সংখ্যায় বিপুল হবে। কয়েক বছরের মধ্যে আমরা তেমন অনেক জনই দেখেছি, আজ কেবল তাঁদের দু'জন নিহত নেতাকে স্মরণ করছি। এ দু'জনের ব্যক্তিত্বে আদর্শে ও সংকল্পে অনুপ্রাণিত হয়ে কয়েক হাজার তরুণ মানুষ মাতৃভূমির ও মানুষের মুক্তির জন্যে-অশনে-বসনে নিবাসে-নিদানে মানুষকে নির্বিঘ্ন ও স্বস্থ করার জন্যে, জীবন-জীবিকায় নিরাপত্তা দিয়ে নিশ্চিত করার জন্যে প্রাণকে বাজি রেখে সংঘাতসঙ্কুল সংগ্রামে নেমেছিলেন। সমকালের প্রবল প্রভাব রাষ্ট্রনায়ক সিরাজ সিকদারকে প্রতিদ্বন্দ্বী প্রতিপক্ষ মেনে শঙ্কাকাতর হয়ে হাতে পাওয়া মাত্র হত্যা করে নির্বিঘ্ন নিশ্চিন্ত হয়েছিলেন। কর্নেল আবু তাহেরও রূশ-ভারতের মুৎসুদ্দির কবল থেকে সেদিন মাতৃভূমি উদ্ধার

করে বড় বিশ্বাস ও ভরসা নিয়ে এক সামরিক নায়ককে বসিয়ে ছিলেন শাসকের আসনে। কিন্তু কয়দিনের মধ্যেই দেশদ্রোহিতার মিথ্যা অপবাদে বন্দী ও বিচারের প্রহসন করে সেই নায়ক অনন্য কৃতজ্ঞতায় হত্যা করলেন তাহেরকে।

এ দুই নিহত বীরের জীবৎকালে আমরা অনেকেই তাঁদের অনুসারী ছিলাম না। তাঁদের সঙ্গে ছিল আমাদের পথ ও পদ্ধতিগত অনৈক্য, যদিও আদর্শে ও লক্ষ্যে আমরা বিপ্লব চাই গণমুক্তির জন্যে, চাই সম্পদের বণ্টনে বাঁচতে। তাই আজ ঐ নিহত বীর দু'জন আমাদেরও প্রেরণার উৎস—বল ভরসার আকর। তাঁদের ত্যাগ, সাহস, মাটি ও মানুষ প্রেম আমাদের চিরকার উদ্বুদ্ধ করবে, করবে সর্বকালের সর্বদেশের মুক্তিপাগল সংগ্রামীদের। আমাদের দেশে গণমানবের মুক্তি–গণবিপ্লব স্বপ্নলোকের বিষয়, এখনো বিপ্লবের অনুকূল পরিবেশ দৃষ্টিসীমার বাইরে। সাহস পাবার জন্যে, আদর্শ স্মরণে রাখবার জন্যে, সংকল্পে দৃঢ় থাকবার জন্যে, বিপ্লব আসন্ন করে তুলবার জন্যে অমর বীর ও প্রেমিক সিকদারকে, কর্ণেল আবু তাহেরকে আমরা স্মরণ করব, স্মরণ করব তাঁদের সাহস ও সঙ্কল্পকে।

আজ এ মুহূর্তে দেশের অবস্থা কি? বিদেশী ঋণের ভারে দেশ আজ পঙ্গু, দানে-অনুদানে তার ভরসা, দুনিয়ার সবচেয়ে দরিদ্রদেশ বলে উপহসিত দেশ বাইরে ভিক্ষার হাত পেতেই আছে। ঋণের দানের আর অনুদানের টাকা এনে সরকার কি করে? শহুরে ভদ্রলোকদের আরামে আয়েশে রাখবার ব্যবস্থা করে, নাচে-গানে-বাজনায়-নাটকে-সিনেমায়-খেলায়-জুয়ায় চব্বিশ ঘন্টা মশগুল রাখে শহুরে লোকদের যাঁদের অনুরাগের বা বিরাগের উপর নির্ভর করে তখ্‌তে সরকারের বা নায়কের স্থিতি। তাই শহরে আমলা-ঠিকেদার-সদাগর-মৌজুতদার-কারখানাদার-চোরাচালানদার, পেশাদারদের আর ছাত্র-যুবক-শ্রমিকদের তোয়াজে তুষ্ট রেখে রাজত্ব করাই শাসকের লক্ষ্য। সে-তোয়াজ-তুষ্টি আবার বিদেশী প্রভুর স্বার্থে ও নির্দেশে চালিত হওয়া চাই। গত সাড়ে পাঁচ বছরের শাসননীতি ছিল একটিই–বিনা বাধায় ও বিনা নিয়ন্ত্রণে দুষ্ট লোককে ও লুব্ধ মানুষকে যথেচ্ছ চলতে দেয়া। এর অপর নাম ঘুষে বশ-করা নীতি। এর শোভন ইংরেজী নাম হতে পারে policy of non-interference বা policy of least resistance. দুর্নীতিবাজকে দুনীতির সুযোগ দেয়া, খুনীকে খুন করতে দেয়া,বাটপারকে রাহাজানি করতে দেয়া, জুয়ারীকে জুয়া খেলার সুযোগ দেয়া, আমলাকে ঘুষ নেয়ার প্রশ্রয় দেয়া,রাজনীতিককে আখের গোছানোর সুযোগ দেয়া, এর নাম ঘুষনীতি, তাই দুষ্ট মাত্রই ছিল এ রাজত্বে তুষ্ট। এ নীতির মূল কথা—দুর্জনেরে রক্ষা করো দুর্বলেরে হানো। কিন্তু তাদের এ আপাত সুখ অর্থাৎ চল্লিশ-পঞ্চাশ হাজার মানুষের এ পৌষমাস—নয় কোটি মানুষের সর্বপ্রকারে সর্বনাশ করেছে,-দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধির আকারে, মুদ্রাস্ফীতির বিপুলতায়, দুর্নীতি-দুঃশাসনের ব্যাপকতায় ও ভয়ঙ্কতায়, আইন-শৃঙ্খলার সঙ্কটে এবং মানুষের জান-মালের নিরাপত্তার অভাবে। সে-নীতি সে-ধারা পরবর্তী নায়কও করছেন অনুসরণ।

এ সবকিছুর প্রতিকার, প্রতিবাদ ও প্রতিরোধ নির্ভর করছে সাহসী সংগ্রামী গণমানব-প্রেমিক মানুষের উপর।

আজকের বাঙলার রাজনীতি

আস্তিক হোক, নাস্তিক হোক, চোর-ডাকাত হোক, কিংবা, অন্য প্রকারের দুর্নীতিবাজ ও মতলববাজ হোক, প্রত্যেকেরই একটা অবশ্য পালনীয় নিয়ম-নীতি থাকা চাই, নইলে স্ব স্ব পেশায় অন্যের আস্থা হারিয়ে দেউলিয়া হতে হয়, কেননা, আস্থাই হচ্ছে লেন-দেনের, বেচা-কেনার, শুভেচ্ছা-সৌজন্যের পুঁজি।

রাজনীতিও তেমন একটা পেশা, কিংবা কারবার। এ পেশার জনসমর্থনই পুঁজি। এবং এ পুঁজি বজায় রাখতে কিংবা বৃদ্ধি করতে হলে জনগণের হয়ে জনগণের জন্যে জনস্বার্থে ও জনকল্যাণে রাজনীতিকের ভাব-চিন্ত-কর্ম-আচরণ নিয়োজিত করতে হয়। রাজনীতিক ইসলামী শাসন-পদ্ধতি, গণতান্ত্রিক নিয়মনীতি, সাম্যবাদমূলক ব্যবস্থা, সমাজতন্ত্র কিংবা একনায়কত্ব প্রবর্তন লক্ষ্যে দল গঠন করতে পারেন। তাঁর আদর্শের লক্ষ্যের অনুগত করে তাঁর কথা ও কাজ চালু রাখতে হবে। তা হলে তাঁর মতের বা দলের অনুরাগী সমর্থকের অভাব হবে না, কেননা 'যত মন তত মত', নানা রুচির, বুদ্ধির ও যুক্তির মানুষের অভাব কখনো হয় না।

নেতার থাকতে হয় একাধারে দুটো গুণ—মনীষা ও চরিত্র তথা অনড় আদর্শ বা নীতিনিষ্ঠা। এ দুটোয় একটা না থাকলে তাঁর নেতৃত্ব স্বল্পকালই স্থায়ী হবে। আর দলের সদস্যদের বা নেতার সহচর সহকর্মীদের থাকতে হবে নীতি-নিষ্ঠা বা আদর্শ-চেতনা। তা হলেই কেবল বহুজনহিতে বহুজনসুখে বহুজনের পক্ষে কথা বলার ও কাজ করার যোগ্যতা স্বীকৃত হয়, তখন গণমানব আশা-ভরসা ও আস্থা-আশ্বাস নিয়ে দলের সমর্থক হয়, হয় কর্মী ও সংগ্রামী।

যে-রাজনীতিক বা যে-দল জনগণের কাতারে দাঁড়িয়ে জনগণের সেবায় ও কল্যাণে আত্মনিয়োগ করে ক্রমে জনসমর্থনে ক্ষমতায় যেতে চায় তার স্বার্থবুদ্ধি ও শ্রেয়োচেতনা সমন্বিত হওয়া চাই। শাহ, সামন্ত, বুর্জোয়া কিংবা গণরাজনীতির জন্যে মৌল সততা বা গনকল্যাণ বুদ্ধি আবশ্যক। কেননা আস্থা হারিয়ে রাজা-বাদশাহ-মন্ত্রী দল কেউ কখনো ক্ষমতায় টিকে থাকতে পারে না, যদিও ক্ষমতায় সাময়িক জবরদখল চলে ইতিহাসের সাক্ষ্যে এ কথা বিশ্বাস করতেই হয়।

আমাদের দেশে যাঁরা সমাজবাদী বা সাম্যবাদী তাঁদের দল আছে, বল নেই। কাজেই রাজনীতি ক্ষেত্রে তাঁরা আপাতত কেজো শক্তি নন।

দেশের আর যাঁরা আশি-নব্বইটা রাজনীতিক দলে বিচ্ছিন্ন ও বিভক্ত হয়ে রয়েছেন, তাঁদের অনেকেরই দলচেতন, অকৃত্রিম হলেও গণমানবের কল্যাণ-চেতনা, বা নিয়ম-নীতি-নিষ্ঠা কিংবা আদর্শবোধ সুষ্ঠু নয়। তাঁদের ধীর বুদ্ধি, স্থির বিশ্বাস, কিংবা লক্ষ্যনিবদ্ধ দৃষ্টি আছে কি নেই ঠাহর করা যায় না কখনো। ব্রিটিশ আমলে ১৯১৫ থেকে কংগ্রেসে এবং ১৯৩৭ সন থেকে মুসলিম লীগে দৃঢ়প্রত্যয়ী চরিত্রবান আদর্শনিষ্ঠ সদস্যরাই ছিলেন বেশী, মতলববাজ ছিল ক্বচিৎ কেউ। বিশেষ করে সে-সময়ে দলত্যাগীরা ব্রিটিশ দালাল বলে নিন্দিত হত বলে, দলত্যাগে উৎসুক মানুষের সংখ্যা ছিল কম।

স্বাধীনতা প্রাপ্তির পরে কেবল বামপন্থীরাই জানত ভাত-কাপড়ে গণমানবের মুক্তি না ঘটলে স্বাধীনতা তাৎপর্যহীন, তারা বুঝত, শাসক স্বদেশী স্বজাতি,স্বধর্মী স্বজন হলেই দেশ বা মানুষ স্বাধীন হয় না, স্বাধীনতার স্বাদ পায় না। অশনে-বসনে-নিবাসে-নিদানে নিশ্চিত জীবনের নিরাপত্তাবোধ ও স্বাধিকার প্রাপ্তিই স্বাধীনতা। কাজেট তারা লঘু গুরুভাবে জনগনের সেট প্রকৃত স্বাধীনতা-স্বাধিকার সংগ্রাম চালিয়ে যাচ্ছে ধৈর্য ও অধ্যবসায় নিয়ে।

আস্তিক-নাস্তিক আর যাদের কোন রাজনীতিক সাধনসিদ্ধি নেই—কেবল শহরে বেকার-বিচরণে অর্থ-বিত্ত-মান-যশ-ক্ষমতা অর্জনের অলস প্রয়াসে কিংবা নিষ্ঠপ্রচেষ্টায় যারা নিয়োজিত, তারাই রাজনীতি ক্ষেত্র যুগপৎ সরকারের ও জনগনের সমস্যা হয়ে দাড়ায়। এ কারনেই দেশে রাজনীতিক দলের সংখ্যা এতো। যদিও রাজনীতিক মতে ভিন্নতা আবিষ্কার গবেষণাসাপেক্ষ। এরা কেবল সুযোগ, সুবিধে ও ক্ষমতা চায়। এদের চেতনায় দেশ যখন স্বাধীন, তখন রাজনীতিতে হালুয়া-রুটি লুটপাট করা ক্ষমতা দখল করে মান-যশ-বিত্ত-বেসাত করা, সমাজে ধনে মানে সন্তানকে প্রতিষ্ঠিত করাই থাকে তাদের ইপ্সিত লক্ষ্য। কাজেই পরাশক্তির অভিভাবকত্বে বিকাশশীল অনুন্নত দেশে কেবল পরাশক্তির কৃপাপ্রাপ্ত মুৎসুদ্দি দালালের রাজনীতিই হয় ব্যক্তিক ও দলীয় জীবনে অভিপ্রেত-বাঞ্ছিত ফল আশুলাভের একমাত্র উপায় বলেই। এ সব দল তাই মন ও মত পরিবর্তন করতে দ্বিধা করে না। তাদের মন ও মত হচ্ছে যখন যেমন তখন তেমন। এমন মানুষ গণস্বার্থে কখনো সংগ্রাম চালাতে পারে না, কেবল গা-পা বাঁচিয়ে আস্ফালন করে মাত্র। এজন্যে আফ্রো-এশিয়া-লাতিন আমেরিকার উন্নয়নশীল দেশে পুঁজিবাদী রাজনীতিকদের চরিত্র, বিবেক, বুদ্ধি, রুচি, জনস্বার্থচেতনা প্রভৃতি ক্বচিৎ মেলে। একথা বলার অপেক্ষা রাখে না যে, চরিত্র না থাকলে ব্যক্তি মানুষে আর কিছুই থাকে না। উল্লেখ্য যে চরিত্র মানে দায়িত্ববোধ ও কর্তব্যচেতনা আর বিবেকানুগত্য।

আজকে আমাদের সবচেয়ে বড় অভাব চরিত্রের। চরিত্র থাকলে অন্য সম্পদ সংগ্রহ কঠিন হয় না। চরিত্র নেই বলেই আমাদের ন্যায়-অন্যায় চেতনা নেই, নেই আইন-কানুনের প্রতি শ্রদ্ধা। তাই আমাদের স্ব স্ব স্বার্থসিদ্ধি পন্থাই ন্যায়, আমাদের প্রয়োজন পূরণই আইন। ফলে এখন এখানে চোর-ডাকাত, খুনী-প্রতারক মাত্রই শাস্তি এড়ায়, যদি সে রাজনীতিক দলের সদস্য হয়। আইনের প্রতি শ্রদ্ধা নেই,কারণ আইনের বা ন্যায়ের গুরুত্ব-চেতনা আমাদের নেই। যেদেশে Respector of LAW নেই, সেখানে Rule of Law চলতে পারে না। এ মুহূর্তের বাঙলাদেশে দোষী-নির্দোষ সাব্যস্ত হয় দলীয় শক্তির মাপে। খুনী জালিয়াত-চোর-চোরাকারবারী শুধু ছাড়া পায় না, শাস্তি মওকুব পায় না, রাজনীতিকদলের নেতৃত্বও পায়। এখানে জুলুম করার শক্তিই ক্ষমতা। জালেমের অভিপ্রায়ই আইন। এমনি অবস্থায় জীবন-জীবিকার জান-মাল-গর্দানের কোন নিরাপত্তা থাকে না। এ হচ্ছে মাৎস্যন্যায়ের, জঙ্গল আইনের এলাকা।

আজকের বাঙলাদেশের ঢাকা শহরের রাজনীতি হচ্ছে দু পয়সা করার সযোগ, সুবিধে ও অধিকার পাওয়া, জুলুম করার ক্ষমতা পাওয়া, শাসনের-শোষণের-পীড়নের বৈধব্যবস্থা কব্জা করা, হুকম-হুমকি-হামলা চালানোর ক্ষমতা পাওয়া। এমনি দেশে,কালে ও প্রাশাসনিক ব্যবস্থায় কিংবা উন্নয়ন পরিকল্পনায় গণমানবের কল্যাণ স্লোগানে থাকলেও বাস্তব কর্মসূচীতে ভোগ-উপভোগ ব্যবস্থায় গণমানব থাকে অবহেলিত ও বিস্মৃত।

আমাদের এ মুহূর্তের রাজনীতিতে শাসকগোষ্ঠী বদলের পালা আভাসিত বটে, কিন্তু বেল পাকলে কাকের কি?

ইদানীং সংবাদে বিম্বিত বাঙলাদেশ

খবরের কাগজের সাক্ষ্যে বোঝা যায় আত্মহত্যা, নরহত্যা, ধর্ষণ, লুণ্ঠন, রাহাজানি, জলে-স্থলে যানবাহন দুর্ঘটনায় অপমৃত্যু, জবর দখল, প্রতারণা, কুলখানি, স্মৃতিসভা, রাজনীতিক দলের অন্তর্দ্বন্দ্ব ও ভাঙন, বিবৃতিভিত্তিক রাজনীতিক আস্ফালনের ও নিষ্ক্রিয় কর্মসূচীর বাহুল্য, রাজনীতিক দলের ঐক্যজোট গড়ার উগ্র আগ্রহ, গোষ্ঠীবদ্ধ হয়ে কবিদের কবিতা পাঠে উৎসাহ,সোভেনিয়র,সংকলন সামষ্টিক পত্র বের করার নামে বিজ্ঞাপন থেকে অর্থোপার্জন, সংবাদপত্রে রাশি নিয়ন্ত্রিত দৈনিক ভাগ্যফল মুদ্রিত করে মানুষের আত্মবিশ্বাস হনন, অর্থ সংকটগ্রস্ত নিরুপায় মানুষের নিয়তি ও জ্যোতিষী নির্ভরতা ও ওষুধের মূল্য সাধ্যাতীত বৃদ্ধি পাওয়ায় হোমিও-চিকিৎসায় লোকের আগ্রহ ও আস্থা বৃদ্ধি, সামাজিক সুবিচার (আর্থিক নয়) প্রতিষ্ঠালক্ষ্যে দুর্নীতির উচ্ছেদ, উন্নয়ন প্রকল্পের প্রসার, উপজেলা নামে থানাকেন্দ্রিক প্রশাসন ব্যবস্থা চালু করে চাকুরের ও ইমারতের সংখ্যা বৃদ্ধিকরণ, (সেই সঙ্গে সংস্থাপনের ও প্রশাননের বাষিক আবর্তক ব্যয় বহু গুণ করণ) অর্থেবিত্তে বহুজনের হিত বহুজনের সুখ সাধন, প্রাসাদ, স্মৃতিসৌধ, প্রতিষ্ঠানিক ইমারত নির্মাণ ও দান অনুদান মাধ্যমে দেশের সামগ্রিক ও সামষ্টিক উন্নতিসাধন প্রভৃতি কাজে সদাব্যস্ত বলে সরকারের নিত্যকার ঘোষণা আর মুসলমানদের মধ্যে ধর্ম কথা (নীতিকথা নয়) প্রচারের রাজনীতিক উদ্যোগ আজকের বাঙলাদেশের সার্বক্ষণিক রূপ ও স্বরূপ।

এ হচ্ছে আসলে বাঙলাদেশের চালু ও চতুর মানুষেরই ভাব-চিন্তা-কর্ম-আচরণের তথা চাল-চলনের বাস্তবচিত্র। দেশের বাদবাকি অজ্ঞ দুঃস্থ বঞ্চিত গণমানবের চালচিত্র সম্পূর্ণ ভিন্ন ধরনের।

কথায় বলে 'অভাবে স্বভাব নষ্ট'। ভাত কাপড়ের অতি অভাব যাদের, যারা চিরজীবন অর্ধাহার কিংবা অনাহারক্লিষ্ট, জন্মমুহূর্ত থেকেই যারা অনিশ্চিত গ্রাসাচ্ছাদনে লালিত, তথা খোরপোষের অভাব-অনিশ্চয়তার শিকার, তাদের দেহ-মন স্বাভাবিক বিকাশ পায় না বলেই নষ্ট-স্বভাবের হয়। অর্থাৎ ইন্দ্রিয়ের বা রিপুর নিয়ন্ত্রণ বা পরিমার্জনা তাদের পক্ষে সম্ভব হয় না বলে এক প্রকারের প্রাণী সুলভ স্থূলতা তাদের মধ্যে থেকে যায়। কিন্তু দীন-দুর্বল হিসেবে আবাল্য প্রবল ধনী দুর্জনের হুকুম-হুমকির ভয়ে ত্রাসে গড়ে ওঠে বলে তাদের বৃত্তি-প্রবৃত্তি থাকে প্রায়ই অবদামিত–অভিব্যক্তি পায় না–তাই অতি দীন মানুষ–মজুর শ্রেণীর-মানুষ 'নিরীহ'–এই কৃপাকরুণ অভিধায় হয় অভিহিত।

এদের কিছু উপরের শ্রেণীর যাদের কিছু আর্থিক ও বৃত্তিক ভিত্তি রয়েছে, অর্থে-সম্পদে রাষ্ট্রিক দারিদ্র্যের কালে তারা দুর্নীতিপ্রবণ হয়ে ওঠে বাঁচার গরজেই, তাদের তখন অপরাধ করতে বাধে না। সাধারণ-অসাধারণ উপায়ে, জান-মাল-গর্দানের ঝুঁকি নিয়ে মারার আর মরার সাহস নিয়ে দুষ্কর্মে এগিয়ে আসে তারা। –ছল-চাতুরী জাল-জুয়া কিংবা কাড়া-মারা-হানা প্রভৃতি সব পন্থা-পদ্ধতি-কৌশলই হয় তাদের অবলম্বন। ঘৃণা-লজ্জা-ভয়হীনতাই তাদের পুঁজি, লিপ্সাই তাদের প্রণোদনা। রাষ্ট্র কিংবা সরকার তখন পোষণের ব্যবস্থা করতে পারে না বলেই শাসনেরও শক্তি রাখে না, ফলে সরকারি-বেসরকারি প্রায় সব লোকই কেবল লুটের তালে থাকে—দায়িত্বে ও কর্তব্যে ফাঁকির, বিশ্বাসভঙ্গের, ঘুষের, চুরির, জালের, প্রতারণার, কমিশনের, শেয়ারের, বোনাসের, দালালির, চোরাবাজারীর, মৌজুতদারীর, ফটকাবাজারীর, চোরাচালানীর, সদাগরীর, দোকানদারীর, আকারে তা ব্যক্তিক, পারিবারিক, সামাজিক ও রাষ্ট্রিক জীবনে হয় পরিব্যাপ্ত। তখন গাঁয়ে টাউটরূপে, গঞ্জে দালালরূপে, শহরে চাকুরে, ফড়ে ও

ঠিকাদাররূপে এরা অজ্ঞ-দুঃস্থ-দুর্বল মানুষের শোষক-পীড়ক হয়ে বসে। তখন দেশে সুষ্ঠুভাবে চলে কেবল অবৈধ 'লেনদেন'। দেশব্যাপী জীবন-জীবিকার আর সবক্ষেত্রেই ঘটে বিপর্যয় ও বিশৃংখলা। মানুষের স্বাভাবিক জীবন-জীবিকা হয় বিঘ্নিত ও বিপন্ন। অনীতি-অনিয়ম-অনাচারই নীতি-নিয়ম, রীতি-রেওয়াজ হয়ে দাঁড়ায়। তখন 'জোর যার মুলুক তার'। এমনি সমাজে অবশ্যি মানুষ উঁচু পদে ও পদবীতে, ধনে ও মানে বড় হলেও মনে ও আত্মসম্মানে আর রুচিতে ও মর্যাদাবোধে থাকে নিতান্ত ছোট ও সংকীর্ণ।

এ মানুষ নিয়েই আমাদের সরকারে সমাজের হাটে-বাজারে নিত্য কারবার। এজন্যে দেশে কেবল ভোটাররা নয়, ছাত্র-শিক্ষক, রাজনীতিক, ডাক্তার, উকিল, সাংবাদিক সবাই নানা প্রলোভনে ঘন ঘন দল বদলায়। চরিত্রের বা আদর্শের কিংবা নীতিনিষ্ঠার কোন গুরুত্ব বা মূল্য নেই তাদের কাছে। নেই তাদের লজ্জা-শরম। তারা কেবলই বেচা যায় আর ভাড়া খাটে। মূলে অভাবে স্বভাবে নষ্ট হয় বটে, তবে অভাব ঘুচলেও লিপ্সু মানুষ 'স্বভাবে' ফিরে আসে না। তাই ধনীরাই দুর্নীতির ধারক। পুঁজি ও প্রতারণা সম্বল করেই তাদের যাত্রা এবং ঐহিক সিদ্ধিও আসে ওই পন্থায়। তৃতীয় বিশ্বের তথা এশিয়ার, আফ্রিকার ও লাতিন আমেরিকার প্রায় সর্বত্রই তা-ই শিক্ষিত শহুরে মতলববাজের চালবাজের ও ধাপ্পাবাজের জয়-জয়কার। চালবাজী ও ধাপ্পাবাজী প্রয়োগে মতলব হাসিল করে মতলববাজেরা। তাই এসব দেশে জনহিতকামী সরকার মেলে না, গণ-দরদী নেতা মেলে না, জনসেবী কর্মী মেলে না, এখানে মানুষ ধন-মান-যশ-ক্ষমতা-প্রতিষ্ঠা-প্রভাব-প্রতিপত্তি ও খ্যাতি লিপ্সু। এখানে আপাত পরার্থবাদীরা শট-কপট-প্রপঞ্চক।

এর থেকে উদ্ধারের যে উপায় নেই, তা নয়। প্রবৃত্তিচালিত প্রাণীর সুপ্ত শক্তির বিকাশ-প্রকাশের লক্ষ্যে আত্মনিয়ন্ত্রণের, আত্ম-উন্নয়নের, আত্ম-সংযমের ও আত্ম-উৎকর্ষের জন্যে শিক্ষা, দীক্ষা বা প্রশিক্ষণরূপ অনুশীলন আবশ্যিক। প্রমাণ প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত কুকুর-বানর-ঘোড়া-হাতি-পায়রা-বাজ-শুক প্রভৃতি পশু-পাখির গুণের ও শক্তির প্রকাশ। প্রাণী মানুষেরও তেমনি সুপ্ত ও জড়গুণের বিকাশ-প্রকাশের জন্যে দীক্ষা, শিক্ষা, প্রশিক্ষণ ও অনুশীলন প্রয়োজন। এর জন্যে মনীষা-সম্পন্ন দৃঢ়-চরিত্র বিবেকবান সাহসী কৌশলী ও প্রয়োজন-সচেতন মানবদরদী ব্যক্তির আকর্ষণ, অনুপ্রেরণা, আহ্বান ও নেতৃত্ব আবশ্যিক। ওই ব্যক্তিত্বের প্রভাবেই তৈরি হবে স্বেচ্ছাসেবী—এদেশেই যেমন একদিন গান্ধী-জিন্নাহর নেতৃত্বে হয়েছিল।

আর প্রতীচ্য আদলে জীবন যাপন লক্ষ্যে জীবনোপভোগের সামগ্রী সংগ্রহ করার প্রয়াস ও মানস-প্রতিযোগিতা হীনমন্যতাজাত একটি নিঃসাড় মোহ ছাড়া যে কিছুই নয়, তা আশু উপলব্ধি করা জরুরি। সুখের প্রতীচ্য-সংজ্ঞা পরিহার করাই বাঞ্ছনীয়, কেননা, ওই সংজ্ঞায় কোন সত্য নিহিত নেই। সুখ কাউকে কেউ বা কিছু দিতে পারে না, সুখ পেতে জানতে হয়। সুখ যে দামী সামগ্রীতে নিবদ্ধ নয়, আনন্দ যে ঐশ্বর্যে জড়িয়ে নেই, সংস্কৃতি যে বিলাস-সামগ্রীর বিপুল আয়োজনে নিহিত নয়, সুরুচির অভিব্যক্তি কেবল মূল্যবান সামগ্রীর সুবিন্যাসেই সীমিত নয়—এ তত্ত্ব নির্মোহ অন্তরে গ্রহণ করতে হবে। বোধগত করতে হবে অন্য তত্ত্বও 'first deserve, then desire' বা যোগ্যতানুযায়ীই ভোগ কর কিংবা আয় বুঝে ব্যয় কর।

তাহলে অপরিহার্য যন্ত্র ও অস্ত্র কিংবা অন্য কোন দুর্লভ দ্রব্যই কেবল আমদানী করতে হবে, এভাবে বিদেশী বাজারের সঙ্গে আমাদের ক্রয়মূলক সম্পর্ক হবে ক্ষীণ, তাতে মুদ্রাস্ফীতি ও দ্রব্যমূল্যের উর্ধ্বগতিজাত সমস্যা আমরা এড়াতে পারব বাঙলাদেশে। আমাদের শহুরে ভদ্রলোকদের জীবনযাত্রার মান নামবে য়ুরোপীয়দের তুলনায় অনেক নীচে। এক রকমের কৃচ্ছ্র সাধনা করতে হবে বটে শহুরে মধ্যশ্রেণীর ও উচ্চবর্গের ভদ্র-লোকদের তবে নয় কোটি দেশজ

দ্রব্য ও ডাল-ভাত নির্ভর কুটিরবাসী গ্রাম্য লোকের দেশে তারা কয়েক লাখ মাত্র। তাদের বিলাসসামগ্রী যোগানের জন্যে বর্তমানে নয় কোটি মানুষের আর্থিক দুর্ভোগের সীমা নেই। দেশের লোকের জন্যে দেশজ দ্রব্য দেশজ পণ্য গড়ে উঠলে বেকার সমস্যাও হয়তো অনেক কাল প্রকট হয়ে দেখা দেবে না।

নির্বান্ধব নিঃসহায় রাশিয়া বা চীন একসময়ে এভাবেই বেঁচে বর্তে ছিল না কেবল, অর্থে-সম্পদে ঋদ্ধ হয়ে রাষ্ট্রশক্তি হিসেবেও প্রতাপে প্রবল হয়েছে। সমহারে কিংবা আনুপাতিক হারে অথবা শ্রমবিনিময়ে উৎপাদন বন্টননীতি গ্রহণ করলে মানুষের গ্রাসাচ্ছাদন সম্পৃক্ত সমস্যার সমাধান তথা অশন-বসন-নিবাস-নিদানের অভাবজাত দুঃখ যন্ত্রণা ও অপমৃত্যু রোধ করা আজো অসম্ভব নয়।

এমনি নিয়ম-নীতি অঙ্গীকার করলে প্রথম অনুচ্ছেদে বর্ণিত দেশ, সমাজ ও জীবনচিত্র মুছে যাবে মুহূর্তেই। এ কালের প্রতিবেশে মানববাদী সমাজবাদীই কেবল জানে বাঁচাবার তত্ত্ব। একালের গরীব দেশে স্বস্তিতে ও শান্তিতে বাঁচতে পারে কেবল সমাজতন্ত্র বরণ করেই। দরিদ্র মানুষ বাঁচবার গরজেই দুর্নীতিবাজ হয় বটে, তবে প্রয়োজনের প্রেরণা কম বলে তাদের দুঃসাহসও কম, মারাত্মক ঝুঁকি নিয়ে এগোয় না, রেখে ঢেকে ভেবে-চিন্তে এগোয়। অবশ্য প্রলোভন প্রবল হলেই তারাও হয় অবিমৃষ্যকারী ও একরোখা-বেপরওয়া খুনী।

আজকের বাঙলাদেশে সাড়ে আটকোটিই হচ্ছে দুর্নীতিবাজ হওয়ার শক্তি, সাহস, বুদ্ধি ও সুযোগ বঞ্চিত নিঃস্ব নিরীহ মানুষ, আর বাকি পঞ্চাশ লক্ষ সাক্ষর শিক্ষিত মতলববাজ, চালবাজ, ধাপপাবাজ, টাউট, মাতব্বর রাজনীতিক, চাকুরে, ফড়ে, দালাল, ঠিকেদার আড়তদার, দোকানদার, মৌজুতদার, চোরাইমালদার, যোগানদার, চোরাইচালানদার গাঁয়ে-গঞ্জে-নগরে কোটি কোটি মানুষের ভাগ্য নিয়ন্ত্রণ করছে শাসনের-শোষণের-পীড়নের পেষণের অনিয়ন্ত্রিত অধিকার নিয়েও অবাধ ক্ষমতা পেয়ে।

নীতিনিষ্ঠ আদর্শবান বিবেকবান বুদ্ধিমান ব্যক্তিত্বসম্পন্ন সাহসী আর দৃঢ়চিত্তের ও স্থির সঙ্কল্পের মানবদরদী কিছু মানুষ যদি বহুজনহিত ও বহুজনসুখ সাধনলক্ষ্যে রাজনীতিতে ও গণকল্যাণ কর্মে নেতৃত্ব দিতে এগিয়ে আসেন, তা হলে স্বল্পকালের মধ্যে আমাদের দুর্ভোগের অবসান ঘটতে পারে লাল-সাদা-নীল-সবুজ যে কোন বিপ্লবের পন্থায়।

নেতৃত্ব-সংকট

প্রজার পালন ও পোষণ রাজধর্ম বলে স্বীকৃত থাকলেও সে দায়িত্ব ও কর্তব্য রাজারা কৃচিৎ মনে রেখেছিলেন। সাধারণভাবে শাসনে শোষণে পীড়নেই ছিল তাঁদের আগ্রহ। কেননা ক্ষমতা ও দর্প-দাপট প্রকাশের তা-ই ছিল পন্থা। ফলে শাহ-সামন্তযুগে শাসন-শোষণের অধিকার বাস্তবে আক্ষরিকভাবে রূপায়িত হলেও পালন-পোষণের অঙ্গীকারে বিস্মৃতি ঘটত; কৃচিৎ কোন শাহ-সামন্ত আধিদৈবিক আপদে বিপদে গ্রহশান্তি লক্ষ্যে দান-ধর্মের আকারে রাজধানীর বা প্রশাসন কেন্দ্রের গরীব-দুঃখীর প্রতি কৃপা বিতরণ করত, কৃচিৎ কখনো রাজস্ব বৃদ্ধির প্রত্যাশায় কৃষিজ ফসলের বৃদ্ধির জন্যে সরকারি খরচে খাল খনন কিংবা বাঁধ নির্মাণ করত।

উচ্চ ও মধ্যবিত্তের প্রতিনিধিত্বে এক প্রকার শাসনতন্ত্রও চালু ছিল কোথাও কোথাও। একে আভিজাতিক-সামন্তিক শাসন বলা চলে। গ্রীসে রোমে এবং গোড়ার দিককার কয় বছর আরবের ইস্‌লামী রাষ্ট্রে এমনি শাসন চালু ছিল! বলা বাহুল্য, এ ছিল একক রাজার স্থলে একাধিক প্রবল ব্যক্তির গোষ্ঠীশাসন মাত্র।

আবিস্কৃত যন্ত্রের বিচিত্র উপযোগের, উৎকর্ষের ও প্রসারের এবং প্রয়োগের ফলে জীবনে-জীবিকায় জীবনাযাত্রাপদ্ধতিতে যে-আকস্মিক ও অবশ্যম্ভাবী পরিবর্তন এল, তার অভিঘাতে সামন্তিক-আভিজাতিক মনমেজাজ, চিন্তা-চেতনা, শাস্ত্র-সমাজ, নিয়ম-নীতি, রীতি-পদ্ধতি ও শাসক-সরকার সবকিছুই হল ঘায়েল; কিছু কিছু নিয়ম-নীতি ও রীতি-রেওয়াজ হল অকেজো, আর অন্য সব রইল কালিক-দৈশিক চাহিদা অনুযায়ী মেরামতের অপেক্ষায়। অনুন্নত দেশে অজ্ঞতার অশিক্ষার ও দারিদ্র্যের দরুন এ পরিবর্তন বাঞ্ছিত রূপ পায়নি কখনো। এর মন্থর গতি বহু অসঙ্গতি, বিশৃঙখলা ও গণদুর্ভোগের কারণ হয়ে রয়েছে অনুন্নত বিশ্বের প্রতিটি দেশেই।

পশ্চিম য়ুরোপে বিত্তে ও বিদ্যায় অগ্রসর উচ্চ ও মধ্য শ্রেণীর শ্রেণীগত স্বার্থেই যে-গণতন্ত্র কামনা ও প্রতিষ্ঠা করল তার মধ্যদিয়ে প্রাথমিক লাভ-লোভ ও দ্বন্দ্ব বিদ্বেষ অতিক্রম করে তারা উনিশ শতকে নিজেদেরকে এক উদার মানবিক বোধের জগতে উন্নীত করেছিল। ফলে তাদের শাসন-শোষণ কার্যত অপরিবর্তিত থাকলেও —আর্থিক না হলেও এক প্রকার সামাজিক ও মানবিক ন্যায়বোধের প্রণোদনাবশে স্বদেশের গণমানবকে সেবায় ও সমবেদনায়, দানে ও অনুদানে তুষ্ট রাখার প্রয়াসে ছিল তারা নিয়োজিত। এমন করে নাগরিকের অধিকারের দায়িত্বের ও কর্তব্যের আর আচরণের একটা ঐতিহ্য গড়ে উঠল।

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধোত্তর য়ুরোপে মানুষের স্বাধিকার চেতনা তীক্ষ্ণ ও প্রবল হওয়া সত্ত্বেও অস্ট্রেলিয়ায়, নিউজিল্যাণ্ডে ও উত্তর-দক্ষিণ আমেরিকায় দেশত্যাগী ভাগ্যান্বেষীদের জন্যে প্রবেশদ্বার মুক্ত থাকায় য়ুরোপে বুর্জোয়া গণতন্ত্র কিছু নীতি-নিয়মের ভিত্তিতে অটল হয়ে আছে বটে, তবে গণদাবির মুখে সরকারও ঘন ঘন সঙ্কটে পড়ে।

যন্ত্রযুগের সূচনায় ও প্রসারে য়ুরোপে মানুষের মনে-মেজাজে, চিন্তায়-চেতনায় ও ব্যবহারিক-বৈষয়িক জীবনে যেসব পরিবর্তন আবশ্যিক, স্বাভাবিক ও অবশ্যম্ভাবী হয়েছিল, সেরূপ প্রতিবেশ আমাদের দেশে তথা কোন অনুন্নত দেশেই আপনা থেকে গড়ে ওঠেনি। য়ুরোপীয় জীবনে ও সমাজে পরিবর্তন এসেছে সে-দেশের মানুষের আত্মিক ও জৈবনিক ক্রমবিকাশের স্বাভাবিক ধারায়। সেসব পরিবর্তনের চাহিদা ও যোগ্যতা ওদের সত্তার উন্মোষিত হয়েছিল, তাই তারা আবিষ্কারে উদ্ভাবনে, দিকে দিকে আত্মবিস্তারে, ঘরে ঘরে আত্মোন্নয়নে, অর্থে বিত্তে বিদ্যায়, অ্যাত্মোৎকর্ষে, প্রতিযোগিতায় ও প্রতিদ্বন্দ্বিতায় জিগীষা নিয়ে আত্মপ্রসার ও সিদ্ধি লক্ষ্যে উদ্যোগে, শ্রমে ও সাধনায় অনলস অশ্রান্ত ও অনবসর জীবন বরণ করেছিল।

য়ুরোপীয়দের প্রাক্তন উপনিবেশগুলোতে য়ুরোপীয় আদলে জীবন চর্চার ও জীবিকার ক্ষেত্র নির্মাণের কৃত্রিম প্রয়াস স্বাভাবিক ও সঙ্গত কারণেই বিফল ও বিকৃত ফলপ্রসূ হওয়ার কথা। টবে পোতা গাছ যেমন স্বাভাবিক বাড় পায় না, অনুকৃত জীবনও তেমনি স্বাভাবিকতার স্বাস্থ্য, লাবণ্য ও সুখ-স্বস্তি পেতে পারে না। বিদ্যার ও বিত্তের জোরে য়ুরোপীয়দের সঙ্গে কৃত্রিম মানসসম্পর্ক স্থাপন করে, অনুকৃত বিদ্যা-বুদ্ধি-জ্ঞান-প্রজ্ঞা দিয়ে এ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে ঔপনিবেশিক শাসনমুক্ত তথাকথিত স্বাধীন দেশগুলোর নায়করা অতি দ্রুত য়ুরোপীয় রাষ্ট্রগুলোর

আদলে দেশ রচনার ও রাষ্ট্র সাজানোর দিবাস্বপ্ন দেখতে থাকে স্থান-কাল ও সাধ্যের কথা বিস্মৃত হয়েই।

যেহেতু আদর্শ গণতান্ত্রিক সরকার হচ্ছে সমবায় প্রতিষ্ঠানের মতো, জন-গণের সর্বপ্রকার আবশ্যিক চাহিদা পূরণই এর লক্ষ্য, সেহেতু এখানেও ব্যবসা-বাণিজ্য আর শিল্প-কারখানা গড়ে উঠতে থাকে, এখানেও গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার প্রয়াস দেখা দেয়, এখানেও জ্ঞান-প্রজ্ঞা বিবেক-বিচার বাঞ্ছিত ও শ্রদ্ধেয় হয়ে ওঠে। কিন্তু ঐতিহ্য ছিল না বলে স্বাভাবিক প্রতিবেশ না পেয়ে সবকিছুই বিকৃতির ও বিশৃঙখলার শিকার হয়। অনুন্নত দেশের জনগণের যে সাক্ষরতা আবশ্যিক ছিল, তা নেই, জীবনের নিম্নতম মান বজায় রাখার জন্য যে আর্থিক সঙ্গতি অর্জন প্রয়োজন ছিল, তা নেই, উঠতি শিক্ষিত মধ্যশ্রেণীর যে-নীতিজ্ঞান, চরিত্রশক্তি ও আর্দশনিষ্ঠা গণতান্ত্রিক ন্যায় প্রতিষ্ঠিত রাখার জন্যে অপরিহার্য ছিল, তাও নেই। যে-কোন নিয়ম-নীতি সুষ্ঠুভাবে চালু করার ও রাখার জন্যে কোন রাষ্ট্রে ন্যায়-নীতিনিষ্ঠ, আদর্শ-সচেতন বিবেকবান মানুষের সংখ্যা কমপক্ষে শতকরা বায়ান্নজন থাকা চাই, নইলে নিয়ম শৃঙখলার মধ্যে সমাজ-সরকার চালু রাখা সম্ভব হয় না।

আফ্রো-এশিয়ার ও ল্যাতিন আমেরিকার অনুন্নত দেশগুলোর গাঁয়ের অজ্ঞ অশিক্ষিত দরিদ্র মানুষের সন্তানেরা তথাকথিত আধুনিক শিক্ষার ছিটেফোঁটা পেয়ে সে-বিদ্যার পুঁজি সম্বল করে শহরেবন্দরে আসে ধনে মানে প্রভাবে প্রতিপত্তিতে প্রতিষ্ঠিত হওয়ার বাঞ্ছা ও দাবি নিয়ে। কাজেই সব বুভুক্ষু প্রতি বছরে বাঘের ক্ষুধা, হায়েনার লোভ ও অজগরের গ্রাস নিয়ে দলে দলে আসছে, ভিড় জমাচ্ছে, কাড়াকাড়ি মারামারি, ঠকাঠকি, ঠোকাঠুকি করছে। এতে তৃপ্ত ও তুষ্ট হওয়ার, চাহিদা পূরণের সুযোগ কয়জনেই বা পায় আর পাচ্ছে। তাই দু তিন প্রজন্ম ধরে ধরে সম্পদভোগী মর্যাদাকামী লোকের লুটপাট চলবেই।

ইতিহাসের সাক্ষ্যে আমরা জানি ও মানি যে যোগ্য নেতৃত্ব পরিচালিত হয়ে বুনো বর্বর মানুষও নিয়ম-নীতিনিষ্ঠ হয়ে বাঞ্ছিত সমাজ-সদস্য রূপে সুনাগরিকের সুপ্রতিবেশীর মানবিক গুণ অর্জন করতে পারে। অধিকারের সুনির্দিষ্ট সীমার মধ্যে থেকে সমস্বার্থে সহিষ্ণুতায় সহযোগিতায় সহাবস্থান করে সুরুচির ও সংস্কৃতির লাবণ্য-ঋদ্ধ সভ্য জাতিরূপে আত্মপ্রকাশ করতে পারে। নবী-অবতার ছাড়াও গ্রীক-রোমান শক-হুন-ইউচি কিংবা ইন্দো-ইরানী য়ুরোপীয় আর্য নেতারা অথবা চেঙ্গিস-হালাকুর মতো নরদানবরা স্বগোত্রের বা স্বজাতির রুচি-সংস্কৃতি-সভ্যতার বিকাশের পথ তৈরি করে দিয়েছিল।

এমনকি এই সেদিনও আমাদের চোখের সামনে গ্যারিবলডী, ম্যাটসিনী, বিসমার্ক, হিটলার, মুসোলিনী, লেনিন, মাও সে তুঙ নন কেবল, ব্রিটিশ ভারতের গান্ধী জিন্নাহও সমকালে স্ব স্ব জাতির প্রাণপুরুষ ছিলেন। এঁরা স্ব স্ব ব্যক্তিত্বের প্রভায় অসংখ্য মানুষকে নীতিনিষ্ঠ, আদর্শবান ও ত্যাগপ্রবন করে তুলেছিলেন, গান্ধী তাঁর ব্যক্তিত্বের জোরে বিয়ে-না-করা খদ্দর-পরা লক্ষ লক্ষ আদর্শনিষ্ঠ সংগ্রামী দেশসেবক তৈরি করেছিলেন, জিন্নাহও ব্রিটিশ-সরকারের কৃপালোভী বহু সংখ্যক বিত্তবান বক-বিড়ালকে অন্তত দশ বছরের (১৯৩৭–৪৭) জন্যে নীতিনিষ্ঠ অনুগত খাদেমে-কওম বানিয়ে রেখেছিলেন।

কাজেই যে-কোন যৌথকর্মে সিদ্ধির ও সাফল্যের জন্যে নেতা চাই। যে-নেতার থাকবে রুচি-বুদ্ধি-জ্ঞান-প্রজ্ঞা-সাহস-আত্মপ্রত্যয়-আদর্শনিষ্ঠা, সুস্পষ্ট ও সুপরিকল্পিত উদ্দেশ্য, লক্ষ্য ও কর্মসূচি—এক কথায় নেতার থাকবে দৃঢ় চরিত্র ও মনীষা–Intellect ও Integrity. তাঁর ব্যক্তিত্বই উদ্দিষ্ট চিন্তায় ও কর্মে উদ্বুদ্ধ ও প্রণোদিত করবে তাঁর দিককার জনগণকে। কেননা,

তাঁর কর্ম ও আচরণ দেখে লোকে জানবে আর শুনবে ও বুঝবে যে, এ মানুষ ক্ষতি স্বীকারের শক্তি রাখেন, এ মানুষ স্বস্বার্থে কাউকে প্রতারিত করবেন না, এ মানুষকে নিশ্চিন্তে বিশ্বাস করা চলে। মানুষ বুঝবে, এমনি মানুষের উপর আস্থা ও ভরসা রাখা চলে এঁকেই নিশ্চিন্তে অনুসরণ অনুকরণ ও সমর্থন করা চলে, কেননা এ মানুষ নিজেরও ক্ষতি না করে অন্যের ক্ষতির কারণ হতে পারেন না, এ মানুষ গণহিতবাদী ও সিদ্ধিকামী। এ মানুষ লেলিয়ে দিয়ে এগিয়ে দিয়ে সঙ্কটকালে পিছিয়ে পড়েন না, সর্বক্ষেত্রে সর্বাবস্থায় পয়লা কদম তাঁরই, তিনি সঙ্কটে অটল, সাহসে দৃঢ়। আমরা ব্রিটিশভারতে এমন নেতৃত্ব দেখেছি গান্ধীর মধ্যে। এ মানুষটির ব্যক্তিত্বের প্রভাব ছিল অসামান্য—এঁর সাহস ও সংকল্পের কাছে বিনাযুদ্ধে হার মানতে হয়েছিল ব্রিটিশ সিংহকে। আমরা দেখেছি গান্ধী জেলে থাকলে ব্রিটিশভারতে কোন রাজনৈতিক কর্মকাণ্ড থাকত না।

আমরা শুনে শুনে মুখস্থ বলি বটে, চাষী-মজুরের নেতৃত্বে পরিচালিত সংগ্রামের মাধ্যমেই ঘটবে বিপ্লব, আসবে গণমুক্তি, কিন্তু গণনেতৃত্বে যে গণ্ডগোল বাধে ও বাড়ে– এ সত্য আর অস্বীকার করা যাবে না। কিন্তু সংগ্রামে নেতার আসনে গণমান্য ধীরবুদ্ধির ও স্থিরবিশ্বাসের সাহসী সংগ্রামী মানুষ থাকলেই কেবল সাফল্য হয় সম্ভব। কেননা, যৌথকর্মে প্রধান পরিচালক এবং যুদ্ধে সেনাপতি প্রয়োজন। একে personality-cult ব্যক্তিত্ব-পূজা বলা যাবে না।

আজ আমাদের ডানে বামে কোন নেতা নেই। এ মুহূর্তে আমাদের রাষ্ট্র যেন স্থির সমুদ্রে ছেঁড়াপাল, ভাঙা-দাঁড় ও হৃতহাল একটি নৌকা। ঝড় উঠলে কি হবে কেউ জানে না। আমাদের কিশোর-তরুণদের অনেকেই দেশের কাজ তথা জনগণের ও রাষ্ট্রের সেবা করতে চায়, কিন্তু আস্থা রাখবার মতো বল-ভরসা পাবার মতো নেতা খুঁজে পায় না বলে নৈরাশ্যে ভোগে, এবং পরে এক সময় ভাবে— 'চারদিককার সর্ব শক্তিমান সাহসী ও বুদ্ধিমান চালিয়াতরা বেপরওয়া জোরজুলুম ও বেদেরেগ লুটপাট চালাচ্ছে যখন, তখন আমি একা সৎ ও আদর্শনিষ্ঠ থেকে কি ফায়দা!' সেও তখন জুটে যায় খুন জখম রাহাজানির পেশায়, নাম লেখায় ভাড়াটে গুণ্ডার তালিকায়, হয়ে ওঠে মৌজুতদার, ঠিকাদার চোরাচালানদার ভেজালদার কিংবা মানুষ বেচার আড়তদার।

এখানে দলপতিও মন্ত্রিত্বের মূল্যর আকর্ষণে দলত্যাগ করে লুটিয়ে পড়ে সরকার-প্রধানের কোলে। সামরিক নায়ক-শাসকের আহ্বানে মন্ত্রী হয়ে হয় কৃতার্থ। আমাদের রাজনৈতিক দল কর্মসূচির জনপ্রিয়তা বা যৌক্তিকতা দিয়ে নয়— টিকে থাকে প্রাক্তন রাষ্ট্র প্রধানের স্ত্রীর বা কন্যার উত্তরাধিকার সূত্রে পাওয়া নেতৃত্বে। আমাদের সরকারে মন্ত্রিত্ব মেলে প্রাক্তন নেতার পুত্র-কন্যা হিসেবে। এ কোন cult-এর আলামত! দেশে আজ কারুর আইনের গুরুত্ব, মর্যাদা ও শাসন-চেতনা নেই। বলতে গেলে এখন আরণ্য জীবনই চলছে আমাদের—চলছে নির্বিঘ্নে মাৎস্যন্যায়। বিচারকও অসহায় আর পরিবেশের শিকার। আইন আছে প্রয়োগ নেই, কাজেই বিচারের বাণী নীরবে নিভৃতে কাঁদে।'

দর্শকের মনোজগৎ বিকৃত ও রুগ্ন করার জন্যে টিভি-তে, প্রেক্ষাগৃহে দেখানো হয় আমেরিকার ক্রাইম ও কমিক পিকচার, আর ভি. সি. আর-এ দেখানো হয় ব্লুফিল্ম নামে বিকৃত আদিরসাত্মক ছবি, ষাটের দশকে সমাজ-সংস্কৃতির উন্নয়ন লক্ষ্যেও কিছু ছবি তৈরির চেষ্টা হয়েছিল। কিন্তু ইয়াঙ্কি ছবিগুলো সিনেমার প্রযোজক পরিচালক ও সিনেমাখোরদের রুচি এমন বিকৃত করে দিয়েছে যে পাল্লা দিয়ে তারা এ্যাকশন-পূর্ণ মারামারির ছবি তৈরি করছে। আমাদের কৈশোরে দেখা 'হাণ্টারওয়ালী'ও তবু অনাবিল রস যোগাত, এখনকার 'হিম্মতওয়ালী' কি দেয়?

সারা সমাজে ধরেছে পচন, দেশ-কাল-মানুষের হিতকামী বিবেকবান কিছু অক্ষম মানুষ উদ্বেগে উৎকণ্ঠায় অস্থির বটে, কিন্তু অন্যেরা হয়তো নৈরাশ্যবশেই নিষ্ক্রিয় ও উদাসীন। গাইয়ে-বাজিয়ে-আঁকিয়ে-লিখিয়েরাও যেন শ্রান্ত ও দিশেহারা। সবাই যেন ঠকচাচার মতোই বলতে চায় দুনিয়ার লোক সৎ নয়—ভালো নয়, আমি একা ভালো হয়ে ঠকব কেন! তবু কিছু নাটক ও নাট্যগোষ্ঠী পথের দিশারী মশাল জ্বেলে রাখবার চেষ্টা করছে, দুএকজন প্রাবন্ধিক ও কবি-গাল্পিকও রয়েছেন পচন প্রতিরোধের চেষ্টায়।

এও স্বীকার্য যে, নানা সঙ্গত ও স্বাভাবিক কারণেই দেশ-কাল-সমাজ-সরকারের পরিবর্তনে ও প্রয়োজনে পুরোনো নিয়ম-নীতি বর্জিত হয়েছে। কিন্তু দেশ-কাল-সমাজ-সরকারের প্রয়োজনেই দেশ-কালের চাহিদা অনুগ নতুন নিয়ম-নীতি চালু হওয়া প্রত্যাশিত ছিল—আবশ্যিক ছিল নতুন মূল্যবোধের ও নীতি-আদর্শের বিকাশ। তা হয়নি, ফলে ঘরে বাইরে ব্যক্তি-মানুষের জান-মাল-গর্দান যেমন নিরাপদ নয়, তেমনি মন-মননও নয় সুস্থ ও স্বাভাবিক।

এর ফলে স্বাধীন বাঙলাদেশে কাম্য কিছু বৃদ্ধি পায়নি। বেড়েছে মুদ্রা, বেড়েছে দ্রব্যমূল, বেড়েছে খুনখারাবী ও রাহাজানি। বেড়েছে ছল-চাতুরী-প্রতারণা, বেড়েছে ভেজাল, বেড়েছে জুলুম-জালিম ও মজলুম। বেড়েছে সোনার দাম। তাই মা-বাপের প্রশ্রয়ে বেড়েছে ছেলেমেয়েদের মুক্তাঙ্গন প্রেম, তৎসম্পর্কিত প্রতারণা ও এসিড ছোঁড়া। বেড়েছে ধনী সন্তানদের ব্রিটেনে, যুক্তরাষ্ট্রে ও কানাডায় বসবাস। বেড়েছে দুবাই-ওয়ালার ধনের আস্ফালন, বেড়েছে কুমারী মেয়েদের সালওয়ারকামিজ প্রীতি, বেড়েছে তরুণদের জামার খোলা বোতামে কেশর-প্রদর্শনী, আর বেড়েছে রাজনীতির অঙ্গনে টাউটের সংখ্যা। ১৯৮৪ সনের 'ইতিবাচক সালতামামি' নামের একটা কবিতায় ইদানীংকার বাঙলাদেশের সমাজ-সংস্কৃতির ও সরকারী কৃতির ব্যঙ্গাত্মক ফিরিস্তি রয়েছে। সেদিক দিয়ে কবিতাটি কালের সাক্ষ্য হয়ে থাকল। কবিতাটি দীর্ঘ বলে উদ্ধৃত করা গেল না। কয়টি চরণ এরূপ ঃ 'আমরা কাজকে তরল কথার সিলিণ্ডারে পুরে ফেলেছি/এবং অসংখ্য আশ্বাসের কারখানা স্থাপন করেছি।/... ভার্সিটির কোণ ছেড়ে গা ঝেড়ে ভীরু প্রেম সড়কে বসেছে।/... আমরা প্রতিনিয়ত নিজেকে হত্যা করে এগিয়ে যাচ্ছি।'

এ অবস্থায় দেশ-কাল-সমাজ-সরকার-রাষ্ট্ররূপী নৌকার কে ধরিবে হাল, কে তুলিবে পাল, কে টানিবে দাঁড়? অতএব নেতা চাই, যে-নেতা জানেন জীবনে জয় ও প্রতিষ্ঠা আপোসে নয়, প্রতিরোধে ও সংগ্রামেই সম্ভব। তিনি আরো জানেন– শ্রেয় রয়েছে কুকুর হয়ে আদর পাওয়ায় নয়, বাঘ হয়ে 'গুলি' খাওয়ায়।

তেমন মানুষ চাই

চোখ মেলে যা-ই দেখে তা-ই যাদের সম্বল, চোখ বুজলে যারা কিছুই ভাবতে ও দেখতে পায় না, তাদের ভাবের অনুভবের স্থিতি চোখের কোলেই। তেমন মানুষ বিশ্বভুবন চষে বেড়ালেও তাদের জীবন-ভাবনা কিংবা জগৎচেতনা কখনো বিস্তার-বিকাশ পায় না। কথায় বলে, নাপিতের বাটি নিয়ে সমুদ্রে গেলেও বেশি পানি আনা যায় না, তেমনি কূর্মপ্রকৃতির ও কূর্মপ্রবৃত্তির মানুষের

প্রবৃত্তিকেও বিদ্যা ও বিত্ত প্রভাবিত করতে পারে না। বিশ্ব পরিক্রমা করে কিংবা বই পড়ে বহু ও বিচিত্র জ্ঞান অর্জন করলেও তা পোশাকের মতো তার বাহ্যশোভা ও সামাজিক খ্যাতি হয়তো বৃদ্ধি করে, কিন্তু মনের গভীরে প্রবিষ্ট হয়ে তার বৃত্তি-প্রবৃত্তি নিয়ন্ত্রণ করে না, এ জ্ঞান ও বহুদর্শিতা তাই বন্ধ্যা—সৃষ্টিশীল নয়। এমনি জ্ঞান তাকে শক্তিমান করে, কখনো প্রজ্ঞা দান করে না। তেমন মানুষ অশিক্ষিত থাকলে যা হত, শিক্ষিত হয়েও তা-ই করে। অতএব, বিদ্যা, বিত্ত কিংবা য়ুরোপ-আমেরিকা প্রবাস কারো স্বভাব চরিত্র বদলায় না। জ্ঞান-প্রজ্ঞা, বিবেক-বিবেচনা, ন্যায়বুদ্ধি, সমাজবোধ, নাগরিক-চেতনা জন্মায় অন্তরে স্বশিক্ষায় ও আত্মপ্রণোদনায়। শহরে আমরা উচ্চশিক্ষিত ও বিত্তবান লোকের মধ্যেই বাস করি, অর্থের স্বার্থের কোন সম্পর্ক না থাকলেও, এরা একপ্রকার দেশ প্রচলিত সামাজিক সৌজন্য এবং আচারিক সংস্কৃতি বজায় রেখে চলে। কিন্তু বৈষয়িক জীবনে এদের সান্নিধ্যে এলে দেখা যায় এরা লোভে হায়েনা, প্রতিহিংসায় শ্বাপদ, রিরংসায় বুনো, ক্ষোভে বর্বর, তোয়াজে সারমেয়, ভীরুতায় ফেরু, সতর্কতায় কাক, অনুকরণে বানর, কৃতঘ্নতায় সাপ, স্বাথসন্ধিৎসায় শকুন।

এলেমের ও হেলেমের জোরে এদের কেউ কেউ প্রায় প্রতিমাসেই বিদেশের কাহাঁ কাহাঁ সেমিনারে সম্মেলনে হাজিরা দিয়ে বেড়ায়—অনেকেই লণ্ডন-প্যারিস-নিউইয়র্কে দশ বারো বছর পড়ে ও থেকে আসার গর্ব করে, কিন্তু তাদের মন-মানসের, স্বভাব-চরিত্রের কোন বিকাশ-বিস্তার কিংবা উন্নয়ন-উত্তরণ দেখিনে। বরং সত্য গোপনে, মিথ্যা ভাষণে, ষড়যন্ত্রে, বাদাবাদিতে তোয়াজে-তোষামোদে, ঈর্ষায়-অসূয়ায় তাদের কারো কারো জুড়ি মেলা ভার। একি বিদ্যার ও বিত্তের এক প্রজন্মের পরিচর্যার ফল? নাকি এ মানুষ নামের প্রজাতির আদিম ও অকৃত্রিম অপরিশীলিত স্বভাবের বহিঃপ্রকাশ!

কারণ যা-ই হোক, আমাদের দেশের তথা জাতির আর্থিক, নৈতিক, সামাজিক ও রাজনৈতিক সমস্যার ও বিপর্যয়ের মূলে রয়েছে শহুরে শিক্ষিত মানুষের এ বৃত্তি-প্রবৃত্তিজাত চিন্তা, কর্ম ও আচরণ। এতো গেল প্রত্যক্ষবাদী নগদ প্রাপ্তিলোভী মননহীন মানুষের কথা, কিন্তু যারা চিন্তক ভাবুক বলে সমাজে পরিচিত, যাদের মনন কিংবা সৃজন সমাজে স্বীকৃত, তাদের দৃষ্টির সঙ্গে কর্মের, চিন্তার সঙ্গে আচরণের, মুখের উচ্চারণে ও বুকে পোষা আশায়, কথায় ও কাজে প্রায়ই বিরোধ প্রকট হয়ে ওঠে। বুদ্ধিজীবীর চরিত্রে এ অস্থিরতা, এ অনেকতা, এ স্ববিরোধ কি দৈশিক সমাজ সংলগ্নতার ফল? না কি বৈষয়িক জীবনে নিরাপত্তা নিশ্চয়তার অভাবজনিত উদ্বেগের প্রসূন! এ-ও কি শিক্ষায় ও শহরে, বিদ্যায় ও বিত্তে প্রথম প্রজন্মের নবাধিকারজাত সাময়িক বিপর্যয়! শিক্ষিত মাত্রই যেমন মধ্যবিত্ত তেমনি ইনটেলিজেন্টশিয়াও, কাজেই তারা নন কেবল, যাঁরা ইন্টেলেকচুয়াল বলে পরিচিত আমাদের শিক্ষক, সাংবাদিক, শিল্পী, সাহিত্যিক, দার্শনিক, ঐতিহাসিক, বিজ্ঞানী কিংবা রাজনীতিক, অর্থ-বিজ্ঞানী, সমাজবিজ্ঞানী এবং অন্যান্য তত্ত্ববিৎ তাঁদেরও অধিকাংশই যে হয় সরকার-ভীরু, নয়তো সরকার-ঘেঁষা। তাঁদের তাই সুবিধেবাদী, সুযোগসন্ধানী, প্রভুভক্ত পোষমানা প্রাণী বলেই চিহ্নিত করতে হয়। তাঁরা বারোমেসে হরবোলা, বিশেষ করে জনগণের প্রয়োজনের সময়ে তাঁরা হয় সরকারের সঙ্গে জুটে যান, নয়তো গা-পা বাঁচিয়ে গা-ঢাকা দেন। সারা দেশে আর বাকী থাকেন নিতান্ত দু'চারজন মানুষ, যাঁরা যখন যেমন তখন তেমন হন না, তেমন নীতিকে ঘৃণা করেন এবং একটা অটল আদর্শ নিয়ে চলেন। এঁরা নেহাত দু'চারজন বলেই এঁরা দৃষ্টি গ্রাহ্য বা অনুভবসাধ্য কোন কৃতি দেখাতে পারেন না। এমনকি বিরুদ্ধ প্রতিবেশে সাহস, ধৈর্য ও আত্মপ্রত্যয় হারিয়ে নিরাশ হয়ে কিংবা গড্ডলিকা জীবনে প্রলুব্ধ হয়ে কেউ কেউ ব্রতভ্রষ্টও হন।

এঁদের নিন্দা করা চলে না, কেননা, সমাজের নয়শ' নিরেনব্বইজনই যখন ধন-জন-মানের মোহে দিশেহারা হয়ে ছুটোছুটি করছে, সেখানে যদি কারও মধ্য বয়সে বা যৌবানান্তে বৃন্তচ্যুতি বা ধৈর্যচ্যুতি ঘটে তবে তাঁকেও করুণা বশে অন্তত মাফ করে দিতে হয়। শিশু পাঠ্য বইতে ছিল বটে—

লোকে যারে বড় বলে বড় সেই হয়' কিন্তু আজকের দেশের এ আর্থিক-নৈতিক-সামাজিক-সাংস্কৃতিক-রাষ্ট্রিক প্রতিবেশে লোকে বড় বলার জন্যে প্রতীক্ষা করা চলে না—আজ সমাজের যে-কোন লোক জানে এবং মানেও যে 'ছলে বলে বা কৌশলে পুঁজিতে বা প্রতারণায়, বিদ্যায় বা বিত্তে, জোরে বা জুলুমে, কেড়ে বা মেরে যে 'আপনাকে বড় করতে বা বলাতে পারে', সেই বড়লোক। এ জন্যে এ যুগ 'হামবড়া'র যুগ, বড়ো বলানোর যুগ—লোকের শ্রদ্ধা ও সম্মান পেয়ে বড়ো হওয়ার কাল অপগত, কেননা তা যোগ্যতা, আদর্শনিষ্ঠা ও সুকৃতিসাধ্য এবং এসব কয়টিই সমৃদ্ধি, সাহস ও সাধনা সাপেক্ষ।

কিন্তু তথাকথিত স্বাধীন সার্বভৌম অনুন্নত দরিদ্র রাষ্ট্রে স্বদেশী স্বধর্মী স্বভাষী স্বজাতি নিয়ে গঠিত বিদেশীর ক্রীড়ণক সরকারের দুঃশাসনে তেমন শ্রেয়োবুদ্ধি সঞ্চারক প্রতিবেশ থাকে না, তাই এ কালে মানুষ কেবল সহজসাধন পন্থী। এ সহজসাধনের অন্য নাম আত্মরতি ও স্বার্থসিদ্ধিৎসা। স্বার্থসিদ্ধি সুযোগ ও সুবিধা সন্ধানই এদের নীতি। বহুজনহিতে এবং বহুজনসুখে নিয়োজিত নয় বলে প্রত্যাশী বঞ্চিতরা একে বলে দুর্নীতি। তবু এ হচ্ছে ভূ-রাজনীতির ঘুঁটি, দরিদ্র রাষ্ট্রে অবস্থানগত ও কালোচিত লোকনীতি, বিষয়নীতি ও জীবিকানীতি।

এ আরণ্য প্রতিবেশ থেকে উদ্ধার পেতে হলে সমন্বিত যৌথ জীবন বিকাশ লক্ষ্যে শ্রেয়োনীতি, হিতবুদ্ধি, যোগ্য নেতৃত্ব ও মানববাদীর আত্মত্যাগ আবশ্যিক।

গণনেতার প্রতীক্ষায়

জাতে হিংস্র শ্বাপদ হলেও সার্কাসের বাঘ-সিংহ প্রশিক্ষণ পেয়ে এমন অনন্যগুণের অধিকারী হয় যে তাদের খাদ্যস্বরূপ তুচ্ছ প্রাণী ছাগল-ভেড়াও তাদের পিঠে পা রাখে নির্ভয়ে। সমস্বার্থে সহিষ্ণুতায় ও সহযোগিতায় খাদ্য-খাদকের সহাবস্থানের—এ নীতির অঙ্গীকার নিশ্চয়ই উচ্চমানের সংস্কৃতির ও প্রজ্ঞার নিদর্শন। কেউ কেউ অবশ্য বলবে যে, এ বাঘ-সিংহের মানসোৎকর্ষের পরিচায়ক নয়, প্রাণের দায়ে চাপের মুখে বাপ বলার মতো অবস্থার ও অবস্থানের সাক্ষ্য মাত্র। তর্কের অবকাশ থাকলেও আমরা দুটো যুক্তিই নীরবে মেনে নিচ্ছি। কারণ, এ দুটোর যে-কোন একটি মানবসমাজ সম্বন্ধে প্রযোজ্য বলে স্বীকৃত হলেই আমরা বর্তে যাই। বিভিন্ন প্রজাতির প্রাণীর সহজাত ও বিশিষ্ট কিছু স্বভাব ও আচরণ থাকে, যেমন স্বভাবে পৃথিবীর যাবতীয় কুকুর অভিন্ন। তেমনি অভিন্ন ইঁদুর, বিড়াল, গুরু, ঘোড়া, মেষ, সাপ, ব্যাঙ, মশা, মাছি। মানুষও এক প্রজাতির প্রাণী। মানুষেরও রয়েছে সহজাত বৃত্তিপ্রবৃত্তি তথা স্বভাব ও আচরণ। এক্ষেত্রে দুনিয়ার তাবৎ মানুষ অভিন্ন। তা হলেও সার্কাসের বাঘ-সিংহের মতো ঘরোয়া পরিবেশে পরিবারে শাস্ত্রিক, নৈতিক, শৈক্ষিক, আর্থিক, সাংস্কৃতিক ও সামাজিক অবস্থান ও উৎকর্ষ অনুসারে তার স্বভাবে ও আচরণে বাহ্য পরিবর্তন ঘটতে পারে। তার ক্ষোভের একটা

বাহ্য কারণ ও যুক্তি থাকতে পারে, পরশ্রীকাতরতা কিংবা অসূয়ার একটা প্রতিবেশ প্রসূত মনস্তাত্ত্বিক কারণ থাকা সম্ভব, তেমন রিরংসারও থাকে একটা জৈবিক ও মৌহূর্তিক কারণ। কাজেই মানুষের আত্মরতি চিরকালই থাকবে পরপ্রীতির পরিপন্থী, সে হবে সাধারণভাবে স্বার্থবাজ, পরধনঈপ্সু, পরসুখঈর্ষ্যু। সার্কাসে প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত বাঘ-সিংহ যেমন বুনো বাঘ-সিংহের স্বভাবও আচরণ বক্তৃতা দিয়েই বদলাতে পারবে না, মানুষও তেমনি এতোকালের শাস্ত্রকথায় নীতিকথায় ইতিকথায় কিংবা তত্ত্বকথায় মানুষের ভাব, চিন্তা, কর্ম ও আচরণ পালটাতে পারেনি। কেননা, প্রতি মুহূর্তে নতুন শিশু নতুন প্রাণী হিসেবেই জন্ম নিচ্ছে, জন্ম মুহূর্ত থেকেই স্বেচ্ছায় সে কোন নিয়ম-নীতি অঙ্গীকার করছে না, কেবল যৌথ জীবনে টিকে থাকার গরজে পারিবারিক ও সামাজিক চাপে সে প্রকাশ্যে সহিষ্ণুতার, সহযোগিতার ও সহাবস্থানের ভান করেছে, এ চাপের বা শাসন শৈথিল্যের সুযোগে সে আজ অকৃত্রিম প্রাণী সুলভ কর্মে ও আচরণে লিপ্ত হয় তথা একান্ত আত্মসুখকামী হয়—আত্মপোষণ ও আত্মপ্রসারই হয় তার লক্ষ্য ভোগ-কৈভোগ লক্ষ্যে লাভের লোভে হয় সে চালিত।

এ কারণেই মূসা-ঈসার কিংবা সক্রেটিস-প্ল্যাটোর অসামান্য ব্যক্তিত্বে অভিভূত স্বস্থানের সমকালীন কিছু লোক তাঁদের বাণীর বশীভূত হয়ে তাঁদের অভিপ্রেত নিয়মনীতির অনুগত হয়েছে বটে, কিন্তু নতুন প্রজন্মের মানুষ আবার কর্মে-আচরণে সে-সব নিয়ম-নীতির প্রতি ঔদাসীন্য দেখায়, যদিও নিতান্ত আবাল্যের সংস্কার বশে বিশ্বাসের কোঠায় অনাদরে নিষ্ক্রিয় আনুগত্য পুষতেই থাকে। এর কারণ মানুষের কাছে তত্ত্বের ও তথ্যের গুরুত্ব সামান্য। তাই বাণীর মূল্য তত্ত্বের ও তথ্যের সত্যতায় ও সারবত্তায় নয়, কার মুখে উচ্চারিত হয়েছে নির্ভর করে তার উপরই।

ওই ব্যক্তিত্বের প্রভা ও প্রভাব যতই কমতে থাকে, বাণীও সে পরিমাণেই গুরুত্ব হারায়। তখন শৈশব-বাল্যের সংস্কারই বিশ্বাসের ও প্রত্যয়ের আকারে মর্মমূলে শিকড় ছড়ায়—তা-ই আত্মপ্রত্যয়হীন দুর্বল ও বিপন্ন মানুষের ভাব-চিন্তা ও কর্ম-আচরণ নিয়ন্ত্রণ করে—শাস্ত্র ও লৌকিক নীতি-নিয়ম ও রীতি-রেওয়াজ এ ভাবেই মানুষের জীবনে রূপায়িত হচ্ছে সংস্কার নিয়ন্ত্রিত নিলর্ক্ষ্য চিন্তা-চেতনার প্রসূনরূপে।

এ কারণেই সব মানুষ আস্তিক ও শাস্ত্রে বিশ্বাসী থাকা সত্ত্বেও, বাহ্যত সমাজ অনুগত এবং শাস্তি-ভীরু হলেও [sin, vice ও crime-প্রবণ] পাপ, দোষ ও অপরাধ প্রবণ, কারণ শাস্ত্রজ্ঞান নয় নৈতিক চেতনা তথা ব্যক্তিগতভাবে উপলব্ধ শ্রেয়োবোধই মানুষের ভাব-চিন্তা-কর্ম-আচরণ নিয়ন্ত্রিত ও পরিচালিত করে। কাজেই সৎকথায় সব মানুষকে কখনো বশ করা যাবে না, কারণ উবাচ ও কিতাব ব্যক্তিত্বের প্রভাবিরহী হলে ক্বচিৎ কারো মন জাগায়। বিরাট সমাজের বিপুল সংখ্যক মানুষের কাছে তা বহুশ্রুত আটপৌরে কথামাত্র—তাই কোন জিজ্ঞাসা বা আকর্ষণ থাকে না কিতাবী কথার প্রতি, বরং সামাজিক নিন্দা ও আইনের শাস্তি অনেক বেশি প্রত্যক্ষ ও ভয়ঙ্কর বলেই অধিক কার্যকর ও ফলপ্রসূ।

শাস্ত্র-সাহিত্য-ইতিহাস-দর্শন কিছুসংখ্যক মানুষের মনোভূমে প্রজ্ঞা-করুণা-মৈত্রীরূপ মনুষ্যত্বের ও মানবতার ফসল ফলাতে সমর্থ বটে, কিন্তু সব মানুষে তা সংক্রমিত করা, ভাষণ বা আচরণ মাধ্যমে সবার মনে তা সঞ্চারিত করা কখনো সম্ভব হবে না—সবার মন-বুদ্ধি-রুচি প্রবৃত্তি-প্রকৃতি-লক্ষ্য একরকম নয় বলেই। তাই আমরা মহামানব বা ইনসানুল কামিল চাইনে, চাই কিছু বিবেকবান মানববাদী যাঁরা নেতৃত্ব দেবেন। ঐ সার্কাসের বাঘসিংহের মতোই জ্ঞান-বুদ্ধি-প্রজ্ঞা-রুচিসম্পন্ন লোকহিতকামী সংবেদনশীল পরিশীলিত মানববাদী মানুষের ঐক্যে

সমর্থনে ও নেতৃত্বেই কেবল সমাজ প্রতাপে প্রবল হয়ে বিরাট-বিপুল জনগণকে নীতিনিয়মের ও আইনের শাসনে রাখতে সক্ষম। বুনো বর্বর ও ভব্য নির্বিশেষে সমাজ এভাবেই আজো টিকে রয়েছে, এবং এগুচ্ছে এ পথেই। কাজেই সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র না হলেও গণ-কল্যাণকামী বুদ্ধিমান ও চরিত্রবান লোক নিয়ে গঠিত 'সরকার যথাসাধ্য সুশাসনে ও সুব্যবস্থায় শোষণ-পীড়িত দীনজনের আর্থিক-যন্ত্রণার কিছুটা আপাত উপশম ঘটাতে পারে,—পারে জান-মালের নিরাপত্তা সম্বন্ধে আশ্বস্ত করতে। বলাবাহুল্য পারিবারিক প্রতিবেশে লালিত ব্যক্তি-মানুষই কেবল বিদ্যা-বুদ্ধি-রুচি এবং সর্বোপরি বিবেক চালিত ন্যায়বোধ অনুযায়ী সংবেদনশীলতাবশে নীতিনিষ্ঠ এবং বহুজনহিত ও বহুজনসুখ কামী হতে পারে। এ মুহূর্তে দেশের অজ্ঞ অসহায় অনক্ষর অনাহার মানুষ যা চায় তা ধনও নয় মানও নয়, প্রাণে বাঁচার মতো সামান্য আহার, মাথা গোঁজার ঠাঁই আর জানের নিরাপত্তা ও মালের হেফাজত। দুঃশাসনে সৃষ্ট আজকের দুর্দিনে এ তিনটেই দুর্লভ। আশা জাগাবে,আশ্বস্ত করবে, প্রত্যাশা করা যাবে — তেমন মানুষদের প্রতীক্ষায় রইলাম।

বুর্জোয়া সমাজে বুদ্ধিজীবী

আজকালকার বুর্জোয়া সমাজে সাধারণভাবে উচ্চ ও নিম্ন অবিশেষে মধ্যবিত্তের ও মধ্যচিত্তের মানুষের জীবনে লক্ষ্য তিনটের যে কোন একটি—ধনের বা মানের কিংবা গুণের মানুষ হওয়া। অবশ্য এ কথা বলার অপেক্ষা রাখে না যে, ধনের মানুষ হওয়া সবারই সুপ্ত, গুপ্ত বা ব্যক্ত লক্ষ্য। আর ধন হলেই মানের লোভ জাগে। কাজেই ধনী মাত্রেই কিছুটা মানলোভীও। তবে মানুষকে এমনি তিন ছকে ভাগ করা চলে না। আমরা কেবল আকাঙ্ক্ষার প্রবণতা অনুযায়ী তিন প্রকারের মানুষকে চিহ্নিত করছি। আসলে মানুষ মাত্রেই মিশ্র বাঞ্ছারই সমষ্টি। একাধারে ধন ও মানলোভী, ধন ও গুণাকাঙ্ক্ষী;মান ও গুণকামী কিংবা ধনমানগুণাকাঙ্ক্ষী মানুষও একেবারে বিরল নয়।

১

ধনী হয় বেনে-ব্যাঙ্কার,ঠিকাদার, কারখানাদার, উকিল-ডাক্তার প্রভৃতি। ধনলিপ্সু ধনী মানুষ হচ্ছে সমাজে উল্কার মতো। যতক্ষণ অছে তার থেকে চোখ ফেরানো যায় না। ধনের মধ্যে তার যতদিন জৈবস্থিতি,ততদিন তাকে এড়িয়ে চলা অনেকের পক্ষে সম্ভব হলেও সে কারো দৃষ্টি এড়ায় না। তার দর্প-দাপট ও তার বিত্ত প্রচণ্ডভাবে অনুভব করায়। তার মৃত্যুসংবাদ মেলে বটে কিন্তু শোক সভা বসে না এবং স্বনামের পথ-ঘাট মন্দির, মসজিদ, স্কুল কলেজ প্রভৃতি প্রতিষ্ঠান রেখে গেলেও যেন সমাজে তার প্রতিষ্ঠা লাভ ঘটে না। কালক্রমে নামটি বিলুপ্ত তাৎপর্যে ও বিস্মৃত পরিচয়ে টিকে থাকে মাত্র। আর যারা জনহিতকর কোন কৃতি বা ইট-পাথরের বাস্তব কীর্তি রেখে যান না তাদের সুনাম-দুর্ণাম উচ্চারণের অভাবে তাদের মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গেই বিস্মৃতিসাগরে নিশ্চিহ্নে মিলিয়ে যায়, মন্ত্রীপদ হারানোর সঙ্গে সঙ্গে যেমন পত্রিকার বুক থেকে মুছে যায় মন্ত্রীর নামডাক। কারণ বিপুল ধন আসে পুঁজিতে ও প্রতারণায়, উৎকোচে ও

অসততায়, ঘুষে ও সুদে, বঞ্চনায় ও দাঁওমারায়, ফাঁকিতে ও ফটকায়। আবার ধনী মরে বটে, তবে অর্জিত সম্পদ রেখে যায় সন্তানের জন্যে, তাই ধনমোহ থেকে মুক্তি দুঃসাধ্য। ধনে ধন যেমন আনে, ধনলিপ্সাও বাড়ায় তেমনি। তাই তৃপ্তি মেলে না কখনো, কেননা তৃষ্ণা সুখের অন্তরায়। স্বচ্ছন্দে বাঁচার জন্যে অর্থ-সম্পদ অবশ্যই প্রয়োজন, নিশ্চিন্তে বাঁচার জন্যে যা দরকার তার অর্থবিত্ত কম হলে যেমন মানবিক গুণের বিকাশ সাধন, মনুষ্যত্ব রক্ষা প্রায় অসম্ভব হয়ে ওঠে, প্রয়োজনাতিরিক্ত ধনও তেমনি মানুষকে করে অমানুষ, লক্ষ্মীর বাহন তাই প্যাঁচা। ধনীর ধন ভোগ-উপভোগের মাধ্যম বা উপায় হচ্ছে মদ-মাগী-জুয়া-তিনটিই গুণ বিনাশক।

২

মানকামী মানুষের লক্ষ্য জুড়ি গাড়ি চড়ায় নয় বরং যাতে দশবিশ জন তার আগে পাছে চলে সে-ক্ষমতা বা প্রতিষ্ঠা অর্জনই তার জীবনে কাম্য। গাঁয়ের মোড়ল-প্রধান, ইউনিয়ন কাউন্সিলের সদস্য-চেয়ারম্যান থেকে জাতীয় সংসদের সদস্য অবধি সবাই এমনি মানের কাঙাল। এই মান ক্ষেত্রবিশেষে তাদের জানের চেয়েও বড়। এখানেও যেহেতু দ্বন্দ্ব রয়েছে, রয়েছে প্রতিযোগিতা আর প্রতিদ্বন্দ্বিতা, সেহেতু এখানেও আছে ছল-চাতুরীর, প্রতারণা-প্রবঞ্চনার, শঠতা-কপটতার খেলা আর দুষ্কৃতি-দুষ্টামির সুযোগ ও সুবিধে। তবে তাদের কিছুটা জনহিতকামী হতেই হয় অন্তত কল্যাণকামীর কপটাভিনয় তাদের করতেই হয়—নিদেনপক্ষে নানা আর্থিক সুযোগ সুবিধে দিতেই হয় চেলাদের ও দলীয় লোকদের। এ কাজে সবচেয়ে পটু হচ্ছে জাতীয় সংসদের সদস্যরা, স্ব স্ব অঞ্চলে এ জন্যেই তারা প্রকাশ্যে লোকহিতকারী, যদিও ঢাকা শহরে তারাই মতলববাজ অর্থ-স্বার্থ সন্ধানী! এই মানের মানুষ যতকাল ক্ষমতার বৃত্তে বিচরণ করে ততকালই মানী। বৃত্তচ্যুতি ঘটলেই তারা মান-খোয়া অনাদৃত নিঃসঙ্গ ব্যক্তিমাত্র। তখন লোক-অবহেলায় বর্তমান তাদের রিক্ত, ভবিষ্যৎ বন্ধ্যা এবং অতীতের রোমন্থনে তাদের স্বস্তি। মানী মানুষ জীবনের অন্তিমলগ্নে বা প্রান্তপর্বে প্রায়ই এই ট্র্যাজেডীর শিকার হয়।

৩

গুণের মানুষ সমাজে শ্রদ্ধেয় ও প্রখ্যাত। যেহেতু দারিদ্র্য সর্বগুণ বিনাশী, সেহেতু গুণের বিকাশের ও প্রকাশের জন্যে গুণী মানুষকে দারিদ্র্য সীমার উর্ধ্বে থাকতেই হবে। গুণী মানুষ লোভে আত্মবিক্রয় করে, দারিদ্র্য-যন্ত্রণার কবলে পড়ে ঘটায় বিবেকের মৃত্যু, হারায় কল্যাণবুদ্ধি। গুণীজনের অবরুদ্ধ গুণের প্রকাশ-বিকাশের জন্যেই স্বনির্ভর সচ্ছল স্বচ্ছন্দ জীবন আবশ্যিক। কোন কোন গুণী ব্যক্তি ধনলিপ্সার শিকার হয়ে মানুষের প্রতি তার দায়িত্বচেতনা ও কর্তব্যবুদ্ধি পরিহার করে, কেউ কেউ মানলোভেও নীতি-আদর্শ বিসর্জন দেয়। এমনি করে সে-সব ধনলোভী ও মানকামী মানুষ শ্রদ্ধেয়তার সঞ্চয় হারায়, খোয়ায় মানও। মনে কাঙাল এবং মস্তিষ্কে ধনী এ সব ব্যক্তি পরিণামে সমাজের ক্ষতিই করে বেশি। মসীজীবী লেখক, পেশাদার রাজনীতিক, ধনলিপ্সু বেণে, অর্থলোভী ঠিকাদার, অর্থকামী চিত্রকর, মানপ্রত্যাশী মনীষী, জনপ্রিয়তাকামী সাংবাদিক, খ্যাতিপ্রিয় বুদ্ধিজীবী, প্রতিপত্তিকামী নেতা সমাজের ক্ষতি করে। মানুষের রুচি-বুদ্ধি-অনুভবের, চিন্তা-কর্ম-আচরণের উন্নয়ন ও পরিশীলন সম্ভব কেবল আপাত প্রত্যাখ্যান ও নিন্দা-নির্যাতনের ঝুঁকি নিতে রাজি গুণীর পক্ষেই।

গুণী মানুষের সামর্থ্য যেহেতু অসামান্য, সেহেতু গুণী মানুষেরা স্বকালে প্রখ্যাত হয় এবং উত্তর-কালেও থাকে লোকস্মৃতিতে অমর। ফলে তাঁর কৃতি, কীর্তি ও কলঙ্ক সমভাবে স্মরণীয়

হয়ে থাকে। মীরজাফরের নবাবী গৌরবকে ম্লান করে দিয়ে বিশ্বাসঘাতকতার কলঙ্কই প্রকট বিকট হয়ে রয়েছে। ইতিহাসে নয় কেবল, সমাজেও লিপ্সু গুণীজনদের কর্ম ও আচরণ তাদের বংশধরকে ও স্বজাতিদের লজ্জিত রাখে। এমনি অনেক গুণীজনের বৃত্তান্ত আমরা সবাই জানি। এই জন্যেই বিজ্ঞানে-দর্শনে, সাহিত্যে-শিল্পে, রাজনীতিতে, চিকিৎসাবিদ্যায় ও লোকসেবায় যাঁরা অনন্য ও অসামান্য কিছু করার সামর্থ্য রাখেন, তাঁদের খ্যাতি ও স্মৃতি অমলিন রাখার গরজেই তাঁদের চিন্তায় কর্মে ও আচরণে সংযত ও বিবেকানুগত থাকা বাঞ্ছনীয়। তাতেই নিহিত রয়েছে একাধারে আত্মকল্যাণ ও লোকহিত।

বুর্জোয়া সমাজে আত্মমর্যাদাসম্পন্ন বিবেকবান ধনী ব্যক্তিত্ব বিরল হলে নাগরিক অধিকারের ও দায়িত্বের রীতি-রেওয়াজ নিয়ম-নীতি আদর্শ-লক্ষ্য না মানার ও প্রথা-পদ্ধতি ভাঙার প্রবণতা বাড়ে। ফলে বাড়ে কাড়াকাড়ির, মারামারির ও হানাহানির ঘটনা, লোপ পায় ন্যায়নীতির শৃঙ্খলাচেতনা। এই পরিস্থিতি দুষ্টক্ষতের মতো সমাজ-মনকে করে অসুস্থ ও বিকৃত। আমাদের আজকের সর্ব প্রকার বিকৃতির বিপর্যয়ের ও দুরবস্থার জন্যে দায়ী আমাদের শিক্ষিত শহুরে লোকের ধনলিপ্সা ও মানঅন্বেষা। আমাদের এক প্রজন্মের শহুরে জীবনে এ ছিল অবশ্যম্ভাবী। তাই বাড়াবাড়িটা বেশি।

আমাদের গুণীজনদের অধিকাংশ সরকারভীরু ও সরকারঘেঁষা। তাই আমাদের কোন লিপ্সা, কোন হ্যাংলাপনা, কোন কাঙালবৃত্তি আমাদের সমাজে তেমন নিন্দনীয় বা ঘৃণ্য নয়। কোন চারিত্রিক দুর্বলতা কোন প্রকার চরিত্রহীনতা আমাদের তাই লোকসমাজে সংকুচিত বা লজ্জিত করে না। তাই চরিত্রহীনের, দুর্নীতিবাজের, মতলববাজের সংখ্যা কেবল অবাধে বৃদ্ধি পাচ্ছে। সামাজিকভাবে একঘরে করার নীতি নাইবা থাকল, মানসিকভাবে শঠ-কপটকে, প্রবঞ্চক-প্রতারককে, দুর্বৃত্ত-দুর্জনকে ঘৃণা করতেও আমরা জানিনে। আজ আমাদের মৌল অভাব চরিত্রের। এ অর্জিত ও রক্ষিত হলে আর সব অভাব মিটে যাবে। প্রমাণ সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থাধীন সমাজ।

বুর্জোয়া সমাজে তাই বিবেকবান বুদ্ধিজীবীর নেতৃত্ব চাই জীবন-জীবিকার ক্ষেত্রে সার্বক্ষণিক শঙ্কা থেকে মুক্ত থাকার গরজবোধে এবং নিরাপত্তা-নির্বিঘ্নতার প্রত্যাশায় ও আশ্বাসে।

সেকাল ও একাল

যৌথ জীবনের অঙ্গীকারই ছিল গ্রামীণ জীবনের ভিত্তি। সেখানে কারো প্রতি কারো ঔদাসীন্য ছিল দায়িত্ববোধহীনতার মতো অপরাধ। গ্রামীর্ণ জীবনে প্রতিবেশীর সঙ্গে সম্পর্ক ছিল অবশ্য স্বীকার্য এবং প্রতিবেশীর প্রতি দায়িত্ব ও কর্তব্য এড়িয়ে চলা ছিল সামাজিক ও নৈতিক অনাচার। গ্রাম যতো বড়োই হোক, সবাইকে চেনা-জানা এবং পরিজনের মতো ভাবা ছিল ব্যক্তি জীবনের স্বাচ্ছন্দ্য ও নিরাপত্তার জন্যেই আবশ্যিক। এ তাৎপর্যে গ্রামীণ জীবনে সাধারণের স্বেচ্ছাচারের স্বাধীনতা কিংবা ব্যক্তিস্বতন্ত্রে অধিকার কখনো স্বীকৃত ছিল না, সেখানে 'সমাজ'-ই ছিল সরকারের মতো সর্বক্ষমতার অধিকারী। সে-সমাজে ধনই ছিল মানের ও বলের উৎস;

যশ অবশ্য বিদ্যায় আর বুদ্ধিতেও ছিল লভ্য। গাঁয়ে দলাদলি ছিল, সেখানে নিরপেক্ষতার ঠাঁই ছিল না, সবাইকে এ দলে বা ও দলে ভিড়ে যেতে হত। মুখ্যত ঈর্ষা-হিংসা-ঘৃণাই ছিল দলাদলির মূলে। পরিবার-প্রধান, জ্ঞাতিনেতা, পাড়ার মোড়ল ও সমাজপতি নিয়ে গঠিত ছিল প্রেসিডিয়াম। সেকালের শহরেও থাকত মহল্লা, মহল্লায়ও ছিল সমাজ এবং সামাজিক শাসন। গাঁয়ের মানুষের বা সমাজের মতো এখানে অত সংকীর্ণচিত্ততা কিংবা সার্বক্ষণিক শত্রুতার-মিত্রতার সে-দল ছিল না। কারণ সেদিনও শহুরে মানুষের আর্থিক স্বনির্ভরতা ও সাচ্ছল্য ছিল, ছিল প্রাত্যহিক দায়িত্বের ও কর্তব্যের আহ্বান, সে-আহ্বানে সাড়া দিতেই হত। কাজেই এখানে সামাজিক উদারতা ও শাসন-শৈথিল্য ছিল। ঈর্ষা-হিংসা-ঘৃণা স্থায়ী ও তীব্র হওয়া সম্ভব ছিল না শহরে।

এখনকার দিনে গ্রামীণ সমাজ হয়েছে আগেকার শহুরে সমাজের মতো শিথিল গ্রন্থি। সেখানে 'স্ব' 'সমাজ' থেকে প্রবল হয়ে ওঠার প্রবণতা দেখাচ্ছে। প্রতিবেশীর রোগে-শোকে-উৎসবে-পার্বণে সুখে দুঃখে হাজির থাকা এখন আর অবশ্য কর্তব্য বলে পালিত হয় না।

এ কালের শহরে 'স্ব'ই প্রধান এবং একমাত্র। এখানে আর আগের মতো মহল্লা-মাহলত নেই, নেই তেমন কোন সামাজিক বন্ধন-চেতনা। এখানে চির অচেনা লোক গাদাগাদি করে ফ্লাটে-ম্যানসনে থাকে বটে, ঘেঁষাঘেঁষি করে চলেও হাটে-বাটে, কিন্তু জানাজানি করে না। জানবার গরজ বোধ করে না। এখানে রোগে-শোকে, কাছে থাকা ভাই-বোন কিংবা শ্যালা-শালী ছাড়া কারো সাহায্য-সহযোগিতার প্রত্যাশা করা চলে না, এখানে উৎসবে-পার্বণে প্রতিবেশীর চেয়ে দূরের বন্ধুর উপস্থিতিই কাম্য।

গোত্রীয় জীবনের রেশ হিসেবে গ্রামে সে-যুগে মানুষে মানুষে একটা সহজ মানব ও মানবিক সম্পর্ক স্বীকৃত ছিল অপরিহার্য বিবেচনায়। আজ যন্ত্র মানুষকে স্বনির্ভরতা ও স্বাতন্ত্র্য দিয়েছে। পুত্তে পোতাতে কিংবা জন্ম-মৃত্যু-বিয়েতে এখন জনবলের প্রয়োজন হয় না।

সে-যুগের সাহিত্যে যদিও নায়ক-নায়িকার তথা রাজপুত্র-রাজকন্যারই কেবল সুখ-দুঃখের, আনন্দ-যন্ত্রণার বং সাফল্য-ব্যর্থতার গুরুত্ব ছিল, অন্য মানুষের অস্তিত্বের কোন মানে-মূল্য ছিল না, তাদের বাঁচা-মরা দু-ই ছিল ওই রাজপুত্তুর ও রাজকন্যের ভোগ-উপভোগের সামগ্রীর যোগানদার হিসেবেই—সেবাদাস হিসেবেই, তবু সমশ্রেণীর মধ্যে একটা মানবিক সম্পর্ক স্বতঃবন্ধনে দৃঢ় ছিল। দাস ও বশ লোক নির্ভর শাহ-সামন্তের সে-সমাজের বিলুপ্তির পরেও কিন্তু দাস ও বশ মানুষই চিন্তা-চেতনার বিষয় হয়নি—হয়েছিল মধ্যবিত্ত নামের এক বৃদ্ধিকামী বুদ্ধিমান শ্রেণী। এ শ্রেণী আজো দুনিয়ায় প্রতাপে প্রবল।

আজকের মানুষেরা স্বনির্ভরতার, স্বাধীনতার ও স্বাতন্ত্র্যচেতনার জন্যে ঋণী যন্ত্রের কাছেই। বহুযুগের অমানবিক পরিবেশ থেকে, সংস্কারের ও সংকীর্ণতার বন্ধন থেকে মানুষকে মুক্ত করেছে বৈদ্যুতিক-আণবিক যন্ত্রের উৎকর্ষই। যদিও স্বীকার করতেই হবে যন্ত্রের আবিষ্কর্তাই রয়েছেন কাণ্ডারীর মতো এ পরিবর্তনের মূলে। কিন্তু আবিষ্কর্তাকে প্রেরণা যুগিয়েছে মানব-বুদ্ধির ও কল্যাণ-চেতনার য়ুরোপীয় উৎকর্ষ। আগের বহু বহু জ্ঞানী-গুণীর কবি-দার্শনিকের তাত্ত্বিক-বিজ্ঞানীর অবদানের সঞ্চয়ে সম্পদে ঋদ্ধ পৃথিবীতে ডারুইন-মার্কস-ফ্রয়েড উচ্চারিত তত্ত্ব ও তথ্য দ্রুত কালান্তর ঘটিয়েছে। একি কেবল যুগান্তর, নাকি মানব সভ্যতার জন্মান্তর!

তবু আজো আফ্রো-এশিয়ার ও লাতিন আমেরিকার তিনশ' কোটি মানুষ বিজ্ঞানের, যন্ত্রের ও মননের এ প্রসাদ থেকে বঞ্চিত। আজো তারা ভেতরে-বাইরে, মনে-মননে, জীবনে-

জীবিকায় মধ্যযুগের কারায়।—আধুনিক যুগে আজকের পৃথিবীতে তাদের উত্তরণ ঘটবে কবে—ঘটাবে কারা?

সেই পুরোনো কথাটি

যে-শিশু কিছুর জন্যে বায়না ধরে, যাকে বুঝিয়ে সুঝিয়ে নিরস্ত বা বশ করা যায় না, তার দাবি পূরণ করতেই হয়, তা যে-ভাবেই হোক। আর যে-শিশু কোন আবদার করলেই মিষ্টি কথায় বা গায়ে হাত বুলিয়ে কিংবা ভবিষ্যতের আশ্বাস দিয়ে তার দাবি প্রত্যাহার করানো যায়, সে-শিশুর 'ভালো' বলে তারিফ থাকলেও সে চিরকাল বাঞ্ছিত বস্তু কে বঞ্চিতই থাকে। অতএব জেদী আবদারে শিশু প্রায়ই যা চায়, তা পায়, অন্তত তার বদলে যতই তুচ্ছ হোক, কিছু পায়, দইয়ের বদলে অন্তত ঘোল পায়। আর মা-বাপের সোহাগমুগ্ধ ঠাণ্ডা মেজাজের অনুগত শিশুর সাধ-আহলাদ মিষ্টি কথার তোড়ে কাগজের নৌকোর মতো কেবলই ভেসে বেড়ায়—কখনো পূরণ হয় না।

শোষিত-বঞ্চিত মানুষের অধিকার দাবির কিংবা স্বাধিকার প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রেও এ তত্ত্ব ও তথ্য প্রযোজ্য। কেবল আশা-আকাঙ্ক্ষাই মানুষকে কোন সিদ্ধি দান করে না। কেবল দাবি উচ্চারণেই দাবি পূরণ হয় না। তার জন্যে জেদ-যত্ন-জোর প্রয়োজন। এ তত্ত্ব নতুন নয়, কাজেই সবারই জানা। কিন্তু জানা আর মানা তো এক কথা নয়। আমরা অনেক কিছু জানি, কিন্তু নানা ভয়ের ও বাধার কারণে জীবনে প্রয়োজনের সময়েও মানতে পারিনে, বা প্রবৃত্তির দোষে মানিনে।

প্রাণী হিসেবেই মানুষ অতি স্থূলভাবে ব্যক্তিগত লাভ-ক্ষতি বোঝে, তাই সবাই অর্থ ও স্বার্থ সচেতন। কিন্তু যৌথ স্বার্থ তথা দৈশিক সামাজিক স্বার্থও যে ব্যক্তিস্বার্থের নিশ্চয়তার জন্যে রক্ষা করা উচিত, অর্থাৎ সামগ্রিক স্বার্থের মধ্যে যে নিজেরও নির্বিঘ্ন নিরাপদ স্বার্থ থাকে, তা বুঝতে চায় না কেউ।

ফলে যে অর্থ-সম্পদ যৌথভাবে অর্জন আবশ্যিক, যে স্বার্থ যৌথভাবে রক্ষা করা দরকার, যে অধিকার আদায় ঐক্যবদ্ধ সংগ্রামে সম্ভব, তা' একতার ও সংহত প্রয়াসের অভাবে বাস্তবায়িত হয় না। শেয়ালের মতো স্বাজাত্যবোধ, কাকের মতো জ্ঞাতিচেতনা, হাতির মতো নেতানুগত্য, পিঁপড়ের মতো সংহতি ও কর্মনিষ্ঠা প্রয়োজন স্বাধিকার প্রতিষ্ঠার সংগ্রামে। বীজ-বৃক্ষ-ফলের মতো ব্যক্তি মানুষেরও জীবন আর জীবিকা যে ব্যক্তি-সমাজ-সরকারে বৃত্তাবদ্ধ তা উপলব্ধ না হলে কোন আদর্শে, লক্ষ্যে বা কর্মে মানুষ ঐক্যবদ্ধ হতে পারে না। জনে জনে জনতা গড়ে ওঠার জন্যে কিংবা এক এক করে অনেক হওয়ার জন্যে কোন নীতির বা আদর্শের বন্ধন প্রয়োজন হয় না। স্ব স্ব একক স্বার্থেই মানুষ জনে জনে যায় হাটে-মাঠে-ঘাটে-বাটে, তাতে জনতা হয়ে ওঠে, এক এক করে অনেকে এক জায়গায় একত্রিত হয় নানা প্রয়োজনে, কিন্তু মিলিত হতে হলে, দলবদ্ধ হতে হলে মনের, মতের, উদ্দেশ্যের, আচরণের ও কর্মের ঐক্য তথা অভিন্ন ও যৌথ স্বার্থচেতনা আবশ্যিক। এই অভিন্ন ও যৌথ স্বার্থচেতনাই দৈশিক, জাতিক

কিংবা মানবিক স্বার্থ বা কল্যাণ-চেতনার ভিত্তি আর প্রণোদনার উৎস হবে স্বার্থগত অভিন্নতার ও অবিচ্ছিন্নতার উপলব্ধি।

এ সব তত্ত্ব আমাদের কারো অজানা নয়, বয়স্ক মানুষকে এসব কথা স্মরণ করিয়ে দেয়া বাহ্যত নির্বোধ বক্তার বিরক্তিকর বাচালতা ছাড়া কিছুই নয়। কিন্তু আমাদের সমস্যা না-জানা না-বোঝার নয়, সমস্যা না-করার না-হওয়ার। আমরা 'জানামি ধর্মং ন চ নিবৃত্তিঃ। আমাদের সমস্যা এই, এবং তাই সঙ্কটের উৎসও এ-ই।

অতএব, জানানোর জন্যে নয়, বুঝিয়ে দেয়ার জন্যেও নয়, কেবল স্মরণ করিয়ে দেয়ার জন্যে, প্রণোদনা সৃষ্টির জন্যে, প্রবর্তনা দানের জন্যেই সে-ই চিরপুরাতন, চির আটপৌরে কথা নতুন করে আবৃত্ত, পুনরাবৃত্ত করতে হচ্ছে।

আপন্ন, আসন্ন ও সম্ভাব্য জীবন-সংকট থেকে সংসারকে সমাজকে ও সরকারকে বাঁচাতে হলে, নিজেকে ও দেশের মানুষকে জুলুমমুক্ত শঙ্কামুক্ত নিরাপদ নিশ্চিত করতে হলে সংকল্প চাই, সাহস চাই, অভিন্ন লক্ষ্য চাই, ঐক্যবদ্ধ সংগ্রাম চাই, তারও আগে বিবেকবান হওয়া চাই, নির্যাতিত মানবতার মুক্তির অঙ্গীকার চাই, আর চাই দুর্জনের সঙ্গে আপোসে নয়, প্রতিরোধে ও সংগ্রামেই যে জীবনের স্থিতি ও জয় সে-উপলব্ধি।

দেশের সবলোক একই লক্ষ্যে একমত কখনো হয় না—কখনো হয়নি এবং কখনো হবেও না। কারণ সমাজে সংসারে রয়েছে শ্রেণীদ্বন্দ্ব, বিপরীত স্বার্থের প্রতিযোগিতা ও প্রতিদ্বন্দ্বিতা এবং তজ্জাত টাগ অব ওয়ার, সংঘাত ও সংঘর্ষ। তাছাড়া মন-মতের ভিন্নতা তো রয়েইছে।

আরো কথা এই, ঘর-সংসার-সমাজ-সরকার নতুন করে গণকল্যাণকর করে গড়ার, বিন্যাসের এবং সাজানোর লক্ষ্যেই যেখানে অঙ্গীকার, সংহতি, ঐক্যমত, ঐক্যবদ্ধ চিন্তা কর্ম আচরণ ও সংগ্রাম প্রয়োজন, সেখানে প্রতিপক্ষতো ভাই, বন্ধু ও আত্মীয়। সম্পদের ও স্বার্থের প্রতিদ্বন্দ্বী ও শত্রুতো স্বদেশী স্বজাতি স্বধর্মী স্বভাষী প্রতিবেশীই। কাজেই সেখানেতো সব মানুষ একদলে সংহত বা মিলিত হতেই পারে না। তাই আমরা চাইছি কেজো সংখ্যার বিবেকবান বুদ্ধিমান ও শক্তিমান অঙ্গীকারাবদ্ধ সংগ্রামী মানুষের ঐক্য যারা মজলুমের পক্ষে জালিমের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করবে স্বদেশী মানুষকে জুলুমমুক্ত করবার জন্যে।

প্রবৃত্তিবশ্যতা ও শ্রেয়োচেতনা

সুদীর্ঘকালের সামাজিক প্রতিবেশে দলচর মানুষের স্বসত্তার স্বাতন্ত্র্য চেতনা কত বিচিত্ররূপে যে শিকড় ছড়িয়েছে জীবন-জীবিকার নানাক্ষেত্রে ভাব-চিন্তা-কর্ম-আচরণের আকারে, তা আমাদের অনুভবের কিংবা উপলব্ধিরও বাইরে।

সবল-দুর্বল, ধনী-নির্ধন, প্রভু-ভৃত্য, বান্দা-মনিব, দাস-প্রভু, উত্তম-অধম, সুন্দর-কুৎসিত, বালক-বৃদ্ধ, নারী-পুরুষ, কালো-ধলো, স্বদেশী-বিদেশী, আত্মীয়-অনাত্মীয়, গুণী-নির্গুণ, শ্রদ্ধেয়-ঘৃণ্য, জ্ঞানী-মূর্খ, শত্রু-মিত্র, প্রভৃতি ভেদে এ চেতনা বহু ও বিচিত্র রূপে আমাদের প্রাত্যহিক জীবনে বিভিন্ন লেন-দেনের, বেচা-কেনার সম্পর্কে, আলাপ-আচরণের সময়ে, গ্রহণ-বর্জনের ক্ষেত্রে পরিব্যাক্ত হচ্ছে। সর্বত্রই বৈষম্য, সর্বত্রই তারতম্য, সর্বত্রই শ্রদ্ধা-ঘৃণা, আকর্ষণ-বিকর্ষণ,

রাগ-বিরাগ, স্থূল-সূক্ষ্ম রূপে নানা মাত্রায় অভিব্যক্ত। এটি এমন সার্বত্রিক, সার্বক্ষণিক, সামগ্রিক, সামাজিক, মানসিক ও সাংস্কৃতিক আচরণ যে, একে কারো চেতনার মূলস্বরূপ থেকে বিচ্ছিন্ন করে বিশ্লেষণ করা যায় না। পারিবারিক ও সামাজিক পরিবেশে এ আশৈশব প্রাপ্ত সংস্কার যা মনে মগজে দৃঢ়মূল হয়েই রয়েছে।

আমরা রাজার প্রাসাদ, সামন্তের মহল, ধনীর অট্টালিকা, মধ্যবিত্তের ভবন, সাধারণের ঘর, গরীবের কুটির, ভিখিরীর কুঁড়ে, ফকিরের আস্তানা, দরবেশের খানকা, বৈরাগীর আখড়া, সৈনিকের শিবির, ব্যবসায়ীর গদী, মুসাফিরের ডেরা বলি।

জীবনে অবস্থান ও কৃতি ভেদে মানুষ অক্কা পায়, পটল তোলে, মরে, প্রাণত্যাগ করে, শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করে, তিরোহিত হয়, লোকান্তরে যায়, ইন্তেকাল করে, প্রয়াণ করে, দেহত্যাগ করে। তখন কারুরটা হয় কবর, কারুরটা সমাধি, কারুরটা মাজার, কারুরটা তাকিয়া, কারুরটা দরগাহ, সর্বশ্রেষ্ঠটা হয় রাওজা। কোন কোন মানুষ মরে হয় ভূত, মামদো ভূত, প্রেত আর পিশাচ —স্বর্গেও যায় ক্বচিৎ কেউ, মোক্ষও পায় কেউ কেউ, নির্বাণও লাভ করে কিছু লোক।

জীবিতকালে সমাজেও অবস্থান ও কৃতি ভেদে কেউ আবদুল্যা, কেউ আবদুল, কেউ আবদুল মিয়া, কেউ আবদুল সাহেব, কেউ মাননীয় আবদুল, কেউবা মহামান্য আবদুল।

আর নানা অর্থে তুই, আপনি, হুজুর, হুজুরকেবলা, ভান্তে-ভগবন তো চলেই। কেউ থাকবে দাঁড়িয়েই, আর কারো আসন মাটি, কারো পিঁড়ে, কারো চৌকি, কারো টুল, কারো চেয়ার। অতএব, দেশ-জাত-বর্ণ-ধন-মান-মর্যাদা স্বার্থ ও শ্রেণী প্রভৃতি চেতনা মানুষের প্রায় জন্মগত। এর থেকেই সমাজের ও সভ্যতার বিকাশের ধারায়, শক্তিমানের-বুদ্ধিমানের প্রাণিসুলভ উদ্বর্তনের রীতি-নিয়মের স্বীকৃতিতে জীবিকাক্ষেত্রে অসম অবস্থানের সৃষ্টি হয়। প্রবল সাধারণত আত্মপ্রসারের লোভে হয় দুর্জন, আর দুর্বল নিরুপায় হয়েই স্বীকার করে তার বশ্যতা। কেননা সুখ ও নিরাপত্তাকামী ভীরু বুদ্ধিমানেরা তখন প্রবল দুর্জনের অনুচর ও সহচর, সহায়, সহযোগী হয়ে যায়।

জনসংখ্যা বৃদ্ধির ফলে জীবনের খাদ্যাদি প্রয়োজনীয় সামগ্রীর দুর্লভতা, উৎপাদনে-বণ্টনে অসমতা জীবিকা ও জীবনযাত্রা করছে সমস্যা-সঙ্কুল। প্রতিযোগিতায়, প্রতিদ্বন্দ্বিতায়, কাড়াকাড়িতে, মারামারিতে, হানা-হানিতে, দলগঠনে যে বা যারা হেরেছে কিংবা ব্যর্থ হয়েছে, তারাই দাস, ভৃত্য, শ্রমিক, সেবক বা প্রজা-পোষ্য রূপে নিপীড়িত, নির্যাতিত, শাসিত, শোষিত এবং বঞ্চিত হয়েছে সর্বত্র ও সর্বদা।

স্বসত্তার স্বাতন্ত্র্যচেতনা থেকেই উদ্ভূত হয়েছে সত্তার লালনের, পোষণের গরজবোধ আর প্রসারের, বিকাশের ও উৎকর্ষ সাধনের প্রণোদনা। মানুষের বৃদ্ধির, সমাজের প্রসারের এবং সভ্যতার বিকাশের আধুনিক স্তরে সবল-দুর্বল, শোষক-শোষিত, শাসক-শাসিত, পীড়ক-পীড়িত সম্পর্কের তাত্ত্বিক কারণ স্বরূপে উদঘাটিত হলেও পূর্বকালেও অর্থ-সম্পদ ক্ষেত্রে এ শ্রেণী-স্বার্থ প্রসূত দ্বন্দ্ব ও প্রতিদ্বন্দ্বিতা মানুষ অবচেতন মনে অনুভব করত।

কিন্তু রীলের সূতোর মাথা বা প্রান্ত না পেলে যেমন সূতো কাজে লাগানো যায় না, আনাড়ি হাতে যথেচ্ছ প্রান্ত সন্ধান যেমন সূতো কেবল জট-জটিল করে তোলে, তেমনি দেশে দেশে কালে কালে জ্ঞানী-মনীষীরা নবী-অবতারেরা এ দ্বন্দ্ব-সংঘর্ষের, পীড়ন-পোষণের ইতি কামনায় নানা উপায় চিন্তা করেছেন, একান্ত নিষ্ঠায় খুঁজেছেন নিদান। মুসা স্বগণ নিয়ে দেশত্যাগ করে, ঈসা দরিদ্র ও দারিদ্র্যের মহিমা কীর্তন করে ও ধনীদের নিন্দা করে, গৌতম বুদ্ধ ও মহাবীর

দেবদ্বিজবেদ কবলমুক্ত সাম্য ও বৈরাগ্য প্রচার করে, হযরত মুহম্মদ ভ্রাতৃত্বে, দানে-যাকাতে গুরুত্ব দিয়ে শঙ্কর, মায়াবাদ প্রচার করে, সন্ত-সূফীরা প্রেম-ভক্তিবাদে গুরুত্ব দিয়ে মানুষের আর্থ-সামাজিক জীবন-যন্ত্রণায় স্বস্তি ও প্রবোধ দানের চেষ্টা করেছেন।

এ কালে উটোপিয়ান সমাজবিজ্ঞানীরা জনকল্যাণকর্মীরা শোষণমুক্ত সমাজচিন্তায় তাত্ত্বিক সাফল্য অর্জন করলেও কার্লমার্কসই প্রথম শোষণমুক্ত আর্থ-সামাজিক সাম্যের সমাজের মূল সূত্র উদ্ভাবন করে জগতে যুগান্তর ঘটিয়েছেন—নতুন পৃথিবী, মানুষ ও সমাজ সৃষ্টির উপায় বাতলেছেন। আর লেনিন দেখিয়েছেন তার বাস্তব ও ব্যবহারিক প্রয়োগ। যন্ত্রযুগে উটোপিয়ানরা কিংবা কার্লমার্কস শক্তিমানদের অবাধ ও অসংগত বাসনাপূর্তি জাত পীড়ন-শোষণ থেকে দুর্বল মানুষকে-সমাজকে মুক্ত করার উপায় সন্ধান করেছেন। আর প্রাচীন যুগের যন্ত্র বিরল প্রতিবেশে গৌতম বুদ্ধ বা মহাবীর খুঁজেছেন ব্যক্তি মানুষের, বাসনার বা ভোগতৃষ্ণার বন্ধন বা দাসত্ব থেকে মুক্তির পথ। দুটোরই লক্ষ্য ছিল পীড়ন-শোষণ মুক্তি।

কিন্তু বিস্ময়ের বিষয় এই যে, প্রবৃত্তি পরবশ দরিদ্র মানুষও অর্থ-সম্পদের বণ্টনে বাঁচা পছন্দ করে না, অক্ষম হলেও ধনী-মানী হবার পথটুকু খোলা রাখতে চায়, হৃদয়ে লালিত সুগোপন আকাঙ্ক্ষা অবাধ স্বপ্নে ও কল্পনায় জীবনের বাস্তব দুঃখ সহ্য করার শক্তি ও সুদিনের আশ্বাস চায়। তা ছাড়া আশৈশবের সংস্কার, অজ্ঞতা আর অনিশ্চয়তাও তাদের সমাজতন্ত্র ভীতির বা বিরাগের অন্যতম কারণ। শোষিত, নির্যাতিত, কাঙাল মানুষ কোন প্রকারে অর্থ-সম্পদের অধিকারী হলে সে শোষিত-পীড়িত মানুষের প্রতি সদয় হয় না, বরং সে নতুন পীড়ক শোষক হয়ে দেখা দেয়। তাই দরিদ্র ঘরের শিক্ষিত মানুষরা নিতান্ত অন্ন বস্ত্রের কাঙাল না হলে 'সমাজতন্ত্র' সমর্থন করে না। সবাই সুযোগ মতো বর্তমান অবস্থা অতিক্রম করে, গাড়ি বাড়ি না হোক, স্থানিকভাবে ধনী মানী রূপে সমাজে প্রতিষ্ঠাকামী। কাজেই প্রবৃত্তির কাছে যুক্তি ও শ্রেয়োচেতনা হার মানে।

তাই মার্কসবাদী কর্মীদের অনেকের মধ্যে একটা বিশেষ বয়সে দেখা দেয় সঙ্কল্প-শৈথিল্য। ফলে মার্কসবাদী আন্দোলন মাঝে মধ্যে প্রবল হয়েও কোথায় যেন বহুদিনের জন্যে মিলিয়ে যায়। সাধারণের চোখে তাই এর বৃদ্ধি ও প্রসার দুর্লক্ষ্য, এর সাফল্য অনিশ্চিত এবং এদের প্রতি আস্থাও হয় তাই শূন্য, নয়তো সামান্য। তবু বাঁচার ও গণমানবকে বাঁচানোর এ পন্থা—এ আন্দোলন পরিহার করা যাবে না। এই আন্দোলন জোরালো করা প্রত্যেক মানব ও মানবতা বাদীর বিবেকী দায়িত্ব।

একাশির একুশের ভাবনা

গত ত্রিশ বছর ধরে আমরা ভাষা আন্দোলনের কারণ, ফল ও তাৎপর্য খুঁজছি, বিশ্লেষণ করছি। বাঞ্ছিত লক্ষ্যে উত্তরণে বিলম্বের জন্যে, ভাষা প্রচলনের বিরোধিতার বা চালু করণে অবহেলার জন্যে আমরা ক্ষোভ, জ্বালা, বেদনা এবং হতাশা অনুভবও করে থাকি।

এই আমরা কারা? আমরা সেই নবাগত শহুরে শিক্ষিত ভদ্রলোক যারা ১৯৪৭ সালের পর থেকে জমিদার-মহাজন শোষিত নিরক্ষর চাষী মোল্লা, ভুঁইয়া, চৌধুরী প্রভৃতি পরিবারের সন্তান।

শিক্ষিত শহুরে চাকুরে কিংবা ব্যবসায়ী হয়ে আমরা আমাদের গেঁয়ো আত্মীয়ের জ্ঞাতিত্ব পরিহার করে হয়েছি তাদেরই প্রভু, শোষক ও শাসক। আমরাই বিত্তহীন হয়েও মধ্যবিত্ত এবং শহুরে সংস্কৃতিবান নাগরিক বুদ্ধিজীবী। আমাদেরই বৈষয়িক ও মানসিক স্বার্থে, আমাদেরই অহংবোধের অভিমান বশে এবং আত্মসম্মান ক্ষুণ্ন হওয়ার আশঙ্কায় আমরা আমাদের মাতৃভাষাকে অন্যতম রাষ্ট্রভাষা করার জন্যে আন্দোলন করি এবং আমাদের সন্তানের প্রাণের মূল্যে আমাদের স্বাধিকার প্রতিষ্ঠা করি। এ জন্যেই এ সংগ্রামে আমরা গণমানবকে গ্রহণ করিনি, করিনি আমাদের ভাষা সংক্রান্ত স্বার্থে তাদেরকে শরীক। আজো তাই গণমানবকে লিখিত মাতৃভাষায় অধিকার দানের তথা সাক্ষর করার আন্তরিক চেষ্টা হয়নি।

এ নতুন গড়ে ওঠা শহুরে শিক্ষিতরাই কেবল যে একটা শোষক ও শাসক শ্রেণী হিসেবে সুপ্রতিষ্ঠ হয়েছে তা নয়, দেশ বলতে, জাতি বলতে রাষ্ট্র বলতে তারা নিজেদেরকেই জানে, বোঝে এবং মানে। দেশের আর্থিক, সামাজিক, নৈতিক, সাংস্কৃতিক অবস্থা বলতে, প্রয়োজন বলতে, ঐতিহ্য বলতে, সম্পদ বলতে, তারা কেবল তাদেরটাই বোঝে।

এবং যেহেতু তাদের মধ্যে রয়েছে উঠবার বা উঠতির অধিকার নিয়ে প্রতিযোগিতা ও প্রতিদ্বন্দ্বিতা, সেহেতু তাদেরও করতে হয় ছলনায়, চাতুর্যে, প্রতারণায়, কৌশলে নৈপুণ্য অর্জন, সন্ধান করতে হয় পর-প্রবঞ্চনার এবং দ্রুত ও সহজ সাফল্যের নতুন পথ।

তাই তাদেরও অবস্থান ক্ষেত্র বিশেষ দ্বান্দ্বিক। এ জন্যেই দেখা দেয় দ্বন্দ্ব, সংঘর্ষ ও সংঘাত। ভাষা আন্দোলনের আদর্শ, উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য নিয়ে তাই গোড়া থেকেই ছিল শহুরে শিক্ষিতদের মধ্যে নানা মতপার্থক্য ও মতবিরোধ। কারো কাছে এ ছিল বাঙালীর চাকরী পাওয়ার জন্যে আবশ্যিক, কারো কাছে এ ছিল অখণ্ড ভারতের দালালদের কৌশল, কারো কাছে এ ছিল হিন্দু-প্রভাবিত মুসলমানদের ইসলামপন্থী করার উপায়, কারো কাছে এ ছিল পাকিস্তানী জাতি গঠনের পরিপন্থী সংস্কৃতি বিরোধী কাজ, কারো কাছে এ ছিল সরকারি ষড়যন্ত্র, কারো কাছে এ ছিল আরবী হরফ বা রোমান বর্ণমালা প্রয়োগে বাঙলাকে কালক্রমে উর্দূ করার উপায়। এ জন্যে বিভিন্ন সৎ বা দুষ্ট মতলবে কেউ বলেছে, বানান বদলাও, কেউ বলেছে হরফ বদলাও, কেউ বলেছে বর্ণ কমাও, কেউ বলেছে আরবী-ফারসী শব্দ বসাও, কেউ বলেছে স্থানীয় তথা ঢাকার বাকরীতি ও ভঙ্গি চালু কর, কোলকাতার (তথা হিন্দুর) চলতি রীতি পরিহার কর। যতদিন আন্দোলন চলেছে ততদিন সরকার-ঘেঁষারা ও সরকার-ভীরুরা বাঙলা ভাষার রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠা চায়নি। আন্দোলনের তীব্রতার ও অমোঘতার কাছে সরকার যখন নতি স্বীকার করল, তখন থেকে সুযোগসন্ধানীরাও ক্রমে বাঙলা ভাষার সমর্থক ও প্রেমিক সংখ্যা বৃদ্ধি করল। চাপের মুখে যে-বছর ২১শে ফেব্রুয়ারি সরকারি ছুটির দিন রূপে ঘোষিত হল, সে-বছর ভাষাপ্রেমিক বাঙালীর সংখ্যা হল অগণ্য।

স্বাধীন সার্বভৌম বাঙলাদেশেও রয়ে গেছে স্বার্থের ও আদর্শের গোপন দ্বন্দ্ব। শহুরে ধনী-মানী বুদ্ধিমানেরা স্মার্ট ও আন্তর্জাতিক মানের শিক্ষিত করার লক্ষ্যে সন্তানদের শৈশব থেকেই ইংরেজি ভাষা শিক্ষার ব্যবস্থা করে। 'এ' আর 'ও' লেবেল-এর পরীক্ষায় পাশ করিয়ে তারা সন্তানদের য়ুরোপে, আমেরিকায় পাঠিয়ে দেয়, আর স্বদেশ -স্বজাতির হিতার্থে বাঙলা ভাষায় শিক্ষা দানের মহিমা কীর্তন করে শিক্ষাবিদ, জননেতা, কমিশন সদস্য, আমলা কিংবা মন্ত্রী হিসেবে।

বাঙলা ভাষাকে উচ্চ শিক্ষার বাহন করার, সরকারি দপ্তরে কিংবা ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠানে—চালু করার দাবি জানায় শহুরে শিক্ষিত লোকেরাই। চালু হতে যারা দেয়নি বা

বিভিন্ন স্বার্থে ও কারণে চালু করবে না, তারাও ওই শহুরে শিক্ষিত লোকের স্বশ্রেণীর কিংবা পরিবারের লোকই। কলেজের ও বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক, সরকারি অফিসের এবং বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের বা সংস্থার কর্তা ও মন্ত্রী মিলে হয়তো নয় হাজার হবে না, অথচ বাঙলা ব্যবহারের দাবি হচ্ছে কোটি খানেক শিক্ষিত মানুষের এবং বাহ্যত নয় কোটির স্বার্থে। বাঙলা চালু করতে কারো অনীহা হিন্দুয়ানী ভাষা বলে, কারো অনীহা কাজ চালানোর মতো ভাষা জানা নেই বলে, কারো অনীহা আন্তর্জাতিক বাণিজ্যিক রাষ্ট্রিক সম্পর্ক বজায় রাখার ঝামেলা ও খাটুনী বাড়ে বলে, কারো অনীহা শ্রেণী মর্যাদা ক্ষুণ্ন করে নিতান্ত 'গণ' হতে হয় বলে। অবশ্য মনের কথা মুখে উচ্চারণের সাহস কেউ রাখে না। কিন্তু একে অপরের মন বোঝে, তাই তারা বছরের এগারো মাস ও তিন সপ্তাহ আপোসে সহাবস্থান করে—আর তাদের আত্মীয় পরিজনেরা ও বন্ধুরা যারা বাঙলা ভাষা চালু করার জন্য ২১শে ফেব্রুয়ারির সপ্তাহখানিক আগে থেকেই লেখে, যারা জানুয়ারিতেই স্বেচ্ছায় সংগ্রাম শুরু করে, তারাও সারা বছর আত্মীয় কুটুমের খাতিরেই চুপ থাকে। ফেব্রুয়ারির এক সপ্তাহব্যাপী তাদের উত্তেজনা ও উচ্চ কণ্ঠের আস্ফালন শিয়াদের মহররম পর্বের কথাই কেবল স্মরণ করিয়ে দেয়।

২১শে ফেব্রুয়ারির সংগ্রাম ছিল রাষ্ট্র ভাষার প্রশ্নে শিক্ষিত বাঙালী জনগণের স্বাধিকার প্রতিষ্ঠার সংগ্রাম। উচ্চারিত বা ব্যক্ত না হলেও সেদিন অন্যতম রাষ্ট্র ভাষা হিসেবে বাঙলাকে স্বীকৃতিদানের দাবির পেছনে আরো অবচেতন বা অব্যক্ত স্বার্থবোধ ও শঙ্কা ছিল, রাষ্ট্রের ভৌগোলিক বিচ্ছিন্নতা ও ব্যবধান, ভাষা-সংস্কৃতিগত পার্থক্যজাত স্বাতন্ত্র্যবুদ্ধিও ছিল অলক্ষ্যে ক্রিয়াশীল। সবটাই বাহ্যত ভাষার দাবি হিসেবেই অভিব্যক্ত হয়েছিল অর্থাৎ এ সংগ্রাম ছিল স্বদেশের, স্বকালের শোষণ ও পীড়ন প্রবণ সরকারের বিরুদ্ধে শিক্ষিত জনগণের ন্যায্য অধিকার আদায়ের সংগ্রাম। যেহেতু গত তেত্রিশ বছর যাবৎ নানা নামের সরকার বদল হলেও অর্থাৎ ব্যক্তি বদল হলেও শাসন-শোষণের নীতি-আদর্শের তথা সরকারের চরিত্র পরিবর্তন হয়নি, সেহেতু বল ভরসা ও অর্থদাতা বিদেশী পুঁজিবাদী শক্তি-প্রভাবিত সামন্তবুর্জোয়া মানস-দুষ্ট কোন তাঁবেদার সরকারই ২১শে ফেব্রুয়ারি উৎসব পালনের অধিকার রাখে না। অথচ ২১শের সংগ্রামীচেতনা নষ্ট করার উদ্দেশ্যে স্বাধিকার প্রেরণা লোপ করার লক্ষ্যে সরকার অগ্রণী হয়ে কোন বছর শোক দিবস, কোন বছর শহীদ দিবস, কোন বছর বাঙলাভাষা চালু দিবস, কোন বছর বিলুপ্ত শত্রুর প্রতি বিক্ষোভ দিবস রূপে একুশে ফেব্রুয়ারি পালন করে জনগণকে লক্ষ্যভ্রষ্ট ও বিভ্রান্ত করে। সরকারি লোকগুলোও যেহেতু শহুরে শিক্ষিত লোকদেরই শ্রেণীর পরিবারের, সেহেতু শহুরে শিক্ষিত লোকেরা, সরকারের এ অনাধিকার চর্চার প্রতিবাদ করে না। আগেই বলেছি দেশ বলতে মানুষ বলতে তারা নিজেদেরকে বোঝে। অর্থ, সম্পদ, শিল্প, সাহিত্য, সংস্কৃতি ও রাষ্ট্র বলতে কেবল নিজেদেরই জানে ও মানে সেজন্যেই তারা স্বশ্রেণীর স্বার্থেই নিজেদের গা-পা বাঁচিয়ে তাদের গাঁ-গঞ্জের অজ্ঞ নিরক্ষর দরিদ্র চাষী মজুরকে লোভ দেখিয়ে নানা আন্দোলনে বিপদের মুখে এগিয়ে দিয়ে, লেলিয়ে দিয়ে এবং লাগিয়ে-বাধিয়ে দিয়ে পরিণামে মজা লুটছে। তাদের বলা হয়েছিল বিদেশী তাড়াও, দুঃখ ঘুচবে, তাদের জানানো হয়েছিল বিধর্মী ভাগাও সুখ আসবে, তাদের বলা হয়েছিল বিভাষী উচ্ছেদ কর, ধন মিলবে—সবটাই ক্রমে করা হয়েছে মেহনতী জনতার সক্রিয় সহযোগিতায়, ভোটে, দাঙ্গায় ও লুটের আকারে এবং দুঃখও ঘুচেছে, সুখও এসেছে, ধনও মিলেছে, তবে মেহনতী জনতার নয়—ওই শিক্ষিত লোকেরই গাড়ি, বাড়ি, জমি, ব্যবসা-বাণিজ্য, কলকারখানা, ঠিকাদারী, মৌজুতদারী, চোরাকারবারী কিংবা চাকরি রূপে। এ শহুরে শিক্ষিতদের ভোগ-উপভোগের চাহিদা মিটানোর লক্ষ্যেই সরকার তার আমদানী নীতি গ্রহণ করে। আমাদের মুদ্রাস্ফীতি জাত বারো আনা

যন্ত্রণার জন্যে দায়ী শহুরে শিক্ষিতেরা এবং তাদের স্বজন সরকার। আর দুঃখ পায় গাঁয়ের নয় কোটি দীন-দুঃখী মানুষ।

দেশের অর্থ-সম্পদ রয়েছে কয়েক হাজার শহুরে লোকের কবলে—তাই পুঁজিবাদী শুভংকরের ফাঁকির ফাঁকে মাথাপিছু জাতীয় আয় বা অর্থ-সম্পদ যখন বাড়ে, তখন গাঁ গঞ্জের চাষী মজুরেরা, শহুরে কারখানা শ্রমিকেরা আরো গরীব হয়, ভদ্র লোকেরা হয় আরো ধনী। সাম্রাজ্যবাদীরা এ অবস্থা বজায় রাখার পরামর্শ দেয় অনুন্নত দেশগুলোর তাঁবেদার সরকারকে, তাদের উপর নির্ভরশীলতা এবং নিয়ন্ত্রণী চাপ বৃদ্ধির জন্যেই। অতএব বিদ্যমান রাষ্ট্রিক ব্যবস্থায় আর্থিক ক্ষেত্রে নয় কোটি বাঙালীর জীবন-যন্ত্রণার, শৈক্ষিক-সামাজিক বঞ্চনার এবং মৌল মানবিক অধিকার হরণের জন্যে দায়ী ৩০/৪০ হাজার শহুরে শিক্ষিত লোক ও তাদের স্বজন সরকার। ভাষা-সমস্যা আজো শিক্ষিতদের মান-অভিমানের ও সুবিধা-অসুবিধার সমস্যা। এ জনগণের নয় বলেই জাতীয় সমস্যা নয়, কোন এক শ্রেণীর সমস্যা মাত্র। আজ স্বধর্মীর, স্বজাতির, স্বভাষীর শাসন স্বাধীনতা নয়, দেশগত ও কালগত অশন-বসন-নিবাস-নিদানের ওই সুনিশ্চিত ব্যবস্থা থাকাই স্বাধীনতা, অন্নে ও আনন্দে নির্বিঘ্নে অধিকার থাকাই স্বাধীনতা। সমস্বার্থে সহিষ্ণুতায় সহযোগিতায় সহঅবস্থানের অঙ্গীকারে চিন্তায় কর্মে ও আচরণে স্বাতন্ত্র্য বজায় রাখার বা অনুশীলনের সুযোগ ও সুবিধে পাওয়াই স্বাধীনতা, এ ছাড়া স্বাধীনতার অন্য কোন সংজ্ঞা চালু নেই এ যুগে।

আজ জাতীয় সম্পদ, জাতীয় সমস্যা, জাতীয় প্রয়োজন প্রভৃতি কথা সর্বজনীন সম্পদ, সমস্যা ও প্রয়োজন সম্পর্কেই কেবল প্রযোজ্য, কোন প্রধান বা প্রবল শ্রেণীর সম্পর্কে এগুলোর প্রয়োগ বাঞ্ছিত নয়। ২১শে ফেব্রুয়ারি যেসব শিক্ষিত শহুরে লোকের পক্ষে স্মরণ্যে-পার্বণ, ঐতিহ্য বা সম্পদ, তারা যদি স্বকালের স্বদেশী সরকারে ন্যায় অবিচার ও পীড়ন-শোষণ প্রতিরোধ করার জন্যে ২১শে ফেব্রুয়ারিতে সংগ্রামের শপথ গ্রহণ করে বা সংগ্রাম শুরু করে, তাহলেই কেবল ২১শে ফেব্রুয়ারি উদযাপন সার্থক হতে পারে।

আর একটি কথা অধিকার কেউ কাকে দেয় না, কেড়ে মেরেই অধিকার প্রতিষ্ঠা করতে হয়—প্রাণ দিয়ে-নিয়েই আদায় করতে হয় দাবি। যুদ্ধে জয়ী হয়েও কান্নায় বা বিলাপে শোক করা সুস্থ চেতনার পরিপন্থী মানস দৈন্যেরই পরিচায়ক মাত্র। তাই "আমার ভাইয়ের রক্তে রাঙানো একুশে ফেব্রুয়ারি"—এ শোকের ও ক্ষোভের গান দিয়ে ২১শে স্মরণ বাঞ্ছিত নয়। কারণ যতদিন প্রতিপক্ষ ছিল, সংগ্রাম চলছিল, ততদিন এ গান প্রবল, প্রচণ্ড আবেগময় সংগ্রামী প্রেরণা এবং প্রয়োজন সৃষ্টি করত। খাঁটি ভাষা-প্রেমিক শিক্ষিত বাঙালীর মনে এখন সে-দেশ সে-কাল ও সে-প্রতিপক্ষ নেই। তাই এখন ওই গান তাৎপর্যহীন। ওই গানের মাধ্যমে শিয়াদের কারবালা পর্বের মতো বিলাপ বন্ধ্যা মনের, নিষ্ক্রিয়ের কর্তব্যভ্রষ্টতার পরিচায়ক মাত্র।

জুলুম প্রতিরোধের একুশে

অতীতকে ও ঐতিহ্যকে সম্পদ ও পাথেয় করে যারা চলতে চায়, তাদের ক্ষয় আছে, বৃদ্ধি নেই। কেননা, তারা বর্তমানে থাকে নিশ্চিন্ত ও নিষ্ক্রিয়, অতীত কালের ভুবনে মানস-বিহার করে

থাকে তুষ্ট। ফলে তাদের চিন্তায় চেতনায় কোন সমকালীনতা থাকে না। ঐতিহ্যচেতনা যে কাউকে ধরেও রাখে না, ভরেও তুলতে পারে না, তার প্রমাণ কেবল এথেন্স্ রোম-বাগদাদ নয়, যে-কোন রাজ্য-সাম্রাজ্য পরিবার-গোষ্ঠী-জাতির কালিক ও দৈশিক পতন ও বিনাশ।

অনুপ্রেরণার কাঙ্ক্ষাবিরহী ঐতিহ্যের রোমন্থন ও অতীত গৌরবের আস্ফালন অক্ষমেরই আশ্রয়। এ নিশ্চিতই আত্মপ্রত্যয়হীনতার ও বন্ধ্যাত্বের প্রকটিত লক্ষণ। বালক বেড়ে ওঠে বাঞ্ছিত জীবনের রূপ অনুধ্যানে, যুবক বাঁচে বাস্তব বর্তমানে ও ভবিষ্যতের আয়োজনে আর হৃতশক্তি বৃদ্ধের স্বস্তি হচ্ছে অতীত কৃতির ও স্মৃতির রোমন্থনে।

১৯৫২ সনের একুশে ফেব্রুয়ারি আমাদের স্বাতন্ত্র্যচেতনার, স্বাধিকার প্রতিষ্ঠার, জীবনপণসংগ্রামের, বিজয়ের ও সাফল্যের স্মারক লগ্ন। এ হচ্ছে আমাদের প্রেরণার উৎস, সংগ্রামী প্রণোদনার অবলম্বন। এ দিনটি আমরা স্মরণে রাখব, পার্বণিক মর্যাদায় স্মরণ করব, আনুষ্ঠানিকভাবে উদযাপনও করব—এ বিষয়ে দ্বিমত থাকার কথা নয়। তবে সরকারি বা দলীয় অভিসন্ধিবশে একে শহীদ দিবস, শোক দিবস, বাঙলাভাষা প্রচার দিবস, জাতীয় দিবস কিংবা দেশ-গড়ার দিবসরূপে পালন করলে এর তাৎপর্য ও মর্যাদা দুটোই নষ্ট হয় বলে আমাদের ধারণা!

একুশে ফেব্রুয়ারির প্রতিবাদ কিংবা প্রতিরোধ ছিল সমকালের শাসকের অন্যায়ের, অবিবেচনার ও জনগণের ন্যায্য অধিকার হরণের বিরুদ্ধে। এক কথায় এ ছিল সমকালের বাঙালী জাতিসত্তার উপর আপন্ন বা আসন্ন হামলা ঠেকানোর সংগ্রাম।

আমাদের ঐতিহ্যপ্রীতি যদি বন্ধ্যা-অনুভূতি প্রসূত না হয়, তা হলে প্রতি একুশে ফেব্রুয়ারি আমাদেরকে সমকালীন নৈতিক, সামাজিক, শাস্ত্রিক, শৈক্ষিক, আর্থিক, সাংস্কৃতিক, প্রশাসনিক জুলুমের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াবার, কণ্ঠে প্রতিবাদ ধ্বনিত করবার, বাহুতে প্রতিরোধের শক্তি সঞ্চয় করবার শপথ গ্রহণে করবে অনুপ্রাণিত, দৃঢ় করবে অঙ্গীকার পালনের সাহস ও সঙ্কল্প।

স্বদেশী, স্বজাতি ও স্বধর্মী শাসক হলেই দেশ বা জাতি যে সত্যিকার অর্থে স্বাধীন হয় না, অন্নে-বস্ত্রে-স্বাস্থ্যে-শিক্ষায়-জীবিকায় সাচ্ছল্য-স্বাচ্ছন্দ্য অবাধ ও সুনিশ্চিত হলেই, স্বাধিকারে স্বাধীনভাবে আত্মবিকাশের ও আত্মপ্রসারের পরিবেশ নির্বিঘ্ন থাকলেই কেবল মানুষ স্বস্থ ও সুস্থ থেকে স্বস্তি-সুখ ভোগ-উপভোগ করতে পারে। আজকের দুনিয়ায় গণমানবের সে-সব অধিকার প্রতিষ্ঠা লক্ষ্যেই তথাকথিত স্বাধীনসার্বভৌম রাষ্ট্রে চলছে বিদেশী অর্থ ও মদদপুষ্ট স্বদেশী সরকারের বিরুদ্ধে জনগণের সংগ্রাম, চলছে সামন্ত-বুর্জোয়া মনের ও বিত্তের এবং মুৎসুদ্দি-দালালবৃত্তির মধ্যশ্রেণীর বিরুদ্ধে গণসংগ্রাম। একুশে হবে আমাদের এই সংগ্রাম-চেতনার উদ্দীপক, তাহলেই কেবল এ দিনটির স্মরণ সার্থক হবে।

আমরা সবাই জানি এবং স্বীকারও করি যে দেশের মাটির ও মানুষের আজ চরম দুর্দিন। একদিকে ফারাক্কা তিস্তার পানি ও তালপট্টির অধিকার সমস্যা, অন্যদিকে দেশের অভ্যন্তরে আর্থিক, নৈতিক, শৈক্ষিক, সামাজিক, প্রশাসনিক, বৈষয়িক, সাংস্কৃতিক জীবনের নানা সমস্যা ও সঙ্কট তীব্র ও প্রতিরোধ্য হয়ে উঠেছে, দুঃশাসন ও দুর্নীতির ফলে। দুর্জন-দুর্নীতি বেশি হলেও আজো দেশে মানববাদী সমাজবাদী গণহিতৈষী অসংখ্য মানুষ আছেন। তাঁরা ইতিহাসের সাক্ষ্যেই জানেন রাজতন্ত্র, নায়কতন্ত্র, সামন্ততন্ত্র, বুর্জোয়া কিংবা সামরিক সরকার গণ-মানুষের, সমাজের কিংবা রাষ্ট্রের বাঞ্ছিত কল্যাণ সাধন করতে পারে না, স্ব-স্ব শ্রেণীস্বার্থ সচেতন বলেই।

বহুজনহিতে বহুজনসুখে রাষ্ট্র পরিচালনা কেবল নীতিনিষ্ঠ গণ-কল্যাণকামী, বিবেকবান, বুদ্ধিমান ও জ্ঞান-প্রজ্ঞাবান গণ-প্রতিনিধির তা' ছাড়া অজ্ঞ অসহায় অনক্ষর দরিদ্র মানুষও

চিরদুর্বল। এসব অজ্ঞ মুক মানুষের অসহায়তার সুযোগ নিয়ে আফ্রো-এশিয়া-লাতিন আমেরিকার অনুন্নত দেশে হয় সামরিক সরকার অথবা দুর্নীতিপ্রবণ দুর্জন-দুঃশাসক নিয়ে গঠিত তথাকথিত গণতান্ত্রিক সরকার নির্বিচার নির্বিঘ্ন জুলুম চালায় গণমানবের উপর। যদিও আমরা জানি আধুনিক সংজ্ঞায় সরকার হচ্ছে গণচাহিদা পূরণ লক্ষ্যে গণপ্রতিনিধি চালিত এক প্রকার সমবায় সংস্থা। এককথায় একালে দেশের মানুষের পালন-পোষণের সর্বাত্মক দায়িত্ব সরকারের বলেই স্বীকৃত। কাজেই স্বীকৃতি প্রমাণ না থাকলে মুখের বা দলিলের অঙ্গীকার বৃথা তিন মহাদেশের উন্নয়নশীল রাষ্ট্রের মানুষগুলো আজ ঠিকেদার, মৌজুতদার, সদাগর, চোরাচালানদার, কারখানাদার, দুর্নীতিবাজ চাকুরে, উকিল, ডাক্তার, প্রকৌশলী, কৃৎকৌশলীর শোষণের ও প্রতারণার শিকার। সবদেশেই শোষক-পীড়কের সংখ্যা সামান্য কিন্তু শোষণ পীড়ন জুলুম গভীর ও ব্যাপক, বলা যায় সর্বাত্মক। একের পীড়নে-শোষণে লক্ষ-কোটি দুঃখ যন্ত্রণা ভোগ করে।

এ অবস্থা চলতে দেয়া যায় না, দেশের মানুষকে প্রবলের শোষণ পীড়ন থেকে মুক্ত করতে হবে, ঘুচাতে হবে গণমানবের জীবন-জীবিকার সর্বপ্রকার বিঘ্ন ও অনিশ্চয়তা। এ দায়িত্ব ও কর্তব্য মানবদরদী বিবেকবান মানুষ মাত্রেরই। তাই, একুশে ফেব্রুয়ারি এমনি সংকল্প ও শপথ গ্রহণের দিন রূপে স্মরণ্য হলেই, উদযাপিত হলেই, জাতির জীবনে একুশের তাৎপর্য অর্থবহ ও ফলপ্রসূ হবে। এ বছরের একুশে তাই জুলুম প্রতিরোধের একুশে হোক।

একুশের ঐতিহ্য

একুশে ফেব্রুয়ারি আমাদের ঐতিহ্য, সে-ঐতিহ্য সত্তার স্বাতন্ত্র্য চেতনার, হিতবুদ্ধির, দ্রোহের, প্রতিরোধের, সংগ্রামের, জেহাদের, শাহাদতের, ত্যাগের, ক্ষতি স্বীকারের, স্বাধিকার প্রতিষ্ঠার এবং বিজয়ের। একুশে আমাদের ঐতিহ্য অর্থাৎ একুশে এখন আমাদের ইতিহর, ইতিকথার, ইতি-বৃত্তের বা ইতিহাসের গৌরবময় চির উজ্জ্বল ও স্মরণীয় অধ্যায়। একুশে এখন কেবল আমাদের প্রেরণার ও প্রবর্তনার উৎস ও অবলম্বন, একুশে এখন আমাদের চলমান বর্তমান জীবনের সম্পদ নয়।

সে-দিন আমাদের জীবনে যে-সমস্যা দেখা দিয়েছিল, তা' আজ নেই, যারা আমাদের সত্তার ও স্বার্থের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করছিল, আমাদের স্বার্থ ক্ষুণ্ন করছিল, তারা আজ' নেই। এক কথায় একুশের সংগ্রামের সে-বিষয়ে নেই, সে-প্রতিপক্ষ নেই, সে-রাষ্ট্র নেই, সে-কাল নেই। কাজের একুশে ফেব্রুয়ারি মুহররমের মতো বার্ষিক স্মরণ আমাদের কোন উপকার করবে না, দেবে না আমাদের কোন সমস্যার সমাধান। সে-ঐতিহ্য সমকালীন অনুরূপ জুলুমের বা সমস্যার প্রতিকারে প্রেরণা ও প্রবর্তনা দেয় না, তা' তাৎপর্যবিরহী আচার মাত্র। তেমন প্রাণহীন কৃত্রিম অনুবর্তন জাতীয় জীবনে কোন শ্রেয়সের সন্ধান দেয় না। হৃতধন নিঃস্ব বংশধরের পূর্বপুরুষের ঐশ্বর্যের অহঙ্কারের মতো তা নিষ্ফল হাস্যকর নিরর্থক আস্ফালন মাত্র। কিন্তু আমরা আছি, আমাদে দেশ আছে, আছে আমাদের শাস্ত্র-সমাজ-সরকার ও রাষ্ট্র। রয়েছে গণমানবের উপর অন্যায়ভাবে জোর জবরানে হুকুম-হুমকি-হামলা চালাবার মতো শাস্ত্রী, সমাজসর্দার,

আমলা আর দুর্জন-দুর্বৃত্ত। কাজেই প্রতি নতুন সূর্যের উদয়ে চলমান জীবনে ব্যক্তি মানুষের—সমাজ—সদস্য মানুষের—ভাব-চিন্তা-কর্ম-আচরণের ক্ষেত্রে নানা সূত্রে ও বিভিন্ন সংগত-অসংগত কারণে আসে আকস্মিক বাধা ও হামলা। তা ছাড়াও রয়েছে নানা প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ জুলুম। সে-জুলুম আসে শাস্ত্রের, সমাজের, সরকারের ও রাষ্ট্রের স্বার্থের নামে। সে-সব জুলুমের প্রতিবাদে, প্রতিরোধে ও প্রতিকারে এগিয়ে আসাও দেশজাত মানুষের কল্যাণকামী বিবেকবান মানুষের অপরিহার্য দায়িত্ব ও একান্ত কর্তব্য।

প্রাত্যহিক জীবনে আমরা আজো শাস্ত্রিক কুসংস্কারের লৌকিক ভুতুড়ে বিশ্বাসের, সামাজিক ক্ষতিকর আচারের ও বিশ্বাসের পুরোনো রীতি-নীতির তথাকথিত বৈধ আর্থিক শোষণের, সামন্ত-বুর্জোয়া ন্যায় ভিত্তিক তথাকথিত আইন-কানুনের পীড়নের, সেবকরূপী শাসকের বৈধ অথচ অসংগত হুকুম-হুমকি-হামলার, অশিক্ষার, অস্বাস্থ্যের; দারিদ্র্যের, অনাহারের, অচিকিৎসার, অনিকেতের, দুর্নীতির, দুঃশাসনের, পারত্রিক কাল্পনিক ভীতির, জীবনবিরোধী নীতিকথার ও আদর্শের জুলুমের শিকার। ব্যক্তিগতভাবে এবং যৌথভাবে এসব সর্বপ্রকার জুলুম প্রতিরোধে ও বিলোপে এগিয়ে আসা বিজ্ঞান সম্মত যুক্তি-বুদ্ধিসম্পন্ন বিবেকবান গণমানবের হিত ও সুখকামী মানুষ মাত্রেরই নৈতিক দায়িত্ব ও কর্তব্য।

মনে রাখতে হবে জীবন মানে প্রতিকূল প্রতিবেশ প্রতিরোধ করে জীবনের সুষ্ঠু বিকাশপ্রাপ্তির জন্যে অনুকূল পরিবেশ রক্ষা, এ তাৎপর্যে জীবন নামান্তরে প্রতিরোধ এবং সংগ্রাম—আপোস নয়। ইংরেজি করে বলা যায় Life is resistence and struggle and not Compromise.

মানুষ অতীতের গৌরবময় ব্যক্তিক, পারিবারিক, গৌত্রিক, সামাজিক, দৈশিক, জাতিক ও রাষ্ট্রিক কৃতি-কীর্তিকেই কেবল 'ঐতিহ্য' হিসেবে স্মরণ করে, কিংবা স্মৃতিতে ধরে রাখে। যা লজ্জার, ক্ষোভের, গ্লানির, পরাজয়ের কিংবা পীড়নের, শোষণের, পেষণের, নির্যাতনের, অপরাধের ও অপকর্মের, দুষ্কৃতির ও দুর্বৃত্তির তা লোকে ভুলবার চেষ্টা করে নিন্দা-কলঙ্কের দাগ বিমোচন লক্ষ্যে।

ইতিহাস বলে প্রাচীন মিশরীদের, বেবিলোনীদের, গ্রীকদের, রোমকদের, ইরানীদের, চীনাদের, ভারতীয়দের আবিষ্কারের, উদ্ভাবনের, বীরত্বের, মহত্ত্বের জ্ঞানের, বিজ্ঞানের, চিকিৎসা শাস্ত্রের সামাজিক নিয়মনীতির, সাংস্কৃতিক সৌজন্যের, স্থাপত্যের, ভাস্কর্যের, যন্ত্রের, হাতিয়ারের, শিল্পের, বাণিজ্যের, প্রশাসনিক উৎকর্ষের অনেক অনেক বিস্ময়কর, গৌরবময় ঐতিহ্য ছিল। কিন্তু বন্ধ্যামনের নিরাকাঙ্ক্ষ্য, নির্লক্ষ্য, নিষ্ক্রিয় প্রণোদনা-প্রবর্তনা বিরহী বংশধরেরা ঐতিহ্যের স্মৃতিমাত্র দিয়ে জীবনের ও জীবিকার, সংস্কৃতির ও সভ্যতার কোন ক্ষেত্রেই অবক্ষয় ও বিনষ্টি রোধ করতে পারেনি। অথচ ঐতিহ্যবিরহী মধ্যযুগের ও এযুগের য়ুরোপ কিংবা আধুনিক জাপান, রাশিয়া, চীন, আফ্রিকা-আমেরিকা আত্মোন্নয়নের আন্তরিক প্রেরণাবশে জ্ঞানে-কর্মে, সংস্কৃতিতে-সভ্যতায় বিকাশের পথে দ্রুত এগিয়ে চলেছে।

অতএব, ঐতিহ্য বা অতীত কেবল জীবনমুখী উদ্যমশীল উদ্যোগী মানুষেরই শক্তির ও কর্মপ্রেরণার উৎস। নইলে কোন অতীতই — কোন পুরোনোই কোন জীবিত মানুষের মানসিক কিংবা ব্যবহারিক কোন প্রয়োজন পূরণ করতে পারে না। অতীত ও ঐতিহ্য সাধারণ ভাবে মানুষের জীবনে-মননে বন্ধ্যা ও মৃত। নতুন দিনে চলমান নতুন মানুষের জীবনের বাঁকে বাঁকে উদ্ভূত নতুন প্রয়োজন মেটাতে পারে কেবল নতুন চিন্তা-চেতনাজাত নতুন নীতিনিয়ম, প্রকৌশল ও যন্ত্র। অতীত বা ঐতিহ্য কেবল সংকল্পের, সাহসের, উদ্যোগের জয়েরর, সাফল্যের, প্রণোদনাময় নজির হিসেবেই স্মরণীয়।

সে দিন একুশে ফেব্রুয়ারিতে রাষ্ট্রের মাতৃভাষাকে যথাযোগ্য স্থানে অধিকার ও প্রতিষ্ঠা দানের জন্যেই বাঙালী রক্ত দিয়েছে, দিয়েছে প্রাণ। অন্যায়কে প্রতিহত করার জন্যেই, ন্যায্য দাবি আদায়ের জন্যেই বাঙালী কিশোর-তরুণ করেছে প্রাণপণ আন্দোলন, সে-দিন প্রয়াসে ও সংগ্রামে সফল হয়েছিল বাঙালী।

স্বদেশে স্বধর্মীয় স্বভাষী শাসক হলেই দেশের নির্বিশেষ মানুষ স্বাধীন হয় না। আজো স্বাধীন বাঙলাদেশ নামের রাষ্ট্রে গণমানব অশিক্ষার, অনাহারের, অস্বাস্থ্যের, অনিকেতের, পীড়নের, শোষণের, প্রবঞ্চনার, দুঃশাসনের, দুর্নীতির, দুর্জনের দুর্বৃত্তির জুলুমের চাপে ধুঁকে ধুঁকে দুঃখ-বিভীষিকার জীবন কাটাচ্ছে। একুশে যদি নৈতিক, শাস্ত্রিক, সামাজিক, প্রশাসনিক আর্থিক-শৈক্ষিক-সরকারি ও রাষ্ট্রিক জুলুম মুক্তির লক্ষ্যে, প্রতিরোধের, প্রতিবাদের ও প্রতিকারের, সংকল্পে ও সংগ্রামে আমাদের অনুপ্রাণিত করে, তবেই কেবল একুশের ঐতিহ্য স্মরণ সার্থক হবে। অমর একুশে আমাদের বিবেকবান, বিবেচক, হৃদয়বান, জনহিতকামী, মুক্তিপিপাসু সর্বপ্রকার জুলুমের প্রতিবাদী, প্রতিরোধক ও সংগ্রামী করুক।

মধুসূদন ও আধুনিকতা

মাইকেল মধুসূদন দত্ত সাধারণ বাঙালী পাঠক-সমাজে অবহেলিত হলেও স্কুলে-কলেজে বিশ্ববিদ্যালয়ে আজো আধুনিক বাঙলা সাহিত্যের পথিকৃৎ ও দিকপাল বলে বন্দিত। বিদ্যালয়ে শিক্ষক-শিক্ষার্থীদের এ বীরবন্দনায় আবেগ যতটা রয়েছে, তথ্যনিষ্ঠা নেই ততটা।

মধুসূদন ভাবে, ভাষায়, ছন্দে ও আঙ্গিকে যা কিছু আনলেন তা এদেশে নতুন বটে, তবে তাতে সমকালীনতা বা স্বাদেশিকতা ছিল না। আঠারো শতক-পূর্ব য়ুরোপীয় সাহিত্য-চেতনাই ছিল তাঁর সম্বল, সারাজীবনে তিনি তা অতিক্রম করতে পারেননি। প্রাচীন গ্রীক-ল্যাতিন সাহিত্য থেকে সতেরো শতকের জনমিল্টন-সাহিত্য অবধি ছিল তাঁর বিচরণ ক্ষেত্র। ভাবে, ভাষায়, ছন্দে, আঙ্গিকে কিংবা চেতনায় তিনি য়ুরোপীয় আঠারো শতক অতিক্রম করে তাঁর সমকালীন কিংবা ঈষৎ পূর্বকালীন য়ুরোপীয় অথবা সমকালীন স্বদেশকে ধারণ করতে সমর্থ হননি।

ফলে প্রাচীন ও মধ্য যুগের য়ুরোপীয় চেতনা এবং প্রাচীন ভারতীয় বিষয়বস্তুই হয়েছে তাঁর সাহিত্যের অবলম্বন। অথচ তাঁর সমকালের অক্ষয়কুমার দত্ত, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, প্যারীচাঁদ মিত্র, কালীপ্রসন্ন সিংহ, বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় এমনকি টুলো পণ্ডিত রামনারায়ণ তর্করত্নও সমকালীন য়ুরোপীয় জীবন-চেতনা ও জগৎ-ভাবনাকে একান্তভাবে জানায় ও গ্রহণে প্রয়াসী ছিলেন স্বাদেশিক কল্যাণ বাঞ্ছনায় উদ্বুদ্ধ হয়ে। এঁরা কেউ লন্ডন-প্যারিস দেখেননি, কিন্তু মধুসূদন সেখানে বাস করেছেন এবং তাঁর জ্ঞানের জগৎও ছিল বিস্তৃততর। মধুসূদনের চেতনায় য়ুরোপীয় আস্তিক্য, নাস্তিক্য, সংশয়বাদী কিংবা প্রত্যক্ষবাদী কোন দর্শনেরই প্রভাব নেই, নেই ফরাসী বিপ্লব বা আমেরিকার স্বাধীনতা আন্দোলনের আভাস, এমনকি বিজ্ঞানে কিংবা ইতিহাসেও তাঁর আগ্রহের প্রমাণ মেলে না তাঁর রচনায়।

মধুসূদনের সমকালে য়ুরোপ ছিল বৈজ্ঞানিক আবিষ্ক্রিয়ার, দার্শনিক চিন্তার ও ইতিহাস চেতনার প্রসাদপুষ্ট সমাজ-শাস্ত্র-সংস্কৃতি ভাঙা, যন্ত্র ও অর্থনীতি নিয়ন্ত্রিত কিন্তু প্রত্যাশাদৃপ্ত

অস্থির ও মুমুক্ষু মানুষের জগৎ। এর কোনটাই লন্ডন-প্যারিস প্রবাসী মধুসূদন মানসে অভিঘাত হানেনি।

ফলে তাঁর সমকালীন ইংরেজি বা ফারসী সাহিত্যের আঙ্গিক, ভাব, ভাষা, ছন্দ কিংবা বক্তব্যের কোন আবেদন ছিল না তাঁর কাছে। ড্রাইডেন, পোপ, ওয়ার্ডসওয়ার্থ, কোলরিজ, বাইরন, শেলী, কীটস, টেনিসন, কেউ তাঁকে আকৃষ্ট করেননি। শেকসপীয়ার-উত্তর নাট্যসাহিত্যও ছিল না তাঁর শ্রদ্ধেয়। সনেটেও পেত্রার্কা থেকে মিল্টন অবধি অনুকৃত বটে, কিন্তু বিষয়বস্তুতে নেই প্রত্যাশিত প্রেম-প্রকৃতি-ফুল-পাখি কিংবা হৃদয়াকুতি।

তাঁর দুটো প্রহসনই কেবল সমকালীনতার ও স্বাদেশিক চিন্তাচেতনার সাক্ষ্য। যখন বাল্যবিবাহ, বহুবিবাহ, পানাসক্তি ও লাম্পট্য ইংরেজিশিক্ষিত কোলকাতাবাসী মাত্রেরই আলাপ-আলোচনা ও তর্কের বিষয়, যখন লিখিয়ে মাত্রই এ বিষয়ে গদ্যে-পদ্যে-নাটকে কিছু না কিছু লিখছেন, মধুসূদনের প্রহসন দুটো তখনকার কালিক ও হুজুগে রচনা মাত্র। উৎকর্ষটাই কেবল তাঁর ব্যক্তিক শক্তির পরিচায়ক, চেতনা বা বক্তব্য তাঁর স্বকীয় নয়—যুগের ও কোলকাতার নব্য সমাজের এক অংশের। তাছাড়া মধুসূদনের আবাল্য আকাঙ্ক্ষা ছিল কেবল দেশদুর্লভ কালোত্তর অমর কবি হওয়া, আর কিছুই নয়, তাতে সমকালীন কিংবা স্বাদেশিক শাস্ত্র-সমাজ-সংস্কৃতি বা জীবন-জীবিকা সংপৃক্ত কোন স্বোপলব্ধ বক্তব্য কিংবা লোকহিতকর চিন্তা-চেতনা ছিল না।

মধুসূদনের ছিল ধন-যশ-মান লিপ্সা। দেশ-কালের বা স্বসমাজের প্রতি তাঁর কোন কর্তব্য-চেতনা ছিল না। তাই সমকালীন কোলকাতার নব্য সমাজের আনন্দ ও যন্ত্রণা, সমস্যা ও সম্পদ তাঁকে স্পর্শ করেনি। তিনি ছিলেন স্বতন্ত্র, বিচ্ছিন্ন ও নিঃসঙ্গ। আত্মহিতে কবি-সাহিত্যিক রূপে আত্মপ্রতিষ্ঠাই ছিল তাঁর সার্বক্ষণিক অনুধ্যানের বিষয় ও কর্মপ্রয়াসের লক্ষ্য। এ তাৎপর্য তাঁর কোন বিশেষ দেশ, কাল, বা সমাজ ছিল না। আত্মপ্রত্যয়ী এ মানুষের আত্মশক্তিতে আস্থা ছিল অগাধ। তাই তিনি চাওয়া ও পাওয়ার মধ্যেকার বাস্তব ব্যবধান স্বীকার করতেন না অন্তরে। এ অর্থেই রাবণ তাঁর প্রতিরূপ বা মানস প্রতিকৃতি। রাবণের মতোই তাই তাঁর বাঞ্ছাপূর্তি ঘটেনি, জীবনের সর্বক্ষেত্রেই তাঁর জীবৎকালে তাঁর আকাঙ্ক্ষা বারবার প্রতিহত হয়েছে। দেশ-দুর্লভ ব্যারিস্টার হওয়া সত্ত্বেও ধনোপার্জন হয়নি, যে-অমর কাব্য রচনা করে তিনি চিরকালের লোকবন্দ্য কবি হবার প্রস্তুতি গ্রহণ করছিলেন, তা লেখা হয়নি। কোলকাতার স্বল্পশক্তি কবি-নাট্যকারদের লজ্জা দেয়ার আস্ফালন বশে প্রায় বিনা প্রস্তুতিতে বাঙলায় লেখা শুরু করলেন। বিড়ম্বিত জীবনে তা-ই কয় বছর চালিয়ে গেলেন। তাও জীবৎকালে তাঁকে প্রত্যাশিত যশ দান করেনি। অমর কবিদের থেকে শেখা এবং চিরন্তন কাব্য থেকে সংগ্রহ করা শিল্প-সৌন্দর্যমণ্ডিত নিখুঁত অবিস্মরণীয় কাব্য লেখার আবাল্য সাধ রইল অপূর্ণ। আবাল্য বাঞ্ছিত ধন, যশ, মান, প্রতিষ্ঠা রইল তাঁর অনায়ত্ত। উচ্চাভিলাষে ও আত্মপ্রত্যয়ে তিনি ছিলেন স্বসৃষ্ট রাবণই। আর তাঁর কবি-শক্তিও ছিল স্বরূপ-চেতনাবিরহী অজিজ্ঞাসু ইন্দ্রজিতের মতোই। কাজেই মধুসূদন আমাদের মধ্যযুগীয় চেতনা-জগতে ও সাহিত্য ক্ষেত্রে যা এনেছিলেন, তা নতুন বটে, কিন্তু কোন অর্থেই আধুনিক ছিল না। কেননা, লন্ডনে-প্যারিসে-কোলকাতায় ইংরেজি বইয়ের মাধ্যমে অনেকেই হয়েছিলেন বিদ্যায়, মুক্তবুদ্ধিতে, প্রাগ্রসর চিন্তায়-চেতনায়, মার্জিত রস-রুচিবোধে সমকালীন য়ুরোপীয় মানুষের সমকক্ষ, যা মধুসূদনে অনুপস্থিত।*

* এ রচনায় যা বলা হল, তা সিদ্ধান্ত নয়—জিজ্ঞাসামাত্র। এ বিষয়ে বিদ্বানদের মনে আলোচনার আগ্রহ জাগানোই আমার লক্ষ্য।

'রবীন্দ্রনাথ' বিষয়ে একটি স্মৃতিচারণ

১

পাকিস্তান আমলে পূর্ববাঙলার অধিকাংশ শহুরে মানুষ জাতীর স্বাতন্ত্র্যচেতনা বৃদ্ধি লক্ষ্যে রবীন্দ্রবিরোধী ছিল। তখন যাঁরা রবীন্দ্রভক্ত ছিলেন, তাঁরা রবীন্দ্র চর্চার পক্ষে সভয়ে ও সসঙ্কোচে কয়েকটি দুর্বল যুক্তি প্রয়োগে করতেন, যে-গুলো রবীন্দ্রপ্রশস্তি না হয়ে, তাঁদের অজ্ঞাতেই হয়ে উঠত রবীন্দ্র-অপমান। তাঁরা বলতেন, দেবেন ঠাকুর ইরানী কবি হাফিজের ভক্ত ছিলেন, পিতার প্রভাবে পুত্র রবীন্দ্রনাথও ছিলেন সুফীভাবের অনুসারী, ব্রাহ্ম রবীন্দ্রনাথও ছিলেন একেশ্বরবাদী এবং মুঘলাইখানা ও লেবাস ছিল তাঁর প্রিয়। কাজেই রবীন্দ্র-রচনাপাঠ পাকিস্তানে জায়েজ। তাই রবীন্দপ্রীতিও হিন্দুপ্রীতির কিংবা ভারতানুরাগের সমার্থক নয়। এসব কথা তাঁদের মৌখিক বক্তৃতায় প্রকাশ পেত বটে, কিন্তু সাধারণত লিখতেন না। পাকিস্তান আমলে ঢাকার পত্র-পত্রিকায় রবীন্দ্রনাথ সম্বন্ধে তেমন কিছু লেখা হয়নি বললেই চলে, কেবল ১৯৬১ সনে রবীন্দ্রজন্মশতবার্ষিকী উপলক্ষে সরকারী বিরূপতা সত্ত্বেও কোন কোন দুঃসাহসী আবেগবশে গা পা বাঁচিয়ে নির্বর্ণ নির্দোষ নিরপেক্ষ বিষয়ে দায়সারা গোছের পার্বণিক লেখা দিয়ে ডকটর আনিসুজ্জামান সংকলিত 'রবীন্দ্রনাথ' নামের প্রবন্ধাবলী প্রকাশনা সম্ভব করেছিলেন। তাতে ডক্টর মুহম্মহ শহীদুল্লাহ, আবুল ফজল থেকে আনিসুজ্জামান অবধি অনেকের লেখাই রয়েছে। অন্যদিকে সৈয়দ আলী আহসান ও অন্য বহু বহু ইসলামপন্থী ও পাকিস্তানী তমদ্দুন বা সংস্কৃতিসেবী রবীন্দ্র বিরোধিতায় ও রবীন্দ্র বর্জনে ছিলেন সদা-সক্রিয়। ১৯৭১ সন অবধি সেই দুর্দিনে বিদ্যালয়ের বাইরে ঢাকায় আমিই ছিলাম লিখিতভাবে একমাত্র বঙ্কিম-জিজ্ঞাসু এবং রবীন্দ্রনাথ সম্বন্ধে অধিক সংখ্যক প্রবন্ধের রচক।[১] তথ্য তুলে ধরার জন্যই এ কথাগুলো বলতে হচ্ছে, দম্ভ প্রকাশ এসব বৃত্তান্তের লক্ষ্য নয়, ১৯৭২-৭৩ সনের সদ্য স্বাধীন বাঙালী মুসলিমদের বাঙালী-চেতনার আবেগোচ্ছল দিনগুলো বোঝানোর জন্যেই দলিল হিসেবে আত্ম-প্রমাণটি দাখিল করতে হল।

যে অর্থ-সম্পদের ক্ষেত্রে রাম-রবীন্দ্রনাথের জাতকে 'জানি দুশমন' জেনে স্বার্থের ও সংস্কৃতির স্বাতন্ত্র্যের যুক্তিতে স্বধর্মীর জাতীয়তার দোহাই কেড়ে ভৌগোলিক ব্যবধান অস্বীকারের অঙ্গীকারে পাকিস্তান রাষ্ট্র গড়ে তুললাম আমরা, কিছুকালের মধ্যেই সেই নতুন রাষ্ট্রে সেই আর্থিক শোষণে উত্যক্ত হয়ে, স্বধর্মীর দেশ-কাল-জাত-বর্ণহীন অভিন্ন স্বার্থে, জাতীয়তায় ও সংস্কৃতিতে আস্থা চোরাবালি-নির্ভরতা তুল্য জেনে, আবার স্বরাষ্ট্রের বিভাষী স্বধর্মী বিতাড়ণে স্বাধীন হওয়ার গরজে পূর্ববৈরী ভারতের আশ্রিত হলাম আমরা।

১৯৭২ সনে সদ্য স্বাধীন শহুরে শিক্ষিত লোকেরা ভারতবাসীর তথা পশ্চিমবঙ্গের বাঙালীর ও ভারতের কংগ্রেস সরকারের প্রতি কৃতজ্ঞতা বশে নিজেদের নির্ভেজাল বাঙালী বানাবার হুজুগে মেতে ওঠে। আর সব প্রয়োজন ও পরিচিতি যেন মিছে হয়ে গেল কেবল অভিন্ন বাঙলাভাষা ও একক বাঙালী জাতিই রইল। সুবিধেবাদীদের এ উচ্ছ্বাসের উদ্যোগের মূলে ছিল রুশ-ভারতের আশ্রিত ও মদদপুষ্ট সরকারের সুনজর আকর্ষণ করে আপাত দাঁও মারা। এ উদ্দেশ্যে রবীন্দ্রসাহিত্য বর্জনে অগ্রণী ও মুখর সৈয়দ আলী আহসান, আশরাফ সিদ্দিকী প্রভৃতি অনেকে রবীন্দ্রনাথ সম্বন্ধে প্রশস্তিমূলক কেতাবও রচনা করলেন। পাকিস্তান যুগে স্বতন্ত্র-

—— লেখক।

১. মোট আটটি। মৈত্রেয়ীদেবীর সংকলন গ্রন্থে কয়েকটি সংকলিত রয়েছে।

সংস্কৃতির ধারক বাহক বলে আস্ফালন করত যারা, স্বাতন্ত্র্যের ও সংস্কৃতির শত্রু রবীন্দ্রনাথের নাম শুনলেও যারা ক্ষেপে উঠত, ১৯৭২ সনে তাদের মুখে শুনি 'রবীন্দ্রনাথ আমাদের স্বাধীনতা-স্পৃহায় ও স্বাধীনতা-সংগ্রামে প্রেরণার ও প্রণোদনার উৎস। বাঙলার হিন্দু-মুসলিমের অভিন্ন ঐতিহ্য ও সংস্কৃতি, দ্বিজাতিতত্ত্ব ভুল ও ভাঁওতামাত্র।' এমনকি 'দুর্গোৎসবও মুসলিম বাঙালীরও জাতীয় উৎসব', টেলিভিশনেও একজন বুদ্ধিজীবী আবদুল গফফার চৌধুরী জাতির উদ্দেশ্যে তা উচ্চারণও করলেন।

ঢাকার এমনি উচ্ছ্বাসমুখর প্রতিবেশে ১৯৭২ সনে রবীন্দ্র জন্মদিনে টেলিভিশনে রবীন্দ্রনাথের প্রতি শ্রদ্ধানিবেদন অনুষ্ঠানে আমি প্রতিবাদী কণ্ঠে মোটামুটি এ কয়টি কথা উচ্চারণ করেছিলাম, সবকথা অবিকল মনে নেই।

১৯৭২ সনে রবীন্দ্র জন্মদিবসে টেলিভিশনে রবীন্দ্রনাথ সম্বন্ধে প্রতিবাদী কণ্ঠে বলেছিলাম : ভৌগোলিক ভারতবর্ষে সাহিত্যক্ষেত্রে দু'জন মহৎ কবির আবির্ভাব ঘটেছে। একজন প্রাচীনকালের কবি কালিদাস এবং অন্যজন একালের রবীন্দ্রনাথ এবং সে-কারণে রবীন্দ্রনাথ আমাদের গৌরব, আমাদের গর্ব, আমাদের মহত্তম পুরুষ। কিন্তু আমরা সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠার অঙ্গীকারে স্বাধীনতা সংগ্রাম করেছি, কাজেই রবীন্দ্রনাথ এক্ষেত্রে আমাদের প্রেরণার উৎস হতে পারেন না, কারণ সমাজতন্ত্রে তাঁর আস্থা ছিল না এবং রবীন্দ্রনাথ ছিলেন ভাববাদী সামন্ত বেনে-বুর্জোয়া, ভূতে ভগবানে ছিল তাঁর গভীর বিশ্বাস, প্রাচীন নিয়মনীতিতে ছিল তাঁর আস্থা ও আকর্ষণ, কাজেই রবীন্দ্রনাথ বিপ্লবী, সাম্যকামী বা সমাজবাদী হতেই পারেন না। রবীন্দ্রনাথ সুশাসন ও সুপোষণ চাইতেন, স্বশাসন ও স্বাধিকার তাঁর চেতনায় কখনো তেমন গুরুত্ব পায়নি।

উল্লেখ্য যে রবীন্দ্রনাথ বিপ্লব ও সন্ত্রাসবাদ পছন্দ করতেন না, তাঁর ধারণায় ওই পথ ছিল সংকীর্ণ ও সংক্ষিপ্ত বিপথ, দিশাহারানোর আশঙ্কাও বেশি। আর সন্ত্রাসবাদী বিপ্লবী-সংগ্রামীও হয়তো কখনো প্রয়োজনীয় সংখ্যায় পাওয়া যেত না। কাজেই সাফল্য থাকত অনায়ত্ত আর বিদ্বেষ কোন শুভ ফল দেয়না। তাছাড়া বিশাল ভারতে বর্ণে-ধর্মে-ভাষায়-স্বার্থে বিচিত্র মানুষ কখনো সংঘবদ্ধ হয়ে আন্দোলন সংগ্রাম করবে এমন ভরসাও তাঁর হয়তো ছিল না বলেই স্বাধীনতা সংগ্রামে তাঁর আগ্রহ-উৎসাহ দেখা যায়নি। যদিও ব্যক্তিগতভাবে সন্ত্রাসবাদীদের তিনি শান্তিনিকেতনে চাকরি দিয়ে অরাজনৈতিক তথা বৈষয়িক জীবন বরণে সহায়তা করতেন। এতেই ব্রিটিশ সরকারের রাজনীতিকে শত্রুর তালিকায় ১৯০৫ সন থেকে ১৯২৫ সন অবধি রবীন্দ্রনাথের নামও ছিল। বড়ো ও ছোট, পথ ও পাথেয়, সমস্যা, সত্যের আহ্বান প্রভৃতি প্রবন্ধ এসূত্রে স্মর্তব্য। শেষ বয়সেও তিনি ব্রিটিশ যুবরাজের দিল্লীবাস[১] কামনা করেছিলেন সুশাসনের প্রত্যাশায়। কাজেই আমাদের প্রেরণার উৎস সুকান্ত, রবীন্দ্রনাথ নন। তাই রবীন্দ্রনাথ আমাদের ঐতিহ্য, সম্পদ নন। আমরা রবীন্দ্রনাথকে নিভৃত জীবনের সঙ্গী রাখব, রাষ্ট্রিক জীবনের সহায়-সম্পদ করব না। এমনি আরো দু'একটি কথা সে-আসরে বলেছিলাম আজ আর মনে পড়ে না। আমার কথা শুনে সেদিন দর্শক শ্রোতাদের কেউ বিস্মিত, কেউ ব্যথিত, কেউ আহত এবং কেউ বা বিক্ষুব্ধ হয়েছিলেন। ১৯৭২ সনের মে মাসের গোড়ার দিকে রবীন্দ্রনাথ সম্বন্ধে এমন কথার উচ্চারণ ছিল অভাবিত। তাই বিচলিত বিব্রত হল সবাই। দৈনিক সংবাদে' ও 'জনপদে' এ নিয়ে বেশ কিছু কাল তর্কবিতর্ক চলল। অন্যান্য কাজেও কিছু লেখালেখি হয়েছিল, এমকি 'হলিডে'-ও উদাসীন ছিল না। আমি এ বাদ-প্রতিবাদে যোগ দিইনি, তবে আমার বৈঠকখানার

১. সভ্যতার সংকট দ্রষ্টব্য।

আড্ডায় মুখ খুলেছি। 'বিরুদ্ধস্রোতে রবীন্দ্রনাথ' লেখক সাংবাদিক আহমদ হুমায়ুন ব্যথিত চিত্তে একদিন আমার বাড়িতে এলেন আমার রবীন্দ্রনাথ সম্বন্ধীয় অবাঞ্ছিত উক্তির তাৎপর্য বুঝে নেয়ার জন্যে।

আমি তাঁকে এ কথাগুলো বললাম—"সামন্ত বুর্জোয়া সরকার শাসিত সমাজে রাষ্ট্রে রবীন্দ্ররচনা আমাদের অমূল্য অপরিহার্য সম্পদ। ওই সমাজে উদার মানবতাই দুঃস্থ শোষিত মানুষের মানস-শরণ এবং সাম্প্রদায়িক চেতনার প্রতিরোধে রক্ষাকবচ। য়ুরোপীয় উদার মানবতার ধারক, বাহক ও প্রচারক ছিলেন আমাদের দেশের এ যুগের 'মনীষার মহত্তম' পুরুষ রবীন্দ্রনাথ। আমাদের অশিক্ষাদুষ্টদেশে মানবিকতার-মানবতার বিকাশ-বিস্তার সহজে সম্ভব কেবল রবীন্দ্রনাথের গান-কবিতা- -গল্প উপন্যাস ও প্রবন্ধ পড়ার ও পড়ানোর, শোনার ও শোনানোর মাধ্যমেই। পাকিস্তান আমলে আমি তাই রবীন্দ্র-প্রশস্তি রচনা করেছি। বলেছি—রবীন্দ্রনাথ মানবতার প্রহূর্ত প্রতিনিধি, মানব কল্যাণের দিশারী। আমাদের গরজেই আমরা রবীন্দ্র সাহিত্যের পাঠক। বলেছি, আমার ভাষাতেই তাঁর বাণী শুনতে পাই, তাঁর ভাষাতেই আমার প্রাণ কথা কয়, আমার এ সৌভাগ্যের তুলনা নেই। "জয়তু রবীন্দ্রনাথ।"

আজ স্বাধীন বাঙলাদেশে রবীন্দ্রনাথকে প্রেরণার প্রণোদনার উৎস বলে প্রচার করা 'সমাজতন্ত্র' প্রতিষ্ঠার অঙ্গীকার পরিহার কিংবা বানচাল করার ষড়যন্ত্রের শামিল বলেই আমি মনে করি। ওই অঙ্গীকার স্মরণ করিয়ে দেয়ার উদ্দেশ্যেই বলেছি যে 'রবীন্দ্রনাথ আমাদের ঐতিহ্য—সম্পদ নন, আমাদের প্রেরণার উৎস সুকান্ত।'—আহমদ হুমায়ুন সেদিন আশ্বস্ত হয়ে ফিরেছিলেন। এ মুহূর্তেও আমার ধারণা রবীন্দ্রসাহিত্য কালের ক্ষয় অনেকাংশে এড়িয়ে বুর্জোয়াদের বেদ হয়েই স্ব-ও সু-প্রতিষ্ঠিত থাকবে। যেমন সেক্সপীয়র রয়েছেন, রয়েছেন তলস্তয় অমর হয়ে। যেমন রয়েছে বহুশ্রুত কিন্তু ক্বচিৎ পঠিত অতীতের প্রয়াত লেখকদের বিখ্যাত গ্রন্থগুলো—বিশ্বে ক্লাসিকস্ বা ধ্রুপদী সাহিত্য চিরস্মরণীয় হয়ে। স্থানান্তরে ও কালান্তরে সবকিছুই স্থানিক কালিক উপযোগ হারায়, রবীন্দ্রসাহিত্যও হারাবে, হারাচ্ছে, ইতোমধ্যে কিছু হারিয়েছে। কিন্তু সমাজবাদীর সমাজ ও রাষ্ট্র চিন্তায়, সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থাপনায় রবীন্দ্রপ্রভাব স্বীকার করলে অনর্থ ঘটবে, দু'কূল হারানো হবে।

২

মানুষ স্বভাবতই শ্রমভীরু বা শ্রমবিমুখ—মানসিক ও দৈহিক উভয়তই। এজন্যে মানুষ পরের চিন্তা, জ্ঞান, প্রজ্ঞা, বুদ্ধি, শ্রম ও অন্ন নির্ভরতায় সুস্থ ও নিশ্চিন্ত হতে চায়। এ কারণেই জীবনের সর্বক্ষেত্রেই মানুষ সাধারণত অনুগতের, অনুসারীর ও অনুকারীর নিরাপদ জীবনে আশ্বস্ত থাকতে চায় রীতি-নিয়ম মেনে। দুনিয়ার প্রায় সব মানুষেরই নেতা-মানা মন আর পোষ-মানা প্রাণ। আদতে মানুষ মাত্রই এ তাৎপর্যে গুরুবাদী ও পৌত্তলিক।

যে-মানুষ বুদ্ধি, শক্তি, সাহস কৌশল জ্ঞান, প্রজ্ঞা সততা, নিষ্ঠা প্রভৃতি সামূহিক সামর্থ্যের আধার বলে লোকমনে আস্থা জন্মাতে পারে, তার উপর আস্থা রেখে, ভরসা করে ও নির্ভর করে তারই নেতৃত্বে কর্তৃত্বে চালিত হওয়া, তারই অবিভাবকত্বে জীবনযাত্রা পরিচালিত করা-পারিবারিক, সামাজিক দালিক কিংবা রাষ্ট্রিক জীবনে মানুষ হিতকর বলেই জানে এবং মানে। উচ্চাভিলাভী আত্মপ্রত্যয়ী উদ্যমশীল প্রতিদ্বন্দ্বী প্রতিযোগী কিছু মানুষেই কেবল স্বনির্ভর, উদ্যোগী ও দ্রোহী হয়।

একারণেই মানুষ জীবনের সর্বক্ষেত্রে শ্রদ্ধা কববার মতো, ভরসা পাওয়ার আর নির্ভর করার মতো শাস্ত্রী, গৃহর্কতা , গোত্রপতি, সমাজসর্দার সামন্ত,শাসক খুজেঁ বেড়িয়েছে। এক সময় ছিল, যখন নবী –অবতারেরাই দিতেন এ নেতৃত্ব। আজকাল নবী –অবতার মেলে না, তাই সবাই কিংবা অনেকে মিলেই আজকাল নেতা বানায়। এবং গরজে পড়েই নেতার ব্যক্তিত্বে সত্য–মিথ্যা নানা গুণ আরোপ করে জনগণই।

শাস্তে, সমাজে, রাষ্ট্রে নেতা চাই, নেতা ছাড়া গতি নেই। তাই পীর-গুরু, মোল্লা-পুরুত যেমন প্রয়োজন, তেমনি প্রয়োজন সাহিত্যে, শিল্পে, দর্শনে, বিজ্ঞানে, যন্ত্রে, সমাজে, রাষ্ট্রে মনীষীর ও নেতার। কেশব সেন দেবেন ঠাকুরকে 'মহর্ষি' বানিয়ে একদিন ব্রাহ্ম সমাজকে সঙ্কটমুক্ত করেছিলেন। গান্ধীকে মহাত্মা বানিয়ে, জিন্নাকে 'কায়েদ-ই-আযম' করে, ফজলুল হককে 'শের-ই-বাঙ্গালা' সাজিয়ে চিত্তরঞ্জনকে' 'দেশবন্ধু', যতীন্দ্রমোহনকে 'দেশপ্রিয়' সুভাষবসুকে 'নেতাজী' ও মুজিবকে 'জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু' উপাধি দিয়ে যেমন স্বদলের প্রভাব-প্রতিপত্তির বিস্তার দেশব্যাপী করার চেষ্টা হয়েছে, তেমনি হেমচন্দ্রকে জাতীয় কবি বানিয়ে, রবীন্দ্রনাথকে 'বিশ্বকবি' আখ্যাত করে, নজরুলকে বিদ্রোহী কবি' আখ্যা দিয়ে অবনঠাকুরকে এবং সে-ধারায় জয়নাল আবেদিনকে 'শিল্পাচার্য' বলে অভিহিত করে একই আদি ও অকৃত্রিম আনুগত্য-তৃষ্ণাই মিটিয়েছে বাঙালী।

আগেও দলীয় মতবাদের প্রয়োজনে সন্ত্রসবাদীদের কাছে রবীন্দ্রনাথের কালে বঙ্কিমচন্দ্র হয়েছিলেন ঋষি, শরৎসাহিত্য প্রভাবিত বাঙলায় মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় হয়েছিলেন বন্দিত, সুধীনদত্ত প্রমুখের সামনেই সুভাষ-সুকান্ত হলেন গণমানবের মনের, আশার ও বুকের ভাষার কবি।

কাজেই বৈষয়িক-রাষ্ট্রিক জীবনে রবীন্দ্র-নজরুলের প্রাসঙ্গিকতা নিয়ে বিতর্ক দিনে দিনে বাড়বে। অদূর ভবিষ্যতে একসময়ে এঁদের কালিক ও স্থানিক ভূমিকা নিঃশেষ হবে। তখন চলবে নতুন লেখকগোষ্ঠী প্রভাবিত ও নিয়ন্ত্রিত নতুন যুগ। সব কিছুর শুরু যেমন আছে, তেমনি আছে শেষ। কাজেই জয় হোক নতুনের। বৈষয়িক-রাষ্ট্রিক জীবন ছাড়াও তো রয়েছে মানুষের অন্য অনেক চেতনার জগৎ। সেখানে রবীন্দ্রনাথ আরো অনেককাল আমাদের মনোভূমে বিচরণ করবেন। তাঁর সঙ্গে আমরাও পূর্বজন্মের প্রথমা প্রিয়ারে খুঁজব। আপাতত রবীন্দ্র-নজরুল আমাদের নিঃসঙ্গ নিভৃত জীবনের আনন্দ সহচর হয়ে থাকুন। আর বুর্জোয়াদের তো ভাবচিন্তা, জীবন ও জগৎ তাঁরা আচ্ছন্ন করে রয়েইছেন।

১৩৯০ সালে আমার চেতনায় রবীন্দ্রনাথ

আজ ১৩৯০ সালের পঁচিশে বৈশাখ। এ দিনে স্বতঃস্ফূর্তভাবে স্মরণে আসেন রবীন্দ্রনাথ, যদিও আমরা বাঙালীরা দিনে যতবার রবীন্দ্রনাথের নাম নানাভাবে শুনতে পাই কিংবা বিভিন্ন প্রয়োজনে উচ্চারণ করি, ততবার উপাস্যের নামও হয় না শ্রুত বা উচ্চারিত।

প্রাচীনকাল থেকে ভারতবর্ষে তথা আজকের পাক-ভারত-বাঙলাদেশে বৈশ্বিক চেতনাসম্পন্ন এত বড় মনীষী-মনস্বী কবি কখনো আবির্ভূত হয়নি। চেতনালোকের বিরাটত্বে,

বিষয়ের বৈচিত্র্যে, অনুভবের গভীরতায়, বোধের ব্যাপকতায়, কলেবরের বিশালতায়, ভঙ্গির বহুধা বিকাশে, আঙ্গিক বিচিত্রতায় রবীন্দ্র-সাহিত্য একটি রূপের ও রসের পাথার—একটি চেতনা-জগৎ।

এ-জন্যেই বাঙালীর জীবনে রবীন্দ্রনাথকে এড়িয়ে চলা আগামী শতকেও সম্ভব হবে না। তাই পঁচিশে বৈশাখে কিংবা বাইশে শ্রাবণে তাঁকে পরিবারের মৃত প্রিয়জনের মতোই সোহাগে-শ্রদ্ধায় স্মরণ করতে হয়। স্মরেণ্য হয় তাঁর অতুল্য কৃতি-কীর্তি।

দেশের আর্থ-সামাজিক জীবনের এক যুগান্তরলগ্নে রবীন্দ্রনাথের জন্ম। তাঁর পারিবারিক জীবনেও ছিল সামন্ত ও বেণে-বুর্জোয়ার মিশ্র হাওয়া। এ আবহেই গড়ে উঠেছিল তাঁর মন–মেজাজ, চিন্তা-চেতনা পেয়েছিল লালন। কেবল খাদ্যে আর পোশাকে নয়, তাঁর পারিবারিক আচারে-আচরণে আদবে- লেহাজেও ছিল সামন্তিক মুঘলাই সংস্কৃতির সুস্পষ্ট ছাপ। আবার প্রতীচ্য আদলে জীবনযাত্রায় ও মননে-চিন্তনে জেগেছিল এ পরিবারের দুর্বার আগ্রহ-আকর্ষণ। রবীন্দ্রনাথ পরিপূর্ণভাবে এ-যুগসন্ধিকালের মানুষ। ক্ষীয়মান ও বর্তমান দুই যুগের টানাপোড়েন তাই তাঁর সাহিত্যে সুপ্রকট। বহু ক্ষেত্রে ও বিষয়ে তাঁর মত-পথের অসঙ্গতির কারণও এ-ই।

রবীন্দ্রসাহিত্যে–গানে-গল্পে-উপন্যাসে-নাটকে-কবিতায়—সর্বত্র তাঁর চিন্তা-চেতনা-কল্পনা উদ্দীপিত হয়েছে রাজা-রানী আর উচ্চবিত্তের শক্তিমান সাহসী মানুষকে অবলম্বন করে, বিশেষ করে রূপক-সাঙ্কেতিক কবিতায় ও নাটকে। বাস্তবে, ব্যক্তিজীবনে, দ্বিতীয় প্রজন্মের ধার্মিক ব্রাহ্ম পুরোহিত হয়েও তিনি মুসলমানদের মতো নিরাকার একেশ্বরবাদী হতে পারেননি। তাঁর চিন্তার, চেতনার কল্পনার ও সৃষ্টির জগতে হিন্দুর শাস্ত্রের-পুরাণের দেব-দেবী, ভয়-ভক্তি, বিশ্বাসও শ্রদ্ধার আসনে বাস্তব হয়ে বিরাজমান দেখতে পাই।

সামন্তযুগের প্রভাবে তিনি হয়েছেন রক্ষণশীল—সমকালীন জ্ঞান-বিজ্ঞানের, জীবনযাত্রার, সভ্যতা-সংস্কৃতির তুলনায় ক্ষীণপ্রভ প্রাচীন ভারত তাই তাঁকে সারাটা জীবন মুগ্ধ ও গৌরবগর্বী রাখে। এ অভিভব তথ্যসমর্থিত বা যুক্তিসিদ্ধ নয়। এ কেবলই স্বাতন্ত্র্যকামী আবেগতাড়িত মনের বন্ধন মাত্র।

আবার আধুনিক য়ুরোপের চোখ-ধাঁধানো চমক-লাগানো মন-মাতানো বুর্জোয়া বিকাশও রবীন্দ্রনাথের মন ভুলিয়েছিল—করেছিল অভিভূত। তাই রবীন্দ্রমানসের বিচরণক্ষেত্র ছিল প্রাচীনভারত ও আধুনিক য়ুরোপ। আধুনিক য়ুরোপীয় বিদ্যার ও চিন্তার প্রভাব স্বীকার করে তিনি প্রাচীন ভারতে আধুনিক জীবনের বাঞ্ছিত মহিমা আরোপ করে আধুনিক তাৎপর্যে প্রাচীন নিয়ম-নীতি, রীতি-নেওয়াজ বরণ করে এক আকর্ষণীয় প্রাচীন অথচ নতুন জগৎ রচনা করে স্বজাতিকে স্বাজাত্যে ও স্বাদেশিকতায় গর্বিত ও উদ্বুদ্ধ করতে চেয়েছিলেন প্রবন্ধে ও সৃষ্ট সাহিত্যের মাধ্যমে—এমনকি বাস্তবজীবন ক্ষেত্রেও। প্রমাণ—আধুনিক প্রয়োজনে প্রাচীন রীতির ব্রহ্মচর্যাশ্রম প্রতিষ্ঠার অভিলাষ। তরুতলে পাঠদান-রীতি পরিহারে এবং অট্টালিকায় আশ্রয় গ্রহণের—তেমনি তাঁর চিন্তার ও কর্মের অসঙ্গতির ও ব্যর্থতার সাক্ষ্যও তাঁর জীবৎ-কালেই মিলেছিল।

বাস্তব জীবনে সামন্ত-বুর্জোয়ার স্বার্থসচেতন রক্ষণশীল কবি কোথাও কোথাও এবং কখনো কখনো বিদ্যাবান ও বিত্তবান বুর্জোয়া-সুলভ উদারতার অনুগত হয়ে উদারতম মানবিকতায় উচ্চকণ্ঠ হয়ে শাস্ত্রের ও সমাজের নিয়ম-নীতি ভাঙার কথা তত্ত্ব হিসেবে উচ্চারণ করেছেন বটে, কিন্তু তেমন মহামুহূর্তেও তিনি শাস্ত্র-সমাজ-সরকার বিরোধী দ্রোহী নন; ক্ষীণকণ্ঠের প্রতিবাদী ও

নিষ্ক্রিয় প্রতিকারকামী মাত্র। এ-সূত্রে তাঁর সৃষ্ট চরিত্রগুলো স্মর্তব্য। উল্লেখ্য তাঁর গোরার ও টলস্টয়ের রিজারেকশানের প্রতিপাদ্য তত্ত্ব। বিবেচ্য বাস্তুচ্যুত ব্যক্তির 'নিখিল বিশ্ব' প্রাপ্তি। স্মরেণ্য 'ভূমৈব সুখম'-এ তাঁর আস্থা। এর মূল কারণ মনে হয় রবীন্দ্রনাথ কেবল সামন্তবুর্জোয়া-ভাববাদী নন—বড়বেশি আস্তিক এবং নিবেদিতচিত্ত ভক্ত। উপাস্যের কাছে সমপিত-জীবন ব্যক্তির পক্ষে জীবনের কোন ক্ষেত্রেই তমঃ রজঃ গুণের মানুষের মতো অমোঘ লক্ষ্যে অগ্রসর হওয়া সম্ভব নয়। প্রসঙ্গত উল্লেখ যে-উদার মানবতার ও আন্তর্জাতিক চেতনার জন্যে রবীন্দ্রনাথ নন্দিত, তার উন্মোষ ১৯০৮ সনে এবং তার বিকাশ ঘটে তাঁর নোবেল পুরস্কার প্রাপ্তির পরে—পঞ্চাশোর্ধ্ব বয়সে। পুরস্কারের সম্মান ও মর্যাদাই তাঁকে আন্তর্জাতিক চেতনার অনুশীলনে প্রণোদিত করেছিল এবং এক্ষেত্রে আনুকূল্য করেছে তাঁর দীর্ঘজীবিতা। পুরস্কার-পরবর্তী সুদীর্ঘ আটাশ বছরের অবদানই তাঁকে মহৎ মনের ও সর্বগ্রাহী মনীষার মহৎ মানুষ ও কবি রূপে নিঃসংশয় প্রতিষ্ঠা দিয়েছিল। করেছিল তাঁকে বিশ্বপথিক, বিশ্বম্ভর ও বিশ্বকবি।

এসব ত্রুটি-বিচ্যুতি সত্ত্বেও যারা ভাববাদী, আস্তিক এবং সামন্তিক চেতনাপ্রবণ বুর্জোয়া, যারা দানের ও দয়ার, কৃপার ও করুণার, সততার ও সৌজন্যের মাধ্যমে মানুষের প্রতি দায়িত্ব ও কর্তব্য পালনে আস্থাবান, দুঃস্থ মানবতার সাময়িক সেবায় এবং রুগ্ন মানবতার তাৎক্ষণিক শুশ্রূষায় যারা ত্যাগের পরার্থপরতার ও মহৎ কর্মের উপলব্ধি-জাত সুখ পেতে চায়, তাদের কাছে রবীন্দ্রসাহিত্য এ-মুহূর্তে তো বটেই ভবিষ্যতেও অন্তত এক শতক ধরে (ভাষার ভঙ্গির জীবনদৃষ্টির জীবন-পদ্ধতির পরিবর্তনের ফলে রবীন্দ্রসাহিত্যও ভবিষ্যতে সুখপাঠ্য থাকবে না, যেমন নেই হোমার-ভার্জিল—দান্তে—ফেরদৌসী—রুমী—জামী—নিযামী—বাল্মীকি—কালিদাস—কৃত্তিবাস এমনকি মধুসূদনও) থাকবে জীবনবেদ হয়ে। তারা রবীন্দ্রসাহিত্য (কবিতা-গল্প-নাটক) পড়ে মনের আকাশ, অনুভবের জগৎ, চেতনার সরোবর প্রসারিত করার সহজ সুযোগ পাবে। স্বাদ পাবে বিচিত্র ভাবতরঙ্গ-তাড়িত সাহিত্য-সমুদ্রের। কল্লোলিত হয়ে উঠবে তাদের অবসরকালীন চিত্তলোক, ঊর্মিমুখর হয়ে উঠবে তাদের চেতনা-সরোবর। তাদের কাছে রবীন্দ্র-সাহিত্য অসামান্য সম্পদ নয় কেবল, অনুভব-সুন্দর জীবনের পুঁজিও।

আর যারা মানববাদী-সমাজবাদী, আর্থ-সামাজিক জীবনে সাম্যবাদী, উৎপাদনে-বন্টনে বৈষম্যই মানুষের অপনোদনের দুঃখ-যন্ত্রণার কারণ বলে যারা জানে ও মানে, সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রগঠন যাদের কাম্য, তাদের কাছে রবীন্দ্রনাথ ও রবীন্দ্রসাহিত্য এক মহান ঐতিহ্য, সম্পদ নয়; কাজেই জীবন-চেতনার ক্ষেত্রে পুঁজিও নয়। গণমানবের বাঞ্ছিত সমাজ গড়ার ও রক্ষার গরজেই স্ব স্ব সংকল্পে সুস্থির থাকার জন্যে তাদের মধ্যে যারা আবেগপ্রবণ ও দুর্বলচিত্ত তাদের পক্ষে রবীন্দ্রসাহিত্যের যাদুস্পর্শ এড়িয়ে চলে মোহমুক্ত থাকাই কল্যাণকর।

রবীন্দ্রোত্তর তৃতীয় প্রজন্মে রবীন্দ্র মূল্যায়ন

রবীন্দ্রনাথের মৃত্যুর পর চুয়াল্লিশ বছর অতিক্রান্ত। আজো কিন্তু রবীন্দ্রনাথ শান্তিনিকেতনে 'গুরুদেব' আর সাধারণ অসাধারণ পাঠকভক্তদের কাছে 'কবিগুরু'। দুটোরই ব্যবহার

তাৎপর্যহীন, তাই অসঙ্গত। কেননা, যারা পড়েনি তাঁর কাছে এবং দেখেনি তাঁকে, তাদের মুখে 'গুরুদেব' নির্বোধের অর্থহীন অন্ধভক্তির সাক্ষ্যমাত্র আর 'কবিগুরু' যদি হয় কবির কবি' নির্দেশক তাহলে তাও হয় ন্যায়-বুদ্ধিরিক্ত স্থূল রুচি অক্ষম ভক্তের অপপ্রয়োগ, আর 'অঙ্কের স্যার' 'ইংরেজির স্যার' প্রভৃতির মতো গোড়ায় রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর নামের শিক্ষকতা ত্যাগের পরে কিংবা মৃত্যুর পরে তাঁকে ওই পরিভাষায় তথা যোগরূঢ় শব্দে চিহ্নিত করা অসঙ্গত বলেই অবাঞ্ছিত। প্রেম-প্রীতি-স্নেহ-ভক্তি-আসক্তি প্রভৃতি অন্ধ আবেগপ্রসূন বলে যে-কথা চালু আছে, এ তারই প্রমাণ মাত্র।

দীর্ঘজীবী সার্বক্ষণিক লেখক রবীন্দ্রনাথের রচনা এতো বিচিত্র, বহুমুখী এবং বিপুল কলেবর যে কোন একজনের পক্ষে ধৈর্য ধরে তাঁর রচনাবলী পড়ে শেষ করাও দুঃসাধ্য, মনে রাখা অসাধ্য; কোন অংশ প্রয়োজনে খুঁজে নেয়া কষ্টসাধ্য, আর তাঁর রচনাবলী ঘরে রাখার পূর্বশর্ত হচ্ছে আর্থিক সাচ্ছল্য। তাঁর যে-কোন রকমের রচনার দেশ-কাল পরিবেষ্টনী সাপেক্ষ মূল্যায়নের জন্যে প্রয়োজন উঁচুমানের মনীষা ও তীক্ষ্ণ স্মরণ-শক্তি সম্পন্ন বিদ্বান ব্যক্তির সশ্রম, সতর্ক ও সচেতন প্রয়াস।

গত ষাট-সত্তর বছর ধরে স্কুল-ম্যাগাজিনে ছাত্র-শিক্ষকরা রবীন্দ্রনাথ সম্বন্ধে নিবন্ধ-প্রবন্ধ লিখছেন, যেমন লিখছেন পত্র-পত্রিকায় অন্য অসংখ্য লেখকরা। বন্যাপ্লাবিত গাঁয়ে যেমন ভেলা যথেচ্ছ চালিয়ে অবলীলায় গন্তব্যে পৌঁছা সম্ভব হয়, তেমনি রবীন্দ্র রচনা-সমুদ্রে আবেগজড়িত মন-মননযোগে আপাত যুক্তি-প্রমাণ নির্ভর ক্ষুদ্র, খণ্ড ও তরল সত্যে যে-কোন লেখকের উত্তরণ ঘটে। এ ক্ষেত্রেও ব্যতিক্রম অবশ্যই রয়েছে, সে কথা সর্বদা ও সর্বথা স্বীকার্য। তবু এও সত্য যে রবীন্দ্রনাথের লেখক জীবনের সুদীর্ঘ পঁয়ষট্টি বছরের পরিপ্রেক্ষিত ও পরিবেশ মনে না রেখে তাঁর বিচিত্র বহুমুখী রচনার যে-কোন একপর্ব কিংবা এক শাখা ধরে আলোচনা করে ঋজু সিদ্ধান্তে পৌঁছা আবেগ-অনুরাগচালিত ভক্তের পক্ষে সহজে সম্ভব হলেও, তাঁর ঠুলিপরা সরু-সংকীর্ণ মানসদৃষ্টি দূরগামী হলেও পার্শ্ব চেতনারিক্ত হওয়ায় তা' নির্ভুল হয় না।

রবীন্দ্রনাথের কাছাকাছি সময়ের প্রতীচ্য প্রতিভাবানদের—গ্যয়টে (১৭৪৯—১৮৩২) টলস্টয় (১৮২৮—১৯১০), বানার্ডশ (১৮৫৬—১৯৫০) রাসেল (১৮৭২—১৯৭০), রোমা-রঁলা (১৮৬৬—১৯৪৪) প্রমুখের—তাঁর মতো এমন বহুমুখী দক্ষতা ছিল না। তাঁদের রচনার কলেবর ও বৈচিত্র্য তাই দিশেহারা করার মতো চোখ-মন ধাঁধানো গোছের নয়।

রবীন্দ্রনাথ কবি হলেও একজন গৃহী ও বিষয়-সচেতন ব্যক্তি। কাজেই কবি ও গৃহী মানুষ হিসেবে বাহ্যত তিনি দ্বৈত সত্তার এবং ক্বচিৎ কখনো চেতনার গভীরে অদ্বৈত সত্তার মানুষ। অতএব তাঁকে প্রয়োজন মতো দ্বৈতাদ্বৈতরূপে জানতে বুঝতে হবে। আর এও মানতে হবে যে তিনি মুখ্যত উনিশ শতকের মানুষ ও কবি, কেননা তাঁর মন-মানস পাকাপোক্ত হয়েছে উনিশ শতকী প্রতিবেশে।

রবীন্দ্রনাথের জন্ম সামন্ত প্রতিবেশে বুর্জোয়া পরিবারে। ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর চাকুরে ও অনুরাগী পরিবারে খাদ্যে পোশাকে আচার-আচরণে তখনো মুঘলাই রুচির প্রতি আসক্তি প্রবল। কিন্তু মনে-মানসে প্রতীচ্য-হাওয়া মৃদু-মন্দগতিতে বইতে শুরু করেছে। পরিবারে মুঘলাই হাওয়া যখন ক্ষীণতর এবং য়ুরোপীয় আবহ প্রবলতর তেমনি সময়ে রবীন্দ্রনাথের জন্ম। বালকের দেহে টুপি-শেরওয়ানী পাজামা রইল বটে', কিন্তু মনে যে রঙ লাগছিল তা' নতুন ও দূরাগত। বাল্যে-কৈশোরে তাঁর পদ্ধতিগত শিক্ষা হল না বটে, তবে নানা বিদ্যায় ছিল তাঁর কৌতূহল, ফলে রবীন্দ্রনাথ যথাসময়ে বিদ্বান হয়ে উঠেছিলেন। আশৈশবের জিজ্ঞাসাই ছিল এ বিদ্যাচর্চার মূলে।

প্রায় সর্বদিক দিয়ে শিথিল চরিত্রের লোক ছিলেন বলে দ্বারকানাথের প্রতি তেমন শ্রদ্ধা ছিল না রবীন্দ্রনাথের[২]। এ জন্যে সুদীর্ঘ জীবনের কোন কথায় লেখায় ক্বচিৎ দ্বারকানাথ প্রসঙ্গ এসেছে। কিন্তু আচার-নিষ্ঠ ব্রাহ্ম ও ব্রাহ্মধর্মবেত্তা পিতার অনুগত ছিলেন রবীন্দ্রনাথ সারা জীবন—'পিতা ধর্মঃ পিতা স্বর্গঃ, পিতা পরমতপঃ'—এ ব্রাহ্মণ্য বিশ্বাসে অটল ছিলেন ব্রাহ্ম রবীন্দ্রনাথ।

ব্রাহ্ম ঋষি ও সমাজপতি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর ব্রাহ্মণ্য উপনয়নে, বর্ণভেদে ও আচারে-সংস্কারে ছিলেন শ্রদ্ধাবান। তাই অব্রাহ্মণের সঙ্গে ব্রাহ্মণ দেবেন ঠাকুর বৈবাহিক সম্বন্ধের ছিলেন ঘোর বিরোধী; বর্ধমানের মহারাজ পরিবারে দৌহিত্রীর বিবাহে তাঁর অনুমোদন মেলেনি।[৩] পৌত্র বলেন্দ্রনাথের বিধবার পুনঃ বিবাহের চেষ্টার সংবাদে বিচলিত দেবেন্দ্রনাথ পুত্র রবীন্দ্রনাথকে পাঠিয়ে বধূকে জোড়াসাঁকোয় আনিয়ে নেন।[৪] ব্রাহ্ম হয়েও রবীন্দ্রনাথ বাইশ বছর বয়সে এগারো বছরের বালিকা মৃণালিনীকে বিয়ে করেন। নিজের তিন কন্যার বিয়েও দেন যথাক্রমে তাদের সাড়ে পনেরো, বারো ও চৌদ্দ বছর বয়সেই। তাঁর উদ্ভিন্ন যৌবন থেকেই ব্রাহ্ম সমাজ, মন্দির উপাসনা এবং তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা সম্পৃক্ত জীবন শুরু। রবীন্দ্রনাথ উপাসনায়, ব্রাহ্ম বটে, কিন্তু নিরাকার ব্রাহ্মবোধ, বৈদান্তিক ব্রহ্মোপলব্ধি তাঁর হয়েছিল কিনা তার আন্তর প্রমাণ নেই। হিন্দু-পুরাণের দেব-দেবী তাঁর চিন্তা-চেতনা আচ্ছন্ন করেছিল, অধিকার করেছিল তাঁর আবেগের জগৎ। তাই তাঁর জীবনদেবতাও নারী বা দেবী স্বরূপা। তাঁর সাহিত্যের চিত্রকল্প ও বাকপ্রতিমা পুরাণ প্রভাবিত, তাঁর জীবন-চেতনা এবং জগৎভাবনাও গীতা-মহাভারত বলয়-ভুক্ত। তিনি তাঁর তত্ত্বভাবনায় ঔপনিষদিক সত্যানুগত্য উচ্চারণ করেছেন বটে, শ্লোকও উদ্ধৃত করেছেন সত্য, কিন্তু তাতে তাঁর অধিকার যে সুষ্ঠু ছিল না, তা শ্লোকের ভুল ব্যাখ্যায় বোঝা যায়, তা ছাড়া প্রধান উপজীব্যগুলো নিবিড়ভাবে জানার বা স্মৃতিতে ধরে রাখার আগ্রহও ছিল না তাঁর। পিতা দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর-বিধৃত শ্লোকের জীর্ণ খাতার পিতার নির্দেশে প্রতিলিপি তৈরির সময়ে কিছু ভালো-লাগা শ্লোক তিনি স্মৃতিতে ধরে রেখেছিলেন এবং সেগুলোই সারাজীবন প্রাসঙ্গিক ক্ষেত্রে [কখনো কখনো মূল পাঠের বিকৃতি সাধন করে][৫] আওড়াতেন—কারো কারো ধারণা এ-ই। ওই পৌরাণিক দেবদেবীর প্রতীকী ভূমিকায় আস্থাবান আমৃত্যু নিষ্ঠব্রাহ্ম পুরোহিত রবীন্দ্রনাথ পুরস্কার-প্রাপ্তি উত্তর জীবনে বৈশ্বিক ও বিশ্ব মানবিক চিন্তা-চেতনায় উদ্বুদ্ধ হয়ে যখন ভাষণে-বক্তৃতায়-বিবৃতিতে স্ব-উপলব্ধ এক মানস বা মানব ধর্মের কথা উচ্চকণ্ঠে উচ্চারণ করতেন, তখন তাঁর চিন্তায় ও আচরণে, বুকের ও মুখের সত্যে অসঙ্গতি সতর্ক সচেতন মানুষের চোখের অগোচরে থাকেনি। ভূতে ভগবানে ছিল তাঁর সমান বিশ্বাস। আমৃত্যু ভৌতিক প্লানশেটে ছিল তাঁর গভীর আস্থা। আর কে না জানে এ ধরনের আস্তিকতা মানস-মুক্তির একটি বড়ো অন্তরায়। আবার রক্তমাংসের মানুষ রবীন্দ্রনাথ কামে প্রেমেও উদাসীন ছিলেন না কখনো। রবীন্দ্র অন্তরের গভীরে পৌরাণিক দেবতাপ্রীতি ও ঔপনিষদিক ব্রহ্মতত্ত্বের সহাবস্থানের ফল হিন্দু-ব্রাহ্মসমাজের পক্ষে কল্যাণকর হয়েছে। সাধারণত নিষ্ঠ ধার্মিকরা ধর্মবিশ্বাসের ক্ষেত্রে স্বাতন্ত্র্যকামী হয়। নিষ্ঠ ব্রাহ্ম রবীন্দ্রনাথেও এ স্বাতন্ত্র্যবাঞ্ছা প্রত্যাশিত ছিল। কিন্তু তিনি স্থির বিশ্বাসে দৃঢ় কণ্ঠেব্রাহ্মরা যে হিন্দুই—স্বতন্ত্র জাতি বা সম্প্রদায় নয়, তা-ই উচ্চারণ করে ব্রাহ্মদেরকে উনজন হবার চিরদুর্ভাগ্য থেকে রক্ষা করেছিলেন।

বাঙলার প্রথম আধুনিক কবির মানসজগৎ ছিল গ্রিক সভ্যতার যুগ থেকে সতেরো শতকের য়ুরোপ অবধি কালে ও স্থানে এবং পৌরাণিক ভারতে নিবদ্ধ। রবীন্দ্রনাথে দেখি প্রাচীন ভারতেও আধুনিক য়ুরোপে মানসবিচরণ। রবীন্দ্রনাথের কল্পনা ও স্বপ্ন বিজড়িত শোনা-প্রাচীনভারত ছিল

মহিমায়, সৌন্দর্যে এবং ধর্মের, ক্ষমার, প্রেমের, মানবতার ও মহত্ত্বের ঐশ্বর্যে অনন্য ও অসামান্য। তাই এ মোহের স্বর্গে তাঁর আমরণ ছিল আনন্দ বিচরণ। তাঁর এ মোহ নিতান্ত স্থূল ও অযৌক্তিকভাবে তাঁর বাস্তব জীবনকেও করেছিল প্রভাবিত। শহুরে জমিদারনন্দন বিলেতফেরত রবীন্দ্রনাথ তাই উষর গাঁ ভুবনডাঙায় পাতেন ডেরা, খোলেন খোলা আকাশের নীচে গাছ তলা সম্বল প্রথমে কেবল ব্রাহ্মের জন্যে, পরে বর্ণহিন্দুর জন্যেও ১৯০১ সনে ব্রহ্মবিদ্যালয় বা ব্রহ্মচর্যাশ্রম বিদ্যালয়—বিশ শতকে তাঁর আদর্শ ব্যবহারিক সভ্যতার শৈশব কালে সম্পদরিক্ত অক্ষম মানুষের বাহুল্য-বর্জিত শীত-গ্রীষ্ম-বর্ষার পীড়ন-কাতর আরণ্য ঋষির প্রকৃতি-নির্ভর জীবনযাত্রা ও আশ্রম নামের পর্ণকুটীর। অথচ শিক্ষা দানের ও গ্রহণের বিষয় ছিল একালের বিদ্যালয় পাঠ্য-বিষয়গুলোই—মানচিত্র, ব্ল্যাকবোর্ড, খাতা-কলম, মুদ্রিত বই যার আবশ্যিক অঙ্গ, সে কারণেই ছাদযুক্ত ঘর একান্ত প্রয়োজনীয়।

এদিকে সমকালের য়ুরোপীয় দর্শনে-বিজ্ঞানে, সাহিত্যে-শিল্পে, উদ্ভাবিত যন্ত্রে ও কৃৎকৌশলে, আবিষ্কৃত তথ্যে তাঁর আকর্ষণ ছিল গভীর, পরিচয়ও ছিল নিবিড়, আর প্রভাব তো ছিল প্রায় অশেষ।

অঙ্গে বা অন্তরে একালের য়ূরোপীয় সাহিত্যে-শিল্পে-সঙ্গীতে-দর্শনে রাজনীতিতে কিংবা শিক্ষায়-সংস্কৃতিতে নেই বা অজ্ঞাত তেমন কিছু রবীন্দ্র চিন্তায়-চেতনায় সাহিত্যে-শিল্পে আমরা খুঁজে পাইনে। তবে যন্ত্রে ও কৃৎকৌশলের ক্ষেত্রে এ কালের জাপানীদের মতোই অনুকৃতির ও অনুসৃতির তথা স্বীকরণের, আত্মীকরণের বা স্বাঙ্গীকরণের বিস্ময়কর অনন্য অসামান্য শক্তিরই—যা রূপে ও নামে এবং অঙ্গে ও অন্তরে মৌলিক হয়েই প্রতিভাত—পরিচয় মেলে তাঁর সাহিত্য-শিল্প-সঙ্গীতের ও মনন-চিন্তনের ধারায়।[৮] তবু তাঁর ভাব-চিন্তা-কর্ম-আচরণে তাঁর য়ূরোপ-চেতনার ও প্রাচীন ভারত-চিন্তার সমন্বয় ঘটেনি কখনো। প্রাচ্য প্রতীচ্য, প্রাচী-প্রতীচী তেল-জলের মতোই অবিমিশ্র ও অসমন্বিত রয়েইছে—সূক্ষ্ম তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তা পষ্ট হয়ে ওঠে। বাস্তবে রবীন্দ্রচিন্তার ও রবীন্দ্রমনীষার অনেক অসঙ্গতির কারণ এ-ই।

রবীন্দ্রচরিত-মানস জানবার বুঝবার জন্যে আরো কিছু আপাত তুচ্ছ বিষয় মনে রাখা জরুরি :

উনচল্লিশ বছর বয়সে প্রাচীন ব্রাহ্মণ্য পৌরাণিক ঘটনা নিয়ে এবং বৌদ্ধ, রাজপুত, মারাঠা ও শিখ ইতিবৃত্ত-উপকথা নিয়ে তিনি কথা ও কাহিনী কাব্য রচনা করেন। কিন্তু সাড়ে সাত'শ বছরের পুরোনো দেশজ কিংবা বিদেশাগত দরবেশ বা শাসক মুসলিমের কোন ব্যক্তিগত কৃতি কিংবা গুণ–মান-মাহাত্ম্য তার কাব্য প্রেরণার উৎস হয়নি। এমন কি আকবর বাদশাহ কিংবা মঈনউদ্দীন চিশতি, রাজিয়া আনারকলি-নূরজাহানও নন। ছয়শ' বছর ধরে প্রবল প্রতাপ এমন এক বিদ্যা-ও বিত্তবান জ্ঞান-কৃতি-কীর্তি বহুল জাতির বা সম্প্রদায়ের কিছুই তাঁর [তাজমহলই ব্যতিক্রম] আবেগ উদ্রিক্ত করতে পারেনি, এতে মনে হয় বিদেশাগত এ শাসকগোষ্ঠীর প্রতি তাঁর অন্তরের গভীরে প্রচণ্ড ঘৃণা-বিদ্বেষ বা স্থায়ী অশ্রদ্ধা ছিল—অথচ শাসক ইংরেজের প্রতি তাঁর এ বিদ্বেষ দেখা যায় না, বরং বড়ো ইংরেদের প্রতি ছিল তাঁর অন্তরের গভীরে প্রচণ্ড ঘৃণা-বিদ্বেষ বা স্থায়ী অশ্রদ্ধা ছিল—অথচ শাসক ইংরেজের প্রতি তাঁর এ বিদ্বেষ দেখা যায় না, বরং বড়ো ইংরেজের প্রতি ছিল তাঁর অপরিমেয় অনুরাগ ও গভীর আস্থা আর নিবিড় শ্রদ্ধা। তাঁর রাজনীতি বিমুখতা, দেশের স্বশাসন ও স্বাধিকার প্রতিষ্ঠার আগ্রহাভাব, স্বাধীনতা আন্দোলনে নিরুৎসাহ প্রভৃতির কিছু কারণও জমিদার কবির ওই ইংরেজপ্রীতি। ঘরে বাইরে ও চার অধ্যায় এবং কিছু প্রবন্ধ এ সূত্রে স্মর্তব্য। স্বশাসন ও স্বাধিকার প্রতিষ্ঠায় রবীন্দ্রনাথের আগ্রহ ছিল না,

ব্রিটিশের সুশাসন ও সুপোষণের প্রত্যাশী ছিলেন তিনি। রাজকুটুম্ব, ঘুষোঘুষি, স্বদেশী সমাজ প্রভৃতি প্রবন্ধ স্মর্তব্য।

মনে রাখতে হবে জালিয়ানওয়ালা বাগের হত্যাকাণ্ড তাকে 'নাইটহুড' ত্যাগের মতো বিচলিত করেনি, ভিতরকার চাপে সিদ্ধান্ত নিতে তার ছেচল্লিশ দিন লেগেছিল। চল্লিশ বছর বয়স্ক কবি সম্রাজ্ঞী ভিক্টোরিয়ার মৃত্যুতে রাজভক্তির প্রতীক মাতৃশোকাচ্ছ্বাস রচনা করেন, 'নাইট উপাধি পেয়ে আনন্দিত ও ধন্য হন। এবং 'বঙ্গভঙ্গ' রদ করায় সম্রাট পঞ্চম জর্জের উদ্দেশে ভারতীয় হিন্দুর পক্ষে কৃতজ্ঞ কবি উচ্ছ্বসিত ভাষায় 'জনগণমন অধিনায়ক' প্রশস্তিটি ১৯১১ সনে রচনা করেন।[৮]

এ-ও লক্ষণীয় যে গদ্যে পদ্যে কোন রূপক সাংকেতিক রচনায় রবীন্দ্রনাথ রাজা-রানীর নীচে নামেননি। তাঁর গল্পে উপন্যাসেও নেই গণমানব, রথের রসিতে কিংবা কালের যাত্রায়ও ছিল না জনগণের বুদ্ধিবিবেচনার প্রতি আস্থা। রক্তকরবীতেও রাজা ও রাজধ্বজা স্থানচ্যুত হয় বটে, কিন্তু সংখ্যায় চিহ্নিত মজুরের স্বাধিকার কিংবা মর্যাদা প্রতিষ্ঠিত হয় না। নাটকটির হাওয়াই তত্ত্বে ঘটে পরিসমাপ্তি। এতেই বোঝা যায় তাঁর মনের গভীরে ছিল সামন্ত দাপটের মোহ। ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদীরা যেমন ভারতীয়দের শিক্ষিত ও সংস্কৃতিবান মানুষ করার মহান দায়িত্ব গ্রহণের ও পালনের গৌরব সগর্বে ঘোষণা করত, রবীন্দ্রনাথও তেমনি মহুয়া কাব্যের সাগরিকা কবিতায় স্বজাতির সে-ঐতিহ্য স্মরণ করে আনন্দিত ও গর্বিত হয়েছেন। বোঝা যায় উপনিবেশবাদে (colonialism) তাঁর ঘৃণা ছিল না।

বঙ্কিমচন্দ্র প্রমুখদের মতো রবীন্দ্রনাথও সমাজে সাধু-সন্ন্যাসীকে বিবেকবান সাহসী সৎলোক বলে জানতেন, কোন গৃহী-গৃহস্থ মানুষ, বিষয়ী মানুষ সৎ, বিবেকবান, পরার্থপর, সাহসী ত্যাগবীর হতে পারে না। কাজেই সাধারণ মানুষের মহত্ত্ব-মহিমা সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথের ধারণাও উঁচু ছিল না, যদিও ক্বচিৎ ব্যতিক্রম লক্ষ্য করা যায়।

উপন্যাসে তো রাজা-সামন্ত-জমিদার ও উচ্চমধ্য শ্রেণীর বুর্জোয়ার নীচে নামেনইনি, গল্পেও 'শাস্তি'র মতো নিরক্ষর চাষী-মজুর শ্রেণীর জীবন কথা দুর্লভ। গল্পে প্রধানত বাহ্য আচরণ কিংবা ঘটনা বিভিন্ন অবস্থানের ব্যক্তি মনে যে ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করে তারই রূপ-স্বরূপ মনোবিজ্ঞানের ধারায় চিত্রিত করার প্রয়াসী ছিলেন প্রজ্ঞাপুষ্ট রবীন্দ্রনাথ। তাঁর শেষ এবং অন্যতম শ্রেষ্ঠগল্প 'ল্যাবরেটরী'।

সামন্ত-জমিদার-বুর্জোয়ার মিশ্র পরিবেশে তাঁর কৈশোর অতিবাহিত বলেই সম্ভবত অমিতশক্তিও মনীষাধর হয়েও ভাববাদী রবীন্দ্রনাথ রোমান্টিক জীবনবিলাসী। উদার মানবতা কিংবা মহৎ আদর্শচেতনা ওই রোমান্টিক জীবনদৃষ্টির উপজাত— অনুশীলনজাত নয়। জমিদার রবীন্দ্রনাথের নয় কেবল, ঠাকুর স্টেটেরই দান-ধর্মের কোন ঐতিহ্য নেই। এমন কি সা'জাদপুরে, শিলাইদহে কিংবা পতিসরে প্রাথমিক বিদ্যালয়ে, সেতু নির্মাণে, খাল খননে, বাঁধ তৈরিতে অথবা অনাথাকে ভাতা দানের সুনাম নেই কোথাও। বরং হুমকি অগ্রাহ্য করে কাঙাল হরিনাথ মজুমদার 'গ্রামবার্তায়' তাঁদের অত্যাচারের, গাঁ জ্বালিয়ে দেয়ার বর্ণনা ছেপেছিলেন।[৯] অবশ্য রবীন্দ্রনাথের সারাজীবনের কর্মে আচরণে স্পষ্টই প্রমাণিত হয়েছে যে তাঁর বৈষয়িক জীবনে কবিসুলভ কোন সারল্য বা দুর্বলতা কিংবা অসতর্ক ঔদাসীন্য ছিল না, তাই শেষাবধি কেবল তাঁরই বাড়িঘর ও জমিদারীই অটুট ছিল। বিয়য়ী রবীন্দ্রনাথ স্থির বুদ্ধির ও ধীর বিশ্বাসের মানুষও ছিলেন। একক প্রয়াসে প্রযত্নে গাঁয়ের প্রাথমিক বিদ্যালয়কে বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ে উন্নীত করা কিংবা সুরুলে কৃষি খামার শ্রীনিকেতন প্রতিষ্ঠা করা অথবা কৃষিব্যাংকের মাধ্যমে

সমবায় ব্যবস্থায় কৃষকদের আর্থিক উন্নতি সাধন প্রয়াস পরহিতব্রতী কর্মযোগী রবীন্দ্রনাথের পরিচায়ক।

রবীন্দ্রনাথ বিরূপ সমালোচনাও সহ্য করতে পারতেন না, প্রতিবাদ করার লোক পাওয়া না গেলে বেনামে লিখে তিনি আত্মপক্ষ সমর্থন করতেন। রবীন্দ্রানুরাগী ও রবীন্দ্রস্নেহভাজন অন্নদাশঙ্কর রায় বলেছেন, রবীন্দ্রনাথ তাঁর ত্রুটি-নিন্দা-কলঙ্কের সাক্ষ্য প্রমাণ সতর্ক প্রয়াসে অপসারিত বা বিনষ্ট করতেন। তা সত্ত্বেও তাঁর ঘনিষ্ঠ সম্পর্কের সুশোভন সরকার তাঁর প্রণাম-প্রীতিরূপ দুর্বলতার কথা বলে গেছেন। তাঁর সেজো ভাইয়ের পৌত্র সুভোঠাকুর [সুভগেন্দ্রনাথ ঠাকুর] জমিদারী পরিচালনায় তাঁর স্বার্থবুদ্ধির কথা বর্ণনা করেছেন।[১০] চুয়াল্লিশ বছর অপগত, ভক্ত অনুরক্তের সংখ্যা হ্রাস পাচ্ছে, শিগগির শূন্য হয়ে যাবে। তখন নতুন প্রজন্মের মানুষ রবীন্দ্রনাথ সম্বন্ধে ভালো-মন্দ-মাঝারি যে-কোন তথ্য-প্রমাণ পেলেই তা জনসমক্ষে তুলে ধরবে, তখন রবীন্দ্র মূল্যায়ন হবে নিরপেক্ষ। জীবন-দৃষ্টির ও ন্যায় চেতনার পার্থক্য অবশ্য সেই নিরপেক্ষ পরিমাপেও থাকবে। ফলে মাপে ও মাত্রায় ঘটবে বৈচিত্র্য।

দেখা যাচ্ছে, রবীন্দ্রনাথে নাট্য প্রবণতাই ছিল অধিক। তাঁর কাব্য রচনা সংলাপ দিয়েই শুরু এবং গীতি-নৃত্যনাট্যে শেষ। কাবিকাহিনী, ভগ্নহৃদয় ও শেষের দিককার নৃত্যনাট্যগুলো স্মর্তব্য। তিনি জীবনে বহুবার এক নাটক ভেঙে দু'তিন নাটক করেছেন, উপন্যাসকে, কবিতাকে নাটক কিংবা নৃত্যনাট্য বানিয়েছেন, কাব্যনাট্য ও নাট্যকাব্য লিখেছেন। এ দিক দিয়ে বিচার করলে তিনি নাটক লিখেছেন বেশি, তুলনায় কবিতা কম। সঙ্গীতে ঐশ ও ঋতু সঙ্গীতই বেশি, স্বদেশ স্বজাতি প্রেমমূলক গান তুলনায় নিতান্ত কম। অধিকাংশই ১৯০৫-০৭ সনের হুজুগে রচনা, প্রেমগানে ও ব্রহ্ম বা পূজা সঙ্গীতে পার্থক্য সামান্য, সাদৃশ্যই বেশি। তাছাড়া ভাষা, ভঙ্গি, সুর ও বক্তব্যগত টুকুরো পৌনঃপুনিকতা রয়েছে অনেক। কোন কোন গানে লৌকিক প্রেম আকস্মিকভাবে ভগবৎ প্রেমে উত্তীর্ণ, ভূমির কথা সহসা ভূমায় অবসিত। বলতে গেলে রবীন্দ্রনাথ নাটক ও কবিতাই লিখেছেন সযত্নে ও সোৎসাহে, ফাঁকে ফাঁকে লিখেছেন গান, উপন্যাস, ভ্রমণবৃত্তান্ত ও প্রবন্ধাবলী। তিনি মূলত কবি-নাট্যকার। ক্ষুদ্র-বৃহৎ উপন্যাসও কম [সংখ্যায় ১৩] বলা যাবে না, গল্প সংখ্যায় শত অতিক্রম করলেও এবং প্রতিভাদীপ্ত হলেও তুলনায় কম। সাহিত্যিক ও সমাজ-ব্যক্তিত্ব হিসেবে এবং ব্রাহ্মনেতা ও পুরোহিত হিসেবে তাঁকে অজস্র পত্রাবালী। ওইগুলো বস্তুত আর এক জগৎ। বলা চলে জীবনের টীকা-ভাষ্য। এভাবে তাঁর সুদীর্ঘ জীবনে তাঁর লেখার সামষ্টিক, সামূহিক ও সামগ্রিক কলেবর হয়েছে বিপুল-বিশাল। পাঠক তাই বিব্রত, বিমুগ্ধ এবং প্রায়শই দিশেহারা, ফলে তাঁর রচনা-সমুদ্র সাঁতরানো কিংবা তার পরিমাপ পাওয়া অনেকের পক্ষেই অসম্ভব। দুঃসাহসী দৃঢ়প্রতিজ্ঞও প্রায়ই দিকপাশ বিভ্রান্ত হয়েও স্বসিদ্ধান্তের নিভুলত-গর্বে স্বস্তিসুখ পায় মাত্র। এ সুবিশাল রচনায় কিছু কৃত্রিম কিছু অকৃত্রিম, কিছু বুকের কিছু মুখের, অনেকটা আবেগের কিয়দংশ স্থির মননের বক্তব্যের বহুলাংশ তত্ত্বের, অনেকাংশ আবেগের এবং বেশ খানিকটা বাস্তবের দান।

রবীন্দ্রনাথ মূল্যত কি বা কে?—নাট্যকার, কবি, কথাকার, চিত্রী, প্রবন্ধকার, ব্রাহ্মসমাজপতি ও পুরোহিত, বাঙালী বা ভারতীয় মনীষী বা চিন্তানায়ক কিংবা দেশকালাতীত বিশ্ব সাহিত্য-শিল্প-মনীষার প্রতিভূ? রাগ-বিরাগ কিংবা ভক্তি-অনুরক্তি মুক্ত চিত্তে নিঃসংকোচে জ্ঞান-বুদ্ধি-বিবেক ও জীবনদৃষ্টি যোগে রবীন্দ্র সাহিত্য-শিল্প-সঙ্গীত নিরীক্ষণ, পরীক্ষণ ও বিশ্লেষণ করে দেখার-দেখানোর, জানার-জানানোর এবং বোঝার বোঝানোর সময় এসেছে নিশ্চয়ই রবীন্দ্র প্রয়াণের পরেরকার দ্বিতীয় প্রজন্মের একালে। এতে রবীন্দ্রনাথের গুণ-মান-

মাহাত্ম্য কমবে না, বরং সঠিক মূল্যায়নে মহাকাল প্রবাহে তাঁর স্থিতি সুদৃঢ় ও সুনিশ্চিত হবে শেক্সপীয়ারের মতো।

নাটকের বিষয়ও নয়, ভাষা ভঙ্গি কিংবা আঙ্গিকও নয়, শেক্সপীয়ারকে অমর-অজর-অটল রেখেছে ও তাঁর রচনাকেও পাঠযোগ্য ও দর্শন সুখকর রেখেছে বিভিন্ন অবস্থায় ও অবস্থানে মানব-মনের ও আচরণের ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া জানা-বোঝার ও প্রকাশের অনন্য অসামান্য শক্তির, মনীষার ও প্রজ্ঞার জন্যেই। অমিত শক্তিধর রবীন্দ্রনাথেও ছিল versatility, অতুল্যতা ও অসামান্যতা, যুক্তির ও যন্ত্রের দ্রুতবর্ধমান এ যুগেও মানবতার বিকাশকামী সামন্তসুখ প্রবণ ভাববাদী রোমান্টিক উদার উদার বুর্জোয়া রবীন্দ্রনাথ সুখ-স্বস্তি-সমবেদনা ও আনন্দকামী মানুষের কর্মহীন নিঃসঙ্গ নিভৃত জীবনের উদাসমুহূর্তের আন্তর-সঙ্গী হয়ে যে থাকবেন কবিতার ও গানের ভুবনে আরো অন্তত শতাব্দী-উর্ধ্বকাল-তা বোধ হয় নিঃসংশয়ে বলা চলে। এ নিঃসঙ্গ নিভৃত অনুভবের জগতেই তার কাঙ্ক্ষিত ও প্রত্যাশিত পরিচিতি 'আমি তোমাদেরি লোক। সেই পরিচয় মোর সত্য হোক'—বাস্তব হয়ে থাকবে, অবশ্য কালান্তরেও যদি তাঁর রচনাবলী লোকের হাতের কাছে থাকে। আর তারা যদি আজকের মতো আগ্রহে পড়ে।

রবীন্দ্রনাথ জন স্টুয়ার্ট মিলের [১৮০৬-৭৩] পঞ্চান্ন বছর বছর এবং কার্লমার্কসের [১৮১৮-৮৩] তেতাল্লিশ বছর পরে জন্মেছিলেন, কৌতূহল থাকলে কৈশোরে লণ্ডনে তাঁকে দেখতেও পেতেন। তবু এঁদের কোন প্রভাব পড়েনি তাঁর ওপর। যদিও রবীন্দ্রনাথ 'সামান্য ক্ষতির গভীরতা, চণ্ডালিকার অপমান, উপেনের সর্বনাশ, পাতালপুরীর মজুরদের দুঃখ, রথের রশিওয়ালাদের গণদাবি, অচলায়তনের ক্ষতি, মুক্তধারার প্রয়োজন জানতেন ও বুঝতেন এবং বুয়র যুদ্ধে ব্রিটিশ বর্বরতায় ক্ষুব্ধ হয়েও, চীনের আফিম যুদ্ধের নিন্দা করেও, রাশিয়ায় রুশ-বিপ্লবের কার্যকারিতা প্রত্যক্ষ করেও মানুষের জীবন-জীবিকা ক্ষেত্রে ক্ষুৎ-পিপাসার সাম্য কিংবা ক্ষুধা-তৃষ্ণা পূরণের মৌল মানবিক অধিকার না হোক জৈবিক প্রয়োজনও উপলব্ধি করেননি। তাই তিনি যখন চাষী-মজুরের চাষী-মজুর কবির জন্যে, [যে আছে মাটির কাছাকাছি] তেমন কবির বাণীর জন্যে কান পেতে আপোস করেন তখন তা বিদ্রূপ কি সৌজন্য বোঝা যায় না। তাই আমৃত্যু তাঁর আস্থা রয়ে গেল লোকোপকারের সামন্তসনাতন পন্থায় অর্থাৎ দান-অনুদানে, দয়া-দাক্ষিণ্যে, কৃপা-করুণায় ব্যক্তিগত বা যৌথভাবে লোকহিত করার রীতিতে পারত্রিক পুণ্যার্জন লক্ষ্যে। এমনকি তিনি জমিদারীপ্রথা উচ্ছেদেরও ছিলেন ঘোর বিরোধী, বলেছেন জমিদারী উঠে গেলে গাঁয়ের লোকেরা জমি নিয়ে লাঠালাঠি কাড়াকাড়ি ও হানাহানি করে মরবে। [প্রমথ চৌধুরীর রায়তের কথার ভূমিকা দ্রষ্টব্য][১১] বাস্তব জীবনের রূঢ় চাহিদার গুরুত্ব ভোলানোর জন্যে তিনি বাঁধা কয়েকটি শ্লোক উচ্চারণ করে আধ্যাত্মিক বাতাবরণ সৃষ্টি করে পাঠককে আকাশচারিতায় করতেন উৎসাহিত। 'এ বিশ্বেরে দেখি তার সমগ্র স্বরূপে—এ হচ্ছে কবির বাস্তবে অসফল কাকাঙ্ক্ষার কথা। বস্তুত পঞ্চাশ বছুরে প্রৌঢ় হওয়া অবধি কলমের ডগায় দু'চারটে মহৎ কথা কিংবা সত্য কথা ফাঁকে ফুকুরে খসে পড়লেও কিংবা মুখ থেকে ফসকে বের হলেও রবীন্দ্রনাথ ছিলেন প্রায় সবদিক দিয়েই তাঁর জ্যেষ্ঠ সমকালীন নাস্তিক মুক্তবুদ্ধি অনন্য বিদ্যাসাগরের চেয়ে অনেক কম প্রগতিশীল, বঙ্কিমচন্দ্রের চেয়েও বেশি রক্ষণশীল ও অনুদার। আমাদের মনে হয় সামগ্রিকভাবে জীবনভাবনার ও জগৎচেতনার ক্ষেত্রে বঙ্কিমচন্দ্র রবীন্দ্রনাথের চেয়ে প্রাগসর ও উঁচুমানের চিন্তা-চেতনার অধিকারী ছিলেন। লোকরহস্য, কমলাকান্তের দপ্তর ও বিভিন্ন প্রবন্ধবলীই তার প্রমাণ।

নোবেল পুরস্কারের মান রক্ষার খাতিরেই রবীন্দ্রনাথকে বৈশ্বিক ও বিশ্বমানবিক চিন্তা-চেতনার অনুশীলন করতে হয়েছে। তাঁর দীর্ঘায়ু তাঁকে এ সুযোগ-সৌভাগ্য দিয়েছে। পুরস্কার প্রাপ্তির পরে তিনি সুদীর্ঘ আটাশ বছর বেঁচে ছিলেন, তার আগে বাল্য-কৈশোরের যৌবনের মধ্যবয়সের জীবনদেবতা চালিত কাঁচা-পাকা লেখায় উনিশ শতক ও এ শতকের এক দশক কেটেছে বটে, প্রায় সমসংখ্যক বছরব্যাপী, কিন্তু পরিচ্ছন্ন ও পরিপক্ব জ্ঞান-প্রজ্ঞা, মন-মনন এবং মনীষা ও নৈপুণ্য নিয়ে বিশ্ববোধ অন্তরে জাগ্রত রেখে লিখেছেন জীবনের স্বর্ণযুগে আটাশ বছর ধরে। বলতে গেলে পুরস্কার পূর্বকালের রবীন্দ্রনাথ ছিলেন উনিশ শতকী কবি আর পুরস্কার-উত্তর কালের রবীন্দ্রনাথ হলেন বিশ শতকের মনীষী মানুষ। সঙ্গীত ও কবিতা ক্ষেত্রে না হলেও অন্যান্য রচনায় উঁচুমানের চিন্তা-চেতনার, ঐহিক চেতনার, উদার মানবতার, বৈশ্বিক অনুভাবের ও আন্তর্জাতিক অভিন্ন মানব-লক্ষ্যের স্বাক্ষর ও সাক্ষ্য রয়েছে, আঙ্গিক ও ভাষিক উৎকর্ষও লক্ষণীয়। এ সব রচনার আবেগ স্বল্প। এ সময়কার কবিতাও তাই প্রায়ই জীবনদেবতা ও ঈশ্বর নিরপেক্ষ ঐহিক এবং ভাষায়, ছন্দে, আঙ্গিকে, বিষয়ে ও বক্তব্যে নতুন। প্রধান জিজ্ঞাসার বিষয় তাই মানুষের জন্ম, জীবন, মৃত্যু, সমাজ, ধর্ম, আদর্শ ও পরিণাম চেতনাই মুখ্য তাঁর গদ্য ও পদ্য রচনায়। এ সব কবিতা আবেগ-অনুভূতি প্রধান নয়, মনীষাদীপ্ত ও দার্শনিক তত্ত্বপ্রধান, ইতিহাসচেতনাপুষ্ট ও বৈজ্ঞানিক তথ্যঋদ্ধ সত্যোপলব্ধি মাত্র। তখন তিনি কবি-দার্শনিক নন দার্শনিক-কবি, জার্নাল রচক অভিজ্ঞতাঋদ্ধ জার্ণালিস্ট, বেত্তা ও বক্তা। মুখ্যত মনীষী, গৌণত কবি। কবি ও গল্পলেখক হিসেবেই তিনি পাঠকপ্রিয় হলেও, তাঁর গানের প্রভাবও শ্রোতাচিত্তে গভীর, আর তাঁর নাটক, উপন্যাস এবং প্রবন্ধও করেছে জনচিত্ত প্রভাবিত। শেষাবধি তাঁর মনীষাদদীপ্ত লেখাই তাঁকে বিশ্বের অন্যতম কবি-মনীষীর আসনে প্রতিষ্ঠিত করেছে। যদিও য়ুরোপে ইদানীং তিনি অপঠিত ও বিস্মৃত। তার প্রবন্ধগুলো আবেগজড়িত ও উপমাদি আলঙ্কারিক যুক্তি খচিত বলে পাঠককে আবিষ্ট করে বটে, তবে তাঁর সিদ্ধান্ত ক্বচিৎ ন্যায়-নির্ভর।

অতএব, রবীন্দ্রনাথ সম্বন্ধে ব্যক্ত-অব্যক্ত, সত্য-মিথ্যা, লঘু-গুরু অনেক অনুযোগ অভিযোগ রয়েছে। খোঁজও মিলেছে তাঁর রচনায় অনেক অপূর্ণতার ও ত্রুটির। সবচেয়ে বড় ক্ষোভ-অভিযোগ এ যুগের পাঠকের তাঁর বিরুদ্ধে তিনি গণ-মানবের কল্যাণকামী ছিলেন না, ছিলেন না দেশকালানুগ সামাজিক রাষ্ট্রিক আর্থিক সাংস্কৃতিক জীবনের চাহিদা ও সমস্যা সচেতন। তাঁর কাছে যা বাঞ্ছিত ছিল যা প্রত্যাশিত ছিল তা মেলেনি। সামন্ত-জমিদার বেণে-বুর্জোয় ঘরে তাঁর জন্ম, এতো বড়ো মনীষার ও মনস্বিতার অধিকারী হয়েও বিদ্যা ও ভ্রমণযোগে সমকালীন বিশ্বসমস্যা উপলব্ধি ও সমাধান অনুমান করেও তিনি সেই সামন্ত-জমিদার-বেণে মানস পরিবেষ্টনী পরিহার করে দেশের, কালের ও মানুষের চিন্তানায়ক হতে পারলেন না। আমৃত্যু তাঁর মানসের মৌল পরিবর্তন হয়নি জীবনের কোন ক্ষেত্রেই। তাঁর জীবনরস ও জগৎদৃষ্টি এই শিকড়ই সরবরাহ করেছে। আফসোস এখানেই।

তাঁর লঘু-গুরু ত্রুটি-বিচ্যুতি, মন-মননের সীমাবদ্ধতা বিমুগ্ধ বিমূঢ় ভক্ত-অনুরক্তেরা এতো কাল চেপে রেখেছেন, অন্য কেউ উচ্চারণ করতে চাইলেও মারমুখো হয়ে উঠেছেন। প্রমাণ ষাটের দশকে বুদ্ধদেব বসুকে এবং ইদানীং সুশোভন সরকারকে ও সুভোঠাকুরকে অনেক গালমন্দ শুনতে হয়েছে। আর পঞ্চাশের দশকে কম্যুনিস্টরাও হয়েছিল নিন্দিত রবীন্দ্র বিরোধিতার জন্যে। রবীন্দ্রোত্তর তৃতীয় প্রজন্মেও যদি আমরা রবীন্দ্র মূল্যায়নে কেবল আবেগকেই প্রশ্রয় দিই, অনুরাগ সম্বল আলোচনায় মত্ত থাকি, তা হলে আমাদের সাহিত্য-

শিল্পরুচির বিকাশ ও উৎকর্ষই কেবল ব্যাহত হবে, আমাদের মন-বুদ্ধি-রুচি, জ্ঞান-প্রজ্ঞা-মনীষা থাকবে বন্ধ্যা, অথচ রবীন্দ্রনাথের গুণ-মান-মাহাত্ম্য, তাঁর সাহিত্য-শিল্পের মূল্য-মর্যাদা তাতে বৃদ্ধি পাবে না কখনো, এবং তাঁর রচনার বহুলাংশের উপযোগরিক্ততা, কালিক ম্লানিমা, জীর্ণতা ও বিনাশ-বিস্মৃতিও রোধ করা যাবে না।[১২] রবীন্দ্রনাথেরও ভাব-ভাষা-ছন্দ-ভঙ্গি, বানান-বাক্য-বক্তব্য সব কিছুই একদিন হয়ে যাবে অশ্রদ্ধেয় সেকেলে। যেমন শিক্ষক-শিক্ষার্থীর ক্লাশরুমের বাইরে মধুসূদন বিস্মৃত এবং তাঁর রচনাবলী অপঠিত। যদিও এ মুহূর্তে রবীন্দ্রনাথ সম্বন্ধে এ সত্য অভাবিত, কেননা আমাদের আবেগ-আচ্ছন্ন চোখে তিনি ভারতচন্দ্রের ভাষায় :

'কবিতা কমলে তুমি রবি মহাশয়
নরলোকে সম নাহি দেবলোক কয়।'

কিন্তু সমাজ পরিবর্তন যাদের লক্ষ্য, যারা গণমানবের আর্থ সামাজিক মুক্তি অর্জনে অঙ্গীকারাবদ্ধ, সাহিত্য-শিল্পের উপযোগ-বৃদ্ধি বিস্মৃত হলে, তাদের চলে না। তবে স্রষ্টা রবীন্দ্রনাথকে এবং বিষয়ী ও সমাজ-সদস্য ব্যক্তি রবীন্দ্রনাথকে সব সময়ে অভিন্ন করে দেখা অযৌক্তিক ও অসঙ্গত।

তথ্য-নির্দেশ

১. খ্রীস্টান মাইকেল মধুসূদন দত্তই বাঙালীর মধ্যে কোলকাতায় প্রথম স্যুট পরেন।

২. (a) Tagore without Illusions, by Hitendranath Mitra, 1983, chapters one & two.
(b) দ্বারকানাথ ঠাকুর—বিস্মৃত পথিকৃৎ—কৃষ্ণকৃপালিনী। ক্ষিতীশ রায় অনূদিত, ১৯৮৪, দ্বারকানাথের কর্ম ও পরিচিতিমূলক কাগজপত্র রবীন্দ্রনাথই নাকি স্বয়ং স্বহস্তে নষ্ট করেছিলেন। এ-গ্রন্থেই তা বলা হয়েছে।

৩. বাঙলার জাগরণ—কাজী আবদুল ওদুদ।

৪. রবীন্দ্র বর্ষপঞ্জী—প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়, ১৯৬২ পৃ.৪৩।

৫. রবীন্দ্রনাথ ও উপনিষদের কিছু বাণী : কল্যাণকুমার দত্ত। "লেখক সমাবেশ" ৫ম বর্ষ ৪র্থ সংখ্যা, ২য় পক্ষ—ডিসেম্বর ১৯৮৪।

৬. কিন্তু এর প্রত্যেকটির সঙ্গেই পাশ্চাত্য রেনেসাঁসের মানবতন্ত্রী মনোভাবের সুগভীর আত্মীয়তা আছে : 'অন্নদাশঙ্করের রবীন্দ্র-ভাবনা' সত্যেন্দ্রনাথ রায়, জিজ্ঞাসা, ৫ম বর্ষ, ১ম সংখ্যা ১৩৯১, পৃঃ ৩৫।

৭. Ibid : Hitendmath Mitra, p. 156, [and chapter five)

৮. ১৯১১ সনেই ২৭তম কংগ্রেস অধিবেশনে কলকাতায় গীত এবং ১৯১২ সনের জানুয়ারিতে ব্রহ্মসঙ্গীত রূপেও গীত হয়।

৯. গ্রামবার্তা পত্রের তথ্য অধ্যাপক আবুল আহসান চৌধুরী পরিবেশিত। চিঠির প্রতিলিপি সংশ্লিষ্ট হল।

শ্রদ্ধাভাজনেষু

স্যার, সালাম জানবেন। অসুস্থতার জন্যে আপনার চিঠির জবাব দিতে কয়েকদিন দেরী হলো। অনুগ্রহ করে মাফ্ করবেন আমাকে।

ঠাকুর জমিদারদের প্রজাপীড়নের সংবাদ কাঙাল হরিনাথের 'গ্রামবার্তা প্রকাশিকা'র কোন বর্ষ কোন সংখ্যায় প্রকাশিত হয়েছিল তা আমার সঠিক জানা নেই। আমাদের কাছে 'গ্রামবার্তা'র যে ফাইল আছে, তাতে এই সংবাদ নেই। প্রজাপীড়নের এই সংবাদ-সূত্রটি পাওয়া যায় কাঙাল-শিষ্য ঐতিহাসিক অক্ষয়কুমার মৈত্রেয়র একটি প্রবন্ধে। কাঙালের মৃত্যুর পর

অক্ষয়কুমারের এই প্রবন্ধটি সুরেশচন্দ্র সমাজপতি সম্পাদিত 'সাহিত্য' পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছিল। এই প্রবন্ধে মৈত্রেয়বাবু কাঙাল হরিনাথের সংবাদপত্র পরিচালনায় সততা ও সাহসের পরিচয় প্রসঙ্গে প্রজাপীড়নের সংবাদ 'গ্রামবার্তায়' প্রকাশের উল্লেখ করেন। ঠাকুর-জমিদারদের অত্যাচার সম্পর্কে হরিনাথ নিজে অক্ষয়কুমারকে যে পত্র লেখেন, তিনি এই প্রবন্ধে তা উদ্ধৃত করে দেন। এই প্রবন্ধ প্রকাশের ফলে রবীন্দ্রনাথ বিশেষ রুষ্ট ও অপ্রসন্ন হন এবং তাঁর অন্তরঙ্গ বন্ধু নাটোরের মহারাজা জগদীন্দ্রনাথ রায়কে বলে অক্ষয়কুমারের 'রানী ভবানী' গ্রন্থপ্রকাশের অর্থ-সাহায্যের প্রতিশ্রুতি প্রত্যাহার করান। কাঙাল-পুত্র সতীশচন্দ্র মজুমদার-সূত্রে জানা যায়, ঠাকুর-জমিদারদের প্রজাপীড়নের সংবাদ-প্রকাশের অপরাধে (?) তাঁরা লাঠিয়াল-গুণ্ডা লাগিয়ে কাঙালকে শায়েস্তা করার ব্যবস্থা নেন। এইসব ঘটনা ঠাকুর জমিদারীর ইতিহাসের দুঃখজনক কালো অধ্যায়'।

এ-ছাড়া অন্যত্র যেমন মীর মশাররফ হোসেন সম্পাদিত 'হিতকরী' পত্রিকায়, ঠাকুর-জমিদাররা যে প্রজাসাধারণের দুঃখ-কষ্ট মোচনে তেমন তৎপর ও মনোযোগী ছিলেন না তার ইঙ্গিত আছে। ঠাকুরবাবুরা তাঁদের জমিদারী এলাকায় গো-কোরবানী নিষিদ্ধ ঘোষণা করেন এবং এই নির্দেশ অমান্যকারীদের নানাভাবে নিগৃহীত হতে হয়। শিলাইদহ ঠাকুর-জমিদারীর এই ভূস্বামী-স্বার্থরক্ষার কৌশল-ব্যবস্থা ও প্রজাপীড়নের ঐতিহ্য চারপুরুষের, দ্বারকানাথ থেকে সুরেন্দ্রনাথ পর্যন্ত। কাঙাল হরিনাথের দিনলিপিতেও এর ইঙ্গিত মেলে।

শিলাইদহ জমিদারীতে রবীন্দ্রনাথের আমলেও কিছু অবাঞ্ছিত ও অপ্রীতিকর ঘটনা ঘটতে দেখা যায়। চরের মুসলমান প্রজাদের টিঢ করবার জন্য নমঃশূদ্র প্রজা এনে বসতি স্থাপনের সাম্প্রদায়িক-বুদ্ধিও রবীন্দ্রনাথের মাথা থেকেই বেরিয়েছিল। এ-ছাড়া পুত্র রথীন্দ্রনাথের নিরীক্ষামূলক শখের কৃষি-খামারের প্রয়োজনে গরীব মুসলমান চাষীর ভিটেমাটি দখল করে তার পরিবর্তে তাকে চরের জমি বরাদ্দের মহানুভবতাও রবীন্দ্রনাথ প্রদর্শন করেছিলেন। এ-সব কথা ও কাহিনী উক্ত জীবনীকারদের যত্ন ও সৌজন্যে চাপা পড়ে গেছে। সত্য ইতিহাসকে তুলে ধরতে গেলে অনেককেই হয়তো সাম্প্রদায়িক বা রবীন্দ্র-বিদ্বেষী শিরোপা, নয়তো সুভো ঠাকুরের ('বিস্মৃতিচারণার প্রতিক্রিয়া' দ্রষ্টব্য) মতো ধিক্কার ও তিরস্কার অর্জন করতে হবে।

ঠাকুর-জমিদারদের প্রজা-পীড়নের বিষয়ে আমি রবীন্দ্রনাথের শিলাইদহ জীবনের নিপুণ ভাষ্যকার শ্রীশচীন্দ্রনাথ অধিকারীকে (তিনি নিজে শিলাইদহবাসী ও ঠাকুর-এস্টেটের কর্মচারী ছিলেন এবং এই বিষয়গুলো জানতেন) চিঠিপত্রে নানা প্রশ্ন করে ছিলাম। তিনি এ-সব জিজ্ঞাসার জবাব এড়িয়ে ও অস্বীকার করে এই ধরণের কৌতূহলকে রবীন্দ্র-বিদ্বেষী বলে অভিহিত করেছিলেন।

উপরি-বর্ণিত বিষয়গুলোর কিছু কিছু তথ্য আমার সংগ্রহে আছে। আপনার প্রয়োজন হলে সেগুলো পাঠাতে পারি। আপনার নির্দেশের অপেক্ষায় রইলাম। এই বিষয়ে আপনি কোন প্রবন্ধ লিখেছেন কী না জানিয়ে বাধিত করবেন। আমার গবেষণার কাজ ('মীর মশাররফ হোসেনের শিল্পকর্ম ও সমাজচিন্তা') চালিয়ে যাচ্ছি। এ বছরের মধ্যে থিসিস জমা দেবো এমন আশা আছে। আমার লেখার কাজে আপনার প্রশ্রয় ও প্রেরণার কথা শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করি। আপনার জবাবের প্রত্যাশায় রইলাম। আন্তরিক শ্রদ্ধা ও সালাম জানিয়ে শেষ করি।

স্নেহসিক্ত,
আবুল আহসান চৌধুরী

১০. ক. রবীন্দ্রজন্মশতবর্ষোৎসব উপলক্ষে বিদেশে বুদ্ধদেব বসু তাঁর ভাষণে রবীন্দ্র সাহিত্যে য়ূরোপীয় প্রভাবের কথা বলে বাঙালীর তীব্র নিন্দা পেয়েছিলেন।

খ. অন্নদাশঙ্কর রায়ের উক্তিটি কোথায় দেখেছি, মনে পড়ছে না।

গ. সুশোভন সরকার ঃ রবীন্দ্রনাথ ও কিছু স্মৃতি, দেশ, ২৪শে এপ্রিল ১৯৮২।

ঘ. শারদীয়া দেশ, ১৩১১, সুভো ঠাকুর—বিস্মৃতিচারণা।

১১. প্রমথ চৌধুরীর 'রায়তের কথা' বইয়ের ভূমিকা।

১২. স্বয়ং রবীন্দ্রনাথই বলেন, "জীবনের আশি বছর অবধি চাষ করেছি অনেক। সব ফসলই যে মরাইতে জমা হবে তা বলতে পারি না। কিছু ইঁদুরে খাবে, তবু বাকি থাকবে কিছু। জোর করে বলা যায় না, যুগ বদলায়, তার সঙ্গে তো সবকিছু বদলায়। তবে সবচেয়ে স্থায়ী আমার গান, এটা জোর করে বলতে পারি। বিশেষ করে বাঙালীরা, শোকে দুঃখে সুখে আনন্দে আমার গান না গেয়ে তাদের উপায় নেই। যুগে যুগে এ গান তাদের গাইতেই হবে।" [লেখক সমাবেশ, ৫ম বর্ষ সংখ্যা-১৩, প্রথম পক্ষ মে ১৯৮৫, পরেশ ধর-উদ্ধৃত]। প্রথমত কালান্তরে গানের সুর, তাল বদলায় বলে প্রেমগানও বিলুপ্ত হয়, এ যাবৎ হয়েছে, কাজেই এক সময়ে রবীন্দ্র-সঙ্গীত শোনার লোক থাকবে না। শুনতে পাই নতুন প্রজন্মের কিশোর তরুণদের কাছে 'পপ'-ডিস্কোই' প্রিয়—রবীন্দ্র-সঙ্গীত নয়।

এখানে আরো কিছু সাক্ষ্য প্রমাণ উদ্ধৃত হল ঃ

লেখক সমাবেশ শারদীয়া ১৩৯২

'বিপ্লবদর্পণ : তলস্তয় ও রবীন্দ্রনাথ'—অশোক চট্টোপাধ্যায়

পৃঃ ৫৩—৬৬।

ক. ১৮৭২ সনে ঠাকুরজমিদারদের বিরুদ্ধে পাবনায় কৃষক বিদ্রোহ দেখা দেয়।

খ. ১৮৯৪ সনে রবীন্দ্রনাথ চাষীদের খাজনা বাড়িয়ে দিয়েছিলেন, খাজনা আদায়ও করেছিলেন [শচীন্দ্র অধিকারী, শিলাইদহ ও রবীন্দ্রনাথ পৃঃ ১৮,১১৭] নতুন জমিদারী ক্রয় করেছিলেন [মার্টিন কোম্পানী থেকে নদীয়ার ড্রেব্রাকোল ক্রয়]। করবৃদ্ধির ও বলপ্রয়োগে কর আদায়ের ফলে প্রজাবিদ্রোহ ঘটলে তাও তিনি সাফল্যের সঙ্গে দমন করেন। বিশশতকের বিশের দশকে প্রজাপীড়ক শোষক রবীন্দ্রনাথের বিরুদ্ধে শিলাইদহের ইসলাইল মোল্লার নেতৃত্বে দু'শঘর প্রজার বিদ্রোহ এ সূত্রে উল্লেখ্য। [অমিতাভ চৌধুরী, জমিদার রবীন্দ্রনাথ, দেশ'শারদীয়া, ১৩৮২।]

গ. ২৩.১.১৩১৫ তারিখে নির্ঝরিণী সরকারকে এক চিঠিতে ব্রিটিশ শাসনকে ঈশ্বরের শাসন হিসেবে গণ্য করে তার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করা যে অন্যায় তার ফতোয়া দেন। 'আত্মশক্তি'তে ব্রিটিশ সরকারের সাথে 'ভদ্ররূপ' সম্বন্ধ স্থাপন করার 'ঔচিত্য' হাজির করেন।... 'রায়তের ক্ষুধা যে কত সর্বনেশে তার পরিচয় আমার জানা আছে। তারা যে প্রণালীর ভিতর দিয়ে স্ফীত হয়ে ওঠে তার মধ্যে শয়তানের সকল শ্রেণীর অনুচরেরই জটলা দেখতে পাবে।' [পৃঃ ৬০—৬১—লেখক সমাবেশ, শারদীয়া, ১৩৯২]

ঘ. বঙ্গভঙ্গ আন্দোলন পরিহার করে তিনি ভুবনডাঙায় ব্রহ্মচর্যাশ্রম সংগঠনে আত্মনিয়োগ করেন। ১৯০৮ সালের পর থেকে তিনি বিশ্বমানবতার তত্ত্বপ্রচারে নিবিষ্ট হন। ব্রিটিশ শাসনের সমর্থনে তিনি রাজটুকুম্ব, ঘুষোঘুষি, স্বদেশী ও স্বাবলম্বন, স্বদেশীসমাজ প্রভৃতি প্রবন্ধ লিখে প্রতিক্রিয়াশীলতার স্বাক্ষর রেখে গেছেন। রমাঁ রলাঁর কাছে

ভারতে ব্রিটিশ শাসনের প্রয়োজনীয়তার পক্ষে যুক্তি হাজির করে ভারতের পরাধীনতাকে স্বাগত জানিয়েছিলেন। [লে. স. অশোক চট্টো. পৃঃ৬৪]
আমাদের মনে হয় প্রবলপ্রতাপ ব্রিটিশ বিতাড়ন অসম্ভব জেনেই তিনি স্বাধীনতা সংগ্রামকে বৃথা বলেই মানতেন এবং ব্রিটিশ আনুগত্যে ও ব্রিটিশের প্রসন্নতায় শ্রেয়স সন্ধান করতেন। দেশের মহৎ মনীষীর এমনি চেতনা অবশ্যই আমাদের লজ্জিত করে।

কালান্তরে শরৎ-বীক্ষা

মানুষ বাঁচে তার দেশ-কালের প্রতিবেশে। দেশের সমকালীন সম্পদ ও সমস্যা, আনন্দ ও যন্ত্রণা তার জীবন-চেতনা ও জগৎ-জিজ্ঞাসা নিয়ন্ত্রণ করে। এ তাৎপর্যে জীবনযাত্রা ও জীবনাচরণ প্রতিবেশ লব্ধ বিশ্বাস-সংস্কার এবং নৈতিক, শৈক্ষিক, আর্থিক আর সাংস্কৃতিক সত্তা ও অবস্থা অনুযায়ী নিয়ন্ত্রিত হয়। কাজেই মানুষের মানস কিংবা ব্যবহারিক অভিব্যক্তি দেশের, কালের ও প্রতিবেশের প্রসূন। ব্যতিক্রম কেবল অসামান্যতারই সাক্ষ্য।

জীবন জীবিকা-লগ্ন। তাই মানুষের হাতিয়ার ও জীবিকা-পদ্ধতির বিবর্তনের সঙ্গে মন-মননের তথা জীবন-দৃষ্টিরও পরিবর্তন ঘটে। ফলে তার শাস্ত্র, সমাজ এবং সরকারও রূপান্তর লাভ করে। সাহিত্য জীবনানুভূতিরই অভিব্যক্তি। তাই সাহিত্য জীবন-চেতনা ও জগৎ-ভাবনার আধার। সাহিত্যে মানুষ তাই সমকালীন জীবন-সম্পদের ও জীবন-সমস্যার, জীবনানন্দের ও জীবন-যন্ত্রণার কথা,—তার প্রত্যয়ের ও স্বপ্নের প্রতিরূপ প্রত্যাশা করে। কেননা সাহিত্যিক দেশকালের প্রতিভূরূপে অনেকেরই হয়েই সম ও সহ ভাবাপন্নের মুখপাত্ররূপে নিজের ভাব, চিন্তা ও উপলব্ধি ব্যক্ত করেন।

শরৎ-সাহিত্য আমাদের এ প্রত্যাশা পুরো পূরণ করে না। কারো কারো মতে আংশিক ভাবেও নয়। সাহিত্যজগতে শরৎচন্দ্রের আবির্ভাব প্রথম মহাযুদ্ধের সময়ে য়ুরোপীয় বুর্জোয়া জীবনের চরম সংকট ও অবক্ষয় কালে। এ যুদ্ধের বাতায়নিক প্রভাবে আফ্রো-এশিয়ার ও ল্যাটিন আমেরিকার জনমনে স্বাধিকারের ও স্বাধীনতার আকাঙ্ক্ষা উপ্ত হতে থাকে। এই যুদ্ধের পরিণামে যুগান্তর সূচিত হল। য়ুরোপের রাজনৈতিক ভূগোলই কেবল পাল্টাল না, রুশ-বিপ্লবের সাফল্যে মানুষের চিন্তা-চেতনায়ও ঘটল রূপান্তর। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পরিণামে আফ্রো-এশিয়া-ল্যাটিন আমেরিকার পর-শাসিত ও পর-শোষিত দেশগুলো স্বাধীন সত্তা নিয়ে মাথা তুলে দাঁড়াল। এই দুই মহাযুদ্ধের মাঝখানে শরৎচন্দ্রের আবির্ভাব। কাজেই সঙ্গত কারণেই তাঁর কাছে প্রত্যাশিত ছিল দার্শনিকসুলভ জীবন-জিজ্ঞাসা ও জীবন-দৃষ্টির, সমাজ-বিজ্ঞানীসুলভ সমাজ-সন্ধিৎসা এবং সাহিত্যিকসুলভ বহুজনহিত ও বহুজনসুখ চিন্তায় ঋদ্ধ জীবনের আশ্বাস। অথচ তাঁর চোখের সামনেই মহাযুদ্ধের বাতায়নিক প্রভাবজ উর্মিসুন্দর নতুন চেতনার ও মূল্যবোধের উন্মেষ ঘটল তরুণ লিখিয়েদের রচনায়। তিনি সেদিকে তাকিয়ে দেখলেন না। মহাযুদ্ধোত্তর পৃথিবীর অংশ বিশেষ আর্থিক সঙ্কটে, খাদ্যাভাবে, রাষ্ট্রবিপ্লবে, হত্যাযজ্ঞে বীভৎস রূপ পেয়েছিল। মানুষের ও মনুষ্যত্বের এই বিপর্যয় শরৎচন্দ্রের চিত্তলোক আন্দোলিত করেনি।

তিনি নিজে যেন একটা বিচ্ছিন্ন বিজন দ্বীপে আশ্রিত হয়ে বাঙলার বর্ণ হিন্দুর ঘরে ঘরে জীবন্ত নারী দেবতার মর্যাদা ও অধিকার প্রতিষ্ঠার পরিকল্পনা তৈরি করেছিলেন। ওই অনুধ্যানে তিনি তপস্বী শিবের মতো অনন্যচিত্ত ও অভিভূত। নারীর স্তব-স্তুতি রচনাতেই তাঁর জীবন কেটে গেল। এ কারণে তাঁর রচনা যতটা আবেগ ও উদ্দেশ্য চালিত ততটা যুক্তিভিত্তিক বা বাস্তবানুগ নয়। তাঁর সাহিত্যে গাম্ভীর্যই পুরুষের এবং জেদই নারীর ব্যক্তিত্ব। ভালো যারা অতি ভালো আর মন্দ যারা পরিণামে ভালো। অর্থাৎ তাঁর অঙ্কিত জীবন ও ঘটনা এক অর্থে ideal, real নয়। অবশ্য এতে ক্ষতি নেই, বরং লাভ আছে। কেননা এ সাহিত্য—যার লক্ষ্য পাঠককে প্রভাবিত করা।

তা ছাড়া তাঁর তুলে-ধরা সমস্যাগুলোও শহুরে জীবনে তখন হয় বিলুপ্ত অথবা বিরল, আর গাঁয়েও তা বিদ্যাসাগরীয় যুগের মতো ব্যাধি হয়ে নেই। হিন্দু সমাজে ইংরেজি শিক্ষার প্রসারে একান্নবর্তী পরিবারের লোকের চাকরিসূত্রে প্রবাস জীবন তখন দ্রুত বিস্তার লাভ করেছে। ফলে পরিবারও বিনা বিবাদে ভাঙছিল। চাকুরের স্বনির্ভরতাও স্বাতন্ত্র-চেতনা বৃদ্ধি করছিল। নারী-শিক্ষার প্রসার ও চাকুরে বর-প্রত্যাশা কন্যাদায়কে বরং উঠতি ঘরে গুরুতর করে তুলছিল। কাজেই আজো 'অরক্ষণীয়া'র বা 'বামুনের মেয়ে'র বিয়েতে বিস্তর বাধা, —তা পিতামহীর বা দারিদ্র্যের দোষে নয় 'ঘর-বর' চড়া দামের পণ্য বলেই। আনন্দবাজারের রোববারের পৃষ্ঠাই তার সাক্ষ্য। শরৎচন্দ্র যে-সমস্যা নিয়ে বিচলিত, এ তার থেকে হাজারগুণ বেশি আর্থিক, সামাজিক, নৈতিক ও সাংস্কৃতিক সমস্যা। মনের বদলে মননের চর্চা করলে তিনি ওই শেষোক্ত বিষয়েই গুরুত্ব দিতেন বেশি।

জাতি-বর্ণ-আচার চেতনা হ্রাসের ও বিলোপের মোক্ষম ওষুধ ছিল ইংরেজি শিক্ষা ও শহুরে শ্রমিক জীবন। সে-নিদান তাঁর দৃষ্টি এড়িয়েছে। বৈধব্য, দাম্পত্য, সতীত্ব, পাতিত্য প্রভৃতি সম্বন্ধে তাঁর চিন্তা-চেতনা সনাতন শাস্ত্র ও সমাজলগ্ন। তিনি নারীর জন্যে শাস্ত্রের ও সমাজের প্রশ্রয় ও কৃপা কামনা করেছেন। তাই বিফল হয়েছে তাঁর প্রয়াস। এক্ষেত্রেও প্রতীচ্য আদলের শিক্ষা ও সংস্কৃতি সহজ সমাধান দিতে পারত—অতীতে যেমন দিয়েছে— আজো যেমন দিচ্ছে। কিন্তু তিনি ছিলেন সনাতন হিন্দু ঐতিহ্যের গৌরব-গর্বী। তাই ব্রাহ্ম মেয়েদের প্রাগ্রসরতা তাঁর শ্রদ্ধেয় ছিল না। রূঢ় হলেও বলতে হয় যে, শরৎচন্দ্রের মন-মত কালোপযোগী ছিল না—তিনি পিছিয়ে-পড়া মানুষ। তাঁর ছিল হিতবাদী, করুণাপ্রবণ, প্রশ্রয়-উদার ও ক্ষমা-সুন্দর মন। ব্যক্তির ও সমাজের মন-মতও তা-ই হোক—এই ছিল তাঁর কাম্য এবং তা-ই হবে—এই ছিল তাঁর প্রত্যাশা। সে কারণে তাঁর দৃষ্টিও টর্চের মতো তীক্ষ্ণ অথচ বিন্দুতে নিবদ্ধ। বিশাল জগতের বিচিত্র জীবনস্রোত, বর্ণালী চেতনাপ্রবাহ, সামাজিক ও মানবিক নতুন-পুরোনো সমস্যার নব নব সমাধানতত্ত্ব অথবা মার্কসীয় কিংবা ফ্রয়েডীয় দর্শন তাঁকে আকৃষ্ট করেনি। ফলে তাঁর ভূমিকা ছিল কারণ-ক্রিয়া বিরহী মধ্যযুগীর সংস্কারকের —আধুনিক সমাজতাত্ত্বিকের নয়। এমনকি শহুরে মানুষ হয়েও তিনি শহুরে সমাজের আচার-সংস্কার শৈথিল্যে আশ্বস্ত না হয়ে গ্রামীণ ও গ্রাম্য জীবনের সমস্যার কালবিরোধী সমাধান কামনায় ছিলেন ব্যাকুল। শহুরের পতিতারা কত আগে থেকেই গিরিশ ঘোষদের উদারতায় নাট্য জগতে সমাদৃত। শিক্ষা এবং শহরই যে সমাজ-মন ও স্বাস্থ্য উন্নত করে, গাঁয়ে-গঞ্জে শহুরে প্রভাবই যে সর্ব প্রকার মানস ও দৈহিক জরা-জীর্ণতা ঘোচায়, তা শরৎচন্দ্র মানতেন বলে মনে হয় না। তাই তাঁর স্বকীয় পন্থায় চন্দ্রমুখীকে শাশ্বত নারী মূর্তিদানের প্রয়াস, পল্লী সমাজের প্রতিচ্ছবি তুলে ধরার চেষ্টা।

অর্কমা-অক্ষমের ঈর্ষা-অসূয়া-পরশ্রীকাতরতা এবং পরচর্চা ও পরনিন্দা সর্বজনবিদিত। অল্প দারিদ্র্যে আস্ফালন এবং বহু দারিদ্র্যে আত্মসম্মানবোধ-বর্জিত কাঙালপনা অবশ্যম্ভাবী। দারিদ্র্য সর্বগুণবিনাশী এবং দোষের আকার—এ উপলব্ধি সুপ্রাচীন। এই আর্থিক অসাচ্ছল্য ও অস্বাচ্ছন্দ্যই শহুরে শিক্ষিত মনকে করেছে লিপ্সু ও নীতিহীন। এ আর্থিক তথা জীবিকা সমস্যাই নষ্ট করেছে চরিত্র, আর সমাজ-স্বাস্থ্য, মন-মত-রুচি করেছে বিকৃত। তাই শাসক-শাসিত শোষক-শোষিত সবাই দুশ্চরিত্র দুর্বৃত্ত। এই পারস্পরিক দৌরাত্ম্য জীবন-জীবিকার অনিশ্চয়তায় উদ্ভূত যেমন, তেমনি আবার জীবন-জীবিকার নিরাপত্তার বিঘ্নও। একাধারে বীজ ও ফল। আড়াই হাজার বছর আগের গৌতম বুদ্ধও উপলব্ধি করেছিলেন—কারণ না জানলে ক্রিয়া নিয়ন্ত্রণ করা যায় না। শরৎচন্দ্র কিন্তু নিরাময়ের নিদান খোঁজেন নি, কেবল প্রশমনের প্রলেপ সন্ধান করেছেন। জ্ঞানলব্ধ প্রজ্ঞা ও অর্থলব্ধ স্বস্তি ও তুষ্টি যে মনের দিগন্ত, আকাশের কিংবা সমুদ্রের মতো না হোক, অন্তত সরোবরের ও প্রান্তরে মতো প্রসারিত করে এবং তাতে যে বদ্ধ ঘরের স্থবির জীবনে সংকীর্ণ চেতনায় উদ্ভূত স্বার্থবোধ ও ঈর্ষা-অসুয়া, দ্বেষ-দ্বন্দ্ব, নীচতা-হীনতা ইত্যাদি বৃত্তিগুলো অতি ক্ষুদ্র ও নিষ্ক্রিয় হয়ে যায়, তা আমরা আত্ম-প্রত্যয়ী স্বপ্রতিষ্ঠ মানুষে প্রায়ই প্রত্যক্ষ করি। পল্লী সমাজের সর্বপ্রকার দ্বেষ-দ্বন্দ্বের ও ছল-চাতুরীর মূলে রয়েছে অর্কমা-অক্ষমের জীবনে আর্থিক স্বস্তির এবং আত্মবিশ্বাসের ও জীবনস্বপ্নের অভাব। বৃদ্ধেরা বাঁচে অতীত কৃতির রোমন্থনে, তরুণরা বাড়ে ভবিষ্যতের আশায় ও আশ্বাসে। জড়তা জরা ও জীর্ণতা আনে। বদ্ধ জলাশয়ের পানি কমে, তাতে শেওলা জন্মে ও বাড়ে। গ্রাম্য সমাজে স্বাস্থ্য আসবে শিক্ষার আলোয় ও আর্থিক সাচ্ছল্যে,—বাণী-বক্তৃতায় নয়। কেননা নীতি-কথায় প্রাণ বাঁচে না। যেখানে প্রাচুর্য ও অজস্রতা সেখানে সংকীর্ণতা ঠাঁই পায় না,—সেখানে ত্যাগের, দানের ও ক্ষমার বিলাস-বাঞ্ছাই জাগে। উদারতা ঐশ্বর্যের নিত্যসঙ্গী।

শরৎ-সাহিত্যে মন আছে, মনন নেই, তাই আবেগ আছে, যুক্তি নেই, সদিচ্ছা আছে, সাফল্য নেই, উপচিকীর্ষার ব্যাকুলতা আছে, উপকারের প্রমাণ নেই। সেজন্যে আজো রাজলক্ষ্মী-অভয়া-অচলা-সাবিত্রী-কমল-কিরণময়ীদের সমস্যার ইতি ঘটেনি। তাঁর সমকালে দারিদ্র্য ঘোচানোর যে তত্ত্ব বহুল উচ্চারিত তার আভাসমাত্র নেই তাঁর সাহিত্যে। কেবল করুণা ও ক্ষোভ প্রকাশ করেই তিনি দায়িত্ব এড়িয়েছেন। তাঁর দরদ ছিল, দাওয়া বাতলানোর সদিচ্ছা ছিল না। পুরোনো মূল্যবোধ নিয়ে নতুন কালের সমস্যার সমাধান দান সম্ভবও ছিল না তাঁর পক্ষে। শরৎচন্দ্র মূলত সনাতন শাস্ত্র ও সমাজনীতির প্রতি আস্থা ও শ্রদ্ধা রাখতেন, আবার ঐ দুটোর আশ্রয়ে ও প্রশ্রয়ে কিছু স্বেচ্ছাচারের স্বাধীনতা দাবি করতেন দুঃখী-দুস্থ-দুরাচারী মানুষের জন্যে বিশেষত নারীর জন্যে। ওদের প্রতি তাঁর মতো দরদী হতেই আবেদন জানিয়েছেন তিনি পাঠককে। তাঁর সব রচনাতেই তিনি মানুষে ও মানুষের মনুষ্যত্বে তাঁর আস্থা এবং দুরাত্মা-দুর্জনের মহাত্মা-মহাজনে রূপান্তর সম্ভাবনায় ও মানুষের ক্ষমাগুণে তাঁর বিশ্বাস উচ্চকণ্ঠে বিঘোষিত করে গেছেন। মানুষ তাঁর কাছে কাঞ্চন—অমৃতস্য পুত্রাঃ, তার বিকৃতি মাত্রই সাময়িক— এ প্রত্যয় তাঁর শেষাবধি অটুট ছিল। কিন্তু এ-ও হৃদয়জ আবেগও তজ্জাত বিশ্বাস প্রসূত, বুদ্ধিগ্রাহ্য কিংবা বোধগত যুক্তির প্রসূন নয়। তাই intellectual-এর কাছে তাঁর সাহিত্যের কদর কম, তাঁর বক্তব্যের গুরুত্ব স্বল্প। কারণ তাঁর অঙ্কিত নারীর কিংবা পুরুষের ঘটনা কিংবা আচরণ বাস্তবে মেলে না, যদিও কামনায় ও কল্পনায় ওই আপন ভোলা মহৎ হৃদয় আপাত দুর্জন-দুর্বৃত্ত পুরুষ, ওই সর্বংসহা স্নেহ ও সেবাপ্রবণ অথচ জেদী-দ্রোহিণী নারী

অনভিপ্রেত নয়। আর অতি ভালো দাদা-বৌদি, সৎমা-জ্যাঠাইমা, ভৃত্য বা বন্ধু কার না কাম্য! কিন্তু মননহীন মানুষের কাছে শরৎ-সাহিত্য কেবল সুখপাঠ্য নয়, হৃদয়লোকের বিচিত্র বার্তাবাহীও। নারী হৃদয়ের বেদনা ও বাৎসল্য, প্রেম ও পাতিব্রত্য, ত্যাগ ও তিতিক্ষা, জ্বালা ও যন্ত্রণা, সেবাবৃত্তি ও সহনশীলতা তিনি দরদ দিয়ে সমানুভূতির ও সহানুভূতির সঙ্গে অঙ্কিত করেছেন। অনুভূতি ঐকান্তিক ও অকৃত্রিম বলেই তা ভাবে ভাষায় ও ভঙ্গিতে অপরূপ ও অমোঘ আবেদনশীল হয়ে উঠেছে। শরৎ-সাহিত্যে উত্থাপিত সমস্যা শিক্ষা ও শ্রমকেন্দ্রের প্রসারে পরিবর্তিত পরিবেশে আজ স্বতোবিলীয়মান। বলাবাহুল্য, তাঁর অভীষ্ট পন্থায় সেদিনও সমস্যাগুলোর কোন সমাধান সম্ভব ছিল না। জীবন-জীবিকার রূপান্তরিত প্রতিবেশে পরিবর্তিত মূল্যবোধ প্রসূত জীবন-দৃষ্টিতে ও জগৎ-ভাবনায় আজ রিপুবশ্যতা বা প্রাবৃত্তিক দুর্বলতা তেমন গুরুতর অপরাধ নয়।

আমাদের বক্তব্য : শরৎ সাহিত্যের অব্যর্থ আবেদন sentiment-এর কাছে—intellect-এর কাছে নয়। হৃয়ানুভূতিপ্রসূত সাহিত্য হৃদয়সংবাদী থাকবেই। কাজেই দরদী শরৎচন্দ্রের প্রতি শ্রদ্ধা এবং শরৎ-সাহিত্যের জনপ্রিয়তা নারী কিশোর ও মননহীন জনের কাছে আরো বহুকাল থাকবে।

শরৎ-সাহিত্যে যখন পাত্র বা পাত্রীর চোখ ছল ছল করে কিংবা অশ্রু গড়িয়ে পড়ে, বর্ণনাগুণে পাঠকের চোখও তখন শুকনো থাকে না, নায়িকা যখন প্রিয় পাত্রকে সাগ্রহে সযত্নে মমতারস মিশ্রিত অন্নব্যঞ্জন পরিবেশন করে, তখন পাঠকও বেদনা-মধুর আনন্দে অভিভূত হয়। রাগে-বিরাগে, অনুরাগে-অভিমানে, আত্মীয়তায়-একাত্মতায়, ক্ষমায়-তিতিক্ষায়, হৃদয়-বৃত্তির এমনি সুষম ও মর্মস্পর্শী প্রয়োগ অনন্যতা দান করেছে তাঁর সংলাপকে। এই মন-কাড়া সংলাপেই তাঁর শিল্প-শক্তির পূর্ণ প্রকাশ ও বিকাশ সুপ্রকট। তাঁর সাহিত্য জীবনের আর্থিক-রাষ্ট্রিক-নৈতিক-সামাজিক সমস্যা না মিটাক, হৃদয়-ধর্মের প্রসার ঘটায় নিশ্চিতই। রবীন্দ্রনাথের ভাষায় তিনিও বলতে পারতেন :

চারিদিকে সবে বাঁটিয়া দুনিয়া
আপন অংশ নিতেছে গুণিয়া
আমি 'নারী মঙ্গলগীত গাহিয়া'
পেয়েছি স্বরগসুধা।...
সংসার মাঝে কয়েকটি সুর
রেখে দিয়ে যাব করিয়া মধুর
দু'একটি কাঁটা করি দিব দূর
তার পরে ছুটি নিব।
সুখ হাসি আরো হবে উজ্জ্বল।
সুন্দর হবে নয়নের জল
স্নেহ সুখ মাখা বাসগৃহতল
আরো আপনার হবে।
প্রেয়সী নারীর নয়নে অধরে
আরেকটু মধু দিয়ে যাব ভরে
আরেকটু স্নেহ শিশু মুখ 'পরে

শিশিরের মত রবে।...
বিদায়ের আগে দু চারিটা কথা
রেখে যাব সুমধুর।

বাঙালীর ঘরোয়া জীবনে শরৎচন্দ্রের এই প্রত্যয় ও প্রত্যাশা ব্যর্থ হয়নি বলেই আমাদের বিশ্বাস।

কালিক প্রত্যয়ের আলোকে শরৎচন্দ্র

শরৎচন্দ্রে আমাদের প্রচলিত ধারণার ব্যতিক্রম অনেক। সংস্কৃত ব্যাকরণের বেড়া ভেঙে নিজের নাম লিখলেন শরৎচন্দ্র। সাহিত্যচর্চা যাঁরা করেন, তাঁরা কৈশোরে যৌবনেই লেখা শুরু করেন। শরৎচন্দ্র শুরু করলেন প্রায় উনচল্লিশ বছর বয়সে—অতিক্রান্ত যৌবনে। সাহিত্যের আবহাওয়ায় যাঁরা লালন চান, তাঁরা দেশে শহরে আসতেই উৎসুক। শরৎচন্দ্র বর্মায় কাটালেন জীবনের ও যৌবনের স্বর্ণযুগ। অন্যেরা লিখে লিখে প্রখ্যাত ও জনপ্রিয় হন, তিনি প্রথম লেখায় পরস্কৃত এবং লেখা মাত্রই প্রখ্যাত। অন্যদের লেখায় বিষয়-বৈচিত্র্য থাকে। শরৎচন্দ্রের সাহিত্য মুখ্যত নারী জাতির মঙ্গল গানে মুখর। এবং গৃহগত জীবনে বৃন্তচ্যুত যৌবনবতী নারীর জীবনের ও মর্যাদার সমস্যাই তাঁর সাহিত্যের প্রধান বক্তব্য। তাঁর নায়ক-নায়িকারা প্রায়ই দুর্ভাগ্যের শিকার এবং সে-সূত্রে তাঁর সাহিত্য বেদনা-করুণ রসের আকর। পাঠক মাত্রই অভিভূত, তবু অসন্তুষ্ট। তাঁর সাহিত্য যতো সুখপাঠ্য, তাঁর জীবনদৃষ্টি সম্বন্ধে পাঠকের ক্ষোভ ততো তীব্র।

তাঁর বিরুদ্ধে পাঠকের নালিশ একটাও নয়, এক রকমও নয়। দুই মহাযুদ্ধের মাঝখানে দাঁড়িয়েও তিনি সাম্যবাদী, সমাজবাদী কিংবা বিপ্লবী নন, নিজে কংগ্রেস করতেন বটে, কিন্তু তাঁর রচনায় রাজনীতি নেই, পথের দাবী ব্যতিক্রম মাত্র। তাতেও তাঁর মন- মত প্রচ্ছন্ন। তা ছাড়া তাঁর সাহিত্যে গণমানব নেই—আছে মধ্যবিত্তের ও উচ্চবিত্তের ভদ্র লোক। এক্ষেত্রেও 'মহেশ' গল্প ব্যতিক্রম। যদিও তিনি নারীর মঙ্গল গানে মুখর, যদিও তাঁর উপচিকীর্ষা আন্তরিক, তবু তাঁর শাস্ত্র, সমাজ ও ঐতিহ্যমানা মর্মে সুদৃঢ় ছিল রক্ষণশীলতা, বদ্ধমূল ছিল সনাতন শাস্ত্র ও সংস্কৃতি প্রীতি। তাই তাঁর মঙ্গল গান সমকালে নারীর মঙ্গল সাধন করেনি, তাঁর উপচিকীর্ষাও নারীর উপকারে পরিণতি পায়নি। তাঁর দৃষ্টি কেবল সমাজের নারীর প্রতি নিবদ্ধ ছিল বলেই তাঁর জীবন-জিজ্ঞাসা ও জগৎ-চেতনা ছিল সংকীর্ণ। বিস্তৃত পরিসরে জীবনকে প্রত্যক্ষ করার প্রয়াস বা আগ্রহ ছিল না তাঁর। তাই তাঁর সাহিত্যে জীবন আছে, জীবন বৈচিত্র্য নেই, রস আছে, রস বৈচিত্র্য নেই, সমস্যা আছে, সমস্যার বহুলতা নেই, সমাধান নির্দেশের সৎসাহস কিংবা উদারতাও তাই তাঁর সাহিত্যে দুর্লভ। বহুধা ও বর্ণালী জীবনের আবর্তনে ও প্রসারে, জীবনচেতনার বিচিত্র প্রকাশে ও বিকাশে কর্মবহুল সংগ্রাম-সঙ্কুল ও অনুভূতি-আকীর্ণ পুরুষ জীবনও তাঁর সাহিত্যে অনুপস্থিত। ফলে তাঁর সাহিত্যে শিল্প আছে, তিনিও শিল্পী বটে, কিন্তু মহৎ শিল্পী বা জীবনশিল্পী তিনি নন। আসলে তাঁরও লক্ষ্য ছিল সনাতন শাস্ত্র-সমাজ মেরামত, ভাঙা বা নতুন করে গড়া নয়, আবেগবশে কেবল ক্ষেত্রবিশেষে পাত্র বা পাত্রী বিশেষের জন্যে

সমাজের কৃপা-করুণা-ক্ষমা যাচঞা করা। ক্ষেত্রে তিনি রামমোহন-বিদ্যাসাগর-বঙ্কিমচন্দ্রের উত্তরসূরী বটে, কিন্তু প্রাগ্রসর প্রতিনিধি নন।

ত্রুটি যাই থাক, বঙ্কিমচন্দ্রের জীবন-চেতনায় ও জগৎ-ভাবনায় একটা সামগ্রিকতা ছিল। তাঁর লোকরহস্য, কমলাকান্তের দপ্তর, মুচিরামগুড়ের জীবনচরিত, সাম্য ও বিবিধ প্রবন্ধ তার সাক্ষ্য। শরৎচন্দ্রে তা নেই। বঙ্কিমের 'হিন্দু ভাবনা'ও ব্যাপক ও সার্বিক। শরৎচন্দ্রে তা কেবল নারী সমস্যায় নিবদ্ধ। বঙ্কিমচন্দ্রের নারী ও পুরুষ সম্বন্ধে তথা মানুষ সম্পর্কে ধারণা ছিল তুলনায় উঁচুতর। ইংরেজ সিবিলিয়ানের পৌরুষ ও ঔদার্য, সিবিলয়ান পত্নীর সপ্রতিভ নিঃসঙ্কোচ বিচরণ তাঁর মন হরণ করেছিল। তাই বঙ্কিম-সাহিত্যে কুমারী-কনেরা শরমে-সঙ্কোচে আড়ষ্ট বটে, শ্রদ্ধাবান ছিলেন, তাই তাঁর সাহিত্যে দুর্জন-দুঃশীলা দুর্লক্ষ্য। বিমলা, আয়েষা, মনোরমা, হীরা, শৈবলিনী, দলনী, শান্তি, প্রফুল্ল, নির্মলকুমারী, দরিয়া, জয়ন্তী, মতিবিবি প্রভৃতির স্মার্টনেস ও ব্যক্তিত্ব, কিংবা তাঁর পুরুষ চরিত্রগুলোর ঔদার্য ও পৌরুষ শরৎ-সাহিত্যে দুর্লভ। ওই সব নারীর কাছে শরৎ চন্দ্রের রাজলক্ষ্মী, কিরণময়ী, রমা, বিজয়া, অচলা-বন্দনা-সাবিত্রী ম্লান। কেবল ষোড়শীই স্বতন্ত্র। যে-প্রত্যয় ও শ্রদ্ধা নিয়ে বঙ্কিম তাঁর নারী-পুরুষ সৃষ্টি করেছেন, সে-প্রত্যয় ও সাহস ছিল না শরৎচন্দ্রের। যদি প্রশ্ন ওঠে বঙ্কিম শাহ-সামন্ত পরিবেশে রোম্যানস রচনা করেছিলেন বলে নারীকে ওই স্বরূপে চিত্রিত করা সহজ ছিল, শরৎচন্দ্রেও কিন্তু দারিদ্র্যমুক্ত মধ্যবিত্ত ও উচ্চবিত্তের সংসার চিত্রই মুখ্য। সেখানে সংস্কারমুক্ত অপকর্মপ্রবণ দুঃসাহসী ব্রাহ্মঘরের বিজয়ার, অচলার, কিংবা জন্ম-দুষ্ট ষোড়শী-কমলের অথবা নিরীশ্বর কিরণময়ীর পক্ষে যা সম্ভব, হিন্দু ঘরের রাজলক্ষ্মীর সাবিত্রীর, মৃণালের, রমার পক্ষে তা কল্পনাতীত। শরৎচন্দ্রের কিরণময়ীরা নাস্তিক বলেই কামপ্রবণ এবং পরিণামে হিন্দু ঘরের সেবাপরায়ণ নারীর মহিমা-মাধুর্য বোধগত করে প্রায়শ্চিত্তের প্রবণতা দেখায়। শাস্ত্র ও সমাজ নিন্দিত সম্পর্কজাত সন্তান বিমলা-তিলোত্তমা বলতে গেলে নারী-গৌরব। কিন্তু ভৈরবী ষোড়শী কিংবা কমল কি তাই! বলা যেতে পারে দুই ঔপন্যাসিকের দেশ, কাল, জীবন-দৃষ্টি ও লক্ষ্য ভিন্ন ছিল বলেই তাঁদের সৃষ্ট নারীর স্বরূপও আলাদা, কিন্তু যখন প্রতীচ্য প্রভাব প্রবল, তখনই শরৎচন্দ্রের নারীদের মনে আচারনিষ্ঠা ও সংস্কারপ্রীতি তীব্র। মুসলিম ঘরের আয়েশা নার্সসুলভ মানবতাবোধের প্রেরণায় পরপুরুষ জগৎসিংহের সেবায় এগিয়ে আসে, শৈবলিনী অচলা-কমলের চেয়েও বেশি বেপরওয়া, হীরার জীবন-জিজ্ঞাসা ও আচরণ কিরণময়ীর চাইতে স্বচ্ছতর। মতিবিবি, মনোরমা, নির্মলকুমারী কিংবা দরিয়া যেন আমাদের সমকালের সর্বসংস্কারমুক্ত শিক্ষিতা সবলা সপ্রতিভ মহিলা। সনাতনপন্থী সমাজে শ্রদ্ধেয় করবার জন্যে শরৎচন্দ্র তাঁর হিন্দু নায়িকাদের সনাতনী আচারে-বিচারে নিষ্ঠ রাখেন, এমন কি বিদ্রোহিণী কমল, সাবিত্রী ও বাইজি রাজলক্ষ্মীকেও।

কুন্দ-রোহিণীর প্রতি বঙ্কিমচন্দ্রের দায়-সারা রায় পাঠক গ্রহণ করেনি। বঙ্কিম-সাহিত্যে কামের ও প্রেমের পার্থক্যও স্পষ্ট, কিন্তু শরৎ-সাহিত্যে সতীত্ব দেহে না মনে তা অনির্ণীত। কর্মকুণ্ঠ দুর্বলচিত্ত পরান্নজীবী শ্রীকান্ত বাইজির খায় পরে, কিন্তু তাকে গ্রহণ করতে তার আত্মসম্মানে বাধে। "লক্ষ্মী, তোমার জন্য সব করতে পারি"—বিয়েই যদি করতে না পারল, তাহলে আর কি দুঃসাধ্য কর্ম সে করতে পারে। সাবিত্রীর পাপদেহ সতীশ-পূজার অর্ঘ্য হতে পারে না, কেন? অচলা কি সতী! কমল কি অসতী! বিপ্রদাসের মতো আচারনিষ্ঠাই কি মানুষকে সৎ ও মহৎ করে, পশ্চাতে প্রজ্ঞাপুষ্ট মন যদি না থাকে!

আসলে বঙ্কিম ছিলেন Intellectual আর শরৎচন্দ্র হলেন হৃদয়বান। এজন্যে তিনি আবেগ ও করুণাতাড়িত। তাঁর জীবন-চেতনায় বিস্তার ও গভীরতা নেই। মূল্যবোধে নেই স্বচ্ছতা বা সঙ্গতি। তাঁর বাস্তব জীবনের বহু বিচিত্র অভিজ্ঞতা ও ভুয়োদর্শনই তাঁর সম্বল। দর্শনে-মনস্তত্ত্বে, ফ্রয়েডীয় যৌনতত্ত্বে উদঘাটিত জীবন-তত্ত্বের সঙ্গে তাঁর ঘনিষ্ঠ পরিচয়ের কোন নমুনা মেলে না তাঁর সাহিত্যে। তাই অসামান্য শিল্পরুচি থাকা সত্ত্বেও তাঁর রচনা জীবনতত্ত্বের ও জগৎ-জিজ্ঞাসার আধার হয়নি। য়ুরোপীয় কোন শ্রেষ্ঠ পূর্বসূরীর কিংবা সমকালীন কোন শক্তিমান লিখিয়ের লেখার মতো তাঁর রচনায় কোন মৌলিক চিন্তা-চেতনার, বিচিত্র জীবন প্রতিবেশের ও সমস্যার চিহ্ন মাত্র নেই। তাঁর অসম্পূর্ণ শিক্ষা ও ভবঘুরে স্বভাবই কি এর মূলে? দুঃখী ও অবমানিতের তিনি হলে দরদী। সমবেদনায় ও করুণায় অপরের হয়ে কাঁদা এবং কাঁদানোই তাঁর লক্ষ্য। তাঁর চেতনায় আদর্শ নারী দেহে মনে আত্মায় পতিগতসত্তা সর্বংসহা অন্নদাদিদি, তাঁর পুরুষের আদর্শ দুঃসাহসী প্রাণচঞ্চল হৃদয়বান পরহিতব্রতী ইন্দ্রনাথ। ওই দুটো চরিত্র অঙ্কনের পরে তাঁর আর ভাববার, জানবার, বুঝবার ও করবার কিছু থাকে না। তাই তাঁর গ্রন্থগুলোতে এক হিসেবে অন্নদা দিদি ও ইন্দ্রনাথই নামান্তরে উপস্থিত। উদ্দেশ্যের, ঘটনার, আচরণের ও অনুভবের পুনরাবৃত্তি তাই তাঁর সাহিত্যে সর্বত্র দৃশ্যমান। যেমন পরের সন্তান নিয়ে বাৎসল্যের প্রকাশ ঘটেছে বিন্দুর ছেলে, রামের সুমতি, মামলার ফল, নিষ্কৃতি, মেজদিদি, চন্দ্রনাথ প্রভৃতিতে নাম ও ঘটনা বিন্যাস ভিন্ন হলেও অনুভব ও আচরণ অভিন্ন। একান্নবর্তী পরিবারে ভ্রাতৃপ্রেম বৈকুণ্ঠের উইল, নিষ্কৃতি, বিন্দুর ছেলে প্রভৃতি হয়ে বিপ্রদাস অবধি পুনরাবৃত্ত। শরৎচন্দ্রের ধারনায় আদর্শ হিন্দুপুরুষ হচ্ছে বিপ্রদাস এবং আদর্শ হিন্দু নারী মৃণাল।

আবার অচলা, সুরেশ, অভয়া, সাবিত্রী, চন্দ্রমুখী, দেবদাস, জীবানন্দ, কমল প্রভৃতি অন্তিম মহত্ত্বে ও মনুষ্যত্বে মহিমান্বিত। শরৎ সাহিত্যের আবেদন হৃদয়বৃত্তির ও হৃদয়বানের কাছে, বুদ্ধিবৃত্তির ও বুদ্ধিমানের কাছে তাঁর কদর কম। এজন্যে তাঁর সাহিত্য হৃদয়বৃত্তিবশ নারীর ও কিশোরের পাঠ্য রূপে থাকবে চিরকাল। সামাজিক ও দার্শনিক আবেদন তার আগেও ছিল না, এখনো নেই, ভবিষ্যতেও থাকবে না। তবে তিনিও বঙ্কিমের মতো গুরুত্ব পাবেন—তাতে সন্দেহ নেই। তার কারণ তিনি বাঙালী ঘরের করুণ কথার কথক। উচ্চ, মধ্য ও নিম্নবিত্তের ঘরোয়া ও সামাজিক জীবনে মানুষের বিশেষ করে নারীর বিবাহ, বৈধব্য, দাম্পত্য, সতীত্ব, বাৎসল্য, কাম ও প্রেম ঘটিত সমস্যা এবং তজ্জাত দুঃখ, লাঞ্ছনা ও আঘাত তিনি তাঁদের হয়ে হৃদয় দিয়ে অনুভব করেছেন এবং নিজে কেঁদেছেন, পাঠকদেরও কাঁদিয়ে তাদের প্রতি সহানুভূতিশীল করে তুলতে চেয়েছেন।

নিঃস্ব, নিরন্ন, নিরক্ষর মানুষের কথা আনুষঙ্গিকভাবে কৃচিৎ আছে বটে, কিন্তু তারা প্রাসঙ্গিক নয়, মুখ্য তো নয়ই। নারীর সেবা ও পূজা করাই ছিল তাঁর একমাত্র ব্রত। সারা সাহিত্যিক জীবনে তাই তিনি অনন্যচিত্ত। ফলে যুগ-সুলভ রাজনীতি, অর্থনীতি, জীবনতত্ত্বও নিরন্ন নিরক্ষর মানুষের কল্যাণচেতনা তাঁর সাহিত্যে অনুপস্থিত। তাঁর সাহিত্য পাপ সহ্য করার ও পাপীকে ক্ষমা করার দীক্ষাই দেয়। কেননা, মানুষ ভালোও নয়, মন্দও নয়। কখনো ভালো কখনো মন্দ, কারো জন্যে ভালো, কারো জন্যে মন্দ, এবং চিরকাল কারো জন্যে মন্দ নয়—মানুষের প্রতি এমনি একটা আশা বা বিশ্বাস জন্মানোর চেষ্টা তাঁর রচনায় ছিল। এজন্যে পরিণামে তাঁর সৃষ্ট পতিত চরিত্রগুলোও ক্ষমার ও সহানুভূতির যোগ্য হয়। তাঁর উপন্যাস দ্বন্দ্বান্তে মিলনমধুর পরিণাম-সুন্দর। করুণ রসে তাঁর রচনার শুরু আর উত্তরণ ঘটে শান্ত রসে। এ

অনেকটা বাস্তব জীবন-নিরপেক্ষ বটে, তবে সাহিত্যে তেমন নিন্দনীয় নয় এ আদর্শায়িত চিত্র। শরৎচন্দ্রের চরিত্রগুলোর আচরণ এবং পরিবর্তন ও পরিণতি ক্বচিৎ যুক্তিসঙ্গত ও স্বভাবসম্মত। প্রায়ই অসঙ্গত ও অসামঞ্জসরূপে তাঁর অভিপ্রায় অনুগ আকস্মিক আচরণে ও পরিণামে কাহিনী সমাপ্তি পেয়েছে।

এমনি অনেক রোমান্টিক চেতনা ও অসঙ্গতির অভিযোগ উত্থাপন করা কঠিন নয়। তবু তাঁর সাহিত্যে গৃহগত জীবনে নারীর দুর্ভোগ দুর্দশার যে বেদনার করুণ চিত্র তিনি অঙ্কিত করেছেন, তাতে পাঠক মনে যে ক্ষোভ, বেদনা, করুণা ও সহানুভূতি জাগে, তার প্রভাবে পাঠক পাপ ও পাপীর প্রতি সদয় ও সহনশীল হয়ে ওঠে। আজ অস্বীকার করবার উপায় নেই যে শরৎ-নির্দেশিত সমস্যার স্বতোসমাধান দিয়েছে এবং দিচ্ছে। এ পরোক্ষ পদ্ধতি শরৎচন্দ্র সচেতনভাবে প্রয়োগ-প্রয়াসী ছিলেন কিনা আমরা জানিনে, তবে তাঁর নারীহিতব্রত সে ব্যর্থ বিফল হয়নি তা নিঃসঙ্কোচে স্বীকার করি। অবশ্য এ সিদ্ধান্ত অগ্রাহ্যও করা যায়। আমরা দেখেছি, বিদ্যাসাগর জীবন-পণ করেও বহু বিবাহ নিরোধ কিংবা বিধবা বিবাহ চালু করতে পারেন নি। ইংরেজি শিক্ষার ও শিক্ষিতের পরিবেশে বহু বিবাহ লোপ পেল, আর বিধবা বিবাহ তেমনি ঘৃণ্য রইল। আজ আবার প্রতীচ্য প্রভাবজ কালান্তরে বিধবা-সধবা এবং বর্ণ-অবর্ণ-অসবর্ণ বিয়ে কাম-প্রেমের ক্ষেত্রে সমমূল্যের এবং শহুরে সমাজে তা গর্হিত নয়। তাই সমাজের কোন ক্ষত, কুপ্রথা, কুরীতি, কুআচার ও কুসংস্কার বিচ্ছিন্ন ভাবে দূর বা সংশোধন করা যায় না। যে-সমাজের ও সংস্কৃতির প্রভাবে স্বসমাজের ত্রুটি ধরা পড়ে ও অসহ্য ঠেকে, তা দূর করতে হলে ওই আদর্শ সমাজের সামগ্রিক অবস্থা ও অবস্থান জানতে ও বুঝতে হয়, এবং প্রতিকারও সেভাবে করতে হয়। শরৎচন্দ্র যে-সব সমস্যা তাঁর সাহিত্যে তুলে ধরেছেন, আসলে সেগুলো প্রতীচ্য শিক্ষার প্রসারে ও প্রভাবে তাঁর সমাজেও ছিল বিলীয়মান। মহাযুদ্ধোত্তর লিখিয়ের উচিত ছিল ব্যক্তির ও সমাজের শৈক্ষিক ও আর্থিক সমস্যাকে গুরুত্ব দেয়া। জীবিকা-লগ্ন জীবনে প্রতীচ্য বিদ্যার প্রসারে এবং জীবিকার চেতনা ও দাবি অনুগ ব্যবস্থায় বা অব্যবস্থায় পুরোনো, মন, মত, মনন পাল্টাতোই, এখন যেমন দ্রুত বদলাচ্ছে। অতএব, শরৎচন্দ্র উত্থাপিত গ্রামীণ, ঘরোয়া ও সামাজিক জীবনের সমস্যাগুলো খণ্ডদৃষ্টির প্রসূন। বুদ্ধিজীবীর কাছে এ সবের গুরুত্ব সামান্য। আগেই বলেছি শরৎচন্দ্র মননশীল নন, হৃদয়বান। কাজেই তাঁর রচনার আবেদন মস্তিষ্কস্পর্শী নয়—হৃদয়ভেদী। তাই নারীর ও মনন-স্বল্প পুরুষের কাছে প্রিয় থাকবে তাঁর সাহিত্য।

বিষয়ও নয়, বক্তব্যও নয়, শরৎ-সাহিত্যকে জনপ্রিয় করেছে এক যাদু। সে-যাদুর আধার তিনটে—ভাষা, ভঙ্গি ও সংলাপ। এসবও হয়তো বাহ্য। মূলে ঐ হৃদয় নিঃসৃত করুণা ও প্রীতি এবং বক্তার ও শ্রোতার আত্মীয়তা ও একাত্মতা সাধক কোমল-পেলব অনুভূতি জাগানো ভাব—পরকে আপন করা বাক-ভঙ্গি। এমন মন-মজানো হৃদয়-কাড়া সুপ্রযোজ্য অন্তরঙ্গ বাগ্বিন্যাস, এমন ললিত মধুর অথচ সরল সুনিপুণ অনন্য কথকতা বাঙলা সাহিত্যে শরৎচন্দ্রের অতুল্য অবদান। এ জন্যে তিনি যা লেখেন তা-ই ভালো। শরৎ-সাহিত্য পাঠকমনকে ক্লান্ত করে না কখনো। রচনার এগুণই তাঁর শিল্প, তাঁর শক্তি, তাঁর প্রতিভা।

শরৎচন্দ্রের পথের দাবী

সুজনেষু,

আপনার পত্র। আপনার প্রশ্নাবলীর কেজো উত্তর দেয়া কঠিন। তবু চেষ্টা করছি। পথের দাবী 'বঙ্গবাণীতে (১৯২১ সন) বের হওয়ার পরেই প্রকাশক ও পাঠক শঙ্কিত হয়ে ওঠে। আর পাঁচ বছর পরে (১৯২৬ সনে) পুস্তকাকারে প্রকাশিত হওয়ার প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই বাজেয়াপ্ত হয়। ফলে সে-যুগে 'পথের দাবী' পড়ার সুযোগ খুব কম লোকেরই ঘটে। আমি চট্টগ্রামের লোক। আমার জন্মও ১৯২১ সনে। ১৯৩৩ সন অবধি চট্টগ্রামে সূর্যসেন দলের সন্ত্রাসবাদীরা প্রবল ছিলেন। বাল্যে-কৈশোরে পথের দাবীর প্রশংসা তাঁদের কাছে শুনেছি বটে, তবে বইটি দেখবার বা পড়বার সুযোগ পাইনি। যতদিন বাজেয়াপ্ত ছিল, ততদিন মুখে মুখে তারিফ শুনে সবাই এ গ্রন্থকে বিপ্লবীদের 'বেদ' মনে করত। যে-কোন নিষিদ্ধ বইয়ের মর্যাদা ও প্রশংসা চিরকালই বেশি। পথের দাবীর মর্যাদা ও গুরুত্ব হয়তো আনন্দমঠের মতোই ছিল।

১৯৩৮ সনে নিষেধাজ্ঞা উঠে গেল বটে, ততদিনে পাঠকের আগ্রহও মন্দা হয়ে এসেছে। সন্ত্রাসবাদ তখন পরিত্যক্ত, এবং 'সাম্যবাদ' ও সাম্প্রদায়িক রাজনীতির আদর-কদর বৃদ্ধি পাচ্ছিল। তখন আনন্দমঠের মতো পথের দাবীও সমকালীন রাজনীতিতে গুরুত্বহীন।

পাকিস্তান আমলে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপিকা ডক্টর নীলিমা ইব্রাহিম ছাত্রপাঠ্য হিসাবে 'শরৎ প্রতিভা' নামে যে-বক্তব্য রয়েছে, তাও উঁচু-মানের নয়, আর চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক রশীদ আল-ফারুকী 'শরৎ সাহিত্য জিজ্ঞাসা' নামে ওই একই উদ্দেশ্যে যে গ্রন্থ রচনা করেছেন, তাতেও রয়েছে এগারো পৃষ্ঠা ব্যাপী আলোচনা, তাও বিশেষত্ব বর্জিত। এছাড়া এখানে আর কোন আলোচনা চোখে পড়েনি।

বিশ্ববিদ্যালয়ে এম.এ. ক্লাশে শরৎচন্দ্রের রচনাবলী পাঠ্য। আমি দু'চারবার প্রশ্নপত্রে 'পথের দাবী'র গুণাগুণ আলোচনামূলক প্রশ্ন করেছি। কিন্তু কোন বারেই ৩০০—৩৫০ পরীক্ষার্থীর কেউ উত্তর লেখেনি। কাজেই এ যুগের শিক্ষার্থীদের আগ্রহেরও কোন পরিচয় মেলে না। সবাই গৃহদাহ, চরিত্রহীন, শেষ প্রশ্ন কিংবা পল্লীসমাজই পড়ে। শ্রীকান্ত আমাদের অনার্সে পাঠ্য।

এবার আমার মত আপনাকে জানাচ্ছি। সাধারণভাবে শরৎ-সাহিত্যে আমার শ্রদ্ধা কম। কাজেই আমার অভিমতও আমার অশ্রদ্ধা প্রভাবিত হওয়ার আশঙ্কা বেশি।

আমার ধারণায় এ গ্রন্থের গোড়ায় একটা মস্ত গলদ রয়েছে। তা হচ্ছে ব্যক্তিপূজার অসংঘত প্রবণতা। এখানে ডাক্তার সব্যসাচী একজন সর্বগুণাধার ও সর্বশক্তিমান নবী-অবতার। তাই গোটা গ্রন্থ তাঁর ব্যক্তিত্বে ও কেরামতিতে আচ্ছন্ন। তাঁর বুদ্ধি, সাহস, কর্মতৎপরতা, সতর্কতা, অনুমান-শক্তি দূরদৃষ্টি, ধৈর্য-অধ্যবসায় প্রভৃতি ডিটেকটিভ উপন্যাসের নায়ক সুলভ। সব্যসাচীর গুণ-মান-মাহাত্ম্য বর্ণনাই যেন ঔপন্যাসিকের উদ্দেশ্য। ফলে বইটি যেন নামান্তরে 'পরমপুরুষ পরমহংস' অথবা পরিণত 'ইন্দ্রনাথ'। একি কংগ্রেসপন্থী শরৎচন্দ্রের গান্ধীপ্রীতির ফল। বিশোধিত অপূর্বই যেন বিপ্রদাস, ভারতীতে কিছুটা রাজলক্ষ্মীর আদল স্পষ্ট—পরিণামে 'বন্দনা' তো বটেই। সব্যসাচী-সুমিত্রারও শ্রীকান্ত-রাজলক্ষ্মীর মতো সম্পর্ক। ব্রজেন্দ্র-সুমিত্রা পরবর্তী 'চার অধ্যায়' স্মরণ করিয়ে দেয়। ব্রজেন্দ্রের ভবানন্দসত্তা তাকে দল-বিরোধী বিশ্বাসঘাতক করে তোলে।

ইন্দ্রনাথীয় শক্তি-সাহস ও বেপরওয়া জীবনের প্রতি মানসমুগ্ধতা সত্ত্বেও শ্রীকান্ত-স্বভাবের কংগ্রেস-পন্থী শরৎচন্দ্রে বিপ্লব-ভীরু। তাই তাঁর মানসসন্তান অপূর্ব-ভারতী-শশী নিরাপদ কংগ্রেসী জনসেবা আন্দোলনের পক্ষপাতী। এবং তাই কৃষক-কংগ্রেস আন্দোলনে আস্থাহীন সন্ত্রাসবাদীরাও নৈরাশ্যে হতোদ্যম। ফলে ইন্দ্রনাথীয় জেদ-পরবশ সব্যসাচী নিঃসঙ্গ। সবাই জানে শরৎচন্দ্র ছিলেন বিপ্লব বিরোধী। কাজেই তাঁর হাতে বিপ্লবী সাহিত্য প্রত্যাশিত নয়। স্বাধীনতার স্বপ্ন আপাত-পরিহারে ও ব্রিটিশানুগত্যে প্রবর্তনা-দানের জন্যে রচিত 'আনন্দ-মঠ' যেমন এক সময়ে স্বাধীনতাকামীর প্রেরণার উৎস রূপে বিবেচিত হয়েছিল, বিপ্লব বিরোধী 'পথের দাবী'ও স্বাধীনতা-স্বাপ্নিকের তেমনি অকারণে প্রিয় হয়েছিল। দুটো গ্রন্থই স্বাধীনতা-কামী তরুণের উত্তেজিত ও আচ্ছন্ন মনে স্বতোচেতনার ইন্ধন রূপে বিবেচিত ও ব্যবহৃত হয়েছে। সন্ত্রাসবাদীরা যতোটা আবেগ-তাড়িত, ততোটা মনীষাসম্পন্ন ছিলেন না। তাই প্রকট অসঙ্গতি তাঁদের দৃষ্টি এড়িয়ে ছিল। সব্যসাচীও আত্মশক্তি কিংবা যুবশক্তি দিয়ে স্বাধীনতা অর্জনের আশা রাখেননি, সিপাহী-বিদ্রোহের মাধ্যমে ব্রিটিশ বিতাড়নের স্বপ্ন দেখেছেন। এ কৃত্রিম উপায় চেতনা বাল-সুলভ। তা' ছাড়া স্বাধীনতা আন্দোলন স্বদেশেই সম্ভব ও স্বাভাবিক—এখানে কর্মক্ষেত্র ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের ভারত বহির্ভূত প্রত্যন্ত অঞ্চল। একে জাত-ধর্ম অবিশেষে সর্বভারতীয় রূপ দেওয়ার চেষ্টাও রয়েছে। মাদ্রাজী আইয়ার, শিখ হীরা সিং, খ্রীস্টান ভারতী, মারাঠি রামদাস তলওয়াকর, ইহুদীরক্তে সঙ্কর ব্রাহ্ম-কন্যা সুমিত্রা, চট্টগ্রামী মঘ ব্রজেন্দ্র—সব রয়েছে। কেবল মুসলিম নেই। মুসলিম আছে অন্য প্রসঙ্গে—একজন নরহন্তা ফেরারী, অন্যজন স্বামীত্যাগিনী নবতারার প্রেমিক স্বামী। এবং বাঙালী হিন্দুরা সবাই ব্রাহ্মণ। এখানেও শরৎচন্দ্রীয় সংকীর্ণতা ও রক্ষণশীলতা লক্ষণীয়। বাঙালী ভীরু বলেই হিন্দু-গৌরব মারাঠি ব্রাহ্মণ তলওয়ারকরের অবতারণা। সুমিত্রা এবং ভারতীও ব্রাহ্মণকন্যা। বর্ণ বাঁচিয়ে কাহিনী ফাঁদার চেতনা রূপকথা-উপকথার যুগে যেমন ছিল, মহুয়াদি গাথায় ও কপালকুণ্ডলায় যেমন দেখেছি, তেমনি এখানেও, ব্রাহ্মণ-কন্যা ভারতীয় সঙ্গে অপূর্বর বিয়ে যদি কখনো হয়ও, তাহলে স্বঘরেই হবে—এক কণা গোময়ে জাত-ধর্ম দুটোই মিলবে। নবতারা স্বামিত্যাগিনী বলেই শাস্ত্র ও সমাজ অনুরাগী শরৎচন্দ্র শশীর সঙ্গে তার বিয়ে ঘটালেন না—আহমেদের হাতে তুলে দিলেন। নবতারা চরিত্রভ্রষ্টা ছলনাময়ী। এমনি মানসিকতা শরৎ-সাহিত্যে সর্বত্রই আমরা প্রত্যক্ষ করি। ব্রাহ্ম কিংবা ভ্রষ্টামায়ের মেয়েরা অথবা নাস্তিক সুরেশ-কিরণময়ী যা করে, আর নবতারা-অভয়ারা বিদেশে যা করে, স্বদেশে কোন হিন্দু নারী-পুরুষ তা করে না—নিন্দা-মন্দ বলেও শেষাবধি শাস্ত্র ও সমাজের অনুগত থাকে।

'পথের দাবী'র শ্রমিক নেতারাও একবার মার খেয়ে শ্রমিক ক্ষেপানোর পথ পরিহার করে। অতএব বিপ্লবেও নয়, বিদ্রোহেও নয়, কংগ্রেসের নিয়মতান্ত্রিক অথচ নিঃশঙ্ক-নিরাপদ জেলখাটা আন্দোলনের মাধ্যমে ভারতের ভাগ্য নির্ধারণই—রাজনীতির ও স্বাদেশিকতার রাজপথ।

আর কাহিনী বিন্যাসে শরৎচন্দ্রীয় সবত্রুটি —সেই অশ্রুপাত, সেই সজলতা, সেই ভোজনচিত্র, সেই মন-কাড়া আবদার-আত্মীয়তা, ঘটনার সেই অসঙ্গত আকস্মিকতা, এবং ভাষায় সেই মুদ্রাদোষ তো রয়েইছে, তা ছাড়া ডিটেকটিভ উপন্যাসের অদ্ভুত রস—আকস্মিকতা ও রোমাঞ্চ সর্বত্র ছড়ানো। আরো একটি বিষয় গ্রন্থের বক্তব্যকে লঘু করেছে। এ্যাংলো ও দেশী খ্রীস্টানদের নেটিভ-লাঞ্ছনাই যেন রয়েছে স্বাধীনতা সংগ্রামের

স্পৃহা জাগার মূলে। মনে হয়, ওই অবজ্ঞা-বিদ্বেষ-বৈষম্য না থাকলে যেন স্বাধীনতা চাওয়ার অন্য প্রয়োজন ছিল না। সত্য না হলেও তবু সব্যসাচীর কথা বরং চমক লাগায় "স্বার্থের দায়ে ধীরে ধীরে মানুষকে অমানুষ করে তোলাই এদের (ইংরেজদের) মজ্জাগত সংস্কার। এই এদের ব্যবসা, এই এদের মূলধন।"

অবশ্য স্বাধীনতার যথার্থ উপযোগ-চেতনাও ছিল সব্যসাচীর, "স্বাধীনতাই স্বাধীনতার শেষ নয়, ধর্ম, শান্তি, কাব্য, আনন্দ—এরা আরো বড়। এদের একান্ত বিকাশের জন্যইত স্বাধীনতা।" প্রাণ-বাঁচানোর জন্যে অন্ন, এবং মনের লালনের জন্যে আনন্দ আবশ্যিক। সামন্ত-বুর্জোয়া প্রভাবিত চেতনায় 'অন্ন'টা গুরুত্ব পায় না। তাই সব্যসাচীও চাষী-মজুরে তেমন গুরুত্ব দেয় না। কবিকে বলে ভদ্রলোক-লক্ষ্যে জাগরণ বাণী শোনাতে, নিরক্ষর চাষী-মজুরের জন্যে গান লিখলে সহানুভূতি বশে ভদ্রলোকেরা যে তাদের দুঃখমোচনে এগিয়ে আসবে, সব্যসাচীর তথা শরৎচন্দ্রের মনে সে তত্ত্ব জাগে না। নীতি-ধর্ম-সত্য-শাস্ত্র-সমাজ সম্বন্ধে সব্যসাচীর বিপ্লবীসুলভ কিছু বিদ্রোহাত্মক কথা আছে। কিন্তু সেগুলো একান্তই তাঁর, ভক্তরা তাঁর ওইসব তত্ত্ব মানে না। বস্তুত সব্যসাচীর মত-পথ সবটাই ভারতীকে দিয়ে খণ্ডন করা হয়েছে।

অতএব এটি বড়জোর কংগ্রেসী-সাহিত্য, বিপ্লবী সাহিত্য কদাচ নয়। এ গ্রন্থ রোমাঞ্চকর ঘটনার আবরণে সর্বত্র নিম্নমানের হৃদয়বৃত্তিরই সুপ্রকাশ ঘটেছে—কামে, প্রেমে, সংযমে, নিষ্কামে।

গ্রন্থ সমাপ্তি ঘটেছে দ্রোহের, দলত্যাগের, নীতিপরিহারের, হতাশার ও বিদায়ের বর্ণনায়।

কাজেই রাজনৈতিক উপন্যাস হিসেবে কিংবা শিল্পসুন্দর সাহিত্য হিসেবে এ গ্রন্থ সার্থক নয়। এ গ্রন্থে পরিচ্ছন্ন ও সুস্পষ্ট রাজনৈতিক বক্তব্য নেই। অপূর্বর জনসেবা এবং সব্যসাচীর বিপ্লবপ্রয়াস—দুটোই যেন ব্যক্তিক রুচি-বুদ্ধি অনুসারে চলতে পারে—এমন একটা ধারণাও পাঠক-মনে জাগবার অবকাশ থাকে। আর সাহিত্যকর্ম হিসেবেও শিল্পে কিংবা রসে একটা বিশেষ গুণে-মানে-উৎকর্ষে উত্তীর্ণ হয়নি বইটি।[১]

মনের বনে

ক. আনন্দ

সুখের মতো আনন্দও পেতে জানতে হয় অর্থাৎ সুখ যেমন কেউ কাউকে দিতে পারে না, সুখের প্রতিবেশ নিজের মধ্যে নিজেকে রচনা করতে হয় ক্ষতি স্বীকারের ও বেদনা সহ্য করার কিংবা অভাববোধকে তুচ্ছ জানার শক্তির অনুশীলন করে, তেমনি আনন্দও বাইরের জগৎ থেকে সংগ্রহ করা চলে না, তা অন্তরের মধ্যে অনুভব করার তত্ত্ব ও ফিকির জানা থাকা চাই, আবাল্য বা আকৈশোর চর্চায় আনন্দ আস্বাদনে দক্ষতাও অর্জন করতে হয়। নিষ্ক্রিয় নিস্তরঙ্গ জীবনে আনন্দের উৎপত্তি নেই। আনন্দ নতুন বস্তু ঘটনা ভাব চিন্তা কর্ম আচরণোত্থিত।

১. পশ্চিমবঙ্গের ডক্টর প্রমোদ মুখোপাধ্যায় নাট্যবিশারদকে লিখিত পত্র।

খৈনি মুখে পুরে, চণ্ডু-চরস-গাঁজা খেয়ে কিংবা আফিম-মদ প্রভৃতি সেবন করে মানুষ যেমন কিছু সময়ের জন্যে আত্মসমাহিত হতে কিংবা তৃপ্তির সুখ পেতে পারে, স্বল্পসময়ের জন্যে সমাজ-সংসারকে তুচ্ছ জেনে, আসন্ন ও আপন্ন বিপদ-বাধা-সঙ্কট সমস্যাকে তুচ্ছ মেনে নিশ্চিন্ত-নির্বিঘ্ন-নিরাপদ জীবনের সুখ-স্বস্তি-আনন্দ আরাম উপভোগ করে বা ভোগে-উপভোগে প্রয়াসী হয়, আনন্দও তেমনি অন্তরে উপভোগ করতে জানতে হয়।

স্বাস্থ্যবান শিশুমাত্রই সদাচঞ্চল ও চপল, সে মুহূর্তমাত্র নিষ্ক্রিয় থাকে না, কৌতূহলের কারণে, আনন্দের খোঁজে সে এটা ধরে, ওটা ছুড়ে মারে। বাইরে যারা আনন্দ-অন্বেষায় আড্ডা দিয়ে, তাস-পাশা-জুয়া খেলে, ক্রীড়া দেখে, সিনেমায় যেয়ে, রেস্তোঁরায় খেয়ে, গান গেয়ে, বাজনা বাজিয়ে এ বাড়ি ও বাড়ি দিয়ে দেখাশোনা করে, পিকনিকে, নৌবিহারে, দেশভ্রমণে ছুটোছুটি করে অথবা ধন-মান-যশের সাধনা করে, তারা আনন্দ সন্ধানী বটে, কিন্তু আনন্দ উপভোগ করে কি? নাকি আনন্দ তাদের কাছে চিরমরীচিকা! যদি সুখ পায়ও তা' আনন্দের সুখ নয়—শিশুসুলভ চাপল্যের সুখ— ছুটোছুটির হালকা সুখ—অন্য কথায় তা' হচ্ছে বিচিত্র মনস্কতার সুখ—ভুলে থাকার সুখ—অনুপলব্ধ অস্থির মনস্কতার সুখ—আনন্দজাত নয়। সুখানুভূতি শর্তসাপেক্ষ। নিশ্চিত-নির্বিঘ্ন নিরাপদ জীবনেই সুখানুভব সম্ভব। এবং সুখমাত্রই আনন্দ নয়, সুখীমানুষ মাত্রই নয় আনন্দিত। সুখী মানুষের আর খুশী মানুষের মধ্যে যে পার্থক্য, এক্ষেত্রেও রয়েছে সে ফারাক। দেহে ও মনে শঙ্কামুক্ত মানুষই সুখী, সুখী মানুষ যখন কোন সাফল্যে তৃপ্ত হয়, তখন সে-খোশ তাকে খুশী করে, খুশী মানুষের আনন্দ অভিব্যক্তি পায় হাসিতে। আনন্দিত মানুষের আকস্মিক উল্লাসও তাই পরিব্যক্ত হয় সরব হাসির মাধ্যমে।

আমরা এখানে অন্য এক আনন্দের কথা বলছি, যা গভীর, ব্যাপক ও স্থায়ী। তা সৎ চিৎ-আনন্দের [সচ্চিদানন্দ] তৃতীয়টির মতো দুর্লভ বলেই বিরলতায় বিশিষ্ট। সে-আনন্দের প্রসূন হচ্ছে এক প্রকারের তৃপ্তি, তুষ্টি [contentment] বা আত্মপ্রসাদ। সে-তৃপ্তিও তুষ্টি মেলে জগতের ও জীবনের তত্ত্বোপলব্ধির প্রয়াসে, জীবনের তাৎপর্য সন্ধানে, জীবন-সত্যের উদ্‌ঘাটনে, জগতের নিয়ম-নীতি জেনে বুঝে প্রজ্ঞাদৃষ্টি লাভে, মানুষের বৃত্তি-প্রবৃত্তির লীলা অনুসরণে, বই পড়ে মাটি-মানুষ শুধু নয় পৃথিবীর যাবতীয় বিষয় সম্বন্ধে জ্ঞান অর্জনে যে-আনন্দ, তা-ই মানুষকে স্থায়ী তৃপ্তি ও তুষ্টি, সুখ ও আনন্দ দান করে। এ আনন্দই আমাদের কাম্য হলে জীবন যথার্থই হবে অর্থবহ, অনুভবের ও উপলব্ধির জগৎ হবে অসীম ও অশেষ, সেই অনুভব রসের আনন্দ-সমুদ্রে মানস অবগাহন, হৃদয়-লব্ধ সুবিন্যস্ত সেই অরণ্যে বিহার, আদি অন্তহীন সেই বোধ-বুদ্ধির নিস্তরঙ্গ আকাশে বিচরণ মানুষকে মনুষ্যত্বকে ধন্য করে, পূর্ণ করে, সার্থক করে। কেননা আনন্দের স্থিতি চেতনার গভীরে, সত্তার অবিচ্ছেদ্য অংশরূপে। এ হচ্ছে 'To know all is to pardon all' স্তরে আত্মোন্নয়ন দশা! আনন্দ চিত্তোত্থিত, বহির্লব্ধ নয়।

খ. কীর্তিমান

ধনী ও মানী হওয়ার কোন সহজ ও সরল পথ নেই, —কিন্তু সংক্ষিপ্ত পথ আবশ্যই রয়েছে। সদাগরী সৎপেশা হলেও দুর্নীতি ছাড়া (মূল্যবৃদ্ধি, মাপের হেরফের, চোরাচালান ও মৌজুত আর ভেজাল) নাকি ব্যবসায়েও দ্রুত ধনী হওয়া যায় না—এমনকি সৎ-ব্যবসায়ীর নাকি, দেউলিয়া হতে বেশি সময় লাগে না। অতএব ধন ও দুর্নীতি সহজাত ও নিত্যসাথী। আর ধনী হলেই মানী হয়। কারণ 'মান' মাত্রই ধনগত ও পদগত। ধন মনোবল ও বাহুবল যোগায়, পদজাত

ক্ষমতা বা পদাধিকার অনুগৃহীত কিংবা নিগৃহীত করার দাপট দান করে। কাজেই ধনী ও মানী হবার জন্যে পেশা বা পদাধিকারই যথেষ্ট নয়—অপপ্রয়োগের ও দুর্নীতির আশ্রয়ে ধন ও মান সযত্নে ও সচতুরতায় সাবধানে অর্জন করতে হয়।

ধনী ও মানী স্বকালে-স্বস্থানে-স্বসমাজে কৃত্রিম ক্ষমতা প্রয়োগে বা প্রদর্শনে মান্য হয় কিন্তু শ্রদ্ধেয় হয় না। নিন্দা-ঘৃণা-কলঙ্কমুক্তও থাকে না। তাতে তাদের কোন ক্ষতি নেই। কারণ তারা স্থূলবোধ-বুদ্ধির ও স্থূলভোগ-উপভোগ লিপ্সু মানুষ। ধন বা পদ হারানোর সঙ্গেই নিদ্রামুক্ত মানুষের সুস্বপ্নের মতোই তাদের মান উবে যায় এবং মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গেই তারাও বিস্মৃতির বা কালের গর্ভে বিলীন হয়ে যায়। যদিও পাপের ধন প্রায়শ্চিত্তে যায়, যে-নালে উৎপত্তি সে-নালে বিনাস কিংবা ill-got, ill-spent বলে আপ্তবাক্য চিরকালই চালু রয়েছে ও থাকবে, তবু অসদুপায়ে অর্জিত ধন ও মান কোথাও কোথাও বংশধরেরাও অনেক কাল ধরেই ভোগ-উপভোগ করে সুখে কাল কাটায়। কাজেই স্বল্পবিবেক, স্থূলবুদ্ধি, অমার্জিত রুচি, আত্মমর্যাদাহীন প্রজ্ঞাবিরহী লোভী মানুষের 'ধনী-মানী হওয়ার জন্যে দুর্নীতবাজ, চালবাজ, মিথ্যাবাদী, সুযোগসন্ধানী ও সুবিধাবাদী হওয়া সাজে। শুধু তা-ই নয়, এ সব বিষয়ে লজ্জা-শরম, শঙ্কা-সংকোচ ত্যাগ করাও শক্তি-সাহস অর্জন করা তার পক্ষে আবশ্যিক।

কিন্তু কীর্তিমান হওয়া যার লক্ষ্য অর্থাৎ যুগান্তরে বা কালান্তরেও যে স্মরেণ্য হয়ে থাকবার বাসনা মনে পোষণ করে তার স্বনির্বাচিত আদর্শ, অনড় উদ্দেশ্য, দৃঢ় সংকল্প, সুস্পষ্ট লক্ষ্য এবং সত্যনিষ্ঠা, কর্মানুরাগ, সংযম, সহিষ্ণুতা ও ক্ষতিস্বীকারের সাহস থাকা চাই, নইলে গর্হিত পন্থায় কীর্তিমান হয়ে স্মরেণ্য হওয়ার বিড়ম্বনা শুধু তার নিজেকে নয়—তার উত্তরপুরুষকে—তার সমাজকে এমনকি জাতিকেও বহন করতে হয়। ইতিহাসে নরদেবতা ও নরদানব—দু-ই স্মরেণ্য ও অমোচ্য স্মৃতি হয়ে রয়েছে, পার্থক্য এই—এদের কেউ শ্রদ্ধেয়, কেউ ঘৃণ্য। বিভীষণ, মীরজাফর থেকে দলের বিশ্বাসঘাতক রাজসাক্ষী অবধি সবাই যেমন ঘৃণায় স্মরেণ্য, চেঙ্গিস-তৈমুরের—বাবুর-আকবরের বংশধর অশীতিপর বৃদ্ধ ভীরু বাহাদুর শাহর প্রাণভিক্ষা চাওয়া তেমনি অবজ্ঞেয়।

আবার ইতিহাসের নিরপেক্ষ আয়নায় দেখা যায়, মানুষ কারো চারিত্রিক দুর্বলতাকেও ক্ষমা করে তার প্রতি শ্রদ্ধাবান, হয়, যদি তার দোষের চেয়ে গুণের পরিমাণ, কুকর্মের চেয়ে সুকর্মের সংখ্যা বেশি হয়—এমনি 'দোষহর' গুণধর শ্রেণীর শ্রদ্ধেয় ছিলেন বেকন, ভল্ট্যায়ার, রাজা রামমোহন, কোন কোন কবি প্রভৃতি বিভিন্ন যুগের ও বিভিন্ন ক্ষেত্রের দুনিয়ার অধিকাংশ কীর্তিমান মানুষ।

উনিশ শতকের কোলকাতায় বহু বহু ধনী-মানী-গুণী-জ্ঞানী মানুষ ছিলেন এবং স্ব স্ব ক্ষেত্রে তাঁদের গুণ-মান-মাহাত্ম্য ছিল স্বীকৃত, কীর্তিমান হওয়া সত্ত্বেও ওইসব প্রতাপে প্রবল ব্যক্তির চারিত্রিক দুর্বলতা কিংবা আদর্শশৈথিল্য ছিল বলে তাঁদের কৃতি ও স্মৃতি আজ আর কাউকে অনুপ্রাণিত করে না। দৃঢ়প্রত্যয়ী চরিত্রবান ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরই উনিশশতকী আকাশের ধ্রুব নক্ষত্ররূপে, আদর্শ চরিত্রের দৃষ্টান্তরূপে বাঙালীর স্মৃতিতে ভাস্বর হয়ে থাকবেন।

গ. জীবনের প্রান্তপর্বের ভাবনা

একষট্টি থেকে আশি বা তার উপরের বয়েসটা হচ্ছে যে-কোন মানুষের জীবনের প্রান্তপর্ব। যে-কোন মুহূর্তে যে-কোন সামান্য কিংবা অসামান্য অসুখে জীবন-দীপের শিখা নিভতে পারে,

ফুরাতে পারে প্রাণবায়ু, তখন চোখ খোলা থাকলেও বিচলিত ব্যক্তিদের কেউ না কেউ চোখের পাতা টেনে চোখ চাপা দেয়। অর্ধশায়িত থাকলে সত্যি পটল তোলায়। জীবনের নানা পর্ব—শৈশব, বাল্য, কৈশোর, যৌবন, প্রৌঢ়ত্ব ও বার্ধক্য। এ ষড় অবস্থার স্তরের, পর্বের বা অবস্থানের মধ্যে দীর্ঘতর পর্ব বা অবস্থান হচ্ছে বার্ধক্যে—সবাই অবশ্য তেমন সৌভাগ্যের কিংবা দুর্ভাগ্যের নায়ক হয় না, এ পর্ব কারো অল্পে অবসিত হয়, কারো কারো হয় দীর্ঘ বা দীর্ঘতম। কিন্তু আত্মীয়-পরিজন কিংবা প্রিয় পরিচিত জনের কাছে ষাটোত্তর বয়স হচ্ছে মরবার বয়েস, সেজন্যে একষট্টির প্রৌঢ়ের আর বিরাশির বুড়োর মৃত্যু তাদের একই নির্বিকার মন্তব্যের কারণ হয়, 'ভালোই হল রথে-হাতে, অর্থাৎ স্বাবলম্বী অবস্থায় পরনির্ভর না হয়েই দৈহিক কষ্ট এবং আত্মীয়ের অবহেলা পাবার আগেই স্বর্গে গেল। পেন্সনধারী না হলে কায়িকশ্রমে অসমর্থ বৃদ্ধের মৃত্যুতে সন্তানেরা মনে মনে খুশীই হয়, নিষ্ফল সেবার ও অসার্থক খরচের দায় থেকে মুক্তি মিলল বলে।

মানুষের চোখে বুড়ো মাত্রই এক, ষাট-আশির পার্থক্য চেতনা তাদের নেই, সেজন্যে এ প্রান্ত পর্বের মানুষের জন্যে শোক করবার, হায় হায় করবার লোক কৃচিৎ মেলে, দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলার লোকও হয় দুর্লভ, জীবিতা প্রেয়সীরও হয়তো অকেজো বুড়োর জন্যে ফেলা দীর্ঘশ্বাস অকৃত্রিম নয়—নেহাত লোক দেখানো।

আমি যুক্তি-বুদ্ধি দিয়ে বুঝি এবং হৃদয় দিয়ে অনুভব করি যে মৃত্যুর পরে আর জীবনে থাকতে পারে না, এ-ও জানি এবং মানি যে আত্মা বলে কিছুই নেই—কাজেই জন্মান্তর, অমরত্ব, পাপ-পুণ্য, স্বর্গ-নরক বলেও কিছু থাকতে পারে না। কেঁচো থেকে হাতী অবধি সব প্রাণীরই জন্ম-মৃত্যুর পদ্ধতি অভিন্ন।

আত্মরক্ষার, খাদ্যসংগ্রহের, আত্মপ্রসারের, প্রজননলক্ষ্যে রমণের প্রবৃত্তিও প্রাণিজগতে সহজাত। ভয়, লোভ, ক্রোধ, অপত্য প্রভৃতিও প্রায় সমভাবে জন্মগত। এমনি অবস্থায় আর কারো আর কিছুর যদি আত্মা না থাকে, অমরত্বে অধিকার না থাকে, তবে মানুষেরও থাকার কথা নয়। দেহে রক্ত আর রক্তে শর্করাই আত্মা, রুহ বা চৈতন্য তথা প্রাণ বা জীবন। রক্তের হ্রাস-বৃদ্ধি, বিশুদ্ধতা-বিকৃতিই দেহের বল-বীর্য, জরা-জীর্ণতা, স্বাস্থ্য-আয়ু নিয়ন্ত্রিত করে। চেতনাই যেহেতু বেদনার কারণ, মৃত্যু মানে চেতনার বিলুপ্তি বা অবসান, কাজেই নৈরাত্ম্য শবেও বেদনাবোধের অবলুপ্তি সুনিশ্চিত, পচনশীলতা তারই সাক্ষ্য।

পাপ-পুণ্য কি ও কেন, তার যুক্তিগ্রাহ্য ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ অসম্ভব। মানুষ শক্তিবলে ও স্বার্থবলে গুরু-মোষের খাদ্য ও চারণভূমি ঘিরে রাখে, বঞ্চিত করে তরু-তৃণভোজী পশুদের। কোন পশু ক্ষুধার তাড়নায় কিংবা লোভের বশে ঘেরা অতিক্রম করলে, বেড়া ভাঙলে মার খায়। তার পাপ কি, অপরাধ কি, এ শাস্তি তার প্রাপ্য কি? প্রকৃতির দেয়া তার ন্যায্য পাওনা এ তরু-তৃণে তার চেয়ে বেশি অধিকার আর কার? প্রতিদিন অসংখ্য কোটি ডিমের আকারে হাঁস-মুরগীর ভ্রূণ নরখাদ্য হিসেবে যে নিহত হচ্ছে মানুষের হাতে, পৃথিবীর আলোর ও জীবনের প্রসাদ থেকে প্রাণ পাওয়ার পূর্বেই বঞ্চিত হচ্ছে—কার পাপে, কোন পাপে? কেবল অহিংস্র দুর্বল প্রাণীই কি পাপী যে সে অপরের খাদ্য হবে? হিংস্র প্রাণী, হাঙ্গর কুমীর, তিমি, জলহস্তী, সিন্ধুঘোড়া, সিংহ, হাতী, চিল, বাজ, শকুন কারো খাদ্য নয় কেন? এদের গুণ কি, পুণ্য কি? ঝড়-ঝঞ্ঝা কেবল গাছ উপড়ায়, কাকাদি পাখী মারে, গরীবের ঘর ভাঙে—এদের অপরাধ কি; পাপ কি? ঝড়-খরা-বন্যা কেবল গরীবের উপর গজব হয়ে নামে কেন? ওরাই কি কেবল পাপী?

দালানবাসী ধনী-মানীরা এসব প্রাকৃতিক দুর্যোগে মরে না কেন?—এতো পুণ্যই বা তারা কোথায় পায়? এসব নানা বিবেচনায় মৃত্যু ভয় আমার নেই, কারণ মৃত্যুতে জীবনের চির অবসান। অতএব, নরকের কীটের, সাপের ও আগুনের আক্রমণ-আশঙ্কামুক্ত আমি। উমর খৈয়ামকে স্মরণ করছি, কেননা তিনিও বলেন :

সব বুলি মিছা শুনহ গোপনে
একটি বচন সত্য সার
যে-ফুল নিশীথে পড়িছে ঝরিয়া
সে নাহি কখন ফুটিবে আর।

ভূতে-ভগবানে বিশ্বাসী রবীন্দ্রনাথ ইহ পরকালের জীবনে মাত্র একটি দ্বারের পার্থক্য বলেই মানতেন। অন্যভাবেও বৃথা ভয়-ভাগানো আত্মপ্রবোধ পাবার চেষ্টা করতেন :

স্তন হতে তুলে নিলে কাঁদে শিশু ডরে
নিমিষে আশ্বাস পায় গিয়ে স্তনান্তরে।

মৃত্যুভয়ে ভীত কবি অবশ্যম্ভাবী মৃত্যুকে গ্রহণ করার জন্যে তাই আত্মবোধনের চেষ্টার অন্যকে ডেকে উচ্চকণ্ঠে বলেছেন : মরণকে তুই পর করেছিস ভাই জীবন যে তোর [তুচ্ছ] ক্ষুদ্র হল তাই এবং জেনেছেন শ্রীভগবানের ক্ষিরোদ সাগররূপ 'সম্মুখে শান্তি পারাবার' আছে বলে। মৃত্যুভীতি বুড়ো রবীন্দ্রনাথের মন-মনন আচ্ছন্ন করে ছিল, তাই এ ভীতি বিতাড়নের প্রয়াসও তাঁর জীবনের প্রান্তপর্বের কাব্যে সুপ্রকটভাবেই ছড়িয়ে ছিটিয়ে রয়েছে 'প্রান্তিক, রোগশয্যায়, আরোগ্য, জন্মদিনে থেকে শেষলেখা' অবধি সর্বত্র। অথচ মনের গভীরে আকৈশোর যে বাসনা পোষণ করতেন, তা-ই ছিল যথার্থ ও অকৃত্রিম এবং তা' তাঁর মর্মমূলে সারাজীবন ধরেই লালিত ছিল :

মরিতে চাহিনা আমি সুন্দর ভুবনে।
মানবের মাঝে আমি বাঁচিবারে চাই।

এবং এ মর্ত্যপ্রীতিবশেই আকুল প্রার্থনা মর্ত্যে 'তুচ্ছ বলে যা' চাইনি, [আজ] তাই মোরে দাও।' কেননা, 'এ ভূলোক মধুময়, মধুময় পৃথিবীর ধূলি।'

মৃত্যুভয় আমার নেই বটে, কিন্তু এ ষাট বছর বয়সের ক্রান্তিলগ্নে মৃত্যুচিন্তা এগিয়ে আসছে, কেননা আমি এ জীবনকে, এ পৃথিবীকে ভালোবাসি, কারণ, আমি জানি এখানেই জীবনের উদ্ভব ও এখানেই জীবনের চির-বিনাশ। তাই এ জীবন অতুল্য সম্পদ, এ জীবন ও এ পৃথিবী সুন্দর, মধুর ও প্রিয়। বিশ্বাস-ভরসা ও নিশ্চিন্তে নির্ভর করতে পারি বলেই আমি স্ত্রীরূপে, সন্তানরূপে, ভাই-বোনরূপে, আত্মীয়রূপে, বন্ধুরূপে, প্রতিবেশী রূপে, দেশবাসীরূপে, সর্বোপরি মানুষরূপে কিছু সমকালীন মানুষকে ভালোবাসি। আমার হৃদয়ে ভালোবাসা ও ভালোবাসাজাত আনন্দ আর সুখ রয়েছে বলেই আমার প্রাকৃতিক প্রতিবেশও সুন্দর ও মনোরম এবং আমার জীবনের দোসর। আমার ভালোবাসার জনেরা আমার বিশ্বাসের, ভরসার ও নিশ্চিন্ত নির্ভরের পাত্র। ব্যক্তির জীবনে মানুষের প্রীতিই পুঁজি ও পাথেয়,—জীবনের শ্রেষ্ঠ সম্পদ। প্রীতির সঞ্চয়ই স্বস্তির ও সুখের উৎস। তাই আমার জীবন সুখের ও আনন্দের। সেজন্যেই মৃত্যুচিন্তা আমাকে বিচলিত করে, ভাবিয়ে তোলে, দায়িত্ব ও কর্তব্য চেতনা দেয়। দীর্ঘায়ু মানুষও অতৃপ্ত, বলে, 'হায়রে জীবন, ফুলফোটা আর ফুলঝরা!'

মৃত্যুদণ্ড নিয়েই জীবনের জন্ম। সে কেবল জানে না যে কোন সময়ে সে-দণ্ড কার্যকর হবে। এ নাজানাটাই তার স্বস্তির ও সুখের মূল। কিন্তু ষাটোত্তর বুড়ো সে না-জানার ভান

করতে পারে না, সে জানে তাঁর দিন, ক্ষণ, মাস, বছর সীমিত অথচ অজ্ঞাত। কাজেই মৃত্যুর আকস্মিক তিথি লগ্নের জন্যে তার প্রস্তুত থাকতে হয়। সে-প্রস্তুতি অবশ্যই—তার মধ্যে থাকে জমাজমির বিলি ব্যবস্থা, সন্তানাদির বিয়ে অবধি সবকিছু। মর্ত্যজীবনের দায়িত্ব পালন ও কর্তব্যকরণ সুসম্পন্ন করে তৃপ্ত ও তুষ্ট মনে মৃত্যুবরণ করা গেলে ব্যক্তির বাস্তব জীবনে সুসমাপ্তি ঘটে।

ঘ. হৃতজীবনের কান্না

কাল চৈত্রসংক্রান্তির বিকেলে রবীন্দ্রনাথের 'বর্ষাশেষ' কবিতার কলি আনমনা আমার কণ্ঠে গুনগুনিয়ে ধ্বনিত হল :

চৈত্র অবসান
গাহিতে চাহিছে হিয়া
পুরাতন ক্লান্ত বরষের
সর্বশেষ গান।

সহসা আমার সচেতন হয়ে উঠল এক গভীর ও গুরু উপলব্ধিতে। প্রকৃতি আবর্তিত হয় বর্ষ পরিক্রমায়। একই রূপে ও রঙে স্থির থেকেই প্রতি এগারো মাসে আবর্তিত হয় মাস, প্রতি দশ মাস অন্তর ফিরে আসে ঋতু অঙ্গে ও অন্তরে অভিন্ন রূপ ও রস নিয়ে। তাই প্রকৃতির জগতে কিছুই হারায় না—কেবল আবর্তিত হয় চক্রাকারে। কিন্তু জীবনে কি কিছু ফিরে আসে! যা যায় একেবারেই যায়, চিরকালের জন্যেই যায়, জীবনের প্রবাহ শূন্যে মিলায়। তাই মানুষের ব্যক্তিক জীবন হচ্ছে হৃতজীবনের বিলাপ, হৃত যৌবনের কান্না। ওই বিলাপই তার স্মৃতির সঞ্চয়, ওই কান্নাই তার যৌবনের স্মারক। জড়ত্বপ্রাপ্ত জীর্ণ জীবনের প্রান্তপর্বে অন্ত্য লগ্নে জীবন যেন হারানো অতীতের একটি প্রচণ্ড দীর্ঘশ্বাস, একটি বুকবিদীর্ণ করা হাহাকার। দীর্ঘ জীবনের দিন গেল, মাস গেল, একটার পর একটা বছর গড়িয়ে গেল, কিন্তু সচেতনভাবে একটি ক্ষণ, দিন, মাস বা বছর গভীর অনুভবের, পরিতৃপ্ত উপভোগের কিংবা পরিপূর্ণ উপলব্ধির আনন্দে সার্থক করেছি বলে মনে পড়ে না।

হেলায় হারানো সুযোগের জন্যে, জীবনের সময়-সম্পদের অপচয়ের জন্যে আজ অনর্থক কান্না বুকের মধ্যে গুমরে উঠছে। স্মরণ করিয়ে দিচ্ছে মোহিতলালের কবিতা যা' হৃত জীবনের হৃত যৌবনের ও অপূর্ণ বাসনার বিফল কান্নায় করুণ:

আমার সকল কামনা ফুটেনি এখনো
ফুটেনি গানের শাখে
চৈত্র নিশীথে বসন্ত কাঁদে দ্বারে হেরি বৈশাখে।

দেহে ও মনে বিকার না থাকলে পৃথিবীর সবকিছু সুন্দর, সুমধুর এবং সুখকর। এ জীবন মধুময় মধুময় পৃথিবীর ধূলি এবং উপভোগ সুখের আকার। এ জীবন অতুল্য ঐশ্বর্য, তাই তো মানুষ অমৃত কামনা করেছিল। পৃথিবীর রূপ-রসের আকর্ষণেই তো কামনা করেছিল অবিনশ্বর চিরন্তন জীবন।

মানুষের জীবনের সবচেয়ে বড়ো ট্রাজেডী হচ্ছে, সে চিরকালই কিংকর্তব্যবিমূঢ়। ঠিক সময়ে ঠিক ভাবনাটি না ভাবার, ঠিক কাজটি না করার, সময় না বোঝার—আজকে এ মুহূর্তে আমি কি হারাচ্ছি, আমার কি করা উচিত —না জানার দরুনই জীবন হয় অসফল, অসার্থক,

অসুন্দর ও অসুখের। সময় অতিক্রান্ত হলে ভুল ধরা পড়ে, তখন হৃত সময়ের কথা ভেবে হৃত সুযোগের জন্যে মনে জাগে আফসোস, জাগে হাহাকার। মরীচিকা-দুষ্ট জীবনমরুর মাঝে মধ্যে জেগে থাকা জীবনের দু' চারটে সার্থক ও সফল মুহূর্তরূপ মরূদ্যান জীবনমরুর প্রতি মায়া জাগায়, তা-ই রোমন্থন করে জরাজীর্ণ জীবনের প্রান্তপর্ব অবসিত হয়।

আহা! যদি নতুন করে গোড়া থেকে জীবন শুরু করা যেত! —'হায়রে জীবন, মানব জীবন ফুল ফোটা, ফুল ঝরা!' আজ জরাক্রান্ত জীবন-সায়াহ্নে কেবলি মনে হচ্ছে জীবনসম্পদ হেলায় অপচয় করে আমি রিক্ত, নিঃস্ব। বয়স বাড়ছে, আয়ু কমছে, বয়স স্থির রাখা যাবে না, আয়ু ধরে রাখা চলবে না, অনিচ্ছায় সময়ের স্রোতে দ্রুত ভেসে যাচ্ছি অনস্তিত্বের শূন্যতায় বিলীন হতে। তবু অস্তিত্বের গভীর আকূতি কণ্ঠে ধ্বনিত হয়ে ওঠে—'দুর্লভ এ জীবন, দুর্লভ এই পৃথিবীর ধূলি কাদা মাটি, দুর্লভ এ ধরণীর লেশতম স্থান, তুচ্ছ বলে যা চাইনি তা-ই মোরে দাও।'

ঙ শ্রাবণে

'সকালের বাদল আঁধারে' কিংবা 'শ্যামল ছায়া ঘন' দিনে অথবা নীলনবঘনে ছাওয়া বিকেলে কেবল কবির নয়, সবার মনেই বিচলন ঘটে, মন যেন কেমন করে। হৃদয়ের এ আকুলি-ব্যাকলি কেন, স্বরূপে তা উপলব্ধি করা সাধারণের পক্ষে সম্ভব নয় বলেই তা অনির্বচনীয়, ফলে থেকে যায় চির-অব্যক্ত। সে অধরা-অনির্বচনীয় অনুভবের মাধুর্য আর বেদনাও তাই স্বরূপে উপভোগ্য হয়ে ওঠে না, কি যেন নেই, কি যেন চাই, কি যেন মন ছুঁয়ে ছুঁয়ে যায়, কি যেন ধরা দেবে দেবে করেও দূরে সরে যায়—অস্পষ্ট প্রলাপ যেন, তন্দ্রার অগভীর-অগোছাল স্বপ্ন যেন এমনি সময়ে পেয়ে বসে, তার মধ্যে ট্র্যাজিক নাটক দেখার আনন্দের ফল্গুপ্রবাহও যেন মিশে থাকে। ভূতে পাওয়ার বা জীনে ধরার মতো এ আচ্ছন্নভাব, এ অভিভূতি পীড়া দেয় না—এক বেদনা-মধুর অনুভূতি জাগায়, কণ্ডুয়নের মতো ভালো নয় জানার পরেও ভালো লাগে, ট্র্যাজেডীর মতো আনন্দবিরহী হয়েও আনন্দ দেয়, এ এক বেদনার সুখ।

রবীন্দ্রনাথ কতো বিচিত্রভাবে এ বাদল আঁধারের, শ্যামলছায়া সজল হাওয়ার, বর্ষামুখর দিনের, বৃষ্টিবহুল শ্রাবণ রজনীর মেঘমেদুরবর্ষা প্রকৃতির বর্ণনা দিয়েছেন অসংখ্য গানে, গল্পে ও কবিতায়, সাধারণের অনির্বচনীয় বহু ও বিচিত্র অনুভব অসামান্য নৈপুণ্যে ও সূক্ষ্মতায় পরিব্যক্তও করেছেন, তবু কি কবি বা পাঠক-শ্রোতা এ রূপের ও রসের শেষ খুঁজে পেয়েছেন, তৃপ্তি কি এসেছে! সৃষ্টির আদিকাল থেকে যেমন প্রকৃতি চমৎকৃত করেছে, ভাবিয়েছে, উতলা করেছে, আজো শ্যামলশৈলশিরে, রেবা নদীর তীরে, বর্ষণের রূপ ও ধ্বনি তেমনি রয়েছে, আজো মালবিকারা দরজায়-জানলায় স্তব্ধ হয়ে স্থির নেত্রে বাদলের ঝর ঝর ধারা প্রত্যক্ষ করে—আজো পাগলা হাওয়া মনেও দোলা জাগায়, এলোমেলো করে চেতনা, পাগল করে তোলে মন। তখন মনে মনে মন হারাবার, পথ ভুলবার আগ্রহ জাগে। আজো মন তেমনি আকুলি-ব্যাকুলি করে— চিরকাল করবে। যখন মেঘে মেঘে আকাশ ছাওয়া, যখন দিকে দিকে সজল হাওয়া, যখন পথে পথে দুস্তর কাদা, যখন পথ চলতে বিস্তর বাধা, তখন বদ্ধ ঘরে কর্মহীন মানুষের মন ঘর ছেড়ে ঘুরে বেড়ায় অবাধে, তখন মন কোন স্বপ্নে হয় বিভোর, কার খোঁজে আকুল, কিসের সন্ধানে ব্যাকুল, কোন ব্যথা চিত্তলোকে গুমরে ওঠে, কোন মাধুরী ছুঁয়ে যায় হৃদয়, তা' এ পরিবেশবিচ্যুত অন্য অবসর সময়ে তেমন স্মরণও করা যায় না।

চ. সিফৎ-ই-দানদান

দাঁত যে মানুষের প্রিয় ও প্রয়োজনীয় সম্পদ তা বোঝা যায় উত্তেজিত শত্রু যখন এক থাপ্পড়ে সব দাঁত ফেলে দেয়ার হুমকি ছাড়ে। এবং দাঁতভাঙা জওয়াব দিয়ে প্রতিপক্ষকে জব্দ করে। সব প্রাণীই মুখে আহার করে, কিন্তু কোন কোন প্রাণী মুখেই খাদ্য সংগ্রহ করে, তখন দাঁতই পালন করে প্রধান ভূমিকা—দাঁত যাদের খাদ্য সংগ্রহের সম্বল, সে-সব প্রাণীকে বলে দাঁতাল, শত্রুকে শিং দিয়ে কাবু করে যারা আত্মরক্ষা করে তারাই সিংহাল, নখরে যাদের ভরসা, তারা হল শ্বাপদ।

দাঁত মানুষের সম্বল ও সম্পদ বটে, তবে দাঁত ছাড়াও মানুষ বেঁচে বর্তে থাকে। কারণ যে-কোন শক্ত খাদ্যও তরল আর গুঁড়ো করার কায়দা-কানুন তার জানা আছে। কাজেই দন্তহীন মানুষ দুর্বল হয় বটে, তবে একেবারে কাবু হয় না। কিন্তু মানুষের জীবনে দাঁতের গুরুত্ব অশেষ অন্য অনেক প্রয়োজনেই। শিশুর উদরে কৃমি আছে কি-না জানা যায় যখন ঘুমের ঘোরে দাঁত কিড়মিড় করে। ক্রোধ উৎপত্তির প্রথম লক্ষণ দাঁতে দাঁত চাপা, যন্ত্রণা সহ্যের চেষ্টাও করতে হয় ঐ একই পদ্ধতিতে। সংকল্পের অভিব্যক্তির কিংবা কঠিন শক্তির পূর্ণ প্রয়োগ কালেও দাঁতকপাটির প্রয়োজন হয়। অন্যকে চটাতে হলেও বাঁদরের মতো দাঁত বের করেই খিস্তি করতে হয়, বিরক্তি প্রকাশ্যের জন্যে, গিজগিজির জন্যে, এবং ব্যঙ্গের বিদ্রূপের এমনকি আদরের ও অভ্যর্থনার জন্যেও ঠোঁটের ফাঁকে দাঁত দেখাতে হয় লঘু-গুরু ভাবে। বত্রিশ দাঁত বের করে হাসার তাৎপর্য ও অপরের উপরে তার প্রভাব ভিন্ন ভিন্ন প্রসঙ্গে, স্থানে ও কালে বিচিত্র আর সুখকর কিংবা বেদনাদায়ক হতে পারে। হাসি নানাপ্রকার—মুসকি হাসি, স্মিত হাসি, অট্টহাসি, দেঁতো হাসি, ক্রোধের হাসি, প্রতিহিংসার হাসি, বোকার হাসি ইত্যাদি এবং যে-কোন হাসি দ্ব্যর্থবোধক হতে পারে।

এ ছাড়াও দু'পাটি দাঁত যদি সুবিন্যস্ত ও সমান হয়, এবং মেজে-ঘষে তকতকে-ঝকঝকে রাখা যায়, তা হলে দাঁত অপরের স্নেহ, প্রীতি, প্রেম, সহানুভূতি, দয়া, দাক্ষিণ্য, সাহায্য লাভের কারণও হয়। অবিন্যস্ত-অমার্জিত দাঁত সুন্দর চেহারাকেও বিশ্রী করে দেয়, আবার অসুন্দর অবয়বেও সুন্দর দন্তপাঁতি ব্যক্তিকে আকর্ষণীয় করে তোলে।

দাক্ষিণ্য, সাহায্য লাভের কারণও হয়। অবিন্যস্ত-অমার্জিত দাঁত সুন্দর চেহারাকেও বিশ্রী করে দেয়, আবার অসুন্দর অবয়বেও সুন্দর দন্তপাঁতি ব্যক্তিকে আকর্ষণীয় করে তোলে।

সুন্দর দন্তপাঁতির কাব্যিক তুলনা হচ্ছে, দাড়িম্ব ও মুক্তোপাঁতি আর দাঁতের ঔজ্জ্বল্যের উপমা হচ্ছে বিজুলির চমক [চপলা চমক, ক্ষণপ্রভা] হীরের দীপ্তি। কথা বলার সময়ে কিংবা হাসার সময়ে কালো মানুষের দাঁত যথার্থই হীরের মতো এমন ঝিকমিক করে যে চোখ ফেরানো যায় না। স্মিত হাসির কালে তা হয়ে ওঠে 'চল চপলার চকিত চমক'। সুবিন্যস্ত ও সুমার্জিত দাঁত যার, বিশেষ বয়সে সে-মানুষ যখন 'হাসির কথা কয়,' তখন 'পরাণ কাড়িয়া লয়'। বাধাবিঘ্ন থাকলে তখন ব্যর্থপ্রেমিক ওই অধরার 'হাসির যন্ত্রণা'য় ভোগে। হাসি প্রাণ পায়, বঞ্জনাঋদ্ধ হয়। আর প্রাণ-কাড়া, মর্মভেদী মনোহর হয় দাঁত সুন্দর হলেই। কথায় বলে 'সুন্দর মুখের জয় সর্বত্র।' বঙ্কিমচন্দ্রের নায়িকারা সুন্দর মুখের জোরেই জয় করেছে পুরুষের হৃদয়—পাগল-করা সুন্দর মুখেও পুঁজি হচ্ছে ঝকঝকে দাঁতের সারি। কাব্যকারেরা এ তত্ত্ব জানতেন বলেই পৃথিবীর তাবৎ নায়িকা-নায়ক সুন্দর দাঁতের মালিক।

ভিন্ন রুচির ও রসের মানুষও রয়েছে, তারা চমক সৃষ্টির জন্যে সোনা দিয়ে দাঁত মোড়ায়, দাঁতে লাগায় মিশি। আবার গা-গঞ্জের লোকের ধারণা–নরকাম্য আদর্শ দাঁত হচ্ছে ইঁদুরের। সেজন্যে শিশুর দাঁত পড়লেই তা ইঁদুরের গর্তে ফেলে, যাতে শিশুর নতুন দাঁত ইঁদুরের দাঁতের মতো সরু, তীক্ষ্ণ, দৃঢ় ও শুভ্র হয়।

সবচেয়ে কাজের কথা এই—প্রিয়াকে প্রীত রাখার জন্যে, গিজগিজি দেয়ার জন্যে, গলাবাজির জন্যে, ভোট যোগাড়ের জন্যে, ভাষণ-বক্তৃতার জন্যে, বাকযুদ্ধের জন্যে দাঁত চাই, শক্ত দাঁত।

বাঙালীর চিন্তা-চেতনার বিবর্তনধারা

উৎসর্গ

বুলবুল ললিতকলা একাডেমীর প্রতিষ্ঠাতা
প্রখ্যাত সংস্কৃতিকর্মী
মাহমুদ নূরুল হুদা
শ্রদ্ধাস্পদেষু

মধ্যযুগের বাঙলা সাহিত্যে চিন্তা-চেতনার বিবর্তনধারা

প্রস্তাবনা

১. মধ্যযুগ

তুর্কী বিজয় থেকেই বাঙলায় মধ্যযুগের উন্মেষ আর প্রাচীন যুগের অবসান, যেমন পলাশীর যুদ্ধে বাঙালীর পরাজয়েই আধুনিক যুগের উষা সূচিত। এ যদি সত্য ও স্বীকৃত হয়, তাহলে বলতে হবে প্রাচীনযুগের অবসানের মূলে ছিল ইসলাম, যেমন মধ্যযুগের বিলুপ্তির মূলে রয়েছে যুরোপীয় জ্ঞান-বিজ্ঞান-সাহিত্য-দর্শন ও কৃৎকৌশল।

আমরা দেখেছি, কাসেমপুত্র মুহম্মদের সিন্দুবিজয়ের ফলে মালাবারের উপকূলে আরব ব্যবসায়ীর বহুলতার দরুন দাক্ষিণাত্যে শঙ্করের জ্ঞান-মায়া-অদ্বৈতবাদের এবং রামানুজ, নিম্বার্ক, মগধ, ভাস্কর প্রভৃতির নতুন ভক্তিবাদের ও ঈশ্বরতত্ত্বের উন্মেষ ও বিকাশ সম্ভব হয়। মাহমুদ গজনীর অভিযানের ফলে এবং কুতবউদ্দীন আইবকের শাসন-প্রতিষ্ঠা থেকে উত্তরভারতে সন্তধর্মের উদ্ভব ও বিকাশ হতে থাকে। ইসলামপূর্বকালের আরব মনন ও সংস্কৃতি উন্নত ছিল না, মধ্য এশিয়ায় ইসলাম-প্রচার-পূর্ব যুগে ছিল বৌদ্ধমত ও প্যাগান-বিশ্বাসই প্রবল। অতএব আটশতকের দক্ষিণ ভারতে এবং দশ-এগারো শতকের উত্তরভারতে নতুন যুগের সূচনা হয় ইসলামের প্রভাবেই। কাজেই দক্ষিণ ভারতে মধ্যযুগ শুরু হয় শঙ্করের নব মতবাদ অবলম্বন করেই, আর উত্তর ভারতে মধ্যযুগ সূচিত হয় নিম্নবর্ণের অস্পৃশ্য ও নিম্নবিত্তের দরিদ্র মানুষের মনোবিচলনের ও দ্রোহের ফলে। এবং এ বিচলন সম্ভব হয় জন্ম-কর্ম নিরপেক্ষ ইসলামের সামাজিক সাম্য এবং মানুষের ব্যক্তিক জ্ঞান-বুদ্ধি-কর্মের অবাধ প্রয়োগে আত্মবিকাশের ও সমাজে আত্মপ্রতিষ্ঠার অধিকার চাক্ষুষ করার ফলে।

বাঙলায় তুর্কী-বিজয় ঘটে তেরোশতকের প্রভাতকালে (১২০৪ খ্রীস্টাব্দে)। কাজেই ভারতবর্ষের পূর্ব-দক্ষিণ প্রান্ত বাঙলায় মধ্যযুগ শুরু হয় তেরোশতকের উষাকালে, আর সূচিত হওয়ার আভাস মেলে রাজা লক্ষ্মণ সেনের রাজত্বের প্রান্তপর্বে দরবেশ জালালউদ্দীনের আবির্ভাবে। লক্ষ্মণ সেনের মন্ত্রী ও স্মার্ত হলায়ুধ মিশ্র রচিত 'শেখশুভোদয়া' এ সাক্ষ্যই বহন করে। আসলে শঙ্কর মতবাদের প্রভাবতরঙ্গ বাঙলায় এসে পৌঁছেছিল, সে তরঙ্গের অভিঘাত ছাপ রেখেছিল বাঙালীর চিন্তায়-চেতনায় ও শাস্ত্রীয় মতবাদে।

২. বিদেশী প্রভাবে নতুন চিন্তা-চেতনার উদ্ভব

ভারতবর্ষে এবং বাঙলাদেশেও চিরকাল নতুন চিন্তা-চেতনার উদ্ভব হয়েছে পরাজয়ের গ্লানি থেকেই, বিদেশীর দেয়া আকস্মিক খোঁচা থেকে, পীড়ন-শোষণের অভিঘাত থেকে। কাজেই এ জাগরণ, এ চেতনা স্বশক্তির উদ্যমে প্রসূত নয়, আত্মরক্ষার সচেতন-অবচেতন প্রয়াসের প্রসূন।

মধ্যরাত্রের সুখস্বপ্ন থেকে অভাবিত অনভিপ্রেত অভিঘাতে আর্তচিৎকারে এস্তমানুষের আকস্মিকভাবে কাঁচাঘুমে জেগে ওঠার সঙ্গেই এ ধরনের চেতনার তুলনা চলতে পারে।

৩. রক্তসাঙ্কর্য

বাঙালাভাষীর এ বাঙলাদেশ চিরকালই বিভাষী-বিদেশী বিজাতি-বিজিত দেশ। অধিবাসীরাও মোটামুটি বিভিন্ন তরঙ্গে ও কালে আসা নানা গোত্রের ও অঞ্চলের বহিরাগত। প্রথম তরঙ্গের লোক দ্বিতীয় তরঙ্গে আসা লোকের কাছে হয়েছে পরাভূত, পর্যুদস্ত, অরণ্যে-পর্বতে পালায়নি যারা, তাদেরকে মানতে হয়েছে ওদের প্রভুত্ব। এমনি করে এসেছে অস্ট্রিক, নিষাদ, এসেছে আলপাইনীয় আর্য, এসেছে দ্রাবিড় ভেড্ডিড কৃষিজীবী, এসেছে মঙ্গোল কিরাত; তারপর ঐতিহাসিক যুগে বিজেতা হিসেবে এসেছে মগধ থেকে নন্দ-মৌর্য-সুঙ্গ কণ্ব-গুপ্ত-পাল সেন, পূর্ববঙ্গে এসেছে চন্দ্র-বর্মণ-দেব-খড়্গ প্রভৃতি বহির্বঙ্গীয় শাসকগোষ্ঠী। বুনো-বর্বর যুগের কথা আমরা কিছুই জানিনে, কেবল সেকালের মানুষের অবস্থা ও অবস্থান কিছু কিছু অননমুান করতে পারি মাত্র পরোক্ষ সাক্ষ্যে ও প্রাতিবেশিক প্রমাণে।

এ অঞ্চলে নানাদেশের বহুগোত্রীয় মানুষের রক্তসাঙ্কর্য ঘটছিল গোড়া থেকেই। বস্তুত মধ্যভারতের বিন্ধ্যপর্বতকে সীমা ধরে হিসেব করলে পশ্চিম উপকূল থেকে পূর্ব প্রান্ত অবধি গোটা দক্ষিণ অঞ্চলে বিভিন্ন রক্তের, বর্ণের ও অবয়বের মানুষের যত মিশ্রণ ঘটেছে এমনটি সম্ভবত পৃথিবীর আর কোথাও ঘটেনি।

৪. আর্য প্রভাব ও আদিম সংস্কার

এলাকার মানুষ যখন বুনো বর্বর স্তর অতিক্রম করে ভব্য হচ্ছে, তখন তারা শাসক উত্তর ভারতীয়দেরই ভাষার, শাস্ত্রের ও সমাজের অনুকারক ও অনুসারক। জৈন, বৌদ্ধ ও ব্রাহ্মণ্য মতবাদ এদেশে গৃহীত হয় এভাবেই। কাজেই ঐতিহাসিককালে ভাষায় শাস্ত্রে সমাজে সরকারে এবং আচারিক রীতি-পদ্ধতিতেও বাহ্যত বাঙালী উত্তরভারত প্রভাবিত।

যেহেতু জন্মসূত্রে ঘরোয়া পরিবেশে প্রাপ্ত মানুষের কোন বিশ্বাস-সংস্কারেরই মৃত্যু বা বিলুপ্তি নেই, বাহুতে প্রথম পাওয়া টিকার মতো চেতনার গভীরে তা অবিমোচ্য দাগ রেখে যায়, সেহেতু অন্তরে সুপ্তভাবে কিংবা ঈষৎ রূপান্তরে প্রজন্ম পরম্পরায় সেসব বিশ্বাস-সংস্কারও থেকে যায়, এবং শীতকালে জরাগ্রস্ত মৃতপ্রায় সুপ্ত ঔষধির মতো অনুকূল পবনে আবার প্রাণবন্ত হয়ে জেগে ওঠে। বাঙালীজীবনেও তা যুগে যুগে বারবার প্রকটিত হয়েছে বাঙালী সত্তার স্বাতন্ত্র্যের সাক্ষ্যরূপে, সাংখ্য যোগ ও তন্ত্র এবং লৌকিক দেবতা প্রভৃতি তার প্রমাণ। আগেই বলেছি, রক্তে, বর্ণে ও অবয়বে মিশ্রণ ঘটার ফলেই সম্ভবত বাঙালী চরিত্রে বৈচিত্র্যই প্রবল, কোন বিশেষ বৈশিষ্ট্যে সর্বজনীন হয়ে ওঠেনি। বাঙালীর কাছে উত্তর-ভারতীয় আর্যাভাষা ছিল শাস্ত্রের ও শাসকের ভাষা এবং সংগত কারণেই তা ছিল বিকশিত, উন্নত এবং লিখিত ভাষা। নিরক্ষর সমাজে বিদেশী শাসকের অপরিচিত ভাষা সর্বজন বোধ্য ও গ্রাহ্য হতে সময় লেগেছে। স্থানীয় জনগণের মুখের বুলিগুলোর সামান্য নিদর্শন মাত্র রয়েছে বস্তু ও ভাব নির্দেশক শব্দে এবং বাক্য গঠন পদ্ধতিতে। বিদ্বানেরা বলেন অজ্ঞাতমূল দেশী শব্দের মধ্যে রয়েছে কিরাত-নিষাদ অর্থাৎ অস্ট্রিক দ্রাবিড় ও মঙ্গোলীয় গোত্রের শব্দসম্পদ।

কিন্তু এ অঞ্চলের বাসিন্দাদের 'বঙ্গবগদশ্চের' (বঙ্গাবগধাশ্চের পাদা) জাতি বলে উল্লেখ রয়েছে ঐতরের আরণ্যকে। কোন কোন বিদ্বান মনে করেন 'বগধ' আসলে পরবর্তীকালের

'মগধ'-এরই আদি বা বিকৃতরূপ; আর 'চের' (বা ইরপাদ) এখনকার ওরাওঁ-মুণ্ডার জ্ঞাতি। কোন কোন বিদ্বান 'বগদ' আধুনিক 'বাগদী' নির্দেশক বলেও মানেন। বংগ, গংগা, দামোদাক (দামোদর) কবোদাক (কপোতাক্ষ) প্রভৃতি মঙ্গোল ভাষার শব্দ। কাজেই বঙ্গ-বগদ-চের গোত্রের বা জাতের লোক ছাড়াও এখানে নেগ্রিটো, আলপাইনীয় আর্যভাষী সেমেটিক ভেডডিড, মঙ্গোলীয় কিরাত ও অস্ট্রিক নিষাদ এবং কৃষিজীবী প্রভৃতি জ্ঞাত-অজ্ঞাত নানা গোষ্ঠীর লোক থাকার কথা।

উত্তরভারতের উন্নততর ও শক্তিমান মানুষের প্রচারের ও শাসনের ফলে উত্তরভারতীয় শাস্ত্র, ভাষা (আর্য ভাষার নাম, কোন গোত্রের বা জাতির নাম নয়। বেদ আর্যভাষী নর্ডিক গোত্রের রচিত। এ যাবৎ আর্যভাষা লোকেরা 'আর্য' নামে অভিহিত হয়ে এসেছে।) আচার-আচরণের নিয়ম নীতি এবং প্রশাসনিক ব্যবস্থা বরণ করে বাঙালীরা আর্যকৃত হল বটে, তবু এ আর্যায়নের আবরণে অন্তরে পুষে রাখল তাদের আদিম গোত্রীয় বিশ্বাস-সংস্কার ও মনন। এর ফলেই জৈন ধর্ম এখানে স্থায়ী হয়নি, বৌদ্ধমত হয়েছিল বিকৃত, ব্রাহ্মণ্যমত পেয়েছিল রূপান্তর, এমন কি ইসলামও স্থানীয় প্রভাবে আচ্ছন্ন। বাঙালীর চিন্তা-চেতনার কালিক ও স্থানিক বিবর্তন ধারার ইতিকথা হচ্ছে একাধারে আরোপিত ও স্বীকৃত নিয়ম-নীতির প্রতি আনুগত্য ও দ্রোহের বৃত্তান্ত।

আমাদের আলোচ্য বিষয় যদিও মধ্যযুগ, তবু গোড়া থেকেই আমাদের শুরু করতে হবে—বাঙালীর চিন্তা-চেতনার উৎস, রূপ-স্বরূপ ও ক্রম-বিবর্তন জানবার বুঝবার জন্যেই।

দেশের ভৌগোলিক অবস্থান, জনগোষ্ঠীর নৃতাত্ত্বিক পরিচয়, শাসক-গোষ্ঠীর কথা, বিভিন্ন গোত্রীয় লোকের বিশ্বাস, সংস্কার, মনন, মধ্যযুগ শুরু হওয়ার প্রাক্কালে বাঙালীর সামষ্টিক, সামূহিক ও সামগ্রিক অবস্থা ও অবস্থান প্রভৃতির সংক্ষিপ্ত রূপরেখা এখানে বর্ণিত হওয়া তাই বাঞ্ছনীয়।

৫. আর্যায়নের পরবর্তী বাঙলার রূপ

সাধারণভাবে দেশের নামেই অধিবাসী ও ভাষা অভিহিত হয়, যেমন জার্মানী-জার্মান-জার্মান, ফ্রান্স-ফ্রেন্স-ফ্রেন্স, বাঙলা-বাঙালী-বাঙালা। আবার ভাষা-ভিত্তি করেও জাতি ও দেশ গড়ে ওঠে। অবহট্ঠ্ যুগে মৈথিল-মগহী-ভোজপুরী-বাঙলা-উড়িয়া-আহমীয়া ভাষা ছিল অভিন্ন। পরে তেরোশতক অবিধ বাঙলা–উড়িয়া-আসামী এবং ষোলশতক অবধি বাঙলা-আসামী ভাষা ছিল অভিন্ন। কাজেই অবহট্ঠ্ যুগে যদি গোটা অভিন্ন ভাষিক অঞ্চল একক শাসনে থাকত, তা'হলে এ পূর্বদক্ষিণ ভারতবর্ষ এক অভিন্ন ভাষিক, দৈশিক ও জাতিক নামে পরিচিত হত। একক শাসনে থাকেনি বলেই লিখিত বাঙলা-উড়িয়া-আসামী ভাষা প্রায় অভিন্ন থেকেও আজ তিনটে পৃথক নামে ও সত্তায় বিভক্ত।

এখনকার বাঙলাভাষী অঞ্চলও অবশ্য কখনো অভিন্ন নামে পরিচিত ছিল না, প্রাচীনকালের রীতি অনুসারে এক এক গোষ্ঠীর লোক পরিচিত হত টোটেম কিংবা ট্যাবু গোত্র নামে (গোত্রবাচক গ্রাম-গাঁই, পরে গ্রাম 'বাস-ভূমি' অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে)। এখনকার বর্ধমান বিভাগ বা উত্তররাঢ় ছিল রাঢ়, এখানকার প্রেসিডেন্সী বিভাগ বা দক্ষিণরাঢ় ছিল সুহ্ম, পুণ্ড্র ছিল করতোয়া থেকে মিথিলা অবিধ বিস্তৃত, এখন পুণ্ড্র সামাজিকভাবে বরেন্দ্র এবং ভৌগোলিকভাবে উত্তরবঙ্গ নামে পরিচিত। বঙ্গ ছিল এখনকার ঢাকা-খুলনা বিভাগ; সমতট ছিল মেঘনাতীরবর্তী অঞ্চল সিলেট-কুমিল্লা-নোয়াখালী ; হরিখেল ছিল পার্বত্য ত্রিপুরা, চট্টগ্রাম ও পার্বত্য চট্টগ্রাম;

আর প্রাগজ্যোতিষপুর ছিল একালের কামরূপকামাখ্যা অবধি আসাম এলাকা। বিদ্বানদের মতে গোড়ায় পুণ্ড্র, রাঢ়, সুহ্ম, বঙ্গ ছিল জাতি নির্দেশক, পরে অর্থান্তরে হয়েছে স্থানবাচক। গুপ্ত শাসনকাল থেকে রাজস্ব ও প্রশাসনিক বিভাগ হিসেবে বর্ধমানভুক্তি (কংকগ্রামভুক্তি, দণ্ডভুক্তি) পৌণ্ড্রবর্ধন ভুক্তি, মণ্ডল, বিষয় প্রভৃতি বিভাগের উপবিভাগে গোটা রাজ্য অঞ্চলে বিভক্ত হয়, তুর্কী-মুঘল আমলে ইকতা, তকসিম, ইকলিম, কশবা, চাকলা, পরগনা, শিক, মহল, সরকার, জেলা প্রভৃতি রাজস্ব ও প্রশাসনিক প্রয়োজনে সৃষ্ট হয়, যেমন প্রদেশে বিভাগে-জেলায়-মহকুমায় -থানায় বিভক্ত হয় ব্রিটিশ আমলে।

৬. নৃতাত্ত্বিক পরিচিতি

রক্তসঙ্কর বলেই বাঙালীর নৃতাত্ত্বিক পরিচয় অতি জটিল। রিজলি, রমাপ্রসাদ চন্দ, বিরজাশংকর গুহ, সুনীতি চট্টোপাধ্যায়, অতুল সুর প্রভৃতি বিদ্বানেরা মাথা-কপাল-কপোল-নাক ঠোঁটের মাপে কিংবা চোখ-চুল-চোয়াল-চামড়ার লক্ষণে বাঙালীর জাত-বর্ণ-গোত্রের উৎস জানবার চেষ্টা করেছেন বটে; তবে তা পুরো যুক্তি-প্রমাণগ্রাহ্য হয়নি। সাধারণভাবে বলা চলে রাঢ়া, সুহ্মা, পুণ্ড্রা, বঙ্সা গোষ্ঠীর লোকই সমতলে ছিল মুখ্য ও সংখ্যাগুরু অধিবাসী। এরা যদি অস্ট্রিক-ভেড্ডিড-আলপীয় হয়, তাহলে বাঙলার প্রত্যন্ত আরণ্য অঞ্চলে নিষাদ কোল ভীল মুণ্ডা সাঁওতাল শবর, পুলিন্দ, ওরাওঁ, মালপাহাড়ী প্রভৃতি হচ্ছে স্বল্প-সংকর আদি অস্ট্রাল বা অস্ট্রেলীয় বা ভেড্ডিড। আর কিরাত, রাজবংশী, নাগা, কোচ, মেচ, মিজো, কুকী, চাকমা, মারমা, আরাকানী প্রভৃতি হচ্ছে স্বল্প-সংকর মঙ্গোলীয়। তাছাড়া মধ্য এশিয়ার কৃষাণ, শক, হুন, পার্থীয়, সিথীয় এবং আরব-ইরানের ও উত্তর আফ্রিকার নিগ্রো রক্তের এবং য়ূরোপীয়দের রক্তেরও ছিটেফোঁটা রয়েছে কোন কোন বাঙালীর দেহে। সমতলের হাড়ি-ডোম-মুচি-মেথর-চাঁড়াল-বাগদী-কৈবর্ত প্রভৃতি অস্পৃশ্যরাও অস্ট্রিক, ভেড্ডিড, আলপীয়দের বর্ণ সংকর বংশধর। মঙ্গোলীয় পটির বা বেড়ের বাইরের পশ্চিম ও দক্ষিণ বঙ্গের বর্ণহিন্দুরা নিজেদের আলপীয় আর্যভাষী বলে দাবী করে, এ দাবীর কোন প্রামাণিক ভিত্তি নেই। আসলে বর্ণাশ্রিত সমাজে উচ্চবর্ণের লোকেরা অন্তত গত দেড়হাজার বছর ধরে বর্ণে ও রক্তে স্বাতন্ত্র্য রক্ষা করেছে বলে তাদের অবয়ব একটা বিশেষ আদল পেয়েছে, যা নিম্নবিত্তের ও নিম্নবর্ণের বৌদ্ধদের, অস্পৃশ্যদের ও পরবর্তীকালে স্থানীয় হিন্দু-বৌদ্ধজ মুসলিম সমাজে রক্ষিত হয়নি। এরা বড়জোর আভিজাত্যের বড়াই করতে পারে—আর্যামির নয়। ডক্টর নীহার রায়ের মতে বাঙালীর দেহে আর্য-রক্ত নেই বললেই চলে।

উত্তরভারতীয় আর্যভাষা গৃহীত হওয়ার আগে বাঙলাদেশে মঙ্গোল কিরাতরা ছিল তিব্বত-চীনাভাষী। গৌতমবুদ্ধ ছিলেন নেপালের তরাই অঞ্চলের কপিলবাস্তুর শাক্যবংশীয়; বারাণসী অঞ্চল-উদ্ভূত গুপ্ত রাজারা ছিলেন মঙ্গোল লিচ্ছবীদের দৌহিত্র বংশীয়; বজ্জিদের সঙ্গে ছিল শাক্যদের সামাজিক ও শাস্ত্রিক সম্পর্ক। প্রত্যন্ত অঞ্চলের কোচ, মেচ, রাজবংশী, গারো প্রভৃতির বুলি ছিল তিব্বতীয়-চীনীয় ভাষারই উপভাষাজাত; বুড়িচঙ্গ, বানিয়াচঙ্গ প্রভৃতি গ্রামনাম এখনো এ সাক্ষ্য বহন করে। আর অরণ্য অঞ্চলে ওরাওঁ, সাঁওতাল, মুণ্ডা, প্রভৃতির ভাষায় প্রাচীন নিষাদ-অস্ট্রিকের ভাষার নিদর্শন তো আছেই। রাজমহলের মালপাহাড়ীদের ভাষায় রয়েছে কানাড়ি নামের দ্রাবিড়ভাষার লেশ ও রেশ।

শিলভ্যাঁ লেভী, ডক্টর মুহম্মদ শহীদুল্লাহ, সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় প্রমুখ আধুনিক বাঙলা ভাষায় বস্তু, স্থান ও ভাববাচকশব্দে, গণনা পদ্ধতিতে, ধ্বন্যাত্মক অনুকার অব্যয়ে, বাক্যগঠনে দ্রাবিড়-মুণ্ডাদির প্রভাব লক্ষ্য করেছেন।[১]

ভারতের আর্যভাষীর প্রশাসনে থাকার দরুন তার ভাষা এবং জৈন, বৌদ্ধ, ব্রাহ্মণ্য ধর্মগ্রহণের ফলে উচ্চবিত্তের মানুষেরা স্বাক্ষর হয়ে শাস্ত্রাদি শেখার পাঠের সুযোগ পায়, কিন্তু নিরক্ষর নিম্নবিত্তের বৃত্তিজীবী মানুষেরা সে-সুযোগ পায়নি বলেই আর্যভাষীর মনন ও সংস্কৃতি তাদের সামান্যই আয়ত্তে এসেছিল। কেবল অনুকরণজাত কিছু আচার-আচরণই তাদের প্রাত্যহিক জীবন নিয়ন্ত্রণ করত। তারাই পরবর্তীকালে স্বগোত্রীয় বিশ্বাসসংস্কারের ও শাস্ত্রের পুনরুজ্জীবন ঘটায়। মনে রাখতে হবে যে, গুপ্ত শাসনকালেই কেবল উত্তর-ভারতীয় আদলে কৃত্রিমভাবে বাঙলাদেশে বিত্ত ও বৃত্তিভিত্তিক বর্ণবিন্যাস হয়, তাও পাল আমলে শিথিল হয়ে যায় এবং সেন আমলে বৌদ্ধ বিলুপ্তির পর সেনরাজ্যে বিশেষ যত্নে পুনরায় বৌদ্ধজ হিন্দুদের বর্ণে বিন্যস্ত করা হয় এবং তা-ই আজ অবিধি চলছে। ডক্টর সুকুমার সেনের উক্তিতে আমাদের এ অনুমানের সমর্থন রয়েছে : "(১১-১২ শতকের) পরবর্তী দুতিন শতাব্দীর মধ্যে এ দেশের ব্রাহ্মণ শাসনের আওতায় ব্রাহ্মণেতর জাতিবর্গের শ্রেণী বিভাগ ও তদানুযায়ী সামঞ্জস্য গড়ে উঠতে থাকে।"[২] এক্ষেত্রে নুলু পঞ্চাননকে, দৈবকীনন্দনকে, ধ্রুবানন্দকে যেমন স্মরণ করব, তেমনি মেল-পটি-গাঁই বিন্যাসের গোজামিলও স্মরণে রাখব। তাছাড়া আদিশূর, জীমূতবাহনবল্লাল সেন, হলায়ুধ মিশ্র প্রভৃতি স্মৃতিকারকেও গুরুত্ব দেব। এসূত্রে উল্লেখ্য যে কপিল-স্মৃতি অনুসারে দানে-ধর্মে ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয় হওয়া সম্ভব ছিল। বিশ্বামিত্র কাহিনী এক্ষেত্রে স্মর্তব্য। এ সব জেনে বুঝে বর্ণে বিন্যস্ত হিন্দু সমাজের ব্রহ্মবৈবর্ত কিংবা বৃহদ্ধর্ম পুরাণোক্ত ছত্রিশ জাতির অস্তিত্ব কতটা বিশ্বাসযোগ্য তা ভেবে দেখা দরকার। তবে ছত্রিশ জাতি যদি ছত্রিশ রকমের পেশা বা বৃত্তিজীবী নির্দেশক হয়, তাহলে আপত্তির কারণ থাকে না।

পরবর্তীকালে মুকুন্দরাম ও ভারতচন্দ্র এমনি পেশাজীবী গোষ্ঠীর বা দলের হিসেবই দিয়েছেন।

সম্প্রতি উৎখননের ফলে দেগঙ্গায় চন্দ্রকেতুর প্রাসাদে এবং পাণ্ডুরাজার ঢিবিতে ও মহিষদলে বেড়াচাঁপায়-হরিণারায়ণপুরে (আনু: খ্রীষ্টপূর্ব ১০০০ অব্দ থেকে) এমন সব নিদর্শন মিলেছে এবং দু'তিনটে বৌদ্ধ জাতক গল্পে এমন কয়টি রাঢ়ীয় স্থানের নাম ও বৃত্তান্তের সামান্য আভাস মিলেছে, যাতে মনে হয় আড়াই তিন হাজার বছর আগেও রাঢ় অঞ্চল আন্তর্জাতিক বাণিজ্য বন্দর ছিল। কাজেই আর্যপ্রভাবপূর্বেও রাঢ় অঞ্চলে একটি সভ্য জাতি বাস করত। ওরা আর্যভাষী আল্‌পাইনীয় কিংবা অস্ট্রিক-ভেড্‌ডিড-নিষাদ ছিল তা জানা যায়নি। বলাবাহুল্য বাঙলাভাষী অঞ্চল মুঘল পূর্বযুগে কখনো একচ্ছত্র শাসনে ছিল না। নন্দ-মৌর্য-সুঙ্গ-কণ্ব আমলে কেবল পুণ্ড্র রাঢ় অঞ্চলই মগধরাজ্য ভুক্ত ছিল। মগধ অঞ্চলে লৌহ খনির আবিষ্কার ও লৌহনির্মিত অস্ত্রের ব্যবহারই মৌর্যদের সাম্রাজ্যের মালিক করে। ইতোপূর্বে ওই অস্ত্রের অভাবে ভারতবর্ষে ঐতিহাসিক যুগে কোন সাম্রাজ্যের সন্ধান মেলে না।[৩]

মহাভারত কিংবা রামায়ণ বর্ণিত চন্দ্র-সূর্য বংশীয় সাম্রাজ্য উপকথার বিষয় মাত্র।

পাল-সেন রাজত্বও বাঙলাভাষী অঞ্চলব্যাপী ছিল না। বঙ্গের দেব-বর্মণ-চন্দ্র শাসনও ছিল না বাঙলাভাষী অঞ্চলজুড়ে। সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ তথ্য এই যে, এসব রাজবংশ বহিরাগত। ফলে সমাজের ও সংস্কৃতির কোন সর্ববঙ্গীয় রূপ ছিল না, তবে অন্য অনেক কারণে বহু সাদৃশ্য ছিল বটে।

ভারতবর্ষের অন্যত্র সাধারণভাবে দেখা যায় একক দেবতার উপাসক বা পূজারী সম্প্রদায়, যেমন বৈষ্ণব, শৈব, শাক্ত, রামনামী, লিঙ্গায়েত, সৌর, গাণপত্য প্রভৃতি। কিন্তু বাঙালীরা সাধারণত বহুদেবতার উপাসক– এজন্যে ধর্মের ক্ষেত্রে তাদের বলা হয় পঞ্চোপাসক। এর

একটি কারণ এরা রক্ত ও মনন সঙ্কর মানুষ। অপর কারণ এরা চিরকাল বিদেশী বিজাতি শাসিত-শোষিত ভাগ্যমনের, ভীরুচিত্তের আকাঙ্ক্ষাভ্রষ্ট লক্ষ্যহীন নির্জিত মানুষ। বাঙালী চরিত্র যে অধিক দোষদুষ্ট হয়েছে, তার কারণ এ-ই।

৭. সাধারণের জীবন-জীবিকা

কূর্ম-শম্বুকের দেহাবরণই আত্মরক্ষার বর্মশিলা। পরাভূত মানুষের বা জাতিরও রক্ষাকবচ হচ্ছে তার রক্ষণশীলতা ও স্বাতন্ত্র্য-চেতনা। চিরকেলে নির্জিত বাঙালীরও স্বতন্ত্র সত্তাচেতনার ভিত্তি বা অবলম্বন ছিল সাংখ্য, যোগ ও তন্ত্র-তত্ত্ব। জৈন-বৌদ্ধ ব্রাহ্মণ্যমত ও ইসলাম গ্রহণ করেও 'বাঙালী ওই তিন দর্শন, চর্যা বা আচার ছাড়েনি। স্বনামে-বেনামে প্রকাশ্যে-গোপনে কিংবা ঈষৎ রূপান্তরে তা আজ অবধি রক্ষা করেইছে। এর একটি প্রমাণ হচ্ছে বরিশালের হাবিবপুরে প্রাপ্ত পিতলের শিব মূর্তি। শিবের উষ্ণীষের উপরে আঁকা রয়েছে ধর্মচক্র ও লোকনাথ মূর্তি।'[৪] আত্মবিকাশের সাধারণ ও স্বাভাবিক পথ যখন বিরুদ্ধ-বিরূপ শক্তির চাপে বা প্রতাপে-প্রভাবে রুদ্ধ হয়, তখন জীবন-জীবিকার ক্ষেত্রে ভাব-চিন্তা, কর্ম-আচরণ আবর্তনধর্মী হয়েই স্বাতন্ত্র্য-চেতনা, সমাজ ও সংস্কৃতি টিকিয়ে রাখে।

আজ যাদের অবজ্ঞায় কিংবা অনুকম্পাবশে 'আদিবাসী' কিংবা 'উপজাতি' নামে চিহ্নিত করি, তারা এক সময়ে বিদেশী-বিজাতির আক্রমণ প্রতিহত করতে না পেরে বনে-জঙ্গলে আশ্রিত হয়েছিল সত্তা ও স্বাধীনতা রক্ষার গরজে। তাদের যে-সব জ্ঞাতি বিজয়ীর শাসন মেনে নিল, তারাই এ কালের অস্পৃশ্য ও জলচল, নমঃশূদ্র, শূদ্র, সৎশূদ্র, নামের নির্বিত্ত বা স্বল্পবিত্তের ঘৃণ্যবর্ণের বৃত্তিজীবী হাড়ি-ডোম-মুচি-মেথর-মালী-চামার-চাঁড়াল-কুমার-বাগদী-মালো-তাঁতী-তেলী-নাপিত-ধোপা-কৈবর্ত-নিকারী প্রভৃতি শতেক পেশাজীবী মানুষ। এদেরই জ্ঞাতিদের মধ্যে যারা সমকালে ছিল উদ্যমশীল, উদ্যোগী, উচ্চাভিলাষী, সাহসী ও ধূর্ত, প্রাবৃত্তিক প্রেরণায় তারাই লোভলিপ্সাবশে ছুটে গিয়েছিল শাসকগোষ্ঠীর সঙ্গে তাদের মুৎসুদ্দি-অনুচর রূপে। তারাই প্রভুর কৃপাপ্রাপ্ত ধনী মানী সাক্ষর মধ্যশ্রেণী ও দেশী সামন্তরূপে কালিক প্রতিষ্ঠা পায় এবং কৃত্রিমভাবে বর্ণে বিন্যস্ত ব্রাহ্মণ্য-সমাজে ব্রাহ্মণ-বৈদ্য-কায়স্থ রূপে চিরকেলে আভিজাত্য লাভ করে অর্থাৎ স্বীকৃতি পায়।

সুপ্রাচীন কাল থেকেই দেখা যায় দেশে বা সমাজে নিঃস্ব মজুর, প্রান্তিক চাষী, চিরদরিদ্র বৃত্তিজীবী এবং দাসই হাজারে ছিল নয়শ' নিরেনব্বই জন। শাহ-সামন্ত ছিল বিস্তৃত অঞ্চলে ক্বচিৎ কেউ, আর ছিল বেণে, মুৎসুদ্দি, গোষ্ঠীপতি, গ্রাম সর্দার, টাউট এবং শিক্ষক। পুরোহিত ও সাক্ষর কিছু ধূর্ত শ্রেণীর লোক ছিল, যারা এ যুগের সংজ্ঞায় ও মাপে মধ্যশ্রেণী। কাজেই প্রাচীনকাল থেকেই সমাজে ঐশ্বর্যবান মানুষ ছিলেন রাজা, অমাত্য ও উচ্চপদের রাজকর্মচারীরাই। এঁরাই ছিলেন মানুষের জান-মালগর্দানের মালিক—দণ্ড-মুণ্ডের অধিকারী। তাই শাসন-শোষণের মতোই—ব্যক্তির কিংবা সমাজের কল্যাণে দান-দয়া-দক্ষিণা-কর্মে, কৃপা বিতরণে, অনুগ্রহ প্রদর্শনে, সম্মান দানে পুরস্কৃত করার অবাধ অধিকার ছিল কেবল রাজার ও উচ্চবিত্তের ক্ষমতাবান রাজপুরুষদের এবং বণিকদের। আর শাস্ত্রীয় ও সর্বপ্রকার বিদ্যাচর্চার অধিকার সীমিত ছিল উচ্চতর বর্ণের ব্রাহ্মণ পরিবারের মধ্যে, চিকিৎসাশাস্ত্র ছিল বৈদ্য নামের ব্রাহ্মণ-অব্রাহ্মণ রক্তের মনুষ্যশ্রেণীর অধিকারে। বৈষয়িক জীবনে অপরিহার্য নানা পরিমাপ ও গণনা বিদ্যা এবং চিঠিপত্র, চুক্তিপত্র প্রভৃতি লেখার মতো জ্ঞান অর্জনে অধিকার ছিল কায়স্থ নামের সে যুগের কেরানীদের। সাধারণভাবে প্রশাসনের কেন্দ্রে বা উপকেন্দ্রেই মিলিত

সার্থবাহন বণিকদের, নগরশ্রেষ্ঠী মহাজনদের, কুলিক (বৃত্তিজীবী) কায়স্থদের এবং অধিষ্ঠানাধিকরণের বা শাসন পর্ষদের প্রধান 'উপরিক' বা ভুক্তিশাসক। রাজপ্রতিনিধি মহাসামন্ত বা প্রতিরাজরাও থাকত নগরে বন্দরে। সরকারি দপ্তরের প্রধান ছিলেন পুস্তপাল বা মহাফেজ। মহামাণ্ডলিক, বিষয়পতি প্রভৃতিও ছিলেন। ভুক্তি, মণ্ডল, বিষয়, বীথিও গ্রাম শাসনের জন্যে ছিলেন নানা স্তরের বিভিন্ন অধিকর্তা।[৫]

এ জন্যে প্রাচীন কিংবা মধ্যযুগে সাধারণের কোন কৃতি-কীর্তির সন্ধান মেলে না; এমনকি ইট-পাথরেও ছিল না এদের অধিকার। তাই ভবন-অট্টালিকা মঠ-মন্দির বিহার-চৈত্য-মসজিদ-মকবেরা সবই ধনীলোকেরই কৃতি-কীর্তির সাক্ষ্য ও স্বাক্ষর হয়ে রয়েছে। যদিও সবকিছুর আবিষ্কর্তা ও নির্মাতা হচ্ছে নিম্নবর্ণের ও নিম্নবিত্তের শ্রমিক শ্রেণীর বৃত্তিজীবী মানুষ। চিত্র শিল্পে, ভাস্কর্যে, স্থাপত্যে, বস্ত্রশিল্পে (রেশম-মসলিন), নাচ-গান-বাজনায় যারা প্রত্যক্ষভাবে ছিল জড়িত, যারা ঘাম ও শ্রম দিয়েছে তাদের কৃতি-কীর্তি স্বীকৃতি পেলেও তারা সমাজে কখনো সম্মানের আসন পায়নি, ধনে-মানে-মর্যাদায় হয়নি অভিজাত শ্রেণীভুক্ত। তাদের সামাজিক অবস্থান ছিল অবজ্ঞেয়, এমন কি অস্পৃশ্যও। যেমন নৃত্যগীতবাদ্যে বিকাশ ও উৎকর্ষ ঘটেছে যে-সব গাইয়ে-বাজিয়ে-নাচিয়ের সাধনায় ও দানে, তারা ছিল নট শ্রেণীর নিম্নবর্ণের সম্প্রদায় এবং বারাঙ্গনা, অথচ ললিতকলার সমঝদার হল শাহ্-সামন্ত, ধনী-মানী বিত্তবান শ্রেণীর মানুষ। অজন্তায় ইলোরায় কাজ করেছিল যারা, মসলিন যাদের সৃষ্টি—তারা এ যুগেও চা বাগানের কর্মী, কারখানার শ্রমিক এবং তারা অশনে-বসনে-নিবাসে-নিদানে আজো দুর্গত।

অতএব, বাঙলার ইতিহাসের যে-অংশে রাজ্য, রাজপুরুষ, প্রাশাসনিক ব্যবস্থা, স্থাপত্যশিল্প, লিখিত শাস্ত্র, সাহিত্য, দর্শন, সংস্কৃতি কিংবা শিলালিপি ও তাম্রশাসন বা পট্টোলির আলোচনা রয়েছে, সে-অংশ বাঙলার বা বাঙালীর ইতিহাস নয়। বাঙলার ও বাঙালীর আদি ও অকৃত্রিম ইতিকথা মিলবে তার সৃষ্ট দেবতায় মূর্তি ও পটুয়া শিল্পে, দেবতার মহিমা-মাহাত্ম্য চেতনার বৈচিত্র্যে, কামার-কুমার-তাঁতী-ঘরামি-পটুয়ার কৃৎকৌশলে ও আঙ্গিক রূপচেতনায়। তাঁর প্রত্যয়ের, প্রত্যাশার, প্রজ্ঞার ও প্রার্থিত জীবনের আর প্রত্যক্ষ মননের সাক্ষ্য রয়েছে নাথ-নিরঞ্জন-ধর্ম-শিব-চণ্ডী-মনসা-বৎসলা-তারা-যক্ষ-ক্ষেত্রপাল প্রভৃতি দেবকথায়। বাঙলার প্রচলিত রাজনীতিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক ইতিহাস হচ্ছে শাসকগোষ্ঠীর কৃতি-কীর্তির ইতিহাস—সেখানে শাসিত-শোষিত অস্পৃশ্য-অবজ্ঞেয় বাঙালীর কথা নেই—এমন কি স্বীকৃতও নয় তার অস্তিত্ব ও স্বতন্ত্র সত্তা।

৮. শাস্ত্র ও সংস্কৃতির ভিত্তি ও বিকাশ

আজকাল মোটামুটি সবাই স্বীকার করে যে উরাল পর্বত ও দানিয়ুব নদীর মধ্যবর্তী অঞ্চলে আর্যভাষী মানুষের ছিল আদি নিবাস। আর্যভাষী ভিন্ন গোত্রের একদল পরে আলপাইন পর্বতাঞ্চলে বাস করতে থাকে। আর আর্যভাষী, দীর্ঘশির বলিষ্ঠ গৌরবর্ণ দীর্ঘকায় লম্বাটে মাথার, সরু-লম্বা নাকের সুন্দর মানুষরাই উরাল পার্বত্যাঞ্চল থেকে আম-শির দরিয়ার তীর বেয়ে প্রথমে ইরানে বসতি স্থাপন করে। সেখানে কালক্রমে তাদের মধ্যে মত-পথের, চিন্তা-চেতনার ও আচার-আচরণের পার্থক্য প্রকট ও দ্বন্দ্ব তীব্র হওয়ায় একদল জীবন-জীবিকার এবং মত-পথের নিরাপত্তা ও স্বস্তি সন্ধানে উত্তর-ভারতে প্রবেশ করে বিজয়ীর দর্প-দাপটে। সে-যুগে দেশান্তরে গমন ও বাস কেবল বিজয়ী গোত্রের বা জনগোষ্ঠীর পক্ষেই হত সম্ভব। ইরানে স্বভাষী স্বগোত্রীয়দের মধ্যেকার দ্বন্দ্বের ও বিচ্ছিন্নতার কিছু আভাস মেলে প্রাচীন পাহলবীতে ও বৈদিক

ভাষায় বিধৃত কিছু শব্দে ও বৃত্তান্তের ইঙ্গিতে। যেমন 'দেও' ইরানীদের অরি, দেব (দেও) ভারতীয়দের মিত্র। অহোর ইরানীদের পূজ্য, আর অসুর ভারতীয়দের ঘৃণ্য শত্রু, আবার মেতরো বা মিত্র (সূর্য) মিহির (মেহের)এবং সূর্যের মর্ত্য প্রতিভূ অগ্নি উভয় দলেই পূজ্য, বৃত্র আর বেতরোও (সর্প) উভয় দলেরই অরি। তেমনি 'অগ্নি'ও ছিল উভয় দলের সহায়ক শক্তি।

বিদ্বানদের ধারণা ঋকবেদেরে প্রথম দিককার সামান্য অংশ সম্বল করেই আর্যভাষীরা এদেশে প্রবেশ করেছিল বিজেতা হিসেবে। এ অংশে ইন্দ্রই তখন খাদ্য বা অন্ন সংগ্রাহক। যাযাবর পশুজীবী আর্যরা অশ্ব, বৃষ, মহিষ, মেঘ, ছাগ, গাভী, মাংসে ছিল আসক্ত, গোড়ায় তারা ছিল মাংসাশী। অবশ্য দধি, দুগ্ধ, ক্ষীর, যব, পক্তি, পুরোডাস, অপূপাত্ত, করম্বই ছিল পিঠাজাতীয় খাদ্য।

এদের দলপতিত তখন ইন্দ্র। ইনিই দস্যুবত্তির মাধ্যমে ভিন্ন গোত্রের নারী এবং অন্ন, পশু, প্রভৃতি সম্পদ সংগ্রহ করতেন। গোড়ায় আর্যগোষ্ঠী তাঁর বল-বীর্যের উপরই নির্ভর করত। তাই বেদে তাঁর সম্বন্ধে রয়েছে প্রায় হাজার সূক্ত। জাতবেদ অগ্নির মাধ্যমে যাজ্ঞিক হোম ও সোমরসপান আর স্থানীয় গোত্রগুলো থেকে ছলে বলে নারীসংগ্রহ করাই ছিল এদের প্রাত্যহিক জীবনের লক্ষ্য। তাই বিয়ের বা নারী সংগ্রহের ছিল প্রায় আট প্রকার পদ্ধতি। রাক্ষস, দস্যু, গান্ধর্ব, অসুর প্রভৃতি বিবাহ ছলবল প্রয়োগেরও অসামাজিকতার সাক্ষ্য বহন করে। এমনকি হরণ করে বয়ে আনা হত বলে নারী হত বধূ নামে অভিহিত। কামে-প্রেমে-হরণে-ধর্ষণে প্রয়োজনে (ক্ষেত্রজসন্তান উৎপাদন লক্ষ্যে) নারী সম্ভোগ ও সন্তান উৎপাদন ছিল নিয়ম-নীতিরই অন্তর্গত। এ সূত্রে ছান্দোগ্য উপনিষদ এবং উদ্দালক ঋষির উপাখ্যান স্মর্তব্য। বিদেশাগত কোন বিজয়ীর সংখ্যাই স্থানীয় অধিবাসীর চেয়ে বেশি হয় না, বস্তুত সৈন্যদলই দেশজয় করে। কাজেই আর্যদেরও সংখ্যা বেশি ছিল না, এবং তাতে নারী ছিল হয়তো নগণ্য সংখ্যক। তাই দেশী নারী তাদের সংগ্রহ করতেই হয়েছে। আর্য স্বামীরা তাই ভিন্ন গোত্রীয় নারীর চোখে আর্যপুত্র এবং বিদেশাগত সংখ্যাল্প যাযাবর আর্যরা পশুপালন কর্মী ও যোদ্ধা সৃষ্টির লক্ষ্যে তাই 'পুত্রার্থে ক্রিয়তে ভার্যা' নীতির ছিল প্রচারক। ভাই-বোনে দাম্পত্য সুপ্রাচীন, সামবেদে যম-যমী–এই ভাই-বোনের বিয়ের কথা রয়েছে। ইরানে ভাইয়ে-বোনে বিয়ে হত। উত্তর পূর্ব ভারতের আদিবাসীর শাশুড়ী ও বিমাতা বিয়ে, দক্ষিণ ভারতে ভাগ্নী ও মামাতুতো-পিসতুতো ভাই-বোনে বিয়ে, কেরলে-হিমালয়ের পাদে দ্রৌপদী বিয়ে, দশরথজাতকে রাম-সীতার বিয়ে—ভাই-বোনে বিয়ে প্রথারই জের। নিত্যচলমান যাযাবরদের গৃহস্থালীর বিস্তার ঘটতে পারে না। স্থায়িবাসিন্দা না হলে আত্মপ্রসার, সম্পদসঞ্চয় কিংবা ঘরবাড়ি নির্মাণ অথবা কৃষিজীবী হওয়া সম্ভব হয় না, তাই যাযাবর আর্যদের তেমন কোন সভ্যতাসংস্কৃতি ছিল তো নাই-ই, অধিকন্তু তারা ছিল দস্যু এবং নগর-সভ্যতার শত্রু। সভ্য গোত্রগুলোর নগর বা পুর ধ্বংস করত বলেই আর্য দস্যুপতি ইন্দ্রের অপর নাম পুরন্দর। ঋগ্বেদের অধিকাংশ ভারতেই রচিত। তাই তাতে রাত্রি, দেবী, সরস্বতী, বিষ্ণু, রুদ্র প্রভৃতি স্থানীয় নারী-পুরুষ দেবতাও ঠাঁই পেয়েছেন। রাক্ষস, দস্যু, দাস, দৈত্য, অসুর, পণি, দানব, যক্ষ, বানর, কুকুর, হনুমান, নাগ প্রভৃতি টোটেম ট্যাবু নামের (পরবর্তী-কালে তাৎপর্যবিহীন অবজ্ঞেয় নামের) ভব্য গোত্রগুলোর আচার-আচরণ নিয়মনীতি, সভ্যতা-সংস্কৃতি, জগৎ-চেতনা ও জীবন-ভাবনা, কৃৎকৌশল প্রভৃতি সব কিছুই তাদের গ্রহণ-বরণ করতে হয় সভ্যদের শাসক হওয়ার প্রয়োজনে। স্থাপত্যে-ভাস্কর্যে ও গৃহ বা সভ্য সজ্জায় ছিল দানবেরা পটু, ময়দানবের বৃত্তান্ত এ ক্ষেত্রে স্মর্তব্য। বানর বালি-সুগ্রীবের পিতা সুষেণ ছিলেন শল্যচিকিৎসক। শুক, নারদ, ব্যাস, ভীষ্ম প্রমুখ মনীষীরা ছিলেন

অনার্য মানুষ। কৃষিজীবী ছিল এদেশের অধিকাংশ গোত্র। জনক দরবারে হরধনু ভাঙা, সীতা লাভ, রামের পদস্পর্শে অহল্যার জেগে ওঠা প্রভৃতি রূপক কাহিনী এসূত্রে স্মরণীয়। লিপিবিদ্যাও সম্ভত প্রাগার্য আবিষ্কার। মহাভারতের কবি জেলেনীপুত্র কৃষ্ণদ্বৈপায়ন ব্যাস—এ অনুমানের উৎস হতে পারেন। আমরা ইতিহাসের সাক্ষ্যে জানি উন্নত মনন ও সংস্কৃতিবিহীন কোন জাতি যদি বাহুবলে কোন দেশে সভ্যতা-সংস্কৃতিতে শ্রেষ্ঠ কোন জাতির বা গোত্রের উপর প্রভুত্ব প্রতিষ্ঠা করে, তাহলে বিজয়ী হয়েও সংস্কৃতি ও মননক্ষেত্রে তারা স্বতোই হয় বিজিত। এভাবে বিজয়ী রোমানেরা গ্রীকদের কাছে, বিজয়ী আরবেরা ইরাক-ইরানের কাছে ছিল ঋণী। বিজয়ী আর্যরা তাই শাসিতজন থেকেই শিখে নিয়েছিল সভ্যলোকের ভাব-চিন্তা-কর্ম-আচরণ আর স্থাপত্য-ভাস্কর্য প্রভৃতি চৌষট্টি কলা। ডক্টর অতুলকৃষ্ণ সুরের ভাষায় : "মৃত্যুর পর আত্মার অস্তিত্বে বিশ্বাস, মৃতব্যক্তির প্রতি শ্রদ্ধা, বিবিধ ঐন্দ্রজালিক প্রক্রিয়া ও মন্ত্রাদি, প্রকৃতির সৃজন শক্তিকে মাতৃরূপে পূজা, শিব ও লিঙ্গ পূজা, কুমারী পূজা, অশ্বত্থ ও বটবৃক্ষ পূজা, সর্পপূজা, টোটেমের প্রতি ভক্তি ও শ্রদ্ধা, দেবদেবীর বাহনের কল্পনা, জন্তু পূজা, গ্রাম্য নদীবৃক্ষ-অরণ্য ও অরণ্য ভূমির মধ্যে নিহিত শক্তির পূজা, মানুষের ব্যধি ও দুর্ঘটনাসমূহ দৃষ্টিশক্তি বা ভূতপ্রেত দ্বারা সংঘটিত হয় বলে বিশ্বাস, বিবিধ নিষেধাজ্ঞা জ্ঞাপক অনুশাসন, জন্ম, মৃত্যু, বিবাহ, শ্রাদ্ধ প্রভৃতি আনুষ্ঠানিক ধর্ম-কর্ম, নব পত্রিকার পূজা, শবরোৎসর, নবান্ন, পৌষপার্বণ, হোলি, ঘেঁটু পূজা, চড়ক গাজন, মনসা, শীতলা, কালী, করালী, ছিন্নমস্তা, পর্ণশবরী প্রভৃতির পূজা, দেবতার জন্য মন্দির নির্মাণ, চিত্রাঙ্কন ও লিখন-প্রণালী, দশাবতারবাদ প্রভৃতি আমাদের প্রাগার্যদের কাছ থেকেই নেওয়া।[৬]

ভারতের অবতারবাদ ভূমধ্যসাগরীয় দ্রাবিড়দেরই দান, এটি নবীবাদেরই ভারতীয় রূপান্তর। উল্লেখ্য যে, বিভিন্ন যুগে কেবল বিষ্ণুরই নয়জন অবতার রয়েছে। আপোসলক্ষ্যে সৌজন্যে দশম অবতার হচ্ছেন গৌতমবুদ্ধ। ব্রহ্মা, শিব, শক্তি, প্রভৃতির কোন অবতার ছিল না। দ্রাবিড় মানসজাত অবতারবাদের সঙ্গে ভক্তির সংযোগ তাই স্বাভাবিক হয়েছে। সূর্য স্বরূপ সৃষ্টি-স্থিতি-সংহারের দেবতা শিলা বা লিঙ্গ প্রতীকে পরবর্তীকালে ত্রিগুণের (স্রষ্টা, পালক ও সংহারক বা স্বত্ব-রজ-তম) ত্রিশূল প্রতীকে এবং আরো পরে জটাধারী অহিভূষণ সার্দুলচর্ম পরিহিত ত্রিশূলধারী কৃষ্ণবর্ণের বৃদ্ধ পুরুষরূপে প্রস্ফুর্তরূপ প্রাপ্ত হন তিনি। সর্বভারতীয় তথা সর্বগোত্রীয় দেবতা বলেই তিনি নানা বিরুদ্ধ গুণের অসমন্বিত প্রতীক পুরুষরূপে দেবাধিদেব মহাদেব রূপে স্বীকৃতি পান। উল্লেখ্য যে শিব, উমা, কৃষ্ণ, বাসুদেব, রাম প্রভৃতি অনার্য নাম। রাম ছিলেন নবদূর্বাদল শ্যাম, কৃষ্ণ ছিলেন নবঘনশ্যাম, শিব ও কালী, চণ্ড ও চণ্ডী কালো, আর্যপ্রভাবে কালী শেষে হয়েছেন গৌরীগৌর বর্ণা, যেমন রাধাও হয়েছেন গৌরী। অতএব শিব, কালী, রাম, কৃষ্ণ—এঁরা আর্য নন। আমরা আগেই বলেছি সাংখ্য ও যোগ অস্ট্রিক বাঙালীর এবং তন্ত্র মঙ্গোলগোত্রীয় বাঙালীর অবদান।

এছাড়া জন্মান্তরবাদ, পশু-পাখি, নারী ও বৃক্ষ পূজা (দারুব্রহ্ম-জগন্নাথ স্মতর্ব্য) মন্দির উপাসনা, প্রতিমা বা মূর্তি পূজা, স্বর্গ-নরক ভূতপ্রেত-পিশাচ ব্রহ্মাবিষ্ণু-মহেশ্বর তত্ত্ব, পরমা প্রকৃতিতত্ত্ব, লিঙ্গপূজা, গণপতি পূজা, চণ্ডী, মনসা, ওলা, শীতলা, বৎসলা, যক্ষ, ক্ষেত্রপাল, ঋতুপূজা, ছটপরব, ষষ্ঠীপূজা, দুর্গাপূজা, বা দশমহাবিদ্যাসম্পন্না দশহরাপূজা, লক্ষ্মী-সরস্বতী, কার্তিক, গণেশ, প্রভৃতি সব ধারণা ও পৌত্তলিকতা আর্যপূর্ব যুগের ভারতবাসীর দান।[৭] কাজেই এখনকার ব্রাহ্মণ্য ধর্মের সব শাখা ও শাস্ত্র কালিক ও স্থানিক পুষ্টি ও বিবর্তন পেয়ে, গুণে মানে-মাহাত্ম্যে, তত্ত্বেও তথ্যে, রূপে ও স্বরূপে, তাৎপর্যে ও ব্যঞ্জনায়, কলেবরে ও মনন উৎকর্ষে আজকের অবস্থা ও অবস্থান পেয়েছে।

আধুনিক ব্রাহ্মণ্য আচারিক ধর্মে বৈদিক নীতি-নিয়ম এবং রতি-পদ্ধতি সামান্যই রয়েছে। আধুনিক কোন কোন বিদ্বানের মতে উপনিষদ বা বেদান্তও হচ্ছে অনার্যমননের ফসল। বলা হয় বিদেহের অনার্যরাজ্য জনকের সভাতেই নাকি উপনিষদ চর্চার শুরু। অন্তত ছান্দোগ্য, বৃহদারণ্যক প্রভৃতি দু'চারটি উপনিষদ যে সাংখ্যতত্ত্ব ও তন্ত্রমত প্রভাবিত, তা অস্বীকার করা যাবে না। 'ইন্দ্র-বিরোচন সম্বাদ'-নারী সম্ভোগরূপ যজ্ঞ প্রভৃতি তত্ত্ব এ সূত্রে স্মর্তব্য।[৮]

এভাবে স্বল্প সংখ্যক বর্বর যাযাবর পুরন্দর (নগরবিধ্বংসক) বিজেতা আর্যরা শাসিত গোষ্ঠীগুলো থেকে শাস্ত্র, সমাজ, সরকার, সভ্যতা-সংস্কৃতি, আচার-আচরণ, নিয়ম নীতি, শাসনপদ্ধতি, কৃষি-শিল্প-বাণিজ্য (পণি পণ-পণ্য/বণিক-বণিজ-বাণিজ্য-শ্রেষ্ঠ-সেঠ-হট-হাঁট্টি এসব পণি, বণিক, সার্থবাহ প্রভৃতি ব্যবসায়ী শ্রেণী) প্রভৃতি শিখে নিয়ে প্রভুত্ব করেছে। এবং চিরকেলে নিয়মে ভারতীয় শাস্ত্র-সমাজ-সরকার-সভ্যতা-সংস্কৃতির সবকিছু শাসকগোষ্ঠীর নামে পরিচিত হয়েছে, এখনো যেমন দেশের যেকোন সরকারি-বেসরকারি প্রতিষ্ঠানে যুক্ত হয় শাসক-প্রশাসক-নেতা-উপনেতা কিংবা শিল্পী-সাহিত্যিক কৃতিমানুষদের নাম। বাহুবলে বিজয়ী আর্যভাষীরা জীবন-জীবিকার অন্যান্য ক্ষেত্রে এমনি ভাবে হল বিজিত, করল আপোস, হল দেশী শাস্ত্র সমাজ সংস্কৃতির অনুগত। বৈদিক দেবতা মিত্র, বরুণ, সবিতা, পুষণ, উষা হারালেন প্রভাব ও প্রতিষ্ঠা। অনার্য দেবতারা প্রাকৃত শক্তির স্তাবক আর্যদের ঘাড়ে বসলেন চেপে। আর্যদের দলপতি হন্তা-দস্যু ইন্দ্র যে শুধু পদচ্যুত হলেন তা নয়, চরমভাবে লাঞ্ছিতও হলেন। এতে বোঝা যায় শাসিত জনগোষ্ঠী শাসকগোষ্ঠীর অজ্ঞতার ও দুর্বলতার পুরো সুযোগ নিয়ে প্রতিশোধও নিয়েছিল। এ সূত্রে দেবরাজ ইন্দ্রের লাঞ্ছনার বৃত্তান্ত উল্লেখ্য। সে-কালে গুরুগৃহে থেকেই ছাত্ররা অধ্যয়ন করত, পাছে গুরুপত্নীর প্রতি সার্বক্ষণিক সান্নিধ্যজাত যৌন দুর্বলতা জাগে, এ আশংকায় গুরুপত্নী মাতৃস্বরূপা রূপে অগম্যা বলে পাঁতি ছিল, ইন্দ্র কিন্তু গুরুপত্নী অহল্যাকে ধর্ষণ করার চেষ্টা করলে গুরু গোতমের বা গৌতমের অভিশাপে তাঁর সর্বাঙ্গে সহস্র ভগ প্রকট হল, পরে তা সহস্র চক্ষুতে হয় পরিণত। অনার্য পুরাণকারগণ এমনি কাহিনী বানিয়ে ইন্দ্রকে মর্যাদা ও প্রতিষ্ঠাচ্যুত করে পূর্ব নির্যাতনের প্রতিশোধ নিয়েছেন। এখানেই শেষ নয়। আরো একটি উপাখ্যান রয়েছে, তাতে দেখা যায় ব্রজে দেবরাজ ইন্দ্রের ও অবতার কৃষ্ণের দ্বন্দ্বযুদ্ধে ইন্দ্র পরাজিত ও বিতাড়িত হয়েছেন।[৯] এভাবে অনার্য অবতার কৃষ্ণ পেলেন প্রতিষ্ঠা। এও শাসক আর্য ও শাসিত অনার্যের শাস্ত্রিক সাংস্কৃতিক দ্বন্দ্বের ও জয়-পরাজয়ের ইতিকথার রূপক।

কালে সামাজিক জীবন ধারায় দেশী-বিদেশীর শাসক-শাসিতের দ্বান্দ্বিক সম্পর্ক ও অবস্থান বিলুপ্ত হয়েছে। এখানে দ্বন্দ্ব-মিলনের কাহিনীর নায়ক বাসুকী, জরতকারু, রাবণ, প্রহ্লাদ, কুবের স্মর্তব্য। পরে কুষাণ, শক, হুন, পার্থীয়ান, তুর্কী, মুঘল-আরব-ইরানী এসে আচার-আচরণ, শাস্ত্র-সমাজ-সরকার ও সংস্কৃতি ক্ষেত্রে নানা রূপান্তর ঘটিয়েছে। সবটি আজকের একজন সাধারণ ভারতীয় হিন্দুর কাছে কেবল আর্য ও ব্রাহ্মণ্য সভ্যতার ও সংস্কৃতির অবদান হিসেবে প্রতিভাত। ফলে দেশজ জৈন-বৌদ্ধ বিশেষ করে মুসলিম-খ্রীস্টান তাতে নিজেদের অনধিকারী বলে মনে করে, ভিন্ন শাস্ত্রের ধারক হয়ে তারা পূর্ব পুরুষের রিক্‌থ স্বেচ্ছায় ছেড়ে দিয়েছে। নিজেদের বঞ্চিত করেছে ঐতিহ্যের গৌরব, গর্ব ও প্রেরণা থেকে।

স্থূল কথায় বৃত্তি-প্রবৃত্তি চালিত প্রাণিসুলভ জীবনে অর্জিত আচরণ ও মননই সংস্কৃতি। এ তাৎপর্যে জীবিকা সম্পৃক্ত জীবনের একক বা যৌথ সার্বক্ষণিক ও বহুধা অভিব্যক্তিই সংস্কৃতি। দলবদ্ধ মানুষের জীবনযাত্রার সামগ্রিক ও সামূহিক রূপই এক অর্থে সংস্কৃতি হলেও বাঞ্ছিত

স্তরের ও উৎকর্ষের না হলে মানুষের অর্জিত ভাব-চিন্তা-কর্ম-আচরণ কিংবা কৃৎ-কৌশল মাত্রই সংস্কৃতি বলে স্বীকৃত হয় না। কেননা বুনো-বর্বর-ভব্য মানুষ বা সমাজ মাত্রেরই স্থূল বা মৌল সংজ্ঞায় সংস্কৃতি থাকে। তাই তা গুরুত্ব বা মর্যাদা পায় না।

জীবন কেবল জীবিকাগত নয়, স্থাল-কাল এবং গোষ্ঠীগতও। মানব-সংস্কৃতিতে বৈচিত্র্য, বিভিন্নতা, বিবর্তন ও বৈষম্য বা অসমবিকাশ কিংবা বন্ধ্যা আচারবদ্ধতা ঘটে এ কারণেই। চলমান জীবনে নয়া নয়া প্রতিবেশে প্রাত্যহিক মানস-ব্যবহারিক প্রয়োজন পূরণ-প্রেরণাজাত অনুভূতির ও মননের এবং আকাঙ্ক্ষার বাস্তব অভিব্যক্তিই তথা চিন্তাচেতনার বহিঃপ্রকাশই বিকাশমান সংস্কৃতির সাক্ষ্য। বেঁচে বর্তে থাকার জন্যেই প্রয়োজন হয়েছে সম্পদের, শাস্ত্রের, সমাজের, সরকারের, সংস্কৃতির, সভ্যতার, শিক্ষার ও রাষ্ট্রের। সংস্কৃতির উৎকর্ষের ও বিকাশের গতি অব্যাহত রাখার জন্যে যে-কোন অবস্থানে জীবন-জীবিকার আর্থিক নিরাপত্তার প্রতিবেশ ও মানসিক স্বস্তির পরিবেষ্টনী প্রয়োজন। যেখানে পরিবেশ আত্মবিকাশের ও আত্মপ্রসারের অনুকূল, সেখানে সংস্কৃতি জীবনের সর্বাত্মক ও সর্বাঙ্গীন বিকাশের প্রতীক ও প্রতিভূ। আর যেখানে প্রতিবেশ প্রতিকূল, সেখানে সংস্কৃতি জরায়, জড়তায়, জীর্ণতায় ও চিরন্তনতায় বন্ধ্যা, বিকৃত নিষ্প্রাণ আচার ও আচরণমাত্র, নিতান্ত বিশ্বাসের ও সংস্কারের অনড় বন্ধন বা নিগড় মাত্র। তা'ছাড়া মানুষের আশৈশব প্রাপ্ত বিশ্বাস-সংস্কারের যেহেতু মৃত্যু নেই, সেহেতু শাস্ত্রিক ও দেশজ-লোকজ বিশ্বাস-সংস্কার সাধারণ শিক্ষিতদের মধ্যেও থেকে যায়। তাই তুক-তাক, দারু-টোনা, বাণ-উচ্চাটন, ঝাড়-ফুক, তাবিজ-কবজ, মন্ত্র-মাদুলি যেমন গুরুত্ব পায়, তেমনি তিথি-নক্ষত্র-লগ্ন, কিংবা কাক, পেচক-শকুন-শালিক, গাভী-শেয়াল-সাপ-টিকটিকি হাই-হাঁচি হুছুট আর ধান, দূর্বা, আম্রসার, কলাগাছ, ঘট-কুলা-দীপ-ধুপ-মাছ-দই প্রভৃতিও প্রতীকি শক্তির স্বীকৃতি পায়। এসব বাধা-বিঘ্ন, সত্ত্বেও কাঙ্ক্ষী মানুষ হাতিয়ারের উৎকর্ষ সাধন করে করে, মননের চর্চা করে করে আজকের যুক্তির, যন্ত্রের ও বিজ্ঞানের যুগে উত্তরিত হয়েছে।

সংজ্ঞাবদ্ধ করলে কোন দেশের বা সমাজের বা সম্প্রদায়ের মানুষের শ্রেয়োচেতনাজাত পরিস্রুত ভাব-চিন্তা-কর্ম-আচরণের অভিব্যক্ত রূপই তার সংস্কৃতি। তার শ্রেষ্ঠ গুণের ও কর্মের প্রকাশিত রূপই তার সংস্কৃতি। অতএব, সংস্কৃতি স্থানে কালে ও সমাজে চৌষট্টিকলা এবং মানবপ্রীতি, সংযম, সৌজন্য, দায়িত্ববোধ ও কর্তব্যচেতনা, ন্যায় ও শ্রেয়োবোধজ্ঞাপক এবং জ্ঞান-বুদ্ধির উপরে প্রজ্ঞার ও বিবেকের গুরুত্বচেতনা প্রভৃতির অধিকারই শ্রেষ্ঠ সংস্কৃতি।

সংস্কৃতির সংজ্ঞারূপে 'শেষের কবিতায়' রবীন্দ্রনাথ-উচ্চারণরিত কমলহীরের রূপক স্মরণে বলা যায়— 'নির্মিত সামগ্রীতে শ্রী, যন্ত্রে উৎকর্ষ, চিন্তায় শ্রেয়োবুদ্ধির দীপ্তি, কর্মে কল্যাণ চেতনার ব্যঞ্জনা, আচরণে সৌজন্যের আভা, সজ্জায় সৌন্দর্য, কথায় মাধুর্য, চোখে প্রীতির প্রভা এবং জীবনাচারে সমস্বার্থে স্বাধিকারে সহিষ্ণুতার, সহযোগিতার ও সহাবস্থানের আগ্রহ আর সুরুচির ও সৌজন্যের সামগ্রিক লাবণ্যই সংস্কৃতি।' ভব্য সমাজে সংস্কৃতি জ্ঞানে-প্রজ্ঞায়-মণীষায় শ্রেয়োবাদী মানুষের ব্যক্তিগত সাধনার ও মনীষার ফল বা ফসল। একের সৃষ্টি সমাজের সবার গ্রহণে-বরণে অনুকরণে-অনুসরণে হয়ে ওঠে আচার-আচরণ, রীতি-রেওয়াজ বা নীতি-নিয়ম। অপরদিকে কোন দেশের, কালের ও সমাজের প্রাকৃতজনের অর্জিত কৌশলের, আচরণের, কর্মের, নীতি-নিয়মের, বিশ্বাসের ও সংস্কারের পৌনঃপুনিকতা-ও প্রাত্যহিকতা দুষ্ট জীবনযাত্রা পদ্ধতির সামূহিক, সামষ্টিক ও সামগ্রিক রূপই বা গোটা জীবনাচারই হচ্ছে লোকসংস্কৃতি। এতে ব্যক্তির অবদান অনির্দিষ্ট, যৌথ উৎকর্ষই বিবেচিত। এ তাৎপর্যে লোকসংস্কৃতি হচ্ছে অনুকৃত ও অনুসৃত রীতি-পদ্ধতির আবর্তিত গণরূপ। বহতা নদীর মতো সংস্কৃতিবানের জীবনে, মননে ও

রুচিতে নব নব উন্মেষশীলতা তথা সৃষ্টিশীলতা থাকতে হয়, নইলে বন্ধ্যা সংস্কৃতি বদ্ধ জলার মতো অবক্ষীয় ও তাৎপর্যবিহীন বিকৃত আচারে পরিণত হয়।

আর একটি কথা, আগেরকার দিনে ব্যক্তি স্বাতন্ত্র্যচেতনা এবং ঐহিকতা ভব্যমানুষে স্বীকৃত ছিল না। তাই জীবনের ও সমাজের কালিক বা দৈশিক প্রয়োজনে নতুন কিছু করতে হলে ঐহিক চাহিদার কথা চেপে রেখে পারত্রিক ও নৈতিক প্রয়োজনের ও উপযোগের দোহাই উচ্চারণ করতে হত স্রষ্টার বা উপাস্যের নামে। দেশের মাটিতে মানুষের সামাজিক, কালিক ও স্থানিক জীবনে নতুন শাস্ত্রীয় মতবাদ রূপেই আসত পরিবর্তন। তাই গৌতম বুদ্ধ ও বর্ধমান মহাবীর যখন নির্জিত নির্যাতিত শূদ্রের পক্ষ হয়ে তাদের মুক্তি সংগ্রাম শুরু করলেন, তখন তা এ যুগের মতো দাবির ও কর্মসূচীর ভিত্তিতে শুরু হয়নি। দিতে হয়েছিল আসমানী বা অধ্যাত্মতত্ত্বের দোহাই। তাই যে দেব-দ্বিজ-বেদের নামে পীড়ন ও বঞ্চনা করা হত, সেই দেবদ্বিজবেদকে করতে হলে অস্বীকার-এমনিভাবে বাস্তব প্রয়োজন পূরণ করতে হত ধর্মের ও নীতি-আদর্শের আবরণে। দক্ষিণ ভারতের শঙ্করের মায়াবাদে, রামানুজ, মধ্ব, নিম্বার্ক, ভাস্কর কিংবা উত্তর ভারতের রামানন্দ, কবির, নানক, দাদু, একলব্য, রজব, রামদাস, রবিদাস প্রভৃতি সন্তদের ভক্তিবাদে, বাঙলার চৈতন্যদেবের প্রেমবাদে অথবা রামমোহনের ব্রহ্মবাদে বা ওয়াহাবী-ফরায়েজীর বিশুদ্ধ ইসলামে পরিবর্তিত পরিবেশে জীবনের ও সমাজের কালিক-স্থানিক দাবিতেই সাড়া দেয়া হয়েছে মাত্র। এ যুগে যুক্তিবাদের ও ঐহিকতার মূল্য, মর্যাদা ও গুরুত্ব বৃদ্ধি পাওয়ায় এখন রাজনীতিক, দার্শনিক, বৈজ্ঞানিক, আর্থ-সামাজিক উপযোগতত্ত্বই সমাজ-সংস্কৃতির, বিশ্বাস-সংস্কারের কেজো পরিবর্তন ঘটাতে পারে। তাই নতুন ধর্ম প্রচার হয় না বটে, তবু ধর্মের নামে রাজনীতি আজো একেবারে অচল নয় অনুন্নত দেশে।

আমাদের মূল বক্তব্য বোধগম্য ও বিশ্বাসযোগ্য করার জন্যে তার ভিত হিসেবে মধ্যযুগের আগেকার শাস্ত্র, সমাজ, সরকার, সভ্যতা ও সংস্কৃতির পূর্ণ অবয়ব না হোক অন্তত কঙ্কাল-চিত্র দেয়া আবশ্যিক মনে করেছি এবং সংক্ষিপ্ত করার চেষ্টা সত্ত্বেও তা বারো হাত কাঁকুড়ের তেরো হাত বীচি হয়ে গেল।

কাজেই সেকালের রাজনীতির, সমাজ-সংস্কারের কিংবা জীবিকাক্ষেত্রে নতুন নিয়ম-রীতি প্রবর্তনের উপায় ছিল নতুন ধর্মমত প্রচার কিংবা পুরোনো শাস্ত্রের সংস্কার আন্দোলন। এমন কি দস্যুবৃত্তি কিংবা বিপ্লব করতেও ধর্ম ব্যবহৃত হয় আবরণ হিসেবে। এ সূত্রে আঠারো শতকের ফকির-সন্ন্যাসী বিদ্রোহও স্মতর্ব্য। মাটির ও মানুষের প্রতি দায়িত্বচেতনা, স্বদেশপ্রেমের ও জাতীয়তার আধুনিক ধারণা তখনো অঙ্কুরিত হয়নি বলে ধর্মভাবের প্রেরণা এবং স্বাধর্ম্যই ছিল ঐক্যের বন্ধনসূত্র।

পূর্ব কথা

১. সাংখ্য, যোগ, তন্ত্র

মৈথুন তত্ত্ব, টোটেম, ট্যাবু ও যাদুবিশ্বাস মানব সমাজের সুপ্রাচীন ঐতিহ্য।[১০] মৈথুন তত্ত্ব ভিত্তি করে শাস্ত্র ও দর্শন গড়ে ওঠে মুখ্যত কৃষিজীবী সমাজেই। তার কারণ মৈথুন ও প্রজনন প্রাচীনকালের মানুষের অনুভবে ও অভিজ্ঞতায় ছিল অঙ্গাঙ্গি সম্পর্কের।[১১] এবং ধন বা শস্য উৎপাদন আর সন্তান উৎপাদন পদ্ধতির অভিন্নতার চেতনা থেকেই মৈথুনতত্ত্ব সৃষ্টিতত্ত্বের–ফলে

ধর্মশাস্ত্রের–মর্যাদায় হয় উন্নীত। এ জন্যেই বুনো-বর্বর যুগে তো বটেই, এমনকি ভব্যমানুষের সমাজেও মৈথুনক্রিয়া ক্ষেত্রে শস্যবীজ বপনকালে ফলনের যাদু-প্রতিবেশ সৃষ্টির সহায় বলে বিবেচিত হত।[১২] পৃথিবীর পিছিয়েপড়া মানুষের মধ্যে আজো এ বিশ্বাস টিকে আছে, যে নারীদেহ থেকে আদি শস্যের উদ্‌গম হয়েছে।[১৩] সেজন্যে আদি শস্যদেবীর নাম শাকম্ভরী। ইনি এখনো কলাবউ বা শস্যবধূ দুর্গারূপে পূজিতা হন দুর্গাপূজার প্রারম্ভে। এ শাকম্ভরী বলেই দুর্গা অন্নদাত্রী বা অন্নপূর্ণা। হরপ্পায় আবিষ্কৃত সীলে লতা প্রসৃতি শাকম্ভরী মূর্তি মিলেছে।[১৪] ইনিই পুরাণোক্ত 'আত্মাদেহ সমুদ্ভবৈঃ' শাকম্ভরী।[১৫] পিতৃপ্রাধান্য অর্থে 'বীজ' এবং 'মাতৃপ্রধান্যসূচক 'ক্ষেত্র' প্রাধান্য–শব্দ দুটোর অভিধার মধ্যেও রয়েছে কৃষি পদ্ধতির অভিজ্ঞতার আভাস। নারী উদ্ভাবিত কৃষি পদ্ধতির[১৬] সঙ্গে নারীদেবতার সম্পর্ক কল্পনাই স্বাভাবিক। তাই বসুমাতা বা বসুমতীই মাটি ও শস্য দেবী। পশুজীবী বিজেতা আর্যেরা এখানে স্থায়ী নিবাসী হয়ে দ্রুত কৃষিজীবী হয়েছিল। তাই পরবর্তী শাস্ত্র গ্রন্থে—বাজসনেয়ী সংহিতায়, ব্রাহ্মণে, বৃহদারণ্যকে, ছান্দোগ্য প্রভৃতিতে মৈথুন, প্রজনন, জীবন ও সম্পদ ইত্যাদি সম্বন্ধে অনার্যতত্ত্ব গৃহীত হয়েছে, দেখতে পাই। এবং সে সঙ্গে গুরুত্ব হারিয়েছেন প্রাকৃত শক্তি-প্রতীক দেবতা বায়ু, বরুণ, ইন্দ্র প্রভৃতি এবং যজ্ঞ ও হোম। ছান্দোগ্য উপনিষদে স্পষ্টত বলা হয়েছে : ক, হে গৌতম, স্ত্রীলোকই হলো যজ্ঞীয় অগ্নি, তার উপস্থই হলো সমিধ। ওই আহ্বানই হলো ধূম। যোনিই হলো অগ্নিশিখা। প্রবেশ ক্রিয়াই হলো অঙ্গার। রতিসম্ভোগই হলো স্ফুলিঙ্গ। ৫-৮-১। এই অগ্নিতে দেবতারা রেতর আহুতি দেন। সেই আহুতি থেকেই গর্ভ সম্ভব হয়। ৫-৮-২। খ. ছান্দোগ্যের বামদেব্যব্রত কথায় আছে যে, এইভাবে যে বামদেব্য সামকে মৈথুনে প্রতিষ্ঠিত জানে, সে মৈথুনে মিলিত হয়। (তার) মিথুন থেকে সন্তান উৎপন্ন হয়। সে পূর্ণজীবী হয়, সন্তান, পশু ও কীর্তিতে মহান হয়। কোনো স্ত্রীলোককেই পরিহার করবে না—এইই ব্রত। ২-১৩-২।[১৭] এর জের রয়ে গেছে। আজো তাই লতা, নারী ভগ ও গোপীযন্ত্র প্রভৃতি গুহ্য সাধন-পূজনের অপরিহার্য অঙ্গ। কেবল এখানেই শেষ নয়, দেবতার হাতের ডালিম হচ্ছে রক্ত তথা রজঃঋতুর প্রতীক। রজঃ আবার সিঁদুরেও প্রতীকীরূপ পেয়েছে, আর পদ্ম হচ্ছে নারীযোনির প্রতীক।[১৮]

বলেছি, কৃষিজীবীর মননে মৈথুন তত্ত্বই পেয়েছে প্রাধান্য। ফসল উৎপাদন ও সন্তান ধারণ পদ্ধতির অভিন্নতাবোধ থেকেই জগৎ সৃষ্টিতেও তারা প্রকৃতির ও পুরুষের নর ও নারী স্বরূপার মৈথুন তত্ত্বে আস্থা রেখেছে এবং মৈথুনকে বীজ বোনার শুভ লগ্ন সৃষ্টির প্রারম্ভানুষ্ঠান রূপে গ্রহণ করেছে। পরে বুদ্ধির, অভিজ্ঞতার, কৌশলের ও হাতিয়ারের বিকাশের ও উৎকর্ষের ফলে উৎপাদন-পদ্ধতির বিবর্তন ঘটেছে। তাই আদিম বিশ্বাস-সংস্কারও নানাভাবে তাত্ত্বিক পুষ্টি পেয়ে সূক্ষ্ম দর্শনের মর্যাদা পেয়েছে। শাকম্ভরী বসুমতী বা শস্যদেবীরূপে যে মানস-প্রসূতার আদি অবির্ভাব, তিনিই আদ্যাশক্তি। তাঁর থেকেই পরম পুরুষের উৎপত্তি। শক্তিস্বরূপা নারীর সঙ্গে অবিনাবদ্ধ হয়ে পুরুষ হয় শক্তিমান। এই শক্তিমান নানী-পুরুষ বা প্রকৃতি-পুরুষ তাত্ত্বিক কল্পনায় দ্বৈত ও অদ্বৈত সত্তায় কল্পিত ও নানা তত্ত্বের রূপকাশ্রিত হয়ে নানা নামে চিহ্নিত হয়েছেন—মায়া-ব্রহ্মা, শিব-শিবানী, পুরুষ-প্রকৃতি, বিষ্ণু-লক্ষ্মী, (বৌদ্ধ) প্রজ্ঞা-উপায়, বজ্র-তারা প্রভৃতি। ফলে মৈথুনতত্ত্বের আদি উদ্দেশ্যের বিস্তৃতি ঘটেছে এবং নতুন তাৎপর্য পেয়ে অধ্যাত্ম চেতনায় মহৎ এবং তাত্ত্বিক সূক্ষ্মতায় অসামান্য হয়ে উঠেছে। এরই বিচিত্র প্রকাশ-বিকাশ ঘটেছে, সাংখ্যে, যোগে, তন্ত্রে এবং শৈব-শাক্ত-বৈষ্ণব-গাণপত্য-লিঙ্গায়েত প্রভৃতি মতবাদে, আর বিভিন্ন বৌদ্ধ যানে। অবশ্য আরণ্য সমাজেরজয়পুরে, পাঞ্জাবে, নীলগিরিতে, ছোটনাগপুরে এবং উত্তর-পূর্ব বাঙলার আদিবাসী সমাজে মৈথুন তত্ত্বের আদি ধারণার রেশ

আজো রয়ে গেছে। জেমস্ ফ্রেজারের মতে মৈথুন আদিতে যেমন ফসল উৎপাদনের আনুষ্ঠানিক অঙ্গরূপে বিবেচিত হয়েছে, তেমনি পরে আবার রতিনিরোধ সাধনায়ও প্রবর্তনা দিয়েছে। তাঁর ভাষায় :

Either he many infer that by yielding to his appetites he will thereby assist in the multiplication of plants and animals; or he may imagine that the vigour that the refguges to extend in reporducing his own kind, will form as it were a store of energy whereby other creatures, whether vegetable or animal, will somehow benefit in propagating their species. Thus from the same crude philosophy, the same primitive notions of nature and life, the savage may derive by different channels a rule either of profligacy or of asceticism.[১৯]

কাজেই রিরংসার অথবা রতিনিরোধে একই ফল প্রাপ্তি লক্ষ্যে বামাচারী ও কামবর্জিত সাধনার উৎস অভিন্ন হতে বাধা নেই। আমাদের দেশে বামাচারী ব্রহ্মচর্য সাধনা—এ দুটোরই আদর-কদর রয়েছে। সাংখ্য, যোগ ও তন্ত্র যে আর্যপূর যুগের মানুষের মানস-উদ্ভূত আদিম মত ও আচার, তা আজকাল আর অস্বীকৃত হয় না। বেলভেলকার ও রাণাডে বলেছেন, যোগ আদিতে অবৈদিক সাধন পদ্ধতি ছিল এবং এর উৎসমূলে রয়েছে আদি যাদুবিশ্বাসের, sympathetic magic বিশ্বাসের জের।[২০] A. E. Gough বলেন, স্থানীয় অনার্যদের থেকেই আর্যরা কালক্রমে যোগসাধন পদ্ধতিটা গ্রহণ করেছিল।[২১] H. H. Zimmer বলেন, সাংখ্যের ও যোগের মূল ধারণাগুলো অতি প্রাচীন ও বেদপূর্বযুগের। সাংখ্য ও যোগ জৈনদের যান্ত্রিক দর্শনের সঙ্গে সম্বন্ধযুক্ত।[২২] হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর মতে, কৌটিল্য তিনটি মাত্র দর্শনের উল্লেখ করেন—সাংখ্য, যোগ ও লোকায়ত। সাংখ্যমত সকলের চেয়ে পুরান, উহা মানুষের করা এবং পূর্বদেশের মানুষের করা। উহা বঙ্গবগধচের জাতির কোন আদি বিদ্বানের মত। বৌদ্ধমত সাংখ্যমত হইতে উৎপন্ন হইয়াছে, এ কথা অশ্বঘোষ এক প্রকার বলিয়াই গিয়াছেন।[২৩] গৌতম বুদ্ধের গুরু আড়ার কলম ও উদ্রক উভয়েই ছিলেন সাংখ্য মতাবলম্বী।

পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায়ের ধারণা, 'তন্ত্র অতি প্রাচীন, তন্ত্র ধর্মই বাঙলার আদিম ধর্ম এবং ইহা অবৈদিক ও অনার্য'।[২৪] শশিভূষণ দাশ গুপ্তও তন্ত্রকে আদিম অনার্য গুপ্তশাস্ত্র বলে জেনেছেন। তিনি আরো বলেন যে-শিব-উপাসকদের হাতে শৈবতন্ত্র, শাক্তদের হাতে শাক্ততন্ত্র রূপে, বৈষ্ণবদের অনুশীলনে বৈষ্ণবীয় তন্ত্র এবং বৌদ্ধ যুগে বৌদ্ধতন্ত্র নামে আর (প্রচ্ছন্ন বৌদ্ধদের) চর্যায় সহজিয়া (তন্ত্র) সাধন পদ্ধতি নামে হয়েছে পরিচিত।[২৫] মূলে অভিন্ন হলেও কালগত ও সম্প্রদায়গত প্রভাবে, আচারে ও চর্যায় পার্থক্য ঘটেছে।[২৬]

শশিভূষণ দাশগুপ্তের মতে, উত্তর পশ্চিমে কাশ্মীর হইতে আরম্ভ করিয়া নেপাল, তিব্বত, ভূটান, কামরূপ এবং বাঙলাদেশ হিমালয় পর্বত সংশ্লিষ্ট এই ভূ-ভাগকেই বোধ হয় বিশেষভাবে তান্ত্রিক অঞ্চল বলা চলে। তন্ত্রাচার চীনাচার নামে সুপ্রসিদ্ধ; বিশিষ্ট চীন বা মহাচীন হইতে এই তন্ত্রাচার লাভ করিয়াছিলেন, এইরূপ প্রসিদ্ধিও সুপ্রচলিত। প্রাচীনতন্ত্র অনেকগুলিই কাশ্মীরে রচিত।... বঙ্গ-কামরূপ মুখ্যভাবে পরবর্তীতন্ত্রের রচনা-স্থান —নেপাল, ভূটান, তিব্বত অঞ্চলে এইগুলির বহুল প্রচার এবং অদ্যাবধি সংরক্ষণ।... তন্ত্রোক্ত দেহস্থ ষটচক্রের অধিষ্ঠাত্রীদেবী ডাকিনী, রাকিনী, লাকিনী, শাকিনী ও হাকিনী। ডাকিনী তিব্বতে এবং লাকিনী-হাকিনী ভূটানে পরিচিতা। দেবীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়ের মতে, তন্ত্র, যোগ, সাংখ্য প্রভৃতির মূলে আছে

কৃষিকেন্দ্রিক যাদুবিশ্বাস এবং যাদু অনুষ্ঠান। তাঁর মতে, 'তন্ত্র' শব্দটিও সন্তান উৎপাদন সম্পর্কীয়।[২৭] তন্ত্র সাংখ্য ও যোগ প্রভাবিত।

সাংখ্য, যোগ ও তন্ত্র মূলত দেহবাদী বা দেহাত্মবাদী নাস্তিক মত। ব্রাহ্মণ্য প্রভাবে যোগে ও তন্ত্রে পরে ঈশ্বর স্বীকৃত হলেও ঈশ্বরোপাসনা আজো অপ্রধান, দেহতত্ত্বই মুখ্য। ব্রাহ্মণ্যবাদীরা এসব মতকে বলত অসুরমত।[২৮] গীতায়ও রয়েছে অসুর মতের উল্লেখ 'অপরস্পরসম্ভূত কিমন্যং কামহৈতুকম' ১৬/৮—জগৎ নারী-পুরুষের মিলনজাত এবং কামোদ্ভূত। এজন্যে একে 'লোকায়ত' মত বলে অবজ্ঞা করা হয়েছে। কাজেই আদিম তান্ত্রিক, যোগী ও সাংখ্যমতবাদীরাই লোকায়তিক। গীতারচনার যুগেও সাংখ্য এবং যোগ ছিল অভিন্ন, সাংখ্য হচ্ছে তত্ত্ব আর যোগ হচ্ছে চর্যা। তন্ত্রমূলে ছিল সাধন-শাস্ত্র। তাই সাংখ্য, যোগ ও তন্ত্র একাধারে গড়ে উঠেছে নিরীশ্বর দেহবাদীর দর্শন, শাস্ত্র ও চর্যা হিসেবে। তন্ত্রও যোগ স্বতন্ত্রভাবে যেমন, তেমনি মিশ্র-ধারায়ও বিকাশ পেয়েছে; এতে শৈব-শাক্ত তান্ত্রিক, বৌদ্ধ তান্ত্রিক, জৈন তান্ত্রিক সম্প্রদায়ের পাশাপাশি বামা বর্জিত বিশুদ্ধ যোগী সম্প্রদায়ও সৃষ্টি হয়েছে। বিশুদ্ধ তান্ত্রিক ছাড়াও বৈষ্ণব সহজিয়ায়, বাউল নামের প্রচ্ছন্ন বৌদ্ধ সহজযানীতে, নামপন্থে রয়ে গেছে যোগতান্ত্রিক সাধনার জের। সাঁওতাল, হো, পাঙ্গা, কোটার প্রভৃতি আরণ্য সমাজেও রয়েছে এর রেশ।

সাংখ্য কপিলের নামে কপিলসাংখ্য এবং যোগ পতঞ্জলির নামে পাতঞ্জল-যোগ নামে অভিহিত। ঈশ্বরকৃষ্ণের সাংখ্যকারিকাই সাংখ্যমতের প্রাচীন গ্রন্থ। আর পাতঞ্জল-যোগের প্রাচীনতম ভাষ্য হচ্ছে ব্যাস প্রণীত ব্যাসভাষ্য। পাতঞ্জলযোগের সঙ্গে ক্রমবিকাশের ধারায় গীতার যোগ, বৌদ্ধ যোগ, জৈন যোগ প্রভৃতির কিছু কিছু মত-পথ-পদ্ধতিগত পার্থক্য ঘটেছে। শিব সংহিতা, সাধনমালা প্রভৃতি অনেক তন্ত্রশাস্ত্র আজো সুপ্রচলিত।

২. মিশ্র আচার-সংস্কারের আর্যভাষী সমাজ

সেকালে মননে, সমাজে, সংস্কৃতিতে পরিবর্তন ছিল অতি মন্থর। মুক্ত মনে স্বাধীন চিন্তায় ছিল সমাজের ও বিশ্বাস-সংস্কারের বাধা। প্রায় অনড় নিয়ম-নীতি-রীতি-রেওয়াজরূপ নিগড় নিয়ন্ত্রণ করত মন-মননকে ও আচার-আচরণকে। ফলে আবিষ্কার-উদ্ভাবনও ছিল বিরলতায় দুর্লক্ষ্য।

সে-যুগে ভিন্নদেশের নতুন মানুষের সঙ্গে পরিচয় না হলে মনে-মননে, সমাজে-সংস্কৃতিতে, আচার-আচরণে, নিয়ম-নীতিতে, হাতিয়ারে ও জীবিকা পদ্ধতিতে সাধারণভাবে কোন পরিবর্তন প্রত্যাশিত ছিল না।

নতুন দেশের নতুন মানুষের জীবনযাত্রার ও জীবনাচারের সঙ্গে পরিচয় ব্যবসা-বাণিজ্যসূত্রে খুব কমই হত। প্রমাণস্বরূপ বলা যায় য়ুরোপীয় বেণেদের সঙ্গে আমাদের দেশের বুকেই আমাদের হাটে-বাজারেই লেনদেন শুরু হয় ষোল শতক থেকেই। কিন্তু ইংরেজ ও ইংরেজি ভাষা যথাক্রমে আমাদের ঘাড়ে ও মুখে না বসা পর্যন্ত য়ুরোপ প্রায় কোন ক্ষেত্রেই এমনকি আন্তর্জাতিক বাণিজ্যক্ষেত্রেও) প্রভাবিত করেনি। বলতে গেলে আমরা তখন তাদের কিছুই অনুকরণ-অনুসরণ করিনি।

কাজেই প্রাচীনকালে শাসকগোষ্ঠী বিদেশী-বিজাতি-বিভাষী-বিধর্মী হলে তাদের প্রভাবেই অথবা বিরুদ্ধ জগৎ-ভাবনার ও জীবন-চেতনার তথা স্বতন্ত্র জীবনাচারের পারস্পরিক অভিঘাতেই ঘটত যুগান্তর। নতুন জাতির সঙ্গে রাজনীতিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক, প্রশাসনিক, ও কৃৎকৌশলিক পরিচয় নতুন মননের ও সংস্কৃতির জন্ম দিত। অতএব নতুন মন-মত-ধর্ম-

আচার-মনন-আদর্শ-সংস্কৃতির ও হাতিয়ারের বা জীবিকা-পদ্ধতির সঙ্গে পরিচয়ের ফলে ব্যক্তির চিন্তা-চেতনায় যে-অভিঘাত সৃষ্টি হয়, তারই প্রভাবে বাহ্য ও মনোজীবনে, সমাজে, আচারে-আচরণে তথা মানস ও ব্যবহারিক জীবনে যে-পরিবর্তন ঘটে, তা-ই ঘটাত যুগান্তর। আজকের দিনে অবশ্য এজন্যে আর রাজ্য-রাজত্বের হাত-বদল হতে হয় না। বৈজ্ঞানিক আবিষ্ক্রিয়ায় যন্ত্রের ও কৃৎকৌশলের দ্রুত ও বিস্ময়কর য়ুরোপীয় বিকাশের ফলে আজকের যন্ত্র-নিয়ন্ত্রিত সংহত পৃথিবীতে প্রায় অভিন্ন ভাব-চিন্তা-মত-পথ, বস্তু, বিদ্যা, যন্ত্র, কৌশল কিংবা সাহিত্য-সংস্কৃতি, সংবিধান-সংস্থা-সংগঠন-প্রশাসন প্রভৃতি সবটাই ঘরে বসে অনুকরণ-অনুসরণ কিংবা গ্রহণ-বরণ করে জীবন-চেতনায় ও জীবিকাপদ্ধতিতে রূপান্তর ঘটিয়ে মননে ও জীবনযাত্রায় ইচ্ছে করলে গোটা দুনিয়ার মানুষ সমভাবে আত্মবিকাশ ঘটাতে পারে। উনিশ শতকের শেষার্ধের পূর্বে জীবনের ও জগতের এ রূপ ছিল অভাবিত ও অসম্ভব।

প্রাগৈতিহাসিক যুগের কোন স্পষ্ট বা সঠিক চিত্র আমরা পাইনি। প্রত্যক্ষে ও পরোক্ষে আভাসিত প্রমাণে ও অনুমানে প্রাচীনযুগের ইতিহাসের ছায়া ও কায়া নির্মাণের চেষ্টা হয় বটে, কিন্তু তা কখনো পূর্ণাবয়বে মূর্ত হয়ে ওঠে না, উঠবে না, কল্পনার সিমেন্টে জোড়াতালি দেয়া নড়বড়ে ও জীর্ণ-জড় কংকালের সামান্য আদল মিলে মাত্র।

মূলে লোহিত ও ভূমধ্যসাগরের উপকূলাঞ্চলের হামীয়-সামীয়-ফিনিশীয়-মাইসেরীয়-সুমেরীয় গোত্রজ দ্রাবিড় ভেড্ডিরাই টোটেম-ট্যাবু ও যাদুবিশ্বাস এবং সম্ভবত সর্বেশ্বরবাদ বা অ্যানিমিজম সঙ্গে নিয়ে এদেশে প্রবেশ করে। যারা উপকূল বেয়ে পরে হাঁটাপথে দক্ষিণভারতে (এখনকার তামিল-তেলেগু কানাড়ি-মলায়ালম প্রভৃতি দ্রাবিড়ভাষী যাদের বংশধর) আসে, তারাই সম্ভবত নবী-অবতারবাদ এদেশে চালু করে। এরাই কালিক ও স্থানিক জীবনের প্রয়োজনে প্রমূর্ত নারী-পশু-পাখী-বৃক্ষ দেবতায় ও জন্মান্তরে আস্থা রাখে। অরণ্য মাহাত্ম্য, ধ্যান এবং মন্দির উপাসনাও এদের মননের ও সংস্কৃতির বিকাশের প্রসূন। অস্ট্রিকরা প্রথমে মৃগয়াজীবী নিষাদ ও পরে দ্রাবিড় ভেড্ডিদের মতো কৃষিজীবী হয়। রামের অহল্যা ও হরধনুভঙ্গ বিষয়ক রূপক-সাংকেতিক উপাখ্যান এ ইঙ্গিতই দান করে। সাংখ্যতত্ত্ব ও যোগচর্যা সম্ভবত এদেরই উদ্ভাবন—এদেরই মননের ফসল। হরপ্পা-মহেনজোদারোতে প্রাপ্ত সিন্ধুসভ্যতার নিদর্শনের মধ্যে বৃষ, শাকম্ভরী ও শিবকল্পমূর্তি মিলেছে। এ লতা-প্রসূতি নারী ও ওই পুরুষ মূর্তি পরবর্তী কালের চণ্ড-চণ্ডী বা শিব-উমা বলে অনুমান করা অসঙ্গত নয়। এ সিন্ধু সভ্যতার সঙ্গে সাদৃশ্য রয়েছে পশ্চিম এশিয়ার চার হাজার বছরের আগেকার সভ্যতার। অতএব দ্রাবিড় ভেড্ডিড সভ্যতা ও সিন্ধু সভ্যতা সমকালীন বলে মেনে নেয়া চলে।

আর মঙ্গোলগোত্রীয় যারা প্রত্যন্ত পার্বত্য অঞ্চলে-নেপালে-ভূটানে-তিব্বতে এখনকার গারো নাগা অঞ্চলে, অরুণাচলে, মণিপুরে, আসামে-মিজোরামে, পার্বত্য ত্রিপুরায় ও পার্বত্য চট্টগ্রামে (প্রাচীন হরিখেলে) এবং সমতলে বাস করত, তারাও ছিল মুখ্যত মৃগয়াজীবী। তারাই ছিল কিরাতগোষ্ঠী বলে পরিচিত। দেহবাদ বা কায়াসাধনতত্ত্ব এবং তন্ত্র তাদেরই অবদান। তাদেরই প্রভাবপুষ্ট অঞ্চলেই তা-ই তন্ত্রের বিশেষ বিকাশ। কাশ্মীর থেকে আসাম অবধি অঞ্চলই তন্ত্রের ও তান্ত্রিক সাধনার বিশেষ বিকাশস্থল।

সি. কুহ্‌লান রাজা বলেছেন, সিন্ধু উপত্যকার সভ্যতার এবং দ্রাবিড় সভ্যতার প্রভাবেই ১. সর্বসাধারণের জীবনে অরণ্যের প্রভাব, ২. মন্দির উপাসনা ও তার সঙ্গে অধিকতর মূর্ত আকারে দেবতার অনুধ্যান, ৩. বিশ্বজগতের পরিকল্পনাধারার মধ্যে পশু, পক্ষী, বৃক্ষ, প্রভৃতির উচ্চস্থান লাভ, ৪. ঐশ-শক্তির স্ত্রীরূপকে উচ্চতর মর্যাদা দান, ৫. ঈশ্বরের স্রষ্টত্ব এবং ৬. জাতীয়

মহাপুরুষ হিসাবে দেবতাদের আবির্ভাব এবং মানুষের দেবত্বের উন্নয়ন।[২৯] তাঁর মতে সাংখ্যমতও অবৈদিক।[৩০] ভক্তির বিকাশও অবৈদিক প্রভাবজ।[৩১] বেদান্তের ও ভক্তিবাদের মাধ্যমে ব্রাহ্মণ্যধর্মের পুনরুজ্জীবন ঘটে প্রধানত দাক্ষিণাত্যের দ্রাবিড় দিয়ে। বৌদ্ধ বিদ্বেষী ও বৌদ্ধ নিধনের প্ররোচক কুমারিল ভট্ট অন্ধ্রদেশের লোক, শংকরাচার্যের জন্মস্থান কেরলা (মালাবার), রামানুজ তামিলদেশে আর মধ্বাচার্য কর্নাটদেশে আবির্ভূত হয়েছিলেন।[৩২] এবং বিষ্ণু আর শিবের শক্তিমহিমার ও ক্রিয়ার ধারণাও অবৈদিক।[৩৩] তাই আগম শাস্ত্রও অবৈদিক।[৩৪] এমনকি উপনিষদের উদ্ভবও নাকি বিদেহের জনকরাজার দরবারে।

আমরা আগেই জেনেছি ঋগ্বেদের গোড়ার দিকের সামান্য অংশ সম্বল করেই নতুন নিবাসের সন্ধানে বের হয়ে ইরানী আর্যভাষীর একটি দল বিজেতা হিসেবে প্রবেশ করেছিল ভারতবর্ষে অন্তত সাড়ে তিন হাজার বছর আগে। তারা ছিল পশুজীবী, মৃগয়াসক্ত ও দস্যুবৃত্তিপ্রবণ যাযাবর। এ মানুষকেই উত্তর ভারতের আদিবাসিন্দাদের প্রভু ও শাসক হতে হল, অথচ এ ছিল তাদের অভিজ্ঞতার বাইরে; ফলে যাযাবর ও গোত্রীয় জীবন পরিহার করে তাদেরকে স্থায়ীনিবাসী প্রভু ও শাসক-প্রশাসক হতে হল। নিবাসের নাম হল আর্যাবর্ত এবং পরে ব্রহ্মাবর্তও হল তাদের নিবাসস্থল। সবটাই তাদের শিখে নিতে হল উন্নততর সভ্যতা-সংস্কৃতির ও প্রজাশাসনপদ্ধতির ধারক স্থানীয় লোকদের থেকে। এভাবে ক্রমে বরণ করল তারা স্থানীয়দের বিশ্বাস-সংস্কার, শাস্ত্র, দেবতাপূজাপদ্ধতি, পারিবারিক ও সামাজিক নিয়ম-নীতি, রীতি-রেওয়াজ, প্রথা-পদ্ধতি, আচার-আচরণ প্রভৃতি সবকিছু। ফলে এখানকার জীবনে এখানকার মাটিতে হল বেদ ও বৈদিক সাহিত্য রচিত, অনার্য প্রভাবে। তাই বেদেই ঠাঁই পেলেন অনার্য রুদ্র, বিষ্ণু, দেবী, রাত্রি প্রভৃতি দেবতা। তিন দেবতা প্রথমে হলেন তেরো, তারপরে তেত্রিশ এবং তারপর ক্রমে বৃদ্ধি পেয়ে এখন জ্ঞাত-অজ্ঞাত নাম গুণ-মান-মাহাত্ম্যের তেত্রিশ কোটি কিংবদন্তীর দেবতা। বেদও পূর্ণাঙ্গ পাওয়ার পর বিন্যস্ত হয়েছে চার নামে চার উদ্দেশে চারভাগে— ঋক, সাম, যজু ও অথর্ব।

আদি বেদের নাম ঋক। বিভিন্ন কবির (কবি শব্দের অর্থ ক্রান্তদর্শী) কবিতা, কবিতাংশ ও শ্লোকের সংকলন গ্রন্থ এটি। এ কবিতা বা শ্লোককে বলা হয় মন্ত্র। কয়েকটি মন্ত্রের সমষ্টিতে বিন্যস্ত হয় সূক্ত (সু + উক্ত), যেমন আয়েতের সমষ্টিতে হয় সূরা। এ সূক্ত সমষ্টিরই নাম সংহিতা। ছন্দে রচিত বলে এর অপর নাম ছন্দ এবং গোড়ার দিকে শুনে শুনে মনে রাখতে হত বলে এর আর এক নাম শ্রুতি। বৈদিক গানের সংকলন গ্রন্থকে বলে সামবেদ বা সামসংহিতা, আর যজ্ঞাদির বিধি-বিধানগুলোর সংকলনগ্রন্থকে বলে যজুঃ বা যজুর্বেদ। সংহিতায় আছে দেবতার স্তবস্তুতি, ব্রাহ্মণে মেলে দেবার্চনার রীতি-পদ্ধতি ও যাজক-যজমানের অনুষ্ঠেয় বিষয়ের বিধান। এ পূজা উপাসনা নয়—নিতান্ত শর্তসাপেক্ষ বস্তুর ও শক্তির আকারে ঐহিক প্রয়োজনে কাম্য সহায়তা দেয়া-নেয়ার চুক্তি ও রীতি-পদ্ধতি। সম্পর্কটা অনেকটা এ যুগের অনুন্নত দেশ ও যুক্তরাষ্ট্রের মতো।

দেবতা ভাবয়তানেন তে দেবা ভাবয়ন্ত বঃ
পরস্পরং ভাবয়ন্তঃ শ্রেয়ঃ পরম অবাপস্যথ।
— তোমরা দেবতার কথা ভাব, দেবতারাও তোমাদের কথা ভাবুক
পরস্পর ভাবনায় তোমরা পরম শ্রেয় লাভ কর।

উপনিষদে দেবতা নেই, আছেন ব্রহ্ম—তাঁরও কোন ধ্যান ও উপাসনা নেই; তাঁকে কেবল বোধগত কিংবা অন্তরে উপলব্ধি করতে হয়। তাই বলা চলে এ যজ্ঞপ্রবণ ভোগবাদী দেবগোষ্ঠীর

বা দেবানুরাগীর দান নয়, এ পূর্ব ভারতের একেশ্বরবাদী পূজা-উপাসনা বিরোধী জ্ঞান-প্রজ্ঞা (বোধি) মাধ্যমে শ্রেয়োকামী অনার্য-অসুরের মত। পরবর্তী ও সমকালীন জৈন-বৌদ্ধ ও কায়াবাদী চার্বাক-আজীবিক-লোকায়তিক-কাপালিক মতের সঙ্গে রয়েছে ঔপনিষদিক মতের সূক্ষ্ম ও মৌল সাদৃশ্য।[৩৫]

প্রত্যেক বেদের সংকলিতরূপ সংহিতা নামে পরিচিত, প্রত্যেক বেদের গদ্যে রচিত ভাষ্যের নাম ব্রাহ্মণ। বেদের কোন সূক্তের বা সূক্তাংশের তাত্ত্বিক ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণজাত সিদ্ধান্ত গ্রন্থের নাম বেদান্ত বা উপনিষৎ। গীতা ও বাদরায়ণ ব্যাস রচিত ব্রহ্মসূত্র থেকেই উপনিষদের শুরু বলে বিশ্বাস করা হয়। এবং আরণ্যক নামেও কোন কোন বেদের ভাষ্য রয়েছে। বানপ্রস্থকালে অরণ্যবাসী ঋষিদের কাল্পনিক অনুষ্ঠানের নিয়মাবলী রয়েছে আরণ্যকে। বেদের টীকাকে বলে নিরুক্ত। সু + উক্ত বলেই বেদের এক একটি কবিতার নাম সূক্ত। সূক্তের বক্তাকে ঋষি, বক্তব্যকে সূক্ত এবং উদ্দিষ্ট ব্যক্তি বা বিষয়কে বলে দেবতা। যজ্ঞের যাজককে বলে ঋত্বিক। পশু, পাখি, বৃক্ষ, নারী প্রভৃতি অমূর্ত ও প্রমূর্ত দেবতার পূজক হওয়ায়, অনার্যা পত্নী-প্রভাবে দেশী নানা বিশ্বাসসংস্কার বরণ করায় ঋক্‌বেদীয় আর্যশাসকগোষ্ঠীর জগৎ-চেতনা ও জীবন-জিজ্ঞাসা হল পরিবর্তিত। বলা চলে এটাই হল চিত্তলোকে ও চিন্তাজগতে প্রথম ভাব-বিপ্লব। এটি অল্পদিনে হয়নি, কয়েক প্রজন্মের প্রয়োজন হয়েছিল। সূক্তে, ব্রাহ্মণে, আরণ্যকে, নিরুক্তে এ প্রভাব অনুপ্রবিষ্ট হয়ে ক্রমে উপনিষদে ভাববাদ পুরোপুরি প্রকট হয়ে ওঠে। দেবরাজ নামে অভিহিত দলপতি বীরবাহু অকুতোভয় দস্যু ইন্দ্র-নিয়ন্ত্রিত আর্যসমাজের এভাবে ভাববাদী ঔপনিষদিক সমাজে উত্তরণ ঘটে। তখনও কিন্তু সাংখ্য-যোগ-তন্ত্রও স্ব স্ব ঠাঁই করে নিচ্ছিল। তারাপদ চৌধুরী তাই বলেন, "বৈদিক ধর্মবিশ্বাসের পাশাপাশি মন্ত্র-তন্ত্র, বশীকরণ এবং ইন্দ্রজালের ক্ষমতা সম্বন্ধে সাধারণের যে ব্যাপক বিশ্বাস ছিল, তাহাও এই প্রসঙ্গে মনে রাখা প্রয়োজন। বৈদিক সাহিত্যে সর্বত্রই এই বিষয়গুলির ইতস্তত উল্লেখ আছে বটে, তথাপি বিশেষভাবে এইগুলি অথর্ববেদ এবং তাহার অনুষ্ঠানঙ্গ কৌশিক-সূত্র উহাদের বিষয়। সেইজন্যই গ্রন্থ দুইটিতে পরবর্তী তন্ত্র শাস্ত্রের সূচনা রহিয়াছে।"[৩৬] একালেই পরব্রহ্মনামে ঈশ্বর আর্যসমাজে প্রতিষ্ঠা পান।

গোড়ার দিকে দস্যুতালব্ধ সম্পদে ঋদ্ধ পশুজীবী সুখী আর্যদের কাম্য ছিল অমৃত ও অমরতা, পরে কাঙ্ক্ষা হল স্বল্পবিত্তজীবনে দায়মুক্তি ও মোক্ষ, তারপরে বাঞ্ছিত হল অতৃপ্ত জীবনের জ্বালাযন্ত্রণামুক্তি ও স্বর্গসুখ। আজ ঐহিক জীবনে অভাবক্লিষ্ট অনিশ্চিত জীবনের দাবি হয়েছে—অশন-বসন-নিবাস-নিদানের নিরাপত্তা। ভাববাদ প্রগাঢ় হবার পর দায়মুক্তি ও পারলৌকিক মোক্ষ হল কাম্য। এ স্তরেই সম্ভবত বৃত্তি বিন্যাস-জাত বর্ণাশ্রম সমাজ গড়ে ওঠে। এবং ব্রাহ্মণ-ক্ষত্রিয় হয়ে ওঠে শাসক শোষক ও পীড়ন-পোষণের মালিক। এখন থেকে এ আর বৈদিক সমাজ নয়—ব্রাহ্মণ্য সমাজ। আর্য-অনার্যের-সমঝোতা সমন্বয় কালে ব্রহ্মা-বিষ্ণু ও মহেশ্বর শিব হলেন যথাক্রমে সৃষ্টি, স্থিতি ও সংহারের দেবতা। এ কালেই ব্রাহ্মণ বিদ্যাবলে ও ক্ষত্রিয় বাহুবলে আত্মপ্রত্যয়ী হয়ে দাবি করল তারা যথাক্রমে ব্রহ্মার মুখ ও বাহু স্বরূপ, বেণে বৈশ্য হল উরুবৎ আর শূদ্র হল ঘৃণ্য পদাশ্রিত। সাধারণভাবে গৌরবর্ণের আর্যে ও কৃষ্ণবর্ণের অনার্যে যে আবয়নিক পার্থক্য ছিল, যা দেশী নারী গ্রহণে বিনষ্ট বিলুপ্ত, সে-বিষয়েও আর্য শাসকরা হল সচেতন সতর্ক; বৃত্তির চেয়েও বর্ণবিদ্বেষ তা-ই হল তীব্র। উত্তর ভারতে তথা আর্যাবর্তে ও ব্রহ্মাবর্তে সমাজে কবে থেকে যে বৃত্তি ও বর্ণ ঘৃণ্য হল তা আমরা সঠিক জানিনে বটে, কিন্তু এ ঘৃণা-বিদ্বেষ ও পীড়ন যে আজ থেকে আড়াই হাজার বছর আগেই তীব্র ও অসহ্য

হয়ে উঠেছিল তার পাথুরে প্রমাণ হচ্ছে প্রায় একই সময়ে বা সামান্য সময়ের ব্যবধানে জিন বর্ধমান মহাবীরের ও গৌতম বুদ্ধের বিদ্রোহ।

এর আগেই উপনিষৎ ও পুরাণগুলো কলেবরে ও সংখ্যায় বৃদ্ধি পাচ্ছিল এবং কোন কোন বিদ্বানের মতে উপনিষৎ ও পুরাণ খ্রীস্টীয় সতেরো শতক অবধি রচিত হয়েছে এবং এসব গ্রন্থে প্রপক্ষেও ছিল অবিরল। তাই ১০৮ বা ১২০ খানা উপনিষদের মধ্যে মাত্র এগারোখানা প্রাচীন বলে স্বীকৃত। উপনিষদও অনার্য মননপ্রসূত বলে কোন কোন বিদ্বানের ধারণা। উপনিষদের প্রথম চর্চা শুরু হয় নাকি বিদেহের জনকরাজার সভায়। অতএব উপনিষদুক্ত সূক্ষ্ম চিন্তা-চেতনার ও অধ্যাত্মতত্ত্বের উন্মেষ ও বিকাশ ঘটেছে অনার্য অধ্যুষিত বিদেহে তথা একালের বিহারে। উপনিষদকে বলে বেদান্ত। বেদের অন্ত বা শেষ কথা বা বেদতত্ত্বের খাঁটি আদি ও অকৃত্রিম বলে গ্রাহ্য এগারোখানা উপনিষদেও কোন ন্যায়পদ্ধতি প্রয়োগে কোন তত্ত্ব উপস্থাপিত হয়নি। তবে ঈশ, কেন, কঠ, প্রশ্ন, মুণ্ডক, মাণ্ডুক্য, তৈত্তিরীয়, ঐতরেয়, ছান্দোগ্য, বৃহদারণ্যক ও শ্বেতাশ্বতর উপনিষদুক্ত সূত্রে ও মহৎ তত্ত্বে গুরুত্ব দিয়ে কয়েকটা দার্শনিক সূত্র আবিষ্কার করেছেন প্রজ্ঞাবানেরা। যেমন, আত্মাতত্ত্ব, অদ্বৈততত্ত্ব, ঈশ্বরতত্ত্ব, সর্বং খল্বিদং ব্রহ্ম, আত্মানংবিদ্ধি, বসুধৈব কুটুম্বকম, নায়েমাত্মা, বলহীনের লভ্য, নাল্পে সুখম লভ্য, ভূমৈব সুখম, তত্ত্বমসি, সোহম্। এবং স্ব বা ইয়ামাত্মা ব্রহ্ম। উপনিষদেই বৈদিক দেবতারা প্রভাব ও প্রতিষ্ঠাচ্যুত হন। এখানে পরব্রহ্মবাদই মুখ্য।

উপনিষদ হচ্ছে দ্বিতীয় ভাব-বিপ্লবের সাক্ষ্য। এখানে বৈদিক দেবতারা যেমন অস্বীকৃত, তেমনি দৈশিক প্রমূর্ত দেবতারাও হৃতসত্তা। কেবল আত্মা বা আত্মারূপী ব্রহ্ম, বা ব্রহ্মের অংশ আত্মাই গুরুত্ব পেয়েছেন, এক কথায় অবাঙমানসগোচর ব্রহ্ম নামের একক ঈশ্বরই স্বীকৃত হলেন। একক ঈশ্বরের এই উপলব্ধির প্রভাব জীবনে, সমাজে, সংস্কৃতিতে ও মননে সুদূর প্রসারী হয়েছিল। সংক্ষেপে উপনিষদগুলোতে সমাজস্বীকৃত বৈদিক মূলতত্ত্বের দেবতার যজ্ঞের ও অন্যান্য পূজা-আচার-উপাসনার বিরোধিতা লক্ষণীয়। এ ব্যাপারে বৃহদারণ্যক ও ছান্দোগ্য প্রাচীন বলে স্বীকৃত এ দুটো উপনিষদুক্ত তত্ত্ব বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। বৃহদারণ্যকে আছে, যে ব্যক্তি আত্মা ব্যতীত অন্য কোন দেবতার আরাধনা করে, সে দেবগণের গৃহপালিত পশু বিশেষ।[৩৭] এ উক্তির আলোকেই পরবর্তীকালে শঙ্কর যজ্ঞাদি আচার পালনে ও দেবপূজায় অস্বীকৃতি জানিয়েছেন।[৩৮] এও সত্য যে, আরণ্যক রচনাকাল থেকে যজ্ঞাদি ক্রিয়াকাণ্ডে বিশ্বাসী আর্যেরা ভাববাদী হয়ে উঠল।[৩৯] তার ফলেই উপনিষদে যজ্ঞের ও দেবতাদির প্রতি বিরূপতা দেখা দেয়। এমন কি পরবর্তী উপনিষদ শ্বেতাশ্বতর প্রভৃতিতে যজ্ঞের গুরুত্ব ও মহিমা পুনঃপ্রতিষ্ঠার চেষ্টা থাকলেও[৪০] তাতে উদ্দিষ্ট নব উপলব্ধ ঈশ্বর বা পরব্রহ্ম কোন দেবতা নন।[৪১] এভাবেই উপনিষদে প্রাধান্য পেতে থাকে কেবল ব্রহ্মবাদ বা একক-ঈশ্বরতত্ত্ব। তাই কঠোপনিষদে উচ্চারিত হয়েছে এ অহঙ্কৃত উক্তি 'পরব্রহ্মের ভয়েই দেবতারা তাদের নির্দিষ্ট কার্যক্রম পালন করে থাকে।'[৪২] বৃহদারণ্যকে।[৪৩] এবং ছান্দোগ্যেও[৪৪] তাই ঘোষিত হয়েছে চরম তত্ত্ব 'আত্মাই ব্রহ্ম'। অদ্বৈতবাদের উৎস এটিই। পুত্রের উদ্দেশে বলা যাজ্ঞবল্ক্যের উক্তিও এ সূত্রে স্মর্তব্য—তত্ত্বমসি (তৎ+ত্বম+অসি) তুমিই সেই (ব্রহ্ম)। অতএব, দ্বিতীয় ভাববিপ্লবের আর্যভারতে পরব্রহ্মবাদ বা ঈশ্বরবাদ তথা সৃষ্টি-স্রষ্টার আত্মা-পরমাত্মার অদ্বৈততত্ত্ব প্রতিষ্ঠা পেল।

এ প্রসঙ্গে পুরাণের কথাও বলতে হয়। ধার্মিক হিন্দুদের কাছে পুরাণ হচ্ছে 'ভারতের সাধনার ও ধ্যানের ইতিহাস'। ইহাদের সুবিশাল কলেবরের মধ্যে কত সহস্র বছরের কামনা ও

বেদনা, সিদ্ধি ও সাধনা রূপকথার রাজকন্যার মতোই সুপ্তিঘোরে আচ্ছন্ন রহিয়াছে। ... সেই বিশাল মণিহর্ম্যে কত প্রকোষ্ঠ, কক্ষে কক্ষে কত চিত্র, কণ্ঠে কণ্ঠে কত কাকলি। শৌর্য ও সৌন্দর্য, প্রেম ও ভক্তি, ত্যাগ ও তিতিক্ষা, সংযম ও সরলতার কি অপূর্ব সমন্বয়।[৪৫] 'পুরাণ শব্দের মূলগত অর্থ পূর্বতন, ছান্দোগ্য উপনিষদমতে 'ইতিহাস পুরাণং পঞ্চমং বেদানাং বেদম'—ইতিহাস ও পুরাণ বেদগুলোর পঞ্চমবেদ। পুরাণের স্বীকৃত সংখ্যা আঠারো, এগুলোর অতিরিক্ত রয়েছে বহু উপপুরাণ ও কয়েকটি পুরাণ অর্বাচীন রচনা। সব পুরাণেই রয়েছে পরবর্তীকালের ও বিভিন্ন লোকের সংযোজিত-পরিবর্তিত অংশ ও উপাখ্যান। পুরাণ হচ্ছে রূপকথা, উপকথা, ব্রতকথা, ইতিকথা, আখ্যান, উপাখ্যান, অলৌকিক গল্প ও অতি রঞ্জিত ঘটনা প্রভৃতির সংকলনগ্রন্থ। দেবকথা, নীতিকথা, ধর্মকথা, মন্ত্রমাহাত্ম্য কথা, তত্ত্বকথা প্রভৃতি কাহিনীর মাধ্যমে বর্ণনা করে মানুষকে শাস্ত্রমুখী রাখা ও অতীত সম্বন্ধে উপদেশাত্মক জ্ঞানদানই মুখ্য লক্ষ্য। বিষ্ণু, মৎস্য ও বায়ু পুরাণমতে পুরাণে আলোচ্য বিষয় পাঁচটি: সৃষ্টি ও প্রলয়, রাজবংশ ও বংশানুক্রম (যেমন সূর্য ও চন্দ্র বংশের বিবরণ) এবং অন্য নানা প্রয়োজনীয় প্রসঙ্গ। নীতিধর্মের ক্ষেত্রে পুরাণগুলো ভারতের লোকশিক্ষা গ্রন্থমালার ভূমিকাই পালন করেছে, এখনো করে।

ভারতের সমাজ-বিবর্তনের ইতিহাসে পুরাণের একটি বিশেষ গুরুত্ব ও ভূমিকা রয়েছে। বেদকথায় তথা শ্রুতিতে অধিকারবঞ্চিত শুদ্রের ও নারীর পুরাণ শ্রবণের অধিকার দেয়া হয়। এই প্রথম শাসিত নির্জিত মানব মানবীকে (নারীও শূদ্রের মতো অধিকারবঞ্চিত ছিল সম্ভবত অনার্য দেশী নারীকে আর্যরা হরণে-বরণে সম্ভোগার্থে শয্যাসঙ্গিনী করেছিল বলেই) দেব-কথা, নীতিকথা ও ধর্মকথা, সূত বা কথক মুখে শ্রবণের অনুমতি দেয়া হল। এ উদার ও নতুন চেতনা সেদিনকার সমাজে নিশ্চয়ই একটা বিপ্লবাত্মক ঘটনা। ভবিষ্য, মার্কণ্ডেয়, ভাগবত, ব্রহ্মবৈবর্ত, বায়ু, মৎস্য, বিষ্ণু প্রভৃতি পুরাণই বিশেষ জনপ্রিয়। সাধারণ সংজ্ঞায় রামায়ণ এবং মহাভারত কাব্য দুটোও পুরাণ। শাক্ত, শৈব ও বৈষ্ণবদের স্ব স্ব মতানুগ পুরাণই প্রিয়।

উপপুরাণের মধ্যে দেবী, কালিকা, ভাগবত, বৃহদ্ধর্ম পুরাণ বাঙলার—বাঙালীর অবদান। কালিকা পুরাণ অবশ্য কামরূপের দান। স্মার্ত রঘুনন্দন প্রমুখ সবাই এসব উপপুরাণই অনুসরণ-অনুকরণ করে স্মৃতি নির্বাচন ও ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ করেন পনেরো-ষোল শতকে। খ্রীষ্টপূর্বকাল থেকে সতেরো শতক অবধি পুরাণগুলো প্রক্ষেপে, সংযোজনে, ব্যাখ্যায়-ভাষ্যে কলেবরে স্ফীত এবং কাহিনীতে ও মতাদর্শে বিচিত্র হতে থাকে। এবার পুরাণ সম্বন্ধে বিভিন্ন বিদ্বানের মত্ উদ্ধৃত করেই পুরাণ পরিচিতি শেষ করছি।

Pragitar বলেন, 'সমষ্টিগতভাবে বিচার করিলে এইগুলি (পুরাণগুলি) প্রাচীন ও মধ্যযুগীয় হিন্দুধর্মের ধর্মদর্শন, ইতিহাস, ব্যক্তি, সমাজ ও রাজনীতির একটি সর্বসাধারণের উপযোগী বিশ্বকোষ।[৪৬] পুরাণে অদ্বৈত, দ্বৈত, দ্বৈতাদ্বৈত ও বিশিষ্টাদ্বৈত এমন কি সাংখ্য যোগ, ন্যায় প্রভৃতি বিভিন্ন দার্শনিক মতবাদেরও সমন্বয় সাধন করিবার চেষ্টা আছে।[৪৭] পুরাণগুলোর মধ্যে বিষ্ণুপুরাণ ও ভাগবত পুরাণ শ্রেষ্ঠ। সর্বপুরাণেরই সারকথা ও তাৎপর্য বিশেষ করে বিষ্ণুপুরাণে মেলে।[৪৮] ভাগবতের দর্শনে সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য বিষয় এই যে, ইহাতে পুরাণসমূহের ঐশ্বরিক লীলাবাদের সহিত বেদান্ত দর্শনের মায়াবাদ, সাংখ্যের প্রকৃতিবাদ, শৈবসম্প্রদায়ের শক্তিবাদ এবং মীমাংসা ও অন্যান্য সম্প্রদায়ের কর্মবাদের সমন্বয় সাধনের জন্য একটি সাতিশয় কলাকুশল প্রযত্ন করা হয়েছে'।[৪৯]

এর পাশাপাশি এর সঙ্গে পরোক্ষে সম্পৃক্ত আরো দুটো তত্ত্ব ও মত—অবতারবাদ ও জড়বাদ আমাদের আলোচ্য।

অবতারবাদ যে সেমেটিক দ্রাবিড়দের উদ্ভাবনা তাতে সন্দেহের অবকাশ কম। কারণ নবী-অবতারে আদর্শ ও উদ্দেশ্যগত পার্থক্য নেই, তফাৎ এই নবী স্রষ্টা প্রেরিত প্রতিনিধি আর অবতার স্বয়ং স্রষ্টারই অংশ।

আদিতে এ ছিল টোটেম-ট্যাবু বিশ্বাসজাত। তাই প্রথমদিককার অবতার হচ্ছে মৎস্য, কূর্ম, বরাহ এবং নরসিংহ, আর তারপরে বামন, পরশুরাম, রাম, বলরাম, কৃষ্ণ এবং সৌজন্যে গৌতমবুদ্ধও, আর ইমাম মেহদীর মতো ভাবী অবতার কল্কিও কল্পিত। বিশেষ লক্ষণীয় যে, কেবল বিষ্ণুরই অবতার হয়েছে। ব্রহ্মা, শিব কিংবা অন্য দেবতার অবতার নেই। কাজেই শৈব, শাক্ত, সৌর, গাণপত্য, লিঙ্গায়েত প্রভৃতির অবতারবাদে আস্থা নেই।

মহাভারতের নায়ক কৃষ্ণ বিষ্ণুরই অবতার। গীতা মূলে ছিল মহাভারতেরই একটি সর্গ বা অধ্যায়। গীতার মূলবাণী হচ্ছে নিষ্কাম ভক্তি। 'কর্মণ্যে বাধিকারস্তে মা ফলেষু কদাচনা।' ফলাকাঙ্ক্ষা নিরপেক্ষ কর্ম করার তাৎপর্য হচ্ছে বিষ্ণুতে আত্মসমর্পণ করে কর্তব্য করে যাওয়া। তবু মহাভারত হচ্ছে ভারতীয় সব তত্ত্বের ও জ্ঞানের আকরগ্রন্থ। নানা প্রসঙ্গে সব তত্ত্ব ও আখ্যান-উপাখ্যানই এতে বর্ণিত হয়েছে। মহাভারতে দেবতারা যে একই ঈশ্বর থেকে বিভিন্ন রূপে-গুণে-মানে-মাহাত্ম্যে উদ্ভূত, তাও স্বীকৃত হয়েছে। সাংখ্য, যোগ ও তন্ত্র এখানেও প্রাধান্য পেয়েছে, সাংখ্য, যোগ, পাশুপত ও পঞ্চরাত্র যথাক্রমে কপিল, হিরণ্যগর্ভ, শিব ও নারায়ণ প্রবর্তিত শাস্ত্র ও দর্শন।[৫০] মহাভারতের ধর্মীয় চিন্তাধারা ঈশ্বরনিষ্ঠ ও স্পষ্টত দ্বৈতবাদী।[৫১] এভাবে বেদবিরোধী লোকপ্রচলিত লোকায়ত ধর্মের দেবদেবী ও আচার নতুন ব্যাখ্যা পেয়ে ব্রাহ্মণ্য ধর্মের অন্তর্ভূত বা তাতে সমন্বিত হল।

ফলে বৈদিক আর্যদের মত ও মনন অনার্য মত ও মননের কাছে হার স্বীকার করে তার সঙ্গে সমন্বিত হল। এক বিদ্বান বলেন "(এইরূপে) রুদ্র-শিব, বিষ্ণুনারায়ণ অথবা কৃষ্ণ বাসুদেবের উপাসনাকে কেন্দ্র করিয়া যে সকল লোক-প্রচলিত মত গড়িয়া উঠিয়াছিল, সেইগুলির আবেগ-প্রধান ভক্তিবাদের দিকে বিশেষ প্রবণতা ছিল, ইহাতে প্রাচীন ক্রিয়াকাণ্ড ও ব্রহ্মমূলক ধর্মমত নিশ্চয়ই অনেকটা শিথিল হইয়া আসিতেছিল"।[৫২]

গীতা মূলত কর্মবাদের প্রবক্তা হলেও গীতাতে জ্ঞান-কর্ম-ভক্তি তিনটেই কমবেশি গুরুত্ব পেয়েছে। পূর্বে বর্ণিত দেবরাজ ইন্দ্র-কৃষ্ণের লড়াই ও পরিণামে ইন্দ্রের পরাজয় ও মর্যাদাচ্যুতি এখানেও স্মর্তব্য। বৈদিক দেবতার বিলুপ্তি এবং দেশী কালো বর্ণের অনার্য অবতারের প্রতিষ্ঠা শাস্ত্রের, সমাজের, সংস্কৃতির ক্ষেত্রে শাসক-শাসিতের সম্পর্কের ক্ষেত্রে একটা নতুন সমন্বিত রূপের নির্দেশক। সভ্য সমাজে জ্ঞান-কর্ম-ভক্তি ভিত্তিক নতুন জীবন-দর্শনের উন্মেষ ও স্বীকৃতি একটা বাহ্য ও আন্তর্বিপ্লব নিশ্চয়ই। এর গুরুতা, গভীরতা, ব্যাপকতা এবং দূরপ্রসারী পরিণতি উপলব্ধি করে বলতেই হয়—শাস্ত্রে ও সমাজজীবনে এ ছিল এক মহালগ্ন—স্মরেণ্য যুগসন্ধিক্ষণ।

গীতা দিয়েই ভারতবর্ষে ব্যক্তি প্রবর্তিত ধর্মের শুরু। গীতার কৃষ্ণই ছিলেন ভারতবর্ষে প্রথম অভিন্ন শাস্ত্রিক-সামাজিক শক্তির উৎস ও নায়ক। কাজেই গীতা—তার সঙ্গে আদি ক্ষুদ্রতম মহাভারত বা ভারতকাব্য এক মহাবিপ্লবের প্রসূন, ফসল ও সাক্ষ্য। আধুনিক ব্রাহ্মণ্য মতের ও শাস্ত্রের উন্মেষ, বিকাশ ও বিবর্তনের ধারায় গীতার দান অতি গুরুত্বপূর্ণ।

৪. চার্বাকদর্শন বা বস্তুবাদ বা জড়বাদ

বৃহস্পতিলোক্য বা ঋগ্বেদের ব্রাহ্মণস্পতি সর্বপ্রথম বস্তুকে চরম সত্য বলে ঘোষণা করেন। চার্বাকরা ছিল বৃহস্পতিরই মতানুসারী। একারণে তাদেরকে বার্হস্পত্য বা লোকায়তিক বলা

হয়। এরা বস্তুবাদী ঐহিক জীবনবাদী—অধ্যাত্মবাদী নয়। আর্যপূর্বযুগেও যে ভারতের লোকমনে এর জড় ছিল, তা বেদে এর উল্লেখ থেকেই জানা যায়। রামায়ণের জাবালি মুনি, হরিবংশের রাজা বেন, গৌতমবুদ্ধের সমকালীন অজিতকেস কম্বলী, তাঁর শিষ্য পায়াসি আর ভাগুরি, পুরন্দর প্রভৃতি বিভিন্ন সময়ে নাস্তিক্যবাদের ধারক ও বাহক ছিলেন।[৫৩] এ ধারার চিন্তার প্রসূন হচ্ছে ইন্দ্রিয়াত্মবাদ, প্রাণাত্মবাদ ও মনশ্চৈতন্যবাদ। দেহের বিনাশে চৈতন্য লুপ্ত হয় এবং দেহের উপাদানগুলো নিজ নিজ ভূতে মিশে যায়। কাজেই কর্মফল ভোগ, আত্মার জন্মান্তর গ্রহণ প্রভৃতি অর্থহীন। জড়পদার্থ থেকে চৈতন্যের উৎপত্তি এ মত বৃহদারণ্যক উপনিষদেও মেলে এবং দেহাত্মবাদের অনুকূলে ইঙ্গিত রয়েছে ছান্দোগ্য উপনিষদের 'ইন্দ্র-বিরোচন' উপাখ্যানে।[৫৪] বার্হস্পত্য সূত্রে আছে, 'সর্বথা লোকায়তি-কমেব শাস্ত্রমর্থ সাধনকালে কাপালিকমের কামসাধনে।' হরিভদ্র সূরি রচিত ষড়দর্শনসমুচ্চয়ের টীকাকার দার্শনিক গুণরত্ন (১৪ শতক) বলেছেন, 'কাপালিক ও লোকায়তিকের মধ্যে কোন পার্থক্য নেই। লোকায়তিকরা গায়ে ভস্ম মাখে, মদ খায়, মাংস খায় এবং তারা মৈথুনাসক্ত ও যোগী। এবং বছরে এক নির্দিষ্ট দিনে তারা সবাই একস্থানে মিলিত হয়ে মৈথুনে রত হয়। মাধবাচার্য বলেছেন—লোকায়তিকরা কামাচারী—অর্থ ও কাম সাধনাই (অর্থকামো পুরুষার্থ) তাদের লক্ষ্য।[৫৫] সাঁওতাল, হো, পাঞ্জা, কোটার প্রভৃতি দেশী গোষ্ঠীর মধ্যে এবং চিলি, নিউমেক্সিকো, নিকারাগুয়া, মেক্সিকো প্রভৃতি দেশের আদিবাসীদের মধ্যে এমনি মৈথুন উৎসব চালু রয়েছে আজো।[৫৬] দোল, হোলি বা মদন উৎসবে আজো সেই মৈথুন উৎসবের রেশ ও লেশ রয়ে গেছে। W. Crooke হোলি বা মদন-উৎসবের মূলে মানুষের, পশুর ও শস্যের উর্বরতা বৃদ্ধির কামনা ছিল বলে অনুমান করেন।[৫৭]

চার্বাকগোষ্ঠীর গ্রন্থগুলো দুর্লভ। অবশ্য আট শতকের জয়রাশি ভট্টরচিত চার্বাকগ্রন্থ 'তত্ত্বোপপ্লবসিংহ' মুদ্রিত হয়েছে। তবে জৈন-বৌদ্ধ-ব্রাহ্মণ্য শাস্ত্র গ্রন্থে চার্বাক মতবাদের কিছু কিছু নমুনা মেলে নানা প্রসঙ্গে। চার্বাকেরা জ্ঞানবাদীও, তবে প্রত্যক্ষ ব্যতীত সত্যজ্ঞানলাভের অন্য উপায় আছে বলে তারা মানে না—'প্রত্যক্ষমেবৈকং প্রমাণম,' কাজেই তারা ইন্দ্রিয়লব্ধ জ্ঞান-নির্ভর। প্রশ্নোপনিষদের ঋষি কাত্যায়নের মতো চার্বাকরা চার উপাদান—ক্ষিতি অপ তেজ ও মরুৎ স্বীকার করে—ইরানীরাও খাক, বাত, আব, আতসই কেবল মানে। চৈতন্য হচ্ছে ওই চার উপাদানের মিশ্রণের ও সমন্বয়ের উপাজাত অর্থাৎ জড় থেকেই চৈতন্যের উদ্ভব। চৈতন্য আত্মা নয়। দেহ-নিরপেক্ষ চেতনা নেই, ফলে অবিনশ্বর আত্মাও নেই। এ কারণেই চার্বাকরা নিরীশ্বর। এখানে এপিকিউরাসের দর্শনের বা মতের সঙ্গে চার্বাকদের প্রায় পুরোপুরি মিল রয়েছে। একিউরীয় দর্শনেও দেহ ও আত্মা তথা চৈতন্য অভিন্ন সত্তা। আত্মা শারীর বস্তু, চার মূল পদার্থে গঠিত বা জাত এবং সব অনুভূতিই ইন্দ্রিয়জ। চার্বাকরা ঐহিকজীবন ও সুখবাদী—এদেরই আপ্তবাক্য হচ্ছে 'যাবৎ জীবেৎ সুখং জীবেৎ ঋণং কৃত্বা ঘৃতং পিবেৎ ভস্মীভূতস্য দেহস্য পুনরাগমনং কুতঃ? কিংবা, 'বরমদ্য কপোতঃ 'শ্বো ময়ূরাৎ।' আজকের কপোত আগামীকালের ময়ূরের চেয়ে মূল্যবান। Eat drink—be merry, for tomorrow we may die. One in hand is better than two is bush.

১. ঢাল সুরা সখি ...
হরদম দাও, আজ বাদে কাল ভরসা কি। (মোহিতলাল মজুমদার)
কিংবা ২. সব বুলি মিছা, শুনহ গোপনে
একটি বচন সত্যসার

যে ফুল নিশীথে পড়েছে ঝরিয়া
সে নাহি কখন ফুটিবে আর। (উমর খৈয়াম)

পৃথিবীর সব মানুষ একই জাতের প্রাণী বলেই হয়তো তাদের ভাব-চিন্তা-কর্ম-আচরণে জগৎচেতনায় ও জীবন-ভাবনায় ঐক্য ও সাদৃশ্য থাকে, তাই অনুভূতির অভিব্যক্তিও ঘটে একই পন্থায় ও অভিন্ন ভাষায়। অতএব, চার্বাকরা অর্থকে ও কামকেই কেবল পুরুষার্থ বলে স্বীকার করত। যারা দেহকে প্রাধান্য দেয় তারা দেহবাদী বা দেহাত্মবাদী, যারা ইন্দ্রিয়কে গুরুত্ব দেয় তারা ইন্দ্রিয়াত্মবাদী, যারা মনকে মুখ্য মনে করে তারা মনাত্মবাদী এবং যারা প্রাণকেই চৈতন্যের মূল মনে করে তারা প্রাণাত্মবাদী। কাজেই চার্বাক বা বার্হস্পত্যদের মধ্যে ছিল চারটি মতবাদী সম্প্রদায়। তবে তারা সবাই ঐহিক, দৈহিক ও ক্ষণিক সুখে বিশ্বাসী।

তর্করহস্যদীপিকায় চৌদ্দশতকের টীকাকার দার্শনিক গুণরত্ন কাপালিকদেরও নাস্তিক, চার্বাক ও লোকায়ত নামে অভিহিত করেছেন, যদিও কাপালিক একটি গুহ্য সাধক সম্প্রদায় আর চার্বাকরা সাধারণ অর্থে ধর্মহীন। আজো মানুষ চোর-ডাকাত-মিথ্যুক-লম্পট প্রতারক প্রভৃতি সব দুষ্ট লোককে সহ্য করে, কিন্তু নাস্তিককে সহ্য করতে চায় না। সেকালেও নাস্তিক, তার্কিক ও প্রত্যক্ষবাদী চার্বাক-লোকায়তিকরা ছিল নিতান্ত ঘৃণ্য। তবু সংশয়বাদী, জড় বা বস্তুবাদী এবং দেহাত্মবাদী আস্তিক প্রভৃতি মতের প্রসারে, পুষ্টিতে এবং বিবর্তিত রূপে টিকে থাকার ক্ষেত্রে চার্বাকলোকায়তিকের দান গভীর ও ব্যাপক। অবশ্য নিরীশ্বর-সঈশ্বর যোগ-তান্ত্রিক সাধনার প্রসারে বিকৃত বৌদ্ধ মতও বিভিন্নভাবে সহায়তা করেছে। বলতে গেলে মহাযানী বৌদ্ধদের বজ্র-সহজযান বিকাশে চার্বাকদের শারীর চৈতন্যবাদ ও লোকায়ত কায়াসাধন ভিত্তিরূপে কাজ করেছে। আজো প্রচ্ছন্নবৌদ্ধ বৈষ্ণবসহজিয়া ও বিভিন্ন গুরুপন্থী বাউল এবং তান্ত্রিক শৈবপন্থী ও নাথপন্থী বৌদ্ধ বজ্র-সহজ মতের কালিক ধারায় বিবর্তিত রূপ নিয়ে টিকে রয়েছে। এসব মতও মূলে চার্বাক লোকায়তিক মতাদর্শের কাছে ঋণী। বজ্রযান, সহজযান-বৈষ্ণবসহজিয়া কিংবা বাউল মত আসলে লোকায়ত লোকধর্মই।[৫৮]

৫ জৈন বৌদ্ধ বিপ্লব

আমরা আগেই বলেছি, আর্য-অনার্য জগৎ-চেতনার ও জীবন-ভাবনার মিশ্রণে যখন শাসক-শাসিতের এক অভিন্ন শান্ত-সমাজ-সংস্কৃতি ও সরকার শাসক আর্যদের নামে চিহ্নিত হল, তখন অনার্য সভ্যতা-সংস্কৃতি ও প্রশাসন ব্যবস্থা শাসকগোষ্ঠী গ্রহণ করলেও শাসকের শক্তি-সুখ সম্পদের ও সংস্কৃতির অতুল্যতার গৌরব-গর্ব রক্ষার বাঞ্ছাবশে তারা দেশজ সংখ্যাগুরু অধিবাসীদের সর্বপ্রকার অধিকার হরণ করে তাদেরকে দাস, দুর্বল ও অনুগত রাখার শাসক-সুলভ ব্যবস্থ করল এবং রাজনীতির নিয়মে উচ্চবিত্তের কিছু ধূর্ত দেশী-লোককেও স্বদলভুক্ত বা স্বজন করে নিল, আর সব অবজ্ঞেয় টোটেম নামে দাস, দস্যু, যক্ষ, রাক্ষস, নাগ, কুকুর, দৈত্য, দানব প্রভৃতি গোষ্ঠীনামে শূদ্র ও সেবক হয়ে থাকল। শাসকগোষ্ঠীর ভোগ-উপভোগের সামগ্রীর যোগান দেয়ার জন্যেই যেন আর সব মানুষের জন্ম ও জীবন। বর্ণে বিন্যস্ত ও বিভক্ত শাসক-শাসিতের সমাজে বৃত্তিক (ব্রৈত্তিক) জীবন যখন অপরিবর্তনীয় হয়ে দাঁড়াল, ক্ষুদ্র ও তুচ্ছ বৃত্তিজীবীর যখন নিঃস্বতা ও নিত্য প্রয়োজনীয় আহার্যের ও অন্যান্য দ্রব্যের অভাব-জাত যন্ত্রণা প্রজন্মক্রমে কখনো ঘুচবার সম্ভাবনা রইল না এবং সে-সব কামার-কুমার-মুচি-মেথর-হাড়ি-ডোম-চাঁড়াল-বাগদী-জেলে-তাঁতী-তিলি প্রভৃতিই যখন দেশের শতকরা আশিজন, তখন সে-সব নির্যাতিত নিপীড়িত শোষিত বঞ্চিত মানুষকে অমানবিক অবস্থা ও অবস্থান থেকে

উদ্ধার করার জন্যে সেদিনও সংবেদনশীল মানববাদী বিবেক-জ্ঞান-প্রজ্ঞাবান মানুষ চেষ্টা করেছিলেন—নিজের ব্যক্তিগত সুখ-সুবিধা পরিহার করে দুঃখ-বিপদ বরণ করতে এসেছিলেন এগিয়ে—মৃত্যুর ঝুঁকি নিয়ে হয়েছিলেন প্রচলিত শাস্ত্র-সমাজ-সরকারের ও নিয়ম-নীতির, রীতি-রেওয়াজের বিরুদ্ধে বিদ্রোহী, প্রতিকার লক্ষ্যে প্রতিবাদে ও প্রতিরোধে হয়েছিলেন মুখর, দাঁড়িয়েছিলেন রুখে। এমনি দুজন মহাবিদ্রোহী মহানায়ক ছিলেন বর্ধমান মহাবীর (খ্রী: পূ: ছয় বা পাঁচশতক) ও গৌতম বুদ্ধ (আনু: ৫৫৬ —৪৭৬ খ্রী: পূ:) মানুষকে পীড়ন, শোষণ ও দাসত্ব মুক্ত করতে গিয়ে তাঁরা চরম বাণী উচ্চারণ করলেন, বললেন, কেবল মানুষ নয়—জীব নির্বিশেষের রয়েছে স্বাধীনভাবে বেঁচে বর্তে থাকার অধিকার—এ পৃথিবীতে সব প্রাণীরই সম অধিকার—সবারই প্রাণের মূল্য ও মর্যাদা সমান। মশা-মাছি-কীট-পতঙ্গ থেকে বাঘ-সিংহ-হাতী কিংবা মানুষ কারো প্রতি জুলুম করার অধিকার কোন মানুষের নেই। এ নীতির নাম অহিংসনীতি। পুরো প্রয়োগ-সাফল্য থাক বা না থাক এমন মহৎ চরম হৃদয়বেদ্য বাণী এর আগে বা পরে আর কখনো কোথাও উচ্চারিত হয়নি।

বলেছি সে যুগে শাস্ত্র, সমাজ, সরকার, কিংবা জীবনাচার সম্পৃক্ত যে-কোন নিয়ম-নীতি, আচার-আচরণ, বিশ্বাস-সংস্কার বদলাতে হলে ঐহিক-পারত্রিক জীবনের সুখশান্তির দোহাই দিয়ে দিয়ে নতুন ধর্মমত কিংবা শাস্ত্র প্রচার করতে হত, এ যুগের মতো নতুন মত-পথ মুখে উচ্চারণ করে কিংবা গ্রন্থে লিখে প্রচার করা যেত না। তাই বর্ধমান মহাবীরকে ও গৌতম বুদ্ধকে জগৎ ও জীবন সম্বন্ধে নতুন তত্ত্বও প্রচার করতে হয়েছে। উভয়েই ছিলেন ভোগবিরোধী ও বৈরাগ্যবাদী—জীবনের ঐহিকতা ছিল তাঁদের কাছে তুচ্ছ ও মূল্যহীন এবং যন্ত্রণাদায়ক। জিন (সন্ত-বিরাগী) বর্ধমান মহাবীর প্রচারিত ধর্মের নাম জৈন ধর্ম। আর গৌতম বুদ্ধ প্রচারিত মতবাদের নাম তাঁর মতাবলম্বীদের কাছে সদ্ধর্ম (সৎ + ধর্ম), অন্যদের দেয়া নাম বৌদ্ধ ধর্ম। মহাবীর বলেছেন, তাঁর পূর্বে আরো তেইশজন বুধ বা তীর্থঙ্কর এ মতবাদই প্রচার করে গেছেন। এঁদের মধ্যে চারজনের নামও জানা যায়। চন্দ্রবংশ প্রতিষ্ঠাতা প্রথম বুধ, দ্বিতীয়জন নেমিনাথ এবং তৃতীয় তীর্থঙ্কর পার্শ্ব নাথ। গৌতমবুদ্ধও বলেছেন, তাঁর পূর্বে আরও শত বোধিসত্ত্ব একই বাণী প্রচার করেছেন। এতে বোঝা যায়, নির্যাতিত মানবতার মুক্তির সংগ্রাম অনেক আগেই শুরু হয়েছিল, তবে সংগ্রামে সাফল্য লাভ করেছিলেন মহাবীর ও গৌতম। লক্ষণীয় যে মহাবীরের জন্ম হয়েছিল মগধ অঞ্চলে আর গৌতমের জন্ম নেপাল সীমান্তে তরাই এলাকার কপিলবাস্তুতে। দুটোই ছিল আর্যঘৃণ্য অনার্য অধ্যুষিত দেশ। নির্যাতিত শোষিত অস্পৃশ্য শূদ্ররা সাধারণভাবে ছিল অনার্য। তাহলে একে পীড়ক আর্যের বিরুদ্ধে পীড়িত অনার্যদ্রোহ বলা অসঙ্গত নয়। যারা এবং যাদের নামে পীড়ন চলে, তাদের আনুগত্য অস্বীকার করা, তাদের শাস্ত্র ও সমাজ বর্জন করাই ছিল এ দ্রোহের লক্ষ্য। তাই জৈন-বৌদ্ধরা দেবদ্বিজবেদ দ্বেষী। বেদ মানে না বলেই এরা নির্গ্রন্থ এবং বেদাদি শাস্ত্রগ্রন্থের অস্তিত্ব স্বীকার করে না বলেই ব্রাহ্মণ্য সমাজের কাছে তারা নাস্তিক নির্গ্রন্থ বলে অবজ্ঞাত। 'অ্যানেলস অব রাজস্থান'-এর লেখক কর্নেল টডের মতে জৈন ধর্মের জড় ছিল মধ্য এশিয়ায়। এ মতের ভিত্তি হচ্ছে ভারত-বহির্ভূত শঙ্কু শীর্ষাকারের এক বর্ণমালায় লেখা জৈন শিলালিপি ও তাম্রশাসন প্রাপ্তি। জৈন-বৌদ্ধেরা জন্মান্তরবাদে বিশ্বাসী, জৈনরা নির্গুণ নিষ্ক্রিয় নির্লিপ্ত ঈশ্বরের অস্তিত্ব স্বীকার করে, কিন্তু উপাসনার প্রয়োজন স্বীকার করে না, বৌদ্ধরা এ বিষয়ে নীরব। জৈন-বৌদ্ধরা নির্বাণকামী। সংখ্যালঘু জৈনরা ব্রাহ্মণ্য সমাজের প্রভাব নানাভাবে স্বীকার করে ব্রাহ্মণকে শাস্ত্রিক আচার ও পূজা সম্পাদনে অধিকার প্রভৃতি দিয়ে আপোস করে নিয়েছিল। তারা গঙ্গা, কালী, গনেশ

প্রভৃতি দেবতাও মানে, ফলে ব্রাহ্মণ্য আনুকূল্যে জৈন সমাজ ও ধর্ম ভারতে বিলুপ্ত হয়নি। কিন্তু ব্রাহ্মণ্যবাদীর এক সময়কার রাজনীতিক প্রতিদ্বন্দ্বী বৌদ্ধ সম্প্রদায় এবং তৎসঙ্গে শাস্ত্রও ভারতের মাটিতে সম্পূর্ণভাবে বিলোপ হয়েছিল। আর বাঙলায় বিলুপ্ত হয়েছিল জৈন মত ও সম্প্রদায়। সর্বজীবে দয়া ও অহিংসা এখনো জৈন জীবনে বাস্তবে আচরণীয় দায়িত্ব ও কর্তব্য। পৈঁজরাপোল তার সাক্ষ্য। কিন্তু মানুষ সম্বন্ধে জৈনরা দ্বেষ-দ্বন্দ্বদুষ্ট।

জৈন বৌদ্ধ ধর্ম প্রায় সমকালীন এবং দুটো মতে ও চর্যায় সাদৃশ্যও অনেক, বৈরাগ্য, ভোগে বিতৃষ্ণা, জন্মান্তরভীতি উভয় ধর্মেই সমভাবে রয়েছে। এখানে বৌদ্ধ স্কন্ধ-চার আর্যসত্য, নির্বাণ ও শূন্যতত্ত্ব এবং বিভিন্ন উপশাখা আর জৈন দিগম্বর শ্বেতাম্বর সম্প্রদায়ের নানা তত্ত্ব (সপ্ত 'নয়'ও প্রমাণ) এখানে প্রাসঙ্গিক নয় বলে আলোচ্য হল না। তবে বাঙলাদেশে বৌদ্ধ ধর্ম চরমবিকৃতি পেয়ে বিভিন্ন যোগতান্ত্রিক দেহতাত্ত্বিক উপযানে পরিণতি পায়, সে-সব মত ও মতাবলম্বী গোষ্ঠী আজো ভিন্ন নামে টিকে রয়েছে। সে বিষয়ে যথাস্থানে আলোচনা থাকবে। এখানে এমাত্র বললেই চলবে যে জৈন-বৌদ্ধ মন্দির-চৈত্য ক্রমে দেব-দেবী আকীর্ণ হয়ে ওঠে।

ব্রাহ্মণ্যবাদী বিদ্বানের দৃষ্টিতে বর্ধমান মহাবীরের ও গৌতম বুদ্ধের আবির্ভাব কাল এক আধ্যাত্মিক অস্থিরতার যুগ। (তখন) প্রাচীন ধর্মের বন্ধন হইতে সমাজ দ্রুত সরিয়া যাইতেছিল।[৩১] (অর্থাৎ অনার্য যোগতন্ত্র, দেব পূজা প্রবল হচ্ছিল; আর নাস্তিক দেহাত্মবাদীরা তো ছিলই)।

আস্তিকমাত্রই স্বাভাবিক কারণেই পরধর্মে আস্থাহীন ও অবজ্ঞাপরায়ণ। কাজেই ঐহিক-বৈষয়িক বিরোধের কোন কারণ ঘটলে তা বিধর্মী বিদ্বেষের রূপ নেয়। গোড়ার দিকে তাই ব্রাহ্মণ্য-জৈন-বৌদ্ধদের মধ্যেও দ্বন্দ্ব-সংঘাত-সংঘর্ষ কম হয়নি। বাঙলাদেশেও হয়েছিল তার বৃত্তান্ত এখানে উল্লেখ্য। বৌদ্ধ ধর্মের আগে রাঢ়ে পুণ্ড্রে জৈন ধর্মই প্রচারিত হয়। জৈনে-বৌদ্ধে যে বাঙলার মাটিতে রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষ হয়েছিল তার কিছু প্রমাণও রয়েছে। দিব্যাবদান সূত্রে জানা যায় অশোক পুণ্ড্রবর্ধনে বৌদ্ধ ধর্মের অবমাননায় রুষ্ট হয়ে আঠারো হাজার আজীবিক বা নির্গ্রন্থ জৈন হত্যা করেছিলেন। অজাতশত্রুর বৌদ্ধবিদ্বেষ ছিল লোকপ্রসিদ্ধ। শশাঙ্কের বৌদ্ধবিদ্বেষ ছিল আরো তীব্র ও ত্রাসকর। তাঁর হুকুম ছিল :

> "আ-সেতোর আতুষারদ্রে বৌদ্ধানাং বৃদ্ধ বালকান
> যো না হন্তি স হন্তব্যোভৃত্যান্ ইত্যশিষণ নিপঃ।"

—সেতুবন্ধ থেকে হিমালয় অবধি যেখানে যত বৌদ্ধ রয়েছে তাদের বৃদ্ধ ও বালকসহ যে ভৃত্য হত্যা করবে না—সে প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত হবে। এ হুকুম হুমকি বা হামলার কি তুলনা আছে!

আবার, 'শঙ্কর বিজয়ে' রয়েছে ব্রাহ্মণ্য রাজারা :

> "দুষ্টামতাবলম্বিনঃ বৌদ্ধান জৈনান
> অসংখ্যাতান রাজমুখ্যান অনেকবিদ্যা
> প্রসঙ্গে নির্জিতা তেষাং শীর্ষানি পরশু
> ভিশ্চিত্ত্বা বহুষু উদুখলেষু নিক্ষিপ্য
> কট ভ্রমনৈশ্চুনীকৃত্য চৈবং দুষ্টমত ধ্বংসমাচরণ
> নির্ভয়োবর্ততে।

অসংখ্য দুষ্টমতাবলম্বী বৌদ্ধ ও জৈন রাজমুখ্য অনেক বিদ্যাপ্রসঙ্গে নির্জিত করে তাদের মাথা কুঠার দিয়ে বিচ্ছিন্ন করে উদুখলে ফেলে মুষলাঘাতে চূর্ণ করে দুষ্টমত ধ্বংস করে নির্ভয় থাকতেন।

সেনরাজাদের উগ্র ব্রাহ্মণ্যবাদ বৌদ্ধ-বিদ্বেষের আভাস দেয়। আর্যমঞ্জু-শ্রীমূলকল্পের ও সরহের দোঁহায় ব্রাহ্মণ্য ধর্মের ও সমাজের নিন্দা প্রকট। আর্যদেবের চিত্তশোধন প্রকরণে, সাধনমালায়, বজ্রসূচিতত্ত্বকোষে ব্রাহ্মণ্যবাদীদের প্রতি বিদ্বেষ মেলে। এমন কি শূন্য পুরাণেও বেদশাস্ত্রের ঠাঁই শ্রীনিরঞ্জনের পদপ্রান্তে, গোরক্ষনাথের ও লাউসেনের কাছে স্বয়ং দূর্গাদেবীও হার মানেন। আস্তিক মানুষে মত-পথ পার্থক্যজনিত এ হানাহানি কোন দেশ-কালের প্রভেদ মানেনি। পরে আমরা 'ব্রাহ্মণে যবনে বাদ'ও দেখেছি।

অন্যের বিশ্বাস অযৌক্তিক অসত্য বলে সহজেই উপলব্ধি করলেও নিজের লালিত বিশ্বাস মানুষ নির্বোধের মতোই আঁকড়ে থাকে। তাই আস্তিক মানুষের বুদ্ধির মুক্তি নেই। মনে হয় বৌদ্ধদের বিরূপতায় বাঙলাদেশে জৈন মত উচ্ছেদ হয়। গোটা ভারতের নিম্নবর্ণের ও নিম্নবিত্তের মানুষ এক সময়ে বৌদ্ধমত বরণ করে ব্রাহ্মণ্য ঘৃণা ও পীড়ন থেকে মুক্তির স্বস্তি লাভ করেছিল।

বিদ্বানদের মতে খ্রীস্টীয় চার শতক থেকেই ব্রাহ্মণ্য ধর্মের পুনরুত্থান ঘটে এবং তখন থেকে বৌদ্ধ মতের নিন্দাবাদে ব্রাহ্মণ্যবাদীরা মুখর হয়ে ওঠে। ছয় শতকে ন্যায়বর্তিকা প্রণেতা উদ্যোতকর বৌদ্ধ দার্শনিকদের মত খণ্ডনে উদ্যোগী হন। সাত শতকে দাক্ষিণাত্যে কুমারিল ভট্ট রাজশক্তিকে বৌদ্ধ-হত্যার প্ররোচনা দিয়ে বৌদ্ধ নিধন ত্বরান্বিত করেন। আটশতকে শঙ্কর বৌদ্ধ মায়াবাদ ও বৈরাগ্য বৈদান্তিক তত্ত্ব বলে গ্রহণ করে বৌদ্ধদের ব্রাহ্মণ্য ধর্ম বরণে উৎসাহিত করেন, তিনি বিহার-চৈত্যের অনুকরণে মঠ স্থাপন করেন। বারো শতকে মিথিলার উদয়নাচার্য নতুন করে বৌদ্ধমত খণ্ডন করেন। আসলে এতেই বৌদ্ধ বিলুপ্তি ঘটেনি, রাজশক্তির প্রশ্রয়ে সুপরিকল্পিতভাবে বৌদ্ধ পীড়নের ফলেই ভারতে বৌদ্ধ মত ও শাস্ত্র লোপ পায়। 'কলিমাজালাল' এ সূত্রে স্মর্তব্য এবং যারা স্বধর্ম ত্যাগ করতে চায়নি, তারা বাহ্যত ব্রাহ্মণ্য সমাজে আশ্রিত হয়ে প্রচ্ছন্নভাবে স্বধর্ম রক্ষা করেছে, তারাই হচ্ছে আধুনিক ধর্মঠাকুর পূজারী, নাথযোগী (তাঁতী), শৈবনাথপন্থী, বৈষ্ণব সহজিয়া ও বাউল।

ব্রাহ্মণ্যবাদীরা বৌদ্ধদের দেবতাদেরও স্বীকৃতি দিয়ে, স্বয়ং গৌতমবুদ্ধকে অবতাররূপে গ্রহণ করে বৌদ্ধদের ব্রাহ্মণ্য সমাজভুক্ত হওয়ার জন্যে প্রলুব্ধও করেছিল। এ বিষয়ে একজন বিদ্বানের মত্ এখানে উদ্ধৃত করছি :

"পৌরাণিকগণ বুদ্ধকে ভগবান বিষ্ণুর অবতার মধ্যে পরিগণিত করেন। শঙ্করাচার্য বুদ্ধের মায়াবাদকে অদ্বৈতবাদ নাম দিয়া সর্বত্র প্রচারিত করেন। বুদ্ধের প্রবর্তিত ভিক্ষু ও ভিক্ষুণী সম্প্রদায়ের অনুকরণে রামানুজ, মাধবাচার্য, বল্লভাচার্য, শ্রীচৈনত্য প্রভৃতি বৈষ্ণবগণ বৈরাগী ও বৈরাগিনী সম্প্রদায় সৃষ্টি করেন। যখন বুদ্ধদেব বিষ্ণু হইলেন, শূন্যবাদ ব্রহ্মবাদে পরিণত হইল এবং ভিক্ষু ও ভিক্ষুণীগণ স্বীয় উপাধি ত্যাগ করিলেন, তখন বৌদ্ধ ধর্মের কিছুই অবশিষ্ট থাকিল না। ক্রমে বৌদ্ধগণ বৈষ্ণব ও শৈব হইলেন।[৬০]

"ব্রাহ্মণগণ তান্ত্রিক সম্প্রদায়ের সহায়তা করিয়া বৌদ্ধ ধর্মের স্বাতন্ত্র্য নষ্ট করিবার উপায় আরো সহজ করিলেন। বৌদ্ধগণ তান্ত্রিক ধর্মের আশ্রয় গ্রহণ করিয়া ব্রাহ্মণ্য ধর্মে পুনরাগমন করিতে লাগিলেন। সমগ্র বৌদ্ধধর্ম কালক্রমে তান্ত্রিক ধর্মে পরিণত হইল এবং তান্ত্রিক বৌদ্ধগণ পরিশেষে হিন্দু হইলেন। ব্রাহ্মণ্য ধর্ম ও বৌদ্ধ ধর্ম এতদুভয়ের সমবায়ে বর্তমান হিন্দু ধর্মের সৃষ্টি হইয়াছে"।[৬১]

বৌদ্ধ দর্শন অতি উঁচু মার্গে উঠেছিল। নাগার্জুন, সুবন্ধু, অসঙ্গ প্রমুখ দার্শনিকদের চিন্তা-চেতনা জ্ঞান-প্রজ্ঞার প্রসূন জড়বাদ, বিজ্ঞানবাদ, যোগাচারবাদ মাধ্যমিকবাদ, নির্বাণবাদ,

শূন্যবাদ জটিলতায় সূক্ষ্মতায় উৎকর্ষে ঔজ্জ্বল্যে আজকের অস্তিত্ববাদের ডায়লেকটিক্‌সের কিংবা নিট্‌সের বার্গসঁর তত্ত্বের প্রতিস্পর্ধী। সেই বৌদ্ধ দর্শনই হার মানল তন্ত্রাচার ও তন্ত্রশাস্ত্রের কাছে। 'যিনি তন্ত্রশাস্ত্রের সৃষ্টি করিয়াছিলেন, তিনিই প্রথম বৌদ্ধ ধর্মের মূলোচ্ছেদ করেন'।[৬২] একে অবক্ষয়জাত বিকৃতি ছাড়া আর কি বলা যাবে! এ তান্ত্রিক ধর্ম খ্রীস্টীয় চারশতক থেকেই বৌদ্ধদের মধ্যে চালু হয়। এ শতকেই পাঞ্জাববাসী দার্শনিক অসঙ্গই 'যোগাচার্য ভূমিশাস্ত্র' নামে প্রথম তন্ত্রগ্রন্থ রচনা করেন। এ তন্ত্রচর্চার পরিণামে ও পরিণতিতেই বৌদ্ধ মহাযান মতে দেখা দিল বজ্র-সহজযানী কায়া সাধন চর্যা।

তথ্যনির্দেশ

১. Munda affinities of Benali Language —Dr. M. Sahidulla; ভাষার ইতিহাস ; O.D.B.L. —Dr. S. K. Chatterjee;

২. বঙ্গভূমিকা ১ম সং, পৃ. ১৩২;

৩. History of Ancient India—D.D. Cosumbi

৪. বঙ্গভূমিকা, পৃ. ৩১৬। (মূর্তিটি আশুতোষ মিউজিয়ামে রক্ষিত)

৫. বাঙালীর ইতিহাস (আদিপর্ব), নীহাররঞ্জন রায়; প্রাচীন বাংলা ও বাঙালী, সুকুমার সেন।

৬. নৃতত্ত্ব ও হিন্দুসভ্যতা, হিন্দুসভ্যতার নৃতাত্ত্বিক ভাষা, পৃ. ১৩।

৭. প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যদর্শনে ইতিহাস, ১ম খণ্ড, ভারত সরকার প্রকাশিত। লোকায়ত দর্শন, দেবী প্রসাদ চট্টোপাধ্যায়।

৮. প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যদর্শনের ইতিহাস, ১ম খণ্ড, পৃ. ১৪৮।

৯. রামায়ণ, আদি কাণ্ড, বাল্মীকি ; ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণ (শ্রীকৃষ্ণ প্রসঙ্গ)।

১০. Golden Bough, Hames Frazer ; Ancient Society, H.L. Morgan; লোকায়ত দর্শন—দেবী প্রসাদ চট্টোপাধ্যায়, পৃ. ১৩২-৩৪, ২৮২-৮৩,

১১. Ancient Symbol Worship—H.M. Westrop, pp. 23-29

১২. লোকায়তদর্শন, পৃ. ১০১, ১১৩-১৪, ১১৭-৩৪; The Mothers, R. Briffault, Vol III, p. 54, 57 ; Golden Bough; p. 119 লোকায়তদর্শনে উদ্ধৃত।

১৩. লোকায়তদর্শন, পৃ. ৩৫৭-৭৯।

১৪. মার্কণ্ডেয় পুরাণ, ৭২, পৃ. ৪৩-৪৪

তাতোহ্হম খিলং লোকমাত্মাদেহ সমুদ্ভবৈঃ।
ভবিষ্যামি সুরা ঃ শাকৈরাবৃষ্টে ঃ প্রাণধারকৈঃ।
শাকম্ভরীতি বিখ্যাতিং তদাযাস্যাম্যহং ভুবি।

শাক্তসাহিত্য, শশিভূষণ দাশগুপ্ত, পৃ. ২৫; Indo Aryan Races : R.P. Chanda, p. 131; Mohenjodaro & the Indus Civillization, J. Marshall Vol I. p. 52

১৫. বঙ্গভূমিকা, পৃ. ১৪৫-৪৬

১৬. The mothers Vol.III, p, 2. Studies in Ancient Greek Society, p. 41-42

১৭. লোকায়তদর্শন-ধৃত অনুবাদ ;

১৮. লোকায়তদর্শন পৃ. ৩৩৪-৪০ ৩৭৯-৪১৫ ; বৃহৎতন্ত্রসার; Iconography of Hindu India, V. Gopinath Roa;

১৯. Golden Bough, p. 138
২০. History of Indian Philosophy, India Govt. Publication p. 81, 451-52
২১. Philosophy of Upanisads and Ancient Indian Metaphysics, p. 8
২২. Philosophy of India (লোকায়তদর্শনে উদ্ধৃত ; পৃ. ৫১৩-১৪)
২৩. বৌদ্ধধর্ম, পৃ. ৩৭।
২৪. রচনাবলী, ২য় খণ্ড, পৃ. ২৭৪-৮৩।
২৫. The Obscure Religious Cults as Background of Bengali lierature, p. 27.
২৬. শাক্তসাহিত্য পৃ. ১২-১৩।
২৭. লোকায়তদর্শন, পৃ. ৫৩৯, ৪৫০।
২৮. বিষ্ণু পুরাণ, ছান্দোগ্য ও মৈত্রেয়ী উপনিষৎ।
২৯-৩৫. প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যদর্শনের ইতিহাস, ১ম খণ্ড, ১ম সং: পৃ. ১৩, ৭, ৯, ১০, ৯।
৩৬. তদেব, পৃ. ১৭।
৩৭. বৃহদারণ্যক ১/৪/১০।
৩৮. ভারতীয় দর্শনের ভূমিকা, ডক্টর সুরেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত, পৃ. ১৭।
৩৯. প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য দর্শনের ইতিহাস, ১ম খণ্ড, পৃ. ৩৮।
৪০. শ্বেতাশ্বরতর ২/৬/৭।
৪১. তদের ২/১৫।
৪২. কঠ ৬/৩।
৪৩. পুরাণপ্রসঙ্গ, বিনায়ক সান্যাল, বাঙালীর ধর্ম ও দর্শন চিন্তা, ডক্টর অসিত বন্দ্যোপাধ্যায় সম্পাদিত পৃ. ৮৩.।
৪৪. Encyclopaedia of Religion and Ethics : Puranas.
৪৫. প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য দর্শনের ইতিহাস, ১ম খণ্ড, পৃ. ১২৭
৪৬. History of Indian Literature : Winteriz p. 545
৪৭. প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যদর্শরে ইতিহাস, পৃ. ১৩২।
৪৮. তদেব [পাদটীকা] পৃ. ১০৭
৪৯. ঐ পৃ. ৭৮-৮০।
৫০. ঐ পৃ. ৮৬।
৫১. ঐ পৃ. ৮৮-৮৯।
৫২. ঐ পৃ. ১৪৫-১৪৬।
৫৩. ঐ পৃ. ১৪৮।
৫৪. History of Indian Philosophy, S. N. Dasgupta, Vol III. p. 533.
৫৫. Journal of the Asiatic Society of Bengal (Science) Vol. XIX 1953, [লোকায়তদর্শনে উদ্ধৃত, পৃ. ১১৭-১৮[; Lokayata—Haraprashad Sastri, p. 6.
৫৬-৫৭. The Holi—A Vernal Festival of The Hindus in Folklore XXV. [লোকায়তদর্শনে উদ্ধৃত, পৃ. ৪৪৮-৯]

মধ্যযুগের বাঙলা সাহিত্যে চিন্তা-চেতনার বিবর্তনধারা

১. একেশ্বরবাদ ও ইসলামের প্রভাব

হেজ্জাজ সেনানায়ক মুহম্মদ বিন কাসিমের আকস্মিক আক্রমণে এবং অভাবিত সাফল্যে (৭১১ খ্রীঃ) বিস্মিত বিচলিত সিন্ধুবাসীরা দেখল এক নতুন গোষ্ঠীর শক্তিধর মানুষ, যারা কোন মর্ত্যমানবের কাছে মাথা নত করে না, যারা কেবল স্রষ্টা উপাস্যের কাছে সমর্পণ করেছে তাদের দেহ-মন-আত্মা। তাদের ভাব-চিন্তা, কর্ম-আচরণ, তাদের সব পার্থিব দায়িত্ব-কর্তব্য ও বাসনা আল্লাহর অদৃশ্য অশ্রুত অভিপ্রায় ক্রমেই চলে বলে তাদের ধারণা। এ জন্যেই তারা উন্নতশির, অকুতোভয়, অঙ্গীকারে অনড়, সঙ্কল্পে অটল। ভয় এবং পরাজয় কাকে বলে তারা জানে না। এককথায় তাদের জীবন-মরণ, কর্ম-আচরণ সবই ওই অমোঘ বিশ্বাস চালিত। তারা সত্য সত্যই বিশ্বাস করে তাদের ব্যক্তিজীবনে আল্লাহর অদৃশ্য ইচ্ছাই সর্বত্র ও সর্বক্ষণ রূপায়িত হচ্ছে। কাজেই তাদের 'জীবন-মৃত্যু পায়ের ভৃত্য চিত্ত ভাবনাহীন'। কেননা রাখে আল্লাহ মারে কে, এবং মারে আল্লাহ রাখে কে,—এ প্রত্যয়ে তাদের মন-মনন পুষ্ট। এ হচ্ছে প্রমূর্ত ঈমান। সেদিনকার কেরল মালাবারের আরব সৈনিক-শাসক-সদাগরদের দেখে ওই এলাকার লোকের মনে হয়তো এ ধারণাই দানা-বেঁধে ছিল যে বিজেতাদের শক্তির উৎস ওই একক উপাস্যই। বহু দেবতার পূজারীরা তাই ওদের কাছে পরাভূত। বিজয়ী ও বীর্যবান ইংরেজদের দেখে বহু শতাব্দী পরে হয়তো এমনিভাবেই রামমোহনের মনেও জেগেছিল একেশ্বরবাদের প্রতি আকর্ষণ, তিনিও উপলব্ধি করেছিলেন একক উপাস্যের মহিমা। সেদিনকার শুধু গণমানব নয়, শাহ-সামন্ত আর ধনী-মানী-বেণেও ইসলামী সাম্যে-ভ্রাতৃত্বে ও মুসলিমের বলবীর্যে এবং চরিত্র-শক্তিতে আকৃষ্ট হয়ে ইসলাম বরণ করে।

কেরল-মালাবারের শঙ্করও (৭৮৮-৮২০ খ্রীঃ) ইসলামের ঋজুবাণীতে ও মুসলিম মনস্বিতায় মুগ্ধ হয়েছিলেন, কিন্তু তিনি আর দশজনের মতো ইসলামে দীক্ষা নিয়ে স্বস্তি ও আত্মোন্নতি কামনা করেন নি। তিনি অবক্ষয়ক্লিষ্ট গোটা জাতির জন্যেই কামনা করেছিলেন ইসলামী আদলের জগৎ-চেতনা ও জীবন-জিজ্ঞাসা, যাতে আচার-বিচারের নিগড়বদ্ধ বন্ধ্যা জীবনে সঞ্চারিত হয় নব উদ্যম, জাগে গতির জোয়ার।

তিনি স্বশাস্ত্র ঘেঁটে উপনিষৎ থেকে বের করলেন একক উপাস্য বা স্রষ্টা তত্ত্ব। এক পরব্রহ্মই সত্য, আর সব মায়া এবং সেকারণে জগৎও মিথ্যা, কেবল ব্রহ্মই সত্য, একমেবাদ্বিতীয়ম-এর মানে অদ্বৈতবাদ। অর্থাৎ সৃষ্টি ও স্রষ্টা মূলে অভিন্ন সত্তা। ব্রহ্মাণ্ডের সব কিছুতে বিচিত্রভাবে ব্রহ্ম স্বতঃ প্রকাশে সুপ্রকট। সব কিছু ব্রহ্ম থেকে উৎপন্ন এবং ব্রহ্মতেই বিলীন হয়। এ এক লীলা বা মায়া মাত্র। তিনি কেবল সৎ, চিৎ এবং আনন্দ স্বরূপ। মুসলিমরা সাধারণ অর্থে অদ্বৈতবাদী হলেও এর তাৎপর্য ভিন্ন। আল্লাহর সত্তা আর সৃষ্ট জগতের সত্তা দুই ভিন্ন। আল্লাহ 'স্বয়ম্ভূ' এবং অতুল্য অপ্রতিদ্বন্দ্বী আর সৃষ্ট জগৎ তাঁর অভিপ্রায় জাত—'কুন ফায়াকুন' 'হৌক' অমনি 'হল'। আর ব্রহ্ম বলেন "একোহম বহু সাম্য'—আমি একা, আমি বহুতে বিচিত্র হব। আল্লাহ তাঁর শক্তি ও মহিমা প্রকাশ করেন, ব্রহ্ম আপনাকে বিচিত্রভাবে আস্বাদন করেন। আমরা আগে একবার জৈন-বৌদ্ধ শাস্ত্র, সমাজ ও মনন দ্রোহ বা ভাববিপ্লব দেখেছি। জিন মহাবীরও গৌতম বুদ্ধের নেতৃত্বে দুঃস্থ বঞ্চিত অস্পৃশ্য গণমানব সেদিন দেবদ্বিজবেদ ধর্ম ত্যাগ করে মুক্তির ও মনুষ্যত্বের স্বাদ গ্রহণ করেছিল। নতুন স্বাধিকার চেতনা নিয়ে, নতুন জীবন তত্ত্ব অঙ্গীকার করে, পুরোনো শাস্ত্র-সমাজ সংস্কৃতি, নিয়ম-নীতি-রীতি বর্জন করে, নতুন শাস্ত্র, সমাজ ও সংস্কৃতি গড়ে তুলল বৌদ্ধরা ও জৈনরা। সে মহাবিপ্লবের বারো-

তেরো শত বছর পরে আচার্য শঙ্করের 'অদ্বৈতবাদ' আবার সারা ভারতে মহাভাববিপ্লব বা শাস্ত্রদ্রোহরূপে দেখা দিল। এবার নিরাকার ব্রহ্মবাদ বা ঈশ্বরবাদই স্বীকৃতি পেল—পৌত্তলিকতা, দেবপূজা, মন্দির-উপাসনা হল বর্জিত।

শঙ্করকে একেশ্বরবাদী বা অদ্বৈত ব্রহ্মবাদী ও জ্ঞানমার্গী বলা হয়। তার কারণ তাত্ত্বিক তাৎপর্যে তিনি ব্রহ্ম ছাড়া আর কারো বা আর কিছুর অস্তিত্ব স্বীকার করেননি, তাঁর মতে পরিদৃশ্যমান সবকিছু মায়া প্রপঞ্চ মাত্র—বাস্তব সত্তাবিহীন; কেবল অবিদ্যাজাত ভ্রম বলেই মানুষ সত্য বলে মানে। প্রজ্ঞাদৃষ্টিতে এ মায়া প্রপঞ্চ ধরা পড়ে—এ জন্যে তাঁর মতকে মায়াবাদ বলে। আবার তাঁর মতে জ্ঞান বা প্রজ্ঞা প্রয়োগে সত্য-মিথ্যা, শ্রেয়-অশ্রেয় নিরূপণ করায় অকল্যাণ এড়িয়ে চলায় সমর্থ হলেই মোক্ষ বা জীবনমুক্তি ঘটে। এজন্যে তাঁকে জ্ঞানমার্গী বলে অভিহিত করা হয়। তাঁর মতে মোক্ষপ্রাপ্তির জন্যে "কোন প্রকার যাগযজ্ঞ, সন্ধ্যা-বন্দনাদি নিত্যকর্ম, গ্রহণ প্রভৃতিতে স্নান, দান প্রভৃতি নৈমিত্তিক কর্ম, কিংবা নানা পূজা-অর্চনাদি কার্য-কর্ম করিবার প্রয়োজন নাই। যাঁহারা বেদবিধি নিষেধাদি মানিয়া চলিবেন তাঁহারা তত্ত্বজ্ঞানের অধিকারী নন।"[১] এককথায় তিনি সর্ব প্রকার ব্রাহ্মণ্য আচার ও পূজা-পার্বণ বিরোধী হলেন। তাঁর আনুষ্ঠানিক ধর্মের অস্বীকৃতি সমকালীন শাস্ত্রের প্রভাবমুক্তির সাক্ষ্য। শঙ্করের মায়াবাদ ভাববাদী বৈরাগ্যপ্রবণ-দ্রাবিড় মানস প্রসূত। তবু যেহেতু তাঁর মতবাদের ভিত্তি উপনিষদ, এবং তিনি গীতার, ব্রহ্মসূত্রের ও উপনিষদের ভাষ্যকার আর মায়াবাদে ও বৈরাগ্যে তিনি গুরুত্ব আরোপ করে বৌদ্ধদের তাঁর স্বমতে আকৃষ্ট ও দীক্ষিত করেছিলেন, সেহেতু তিনি পৌত্তলিকতা বিরোধী হয়েও কার্যত বৌদ্ধ বিলুপ্তিতে ব্রাহ্মণ্য সমাজের প্রসার ঘটিয়েছিলেন। এজন্যে কৃতজ্ঞ ব্রাহ্মণ্যবাদীরা এ তার্কিক মহাপণ্ডিতকে স্বজন-স্বধর্মী বলেই জানত ও মানত। কাজেই তত্ত্বহিসেবে ব্রাহ্মণ্যবাদীরা তাঁর মত নির্দ্বিধায় মেনে নিল, ফলে মন্দিরের কাছে-পাশে আপোসে মঠ উঠল মাত্র।

আগেই বলেছি, সে যুগে নতুন চিন্তা-চেতনার উন্মেষের জন্যে বিদেশী-বিজাতি-বিধর্মীর সঙ্গে নিবিড় পরিচয় আবশ্যিক ছিল। সে পরিচয় সাধারণত ঘটত বিজিত-বিজেতা হিসেবে, ক্বচিৎ কখনো স্ব স্ব শাস্ত্র প্রচারের মাধ্যমে। কাজেই ইসলামের সঙ্গে পরিচয়-মুহূর্তে নতুন জীবনাচারের ও জীবনদর্শনের অভিঘাতে ভারতীয়দের নিস্তরঙ্গ মনে, মননে যে-প্রবল তরঙ্গ তুলল, তাই নিরাকার ঈশ্বরতত্ত্বের জন্ম দিল। আসলে শঙ্করের মতবাদ একটি নতুন সন্তধর্মের উদ্ভব ঘটাল। আগেও অদ্বৈততত্ত্ব উপনিষদে ছিল বটে, কিন্তু পৌত্তলিক সমাজে, দেবতাকীর্ণ মন্দিরে এ তত্ত্ব কারুর উপলব্ধির মধ্যে ছিল না। স্বল্পজীবী তরুণ শঙ্কর মাত্র বত্রিশ বছর আয়ুর মধ্যেই কোন ঐশ্বরিক অভিজ্ঞানের বা অবতারত্বের দাবীতে নয়, কেবল বিদা-বুদ্ধি-জ্ঞান-প্রজ্ঞা-যুক্তি প্রয়োগে এবং অসামান্য ব্যক্তিত্ব বলে গোটা ভারতের সমকালীন মনীষীদের স্বমতের সমর্থক ও অনুগত করতে পেরেছিলেন। তাঁর নতুন মতের প্রভাবে প্রায় দেড়হাজার বছরের পুরোনো গণধর্ম জৈন-বৌদ্ধ ধর্মের ও সমাজের বিলুপ্তি ত্বরান্বিত হল।

এখানেই শেষ নয়, তাঁর মায়াবাদ ও জ্ঞানবাদ তেমন জনপ্রিয় না হলেও তাঁর অদ্বৈততত্ত্ব ক্রমে ভক্তিবাদের বাহন হয়ে পরবর্তী প্রায় হাজার বছর ধরে গোটা ভারতে কখনো আঞ্চলিকভাবে কখনো বা গোষ্ঠী ও সম্প্রদায়গতভাবে শাস্ত্রদ্রোহের মাধ্যমে সমাজ ও সংস্কৃতিক্ষেত্রে বিপ্লব ঘটিয়েছে এবং সে-সব ভাব-বিপ্লবে মানুষ ও মনুষ্যত্বই মুখ্য বিবেচ্য বিষয় ছিল বলে রক্তপাত হয়নি কোথাও—এ যুগের ভাষায় বলা চলে, সবটাই ছিল একাধারে সৃষ্টি ও স্রষ্টাপ্রেম জাগানোর শ্বেতবিপ্লব, প্রেম দেয়া-নেয়ার, প্রীতি বিলানোর বিপ্লব। বাঙলাদেশে এ

প্রীতি-সেবা দানের শেষ প্রচারক-প্রবক্তা ছিলেন উনিশ শতকের গদাধর চট্টোপাধ্যায় ওর্ফে রামকৃষ্ণ পরমহংস (১৮৩৫-৮৬ খ্রী:)।

শঙ্করাচার্যের ব্যাখ্যাত বেদান্তদর্শন সবাই স্বীকার করলেও বরণ করেনি। কিন্তু কেবল তাঁর এ অদ্বৈতবাদের, মায়াবাদের কিংবা জ্ঞানবাদের প্রভাবেই ব্রাহ্মণ্যসমাজে ক্রমে ক্রমে সন্ন্যাস বা বৈরাগ্য পন্থা জনপ্রিয় হয়ে ওঠে। পূর্বতন জৈন-বৌদ্ধ সংস্কারের প্রভাবে কাপালিক-লোকায়তিক- যোগী-শ্রমণ-ভিক্ষুর চর্যার আদলে গড়ে ওঠে বিভিন্ন মত-পথের ও চর্যার সন্ত-সন্ন্যাসী-যোগী-ব্রহ্মচারী-বৈরাগী-বিবাগী-সাঁই সাধক সম্প্রদায়।

উপনিষদের শঙ্করভাষ্যের ভিত্তিতে এ প্রভাবে গড়ে ওঠে নয়-দশ শতকে ভাস্করের ভেদাভেদবাদ, বারো শতকে রামানুজের বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ, বারো-তেরো শতকে নিম্বার্কের দ্বৈতাদ্বৈতবাদ, তেরো শতকে মধ্বের বা মাধবের দ্বৈতবাদ, ষোল শতকে বল্লভের শুদ্ধাদ্বৈতবাদ এবং চৈতন্যের অচিন্ত্যদ্বৈতাদ্বৈতবাদ। এবং বলাবাহুল্য এসব মতের বীজ উপ্ত হয় ইসলামেরই প্রত্যক্ষ প্রভাবে এবং বিকাশ হয় ইসলামের প্রভাব ও প্রসার প্রতিরোধের অবচেতন প্রেরণায়। উল্লেখ্য যে শঙ্কর, ভাস্কর, রামানুজ, নিম্বার্ক, মধ্ব ছিলেন দাক্ষিণাত্যের দ্রাবিড় ও ব্রাহ্মণ পণ্ডিত। বল্লভ আর চৈতন্যও ছিলেন ব্রাহ্মণ পণ্ডিত এবং যথাক্রমে মিথিলার ও বাঙলার লোক। এঁরাও হয় দ্রাবিড়, নয়তো অস্ট্রিক, অথবা রক্ত-সঙ্কর, যদিও চৈতন্যদের আর্যদের মতো গৌর বর্ণের অসামান্য সুন্দর-সুপুরুষ ছিলেন। বিন্ধ্যপর্বত সীমারেখার দক্ষিণের লোক বলেই অর্থাৎ দ্রাবিড়-ভেড়্ডিড-অস্ট্রিক বলেই এঁরা ভাবপ্রবণ ও ভক্তিবাদী। লক্ষণীয় যে ভক্তিবাদের প্রসার ঘটেছে নিম্নবিত্তের ও নিম্নবর্ণের অস্পৃশ্য অনার্যদের মধ্যেই বেশী। 'ভক্তি দ্রাবিড় উপজি/লায়ে রামানন্দ/প্রকট কিয়ে কবীরণে'।

দাক্ষিণাত্যের সুপ্রাচীন গাইয়ে বাজিয়ে ভক্তিবাদী আলোয়ার সম্প্রদায়ের 'কৃষ্ণনাপ্পিনাই' প্রণয়গীতিও এ প্রসঙ্গে স্মর্তব্য। উত্তর ভারতের ভক্তিবাদী সন্তরা ছিলেন মুদী, মুচী, মালী, সুতার, কুমার, নাপিত, মেথর বা ঝাড়ুদার শ্রেণীর লোক। যেমন কবীর ছিলেন তাঁতীর ছেলে, রবিদাস মুচি, সেন ছিলেন নাপিত, তুকারাম শূদ্র, ধর্মদাস মুদী, বর্ণহিন্দু হলেও নামদেব ও নানক ছিলেন দরিদ্র দর্জির ও রঙরেজের সন্তান।[২] দাদু ধুনকর, সুন্দর দাস বেণে, বিমান চাষী, তিরুবল্লভ ছিলেস পারিয়া। রামানন্দ, একনাথ, রজবও ছিলেন না মানীঘরের সন্তান। কাজেই ভক্তিবাদের ধারক, বাহক ও প্রচারকদের মধ্যে দক্ষিণে ব্রাহ্মণ এবং উত্তরে অস্পৃশ্য-শূদ্রই প্রধান, তবু তাত্ত্বিক ও লক্ষ্যগত আদর্শের দিক দিয়ে এঁদের মত-পথ-প্রয়াসকে অভিন্ন মূল রশুনের সঙ্গে তুলনা করা চলে।

নয় শতকের গোড়া থেকেই শঙ্করের মতবাদের প্রভাব বাঙলাদেশেও ছড়িয়ে পড়ে। ক্রমে অদ্বৈতবাদ ও ভক্তিবাদ বাঙলাদেশেও জনপ্রিয় এবং চৈতন্যমতবাদে তা অচিন্ত্যদ্বৈত-অদ্বৈতবাদ রূপে এবং ভক্তির প্রেমে উত্তরণে পরিণতি ঘটে এই বাঙলাদেশেই। তাই শঙ্করদর্শন ও অন্যান্য সন্ত-দার্শনিকদের আলোচনা মধ্যযুগের বাঙলা সম্বন্ধে প্রাসঙ্গিক।

এ সূত্রে স্মরণীয় যে বাঙলাদেশ প্রত্যন্ত অঞ্চল হওয়ায় এখানে উত্তরভারতীয় আর্য প্রয়োজনীয় সংখ্যায় এবং তাদের শাস্ত্র, সমাজ ও সংস্কৃতি প্রত্যাশিত মাত্রায় কখনো মেলেনি। প্রথমে জৈন ধর্ম পরে মৌর্যযুগে বৌদ্ধ ধর্ম রাঢ়ে পুণ্ড্রে প্রচারিত হয়। গুপ্তশাসন কালেই সম্ভবত এখানে এ পাণ্ডববর্জিত তথা ব্রাহ্মণ্য ধর্ম ও আর্যবর্জিত অঞ্চলে নিতান্ত প্রয়োজনে কিছু উত্তর ভারতীয় (বারাণসীর ত্রিবেণীর তীরবর্তী অঞ্চলের) শাসক-সৈনিক ক্ষত্রিয় ও যজন-যাজনের জন্যে কিছু ব্রাহ্মণ আর আনুষঙ্গিক উপসর্গ হিসাবে কিছু বেণে এসেছিলেন। তাতে তেমন একটা

ব্রাহ্মণ্য শাস্ত্রিক সামাজিক, আচারিক ও সাংস্কৃতিক পরিবেশ গড়ে ওঠা সেকালে সম্ভব হয়েছিল বলে মনে হয় না। পরবর্তীকালের আদিশূরী কিংবদন্তীতে কিংবা বল্লালী প্রয়াসে আমাদের এ অনুমানের সাক্ষ্য-সমর্থন মেলে। তাছাড়া গুপ্তরা নাকি বৈষ্ণব ছিলেন, তাঁরা কেবল বিষ্ণু মন্দির প্রতিষ্ঠায় ও বিষ্ণু পূজার প্রসারে ছিলেন আগ্রহী।

পাল আমলের গোড়ার দিকে বৌদ্ধ ধর্মই বাঙলার গণধর্ম ও গণমানবের ধর্ম ছিল বটে, কিন্তু শেষ দুশ বছরের দুর্বল রাজাদের কালে রাজশক্তি ব্রাহ্মণ্য মণীষা-নির্ভর হয়ে পড়ে। সে সুযোগে ব্রাহ্মণ্য শাস্ত্র-সংস্কৃতি হয় প্রবল আর সে-মতের প্রভাবে বৌদ্ধ চৈত্যে দেব দেবীর সংখ্যা বাড়তে থাকে।[৩] এবং ব্রাহ্মণ্য ধর্ম শঙ্কর-মত পুষ্ট হয়ে নতুন করে বহু সম্প্রদায়ে ও উপশাখায় বিভক্ত বৌদ্ধদের আকৃষ্ট করে, ফলে বৌদ্ধধর্ম রাজধর্ম ও গণধর্ম হওয়া সত্ত্বেও মতগত ভিন্নতার ও বিচ্ছিন্নতার দরুন দুর্বল হওয়ায় ব্রাহ্মণ্য ধর্মের প্রসার প্রতিরোধ করতে পারেনি একক নেতৃত্বে বা সঙ্ঘবদ্ধভাবে। এভাবে নয় শতকের মধ্যকাল থেকে এগারো শতকের মধ্য ভাগেই বৌদ্ধ সম্প্রদায়গুলো প্রায় বিলুপ্তির মুখে এসে দাঁড়াল। সেনরাজত্বে রাজকীয় উদ্যোগে আক্ষরিকভাবে ব্রাহ্মণ্যবাদের আচারিক ও আনুষ্ঠানিক প্রতিষ্ঠার ফলে প্রকাশ্যে কোন সম্প্রদায়েরই বৌদ্ধমতবাদ রক্ষা করা সম্ভব হয়নি।[৪]

এবার আমরা আমাদের মতের ও মন্তব্যের যৌক্তিকতার কিছু সাক্ষ্য ও সমর্থন যোগাড় করে দিচ্ছি।

ক. বিনয় ঘোষ বলেন, "বুদ্ধ আর যিশুর মর্মবাণী আত্মসাৎ করে মহম্মদ 'ইসলামের বাণী' নতুন করে শোনালেন মানুষকে। তাই বিশ্বমানব আবার নতুন করে ইসলামের আহ্বানে সাড়া দিল। নীতিভ্রষ্ট ভারতের নিস্তেজ মানুষও যে সাড়া দেবে, তাতে আর বিস্ময়ের কি আছে? দক্ষিণ ভারত ইসলামের আহ্বানে সাড়া দিয়েছিল, ইসলামের বাণী ইসলামের আদর্শ সমুদ্র পথে প্রথম পৌছল দক্ষিণ ভারতে। তাই বোধ হয়, অষ্টম শতাব্দীর পর থেকেই ভারতের সংস্কৃতির ইতিহাসে এক যুগান্তকারী পরিবর্তনের সূচনা হয়। দক্ষিণাভারত নতুন যুগের ভারত-সংস্কৃতির পথপ্রদর্শক হয়ে ইতিহাসের রঙ্গমঞ্চে অবতীর্ণ হয়েছে। ... অষ্টম শতাব্দীর পর থেকেই ধর্মসমন্বয় ও সংস্কৃতি সমন্বয়ের নতুন ধারার প্রবর্তক হল দক্ষিণভারত-দাক্ষিণাত্য। শঙ্করাচার্য, রামানুজ, বল্লভাচার্য, নিম্বাদিত্য সকলেই দক্ষিণভারতের। একেশ্বরবাদ ভক্তিবাদ বৈষ্ণব ধর্ম ও শৈব ধর্মের জন্ম হল দ্রাবিড়দেশে, নবীন ইসলাম ধর্মের সঙ্গে নব্য হিন্দু ধর্মের ঘাতপ্রতিঘাতের ফলেই দক্ষিণভারতের এই নতুন ধর্মসমন্বয় ও সংস্কৃতিসমন্বয়ের ধারা প্রবাহিত হয়েছে। ভারতের সংস্কৃতি সমন্বয়ের ইতিহাসে দক্ষিণভারত পুরোভাগে এসে দাঁড়িয়েছে। ... দক্ষিণভারতের দু'একজন রাজা পর্যন্ত যে ইসলাম ধর্মে দীক্ষা নিয়েছিলেন তা থেকেই বোঝা যায়, ইসলাম তখন হিন্দু সমাজের ওপর বেশ প্রভাব বিস্তার করেছে। ....ইসলামের এক দেবতা ও এক ধর্মের বিপুল বন্যার মুখে দাঁড়িয়ে শঙ্কর আপসহীন অদ্বৈতবাদ প্রচার করেছেন। শঙ্করাচার্যের আপসহীন অদ্বৈতবাদ মনে হয় যেন নবীন আরবী ইসলামের একেশ্বরবাদের ভারতীয় রূপ। বেদ উপনিষদ তার উৎস হলেও ইসলামের প্রভাবেই যে সেই উৎস সন্ধানের প্রেরণা এসেছে এবং সেই অদ্বৈতবাদের পুনরুজ্জীবন সম্ভবপর হয়েছে তা স্বীকার না করে উপায় নেই। শঙ্করাচার্যের পরে রামানুজ, বিষ্ণুস্বামী, মাধবাচার্য ও নিম্বার্কের দর্শনের সঙ্গে ইসলামের সম্পর্ক আরো ঘনিষ্ঠ হয়েছে দেখা যায়। ...ইসলাম ধর্মের প্রভাব বিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে শঙ্করাচার্যের কেবলাদ্বৈতবাদ থেকে রামানুজের বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ ও নিম্বার্কের দ্বৈতাদ্বৈতবাদের প্রগতির ধারা বিশেষভাবে লক্ষ্য করার বিষয়। ...ইসলামের আত্মনিবেদন, ইসলামের প্রেম,

ইসলামের সমানাধিকার ও সাম্যের বাণী, ইসলামের গণতন্ত্রের আদর্শ মুসলমান সাধকরা সহজ ভাষায় সোজাসুজি যখন এদেশে প্রচার করেছেন, রামানুজ নিম্বার্ক তখন শঙ্করের শুদ্ধ জ্ঞানের স্তর থেকে শ্রদ্ধা ভক্তি প্রীতির স্তরে নেমে এলেন।"[৫]

খ. তারাচাঁদ বলেন : The establishment of this (Sankar's) monotheistical tendency received a powerful impetus from the appearence of so uncompromisingly monotheistic a religion as Islam. Sankara was born at a time when Muslims were beginning this activities in India, and if tradition is correct, when they had gained a notable success in the extension of their faith by converting the king of the Land. He was born and brought up at a place where many ships from Arabia and Persian gulf, touched. If his extreme monoism, his stripping of the one of all semblances of duality, his attempt to establish this monoism of the authority of revealed scriptures, his desire to purge the cult of many abuses, had even a faint echo of the new noises that were abroad, it would not be a matter for great surprise or utter incredulity .... His successors Ramanuja, Visnuswami. Madhava and Nimbarka and the hymn-makers, in their speculations and religious tone, show closer parallalism. In the give and take of culture between Muslims and Indians it is difficult to assess accurately the share of the each .... But the fact remains that a number of elements were absorbed into Hinduism through its direct contact with Islam and these elements were presented to India impressed with the Islamic mould. (pp. 111-12) .... Ramanuja's prapatti and Guru-Bhakti—It is more likely however, that they come from Islam. Both were very prominent features of that (Islam) religion. The word 'Islam' means surrender and the Muslim is verily a prapanna' ..... Historically also there is no insuperable difficulty in supposing that Ramanuja adopted it from Islam. (p. 114). This sufi conception of deified teacher was incorporated in medieval Hinduism (p. 115)

গ. লিঙ্গায়েত 'বাদ সম্বন্ধেও তারাচাঁদ বলে, "It is difficult to resist the inference that Lingayetism was a result of the Influence which these Muslims exerted in these parts of India. No other hypothesis appears sufficient to explain the Rovolutionary character of its doctrines and Customs. The abandonment of such a deep-rooted Hindu idea as that of metempsychosis and of such customs as cremation and purificatory death ceremonial, the abolition of inequalities of caste and sex and the reform of marriage, the conceptions of the community of brave warriors led by their sanctified preceptor, and of god (allama) whose very name is probably of Muslim origin, point unmistakably to the source of inspiration, that is Islam (pp. 119-20)[৬]

ঘ. এ প্রসঙ্গে উমেশচন্দ্র ভট্টাচার্য বলেন, "আমরা এ সিদ্ধান্ত করতে পারি যে, মুসলমানদের ভারত আক্রমণের সঙ্গে সঙ্গে হিন্দুরা ইসলামের একেশ্বরবাদের সহিত কম বেশি পরিচিত হইতেছিল। ...একেশ্বরবাদ ভারতেও ছিল, উভয়ে মিলিয়া দশম-একাদশ শতাব্দীতে

একটা পরিপুষ্ট আকারে দেখা দেয়। ঋণ স্বীকার করা ভাল। ...যেমন করিয়াই হউক শঙ্করের দুই তিন শত বৎসর পরে বেদান্ত দর্শনের সাহিত্যে এই একেশ্বরবাদের প্রভাব স্পষ্ট পরিলক্ষিত হয়। ...তাদের (মুসলমানদের) একেশ্বরবাদের সংস্পর্শে আসিয়া ভারতের একেশ্বরবাদ বিশেষতঃ বৈষ্ণব একেশ্বরবাদ উদ্বুদ্ধ হইয়া উঠে নাই এমন কথা বলিতেও আমাদের সঙ্কোচ বোধ হইতেছে।[৭]

ঙ. সুকুমার সেনের ধারণা, "রাজসভাশ্রিত উচ্চতর সমাজে হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে সংস্কৃতির আপস কিছু হইয়াছিল। ইহার পিছনে দরবেশ-ফকীরদেরও প্রভাব ছিল এবং এই সূত্রে গৌড়ীয় বৈষ্ণবধর্মে সূফীভাবের কিছু ছাপ পড়িয়াছিল বলিয়া মনে হয়।[৮]

চ. ডক্টর সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় বলেন : One contact with the Muslim, that is to say the turks and the Persians has not been without any effect upon us, say from 1000 A.D. onwards. We have taken over from the Persians and the turks hundreds of new things in the material domain and profited considerably by them. In the domain of thought and ideas also we have been profoundly effected ..... In the sphere of religion, too, thee has been a very strong Influence of Islam : The Muslim insistence upon a Saguna Brahma without a form (Nirakara) ... —This kind of conception we find in all the Sant-Margi' saints and poets including Kabir and Nanak. Certain ideologies and practices from the sufi form of Islam also have become accepted into the medieval Vaishnav schools of India, including our Gaudiya Vaishnavism ... But Suffism in India certainly has had its own history and that I look upon it as an integral part of our won Indian cultral development. "..... Through Sufiism the character of Indian civilisation—Hindu civilisation, was very deeply modified, particulary in North India. In my article published long ago, 'Islamic Mysticsm, Iran and India' I mentioned that even in our Gaudiya Vaisnavism certain Sufi infiuences actually strengthened it.'

"সূফীমত হইতে মধ্যযুগের বৈষ্ণব ও সন্তবিচার কিছু জিনিস আত্মসাৎ করিয়াছে। .... গৌড়ীয় বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের গঠনে, বাঙলার বৈষ্ণব পদাবলী সাহিত্যে সূফী প্রভাব আছে।[৯]

এভাবে দক্ষিণভারতোদ্ভূত শাঙ্কর অদ্বৈতবাদের বিকাশে 'অদ্বৈত' তত্ত্ব যেমন নানা সূক্ষ্ম তাৎপর্য লাভ করেছে, তেমনি তাতে ভক্তিতত্ত্বও নানা বৈচিত্র্যে বিকশিত হয়েছে। কিন্তু সর্বাধিক এবং অশেষ গুরুত্বপূর্ণ তথ্য হচ্ছে এই যে আটশতক থেকে উনশ শতক অবধি (রামমোহন-রামকৃষ্ণ পরমহংসের কাল) বহিঃশক্তির সঙ্গে ঘনিষ্ঠ পরিচয়জাত অভিঘাতে শাস্ত্রিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক জীবনে যে বিচলন ঘটে বিপরীত শাস্ত্র-সমাজ-সংস্কৃতির মোকাবেলায়, তার ফলে দেশীলোকের শাস্ত্রীয় বিশ্বাসে, সামাজিক নিয়ম-নীতিতে, আচার-আচরণে এবং সাংস্কৃতিক রীতি-রেওয়াজে ভাঙন আসন্ন হয়ে ওঠে, অপ্রতিরোধ্য হয়ে ওঠে দ্রোহ ও পরিবর্তন। তখন ওই আসন্ন সমস্যার সমাধানে, শাস্ত্র-সমাজ-সংস্কৃতির স্বাতন্ত্র্য ও নিরাপত্তা রক্ষণে বারবার ভক্তি-বাহন ওই 'অদ্বৈততত্ত্ব'ই দোহাই ও উপায় হিসেবে ব্যবহৃত হয়েছে সর্বত্র। এমনকি ওই অদ্বৈততত্ত্ব ইসলামী একেশ্বরবাদের প্রভাবে সৃষ্টি-স্রষ্টার দ্বৈত-তত্ত্বও হয়েছিল স্বীকৃত—দ্বৈতাদ্বৈতবাদ, বিশিষ্ট বা অচিন্ত্য দ্বৈতাদ্বৈতবাদ তারই ফল।

বলেছি, আটশতকের দক্ষিণ-পশ্চিম ভারতের মালবারে বিজেতা ও ব্যবসায়ী হিসেবে যারা প্রবেশ করেছিল, তারা ছিল আল্লাহর অদৃশ্য অভিপ্রায়ে সমর্পিতচিত্ত, নিজেদের জীবনে সুখে-দুখে-বিপদে-সম্পদে আল্লাহর ইচ্ছা রূপায়ণই তারা অনুভব করত প্রতি মুহূর্তে—এমনি ছিল তাদের ঈমানের জোর। শঙ্করাচার্য কিংবা কেরল-মালাবার বন্দরের সেদিনকার মানুষ মুসলিমদেরকে কথায়-কর্মে-আচরণে এই রূপ দেখেই মুসলিম জীবনে ইসলামের শিক্ষা, সাম্য ও মানবিকরূপ প্রত্যক্ষ করেছিল, করেছিল অনুভব ও উপলব্ধি। আর আফগানিস্তান অবধি বিস্তৃত মধ্য-এশিয়ার নানা গোত্র-গোষ্ঠীর যে-সব তুর্কী দশ শতকের শেষ পাদ থেকে সবুক্তগীনের (৯৭৭-৯৭) সঙ্গে ভারতে প্রবেশ করে, তাঁর পুত্র সুলতান মাহমুদের (৯৯৭-১০৩০ খ্রী") হয়ে যারা বার বার ভারতে প্রবেশ করে ও পাঞ্জাবে প্রশাসন চালায়, অথবা আরো পরে মুহম্মদ ঘোরীর (১১৯১-৯২) দিল্লী দখলকালে মধ্য-এশিয়ার যাঁরা ভারতবর্ষে এল সৈনিক-শাসক-সদাগর কিংবা ক্রীতদাস ও ভাগ্যান্বেষী হিসেবে, তাঁদের মধ্যে আট শতকের ওই মুসলিমের মতো ঈমানের জোর ছিল না, ছিল না আল্লাহর আদেশ-নিষেধের সঙ্গে স্ব-সত্তার অভিন্নতা ও অবিচ্ছিন্নতা বোধ। তারা ছিল আশৈশবের সংস্কার-চালিত অতি সাধারণ দোষ-গুণের নিরক্ষর দরিদ্র মানুষ। কিন্তু সুপ্রাচীন প্যাগান ও বৌদ্ধ ঐতিহ্য ছিল বলেই ইসলামী সামাজিক সাম্য তাদের মধ্যে ছিল আক্ষরিকভাবে চালু। ব্যক্তি মানুষের মূল্যে-মর্যাদায় তারা ছিল গভীরভাবে আস্থাবান। তাই তারা যে-কোন মানুষের গুণ-মান-মাহাত্ম্য স্বীকারে ছিল উদার ও উচ্চকণ্ঠ। এ সূত্রে এ-ও উল্লেখ্য যে ক্রীতদাস বলতে 'আঙ্কল টমস ক্যাবিন' বর্ণিত দাসদের ছবি স্মরণ করা যাবে না এ ক্ষেত্রে। দাসদের বলা হত 'মামলুক' দিন মজুরীর পরিবর্তে এদের এককালীন টাকা দিয়ে বাজার থেকে কেনা হত পরিবারের পশু পালনের ও কৃষিকর্মের সহায়ক শ্রমিক হিসেবে। এসব মামলুক ছিল অনেকটা একালের ভারতের চাকুরে শিক্ষার্থী গৃহশিক্ষকের মতোই। ক্রীত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই হত প্রায় সব ব্যাপারে পরিবারের সদস্য। কাজেই এরা ঘৃণ্য বা নিপীড়িত ছিল না। এ ক্ষেত্রে সাধারণ গৃহস্থ ঘরে ও শাহ-সামন্তের প্রাসাদে কোন পার্থক্য ছিল না। প্রমাণ, যাঁদের দিয়ে উত্তরভারতে তুর্কী শাসন চালু হল, তাঁরাই। যেমন গজনীর ক্রীতদাস–রাজা আলপ্তগীনের জামাতা ক্রীতদাস-রাজা সবুক্তগীন, তাঁর পুত্র সুলতান মাহমুদ, ঘোরের ক্রীতদাস রাজা মুহম্মদ ঘোরী, তাঁর ক্রীতদাস দিল্লীর বাদশাহ কুতুবউদ্দীন আইবক, তারপর একের পর এক ক্রীতদাস ও তাঁদের বংশধর বসতে থাকেন দিল্লীর সিংহাসনে। ইতিহাসেও তাই এঁদের আমলকে 'দাস বংশীয় রাজত্বকাল' বলে অভিহিত করা হয়। তা হলে সাধারণ তুর্কী পরিবারেও ছিল এমনি প্রথা। আজ ক্রীতদাস, কাল জামাতা, পরের দিন গৃহস্থ বা গৃহপতি, পেশায়ও সৈনিক-সেনানী-সদাগর-প্রশাসক-শাসনকর্তা-বাদশা-সুলতান। কাজেই হরহামেশাই জন্মসূত্রে নয়, কর্মসূত্রেই হচ্ছিল তুর্কী-মুসলিমের জীবন নিয়ন্ত্রিত। গৃহস্থের সন্তান গরীব হয়ে আত্মবিক্রয় করছে—ক্রীতদাস হচ্ছে, এমন ঘটনাও ঘটছে অহরহ—খরা-বন্যার বিপর্যয়ে-দুর্ভিক্ষকালে কিংবা যুদ্ধে-লুণ্ঠনে বিধ্বস্ত এলাকায় এবং পলাতক জীবনে।

সুলতান মাহমুদ অধিকৃত পাঞ্জাবে ষাট বছর আগেই নিম্নবর্ণের ও নিম্নবিত্তের মানুষ শাহিয়াবংশীয় রাজত্বের অবসানে ইসলামী সাম্যে আর ব্যক্তিজীবনের সম্মানে ও স্বাধীনতায় আকৃষ্ট হয়ে সর্বোপরি জ্ঞান-বুদ্ধি-রুচি-শক্তি-কৌশল অনুযায়ী জীবিকা-নির্বাচনের অবাধ অধিকার প্রাপ্তিলোভে দলে দলে ইসলাম বরণ করতে থাকে। বহু বহু কাল ইরানী-গ্রীক-হূন-কুষাণ শাসনে থাকার ফলে এখানে মানুষের ব্রাহ্মণ্য শাস্ত্রে বিশ্বাস এবং সমাজবন্ধনও ছিল শিথিল। তাই মদিনা থেকে মূলতান অবধি ইসলামের প্রসার ছিল অপ্রতিরোধ্য। কিন্তু তুর্কীদের

দিল্লীরাজ্য দখলের পরে ইসলামের প্রচার ও প্রসার আর সহজ রইল না। সুসভ্য ব্রাহ্মণ্যবাদীদের সুপ্রাচীন ও সুবিকশিত শাস্ত্র, দর্শন, সমাজ ও বাঞ্ছিত সংস্কৃতি রয়েছে। কাজেই তারা শাসকগোষ্ঠীর নতুন ধর্ম-সংস্কৃতির মোকাবেলায় রইল অটল। যেন 'কেহ কারে নাহি জিনে সমানে সমান'। তবে নিম্নবর্ণের নিঃস্ব অস্পৃশ্য মানুষ শাসক-সমাজে চালু সুবিধেগুলো দেখে নিজেদের জন্যে সেসব স্বাধিকার প্রতিষ্ঠার সংগ্রাম প্রত্যক্ষভাবে ঘোষণা করতে সাহস পায়নি, অপরিচিত ইসলাম বরণও সংস্কারবদ্ধ মানুষের পক্ষে সহজ ছিল না। তাই চিরনির্যাতিত শূদ্র-অস্পৃশ্যরা ওই অদ্বৈততত্ত্ব সম্বল করে, স্ব স্ব হৃদয়ে ভক্তির বীজ উপ্ত করে অগ্রসর হল দ্রোহ-ঘোষণায় ব্রাহ্মণবাদী পীড়কদের বিরুদ্ধে। তারা 'দেবদ্বিজবেদ' ও মন্দির ছাড়ল বটে, কিন্তু প্রবেশ করল না মসজিদে। এবার পথে বের হয়ে পথ চলে পথের দিশা নিজেরাই খুঁজতে লাগল। পাথেয় বা সম্বল হল স্রষ্টার প্রতি ভক্তি, আর সৃষ্টির প্রতি প্রীতি। সবাই হল একেশ্বরবাদী, অন্তত একক দেবতার উপাসক। উচ্চারিত হল ধর্ম-সমন্বয়ের বাণী অর্থাৎ ভক্ত মাত্রই অভিন্ন। কাজেই সহিষ্ণুতা, সম্প্রীতি ও ঐক্যই কাম্য। একক সে ঈশ্বরের বাস মন্দিরে-মসজিদে-গির্জায় নয়, —হৃদয় মন্দিরে, সেখানেই তাঁকে ভক্তিযোগে প্রতিষ্ঠিত রাখতে হয়, আত্মনিবেদন করতে হয় তাঁর কাছেই, তা হলেই হয় চিত্তশুদ্ধি, পাপমুক্তি, তা হলেই হয় সর্বসিদ্ধি সাধন। আর জ্ঞানে কর্মে মুক্তি মেলে না, কৃপা মেলে ভক্তের সেবায়। তাই কবীরের ভাষায় অকারণেই 'হিন্দু ধাবৈ দেহরা মুসলমান মসীত'—হিন্দু দেবালয়ে এবং মুসলিম মসজিদে যায়। ঈশ্বর বলেন :

মোকো কঁহা ঢুঁড়ো বন্দে, মৈঁ তো তেড়ে পাসমে।
না মৈঁ দেবল না মৈঁ মসজিদ, না কাবে কৈলাস মে ॥

—আমাকে কোথায় খুঁজছ, আমিতো রয়েছি তোমার পাশেই। আমি মন্দিরে মসজিদে কিংবা কাবায় কৈলাসে থাকি নে। দাদুর কথায়ও বলা চলে : হিন্দু-তুরুকা হোইবা সেতী কাজ'।

—হিন্দু বা মুসলিম হয়ে কি লাভ, তাকে পাওয়াই হল কাজ। তাই :

না হম হিন্দু হোহিগে না হম মুসলমান
ষট দর্শন মেঁ হম নঁহী হম রাতে রহিমান ॥
—ন তহাঁ হিন্দু দেহ্‌রা ন তহাঁ তুরুক মসীত।
অতএব নির্ভৈ নিপর্থ হোই।

—আমি হিন্দু বা মুসলিম হতে চাইনে, ষড় দর্শনের পথেও আমি নেই। আমি থাকতে চাই দয়াময়ের সঙ্গে। এবং তাঁর রাজ্যে মন্দির-মসজিদ নেই। অতএব নির্ভয়ে (পুরাতন শাস্ত্রীয়) পথ ত্যাগ কর।

কবীরের ভাষায় 'পাঁচ তত্ত্বকী পুতলা গৈরী খেলে মাহি। পাঁচ ভূতের এদেহে নিগূঢ় সত্তা খেলছে। দাদু বলেন, এ জীবদেহেই ঈশ্বরের স্থিতি। আঠারো শতকের মারাঠি সাধক তুলসী হাথরসীও (জন্ম ১৭৬০ খ্রী:) বলেন :

তুলসী কহে সব খুদা ভরপুর হৈ
রুহ্‌ মেঁ নিরখ দিল দেখ জাই।

—তুলসী বলেন খোদা আছেন সব পরিপূর্ণ করে আত্মার মধ্যে, হৃদয়ের মধ্যে যেয়ে দেখ তাঁকে। কাজেই হৃদ-মন্দিরেই চলবে তাঁর সেবা-উপাসনা। এ সূত্রে 'বাণীর নামাজ তারে তারে আমার নামাজ কণ্ঠে গাই; 'তোমার পথ ঢাইক্যাছে মন্দিরে মসজিদে', 'মন্ত্রের তন্ত্রের পাতলি যে ফাঁদ, দিবে সে কি ধরা?' প্রভৃতি বাউল গান স্মর্তব্য।

মূলত এঁরা ব্রাহ্মণ্যবাদ অস্বীকার করে ভক্ত-ভগবানের প্রত্যক্ষ প্রেমবাদ বা সম্পর্কবাদই প্রচার করেন বর্ণেবিন্যস্ত সমাজের পীড়ন-শোষণ মুক্তির লক্ষ্যে। ইসলামী তত্ত্বের তথা সূফী তত্ত্বের প্রভাবও এঁরা স্বীকার ও সমন্বিত করেছিলেন, যদিও এঁদের উপাস্য কখনো নাথ-নিরঞ্জন, রাম, হরি ও হর কিংবা কখনো রাম-সীতা, কখনো হর-পার্বতী কখনো রাধা-কৃষ্ণ, কখনো বা আপোস লক্ষ্যে রাম-রহিম।

চৌদ্দশতক থেকেই উত্তর ভারতে সন্তদের আবির্ভাব ঘটতে থাকে। লোক-প্রসিদ্ধি এই যে দাক্ষিণাত্যের দ্রাবিড় ভক্তিবাদ উত্তরাপথেও আর্যেতর শূদ্র-অস্পৃশ্যদেরই প্রিয় হয়েছিল, 'ভক্তি দ্রাবিড় উপজি (উত্তরভারতে) লায়ে রামানন্দ এবং প্রকট কিয়ে কবীরনে'। অতএব রামানন্দ, কবীর, নানক, দাদু, রবিদাস, একলব্য প্রভৃতি বহু সাধুসন্ত গুরু-নির্ভর এ ভক্তিবাদ প্রচার করেন, আর তার ফলে গুরুবাদী অনেক সন্ত-সম্প্রদায় গড়ে ওঠে গোটা উত্তর-ভারতে। এভাবে ইসলামের প্রসার হল রুদ্ধ, আর যেহেতু ব্রাহ্মণ্যমতবাদাশ্রিত লোকেরাই নতুন তত্ত্বাদর্শ ও চর্যা বরণ করে রাম, হরি, হর বা ব্রহ্মের উপাসকই রয়ে গেল, শাস্ত্রীয় অর্থে এরা বিধর্মী হল বটে, কিন্তু একালের রাজনীতিক সংজ্ঞায় রয়ে গেল হিন্দুজাতিভুক্ত। ফলে ঐহিক-বৈষয়িক ক্ষেত্রে লাভবান হল ব্রাহ্মণ্যবাদীরাই।

২. তুর্কীবিজয় কালে বাঙালীর ধর্ম

তেরোশতকের উষালগ্নে কুতবউদ্দীন আইবকের হয়ে মধ্য-এশিয়ার খালজী বংশীয় আফগান ভাগ্যান্বেষী ইখতিয়ারউদ্দীন মুহম্মদ বখতিয়ার খালজী জয় করলেন গৌড়রাজ্য—রাঢ়-বরেন্দ্র অঞ্চল। এর প্রতিক্রিয়া-স্বরূপ চারমুখী চারটি চিন্তাবিপ্লব তথা সমাজে-মননে চারটি প্রতিক্রিয়া দেখা দিল : ১. প্রচ্ছন্ন বৌদ্ধ ও শূদ্রাদি গণমানবের গোষ্ঠী-ঐতিহ্য চেতনার উন্মেষ ও লৌকিক দেবতার প্রতিষ্ঠা প্রয়াস, ২. উচ্চবর্ণের সমাজে শাস্ত্র ও স্বাতন্ত্র্য হারানোর আশঙ্কায় শাস্ত্র-সংস্কার, ৩. বিদেশী-বিজাতি-বিধর্মী-বিভাষীয় শাসকগোষ্ঠী হিসেবে উপস্থিতির ফলে ও প্রভাবে উদ্ভূত সমস্যার উত্তরভারতীয় আদলে সমাধান প্রয়াস এবং ৪. দেশজ মুসলিম সমাজের উন্মেষ ও বিকাশ।

বল্লাল সেনের ও লক্ষ্মণসেনের ব্যক্তিগত যোগ্যতা সত্ত্বেও বারো শতকের শেষপাদে বাঙলার ও বাঙালীর অন্তত রাজধানীর মানুষের জীবনে সমাজে ও রুচিতে অবক্ষয় ও বিকৃতি দেখা দিয়েছিল। এ সময়কার অবস্থা সম্বন্ধে ডক্টর নীহাররঞ্জন রায় বলেন—"তখন (মুসলিমবিজয় কাল) রাষ্ট্রে, ধর্মে, শিল্প, সাহিত্যে, দৈনন্দিন, জীবনে যৌন অনাচার, নির্লজ্জ কামপরায়ণতা, মেরুদণ্ড বিহীন ব্যক্তিত্ব, বিশ্বাসঘাতকতা, রুচিতারল্য এবং অলঙ্কার বাহুল্যের বিস্তার, সমাজ দেহে দুষ্ট ক্ষতের মতো প্রকট হয়েছিল।[১০] ডক্টর সুকুমার সেন এ সময়কার একটি তুকতাকের পুথি থেকে শত্রু ঠেকানোর মন্ত্র ও আচারের কথা উল্লেখ করেছেন : 'শ্মশানের ছাই কয়েকটি বিশেষ বিশেষ গাছের ছাল ও মূলের সঙ্গে বেটে তূর্যের গায়ে ভালো করে মাখিয়ে এই মন্ত্র পড়ে বাজাতে হবে :

'ওং অং হং হালিয়া হে মহেলি বিহজ্জহি সাহিনেহি
মাশানিহি খাহি লুঞ্চহি কিলি কিলি কালি হুংকট স্বাহা।

আর শ্বেত অপরাজিতার মূল ধুতুরাপাতার রসে বেটে নিজের কপালে তিলক এঁকে সর্বঙ্গোদয় মন্ত্র জপ করতে হবে। তা হলে সেই তূর্যের শব্দ শুনে 'ভবতি পরচক্রভঙ্গ স্বসৈন্য

বিজয়।'[১১] দেশের দণ্ডশক্তির—রাজসভার রণকৌশল যদি এ হয়, তা হলে নৈতিক মানসিক চারিত্রিক পতন কি চরম রূপ ধারণ করেছিল, কল্পনা করতেও বিবেকবান মানুষ শিউরে উঠবে। বারো শতকের অবসানকালে বাঙালীর নৈতিক দৌর্বল্য, চারিত্রিক বিকৃতি ও সামাজিক শৈথিল্য যে বিশেষ প্রকট ও প্রবল হয়েছিল তার সাক্ষ্য রয়েছে হলায়ুধ মিশ্রের 'শেখ শুভোদয়া'য়, জয়দেবের 'গীতগোবিন্দে', গোবর্ধন আচার্যের 'আর্যা সপ্তশতী'র কোন কোন শ্লোকে বা আর্যায়, দরবারে গণক জ্যোতিষীর আদরে ও দরবেশের কদরে, সান্ধ্য আসরে নটীর সমাদরে।[১২] রামাই পণ্ডিতের 'শূন্য পুরাণে'র, নিরঞ্জনের রুস্মায় ধর্মপূজাবিধানের কলিমা জলালে। ডক্টর অসিত বন্দ্যোপাধ্যায়েরও ধারণা —'বৈদিক মতাবলম্বী ও স্মার্তনীতিতে বিশ্বাসী সেনবংশ বাংলাদেশে যে বৈদিক ও পৌরাণিক হিন্দুধর্মের পুনঃপ্রতিষ্ঠার চেষ্টা করিয়াছিলেন, তাহার সহিত নিম্নস্তরের জনসাধারণের কিছুমাত্র যোগ ছিল না—তাহারা তখনও কালচক্রযান, বজ্রযান, সহজযান, নাথধর্ম প্রভৃতি অব্রাহ্মণ্য ধর্মমতের সুড়ঙ্গ পথে গতায়াত করিতে ছিল'।[১৩]

আমাদের ধারণা সেনরা বাহুবলে বাহ্যত ব্রাহ্মণ্য আচার-বিশ্বাস জনগণের ওপর চাপাতে সমর্থ হলেও, এতে জনগণের অন্তরের সায় কিংবা বিশ্বাসের সমর্থন ছিল না। প্রচ্ছন্ন বৌদ্ধরা তাদের বামাচারী কায়াসাধন, বামাবর্জিত ব্রহ্মচর্য (বিন্দু ধারণ) এবং স্থানীয়ভাবে উদ্ভাবিত নানা শক্তিপ্রতীক লৌকিকদেবতার প্রতি আনুগত্য গোপনে বজায় ও চালু রেখেছিল। বিদেশী তুর্কীবিজয়ে স্বধর্মী শাসকের ও শাস্ত্রের ভয়মুক্ত হয়ে তারা স্ব স্ব অরিমিত্র দেবতার পূজায় ও প্রচারে, চর্যায় ও চর্চায় মেতে উঠল। বজ্র-সহজযানী প্রচ্ছন্ন বৌদ্ধ প্রভাবের বিকৃতিই এ সময়ে আদিরসের বন্যা বইয়ে দিয়েছিল, সে সঙ্গে মন্ত্রযানীর ও মঙ্গোলীয় গোত্রের—কামরূপ-কামাখ্যার তুকতাক, দারু-টোনা, বাণ-উচ্চাটন, তাবিজ-কবজ আর মন্ত্র-মাদুলীও দীন-দুর্বল অজ্ঞ-অনক্ষর-অদৃষ্টবাদী অসহায় মানুষের মনে (এমনকি রাজদরবারেও) যাদুর ঐন্দ্রজালিক শক্তির প্রতি আস্থা ও আশ্রয়-লিপ্সা জাগিয়ে ছিল। অতএব, আমাদের আবার সাংখ্য যোগতন্ত্রাশ্রিত মহাযানীবৌদ্ধ মত আলোচনায় ফিরে যেতে হবে।

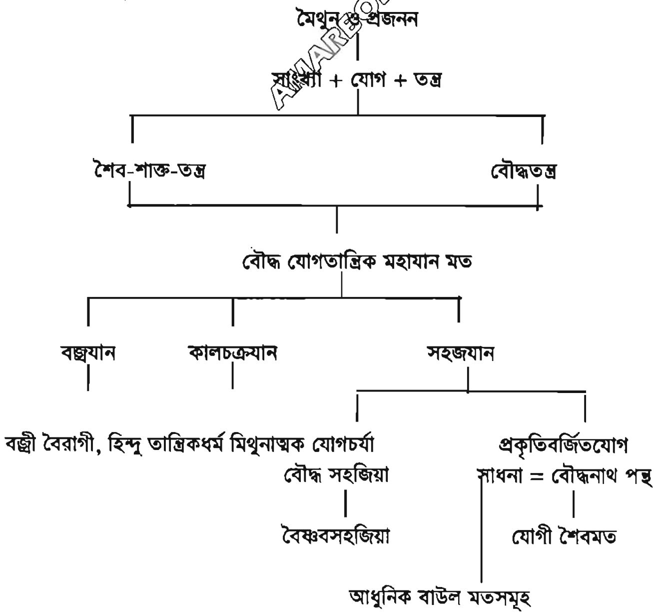
আগেই বলা হয়েছে বৌদ্ধ মহাযান মতের প্রসার ক্ষেত্র ছিল বাঙলাদেশ। আটশতক থেকে এ মহাযানীরা ক্রমে পৌত্তলিক হয়ে ওঠে এবং আর্যতারা, তারা, শ্যামতারা, শ্বেততারা, উগ্রতারা, বজ্রতারা, যক্ষ, ক্ষেত্রপাল, বৎসলা বা বাসুলী, লোকনাথ, অবলোকিতেশ্বর প্রভৃতি ছাড়াও পঞ্চ স্কন্ধ-প্রতীক বৈরোচন, রত্নসম্ভব, অমিতাভ, অমোঘসিদ্ধি, অক্ষোভ প্রভৃতি বহু প্রতীক-দেবতার মূর্তি পূজা করতে থাকে। লোকনাথ সূর্যরূপী বৌদ্ধ ধর্মদেবতা ধর্ম নিরঞ্জনেরই অপর রূপ পরে ভক্তিবাদের বিগ্রহ রূপে তিনি বিষ্ণুর গুণ-মান-মাহাত্ম্য লাভ করেছেন।[১৪] এ সঙ্গে আদি মৈথুনতত্ত্ব পুরুষ-প্রকৃতিতত্ত্ব তথা সাংখ্যতত্ত্ব এবং দেহতত্ত্ব বা দেহাত্মবাদও সমগুরুত্বে অঙ্গীকৃত হয়। ফলে রতিনিরোধ লক্ষ্যে যৌগিক কায়াসাধন এবং বিন্দুধারণ লক্ষ্যে তন্ত্রসম্মত (পঞ্চমকার সমেত) বামাচারী সাধনাও প্রয়োজনীয় হয়। এর পরিণামে ক্রমে বজ্রযানী ও সহজিয়া মতের উদ্ভব ঘটে। তন্ত্রের সে-তত্ত্ব 'যা আছে ভাণ্ডে, তা-ই আছে ব্রহ্মাণ্ডে (ব্রহ্মাণ্ডে যে গুণাঃ সন্তি তে তিষ্ঠন্তি কলেবরে)' এ তত্ত্বে আস্থা রেখে তারা বিরোচনের সেই উক্তি 'এ পৃথিবীতে দেহের পূজা করবে, দেহেরই পরিচর্যা করবে। দেহকে মহীয়ান ও পরিচর্যা করলেই ইহলোক ও পরলোক—এ উভয় লোকই লাভ হয়।' (৮/৮/৪-ছান্দোগ্য)—অনুসরণে কায়াসাধন করে।

শুক্রই হচ্ছে বজ্র। বৌদ্ধ কমল-বজ্র, প্রজ্ঞা-উপায়, চন্দ্র-সূর্য সাংখ্যের পুরুষ-প্রকৃতির নামান্তর মাত্র। এ বজ্র সৃষ্টির উৎসরূপ শক্তি। কাজেই একে সঞ্চিত ও সংরক্ষিত রাখলে অজর অমর হওয়া যায় এবং একে ইড়া-পিঙ্গলা-সুষুম্না নাড়ী পথে উর্ধ্বে শিরে-কপালে সহস্রার নামে

সহস্রদল পদ্মে স্থাপন করা সম্ভব হলেই সামরস্যজাত সচ্চিদানন্দ বা বোধিচিত্ত বা ব্রহ্মবোধ অবস্থায় উত্তরণ ঘটে। এরই বৌদ্ধনাম নির্বাণ, শূন্যতা, বজ্রযানী নাম মহাসুখ, সহজিয়া বৌদ্ধনাম সহজানন্দ।

সাধক অধিকারী হয় ইচ্ছা শক্তির। বামাচারী তান্ত্রিক সাধনায় নারী সঙ্গী প্রয়োজন, সাধকের সাধ্যানুসারে সঙ্গিনী নির্বাচনকে বলে 'কুল'—এ নির্বাচন-যোগ্যতাকে বলে কৌলজ্ঞান। বিভিন্ন পন্থের ও স্তরের সাধন সঙ্গিনীর নাম রজকী, শবরী, চণ্ডালী, ডোমনী, ব্রাহ্মণী, যোগিনী, নৈরামণি, সহজসুন্দরী, ত্রিপুরাসুন্দরী প্রভৃতি। এসব মতবাদীরা মূলে নিরীশ্বর, পরে ব্রাহ্মণ্যবাদীদের প্রভাবে পড়ে দেবতার বা ঈশ্বরের ঠাঁই করে দিয়েছে—বিশেষ করে বৈষ্ণব সহজিয়ারা ও বাউলেরা এবং নাথেরাও। আগেই বলেছি, তন্ত্র মঙ্গোলদের দান। তাই এতে তিব্বত-চীনের প্রভাব সুস্পষ্ট। তান্ত্রিক সাধনায় লতা, স্ত্রীভগ, যন্ত্র, মণ্ডলচক্র, ভৈরবী চক্র, গোপীচক্র, নৈশচক্র, প্রভৃতি আজো বিভিন্ন পন্থার সাধন-পূজনের অপরিহার্য অঙ্গ। এমনি করে সেই আদি মৈথুনতত্ত্ব —পুরুষ-প্রকৃতি, মায়-ব্রহ্ম, শিব-উমা, বিষ্ণু-লক্ষ্মী, প্রজ্ঞা-উপায়, বজ্র-তারা, করুণা-শূন্যতা, প্রভৃতি নানা নামে ও বিচিত্র তাৎপর্যে জৈন-বৌদ্ধ-ব্রাহ্মণ্য তান্ত্রিকচর্যায় বিকাশ পেয়েছে। মৈথুতত্ত্বের মৌল তাৎপর্যের ও মর্যাদার কিছুমাত্র বিকৃতি না ঘটিয়েই দ্বৈত-অদ্বৈত রূপে, দ্বয়-অদ্বয় চেতনায়, শক্তি-শক্তিমান পরিচয়ে বিভিন্ন সম্প্রদায় সেই সৃষ্টিসম্ভব-জগৎকারণকে সাংখ্যে যোগে তন্ত্রে শৈবে-শাক্তে-বৈষ্ণবে-নাথে-গাণপত্যে-লিঙ্গায়েতে, বজ্র-সহজযানে, সহজিয়া, বৈষ্ণবে-বাউলে বিচিত্র করে তুলেছে।

ছকে উপর্যুক্ত মতবাদগুলোর উদ্ভব ও বিকাশ নিম্নরূপ:



নাথধর্মকে অনেক বিদ্বানই শৈবমত ও শৈবপন্থ বলে মানেন, আসলে নাথধর্ম বিকৃত ও প্রচ্ছন্ন বৌদ্ধমত। আজকাল কোন কোন বিদ্বান তা স্বীকার ও করেন।

ডক্টর মুহম্মদ শহীদুল্লাহর মতে 'নাথপন্থা যে বৌদ্ধ মন্ত্রযান হইতে উদ্ভূত বা প্রভাবিত তাহাতে সন্দেহ নাই। এই নাথপন্থ বৌদ্ধ ধর্মের মহাযান শাখার শূন্যবাদের ওপর প্রতিষ্ঠিত। এই নাথ পন্থারই অপর নাম সহজসিদ্ধি।'[১৬]

ডক্টর পঞ্চানন মণ্ডলও বলেন 'কাজেই নাথ ও ধর্ম সম্প্রদায়ের ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ ও মিশ্রণ ঘটিয়াছে ইহা অবিসম্বাদিত সত্য।'[১৭] ডক্টর কুসুমার সেনও বলেন, "(যাহারা) নিরঞ্জন পন্থী, কনফট, মচ্ছেন্দ্রী, সারঙ্গীহার, কানি পা ইত্যাদি নামে পরিচিত আছেন, তাঁহারা (সন্ন্যাসীরা) নাথ পন্থেরই পথিক। বাঙলাদেশে নাথপন্থী সাধুরা এখন শৈব সম্প্রদায়ভুক্ত হইয়া পড়িয়াছেন।

'নাথপন্থের উৎপত্তি ও বিকাশ যে বাঙলা-কেন্দ্রিক পূর্বভারতে ঘটিয়াছিল তাহাতে সন্দেহ করিবার কিছু নাই। নাথপন্থ নিরীশ্বর। ধর্মমঙ্গল শূন্যপুরাণের ধর্মঠাকুর আর নাথ ঐতিহ্যের নিরঞ্জন আদিনাথ অভিন্ন।

"ধর্মঠাকুরের পুরাণকথা আর নিরঞ্জনের সৃষ্টি বর্ণনা একই।"[১৮] পাল রাজাদের ব্রাহ্মণ্যবাদীরা প্রভাবজাত দুর্বলতার ফলে ব্রাহ্মণ্য শাস্ত্র-সংস্কৃতি এমন কি সংস্কৃত-ভাষাও জনপ্রিয় হয়। বৌদ্ধমতে তান্ত্রিকতার প্রভাবও বৌদ্ধবিলুপ্তি ত্বরান্বিত করছিল, তাছাড়া ব্রাহ্মণ্যবাদীদের চাপও ছিল। ফলে নবম-দশম একাদশ-দ্বাদশ শতাব্দীতে বৌদ্ধপন্থীরা ধীরে ধীরে শৈবপন্থীদের সঙ্গে মিলে আসছিল।[১৯]

শিবের মাথার উপরকার চক্র ও বৌধিসত্ত্বমূর্তিই তার প্রমাণ।[২০] এ সময়ে বুদ্ধ ও গিরিশ শিবকে অভিন্ন সত্তা বলে ভাবা হচ্ছিল।[২১] (ভক্তিশতকের শ্লোক : তেরোশতকের রামচন্দ্র কবিভারতী)।

আগেই বলেছি, বৌদ্ধ বিলুপ্তির সময়ে নিম্নবিত্তের বৌদ্ধেরা আত্মরক্ষার প্রয়াসে বাহ্যত ব্রাহ্মণ্য শাস্ত্র ও সমাজ বরণ করে প্রচ্ছন্নভাবে নিজেদের মতপথ ভিন্ননামে রক্ষা করে। এ সময়েই প্রজ্ঞা-উপায়, নাথ-নিরঞ্জন, বজ্র-তারা, করুণা-শূন্যতা প্রভৃতি পরিহার করে তারা মুখ্যত অনাদিনাথকে ব্রহ্মনামে, আদিনাথ-আদ্যাশক্তিকে শিব-উপমারূপে স্মরণ করতে থাকে। 'নাথ' মাত্রই বৌদ্ধ দেবতা। পরে আদিনাথ, চন্দ্রনাথ, বৈদ্যনাথ শিবে, মীননাথ গোরক্ষনাথ প্রভৃতি শৈব-সিদ্ধ গুরুরূপে পরিচিত হন। এখানেই শেষ নয়, তারা উমা-চণ্ডী-কালীতে, লোকনাথ-অবলোকিতেশ্বর বিষ্ণুতে এবং যক্ষ, বাসুলী, ক্ষেত্রপাল, জাঙ্গুলী-মনসা হিন্দুদেবতায় রূপান্তরিত হয়ে লৌকিক-পৌরাণিক ব্রাহ্মণ্যদেবতার মর্যাদা লাভ করেন। এখানে উল্লেখ্য যে, বৌদ্ধ-লোকনাথকে তান্ত্রিক বৌদ্ধেরা ত্রিনেত্র-ত্রিমুখ ও ব্যাঘ্রচর্মধারী শিব রূপেই কল্পনা করেছিল, পরে তিনি বিষ্ণুসত্তা পেলেন। কালক্রমে গুণে-মানে-মাহাত্ম্যে-হেরুক ভৈরবে, নৈরামণি মহামায়ায়, তারা কালীতে বিবর্তিত।

বৌদ্ধ মতজাত বলেই শৈব-যোগী বা সন্ন্যাসী মতও গোড়াতে ছিল নিরীশ্বরমত। হঠযোগ ছিল এদের কায়াসাধনের বাহন বা মাধ্যম। নাথপন্থের মূল সাধ্য 'মহাজ্ঞান'। তা লাভ করে সে অনুসারে রতি-নিরোধে অজর-অমর-খেচর ও অশেষ শক্তিধর হওয়াই লক্ষ্য। মীননাথ গোরক্ষনাথ কাহিনী স্মর্তব্য। আবার রতি প্রয়োগে, হাড়িফা-কানুফা-ময়নামতী-মানিকচাঁদ-গোপীচাঁদ প্রভৃতির তন্ত্রসম্মত যৌগিক সাধনার কথাও এখানে উল্লেখ্য। বৌদ্ধবিলুপ্তিতে বুদ্ধ-স্তূপ গেছে, কিন্তু বৌদ্ধজ হিন্দু-মুসলিমের মনের কোণে তার সংস্কার রয়ে গেছে। তাই ঝাড়ে-ঝোপে পথের বাঁকে হিন্দুরা আজো দেবতা-উপদেবতা-অপদেবতার স্থিতি দেখে, আর মুসলমানেরা

বানায় দরগাহ, আজকাল হয়তো সে-সংস্কার বশেই দেশের সর্বত্র গাঁয়ে-গঞ্জে, শহরে-বন্দরে, স্কুলে-কলেজে শহীদ মিনারের প্রতিষ্ঠা প্রত্যক্ষ করি।

অতএব, আদি মৈথুনতত্ত্বের বিকাশে সাংখ্য, যোগ, তন্ত্র প্রভৃতির অনুশীলনে দেহাত্মবাদী, প্রাণাত্মবাদী, মনাত্মবাদী, নিরীশ্বর ঐহিকতাবাদী মানুষ জৈন-বৌদ্ধ যুগে জৈন-বৌদ্ধমত এবং ব্রাহ্মণ্যযুগে ব্রাহ্মণ্য মত, এমনকি ইসলাম বরণ করেও তাদের সুপ্রাচীন বিশ্বাস-সংস্কার পরিহার করেনি, যথা সময়ে শীতকালীন সুপ্ত ঔষধির মতো কালক্রমে স্ব স্ব বিশ্বাস-সংস্কারই আবার জীবনে-মননে রূপায়িত করেছে প্রায় অলক্ষ্যে ও অবচেতন প্রেরণায়। যা ছিল নিরীশ্বর চর্যা, তা-ই কালিক ও স্থানিক কিংবা প্রতিবেশী শাসক-গোষ্ঠীর প্রভাবে আস্তিক ও একেশ্বরবাদী হয়েছে বটে, তবে মৌল তাৎপর্যের ও গুরুত্বের হ্রাস-বৃদ্ধি তেমন হয়নি। বৌদ্ধযুগে ছিল বৌদ্ধ ধর্মনিরঞ্জন পূজা, —মহাযানের উপশাখা বজ্র, সহজ, কালচক্র, মন্ত্রযান ও নাথপন্থা অবলম্বনে। ব্রাহ্মণ্য যুগে ধর্মদেবতার পূজারীরূপে, বৈষ্ণব সহজিয়ারূপে, শৈব নাথপন্থী নামে, তান্ত্রিক কাপালিক সাধক-সন্ন্যাসী পরিচয়ে, এবং হিন্দু-মুসলিম গুরুপন্থী বাউল রূপে দেহাত্মবাদী রয়ে গেছে দেশের এক শ্রেণীর মানুষ। অবশ্য সাক্ষর ও শিক্ষিত হয়ে ওরা আর সহজিয়া বা বাউল থাকছে না। এবং হিন্দুদের মধ্যেও তন্ত্র এখন সামাজিক নয়—গুহ্য সাধনার অবলম্বন মাত্র।

সাংখ্যসম্মত যোগতান্ত্রিক কায়াসাধনতত্ত্ব সাধারণভাবে রূপক-সাংকেতিক ভাষার পরিভাষায় হেঁয়ালি-ধাঁধা রূপে পরিব্যক্ত। চর্যাগীতি থেকে বাউল গান অবধি সে-ধারা অবিচ্ছিন্ন ভাবে চলেছে। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে চর্যাগীতিতে বামাচারী যোগতান্ত্রিক ও বামাবর্জিত যোগতান্ত্রিক পদ্ধতির সমকদর লক্ষণীয়। পদগুলো তত্ত্বের ও চর্যার পর্যায়ক্রমানুগ করে বিন্যস্ত বলে মনে হয়, তাই একই পদকারের—যেমন কাহ্ন পার-পদ সংকলনের বিভিন্ন স্থানে সংস্থিত। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে প্রতি মানুষের দেহ স্ব স্ব আঙুলের মাপে ৮৪ আঙুল পরিমিত। ৮৪ আঙুল পরিমিত কায়াসাধনায় সিদ্ধিলাভ করলে তাদের বলা হয় চৌরাশি সিদ্ধা। এটা সিদ্ধার সংখ্যাবাচক নয়, দেহাকার নির্দেশক (সৈয়দ সুলতান: তাঁর যুগ ও রচনাবলী দ্রষ্টব্য)।

চর্যাগীতি ছাড়াও বজ্র-গীতিতে, গোপীচাঁদ-ময়নামতীর গানে, নাথ-সাহিত্যে, ফয়জুল্লাহর গোরক্ষবিজয়ে, আলি রজার আগম-জ্ঞানসাগরে, সহদেবের অনিলপুরাণে, হাজী মুহম্মদ সৈয়দ সুলতান শেখ চাঁদ প্রভৃতির সূফী সাহিত্যে, হাড়মালায়, সাধনমালায়, হঠযোগপ্রদীপিকায় প্রভৃতি যোগতন্ত্রের সূফী গ্রন্থে, বৈষ্ণবসহজিয়া পদে ও নিবন্ধে, বাউলচর্যায় ও গানে, মণ্ডল-গোপী-যোগিনী-নৈশ-চক্রে এ ধারা রয়েছে অবিরল ও অবিচ্ছিন্ন। এবার তত্ত্বের ও চর্যার ধারাবাহিকতার কয়েকটি দৃষ্টান্ত পরিশিষ্টে দিচ্ছি।[২২]

এখনকার যুগে বৈষ্ণবসহজিয়ারা এবং বিভিন্ন গুরুপন্থী বাউলরা স্বকালের মানুষ, সমাজ, সংস্কৃতি সম্বন্ধে উদাসীন নয়, তারাও প্রীতিপ্রচারক ও ভক্তিবাদী। তাই ভেদবুদ্ধিহীন মানবতার উদার পরিসরে সাম্যের ও সহিষ্ণুতার অঙ্গীকারে প্রেমের সুউচ্চ মিনারে বসেই বাউল-সহজিয়ারা সাধনা করে তাই রবীন্দ্রনাথের ভাষায় 'এ জিনিস হিন্দু-মুসলমান উভয়েরই। এ মিলনে গান জেগেছে, ... এ গানের ভাষায় ও সুরে হিন্দু মুসলমানের কণ্ঠ মিলেছে। কোরানে পুরাণে ঝগড়া বাধেনি।' ঝগড়া বাধেনি, কারণ তারা বিষয়ী লোক নয়, বাউল-সহজিয়ার গানের বাণী ও সুর আনন্দ-সুন্দর জীবন-চেতনা জাগিয়ে চিত্ত করে ঋদ্ধ, দেয় জন্মের, জীবনের ও জগতের তাৎপর্য সন্ধানে প্রেরণা। জীবনের, জগতের ও স্রষ্টার এ রহস্য জিজ্ঞাসায় আত্মার এ আকুলতা অকূলে কূল পাওয়ার আকুলতার মতোই বৃথা জেনেও পিঁপড়ের সমুদ্র সাঁতারের আকাঙ্ক্ষার মতে ক্ষুদ্রমানুষের অসীমের সীমা সন্ধানের এ আগ্রহও আনন্দময় প্রয়াসে

নিঃশেষ হবার সুযোগ পায়। অধরাকে ধরার এ প্রত্যাশাই, এ আনন্দিত অভিভূতই বাউলকে করেছে বিবাগী-পথিক। পথে নেমে, পথ চলে, পথের দিশা খুঁজে, পথ বাড়িয়ে, তৃপ্তির প্রত্যাশায় তারা অতৃপ্ত হৃদয়ে ঘুরে বেড়ায় সারাটা জীবন।

৩. দেবতা ও দেবতামঙ্গল

অজ্ঞ অসহায় আদি বুনো-বর্বর মানবের চাওয়া-পাওয়ার মধ্যেকর অসাফল্যের ও অসম্ভাব্যতার ব্যবধান এবং জীবন-জীবিকার ক্ষেত্রে বিপদের ও নিরাপত্তার ভাবনা তাদেরকে করেছিল সর্বপ্রাণবাদী, যাদু শক্তিবাদী, টোটেম ট্যাবুবাদী। ক্রমে তারা জীবন-জীবিকার নিরাপত্তা লক্ষ্যে, চাওয়া-পাওয়া নির্বিঘ্ন করার প্রয়াসে অরি ও মিত্র শক্তি-প্রতীক অমূর্ত এবং ক্রমে সমূর্ত দেবতা সৃষ্টি করে। এবং বৈদিক প্রাকৃত শক্তিপ্রতীক অগ্নি, বরুণ প্রভৃতির মতো ঐহিক জীবনের কেজো দেবতাই এঁরা। আর যেহেতু অনিশ্চয়তার ক্ষেত্রে সুখের চেয়ে স্বস্তিই ভালো, সেহেতু মিত্রদেবতার চেয়ে অরি দেবতারই ভয়-ভরসা তাদেরকে বেশি অনুপ্রাণিত করেছে। তাই লক্ষ্মী সরস্বতী ক্ষেত্রপালের আদর কম, কদর বেশি ক্ষতিকর শক্তিদেবতার—চণ্ড-চণ্ডীর, গণেশের, শীতলার, ষষ্ঠীর, মনসার, শনির, যক্ষের, বাসুলীর এবং অন্য অপ-ও উপ-দেবতার। এসব দেবতা লৌকিক, এবং বাঙালীর বুনো-বর্বর জীবনেই এঁদের উদ্ভব। বৌদ্ধযুগেও বিভিন্ন তারা, তারিতা, মারীচি, যক্ষ, ক্ষেত্রপাল, জাঙ্গুলী প্রভৃতি দেবতা প্রাত্যহিক জীবনের প্রয়োজনে উদ্ভাবিত। সেনেরা ব্রাহ্মণ্য শাস্ত্রের ও সমাজের নিয়ম-নীতির, আচার-আচরণের, উৎসব-পার্বণের আক্ষরিক প্রয়োগকামী ছিলেন। ফলে গণমানব অনেককাল প্রকাশ্যে তাদের ভয়-শঙ্কার, বল-ভরসার দেবতাদের মাহাত্ম্যকথা প্রচার করতে এবং পূজা-অর্চনা করতে পারেনি রাজশক্তির সমর্থনপুষ্ট ব্রাহ্মণ্য শাস্ত্রী, সমাজপতি ও প্রশাসকের ভয়ে।

তেরোশতকের উষাকালে তুর্কীবিজয়ের ফলে রাজশক্তির সমর্থনচ্যুত শাস্ত্রী, সমাজ-পতি ও গোষ্ঠীসর্দারের হুকুম-হুমকি ও হামলামুক্ত হয়ে গণমানব আবার লৌকিকদেবতার মাহাত্ম্যকথা আসরে নাচ-গান-বাজনার মাধ্যমে প্রচার এবং বারোয়োরী অনুষ্ঠানে-উৎসবে-পার্বণে পূজা-অর্চনা চালু করতে থাকে। এ সব দেবতার ব্রতকথার, মাহাত্ম্যকথার ভিত তৈরী হয় প্রথমে কবি-কথকের মৌখিক রচনায়, পরে পনেরো ষোল-সতেরো-শতকে অনেক দেবতারই বৃত্তান্ত লিখিত পাঁচালী কাব্য হয়ে দাঁড়ায় এবং কলেবরেও বৃদ্ধি পেতে থাকে। আর সংস্কৃত পুরাণের অন্তর্ভুক্ত হয়ে এঁরাও পৌরাণিক আভিজাত্য পান এবং এঁদের গুণ-মান-মাহাত্ম্যও পৌরাণিক মর্যাদা লাভ করে।

রামায়ণের, মহাভারতের ও ভাগবতের অনুসৃতি বা অনুবাদমূলক পাঁচালীগুলো ছাড়া হিন্দু রচিত আর সব রচনাই দেবতামঙ্গল পাঁচালী। এসব দেব-কাহিনী প্রকৃতপক্ষে ব্রাহ্মণ্য ধর্মের শাস্ত্রের বিস্তার-বিকৃতিই ঘটিয়েছে, অনুপ্রবিষ্ট হয়ে পুরাণ কাহিনীকে করেছে জটিল। শ্রুতি-স্মৃতি-গীতার বাণীর পাশে এসব ব্যক্তিজীবনের ভয়-ভরসা সম্পর্কিত লৌকিক দেবতার রোষ ও কৃপা বিষয়ক কাহিনীর সঙ্গে ইহ-পরলোকে প্রসারিত জীবনের পাপ-পুণ্য-মোক্ষ-ব্রহ্মত্বের কোন সম্পর্কসূত্র নেই। এদিকে দিয়ে বিচার করলে মঙ্গলকাব্যগুলো কেবল পুরোনো বিশ্বাস-সংস্কারের ক্ষতিকর লালনের সহায়ক হয়েছে, প্রগতির পথে উচ্চতর ও সূক্ষ্মতর চিন্তার, চেতনার ও মননের সহায়ক হয়নি। সভ্যতায় সংস্কৃতিতে কিংবা বৈষয়িক জীবনে উন্নয়ন-উৎকর্ষের সহায়ক হয়নি, এমন কি সাহিত্য-শিল্প হিসেবেও তেমন গড়ে ওঠেনি, ভরে তোলেনি মন ও মেজাজ। কিন্তু তবু তার মধ্যেও পড়েছে তুর্কী- শাসকদের শাস্ত্র, সমাজ, সংস্কৃতি, মনন ও সভ্যতার

প্রভাব, রয়েছে সে-প্রভাবের স্পষ্ট ছাপ। এ কথা বলবার আগে ওই বিদেশী বিজাতি বিধর্মী বিভাষী শাসক-প্রশাসকের প্রভাবের রূপ স্বরূপ সংক্ষেপে তুলে ধরা দরকার।

আগেই বলেছি, সে-যুগে কোন দেশে কোন শাস্ত্রে সমাজে জীবনাচারে কিংবা সরকারে অথবা সভ্যতা-সংস্কৃতিতে বা আচারে-আচরণে, মনে-মননে, নতুন চিন্তা-চেতনার উন্মেষ ঘটার-ঘটানোর জন্যে প্রয়োজন হত বিদেশী-বিজাতি-বিধর্মী-বিভাষীর সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সম্পর্কের। সে-যুগে তা সাধারণভাবে সম্ভব হত বিজেতা হিসেবে বিদেশীর আগমনে আর ক্বচিৎ কখনো বিদেশীর ধর্ম প্রচারের মাধ্যমে। বাণিজ্য সূত্রে যে পরিচিতি অনিবিড় ও সীমিত থাকে তার প্রমাণ ১৭৫৭ সনের পূর্বেকার য়ুরোপীয় বেণেরা। নতুন চেতনার উন্মেষ বিপরীত কিংবা উন্নতমানের চেতনার অভিঘাতেই সম্ভব। শাসক-শাসিতের প্রত্যক্ষ সম্পর্কের অবশ্যম্ভাবী উপজাত পরস্পরের ধর্মের, জীবনাদর্শের, সংস্কৃতির ও জীবনাচারের ঘনিষ্ঠ পরিচয়। সে পরিচয় সম্ভব হয় পরস্পরের অবৈষয়িক আলাপ-সংলাপের মাধ্যমে কিংবা লিখিত ভাষার শাস্ত্র সাহিত্য দর্শন ও ইতিহাস পাঠের ফলে। এজন্যে পরস্পরের কিংবা বিদেশাগতদের ভাষা জানা আবশ্যিক। প্রমাণ, তিনশ, বছর ধরে য়ুরোপীয় বেনেরা ভারতে যাতায়াত করলেও তাদের ভাষা জানা ছিল না বলে য়ুরোপ ছিল আমাদের অজ্ঞাত। ইংরেজী ভাষার মাধমে আমাদের ব্রিটিশ শাসকদের শাস্ত্র, সংস্কৃতি, শিল্প, সাহিত্য, দর্শন, বিজ্ঞান, ইতিহাস প্রভৃতির সঙ্গে ঘনিষ্ঠ পরিচয় হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে য়ুরোপের মন-মনন হল আমাদের অনুসরণ-অনুকরণের বিষয়, আর এভাবেই আমাদের মন-মনন হল প্রসারিত, আমাদের জীবনে মধ্যযুগীয় অমারজনীর হল অবসান, সূর্যোদয় ঘটল আমাদের মনোলোকে, চেতনার দিগন্ত হল অসীম, আমাদের উনিশ শতকী শহুরে শিক্ষিত জীবনে ও মননে ঘটল কালান্তর।

এমনি যুগান্তর সম্ভব হয়েছিল বাঙলাদেশে তুর্কী বিজয়েও কিঞ্চিন্ন্যূন আটশ' বছর আগে। তুর্কীর নিরাকার একেশ্বরবাদের, মননের ও সংস্কৃতি প্রভাবে যে নতুন চিন্তা-চেতনার উন্মেষ দেখা গেল, তাও পরবর্তীকালের ইংরেজ প্রভাবের মতো ছিল ব্যাপক ও গভীর। অদ্বৈতবাদ-ভক্তিবাদ-সন্তধর্ম-প্রেমবাদ-লৌকিকদেবতার জনপ্রিয়তা প্রভৃতি তারই প্রসূন। তাতে বিজ্ঞান-বুদ্ধি ছিল না বটে, কিন্তু উচ্চমার্গের তাত্ত্বিকচেতনা ছিল। তাতেও ছিল নতুন জ্ঞান-প্রজ্ঞার আলো। তার অবশ্য চোখধাঁধানো, মনজাগানো ঔজ্জ্বল্য ছিল না তেমন, তবে মানবতার, সংবেদনশীলতার ও নৈতিকবোধের স্নিগ্ধতা ছিল। সেদিনও নির্জিত-নিপীড়িত-শোষিত নির্বিত্ত নিম্নবর্ণের অবজ্ঞেয় মানুষের মনে মুক্তির আকাঙ্ক্ষা, আত্মমর্যাদার দাবি ও দ্রোহের সাহস জেগেছিল। সেদিনও শঙ্করীয়-রামমোহনী কায়দায় ধর্মতত্ত্বে নতুন ব্যাখ্যা মিলেছিল, ধরা পড়েছিল সমাজতত্ত্বে ফাঁকির ফাঁক। জন্মসূত্রে নয়, আত্মশক্তি আত্মপ্রত্যয় ও কর্মকুশলতা সূত্রেই যে জীবন-জীবিকা নিয়ন্ত্রিত, সম্ভব হয়েছিল সে-উপলব্ধিও। চিহিত হয়েছিল জুলুম, চিহ্নিত হয়েছিল জালিম ও মজলুম, জাতজন্ম-বর্ণ-ধর্ম-নিরপেক্ষ ও নির্বিশেষ ব্যক্তিমানুষের জীবনের ও জীবিকার ক্ষেত্রে সামর্থ্য ও অভিপ্রায় অনুসারে উন্মুক্ত হল সম্ভাবনার ও সাফল্যের, আত্মপ্রতিষ্ঠার ও আত্মপ্রসারের নানা পন্থা। শাস্ত্রের ও সমাজের জন্যে যে জীবন নয়,—জীবনের প্রতিষ্ঠা-প্রসারের জন্যেই যে শাস্ত্র ও সমাজ-নীতি, তাও হয়েছিল বোধগত। কেবল দীক্ষিত মুসলিমের কাছে নয়, আত্মপ্রত্যয়ী মানুষের জীবনে বাঞ্ছিত সাফল্য-সম্ভাবনা যে অশেষ, তা 'দেবদ্বিজবেদ', জুজুর মিথ্যা ভয়মুক্ত মানুষের কাছে আর অজানা রইল না। দক্ষিণ ভারতের ভক্তিধর্ম, তুর্কীপ্রভাবে উত্তরভারতের সন্তধর্ম, গৌড়ীয় নব-বৈষ্ণবের তথা চৈতন্যের প্রেমধর্ম তারই সাক্ষ্য। গণমানব-সমাজে লৌকিক দেবতার জনপ্রিয়তাও ছিল তেমনি আবর্তনশীলতা সত্ত্বেও

অজ্ঞ-অক্ষম মানুষের মুক্ত-প্রতিবেশে মানস-স্বাধীনতাবোধের পরিচায়ক। সেদিন ভারতে মানুষের জীবন-জিজ্ঞাসায় ও জগৎ ভাবনায় এভাবে ঘটেছিল যুগান্তর। ধর্মান্তরে, কর্মান্তরে-চিন্তাচেতনার রূপান্তরে, সাহিত্যে-শিল্পে-ভাস্কর্যে-স্থাপত্যে-সঙ্গীতে-শস্ত্রে-সমরে-পোশা প্রেশানে সর্বাত্মক পরিবর্তন ঘটেছিল তুর্কী-মুঘল শাসনকালে, যেমনটি ঘটেছিল পরবর্তী ব্রিটিশ কে-এ শাসনে শহরে-বন্দরে শিক্ষিত সমাজে এমনকি অশিক্ষিত বিত্তবানদের জীবনেও।

এ মানসমুক্তি স্বাতন্ত্র্যগর্বী অভিজাত উচ্চবিত্তের মধ্যে যত না ঘটেছিল, তার চেয়ে হাজারগুণ বেশি এসেছিল নিম্নবর্ণের ও নিম্নবিত্তের মানুষের মধ্যে। মুখ্যত তারাই বরণ করেছিল সন্তধর্ম, ভক্তিবাদ ও ইসলাম। এ গণমানবই সময় জীবনের সর্বক্ষেত্রে আত্ম-প্রকাশে ও আত্ম-বিকাশে হয় উৎসুক, উন্মুখ ও উদ্যোগী। তাই আমাদের শিল্পে -সাহিত্যে-ভাস্কর্যে-সঙ্গীতে গেঁয়ো গণমানবের প্রভাবই বেশি দেখা যায়। এ সাহিত্যে বাঞ্ছা, দৃষ্টি ও সৃষ্টি নতুন হওয়া সত্ত্বেও ভাব-ভাষা-বিষয় রূপরস-নীতি-আদর্শে, এক কথায় অঙ্গে ও অন্তরে সবটাই স্থূল, অপরিস্রুত, আবর্তিত ও নিম্নমানের হওয়ার মূরে রয়েছে স্বল্পবিত্তের ও গ্রাম্য মানুষের পরিচর্যা। এখানে দেবতা ও মানুষ হিংসা-ঈর্ষা-অসূয়া-রিরংসায় অভিন্ন এবং ছল চাতুরী প্রতারণায় পরস্পর প্রতিদ্বন্দ্বী। হর-গৌরী দরিদ্রতম গৃহস্থ প্রতীক। বাঙলার তুর্কী আমলে শিক্ষিত মনীষীর প্রতীক হলেন জাত-বর্ণ-শ্রেণী-দ্রোহী, স্রষ্টা ও সৃষ্টিপ্রেমবাদী চৈতন্যদেব আর মুঘল আমলে অশিক্ষিত মনীষার প্রসূন হল পীর-নারায়ণ সত্যের প্রতি আনুগত্যের ভিত্তিতে সমস্বার্থে সহিষ্ণুতায় সহযোগিতায় হিন্দু-মুসলিমের সহাবস্থানের অঙ্গীকার। ফারসী সাহিত্যের প্রভাবও এ সূত্রে স্মর্তব্য। বিষয়গত অনুবর্তন সত্ত্বেও মন-মননের প্রসার এ সাহিত্যে দুর্লক্ষ্য ছিল না। এমনি করেই ঘটল প্রাচীন যুগের মধ্যযুগে উত্তরণ—প্রাচীনতার সময়োপযোগী চাহিদানুগ রূপান্তর। যদিও সাহিত্যে পরিস্রুত দরবারী জৌলুস ও উৎকর্ষ ছিল দুর্লভ।

ইংরেজী প্রভাবে পরিবর্তন এসেছিল কেবল শহুরে মানুষের মননে ও আচরণে। কিন্তু তুর্কী মুঘল আমলে গাঁয়ে গঞ্জে, শহরে বন্দরে সর্বত্র সমভাবেই নড়ে উঠেছিল বৌদ্ধ ও ব্রাহ্মণ্য শাস্ত্রের আর সমাজের ভিত। পরিণামে সেন আমলের অবশিষ্ট নির্জিত দুস্থ বৌদ্ধরা হল ইসলামে আশ্রিত, ব্রাহ্মণ্যবাদী শাস্ত্রীর ও সমাজসর্দারদের হুকুম-হুমকি-হামলার শিকার নিম্নবর্ণের ও নিম্নবিত্তের বৃত্তিজীবী জলচল ও অস্পৃশ্য হিন্দুরাও বরণ করল ইসলাম। যেমনটি দাক্ষিণাত্যে ও অন্যত্র ইংরেজ আমলে এ শ্রেণীর লোক বরণ করেছিল খ্রীস্টধর্ম। সুযোগ সন্ধানী সুবিধেবাদী উচ্চ ও মধ্যশ্রেণীর বর্ণ হিন্দুরাও স্বল্প সংখ্যায় ইসলাম বরণ করেছিল রাজানুগ্রহ লোভে। ফলে ব্রাহ্মণ্য শাস্ত্র আর সমাজও ফাটলে ভাঙনে হয়েছিল হীনবল ও হৃতগৌরব। তখনো অবশ্য বসনে-ভূষণে, আচারে-আচরণে, ভাষায়-ভঙ্গিতে বাহ্য-প্রভাবটা ব্রিটিশ আমলের মতোই গাঁয়ের চেয়ে শহরে-বন্দরে শিক্ষিত সমাজেই ছিল প্রকট। সেকালের শিক্ষার বাহন তথা শাস্ত্র-সাহিত্য-দর্শন পুরাণাদি সর্ব প্রকার বিদ্যা বা জ্ঞানচর্চার মাধ্যম ছিল—এক কথায় শিক্ষিত লোকের ভাষা ছিল সংস্কৃত। কাজেই বৈদিক-প্রাকৃত-অবহট্ঠ হয়ে আসা বাঙলা বুলি যে লিখিত সাহিত্যের ভাষা হওয়ার যোগ্য বা তাকে সাহিত্য-শিল্পেরও বাহন করা বাঞ্ছনীয়, তা সেকালের কোন শিক্ষিত লোকের মনে জাগেনি। তুর্কী আমলে বর্ণ হিন্দু শাস্ত্রীর ও সমাজপতিদের রক্ত-চক্ষুর হামলার ভয় যখন চুকে গেল, তখন জনগণের লৌকিকদেবতার মাহাত্ম্যপ্রচার ও সমাজে-প্রতিষ্ঠা লক্ষ্যে স্বল্প শিক্ষিত লোকেরাই জনগণের জন্যে বাঙলাবুলিকে লেখ্যরূপ দিতে থাকেন। পাঁচালীগুলো লিখিত হয়েছে এভাবেই। তাই বলতে গেলে আঠারো শতক অবধি হিন্দুরা বাঙলায় ধর্মনিরপেক্ষ কোন বিশুদ্ধ ঐহিক বিষয়ক সাহিত্য সৃষ্টি করেনি।

মঙ্গল পাঁচালীগুলো মুখ্যত অরিদেবতাকে তোয়াজে তুষ্ট করার প্রয়াস জাত। কাজেই এসব দেবতার মধ্যে দেবতায় প্রত্যাশিত মহৎগুণের অভাব। এঁরা মানলোভী পূজাকামী, প্রতিশোধপ্রবণ, নিষ্ঠুর এবং জিগীষু। তবু এর মধ্যেও শাসক তুর্কীদের শাস্ত্রের, সমাজের, জীবনাদর্শে, জগৎ-চেতনার ও বিশিষ্ট মননের বা দর্শনের প্রভাব পড়েছে।

যেমন ধর্মমঙ্গলে ধর্ম-নিরঞ্জন হচ্ছেন—একেশ্বর তথা সর্বশক্তিমান একক-অদ্বৈতদেবতা (ধর্ম বসিল ধবল ঘাটে হৈয়া, শ্বেতকায়, গঙ্গারে পরমব্রহ্ম (ধর্ম) দিল দরশন।—বিপ্রদাস)। 'তাঁর প্রতি যার বিশ্বাস অকৃত্রিম ও গভীর, সে হয় অনুগৃহীত, হয় জীবনে-জগতে অজেয় এবং অসাধ্য সাধন, অপ্রাপ্য প্রাপ্তিতে হয় ধন্য ও কীর্তিমান। নায়ক লাউসেন তার প্রমাণ। তা'ছাড়া, গোটা কাহিনীতেও রয়েছে ইসলামী সাম্য-সমতার ছাপ। ধর্মঠাকুরের পাঁচালীতে অস্পৃশ্য ডোম থেকে, পথের কাঙাল থেকে সেনা-সামন্ত-রাজা সবারই রয়েছে ঠাঁই। বিস্তৃত সামাজিক প্রতিবেশে এ গ্রন্থ রচিত। তাই কুটির ও প্রাসাদ, যুদ্ধ ও ষড়যন্ত্র, ঈর্ষা-হিংসা-ঘৃণা, প্রতিরোধ-প্রতিশোধবাঞ্ছা, বাহুর বল ও সত্যের শক্তি, ক্ষমা-তিতীক্ষা-প্রতিহিংসা সব রয়েছে এবং কালু ডোম, লখাই ডোমনী আর ইছাই ঘোষ, সোম ঘোষ মহামদপাত্র পেয়েছে সমগুরুত্ব। অপর এক ধারার কাব্যের নায়ক ধনপতিসদাগর একেশ্বর তত্ত্বের প্রভাবে একক দেবতার পূজাতেই থাকতে চেয়েছে নিষ্ঠ। তার চরিত্র বল না থাকায় শৃঙ্খলমুক্তির লোভে এবং পুত্রের আশ্বাসে একেশ্বর তত্ত্ব আঁকড়ে থাকতে পারল না পশ্চিম বঙ্গের চণ্ডীমঙ্গলের নায়ক ধনপতি বেণে।

কিন্তু নদীবহুল পূর্ববঙ্গে পদ্মা-মেঘনা-ব্রহ্মপুত্রের তীরে যাদের জন্ম, তরঙ্গবিক্ষুব্ধ নদী বুকেই যাদের জীবিকা, ভাঙন-সঙ্কুল তীরবর্তী ঘরে যাদের জীবন, সে-মানুষের ধৈর্য, অধ্যবসায় ও সাহস না থাকলে চলে না, এমনি প্রতিবেশে মানুষ সংগ্রামী না হলে টিকতে পারে না। এমনি ধৈর্যবান অধ্যবসায়ী সাহসী ও সংগ্রামশীল মানুষের বৈচিত্র্যহীন আবর্তিত জীবনেও একেশ্বরতত্ত্বের প্রভাবে বিদ্যুতের মতো, স্ফুলিঙ্গের মতো একবার একটি মনে একটি গল্পে এককালে ও একস্থানে এক প্রত্যয়ী আত্মা জেগেছিল, সকল বাঁধন তুচ্ছ করে, 'জীবন মৃত্যুকে পায়ের ভৃত্য' করে প্রাণের, মানের, আদর্শের ও বিশ্বাসের প্রতিষ্ঠা চেয়েছিল—এমন আকাঙ্ক্ষা বিরলতায় অনন্য, এমন দ্রোহ অনুপম, এমন সাহস অতুল্য। ইসলামের সঙ্গে পরিচয়ের মুহূর্তে নতুন তত্ত্বের অভিঘাতে ওই একবার মাত্র—তার আগে বা পরে আর কখনো বাঙালী চরিত্রে তো নয়ই—বাঙালী চিত্তেও সাধ বা স্বপ্ন হিসেবেও আভাসিত হয়নি। কিংবদন্তীর তেত্রিশ কোটি দেবতার অনুগত বাঙালীর সন্তান চাঁদ বেণে বলে—'আমি শিবের উপাসক, ওই একজন ছাড়া অন্য কাউকে—কোন নারীদেবতাকে পূজো করব না আমি। 'যেই হাতে পূজি আমি দেব শূলপাণি। সেই হাতে পূজব আমি চেংমুড়ি কানি?' সর্বস্বান্ত হব, মরব, তবু মাথা নোয়াব না তার কাছে।' এদিকে অজগাঁয়ের অজ্ঞ অনক্ষর মাঠে-ঘাটে খালে-বিলে ঘুরে বেড়ানো নিতান্ত বালিকা বেহুলা—গেরস্থের মেয়ে, বিয়ে কি তা-ই বুঝবার বয়স ছিল না তার—সন্ধ্যায় বধূ হয়ে ঢুকল বাসর ঘরে আর বিধবা হয়ে ভোরে বলে উঠল 'আমি মানি না, আমার জীবন-যৌবন-দাম্পত্য ব্যর্থ করে দেবার অধিকার কারুর নেই সৃষ্টিরও নেই স্রষ্টারও নেই। আমি এ মৃত্যু স্বীকার করিনে'। এ সদ্যবিধবার শোকোচ্ছ্বাস নয়, এ অবুঝ বালিকার জেদের কথাও নয়, এ এক সংকল্পে অটল দৃপ্তা নারীর বিশ্বজগতের অনিয়ম ও স্বেচ্ছাচারিতার বিরুদ্ধে উচ্চকণ্ঠে প্রতিবাদ। চাঁদ-বেহুলার এ কাহিনী, এ দ্রোহ, এ পরিণাম, এ চরিত্র সাহিত্যজগতে দুর্লভ ও অনন্য।

মনসা মঙ্গলের কাহিনী দেব-মানবের সংগ্রামের কাহিনী। সে-সংগ্রামে দেব-মানবে সন্ধি হয়েছে, মানবভাগ্য পরাজয়ের গ্লানি বহন করেনি । এমন দ্রোহ কেউ কখনো কোথাও দেখেনি। এ সংগ্রামের মনুষ্যত্ব হয়েছে মহিমান্বিত। কেননা চাঁদ হার মানেনি। সে আত্মসমর্পণ করেছে এক বালিকার অতুল্য কৃচ্ছ সাধনার ও সিদ্ধির কাছে, প্রণাম জানিয়েছে ওই বালিকার ধৈর্য-অধ্যবসায়-জেদকে ও জয়কে—'বাম হস্তে পূজা আমি করিব তাহার।' চাঁদ-চরিত্র ইসলামের 'আল্লাহ ছাড়া কারুর কাছে মাথা নত না করার' বাণীই স্মরণ করিয়ে দেয়।

বাঙালী হিন্দুরা সাধারণভাবে পঞ্চোপাসক হলেও চরম ও পরম তত্ত্ব হিসেবে পরব্রহ্মকে তথা অদ্বৈততত্ত্বকে স্বীকার করে। মরমী কথায় তাই ভারতচন্দ্রের ভাষায় 'হরি হর বিধি তিন আমার (কালীর) শরীর। অভেদে যেজন ভজে সেই ভক্তবীর।'

অথবা, 'যেই হরি সেই হর, যেই কৃষ্ণ সেই কালী' এমনি উপলব্ধিও দুর্লভ নয়। তাই আদিতে মঙ্গল পাঁচালীর দেবতার স্বভাবে উগ্রতা, স্বার্থপরতা, সংকীর্ণতা ও অসহিষ্ণুতা থাকলেও ইসলামের একেশ্বরবাদের ও শঙ্করের অদ্বৈতবাদের পরোক্ষ প্রত্যক্ষ প্রভাবে দেবতারা সাধারণ ভাবে ভক্তবৎসল, সহিষ্ণু, উদার ও ক্ষমাশীল হয়ে ওঠেন—বিশেষত চৈতন্যমতবাদের প্রভাবে ভক্তির প্রলেপে স্নিগ্ধ হয়ে ওঠে পাঁচালী কাব্য।

মঙ্গলকাব্যগুলো দেবকাহিনী হলেও সে-দেবতার কথা এসেছে। মানুষেরই-বাঙালীরই আশা-প্রত্যাশার, সাফল্য-ব্যর্থতার, রোগ-শোকের, দুঃখ-বেদনার, সুখস্বস্তির, আনন্দ-যন্ত্রণার বাহন হিসেবে এবং বাঙালীরই জীবন-ভাবনার ও জগৎ-চেতনার অবলম্বনরূপে, তাদেরই জীবন-জীবিকার ক্ষেত্রে চাওয়া-পাওয়ার প্রয়োজনেই। কাজেই মঙ্গল কাব্যেও আমরা দেব-লীলার ফাঁকে ফুকুরে নয় কেবল, দোষে-গুণে দ্বেষে-দ্বন্দ্বে, সেবায়-সৌজন্যে, প্রেমে-ঘৃণায়, ক্ষমায়-প্রতিহিংসায়, নিষ্ঠুরতায়-করুণায়, কাঠিন্যে-কোমলতায়, মহত্ত্বে-ইতরতায়, লাবণ্যে-কৌৎসিত্যে, ছলনায়-সরলতায়, দারিদ্র্যে-ঐশ্বর্যে, কেড়ে নেয়ায়-বিলিয়ে দেয়ায় বিচিত্রভাবে প্রকটিত বাঙালীরই মুখ্য ভূমিকা প্রত্যক্ষ করি। কালু-লখাই-মহামদ-সোমঘোষ-ইছাইঘোষ-কর্ণসেন-রঞ্জাবতী-ফুল্লরা-মুরারিশীল-ভাঁড়ুদত্ত-খুল্লনা-লহনা-দুর্বলা-চাঁদ-বেহুলা-বড়াই-হীরা আর বাঙালীর হর-গৌরী, মনসা, চণ্ডী, সত্যপীর, দক্ষিণরায়, বড়খাঁগাজী, অথবা গাথার নদেরচাঁদ-মহুয়া-হোমনা-মদিনা-দুলাল-মলুয়া-আয়না-ফিরোজ-সখিনা—এঁরা আমাদের চিরচেনা ঘরের লোক, হাটে-বাটে-মাটে-ঘাটে-দেখা মানুষ—আমাদের চিরকালের প্রতিবেশী আত্মীয় আত্মজ বন্ধু বা শত্রু।

৪. চৈতন্য বিপ্লব : বাঙলার রেনেসাঁস

ইসলামের সঙ্গে পরিচয়ের ফলে দাক্ষিণাত্যে ও উত্তরাপথে যেভাবে একেশ্বরবাদ জ্ঞানবাদের, মায়াবাদের ও ভক্তিবাদের বাহন হয়ে শাস্ত্রে-সমাজে-মনে-মননে একাধারে ভাঙাগড়ার আলোড়ন সৃষ্টি করেছিল, তুর্কীবিজয়ের ফলে বাঙলাদেশেও তেমনি ভাববিপ্লব আর সামাজিক উপপ্লব দেখা দিয়েছিল। বাঙলাদেশেও তুর্কীবিজয়ের ফলে নির্বিশেষে বাঙালীচিত্তে নতুন চিন্তা-চেতনার, উদ্যোগ-আয়োজনের আর আবিষ্কার-উদ্ভাবনের বীজ উপ্ত হল। সমকালীন বাঙালী মনীষী-মনস্বীরা বাঙলার ব্রাহ্মণ্য সমাজে জলচল ও অস্পৃশ্য মানুষের দ্রোহ ঠেকানোর জন্যে, অসন্তোষ দূর করার লক্ষ্যে, শাস্ত্রের অনুগত রাখার গরজে, সমাজের ভাঙনরোধ কল্পে শাস্ত্রের, স্মৃতির ও ন্যায়াদি দর্শনের নতুন ভাবে চাহিদানুগ ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ করে, নতুন তাৎপর্য ব্যঞ্জনা আরোপ করে, গ্রহণ-বর্জন-সংশোধনের মাধ্যমে এবং মেল, কাপ, পটি বন্ধনের নতুন নিয়মনীতি

প্রবর্তনে ও প্রয়োগে বিদেশাগত ইসলামের অভিঘাত ঠেকানোর প্রয়াসী হয়। এ সূত্রে পনেরো শতকের রাঢ়ের দত্তখান বা দত্তখাস—কিংবদন্তীর সমীকরণ, জাতিমালা কাচারী ও বরেন্দ্রের উদয়নাচার্য ভাদুড়ীর 'পরিবর্ত মর্যাদা' নীতি স্মর্তব্য। এক্ষেত্রে স্মার্ত রঘুনন্দন ভট্টাচার্য, নৈয়ায়িক রঘুনাথ শিরোমণি, বুনো রামনাথ, মেলবন্ধন (১৪৮০ খ্রীঃ) রচয়িতা দেবীবর ঘটক, মহাবংশাবলীর (১৪৮৫ খ্রীঃ) ধ্রুবানন্দ মিশ্র, গোষ্ঠীকথা ও মেলবন্ধন রচয়িতা (১৫৪০ খ্রীঃ) নুলুপঞ্চানন প্রভৃতির ভূমিকা স্মরণীয়। রঘুনাথ তার্কিকশিরোমণি, জানকীনাথ ভট্টাচার্য চূড়ামণি, কানড় তর্কবাগীশ, হরিদাস ন্যায়ালঙ্কার, গঙ্গেশ প্রমুখ, এবং মিথিলার দশ শতকের পরবর্তী প্রজন্মের রঘুনাথ, ভবানন্দ সিদ্ধান্ত বাগীশ, মথুরানাথ তর্কবাগীশ, জগদীশ তর্কালঙ্কার, গদাধর ভট্টাচার্য প্রভৃতি উল্লেখ্য। তাহলেও মধ্যযুগে বাঙালীর শ্রেষ্ঠ ও গৌরবময় অতুল্য অবদান হচ্ছে নব-ন্যায় ও স্মৃতি রচন নব্যভাষ্য রচন ও সংস্কার সাধন। এক্ষেত্রে ন্যায় কন্দলী প্রণেতা দশ শতকের শ্রীধর, এগারো শতকের প্রখ্যাত পণ্ডিত, মন্ত্রী ভট্ট ভবদেব, বারো শতকের জীমূতবাহন, বল্লাল সেনের গুরু অনুরুদ্ধ, রাজা বল্লাল সেন, হলায়ুধমিশ্র, শূলপাণি, শ্রীনাথ, রামভদ্র প্রমুখের দানও স্মর্তব্য। এখানে উল্লেখ্য যে, "বাংলায় ও মিথিলায় অনুশীলিত নব্যন্যায় বৌদ্ধ ন্যায়শাস্ত্রেরই অনুবৃত্তি"।[২৩]

ষোলশতকের বাঙালীর ন্যায়-স্মৃতি আলোচনার এ কৃতিত্বকে ইসলামের ও মুসলিম সংস্কৃতির মোকাবেলায় হিন্দুর সতর্ক মানসচেতনার ও চিৎপ্রকর্ষের সাক্ষ্য ও স্বাক্ষর বলেও বিবেচনা করা চলে। বঙ্কিমচন্দ্র বলেছেন, 'পাঠান শাসনকালে বাঙালীর মানসিক দীপ্তি অধিকতর উজ্জ্বল হইয়াছিল। পঞ্চদশ-ষোড়শ শতাব্দীতে বাঙালীর জ্যোতিতে বাঙলার যেরূপ মুখোজ্জ্বল হইয়াছিল সেরূপ তৎপূর্বে বা তৎপরে আর কখনো হয় নাই।[২৪] দক্ষিণ ও উত্তর ভারতের শাস্ত্রীদের স্বধর্মীর ও স্বসমাজের ভাঙন রোধের প্রয়াসের মতো বাঙালী শাস্ত্রীর ও সমাজপতিদের শাস্ত্রে সমাজে গণমানবকে ধরে রাখার প্রয়াস যখন ব্যর্থ হবার মুখে তখনই তরুণ ব্রাহ্মণ পণ্ডিত ইউসুফের মতো অসামান্য আঙ্গিকরূপ, অতুল্য ব্যক্তিত্ব ও অনন্য মনীষা নিয়ে হিন্দু সমাজের ভাঙন ও ইসলামের প্রসার রোধে এগিয়ে এলেন। সন্ত-আন্দোলনের প্রচ্ছায় যেমন উত্তরভারতীয় ব্রাহ্মণ্যসমাজ ভেঙেও কার্যত অখণ্ড ব্রাহ্মণ্য জাতিসত্তা রক্ষা করল, তেমনি বাঙলায়ও চৈতন্যদেব সেদিন হিন্দুজাতির ত্রাণকর্তা বা জাতীয় সত্তার রক্ষক রূপে দেখা দিলেন, যদিও তাঁর নতুন মতবাদ ছিল বেদধর্ম বিরোধী (হেন মহাঠাকুরাণী ভাব যার মনে উপজয়, বেদধর্ম তেজি সে কৃষ্ণক ভজয়।) চৈতন্য-দেবের মুখ্য ঐতিহাসিক ভূমিকা সম্বন্ধে ডক্টর আবু মহামেদ হবিবুল্লাহ বলেন : "চেতন্যদেবের বৈষ্ণব আন্দোলন যে হিন্দুর সমাজ সংরক্ষণেরই ইসলাম প্রতিরোধক পরোক্ষ আন্দোলন, এ সিদ্ধান্ত নিয়ে আজ আর তর্ক নেই। কেবল বৌদ্ধ ও অনুরূপ শ্রেণীকেই নয়, ধর্মান্তরিত হিন্দুকেও সমাজে পূনর্গ্রহণের উপায় হিসাবে যে প্রেম ও ভ্রাতৃত্বের আহ্বান ধ্বনিত হয়েছিল, তার যে প্রত্যাশিত ফলও পাওয়া গিয়েছিল, তার প্রমাণের অভাব নাই। ষোল শতক থেকেই বাঙলায় ইসলামের অব্যাহত প্রসার রুদ্ধ হয়ে গেছে, এ কথা হয় তো তাই বলা যায়'।[২৫]

সেকালের মানুষের জীবন-জীবিকা, নিবদ্ধ থাকত গাঁয়ের পরিসরেই। তাদের বহির্বিশ্বও ছিল হাট-বাজার আর এলাকার কয়েক ক্রোশের চৌহদ্দী। সাধারণ মানুষের চাওয়া-পাওয়া বর্ণে ও বৃত্তিতে বিন্যস্ত সমাজে অন্ন-বস্ত্রভিত্তিক বলে তাদের আকাঙ্ক্ষাও ছিল ক্ষুদ্র ও তুচ্ছ। তা ছাড়া পথও ছিল দুর্গম, দূরতিক্রম্য ও দস্যুসংকুল। তাই গাঁ-গঞ্জ ছিল বহির্জগৎ থেকে বিচ্ছিন্ন। নগর-বন্দরের সমীর ও সংবাদ গাঁয়ের উচ্চবিত্তের শিক্ষিত লোকের কাছে পৌঁছতেও সময় লাগত।

তবু সেকালেও আত্মপ্রত্যয়ী উচ্চাভিলাষী রাজকুমারেরা ছিল, ছিল অভিযাত্রী বণিকপুত্র, ছিল ভাগ্যান্বেষী-উচ্চাভিলাষী উদ্যোগী পুরুষ, ছিল কৌতূহলী দুঃসাহী নিরুদ্দেশ পর্যটক, আরো ছিল পুণ্যার্থী শাস্ত্রপ্রচারক ও তীর্থযাত্রী। পিতৃহীন তরুণ দরিদ্র বিশ্বম্ভর পিতৃপুরুষের সম্পদের সন্ধানে সিলেট গিয়েছিলেন, পথ পরিক্রমায় তাঁর সময় লেগেছিল দু বছর।

লোকনাথ-কেন্দ্রী বৌদ্ধ ভক্তিধর্মের ঐতিহ্য ছিল বাঙালীর। ভক্তি চর্যা গুরুনির্ভর। গুরুবাদও বৌদ্ধ ঐতিহ্যের সাক্ষ্য। ভারতী, পুরী, আনন্দ, গিরি, তীর্থ প্রভৃতি বিভিন্ন গুরুবাদী ভক্ত বৈরাগীর সঙ্গেও তাঁর নদীয়ায় সাক্ষাৎ হত। কেশব ভারতীয় ও ঈশ্বরপুরীর প্রতি শ্রদ্ধাবান ছিলেন চৈতন্যদেব। অন্যান্য পণ্ডিত সংসর্গও তিনি পেয়েছিলেন বিতর্ক ও অধ্যাপনা-পেশা সূত্রে। আর শাসকের শাস্ত্র সমাজ, রীতিনীতি ও জীবনাদর্শ সম্বন্ধে জিজ্ঞাসাও ছিল তাঁর।

উল্লেখ্য যে পনেরো শতক থেকেই ইসলামী শাস্ত্র-সংস্কৃতির ও জীবনাদর্শের আকস্মিক অভিঘাতজাত বিমূঢ়তা বিমোচন করে স্বস্থ ও সুস্থভাবে স্বদেশের, স্বধর্মের, স্বজাতির ও স্বসংস্কৃতির রূপ-স্বরূপ বুঝবার ও বুঝাবার প্রয়াসী হন বাঙালীরা। চণ্ডীদাস, কৃত্তিবাস, মালাধর, বসু, বিপ্রদাস, বিজয়গুপ্ত প্রভৃতির রচনা এসূত্রে স্মতর্ব্য। বলেছি, চৈতন্যদেব উত্তরভারতীয় ভক্তিবাদী সন্তদের আদলে বাঙলার ব্রাহ্মণ্য সমাজের ভাঙন-রোধে এগিয়ে এলেন বটে, তবে তাঁর মনীষারও মৌলিক অবদান রয়েছে এতে। 'নামে রুচি আর জীবে দয়া' —এ সাধারণ নীতিরও গভীরে রয়েছে মানুষের প্রাণের মূল্য, সামাজিক মর্যাদাবোধ ও মনুষ্যত্বের মহিমা-চেতনা। তাই তাঁর পক্ষে 'নরে নারায়ণ ও জীবে ব্রহ্মদর্শন' সহজেই সম্ভব হয়েছিল : তাঁর মুখেই উচ্চারিত হয় 'চণ্ডালোহপি দ্বিজশ্রেষ্ঠ হরিভক্তি পরায়ণঃ' এবং ভক্তি এই প্রথম প্রেমে উন্নীত ও মহিমান্বিত হয়। ভক্ত-ভগবানের সম্পর্ক হচ্ছে সেবক-সেবিতের, পূজ্য-পূজারীর, দাস-প্রভুর আর প্রেমিক-প্রেমাস্পদের সম্পর্ক হচ্ছে শ্রদ্ধা-ভক্তি, ভয়-ব্যবধান, সংকোচ-শরম, ঘৃণা-লজ্জা, মান-অপমান, উঁচু-নীচু, চেতনা-বিহীন সমকক্ষের, সহচরের, অভিন্ন হৃদয়ের, মনের ও মতের। কাজেই এ চেতনায়ও মানুষের মাহাত্ম্য তথা সৃষ্টির মর্যাদা স্রষ্টার মর্যাদার তুল্য হয়ে উঠল প্রেমের বন্ধনে। এমনিভাবে মানুষ ও মনুষ্যত্ব সম্বন্ধে নিম্নমানের চিন্তা-চেতনা সম্পন্ন বাঙালী চৈতন্য-প্রভাবে কেবল হৃদয়বান, বিবেকবান, প্রীতিপ্রবণ হল না, মানুষ নির্বিশেষকে নারায়ণের প্রমূর্তপ্রতীক রূপে প্রত্যক্ষ করে মানুষের ও মনুষ্যত্বের প্রতি হল শ্রদ্ধাবান এবং নরের সেবাই, নরের প্রতি প্রীতিই নারায়ণসেবার ও নারায়ণ-প্রীতির যে শ্রেষ্ঠ মাধ্যম, তাও হল উপলব্ধ। বাঙালীর সংস্কারে বৌদ্ধ-ঐতিহ্য সুপ্ত ছিল বলে ইসলামের ও সূফী-মতের প্রভাবে চৈতন্যচিত্তে যে চেতনার ও মননের বীজ উপ্ত হল দেশ-কাল-সমাজের প্রয়োজনে, তা সহজেই প্রভাবিত করেছিল বাঙালীকে, যদিও চৈতন্যের গৌড়ীয় নববৈষ্ণববাদে দীক্ষা দিয়েছিল খুব কম-সংখ্যক বাঙালীই।

জীবাত্মা পরমাত্মারই অংশ। তাই খণ্ড জীবাত্মা অখণ্ড পরামাত্মায় ফিরে যাওয়ার জন্যে ব্যাকুল। তাই মনুষ্যাত্মা রূপ রাধা 'আজিও কাঁদিছে হৃদয় কুটিরে'। ক্ষণে-ক্ষণে তাই হৃদয়ের মনের ও চেতনার গভীরে পরমাত্মার বিরহবোধ অনুভব করে মানুষ। খণ্ড জীবাত্মা অখণ্ডে লীন হয়ে তার অনশ্বর অস্তিত্ব সম্বন্ধে নিশ্চিন্ত হতে চায়। পরমাত্মার জন্যে এ বিরহবোধই ধ্বনিত হয়েছে সূফী-বৈষ্ণব-বাউলের গানে। মিলনের—পাওয়ার আকূতিই তাকে পথে নামায়—বিবাগী করে। এজন্যেই এ সম্পর্ক একান্তই প্রেমিক-প্রেমিকার, ভক্ত-ভবগানের, সেবক-সেবিতের, দাস-প্রভুর কিংবা বান্দা-মনিবের, পিতা-পুত্রের বা মাতা-সন্তানের নয়। এ ধারণা ভারতীয় ঐতিহ্যে ছিল না, ছিল ইরানে। উদ্দীপক সাকীর ইশক-শরাব পরিবেশন মাধ্যমে আশেক-

মাশুকের প্রেমানুভব ও প্রেমাভিভূতিই কাম্য। এ হচ্ছে 'ভাবসম্মিলন'। এভাবে জাগে ফানাফিল্লাহর— আত্মলীনের ও বাকাবিল্লাহর—একাত্মতার আকাঙ্ক্ষা ও কল্পনানুভূতি। বড়াইয়ের দৌত্যে রাধা-কৃষ্ণের প্রণয়, ভাবসম্মিলনে যুগলরূপে ও অভেদরূপে আত্মসত্তার অনুভূতি, পরিণামে একাত্মবোধে আনালহক-সোহ হক্-চেতনায় আত্মতৃপ্তিই (তুলঃ 'মুই সেই মুই সেই'—চৈতন্যোক্তি) এ সাধনার লক্ষ্য। এছাড়াও ব্যক্তিক, পারিবারিক ও সামাজিক সম্পর্কেও বিনয়ের এবং প্রীতির অনুশীলন, নামকীর্তন জীবে দয়া, বর্ণভেদপ্রথার বিলোপ, তালাক, পুনর্বিবাহ, নামে রুচি, দশা, সখীভাব, ঐশ্বর্য প্রদর্শন, রাগাত্মিকা ও রাগানুগাভক্তি, সর্বোপরি 'অচিন্ত্য দ্বৈত-অদ্বৈত' চেতনা প্রভৃতি প্রত্যক্ষভাবে সূফীদের পাপী-তাপীর প্রতি করুণা, যিকর, খিদমত, ইসলামী সাম্য, নারীর অধিকার, সমা, হাল্ সদাসোহাগ, কিরামত, তরিকত, হকিকত, মারফত প্রভৃতি সাধন পর্যায় (তুলঃ পূর্বরাগ-অনুরাগ-বংশী-বিরহ প্রভৃতি) এবং ইসলামী স্রষ্টা-সৃষ্টি দ্বৈত তত্ত্বের প্রত্যক্ষ প্রভাবজ বা অনুকৃতি-অনুসৃতি। এ প্রসঙ্গে উল্লেখ যে ডক্টর মুহম্মদ এনামুল হকের সূফী-বৈষ্ণবতত্ত্বের এবং সূফী-বৈষ্ণব সাহিত্যের তুলনা জ্ঞাপক আলোচনা ও বিশ্লেষণ সর্বাংশে সবার পক্ষে গ্রহণযোগ্য না হলেও জিজ্ঞাসার সীমা অবশ্যই বাড়ায়।[২৬] তাই 'পরিশিষ্ট খ'-এ তা বিধৃত হল।

ষোল শতকের গোড়ার দিকে বাঙলায় নববৈষ্ণবমতের উদ্ভবে যে ভাববিপ্লব দেখা দিল, তার প্রভাবে গণমনের সংকীর্ণতা ও ক্রুর সাম্প্রদায়িকতা হ্রাস পেয়েছিল। উদার মানবিকবোধের উন্মেষে বাঙালীর চিত্তলোক প্রসারিত, রুচি বিকশিত এবং সহিষ্ণুতা ব্যাপক হয়েছিল। চৈতন্যোত্তরযুগের মঙ্গলপাঁচালীগুলোর দেবতায় ও মানুষের মননে ও আচরণে তা প্রকটিত হয়েছিল। এ সময়ে বৈষ্ণবমত যারা এড়িয়ে চলেছিল, তাদেরও চিত্ত হরণ করেছিল রাধা-কৃষ্ণ-লীলার মহিমা। কামে-প্রেমে-অধ্যাত্মচেতনায় তাই বৈষ্ণব ও অবৈষ্ণব নির্বিশেষে স্ব স্ব অনুভবের অভিব্যক্তির অবলম্বন হিসেবে রাধা-কৃষ্ণকে স্মরণ ও শরণ করেছে। গোটা তিন শতক ধরে 'হিন্দু-মুসলিমে, বাউলে-বৈষ্ণবে রাধা' ছাড়া সাধা ছিল না। ছিল না 'কানু' ছাড়া গীত। প্রেমিক অর্থে কালা, প্রেমিকা নির্দেশক 'রাই' সাধারণ কাম-প্রেমগীতিরও নায়ক-নায়িকা ছিল।

নরে নারায়ণ দর্শন কিংবা জীবে ব্রহ্মের স্থিতি ও প্রতিরূপ অনুভব করা যুগের রীতি-রেওয়াজ হয়ে দাঁড়িয়েছিল, ষোল শতকের শেষপাদে সমাজে, ধর্মে ও রাষ্ট্রশাসনে আকবরের উদারনীতি ও বোধ আরো উজ্জীবিত ও প্রসারিত করেছিল। তাই ষোল শতক বাঙালীজীবনে ছোটখাট রেনেসাঁসের যুগ। মানুষ যে শুধু আশায়-আকাঙ্ক্ষায়, অভিপ্রায়-অভিলাষ পূরণ-প্রেরণায়, জয়ের আনন্দে জাগে তা নয়; আকস্মিক ও অনভিপ্রেত আঘাতে-ক্ষতিতে, গ্লানির যন্ত্রণায়, দলিত হবার ক্ষোভেও রুখে দাঁড়ায়, আসন্ন-আপন্ন বিপদ-চেতনায়ও জাগে, বিপন্মুক্তির হৃতমান উদ্ধারের ও দুঃখমোচনের গরজেও যে উদ্যম-শক্তি-সাহস-আত্মপ্রত্যয় জাগে, আত্মরক্ষার ও জিগীষার প্রণোদনা জাগে তার প্রমাণ বিরুদ্ধ প্রতিবেশে ভারতবর্ষের ও বাঙলাদেশের এ সব ভাববিপ্লব, যার ফলে জখম হলেও, মচকালেও, সত্তায় ও শক্তিতে টিকে রইল হিন্দুর শাস্ত্র, সমাজ, সংস্কৃতি, ঐতিহ্য ও জাতিনাম। এ রেনেসাঁস একান্তই বৈষ্ণবের। এ প্রাণ-প্রাচুর্য চৈতন্যদেবেরই দান, তাই অবৈষ্ণব-হিন্দু মুসলিম এ বিপ্লব-বন্যার তোড়ে বিমূঢ় ও স্তব্ধ হয়ে গিয়েছিল। এর ফলে পনেরোশ' বিশ থেকে আশি অবধি প্রায় ষাট বছরের পরিসরে অবৈষ্ণবের রচনা বিরল। এ তাদের মানস বন্ধ্যাত্বের কাল।

তেরো শতকের শুরু থেকে তুর্কী প্রভাবের প্রথম দান : বাঙলায় লৌকিক ও পৌরাণিক দেবতা বিষয়ে বাঙলায় মৌখিক ও লিখিত সাহিত্য সৃষ্টির শুরু : বড়চণ্ডীদাস, কৃত্তিবাস, মালাধর বসু, কানাহরিদত্ত, বিজয়গুপ্ত, বিপ্রদাস পিপিলাই প্রভৃতির আবির্ভাব।

দ্বিতীয় দান : নতুন মানসিক-শাস্ত্রিক-সাংস্কৃতিক-সামাজিক প্রতিবেশে বাঙলায় ব্রাহ্মণ্য ধর্মের ও সমাজের সংস্কার প্রয়াস এবং হিন্দু-মনে নতুন জীবন-স্বপ্নের উন্মেষ— 'গৌড়েতে' ব্রাহ্মণ রাজা হবে হেন আছে।'—স্বজাতির ও স্বসমাজের স্বতন্ত্র ও স্বাধীন সত্তার পুনরুদ্ধার কামনা। এর তৃতীয় দান : উত্তরভারতিক সন্তধর্মের অনুকরণে-অনুসরণে কিন্তু ঔপনিষদিক অদ্বৈত তত্ত্বের মূলগত পরিবর্তনে অচিন্ত্য দ্বৈতাদ্বৈততত্ত্বের ও স্রষ্টা-সৃষ্টির প্রেম-তত্ত্বের উদ্ভাবন ও প্রতিষ্ঠা। চিন্তা-চেতনার এ বিপ্লবের উপজাত হচ্ছে মেল-কাপ-পটি বন্ধনে জাতিমালা কাচারীর সাহায্যে 'পরিবর্তন মর্যাদা' বিন্যাসে সর্বোপরি নব ন্যায়ের ও নব স্মৃতির শাসনে ব্রাহ্মণ্য সমাজকে দৃঢ়ভিত্তিক করার কালিক প্রয়োজনে বাঙালী হিন্দু-মনীষার আকস্মিক স্ফূরণ ও বিস্ময়কর উৎকর্ষ। অবশ্য ব্রাহ্মণ্যসমাজ বাঁধন যত শক্ত করতে চাইল, ছিঁড়বার আশঙ্কা ততই বাড়ল। সে-আশঙ্কা ভিন্ন পথে দূর করলেন চৈতন্যদেব, তাঁর কাছে সেদিনকার ব্রাহ্মণ্য জাতির ঋণ অশেষ অপরিশোধ্য। এ-ও সত্য যে চৈতন্যদেব প্রচারিত ভগবৎ প্রেম, মানবপ্রীতি, সাম্য, বৈরাগ্য, মানুষের মর্যাদা, মনুষ্যত্বের মহিমা, ক্ষমার ও করুণার দেশনা বৈষ্ণবের জীবনে ও সমাজে বেশিদিন স্থায়ী হয়নি। বৈষ্ণবরা একটা সম্প্রদায় হয়েই রইল, পরিণামে বাঙলায় মানুষে মানুষে মত-পথের ব্যবধানের একটা নতুন প্রাচীর গড়ে উঠল মাত্র। লক্ষ্যে কেই-বা কয়দিন স্থির থাকে, যে-কোন নীতি-আদর্শের তাৎপর্য আর ব্যঞ্জনাও কালে উবে যায়!

চৈতন্যদেবের অচিন্ত্য দ্বৈতাদ্বৈততত্ত্ব যে বেদান্ত-প্রভাবিত দ্বৈতবাদী সূফীর অদ্বৈতসিদ্ধি লক্ষ্যে উদ্ভাসিত তত্ত্বের প্রভাবজ, তা প্রমাণের অপেক্ষা রাখে না। এক্ষেত্রে তাই কোরআনিক দ্বৈত এবং বৈদান্তিক অদ্বৈত এক আশ্চর্য সূক্ষ্মতায় সমন্বিত হয়েছে।

পূর্বেই বলা হয়েছে আরব-তুর্কীবিজয়ের ফলে বৈদান্তিক অদ্বৈত ব্রহ্মতত্ত্বে আস্থা রাখা সম্ভব হয়নি কারুর পক্ষেই। তাই স্রষ্টা-সৃষ্টি নিয়ে ভাস্করের ভেদাভেদ তত্ত্বের, রামানুজের বিশিষ্টাদ্বৈততত্ত্বের, নিম্বার্কের দ্বৈতাদ্বৈত তত্ত্বের, মাধবের দ্বৈততত্ত্বের, বল্লভের শুদ্ধাদ্বৈততত্ত্বের এবং চৈতন্যের অচিন্ত্যদ্বৈতাদ্বৈততত্ত্বের উদ্ভব। সূফী-বৈষ্ণবের মতে সৃষ্টি ও স্রষ্টা ভিন্নও বটে, আবার অভিন্নও বটে। যেমন জল আর তরঙ্গ অভিন্ন বটে, কেননা জলবিহীন তরঙ্গ নেই, কিন্তু তরঙ্গেরও একটা স্বতন্ত্র রূপ কল্পনা করা সম্ভব। তেমনি সূর্যবিহীন রোদ হয় না বটে, তবে রোদ ও সূর্যকে অভেদ ও পৃথক করে কল্পনা করা যায়। কিন্তু এককভাবে কোনটাই তথ্য বা সত্য নয়, —এজন্য এ দ্বৈত-অদ্বৈত সত্তা অচিন্ত্য। তাত্ত্বিক কবি হাজী মুহম্মদ (১৬-১৭ শতক) তাঁর 'নূরজামাল বা সুরতনামায়' এ দ্বৈত-অদ্বৈত বোধের একটা লোকগ্রাহ্য ব্যাখ্যা দিয়েছেন :

বীজ হোন্তে বৃক্ষ যেন বৃক্ষ হোন্তে ফল।
ফল বৃক্ষ বীজ—এ তিন নাম হয়
একে হয় তিন জান তিনে এক হয়।
বীজ বৃক্ষ ফল হোন্তে কেহ ভিন্ন নয়।
কিন্তু – তথাপি ফলেরে বৃক্ষ কহন না যায়।
তেমন জানিও যে আল্লাহ আর বান্দা
আল্লাহ হোন্তে বান্দা সব হইয়াছে পয়দা।
গাছ আর ফল যেন হয় এক কায়

তথাপি ফলের দুঃখে গাছ দুঃখী নয়।
তেন রূপে জানিও বান্দা আর খোদায়। ...
দরিয়ার পানি যেন গোরকি উথলে
গোরকিক দরিয়া কেহ কভু নাহি বোলে!
তবু সিন্ধু ঢেউ সিন্ধু হোন্তে কেহ ভিন্ন নহে।
বান্দার মরণে কভু খোদা না মরয়।
পুষ্পের মধ্যেতে গন্ধ গন্ধেতে স্বরূপ।

কৃষ্ণদাস কবিরাজও বলেন :

রাধা পূর্ণশক্তি কৃষ্ণ পূর্ণশক্তিমান
দুই বস্তু ভেদ নাহি শাস্ত্র পরমাণ।
মৃগমদ তার গন্ধ যৈছে অবিছেদ
অগ্নিজ্বালাতে যৈছে নাহি কভু ভেদ।
রাধাকৃষ্ণ তৈছে সদা—একই স্বরূপ
লীলারস আস্বাদিতে ধরে দুই রূপ।

বাঙলাদেশের ইতিহাসে চৈতন্যদেব একজন চিন্তানায়ক, সমাজনেতা, শাস্ত্র-সংস্কারক, ধর্ম-প্রবর্তক, যুগস্রষ্টা, অসামান্য পুরুষ। চৈতন্য ধর্মান্দোলনের প্রত্যক্ষ ফলস্বরূপ আমরা গ্রাম্যতাদুষ্ট-ভাষায় রচিত পাঁচালী সাহিত্যের পাশে ভাবে-অনুভবে চিন্তা-চেতনার সূক্ষ্মতায় মনন-উৎকর্ষে অঙ্গে-অন্তরে, ভাষায়-ভঙ্গিতে বৈষ্ণব গীতিকবিতা বৈশ্বিক সম্পদ হয়ে রয়েছে। বাঙলা ভাষায় সূক্ষ্ম দার্শনিক চিন্তামূলক তত্ত্ব গ্রন্থও বৈষ্ণবের দান। আগেই বলেছি চৈতন্য মতবাদের প্রভাবে রাধা-কৃষ্ণ প্রণয়লীলা মহিমান্বিত হয়ে ভগবৎ-সাধনার মাধ্যম হয়ে ওঠে। বাঙালী নির্বিশেষে এই রূপক রস আস্বাদনে হয় ধন্য। রাধার কান্তাভাবের অনুকরণে দশমহাবিদ্যা প্রতীক ভয়ঙ্কর শক্তির আধার কালী-দুর্গা-উমা এই বৈষ্ণব ভক্তি বা প্রেমবাদের প্রভাবে স্নেহময়ী মাতৃরূপে সন্তানবৎসলা জগজ্জনীতে রূপান্তর পেয়ে শাক্ত পদাবলীর অবলম্বন হয়েছেন এবং যাঁর অনুধ্যানে ও উপাসনায় উনিশ শতকে রামকৃষ্ণ নরকল্যাণকামী প্রেমিক। নরসেবার ও মানবপ্রীতির উদাত্তবাণী যাঁর মুখে সদা উচ্চারিত এবং আজো প্রতিধ্বনিত। বৌদ্ধযুগের বিলুপ্তপ্রায় সহজিয়া এবং বাউল মতও বৈষ্ণবমতের আশ্রয়ে ও প্রভাবে উজ্জীবিত হয়ে ওঠে। ব্রজবুলি ভাষার প্রতিষ্ঠা ও প্রসারও বৈষ্ণব পদাকারদের দান। অবৈষ্ণব চট্টগ্রামী হিন্দুদের এবং মুসলিম কবির রাধাকৃষ্ণ বিষয়ক পদাবলীও বৈষ্ণব প্রভাবের গভীরতার ও ব্যাপকতার সাক্ষ্য।

তথ্যনির্দেশ

১. ভারতীয় দর্শনের ভূমিকা, সুরেন্দ্রনাথ দাসগুপ্ত, পৃ. ১৭।
২. Tagore without illusions, Hitendra Mitra, p. 5.
৩. প্রাচীন বাংলা ও বাঙালী, সুকুমার সেন, পৃ, ৩০।
৪. প্রাচীন বাংলা ও বাঙালী, সুকুমার সেন. পৃ. ৩১।
৫. বাঙলার নবজাগৃতি ১ম সং. পৃ. ১২১-২৪।
৬. Influence of Islam on India Culture, pp. 111-12, 114, 115, 119-20.
৭. ভারতদর্শন সার, পৃ. ৬৪-৬৭, ২৬৭, ২৯২।

৮. বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস, ৩য় সং. পূর্বার্ধ, পৃ. ১৪৫।

৯. সুরজিৎ দাশগুপ্তকে লিখিত পত্র, 'পরিচয়' সেপ্টেম্বর ১৯৭ সন, পৃ. ৫৭-৫৮, ৬৪; চিঠির তারিখ ১১/৭/৫২-১/৫/৫২ সন।

১০. বাঙালীর ইতিহাস (আদিপর্ব)।

১১. মধ্যযুগের বাংলা ও বাঙালী।

১২. লক্ষ্মণ সেনের পুত্রদের অনুশাসনে উল্লেখসূত্রে; বঙ্গভূমিকা পৃ. ২১৩।

১৩. বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত, ১ম খণ্ড, পৃ. ২৭।

১৪. মল্লসারুলে প্রাপ্ত তাম্রলিপির উল্লেখসূত্রে নিধনপুর তাম্রপট্ট, সুকুমার সেন উদ্ধৃত বঙ্গভূমিকা, পৃ. ১৬৯।

১৫. বিস্তৃত আলোচনার জন্যে আমার বাঙালী ও বাঙলা সাহিত্য, পৃ. ৫৯-৬৫, ৮৭-১১৫; বাউলতত্ত্ব, পৃ. ১-৫১। দ্রষ্টব্য।

১৬. বাংলা সাহিত্যের কথা, ১ম খণ্ড, প্রাচীনযুগ, পৃ. ১৭, ২২, ২৮।

১৭. গোর্খবিজয়ের ভূমিকা।

১৮. তদেব পৃ. ১-ক।

১৯-২২. বঙ্গভূমিকা : সুকুমার সেন. পৃ. ১৭২-৭৪; দৃষ্টান্ত সমূহ—পরিশিষ্ট 'ক' দেখুন।

২৩. বঙ্গভূমিকা ঐ. পৃ. ১৫৩।

২৪. বাঙালীর ইতিহাস (প্রবন্ধ)।

২৫. সমাজ সংস্কৃতি ও ইতিহাস ; আবু মহামেদ হবিবুল্লাহ, ১ম সং. পৃ. ১৪৮-৪৯।

২৬. মনীষা-মঞ্জুষা, ১ম সং. পৃ. ৪৮-৫৪। মুসলিম বাঙ্গলাসাহিত্য, ১ম সং, ১৯৫৫ সন, পৃ. ৫০-৫১।

পরিশিষ্ট 'ক' ১৯-২২ সংখ্যক তথ্যের দৃষ্টান্তসমূহ

চর্যাগীতিতে	১.	জাহের বাণ চিহ্ন রুব ণ জানি।	[২৯ সং]
দোঁহায়	২.	নাদ ণ বিন্দু রবি ণ শশিমণ্ডল	[৩০ সং]
	৩.	মাররে জোইআ মূসাপবণা জেণ তুটএ অবণাগবণা	[২১ সং]
	৪.	অসরিরি কোই সরিরহি লুক্কো জো তাই জানই সো তাই মুক্কো।	
	৫.	ঘরে আচ্ছই বাহিরে পুচ্ছই পই দেকখই পড়িবেশী পুচ্ছই।	
	৬.	গঙ্গা জউনা মাঝেঁর বহই নাও	[১৪. সং]
	৭.	পঞ্চতথাগত কিঅ কেড় আল বাহঅ কাজ কাহ্নিল মাআজাল	[১৩ সং]
	৮.	এত্থু সে চাঁদ দিবাকার/দেহ সরিসহ তিখ মই সুই অণণ ন দীটঠও— — সরহ	
	৯.	অনহা ডমরু বাজও চীর নাদে	[১১ সং]
	১০.	ক. জোইনি তই বিনু খনহিঁ ন জীবমি খ. তুলো ডোম্বি হঁও কাপালী	[৪সং] [১০সং]
	১১.	কাআ নাবড়ি ঘান্টি মন কেড়ুআল	[৩৮ সং]

পরবর্তীকালের রচনায় এগুলোর প্রতিধ্বনি :

১. দেখিতে না পারি যারে তারে বলি শূন্য। সৈয়দ সুলতান [জ্ঞান প্রদীপ]

২. আপনে শূন্যকার আছে সৃষ্টিকর্তা ঐ

৩. বিন্দু বিন্দু নাদ বিন্দু নহে ভিন্নভিন্ন
শিব-শক্তি দোহ এক ভিন্নমাত্র নাম
শিব ধরিতে শক্তির লিঙ্গেত বিশ্রাম। ঐ

৪. বাউ ত করহ নর আয়ুর উদ্দেশ ঐ

৫. ঘটে ঘটে ব্যাপিত আছএ নৈরাকার ঐ

৬. আমার মনের মানুষ আছে মনে ....। ঐ

৭. শূন্যময় করতার শূন্যে বাঁধা ঘর
শূন্যে উঠে শব্দ, মিশে শূন্যের ভিতর
শূন্যে জিউ শূন্যে পিউ শূন্যে সব জিন্দা—শেখচান্দ

৮. তনের গুরু মন মনের গুরু পবন
পবনের গুরু শূন্য, শূন্যের গুরু নির্গুণ। ঐ

৯. আউট হস্ত নৌকার প্রবন্ধর কাণ্ডারী।
বাসত্তর দেব সঙ্গে মন ইচ্ছার পাড়ি। ঐ

১০. উজানে উজায় নৌকা লাহুতেত থানা
আমনা গমনা করে শূন্যে উড়ে মনা। শেখচান্দ [তালিব নামা/হর-গৌরী সম্বাদ]

১১. চন্দ্রসূর্য কামবিন্দু শরীর মাঝার
অনাহত পুরুষ পরাণপুরে বাস
এ ঘরের দশ দুয়ার করিল প্রকাশ। ঐ

১২. [শুক্র] টলে জীব, অটলে ঈশ্বর
তার [শুক্রের] মধ্য খেলা করে রসিক শেখর—বাউল গান।

১২.ক. ঈশ্বর পুরাণ (অনাদি) জ্ঞান সেই এক দম
সে দমতু হইয়াছে এ দুই আলম। শেক মনসুর [শির্নামা]

১৩. বায়ুতে করহ নর আয়ুর উদ্দেশ্য—সৈয়দ সুলতান।
[দেহে] অনাহত শব্দ উঠে করি হুলস্থুল
কাসা করতাল শব্দ আনন্দ বহুল। ঐ

১৪. শূন্যরূপে এক আল্লা সতত উজ্জ্বল
নাম শূন্য কাম শূন্য শূন্যে যার স্থিতি
সে শূন্যের সঙ্গে করে ফকির পিরীতি।
শূন্যেত পরম হংস শূন্যে ব্রহ্মজ্ঞান
যথাতে পরম হংস তথা যোগধ্যান। ....
শূন্য সিন্ধু হস্তে ব্যক্ত রূপের সাগর। আলি রজা [আগম-জ্ঞানসাগর]

১৫. পরকীয়া সঙ্গে যোগ্য প্রেমের মানস। ঐ

১৬. কায়া হয় কামিনী পুরুষ হয় মন
মন হয় রমণী পুরুষ নিরঞ্জন। ঐ

১৭. মন স্থির তো বচন স্থির/পবন স্থির তো বিন্দু স্থির
বিন্দু স্থির তো কন্ধ স্থির/বলে গোরখদেব সকল থির। [হঠযোগপ্রদীপিকা]

১৮. শব্দ স্থির হয় যদি স্থির হয় মন
মন স্থির হন্তে অতি স্থির হয় তন। [আলি রজা]
তন স্থির হন্তে হয় কায়ার সাধান।
১৯. পাগল করিল গোরক্ষ দিয়া শূন্যজ্ঞান—ফয়জুল্লাহ [গোরক্ষবিজয়]
২০. শূন্যমন্ত্র শুনাইয়া করিব পাগল। ঐ
২১. মন হয় পবন, পবন হয় সাঞি। ঐ

রূপক সাংকেতিক তত্ত্ব ও ধাঁধা-হেঁয়ালির নমুনা :

১. রুখের তেন্তরি কুম্ভীরে খাই। ২. বলদ বিআঅল গবিআ বাঁঝে। ৩. বেঙ্গস সাপ বঢ়িল জাঅ। ৪. জো সো চোরা সোই সাধু। ৫. নিতি-নিতি সিয়াল সিহসম জুঝে। ৬. পিটা দুহিএ এতিন সাঁঝে।—চর্যাগীতি

২. পুকুরের পানি নাই পাড় কেন ডুবে
বাসা ঘরে ডিম্ব নাই ছাও কেন উড়ে।
নগরে মনুষ্য নাই ঘরে ঘরে চাল
আন্ধলে দোকান দিয়া খরিদ করে কাল। [গোরক্ষ বিজয়]

২. গুরু মীননাথের উল্টা উল্টা ধারা
পুকুর মুড়ে ধান শুকাইয়া উগার তলে বাড়া। ঐ

৩. মরা মানুষে ভাত রান্ধে জীতা মানুষের পেটে। ঐ

৪. পুতকীর দুগ্ধে সিন্ধু উথলিল পর্বত ভাসিয়া যায়
শুষ্ক কাষ্ঠ ছিল পল্লব মুঞ্জরিল পাষাণ বিঁধিল ঘুণে।
[অনিল পুরাণ সহদেবচক্রবর্তী]

৫. সাপের মাথায় ভেকের নাচারি ... বৈষ্ণব সহজিয়া পদ
৬. মাকড়সার জাল মাতঙ্গ বাধিলে ... ঐ
৭. জলেতে নামিবি নীর না ছুঁইবি .. ঐ
৮. মৃত্তিকার উপর জলের বসতি তাহার উপরে ঢেউ ... ঐ
৯. তোরা না হইবি সতী, না হইবি অসতী ... ঐ

১০. আমার বাড়ীর কাছে আরশীনগর
তথা এক পড়শী বসত করে বাউল গান

১১. আমার জন্মের ষোল বছর পরে পিতার জন্ম হল ঐ

১২. উঠন ঠন ঠন করে রে ভাই ঘরে জলের ঢেউ ঐ
নৈরামনি নিরঞ্জনে পায়না খুঁজে কেউ। ঐ ইত্যাদি।

১৩. মশার লাথিতে পর্বত ভাঙ্গিল/ক্ষুদ্র পিপীলিকার হাসি
অনেক যতনে নৌকা বাঁধিনু/কাঁকড়া ধরিল কাছি।

১৪. সরিষা ভিজাইতে জলবিন্দু নাই/ডুবিল দেউল চূড়া।

১৫. আজো শেষকথা হচ্ছে বিরোচনোক্ত : 'দেহই সত্য, তারই পূজা করবে/কেননা, যা আছে দেহভাণ্ডে, তা-ই আছে ব্রহ্মাণ্ডে/এবং 'সখিগো, জন্ম মৃত্যু যাহার নাই/তার সনে প্রেম গো চাই/উপাসনা নাই গো তার। দেহের সাধন সর্বসার/তীর্থ ব্রত যার জন্যে/এ দেহে তার সব মিলে।' [সহজিয়াপদ]

উত্তর ভারতের সন্ত-কবীর-রচিত গানেও মেলে চর্যাগীতির ভাব ও ছাপ :

১. বৈল বিয়াই গাই ভঈ বাঁঝ/বছরা দুহৈ তীনু্য সাঁঝ/মাস পসারী চীহলর খবারী মুসা কেবট নাব বিলাইয়া/মীড়ক সৌবৈ পহরইয়া।

২. দেখত সিংহ চরাবত গাঈ/জলকি মুছলি তরুবর ব্যাঈ। ইত্যাদি।

পরিশিষ্ট 'খ'

এ প্রসঙ্গে ডক্টর মুহম্মদ এনামুল হকের মত ও মন্তব্য সবার পক্ষে সর্বাংশে গ্রহণযোগ্য না হলেও—এর নতুনত্বের জন্যে আর সূফীমতের ও চর্যার সাদৃশ্যজ্ঞাপক আলোচনা বলে এখানে উল্লেখ্য : রাধাকৃষ্ণ প্রেমলীলাই শ্রীকৃষ্ণকীর্তন কাব্যের একমাত্র উপজীব্য। পদাবলীর উপজীব্য ও রাধাকৃষ্ণের প্রেমলীলা। এই লীলার বর্ণনা 'কৃষ্ণ কীর্তনে' কাহিনীভিত্তিক হইলেও পদাবলীর ন্যায় শ্রীকৃষ্ণকীর্তন পদসর্বস্ব। এই কাব্যে উল্লেখযোগ্য পাত্র-পাত্রীর সংখ্যা মাত্র তিনটি; তাঁহারা হইতেছেন রাধা, কৃষ্ণ ও বড়াই। প্রেমাস্পদের ভূমিকায় রাধা এবং উভয়ের মধ্যে প্রেম ঘটাইয়া দেওয়ার সহায়করূপে বড়াই পরিকল্পিত। ...প্রকৃতপক্ষে ইহা হৃদয়ধর্মী গীতিকাব্য; প্রেমই ইহার প্রধান উপজীব্য। ...এই কথা কয়টি মনে রাখিয়া ...চিন্তা করিলে দেখিতে পাই, সূফীদের গজলের মতই কৃষ্ণকীর্তন খণ্ড খণ্ড পদের সমষ্টি এবং তাঁদের ইশকতত্ত্বই যেন প্রেমরূপে ইহার মূল প্রেরণা যোগাইয়াছে। ইহার কৃষ্ণ যেমন সূফীদের আশিক রূপে দেখা দিয়াছে, রাধিকা-ও তেমন মশুক-রূপে আবির্ভূতা হইয়াছে, আবার বড়াইও তেমন সূফীতত্ত্বের 'রাবিতা' বা প্রেমিক প্রেমাস্পদের মধ্যে মিলন ঘটাইবার যোগসূত্র 'পীর-ই-মগাঁ' বা সিদ্ধিলব্ধ গুরুরূপে চিত্রিত হইয়াছে। ... কৃষ্ণকীর্তনের শেষ দুই খণ্ড অর্থাৎ 'বংশী' ও 'বিরহ' খণ্ড ...সূফীদের 'দিল-আজারী' ও জুদায়ী-পরিকল্পনার একটি সুস্পষ্ট ছবি মানস মুকুরে ভাসিয়া উঠে। ...সূফী কবিদের ইউসুফ-জুলেখা, লাইলী-মজনু, শিরি-ফরহাদ ও পদ্মাবতীর ন্যায় শ্রীকৃষ্ণকীর্তনও একটি রূপক কাব্য। ...মুসলিম সূফীতত্ত্ব প্রভাবিত প্রাণধর্মী 'গজলিয়াৎ' জাতীয় গীতিধারা বৈষ্ণবদের পদাবলী সাহিত্যে স্ফূর্ত ও মূর্ত হইয়া উঠিয়াছিল।

সূফীদের গজলিয়াৎ এবং বৈষ্ণবদের পদাবলী শুধু সমার্থক নহে, আধ্যাত্মিকতা, ভাবৈশ্বর্য ও আঙ্গিকের দিক হইতে অনেকখানি এক। সূফীসাহিত্যের ইশক্ যেমন 'মৈয়' ও শরাবের প্রতীক গ্রহণ করিয়া শাকীর মারফতে সরাইখানার কক্ষে কক্ষে পরিবেশিত হইয়াছে, বৈষ্ণবপদাবলীর প্রেমও তেমন পিরীতির বেশে 'মান' অভিমানের রূপ ধরিয়া গোপিনীদের মধ্যস্থতায় বৃন্দাবনের কুঞ্জে কুঞ্জে ছড়াইয়া পড়িয়াছে। সূফী-সাহিত্যের আশিক ও মাশুক বুৎ ও বুৎগর অথবা শমা ও পরওয়ানা বৈষ্ণব পদাবলীতে রাধা ও কৃষ্ণের প্রতীক লইয়া আত্মপ্রকাশ করিয়াছে। ...এই রাধা জীবাত্মার এবং এই কৃষ্ণ পরমাত্মার প্রতীক, কৃষ্ণের বাঁশরী জীবাত্মার প্রতি পরমাত্মার ডাক, এই দুইয়ের মিলনের অন্তরায়স্বরূপ ঐহিক জীবনের সংসার ধর্ম, মধ্যখানে 'যমুনা নদী' রূপে বিরাট ব্যবধান সৃষ্টি করিয়াছে। জীবনের পরপার হইতে কৃষ্ণরূপী পরমাত্মার বংশী ধ্বনি ভাসিয়া আসিয়া রাধারূপী জীবাত্মার জীবনের ঘাটে পৌছিয়াছে, আর মানবাত্মাকে পরমাত্মার সহিত মিলনের জন্য উতলা করিয়া তুলিয়াছে। ...এই যে রাধা, এই যে কৃষ্ণ, এই যে যমুনা, এই যে বাঁশী—ইহাদের সহিত পৌরাণিক রাধাকৃষ্ণের সম্বন্ধ কোথায়? ....সূফী কবিদের হাতে 'মানুষ' 'পরওয়ানা' বা আশিক সাজিয়াছে, আর সে বৈষ্ণব-কবিদের হাতে 'রাধিকা' বা প্রেমিকা বনিয়াছে। সূফী কবিদের 'সুজ ও সাজ বা প্রেমের আকূতি, হিজরান নামে আত্মপ্রকাশ করিয়া যেমন পাঠকের নয়ন-কোণে আসুর আবির্ভাব ঘটাইয়াছে বৈষ্ণব

কবিদের 'বিরহবেদনা' বা 'পিরীতি-আরতি', 'মাথুর' আখ্যায় চিহ্নিত হইয়া তেমনই সকল বাঙালীকে কাঁদাইয়াছে। ... কালিন্দীনদীর অপর পাড়ে অবস্থিত কৃষ্ণের বাঁশরী লীলা দেখাইবার জন্য বংশীধ্বনি অবলম্বনে বৈষ্ণবকবির যেই বিরাট পদাবলী সাহিত্য রচিত হইয়াছে তাহার মর্মার্থ ও প্রতীক, মৌলানা জালালুদ্দিন রুমীর (১২০৭-৭৩ খ্রীঃ) সুবিখ্যাত 'বাঁশরীবেদন' কবিতার মর্মার্থ ও প্রতীক অবিকল এক, দেশ ভেদে কেবল ভাষাভেদ ও রূপভেদ ঘটাইয়াছে—এইটুকুই পার্থক্য। সূফীদের শিষ্য-প্রশিষ্যরা যেমন পারশ্যে তাজকিরা-ই আউলিয়া এবং ভারতবর্ষে সুত্তযানহ্-ই উমরী বা সাধক জীবনের কাহিনী লিখিয়াছেন, বাংলার বৈষ্ণবরাও তেমনি চৈতন্য প্রমুখ বৈষ্ণবসাধকের জীবন-কাহিনী লিখিয়া 'মহাজনচরিত' নাম দিয়াছেন। ...এই জীবনীগলিতে ব্যবহৃত 'মহাজন' ও 'আউলিয়া' শব্দ একবারে সমার্থবোধক। ....স্মরণ রাখিতে হইবে 'ঐশ্বর্য' ও 'কিরামৎ' শব্দ দুইটি শুধু সমার্থবোধক নহে, একটি যেন আর একটির অনুবাদ।' [মনীষামঞ্জুষা, বাঙলাসাহিত্যের মুসলিম প্রভাব, ১ম সং. পৃ. ৪৮-৫৪।]

অনত্র : 'নামেরুচি, জীবেদয়া'—ইহাই গৌড়ীয় বৈষ্ণবমতের মূলশাস্ত্র। ... গৌড়ীয় বৈষ্ণবদের এই 'নামে রুচি ও জীবে দয়া' মুসলিম সূফী সাধকদের 'জিক্র' ও 'খিদমৎ' নীতির নামান্তর। ইহাতে ইসলামের সাম্য, উদারতা ও ভ্রাতৃত্বের ছাপও সুস্পষ্ট। সূফীদের 'সমা' বৈষ্ণবদের 'কীর্তনে' কোন তফাৎ নাই। এই কীর্তনের শেষে বৈষ্ণবদের যে দশা হয়, তাহাতে যে শারীরিক ও মানসিক অবস্থা ফুটিয়া ওঠে, সূফীদের 'হালের' অবস্থানও তাহাই। কীর্তন ও সমা, এবং দশা ও হাল শব্দার্থ, ভাব, সম্পাদন-ব্যবস্থা ও মানসিক অনুভূতির দিক হইতে একই বস্তুর অভিব্যক্তি গৌড়ীয় বৈষ্ণবদের প্রেম, সূফীদের 'ইশক', 'রাধা-কৃষ্ণ' সূফীদের 'সাকী' ও বুৎ কিংবা 'শারআ' ও 'পরওয়ানা' 'ঐশ্বর্য' সূফীদের কিয়ামৎ ছাড়া আর কিছুই নহে।" [মুসলিম বাঙ্গলাসাহিত্য, ১ম সং, ১৯৫৫ সন, পৃ. ৫০-৫১।]

মধ্যযুগের বাঙলা সাহিত্যে চিন্তা-চেতনার বিবর্তনধারা

মধ্য এশিয়ার তুর্কী-মুঘলরা কিংবা ইরানী শিয়া সুলতানরা ভারতে রাজত্ব করতে এসেছিলেন, কাজেই শাসনে-প্রশাসনে-প্রজাপালনে পোষণে কিংবা শোষণে-পীড়নে তাঁদের লক্ষ্য ছিল প্রজার আনুগত্য অবিচল রাখা। মানুষের ধর্ম বিশ্বাসের স্থিতি হচ্ছে তার মর্মমূলে। তাই এর রক্ষার জন্যে মানুষ জান-মাল-গর্দান দিতে রাজি থাকে। এ ক্ষেত্রে মানুষ হুকুম-হুমকি-হামলায়-দলনে-দমনে মন-মত বদলায় না প্রায়। আত্মহনন তুল্য জেনেই রাজা-রাজনীতিকরা স্বধর্মপ্রীতিবশে পরধর্ম হরণে বৃথা আগ্রহী হয় না, অন্তত প্রত্যক্ষে কখনো নয়। তাই তুর্কী-মুঘল আমলে উত্তর ভারতে, শিয়া সুলতানদের আমলে দাক্ষিণাত্যে রাজশক্তি ইসলাম প্রচারে উদ্যোগী হয়নি। যদিও তাঁরা জানতেন, স্বধর্মীর সংখ্যা বাড়লে রাজার ও রাজ-গোষ্ঠীর সমর্থক সংখ্যাও বাড়ে এবং তাতে দীর্ঘস্থায়ী হয়ে গোষ্ঠীশাসন।

আমরা জানি বহুকাল ধরে পাঞ্জাব অবধি অঞ্চল ছিল পারস্য সাম্রাজ্যের অংশ, পরে হল গ্রীক-শক-কৃষাণ শাসিত রাজ্য। বিদেশী বিধর্মী-বিভাষীবিজাতি শাসনকালে এ এলাকার বৌদ্ধ ও ব্রাহ্মণ্য শাস্ত্রে, সমাজে নিয়মনীতিতে, প্রথায়-পদ্ধতিতে, আচার-আচরণে হয়তো শৈথিল্য বা বিকৃতি দেখা দিয়েছিল। এগারো শতকেও আলবিরুনী এখানকার লোকের শাস্ত্রে সর্ব প্রকার অজ্ঞতার নিন্দা করেছিলেন। ফলে সিন্ধু-মুলতান-গান্ধার অবধি ইসলামের প্রসার ছিল প্রায়

অবাধ। কিন্তু ভারতের অন্যত্র ব্রাহ্মণ্য শাস্ত্র ও সমাজ ছিল নরপতির, শাস্ত্রীর ও সমাজ-সর্দারের কঠোর নিয়ন্ত্রণে, শ্রুতি-স্মৃতি-গীতা-পুরাণের অনুশাসনের আনুগত্যে আশৈশব অভ্যস্ত উচ্চবর্ণের এবং উচ্চ-মধ্যশ্রেণীর মানুষ আর জলচল শূদ্র তাই ইসলামের সাম্যে-সৌন্দর্যে একেশ্বরের আকর্ষণে কিংবা রাজশক্তির কৃপা-করুণা লোভে সহজে টলেনি। ছয়-সাতশ বছর ধরে তুর্কী-আফগান-মুঘল-ইরানীরা এদেশ শাসন করেছে, তবু রাজধানীতে কিংবা নগরে-বন্দরে মুসলিম-সংখ্যা বৃদ্ধি পায়নি, চিরকালই সংখ্যালঘুই থেকে গেছে। রাজশক্তি যে ইসলাম প্রচারে সহায় হয়নি, এটিই তার পাথুরে প্রমাণ।

বাঙলায় ইসলাম, মুসলিম ও সূফী

বাঙলাদেশে তথা ভারতবর্ষে ইসলাম-প্রচারক ছিলেন মুখ্যত পীর-দরবেশরা। এঁরা ছিলেন সাধারণভাবে অধ্যাত্মপন্থী, গুরুবাদী ও মরমী। শরীয়ত তাঁদের কাছে অধ্যাত্মসিদ্ধির বা সাধনার চার স্তরের বা পর্যায়ের মধ্যে প্রথম স্তর বা পর্যায়। শরীয়ত তাদের কাছে শেষ নয়, শুরু মাত্র। এজন্যে তাদের চোখে শরীয়তের গুরুত্ব সামান্য।

আবার এ প্রচারক সূফী-পীর-দরবেশরা ছিলেন বিদেশী ও বিভাষী। ভাষার বাধা যে কেবল জানা-বোঝার সঙ্কট সৃষ্টি করেছিল, তা নয়। মনে-মননেও ব্যবধান রেখেছিল দুরতিক্রম্য। তা সত্ত্বেও ইসলামে আকর্ষণ ও দীক্ষা ছিল অব্যাহত। ব্রিটিশ ভারতে য়ুরোপীয় প্রচারকরা যে-সব গুণে ও উপায়ে দুস্থ জনমানবকে আকৃষ্ট করতেন, সূফী-পীর-দরবেশরা সে-পন্থায় নয়, জনগণের হৃদয় জয় করেছিলেন তাঁরা স্ব স্ব ব্যক্তিত্বের, চরিত্রের ও আচরণের অনন্য লাবণ্যে ও ঔজ্জ্বল্যে।

সূফী-পীর দরবেশরা ছিলেন লোকচক্ষে সিদ্ধ সাধক পুরুষ। তাঁরা ছিলেন অলৌকিক শক্তিধর—ত্রিকালদ্রষ্টা, তাঁদের সুপারিশে আল্লাহ পাপী-তাপী রুগ্ন-দুস্থের দুঃখ মোচন করেন, আশা-আকাঙ্ক্ষা পূরণ করেন, আরো দেন কর্মে সাফল্য। পরবর্তীকালের খ্রীস্টান মিশনারীদের মতো তাঁদেরও ছিল সেবাব্রত, অধ্যবসায় এবং প্রীতি ও করুণা। কিরামতি ছাড়াও তাঁরা খানকা, সরাই, চিকিৎসালয়, লঙ্গরখানা প্রভৃতির মাধ্যমে দুস্থ মানবতার সেবা যেমন করতেন, তেমনি ঝাড়-ফুঁক, তাবিজ-কচ দিয়ে দূর করতেন তাঁদের আপদ-বালাই। বিপদে আপদে সুনিশ্চিত সহায় জেনে গাঁয়ের গঞ্জের দরিদ্র অজ্ঞ অসহায় মানুষ তাঁদেরকেই স্মরণ ও শরণ করত। তাদেরই হত আশ্রিত। তাঁদের সেবা-সহায়তা, কৃপা-করুণা আর মাঙ্গলিক কিরামতিই ছিল জনগণের বল-ভরসার আকর। ভাবেই গাঁয়ের-গঞ্জের দরিদ্র মানুষকে আকৃষ্ট করেছেন তাঁরা। লোকের ভক্তি ও শ্রদ্ধাই ছিল তাঁদের ইসলাম প্রচারের পুঁজি। প্রমাণ বাঙলায় আগত প্রথম দরবেশ বলে ঐতিহাসিকভাবে স্বীকৃত জালালউদ্দীন তাবরেজী। হলায়ুধ মিশ্র এঁরই মাহাত্ম্য কীর্তন করেছেন, 'শেখ শুভোদয়া' গ্রন্থে। এটাই প্রথম পীরকাব্য এবং রাজা লক্ষ্মণ সেনও এঁর ব্যক্তিত্বে, কিরামতিতে ছিলেন মুগ্ধ। শহুর মানুষ হচ্ছে ফিকিরের ফকির। তারা নানা কারণে সাত ঘাটের ঘা-খাওয়া, নানা আগুনে পোড়খাওয়া, মতলববাজ মানুষ। গ্রামের সরল মানুষের মতো তারা আবেগতাড়িত কিংবা বিবেকচালিত মানুষ নয়। সেজন্যে শহুরে মানুষ ভাব-অনুভবজাত অবৈষয়িক নীতি-আদর্শের আবেদনে-নিবেদনে সহজে সাড়া দেয় না, কাক-শেয়ালের সতর্কতা নিয়ে তারা চলে, বলে এবং করে। শহুরে মানুষ সংখ্যায় কম, আর গাঁয়ে বিদ্বান ও বিত্তবান মানুষের সংখ্যা চিরকালই নগণ্য। কাজেই গাঁয়েই প্রচারকদের সাফল্য ছিল বেশি। পরবর্তীকাল খ্রীস্টধর্ম প্রচারকরাও সহজে দীক্ষিত করেছে নিম্নবর্ণের এবং নির্বিত্ত

নিম্নবৃত্তির নির্জিত মানুষকেই। বাঙলাদেশের গাঁয়ে-গঞ্জে শহরে বন্দরে যে-সব সূফী-পীর-দরবেশ ইসলাম প্রচার করেছেন, তাঁদের প্রধানদের নাম, দরগাহ ও কিছু কিছু পরিচিতি আজো টিকে রয়েছে। এতে বাঙলাদেশে ইসলামের প্রসারের কাল ও কারণ সম্বন্ধে একটা স্থূল অথচ কেজো ধারণা পাওয়া যায়।

সূফী-পীর-দরবেশদের কাছে দীক্ষিত বলে গোড়ার দিকে আরবী শেখার ও শরীয়তী আচার-আচরণ জানার সুযোগ পায়নি দেশজ দীক্ষিত মুসলিমেরা। তারা মুখে মুখে যা শুনেছে, কানে কানে যা রেখে গেছে, গাঁয়ে-গঞ্জে মুসলিমের স্বল্প সংখ্যার দরুন, তা-ই বহু প্রজন্ম ধরে শ্রুতি-স্মৃতি নির্ভর হয়ে চালু থেকেছে। এ জন্যেই শরীয়তী ইসলামের অজ্ঞাত অবিধেয় হলেও গুরুবাদী বৌদ্ধ-হিন্দু প্রভাবে পীরবাদও বাঙলার ইসলামের সমকালীন। বস্তুত পীরের 'দেশনাই ছিল ব্যক্তির অবশ্য পালনীয় ধর্মকর্ম'। আজো কোরআন-হাদিসের বাণীর চেয়ে বেশি গুরুত্ব পায় পীরের মৌখিক পরামর্শ ও নির্দেশ। বৌদ্ধ স্থবির ও পীর একার্থবোধক—জ্ঞান-প্রজ্ঞা-অভিজ্ঞতা সম্পন্ন বৃদ্ধ পুরুষ। পীরবাদী বলেই বাঙলার তথা ভারতের মুসলিমরা আচরণে না হলেও অন্তরে মানে যে, মারফতী অর্থাৎ অধ্যাত্মসিদ্ধিই ব্যক্তির লক্ষ্য। এদের কাছে ইসলাম শরীয়তে শেষ নয়—তরিকত, হকিকত স্তর বা মঞ্জিল অতিক্রমণে মারফতে উত্তরণেই পূর্ণতা।

বলেছি গাঁ-গঞ্জের অস্পৃশ্য ও জলচল প্রজন্মক্রমে নির্দিষ্ট ক্ষুদ্র বৃত্তিজীবী শূদ্ররাই মুখ্যত ইসলাম বরণ করেছিল। এরা ছিল পুরুষানুক্রমে নিঃস্ব বা দরিদ্র ও অজ্ঞ এবং শাস্ত্রিক, সামাজিক, নৈতিক, শৈক্ষিক ও সাংস্কৃতিক আচার-আচরণের মৌল মানবিক অধিকার থেকে চিরবঞ্চিত। শিল্পবিপ্লবের মতো কিছু তখন ঘটেনি বলেই যন্ত্র বিরল সে-যুগের অপরিবর্তিত জীবিকা ও হাতিয়ার নির্ভর মানুষ মুসলমান হয়েও পেশা-বদল করার সুযোগ পায়নি বললেই চলে। তাই তাঁতী মুসলিম হয়ে হল জুলাহা, হাড়ি-ডোম-বাগদী-চাঁড়াল-ব্যাধ নামান্তরে হল জেলে-নিকেরী, কাহার, কশাই, মুলুঙ্গী, রঙরেজ, মুজারী, কাগজী, মণ্ডল, বিশ্বাস, সর্দার প্রভৃতি। না ঘুচল তাদের অশিক্ষা, না ঘুচল তাদের দারিদ্র্য। এদের কথাই Robert Orme তাঁর 'Historical Fragments of Mugal Empire' গ্রন্থে বলেছেন, The Moors of Indostan may be divided into two kinds of people differing in every respect ...Under the first are reckoned the descendants of the conquerors. The second rank of Moors comprehends all the descendants of coverted Gentoos—a miserable race as none but the most miserables of the Gentoos castes are capable of changing their religion.'

†বৌদ্ধ যুগেও বর্ণেবিন্যস্ত ব্রাহ্মণ্যসমাজে শূদ্র শ্রেণীর শিক্ষার ঐতিহ্য ও অধিকার ছিল না বলে (এপ্রসঙ্গে সেনরাজাদের সর্বশ্রেণীর শূদ্রের শিক্ষায় অধিকারহরণ স্মর্তব্য) মুসলিম হয়েও এরা শিক্ষা গ্রহণে আগ্রহী হয়নি। তবে ব্যতিক্রম অবশ্যই ছিল! ওই শিক্ষিতরাই পরবর্তীকালে স্বল্প সংখ্যায় মোল্লা-মৌলবী-মুয়াজ্জিন, আকন্দ-খোন্দকার, মুন্সী, উকিল, আমিন, পাটওয়ারী, বিশ্বাস, কাজী হয়েছে এবং বিত্তশালী হয়ে কৃত্রিম উপায়ে খান্দানীও হয়েছে। এখনো যেমন হচ্ছে। তবু তাদের সংখ্যা লাখে দশবিশ জনের বেশি ছিল না। শিক্ষা চিরকালই সীমিত ছিল দু এক শ্রেণীর ব্রাহ্মণে, কায়স্থে ও বৈদ্যে-অন্য কায়েত বৈদ্য-বামুনও ছিল অনক্ষর-অশিক্ষিত।

গোড়ার দিকে অর্থাৎ তেরো-চৌদ্দ শতকে সব গাঁয়ে মুসলিম ছিল না। থাকলেও একটা দুটো পরিবার হয়তো। এভাবে অনুমান করলে তেরো শতকে দুচার হাজারে একজন দেশজ মুসলমান, চৌদ্দ শতকে শতকরা তিন জন, পনেরো শতকে শতকরা পাঁচজন, ষোল শতকে

শতকরা দশ জন, সতেরো শতকে বিশ, আঠারো শতকে ত্রিশ এবং উনিশ শতকের ১৮৭১ সনের আদম শুমারী অনুসারে বাঙলা সুবায় মুসলিম জনসংখ্যা ছিল গড়ে শতকরা বত্রিশজন।[২]

কাজেই মুসলিমরা গাঁয়ে ছিল সংখ্যায় স্বল্প, এবং জীবন-জীবিকার সর্বক্ষেত্রে ছিল বর্ণহিন্দু জমিদার-মহাজন-দোকানদার ও প্রশাসনিক নিয়ন্ত্রিত এবং অন্যান্য বৃত্তিজীবী নির্ভর। ইকতায়, ইকলিমে, কশবায়, শিকে, পরগনায়, মহলে, সরকারে ও থানায় তুর্কী-মুঘল আফগান-ইরানী স্বধর্মী রাজপুরুষ শাসক প্রশাসক হিসেবে থাকলেও তারা গ্রামবাসী দেশজ মুসলিমের কোন উপকারে আসেনি। এমন কি গোটা ভারতবর্ষের সাত শত বছরের ইতিহাসে কোথাও কখনো কোন দেশজ মুসলিমকে দরবারে উজির বা সেনাপতি কিংবা শাসক হিসেবে অথবা কেবল শোভাবর্ধক আমীর হিসেবে খুঁজে পাওয়া যায় না। মধ্য এশিয়া ও ইরান-ইরাক থেকে ভাগ্যান্বেষণে যারা প্রতি বছর ভারতে আসত, তারাই নিয়োগ পেত শাসন ও সেনাবিভাগে, নওয়ারী আমলের শেষ দিনেও যাঁর ভূমিকা নওয়াবের প্রতি আনুগত্য প্রত্যাহারে ও কোম্পানীতোষণে নিন্দনীয় সেই রেজা খানও ছিলেন ইরান থেকে সদ্য আগত এবং নওয়াব আলিবর্দীর ভাই হাজী আহমদের পৌত্রীর স্বামী। ব্রিটিশ আমলে যেমন দেশী হিন্দু-মুসলিম উচ্চপদ শেলেও যোগ্যতার অভাবে দেশজ খ্রীস্টানরা বঞ্চিত ছিল, তুর্কী-মুঘল যুগে দেশজ মুসলিমরা যোগ্যতার অভাবেই রাজশক্তির কোন আনুকূল্য পায়নি।

এবার গোড়ার দিককার অর্থাৎ তেরো থেকে পনেরো শতক অবধি কালের গ্রামবাসী নগণ্য সংখ্যার মুসলিমের শাস্ত্রিক, সামাজিক, নৈতিক, শৈক্ষিক, আর্থিক এবং সাংস্কৃতিক জীবন কল্পনা করা যাক।

ইসলামে দীক্ষিত হওয়ার পূর্ব মুহূর্তে ওরা ছিল বৌদ্ধদের কিংবা শূদ্র হিন্দুর সন্তান। বৌদ্ধ হিসেবেও তাদের শাস্ত্রের সঙ্গে কোন প্রত্যক্ষ সম্পর্ক ছিল না ছিল না পূজা-অর্চনায়, পার্বণিক, অনুষ্ঠানে কোন গুরুত্বপূর্ণ অধিকার বা ভূমিকা। শাস্ত্রে অজ্ঞ মানুষমাত্রই হয় শোনা-সংস্কারে চালিত এবং শুনে-পাওয়া বিশ্বাসে নিয়ন্ত্রিত। মুসলিম হওয়ার পরে এক্ষেত্রে তাদের কোন উন্নতি হয়নি, নতুন কোন অধিকারও বর্তায়নি। কারণ শাস্ত্রটা ছিল তেরো নদীর ওপারের, শাস্ত্রের ভাষাটা ছিল অনায়ত্ত, সেই শাস্ত্র-মানা মানুষের সমাজটাও ছিল অজানা, তাদের আচার-আচরণ ছিল অদেখা, আর আদর্শ, উদ্দেশ্য ও তাৎপর্যসমেত শাস্ত্রীয় শিক্ষার পূর্ণ রূপ তো ছিল অচিন্ত্যই। অতএব শাস্ত্রের ব্যাপারে ছিল তাদের বিচ্ছিন্ন দ্বীপে মানস প্রবাস।

সমাজবদ্ধ মুসলিমের শরীয়তসম্মত প্রাত্যহিক জীবনাচার গ্রহণ-বরণের সুযোগ তাদের হয়নি অনেককাল। সূফী-পীর-দরবেশরা নিজেরাও শরীয়তী কায়দায় উদাসীন বলে শাস্ত্র নির্দেশিত নৈতিক শিক্ষাও তারা পায়নি, যা পেয়েছে তা হচ্ছে মোটামুটি ডাকাতি-চুরি-মিথ্যা-প্রতারণা থেকে বিরত থাকার, আর রোজা-নামাজ-জাকাত প্রভৃতির বিধিনিষেধ মানার নির্দেশ। শিক্ষা দেয়া-নেয়ার শরীয়তানুগ কোন গরজ অনুভূত হয়নি।

সে-যুগের প্রতিবেশে ক্ষুদ্র গ্রামীণ পেশাজীবী মানুষের আর্থিক উন্নতির কোন সাধারণ পন্থা ছিল না, ভিন্ন উপায়ে এবং ঝড়-খরা-বন্যার বিপর্যয়ের সুযোগে আকস্মিকভাবে ক্বচিৎ কেউ ধনী হত। বিপ্রদাসপিপিলাইর কাব্যে মনসার চেলা সাপ-উপদ্রুত জোলাপাড়ার বর্ণনায় কিংবা মুকুন্দরাম বর্ণিত গুজরাটের মুসলিম পাড়ার বিবরণে বিত্তে সম্পদে সমৃদ্ধির কোন পরিচয় নেই। দৈশিক পরিবেশে ঐতিহ্যধারায় লৌকিক ও স্থানিক দেবপূজা, নানা পার্বণ ও জন্ম-মৃত্যুর-বিয়ে উপলক্ষে নাচ-গান-বাজনার ও পান-ভোজনের যে-সব অনুষ্ঠান হত, সেগুলো ইসলাম বরণের মুহূর্তেই পরিহার করতে হল। বলতে গেলে যৌথজীবনে দেখে শুনে শেখার, জানার আর

অনুসরণের পথও অনেকাংশে বন্ধ হয়ে গেল মুসলিমদের জন্যে। কাজেই শৈক্ষিক ও সাংস্কৃতিক জীবন তাদের হল ক্ষয়িষ্ণু। সৃষ্টি ও স্রষ্টা, জগৎ ও জীবন সম্বন্ধে নতুন ইসলামী ভাব-ভাবনার অনুগত করে জীবন ও সমাজ গড়ার অঙ্গীকারবদ্ধ দেশজ মুসলিম পরিহার করল তার পূর্বপুরুষের সর্বপ্রকার বিশ্বাস-সংস্কার আচার-আচরণ। আত্মরক্ষার ও আত্মগড়ার প্রয়োজনে যে-স্বাতন্ত্র্য চেতনার আশ্রয় নিতে ও প্রশয় দিতে হল তাকে, তাতে যে-মানস শূন্যতার সৃষ্টি হল, তার বাঞ্ছিত বিকল্প তার আয়ত্তে ছিল না বলে তা কখনো পূর্ণ হয়নি। পূর্ব পুরুষের রিকথ যা ছিল তা বর্জন করল, যা কাম্য ছিল তা পেল না। কাজেই বাঙালী মুসলিমের স্বদেশে মানস-প্রবাস জীবন হল শুরু।

লৌকিক ইসলাম

কিন্তু মানুষ শূন্যবস্থায় বাঁচতে পারে না। তাই সম্ভবত দীক্ষিত মুসলিমের সন্তানেরাই যে-জ্ঞাতির প্রভাব এড়ানোর জন্যে অঙ্গে ও অন্তরে তাদের সব কিছুর স্পর্শ ও স্মৃতি বর্জনের উপদেশ পেয়েছিল, সে-জ্ঞাতির নাচগানবাজনা, বিশ্বাস সংস্কার এবং আচার-আচরণও পুরাণবৃত্তান্ত আবার সাগ্রহে গ্রহণ করতে থাকে। বিকৃত বা অবিকৃতভাবে গৃহীত ওই সব হিন্দু-বৌদ্ধ [বা বিজ্ঞান সম্মত সংজ্ঞায় বললে আদি বুনো-বর্বর ও ভব্য সমাজ পরম্পরায় প্রাপ্ত আদিম-বিশ্বাস-সংস্কার] আচারের ঈষৎ বিবর্তিত অনুসৃতি-অনুকৃতিকে এ যুগের বিদ্বানেরা নাম দিয়েছে 'লৌকিক ইসলাম'। সতেরো শতকের কবি মুহম্মদ খানের 'সত্য-কলি বিবাদ সম্বাদে'(১৬৩৫ খ্রী:) সতেরো শতকের অপর কবি মুজাম্মিলের 'নীতিশাস্ত্রবার্তা'বা সায়াৎনামা গ্রন্থে এবং আঠারো শতকের কবি খোন্দকার নসরুল্লাহর শরীয়তনামায় (১৭৫৫ খ্রী:) মুসলিমের বিশ্বাসে-সংস্কারে, প্রাত্যহিক আচারে-আচরণে ও উৎসবে-পাবর্ণে বৌদ্ধহিন্দুর প্রভাব ও অনুকৃতির বিস্তৃত বর্ণনা রয়েছে। প্রত্যক্ষদর্শী মোল্লা কবির সাক্ষাৎ সাক্ষ্য রয়েছে শরীয়তনামায়। সংক্ষেপে তাঁর বর্ণিত চট্টগ্রামের মুসলিম ঘরে বৌদ্ধ-হিন্দু আচার-সংস্কারের বর্ণনা এরূপ:

১. মুসলিম কন্যা বা বধূ প্রথম রজস্বলা হলে নাচ-গান-বাজনার অনুষ্ঠান করা হত। রজস্বলা নারীর ছোঁয়া লাগলে অন্যদের স্নান করে পবিত্র হতে হত। রজস্বলা হিন্দু নারীর মতোই তাকে নাপিত দিয়ে নখ কাটিয়ে তার পুরো কাপড় ধোপার বাড়ি পাঠিয়ে, গোবর-জলে ঘর নিকিয়ে শুদ্ধির ব্যবস্থা করা হত। প্রসূতি ও আঁতুর ঘর—দুই ছিল অপবিত্র।

২. মাথায় করা ডালায় কুলায় ধান-দূর্বা ও ঘট মুখে আম্রসার নিয়ে গাঁয়ের বউ-ঝিরা শিরনীর জন্যে বাড়ি বাড়ি ভিখ মেগে ফিরত।

৩. মৃতদেহও অপবিত্র মনে করা হত। মৃতের পরিবারের পুরুষেরা নাপিত ডেকে চুল দাড়ি খেরী করাত, নারীরাও কাটাত নখ।

৪. শিশুর কল্যাণে (যষ্ঠীর সঙ্গে) নিমরিয়া পীরের উদ্দেশ্যে মোরগ বলি দিত।

৫. সূর্যমুখী কলার নৈবেদ্য সমেত ব্রাহ্মণকে দিয়ে পুষা (পুষ্কর) দেবতার পূজা দিত, আর মহাক্ষ্মীর নামে বলি দিত হাঁস। হাঁসের রক্ত ছিটিয়ে দিত ধানের গোলায় বরকতের জন্যে। এখানেই শেষ নয়; আবার 'কেহ-কেহ শূকর চণ্ডীরে দেওন্ত হাঁস'। বৌদ্ধ দেবতা মা মঘিনীর নামে উৎসর্গ করত ছাগল।

৬. বিষুব সংক্রান্তির দিনে গৃহস্থ গরু-ছাগলের গলায় ফুলের মালা পরাত, কেউ কেউ নিজের অঙ্গে মাখত হলুদ ও চন্দন।

৭. মুসলিম চাষীরাও 'হাল পালন' ব্রত পালন করত। আষাঢ়ের প্রথম সপ্তাহকে বসুমতীর রজস্বলা থাকার কাল জেনে ওই সাতদিন হালচাষ বন্ধ রাখত। বহুলফলন প্রতীক 'ডিম' বা জাম গাছের ডাল' জমির কেন্দ্রে পুঁতে প্রথম হালচাষ শুরু করত তারা।

৮. শব-ই-বরাতে অত্মীয় স্বজনদের কবরে একজোড়া ভাত বা এজোড়া রুটি রেখে দিত, 'পূজা যেন রাখি থাকে বুতের সাক্ষাৎ।'

এ যে কেবল মুসলিম সমাজেরই চিত্রতা নয়, এ সব মানুষের অজ্ঞতার ও অশিক্ষার সাক্ষ্য। আর বহির্বিশ্বের সমীর ও সংবাদ বিরহী সে-গ্রামীণ জীবনে মানুষের দুঃখ-যন্ত্রণায়, রোগে-শোকে কিংবা সুখ-সৌভাগ্যে বল ভরসার, স্বস্তি-সান্ত্বনার এগুলো ছাড়া আর কি-ই বা অবলম্বন ছিল!

শাস্ত্র চর্চা

গাঁয়ে গাঁয়ে দু চারজন করে মুসলিম-সংখ্যা দীক্ষায় ও উৎপাদনে বেড়ে বেড়ে মনে হয় পনেরো শতকের দিকে সংখ্যায়, শক্তিতে এবং আত্মপ্রত্যয়ে দৃঢ়মূল হয়ে গ্রামীণ মুসলিমরা তাদের জীবনে সমাজে মননে ইসলামের শাস্ত্রিক, সামাজিক, আদর্শিক ও সাংস্কৃতিক আচার-আচরণের নিষ্ঠ রূপায়ণ কামনা করতে থাকে। তখন থেকে মনে হয় দেশে কেউ কেউ আরবী শিক্ষিত মোল্লা-মুয়াজ্জিন পীর-খোন্দকার হওয়ার যোগ্যতাও অর্জন করেছে। এমনি করে গাঁয়ে গাঁয়ে এক ইসলামী হাওয়া বইতে শুরু করে। কিন্তু দুনিয়ার তাবৎ শাস্ত্রীসমাজ বেদ-বাইবেল-কোরআন-পুরাণ অনুসারী নির্বিশেষে—বৃত্তি-বিত্ত-বেসাতে নির্বিঘ্ন স্থায়ী অধিকার রাখা লক্ষ্যে শাস্ত্রে লোকসাধারণের অধিকার প্রসারের যেহেতু বিরোধী, সেহেতু ঐশিক বাণীর পবিত্রতা ও কার্যকরতা ক্ষুণ্ন হবার সেই পুরোনো অজুহাতে ও আশঙ্কায় মুসলিম সমাজেও শাস্ত্র কথা অনূদিত হতে পারেনি। যদিও চিরকাল শাস্ত্রকথা লোকশিক্ষার প্রয়োজনে মুখে মুখে অনূদিত হয়েছে। অতএব শাস্ত্রীগোষ্ঠীর জীবিকাগত স্বার্থচেতনাই শাস্ত্রের লিখিত অনুবাদে ও গণাধিকারে 'পাপতন্ত্রের' আর মোল্লা-পুরুত-পাদ্রীতন্ত্রের জনক। এবং গণ-অজ্ঞতাই তার পালকপোষক।

ষোলশতকের শেষপাদের দিকে মুসলিম জনসংখ্যা আরো বৃদ্ধি পেয়েছে, শিক্ষিতের সংখাও বেড়েছে, তখনই কেউ কেউ সাহস করে শাস্ত্রীর রক্তচক্ষু উপেক্ষা করে, দ্বিধামুক্ত হয়ে, সংস্কারের নয়—যুক্তির অনুগত হয়ে শাস্ত্রকথা অনুবাদে এগিয়ে আসেন। তার আগে কেবল রসুলের নয়, পূর্ব নবীর কথা বলতেও ছিল পাপভীতি। শাহমুহম্মদ সগীরের (১৩৮৯-১৪১০ খ্রীঃ) উক্তিতে তার প্রমাণ মেলে :

না লেখে কিতাব কথা মনে ভয় পাএ।
দুষিব সকল তাক ইহ না জুয়াএ।
গুনিয়া দেখিলুঁ আম্মি ইহা ভয় মিছা
না হএ ভাষাএ কিছু হএ কথা সাচা।

নির্ভয়ে প্রথম নবীবংশ ও রসূলচরিতা রচনা করেছেন কবি পীর মীর সৈয়দ সুলতান (১৫৮৪ খ্রীঃ) :

না বুঝে বাঙালী সবে আরবী বচন
যারে যেই ভাষে প্রভু করিল সৃজন
সেই ভাষ হএ তার অমূল্য রতন।

'আমীর হামজা' কাব্যের কবি আবদুল নবী (১৬৮৪ খ্রীঃ) বলেন :

মুসলমানি কথা দেখি মনেহ ডরাই
রচিলে বাঙ্গালাভাষে কোপে কি গোঁসাই।
লোক উপকার হেতু তেজি সেই ভয়
দৃঢ়ভাবে রচিবারে ইচ্ছিল হৃদয়।

পাপ ও লোকনিন্দা-রোষ সম্বন্ধে সম্পূর্ণভাবে দ্বিধা-দ্বন্দ্ব মুক্ত না হয়েও যাঁরা ইসলাম ও মুসলিম বিষয় সম্বন্ধে লিখেছেন, তাঁরা হলেন ষোল শতকের হাজী মুহম্মদ(সুরতনামা), মুজাম্মিল (নীতিশাস্ত্রবার্তা)। সতেরো শতকের মুক্তালিব (কিফায়তুল মুসল্লিন ১৬৩৯ খ্রীঃ) প্রভৃতি। যিনি সক্রোধে ও সক্ষোভে বাঙলা ভাষা বিরোধীদের প্রতি বেপরওয়া বাণী উচ্চকণ্ঠে উচ্চারণ করেছিলেন, তিনিও সতেরো শতকের কবি রাজ্জাক-নন্দন আব্দুল হাকিম :

যেই দেশে যেই বাক্য কহে নরগণ
সেই বাক্য বুঝে প্রভু আপে নিরঞ্জন।
যে সব বঙ্গেতে জন্মি হিংসে বঙ্গবাণী
সে সব কাহার জন্ম নির্ণয় না জানি।
দেশী ভাষা বিদ্যা যার মনে না জুয়ায়
নিজ দেশ ত্যাগী কেন বিদেশে না যায়।

এ সূত্রে হিন্দু সমাজের শাস্ত্রীর পাঁতি : অষ্টাদশ পুরাণানি রামস্য চরিতানি চ ভাষায়াং মানবঃ শ্রুত্বা রৌরবং নরকং ব্রজেৎ।

কিংবা 'কৃত্তিবেশ কাশীদেসে/আর বামুন ঘেঁষে/এ তিন সর্বনেশে।' 'স্মর্ত্যব্য। এমনি বহু বহু বাধাবিপত্তি ঘটেছিল হিব্রু ও ল্যাটিন ভাষা থেকে য়ুরোপীয় নানা ভাষায় বাইবেল অনুবাদ কালেও। তবু অবশ্য মোল্লা-পুরুত-পাদ্রী-রাব্বীর প্রতিষ্ঠা ও প্রাপ্তি, মান ও মাহাত্ম্য আজো কমেনি। ষোল- সতেরো শতক থেকে শরীয়তের তথা কোরআন-হাদিসের নানা বিধি-নিষেধ, নিয়ম-কানুন সম্বন্ধে অনেক কবি—শেখ পরাণ, নেয়াজ, মুত্তালিব, আশরাফ, আলাউল, সৈয়দ নূরউদ্দিন, নসরুল্লাহ খোন্দকার, নাসির উদ্দীন প্রভৃতি স্ব স্ব রচনার মাধ্যমে মুসলিমদের শরা-শরীয়ত সম্বন্ধে জ্ঞান দানের চেষ্টা করেছিলেন। অজ্ঞতার ও অশিক্ষার সে-যুগে হাতে লেখা এসব গ্রন্থ সহজে পঠিত ও প্রচলিত হতে পারেনি, নিতান্ত ক্ষুদ্র অঞ্চলের সংকীর্ণ সীমায় ছিল এসব গ্রন্থের প্রচার আবদ্ধ।

এ সব শাস্ত্র-সম্বন্ধীয় গ্রন্থ রচিত হবার পরেও রয়ে গেল কুফরী বিশ্বাস-সংস্কার-আচার-আচরণ, রয়ে গেল উত্তর ও দক্ষিণ বঙ্গে মুসলিম বাউল সম্প্রদায়, রয়ে গেল পীর-ফকির-দরগাহ্‌র প্রভাব, রয়ে গেল তুক-তাক-দারু-টোনা বাণ-উচ্চাটন, তাবিজ-কবচ, মন্ত্র-মাদুলি আর ঝাড়-ফুক। প্রমাণ ১৭৫৫ খ্রীস্টাব্দে রচিত পূর্বোক্ত 'শরীয়তনামা'ধৃত বিবরণ। এ যে কেবল মুসলিম সমাজে ছিল তা' নয়, গোটা বাঙলাদেশে সব জাত-বর্ণ-ধর্মের লোকের প্রাত্যহিক জীবনের বাস্তব অবলম্বন ছিল লোকায়ত লৌকিক শাস্ত্র, বিশ্বাস, আচার এবং অনুষ্ঠেয় নানা কর্ম ও মন্ত্র।

হিন্দু সমাজে এসব লৌকিক আচার-আচরণ-অনুষ্ঠান পরিহারে প্রবণতা জাগে ব্রিটিশ আমলে ইংরেজি শিক্ষিত লোকদের যুক্তিবাদে অনুরাগ জাগায় ফলে আর কিছুটা রামায়ণ-মহাভারত ও শ্রুতি-স্মৃতি-গীতা-পুরাণের যুক্তি গ্রাহ্য আধুনিক টীকাভাষ্যের প্রভাবে। আর মুসলিম সমাজে এসব রীতি-রেওয়াজ কমতে থাকে উনিশ শতকী ওয়াহাবী (মুহাম্মদী)-ফরায়েজী আন্দোলনের ফলে। তারপরেও অনেক কিছু আশ্রিত ছিল ভীরুহৃদয়ে, এবং এখনো রয়েছে চালু বিভিন্ন অজ্ঞ-অশিক্ষিত অনগ্রসর গ্রামবাসীর মধ্যে এবং অস্পৃশ্য শূদ্রদের মধ্যে আর আরণ্য-মানবদের মধ্যে।

শহর-বন্দরের শিক্ষিত-অশিক্ষিতরা যে এসব আচার-সংস্কার ছেড়েছে—তা তাদের আত্মিক উন্নয়নের বা মনন উৎকর্ষের ফলে নয়, এ যন্ত্রযুগে যন্ত্র-নির্ভর মানুষের জীবিকা-পদ্ধতির, হাতিয়ারের, জীবনযাত্রার ও চিকিৎসা-পদ্ধতির আবশ্যিক পরিবর্তন ঘটায়, বাধ্য হয়েই স্থান-কালের ও প্রয়োজনের কাছ আত্মসমর্পণ করেছে মানুষ। আজকের দিনে দিন-ক্ষণ-তিথি-লগ্ন যেমন মানা যায় না যাত্রাকালে, তেমনি চলা যায় না ছোঁয়াছুঁয়ির, খাদ্যাখাদ্যের কিংবা জাত-জন্ম-বর্ণ-ধর্মের বাছ-বিচার করে। শহরবাসীর গৃহগত জীবনে ও অশনে বসনে আসনে আসবাবে আহার্য তৈরীর উপকরণে ও পদ্ধতিতে ঘটেছে আমূল পরিবর্তন।

শাস্ত্রচর্চার মূল প্রেরণা

আগের কথার সূত্র ধরে একটি প্রাসঙ্গিক কথাও বলা প্রয়োজন। জ্ঞানী গুণী সমাজ-সর্দার মুসলিমরা যেমন জীবনে-সমাজে-সংস্কৃতিতে ইসলামী শিক্ষার রূপায়ণ কামনা করে, তেমনি ইসলামের ও ইসলামের উন্মেষ যুগের প্রখ্যাত মানুষদের কৃতিকীর্তি তথা সমাজক্ষেত্রে তাঁদের ভূমিকা স্মরণ করতে থাকে। নামাজ-রোজা-হজ্ব-যাকাত কিংবা সুন্নত-ফরজ-ওয়াজেব-নফল-মুস্তাহাবের কথার সঙ্গে ইসলামের উদ্ভব কালের মুসলিম বীর আলী-হামজা-হানিফাদেরও গুণ-মান-মাহাত্ম্য বর্ণনায় হয় উৎসুক, এবং এসব রচনার মাধ্যমে কাফের ও কুফরীর বিরুদ্ধে সংগ্রামীচেতনা সঞ্চারে হয় উদ্যোগী। প্রেরণা-প্রণোদনার উৎস পুণ্যার্জন নয়, নিতান্তই স্বধর্ম ও স্বধর্মী প্রীতি। এরও মূলে রয়েছে আত্মমর্যাদাবোধ এবং স্বগোষ্ঠীর সম্মানচেতনা। এতেই উচ্চবিত্তের ও শহুরে শিক্ষিত মানুষের মধ্যে স্বাতন্ত্র্য-চেতনা ও বিজাতি-দ্বেষণা উপ্ত, অঙ্কুরিত ও বর্ধিত হয়। তাছাড়া তখন ইসলামের প্রচার বন্ধ হয়ে গিয়েছিল এবং সমাজ তাই সংগঠনে ও ইসলামী শিক্ষার স্বরূপ অনুধ্যানে হয়েছে ব্রতী স্থিতিশীল হবার লক্ষ্যে। বাঙলার হিন্দু সমাজেও এমনি একটা অবস্থায় অনুরূপ পন্থায় সমাধান সন্ধান করতে দেখেছি।

তেরোশতকে তুর্কীশাসন শুরু হলে ব্রাহ্মণ্য শাস্ত্র, সমাজ ও সংস্কৃতি রাজকীয় সমর্থন হারালে সমাজের প্রচ্ছন্ন জৈন-বৌদ্ধ-আরণ্য মানব ছাড়াও সুপ্রাচীন দ্রাবিড়-ভেডডিড-অস্ট্রিক-মঙ্গোল-নেগ্রিটো রক্তসঙ্কর মানুষেরা স্ব স্ব গোষ্ঠী-দেবতার তথা লৌকিক অরি-মিত্র দেবতার গুণ-মান-মাহাত্ম্য ও পূজা প্রচারে বিশেষ উৎসাহী হয়ে ওঠে এবং সেন আমলে রাজকীয় প্রত্যক্ষ প্রচেষ্টায় আরোপিত ও চালু শ্রুতি-স্মৃতি-গীতা-পুরাণস্বীকৃত দেব-দ্বিজের পূজা-অর্চনা ও ব্রত-পার্বণ প্রভৃতির প্রতি উদাসীন হতে থাকে। ব্রাহ্মণ্য শাস্ত্রের, আচারের ও সংস্কৃতির এ ক্ষয়িষ্ণু প্রভাব প্রত্যক্ষ করে সমাজের উচ্চবিত্তের ব্রাহ্মণ-বৈদ্য-কায়স্থরা বিশেষ উদ্বিগ্ন হয়ে পড়ে।

তুর্কী আমলে গণমানবের লৌকিক দেবতা প্রতিষ্ঠার ও পূজার প্রবণতা ঠেকানো ব্রাহ্মণ্য শাস্ত্র, সমাজ ও সংস্কৃতি রক্ষার প্রয়োজনে জরুরী হয়ে উঠল। অথচ শাস্ত্রগ্রন্থ অনুবাদের মাধ্যমে শাস্ত্রে অনধিকারী জনগণের মধ্যে প্রচার করা পাপ—এ ধারণা ধর্মভীরুদের মনে দৃঢ়।

গণনির্যাতনের ভয়ে তাই সুলতানের ছত্রচ্ছায়ায় থেকে কায়স্থ-বৈদ্যরাই রামায়ণ-মহাভারত-ভাগবত অনুবাদে এগিয়ে আসেন। ব্রাহ্মণ কৃত্তিবাস ওই নির্যাতন-আশঙ্কায় গৌড় সুলতানের দরবারে সালাম ঠুকে এসেছিলেন, কবীন্দ্র পরমেশ্বর কিংবা শ্রীকর নন্দীও অবলম্বন করেছিলেন সে-পন্থা। এ প্রতিযোগিতার-প্রতিদ্বন্দ্বিতারও প্রতিরোধ-প্রয়াসের অবসান হল আপোস ব্রাহ্মণ্য ও লোকায়ত মতের ও দেবতার সমন্বয় সাধনে, পুরাণে ও বর্ণহিন্দুর ঘরে-সমাজে লৌকিক দেবতার স্বীকৃতিতে। এভাবে ব্রাহ্মণ্য শাস্ত্র-সমাজ-সংস্কৃতি ভিন্নরূপী শাস্ত্রের ও সংস্কৃতির সঙ্গে আপোসরফা করে হৃতশক্তি ফিরে পেয়ে বিচিত্র রঙে-রূপে-রসে-তত্ত্বে ও তথ্যে ঋদ্ধ হয়ে অঙ্গে বিপুল আর অন্তরে গভীর ও ব্যাপক হয়ে উঠল।

সাম্প্রদায়িক সম্পর্ক

ষোলশতকের দিকে এমনি মিশ্র কিন্তু অখণ্ড ব্রাহ্মণ্য শাস্ত্র, সমাজ ও সংস্কৃতি যখন কঠিন বাঁধনে দৃঢ় ও সংহত হচ্ছিল, তখনই ইসলামের প্রতি আকৃষ্ট মানুষদের সমাজে ধরে রাখার জন্যে শাস্ত্রী-সমাজপতিরা হলেন সচেষ্ট। বিদেশী-বিভাষী-বিধর্মী-বিজাতির শাস্ত্র-সমাজ-সংস্কৃতির তুলনায় নিজেদের শাস্ত্র-সমাজ-সংস্কৃতির উৎকর্ষ প্রমাণ করা, এমনি অবস্থায় জরুরী হয়ে উঠল ভাঙন রোধ করার জন্যে। কাজেই সাধারণ জনগণের মধ্যে নয় কেবল, শাস্ত্রী-সমাজপতি ব্রাহ্মণের এবং বিদেশী শাস্ত্রী ও সমাজপতির মধ্যে দেখা দিল মনে মনে অন্তরে অন্তরে প্রতিযোগিতার ও প্রতিদ্বন্দ্বীর দ্বেষ-দ্বন্দ্ব। বৈষ্ণবচরিত গ্রন্থে এ দ্বেষ-দ্বন্দ্বের কথাই প্রকাশ পেয়েছে' ব্রাহ্মণে যবনে বাদ যুগে যুগে আছে' এবং 'গৌড়ে বিপ্ররাজা হবে হেন আছে' উক্তিতে। শোনা যায় নদীয়ায় বিধর্মী রাজশক্তির উৎখাত লক্ষ্যে বিদ্রোহের আয়োজন চলছে সংবাদে বিচলিত হোসেন শাহ [১৪৯৩-১৫১৯ খ্রীঃ] নদীয়ায় সৈন্যবাহিনী মোতায়েন করে ছিলেন, এবং এ আশঙ্কা দূর করার জন্যেই রাজনীতিক চাল হিসেবে চৈতন্যদেবের মত প্রচারে প্রশ্রয় দিয়ে হিন্দু সমাজে বিরোধের ও অনৈক্যের বীজ বুনেছিলেন।

আজো যেমন, তেমনি সেকালেও রাজনীতিক ও আর্থনীতিক ক্ষেত্রে লড়াইয়ে সাম্প্রদায়িক ও দলীয় দ্বন্দ্ব-সংঘাত ঘটত যুদ্ধক্ষেত্রে খোলা ময়দানে, যুদ্ধও হত মানুষের নেতায় নেতায়, সসৈন্য রাজায় রাজায়। এ হচ্ছে উচ্চাভিলাষী ক্ষমতালিপ্সু মানলোভী শহুরে বিত্তবানদের বিষয়। তাই আজকের দিনেও গ্রামে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা কিংবা দলীয় হরতালের ব্যবস্থা করা যায় না, অতীতেও যায়নি। অথচ প্রয়োজনে শহরে যে-কোন মুহূর্তে তার ব্যবস্থা করা যায়।

চিরকালের আস্তিক মানুষের মতো সেকালেরও হিন্দু-মুসলিমের মধ্যে পরস্পরের ধর্মের প্রতি পরস্পরের অবজ্ঞা ছিল। কেননা প্রত্যেক আস্তিক মানুষেরই ধর্মনিষ্ঠার শর্ত হিসেবে জানতে ও মানতে হয় যে, তার স্বধর্ম ব্যতীত আর সব ধর্মই অজ্ঞতা-অসত্য ভিত্তিক। তারা যেহেতু স্বধর্মের সত্যতায় ও শ্রেষ্ঠত্বে তুষ্ট, সেহেতু পরধর্মকে মনে বা অন্তরে মিথ্যা জেনেই স্বস্থ। এজন্যে তারা মারামারি-হানাহানির প্রয়োজন বোধ করে না, কৃচিৎ নিজেদের মধ্যে পরধর্ম নিয়ে উপহাস-পরিহাস প্রকাশ করে মাত্র।

নগর-বন্দরের শহুরে সমাজে রাজা-রাজনীতিক, শক্তিমান-বিত্তবান, সাহু-সদাগর, শাসক-সেনানী, পণ্ডিত-মুন্শী প্রভৃতি রাজশক্তি সম্পৃক্ত শ্রেণীর মানুষের মধ্যেকার দ্বন্দ্বের কথা সেকালের শহুরে সাহিত্যেও মেলে। রাজপণ্ডিত বিদ্যাপতির কীর্তিলতায়, বিপ্রদাস পিপিলাইয়ের পদ্মাপুরাণে, বিজয়গুপ্তের মনসার ভাসানে, দ্বিজবংশীদাসের মনসামঙ্গলে, বৃন্দাবন দাসের চৈতন্য-ভাগবতে, জয়ানন্দের চৈতন্যমঙ্গলে, কৃষ্ণদাস কবিরাজের চৈতন্যচরিতামৃতে যেমন যবন

বিদ্বেষের ও হিন্দু পীড়নের চিত্র রয়েছে, তেমনি কাফের-বিদ্বেষের চিত্র পাই শাহ বারিদ খানের রসূলবিজয়ে, হানিফার দিগ্বিজয়ে, জায়েন-উদ্দিনের রসূলবিজয়ে, এবং আলি-হামজা-হানিফা প্রভৃতির দিগ্বিজয় কাহিনীতে।[৪]

অন্যদিকে আবার গাঁ-গঞ্জের হিন্দু মুসলমানের দ্বন্দ্বে-মিলনে-সহিষ্ণুতায় সহাবস্থানের চিত্র রয়েছে সব মনসামঙ্গলের হাসান-হোসেন পালায়, মুকুন্দ-রামের চণ্ডীমঙ্গলের গুজরাট নগরে, ভারতচন্দ্র রায়ের মানসিংহ খণ্ডে মানসিংহ-বাদশাহর লঘু উপহাসে পরিহাসে আর ধর্মমঙ্গলে এবং চৈতন্যচরিত গ্রন্থেও। দুঃখের যন্ত্রণার অভিঘাতে বাঙলার হিন্দু-মুসলিম অভিন্ন লক্ষ্যে আপোস ও হার্দ্যিক ঐক্য ও সংহতি কামনা করেছিল পীর-নারায়ণ সত্যের সেবক হয়ে। বাঙালী মুসলিমের সে আলোচনা পরে হবে।

বাঙালী মুসলিমের বহির্মুখিতার ফল

এবার আগের কথায় আবার ফিরে আসি। ফুলের পাপড়ির মতো, কিশলয়ের মতো নিত্য বিকাশমান থাকে জীবন্ত সংস্কৃতি, আর যে-সংস্কৃতি বন্ধ্যা, সৃষ্টিশীল নয়, তা সংস্কৃতি নয়, আচারমাত্র। বাঙালী মুসলিমরা বিদেশী ধর্ম বরণ করে স্বদেশেই মানস-প্রবাস অনুভব করেছে। দৃষ্টি সুদূরে নিবদ্ধ করতে হলে দাঁড়িয়ে যেতে হয়। তাতে চলার ছন্দ হয় নষ্ট, গতি হয় রুদ্ধ। আর জীবনের তথা মন-মননের বিকাশের জন্যে আদর্শিক-নৈতিক অবলম্বন চাই বটে, কিন্তু আনুগত্যে বিকাশ নেই, কেননা আনুগত্য দেহ-মন-আত্মার নিঃশর্ত সমপর্ণ দাবি করে। বাঙালী মুসলিম ইসলামে ও আরব-ইরানে ছিল সমর্পিতচিত্ত, যদিও তার জন্ম-জীবন-মৃত্যু ছিল—বাঙলার মাটির ও বাঙলার আবহাওয়ার অধীন। উর্ধ্ব দৃষ্টির চলমান মানুষ হোঁচোট খায়। মন-মননের বিকাশের ও উৎকর্ষের জন্যে প্রয়োজর দ্রোহের, তা এ মানুষে ছিল না। তার জীবন নিয়ন্ত্রিত হয়েছে বাঙলার শস্যে-সম্পদে, হাটে বাটে মাঠে ঘাটে, তার দুঃখ-দুর্দশা ঘটেছে বাংলার ঝড়-খরা-বন্যায়, বাঙলার ঋতু ও চাঁদ-সূর্য গড়েছে তার মন ও মেজাজ। তবু সে স্বদেশ-স্বজাতি-সংস্কৃতি খুঁজেছে মরুভূ আরবে, উত্তর আফ্রিকায়, ইরাকে, ইরানে ও মধ্য এশিয়ায়, হতে চেয়েছে কোরাইশ, হাসেমী, সিদ্দীকি, উসমানী, আলাভী, ফাতেমী, নিশাপুরী, মদনী, বলখী, বোখারী, গজনবী। ফলে স্বদেশের মাটিতে ছিল না তার মনের শিকড়, স্বদেশের মাটি ও মানুষ ছিল না তার জিজ্ঞাসার ও মননের বিষয়। নিজেদের স্থূল বৈষয়িক প্রয়োজনে ছাড়া স্বদেশের আর কিছুতেই নিবদ্ধ ছিল না। তাদের চিন্তা-চেতনা। তাদের আদর্শিক জীবন-চেতনায় ছিল কেবল স্থান-কাল-ভূগোল নিরপেক্ষ অজর অনড় বিশ্বমুসলিমের একক গোষ্ঠীবোধ বা জাতিচেতনা। অবশ্য সেকালে সবমানুষে স্বধর্মীরস্বাজাত্য চেতনাই ছিল, কিন্তু দৈশিক জাতি-চেতনা ছিল দুর্লভ। উনিশ শতক অবধি গোটা ভারতের কোথাও কারুর মধ্যে দৈশিক জাতিচেতনা দেখা যায় নি, সিপাহী বিপ্লবেও ছিল রাজ্যচেতনা মাত্র। এজন্যেই গোটা মধ্যযুগে মুসলিমরা সৃষ্টিশীল ছিল না। সাহিত্যে শিল্পে স্থাপত্যে কিংবা সংস্কৃতিতে অনুবাদে অনুকরণেই তাদের দিন কেটেছে, চাহিদা মিটেছে। বাস্তব প্রতিবেশে অবহেলা এবং আদর্শিক প্রতিবেশে অনধিকারই এর কারণ। এ ব্যর্থ বিড়ম্বিত জীবন অবশ্য সবার ছিল না—এ হচ্ছে সেকালের জ্ঞানী-গুণী শিক্ষিত মননশীল ধনী মানী ইসলামী শাস্ত্র-সংস্কৃতিপ্রিয় মানুষের কথা।

লোক সাহিত্য-সংস্কৃতি

স্বল্প আয়ের অজ্ঞ অনক্ষর বৃত্তিজীবী ও চাষী-মজুর শ্রেণীর মানুষ কিন্তু স্বদেশের মাটি ও জল-বায়ু থেকে দেহ-প্রাণের রস আহরণ করেছে। প্রাকৃত-জনের—অবজ্ঞায় যাদের বলা হয় ফোক

বা লোক—ফোকলোর নামে অভিহিত গান-গাথা-রূপকথা-উপকথা-ইতিকথা, তাদের তৈরী সামগ্রী, তাদের লোকায়ত বিশ্বাসসংস্কার, তাদের হিংসা-ঘৃণা-প্রেম-প্রীতি, তাদের জীবন ও জগৎচেতনা, আশা-নিরাশা সবকিছুই দেশের মাটি, মানুষ ও পরিবেশ সম্পৃক্ত অকৃত্রিম অনুভবের প্রসূন ও ফসল। তারা উনিশ শতকেও নয়, বিশ শতকের আগে জীবনাচারে তেমন ইসলামী চেতনা লাভ করেনি। ঘরে বাইরে তাদের চেতনায় ও ব্যবহারিক আচার-আচরণে, ব্যবহৃত সামগ্রীতে, পালা-পার্বণে, উৎসবে-অনুষ্ঠানে, প্রথায়-পদ্ধতিতে, সাজে-সজ্জায় দেশী ঐতিহ্যের বা তথাকথিত হিন্দুয়ানীর ছাপই ছিল বারো আনা। এমন কি তাদের অধিকাংশের নামও ছিল দেশী, যেমন ইধা, বুধা, কালা, ফেলা, পরান, বানু পাঁচু, লালন, দুদ্দু, কানাই, দোনা, গোপাল, চাঁদ, সুরুজ, সোনা, মনা, তোতা, বগা, বাছা, রূপসী, আয়না, ফুলী, কুসুম, সোনা, মিছরী, ভেলুয়া, আকাশী, বাতাসী, চোখধন, মানিকধন প্রভৃতি।

কিন্তু এসব হিন্দুয়ানী আচার-সংস্কার নয়, আদিম বুনো-বর্বর ও ভব্য পূর্বপুরুষের রিকথ হিসেবেই এ সব ব্রাহ্মণ্য ও বৌদ্ধ যুগ পার হয়ে মুসলিম সমাজেও চালু রয়েছে মাত্র। নীহাররঞ্জন রায় বলেন, "এ তথ্য সর্বজন-স্বীকৃত যে আর্চ, ব্রাহ্মণ্য বা বৌদ্ধ জৈন ইত্যাদি সম্প্রদায়ের ধর্মকর্ম, শ্রাদ্ধবিবাহ, জন্মমৃত্যু প্রভৃতি সংক্রান্ত বিশ্বাস, সংস্কার ও আচার অনুষ্ঠান, নানাদেবীর রূপ ও কল্পনা, আহার-বিহারের ছোঁয়াছুয়ির অনেক কিছুই আমরা সেই আদি-বাসীদের নিকট হইতে আত্মসাৎ করিয়াছি।"[৫] এগুলো ছাড়াও ধান, দূর্বা, কলা, হলুদ, পান-সুপারী, কলাগাছ, অগ্রসার, কুলা, ঘট, কড়ি, দই, মাছ প্রভৃতির আনুষ্ঠানিক ব্যবহারও আদিবাসীর এবং এসব প্রাচীনতম যাদুবিশ্বাসের প্রতীক।

বাঙলার সূফীমত

কোরআন-বর্ণিত ইসলামে কোন হেঁয়ালি নেই। কোরআনের আল্লাহ্ হচ্ছেন 'রব'-প্রভু, আর মানুষ হচ্ছে আবদ্—দাস। অতএব স্রষ্টা আল্লাহর সঙ্গে সৃষ্টি মানুষের সম্পর্ক হচ্ছে প্রভু-ভৃত্যের, সেবিত-সেবকের, উপাস্য-উপাসকের, বান্দা-মনিবের। আল্লাহর বিধি-নিষেধ মেনে চলাই হচ্ছে আল্লাহ্র প্রতি আনুগত্যের নামান্তর। নির্ভুল আনুগত্যের তথা নিষিদ্ধ ভাব, কর্ম ও আচার-আচরণ পরিহার করে নির্দিষ্ট দায়িত্ব ও কর্তব্য ত্রুটিহীন ভাবে পালনের পুরস্কার হচ্ছে স্বর্গের সুখ আর কর্তব্যে অবহেলার তিরস্কার হচ্ছে নরকের যন্ত্রণা। নিষিদ্ধ ভাব-চিন্তা-কর্মে বিরত না থাকা বা কর্তব্য পালনে উদাসীন থাকা মানে দুষ্টশক্তি শয়তানের খপ্পরে পড়া। এ জন্যেই জাগ্রতজীবনে ঘন ঘন আল্লাহকে স্মরণ ও শরণ করতে হয়। ইবলিসকে এড়িয়ে চলার উপায় হিসেবে তাই আওড়াতে হয় আউজুবিল্লাহ ও বিসমিল্লাহ, আর নিরাপদ ঋজু পথের দিশা দানের জন্যে পড়তে হয় নামাজ, যে-নামাজে সুরা 'ফাতেহা' তাই আল্লাহর কাছে আবেদনের আবশ্যিক মাধ্যম। সাধারণের প্রাত্যহিক জীবনে স্মরণীয় ও করণীয় ইসলাম হচ্ছে এ-ই।

কিন্তু আরবের ইসলাম যখন সিরিয়ায়-ইরাকে-ইরানে এল, তখন কোরআনের বাণীর সঙ্গে যুক্ত হলে সে-অঞ্চলের মানুষের অধ্যাত্ম বিষয়ক ঐতিহ্য। সেখানে ছিল গ্রীক-ইহুদী-খ্রীস্টান-জোরাস্ত্রীয়-মানী-মজদকী-জিনদিকী, বৌদ্ধ ও বৈদান্তিক অধ্যাত্মতত্ত্বের মিশ্র ও জটিল ঐতিহ্য। ফলে সেখানে সর্বেশ্বরবাদ, অদ্বৈতবাদ, নির্বাণবাদ, মোক্ষবাদ, জীবাত্মা-পরমাত্মার প্রেমবাদ ও সর্বাত্মক লীলাবাদ লোক-ঐতিহ্যে লঘু-গুরুভাবে তখনো চালু ছিল বলেই ইসলাম বরণের সঙ্গে সঙ্গেই আশৈশবের বিশ্বাস-সংস্কার পরিহার করা সম্ভব হয়নি। ফলে পুরোনো সংস্কার ও নতুন ইসলামী বিশ্বাস অবচেতন ভাবেই সমন্বিত হতে থাকে তাদের চিত্তলোকে।

গ্রীক ঐতিহ্যের ধারক সিরিয়ার আর ব্যাবিলোনীয় একাধিক ঐতিহ্যের বাহক ইরাকেই আটশতকের উষাকাল থেকেই আল্লাহ-মানুষের, স্রষ্টা-সৃষ্টির ভিন্নতর সম্পর্ক-চেতনা দেখা দেয় গুণী-জ্ঞানী ধর্মনিষ্ঠ ব্যক্তির মধ্যে। এর নাম অধ্যাত্মচেতনা, মরমীচেতনা বা সূফীবাদ দেয়া যেতে পারে। এঁরা হচ্ছেন হাসান বসরী (মৃ: ৭২৮ খ্রীঃ) রাবিয়া (মৃঃ ৭৫৩ খ্রী) ইব্রাহিম অদমহ (মৃঃ ৭৭৭ খ্রীঃ) আবু হাসিম (মৃঃ ৭৭৭ খ্রীঃ) দায়ুদ ত্বয়ী (মৃঃ ৭৮১ খ্রীঃ) মারুক করখী (মৃঃ ৮৬০ খ্রীঃ)। এঁদের প্রভাব মিশরে ইরানে হল পরিব্যাপ্ত। জুননুন মিশরীই (মৃঃ ৮৬০ খ্রীঃ) সূফীমতের প্রথম প্রবক্তা। তাঁর সূফীমতের সংকলন গ্রন্থ প্রচার করেন জুনাইদ বাগদাদী (মৃঃ ৯০৯-৯১০ খ্রীঃ)। এঁর শিষ্য খোরাসানের আস্‌শিবলীর (মৃঃ ৯২১ খ্রীঃ) প্রচারণায় সূফীমত প্রসার ও জনপ্রিয়তা লাভ করে। সূফীমতও গুরুপ্রোক্ত হওয়ায় সূফীবাদ বলতে কোন একক মত বোঝায় না। তবে এর ভিত্তি হচ্ছে জীবাত্মা-পরমাত্মার প্রেমবাদ। সে-প্রেমে আশেক বা প্রেমিক হচ্ছে মানুষ বা মানবাত্মা আর মাশুক হচ্ছে পরমাত্মা বা আল্লাহ। সৃষ্টি-প্রেমেই সৃষ্টা-প্রেমের বিকাশ, কাজেই জীবসেবা বা জীবে দয়া এ মতের একটি লক্ষণ। ইরানী সর্বশ্বেবাদ, বৈদান্তিক অদ্বৈতব্রহ্মবাদ, বৌদ্ধ নির্বাণবাদ বা শূন্যতত্ত্ব, এমন কি নব প্ল্যাটোনিক আত্ম-পরমাত্মা তত্ত্বও সূফীমতের অবলম্বন হলেও মৌলতত্ত্ব হিসেবে সূফীরা যেহেতু ইসলাম অঙ্গীকার করেই এ মতের প্রতিষ্ঠা ও প্রসার কামনা করেছেন, সেহেতু কোরআনের কয়েকটি আয়াতের দূরান্বিত ব্যাখ্যা ও সমর্থন সংগ্রহ করে এ মতবাদের উৎস কোরআন বলেই দাবি করেছেন—যেমন, আল্লাহকে ঘন ঘন স্মরণ কর। ৩৩/৪৯) —একে যিকর নির্দেশক বলেই সূফীরা মনে করেন। হোসেন পুত্র মনসুর হাল্লাজ (মৃঃ ৯২১ খ্রীঃ) এবং ইব্রাহিম অদহম (মৃঃ ৭৭৭ খ্রীঃ) বায়েজীদ বিস্তামী ওরফে আবু এযিদ (মৃঃ ৮৭৩ খ্রীঃ) ছিলেন অদ্বৈতবাদী সূফী। 'আনাল হক' আমিই আল্লাহ'[সোহ্‌হম] উচ্চারণের দরুন মনসুর হাল্লাজ শরীয়তপন্থীদের হাতে নিহত হয়েছিলেন।

আগের মতোই আজকের দিনেও সূফীমত বলতে গুরুপন্থী নানা মত-সমষ্টিই বোঝায়। ভোগে অনাসক্তি, আল্লাহপ্রেম, জীবসেবা, আরফানা (আল্লাহতে আত্মসমর্পণ-অহংকার বিলোপ) এবং বাকা (আল্লাহতে অভিন্ন হয়ে মিশে যাওয়া) লক্ষ্যে দেহ-মন-আত্মযোগে সাধনা করাই সূফীর লক্ষ্য। ইসলামের প্রভাবে ঔপনিষদিক অদ্বৈতবাদীরা হল দ্বৈতবাদী আর স্রষ্টা-সৃষ্টি দ্বৈতবাদীরা হল বেদান্ত প্রভাবে অদ্বৈতবাদী, বাকাবিল্লাহ তত্ত্ব তারই প্রমাণ। সাধনায় সিদ্ধ সূফী হয় 'ইনসানুল কামেল'—পূর্ণ মানুষ। এ অবশ্য নীটশে কিংবা বানার্ডশ বর্ণিত পার্থিব সমাজের 'সুপারম্যান' নয়।

বলেছি, এদেশে ইসলাম প্রচার করেন সূফী-দরবেশরাই। দেশজ মুসলিমরা পূর্ব-পুরুষের আচার-সংস্কার বাঞ্ছিত মাত্রায় ভুলতে পারেনি প্রতিবেশের আনুকূল্য ছিল না বলে। কাজেই সূফীতত্ত্বের সঙ্গে যে-কিছুতে সাদৃশ্য-সামঞ্জস্য দেখেছে, তারা তা-ই গ্রহণ করেছে। একারণেই বৌদ্ধ নাথপন্থ, সহজিয়া তান্ত্রিক সাধনা, যোগ, কায়-সাধনা, শাক্ত তন্ত্র, বামাচারী সাধনা প্রভৃতি তাদেরও চর্যার অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। এভাবে তারাও স্বদেশে খাড়া করেছে মিশ্র দর্শন। ডক্টর সুনীতি কুমার চট্টোপধ্যায় তাই বলেন, "সূফীমতের ইসলাম সহজেই বাঙ্গলার প্রচলিত যোগামার্গ ও অন্যান্য আধ্যাত্মিক সাধনমার্গের সঙ্গে একটা আপোস করিয়া লইতে সমর্থ হইয়াছিল।"[৭]

ভারতবর্ষে সাধারণভাবে এগারো শতক থেকেই সূফী সাধক-প্রচারক প্রবেশ করতে থাকেন, তেরো শতকের মধ্যেই তাঁদের সর্বাত্মক হতে থাকে। এ দেশে চৌদ্দটি গুরুবাদী সূফী খান্দাল বা সম্প্রদায় প্রখ্যাত হলেও উপশাখাও ছিল অনেক। বহিরাগত কাদিরিয়া,

সুহরওয়ার্দিয়া, চিশতিয়া, নকশবন্দিয়া, ছাড়াও দেশজ কলন্দরিয়া, মাদারিয়া, গাওসিয়া, নিজামিয়া প্রভৃতি সূফীমতও জনপ্রিয় হয়েছিল।

কামরূপ-কামাখ্যার ডাকিনী-যোগিনীদের মন্ত্র-মাদুলী যাদু—ইন্দ্রজাল, তুক-তাক প্রভৃতির সঙ্গে মোকাবিলা করতে হয়েছে বলেই হয়তো মাদারিয়া ফকিরদের নানা যাদু-কিরামতির আশ্রয় নিতে হয়েছিল। আজো 'মাদারির খেল' কথাটিও সে-ঐতিহ্য স্মরণ করিয়ে দেয়। হিন্দু-বৌদ্ধ দেবতা-উপদেবতাদের নাকি মৎস্য ও কূর্মকরে মাদারিয়ারা খানকার ও দরগাহর পুকুরে আজো বন্দী করে রেখেছেন। এদেশের সূফীরা যোগ, তন্ত্র ও বামাচারী চর্যাও গ্রহণ করেন। সম্ভবত বৌদ্ধ-হিন্দু ধর্মে বিশ্বাসীদের তত্ত্বের, নিয়মনীতির ও রীতিপদ্ধতির সাদৃশ্য দেখিয়ে সহজে স্বমতে আকৃষ্ট করার জন্যে তাঁরা এ পন্থা গ্রহণ করেছিলেন।

মধ্যযুগের ভারতে বিভিন্ন স্থানে, বিভিন্ন সময়ে বিবিধ শাস্ত্রিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও রাজনীতিক প্রয়োজনে ভাব-চিন্তার, কর্ম-আচরণের, প্রথা-পদ্ধতির এমনকি ধর্মের ক্ষেত্রেও সমন্বয়ের, ঐক্যের, মিশ্রণের, সহিষ্ণুতার ও সহাবস্থানের বাণী বার বার উচ্চারিত হয়েছে উচ্চকণ্ঠেই। দীর্ঘকালের প্রতিবেশীসুলভ দেয়া-নেয়া জ্ঞাতে-অজ্ঞাতে অনেক হয়েছে জীবনের, মননের, কর্মের ও আচরণের নানা ক্ষেত্রে।

ইসমাইলী, বা আগাখানী খোজা, কাকাপন্থী, ইমামশাহী, রাজপুতনার মেও[Meo] মিরাশি, সামসী, রসুলশাহী, আরুবারা, দুদেকুল, মায়াকোয়্যা, কাটিক প্রভৃতি হিন্দুমুসলিম মিশ্র মতবাদী সম্প্রদায় আজো ভারতের নানাস্থানে ছড়িয়ে রয়েছে।[৮] আর সন্তধর্মে তো মিশ্রণ রয়েইছে। সমন্বিত সংস্কৃতির সবচেয়ে বড় প্রমাণ রয়েছে সঙ্গীতে ও সাহিত্যে, তারপর বোধ হয় চিত্রকলায় ও স্থাপত্যে। দীর্ঘকালের প্রতিবেশীদের মধ্যে লঘু-গুরু প্রভাব হয় পারস্পরিক। আর মনের, মতের, তত্ত্বের ও প্রথাপদ্ধতির সমন্বয় ও মিশ্রণ আরো নিবিড়, গভীর, ও ব্যাপক হয়েছিল গৌড়ীয় নববৈষ্ণব ধর্মে ও চর্যার এবং বাঙলার তথা ভারতের সূফীসাধনায়। বৈষ্ণব মতবাদের পরিচয় আগেই দেয়া হয়েছে।

এখানে সূফীমতের স্থানীয় বিকাশে দৈশিক ঋণের হিসেবে দিচ্ছি : ভারতের বিভিন্ন সূফীমতের ওপর স্থানিক প্রভাব পড়েছে নানাভাবে। নকশ-বন্দিয়া মতবাদে ও সাধনতত্ত্বে ভারতীয় দেহতত্ত্বের ও যোগের প্রভাব পড়েছে সব চেয়ে বেশি। তারাও স্বীকার করে কুণ্ডলিনী শক্তি, ষড়কেন্দ্রী দেহে ষড়-রঙের আলো সন্ধান করা এবং সেই ষড়বর্ণের জ্যোতিকে বর্ণহীন জ্যোতিতে পরিণত করাই সাধনার লক্ষ্য। এটি শিব-শক্তি মিলনজাত সচ্চিদানন্দের কিংবা বৌদ্ধ সহজানন্দের, সামরস্যের, বোধিচিত্তাবস্থার আদলে পরিকল্পিত। অন্যান্য ঋণ এরূপ :

১. বৌদ্ধ চর্তুষ্কায়ের আদলে তন লতিফু, তন কসিফু, তনফানি এবং তন বকাউ কল্পিত।
২. আবার চার দীলও কল্পিত হয়েছে : দীল আম্বরী, সনুবরী, নিলুফারী, ও মুজাওয়ালী। এটিও বৌদ্ধ চার তত্ত্বের—আত্মতত্ত্বের, মন্ত্রতত্ত্বের, দেবতাতত্ত্বেরও জ্ঞানতত্ত্বের অনুকৃতি। আবার হারিস, মারিস, মুকিম ও মুসাফির এ চার 'রুহ'ও হয়েছে কল্পিত।
৩. হিন্দুর ষটচক্র এবং ষড়পদ্মও হয়েছে স্বীকৃত। মূলাধার, মণিপুর, অনাহত ও আজ্ঞাচক্র—এ চারটির রয়েছে বিশেষ গুরুত্ব।
৪. কুণ্ডলিনী ও পরশিবশক্তিকে এঁরা অভিহিত করেছেন জ্যোতি : [লতিফা] নামে।

৫. আবার ষড়পদ্মর আদলে ষড় লতিফাও হয়েছে কল্পিত। কল্‌ব [রুহঃ হৃদয়], সির [সুপ্তহৃদয়], খাফি [গুপ্ত আত্মা], কসফ্‌ [বিবেকী আত্মা] ও নফস [দুষ্প্রবৃত্তি] এগুলো নকশবন্দিয়া খানদানের পরিকল্পিত। অন্য এক মতে রুহ্‌ চার প্রকার : নাতকি, সামী, জিসিমি ও নাসি| সির্নামা দ্রষ্টব্য|।

৬. ইড়া [গঙ্গা] পিঙ্গলা [যমুনা] সুষুম্না [সরস্বতী] নাড়ী ও প্রাণ-অপ্রাণ বায়ুর নিয়ন্ত্রণ ও উল্টা সাধনা এঁদেরও বাঞ্ছিত।

৭. চক্রের অধিষ্ঠাত্রী বৌদ্ধ দেবতা লোচনা, মামকী, পাণ্ডুরা ও তারার মতো কিংবা হিন্দুতন্ত্রের চক্রদেবতা : ব্রহ্মা-ডাকিনী, মহাবিষ্ণু-রাকিনী, রুদ্র-লাকিনী, ঈশা-কাকিনীর মতো চতুর্দ্বারের জন্যে চার ফিরিস্তা-জিব্রাইল, মিকাইল, ইস্রাফিল ও আজরাইল প্রহরী হিসেবে কল্পিত।

৮. অদ্বৈততত্ত্ব ও সর্বেশ্বেরবাদ সব খানদানই বরণ করেছে। এবং বাকা-বিল্লাতে [আল্লাহ্‌তে তাঁর অংশ হিসেবে লীন হওয়া] আস্থাও দুর্লক্ষ্য নয়। হমহউস্ত [সবই আল্লাহ্‌, সর্বেশ্বরবাদ] এ বিশ্বাসে এবং হাহুত [পরমাত্মার সঙ্গে একাত্ম অবস্থা] লক্ষ্যে সাধনায় নির্বাণের ও অদ্বৈতবাদের প্রত্যক্ষ অনুকৃতি রয়েছে।

৯. আসন, ন্যাস, প্রাণায়াম, জপ, সমধি প্রভৃতিও হয়েছে সূফীদের যিকরের অপরিহার্য অঙ্গ। রেচক, পূরক ও কুম্ভক সূফীদের 'দম' নিয়ন্ত্রণ চর্যার অঙ্গ।

১০. প্রবর্ত, সাধক ও সিদ্ধার অনুকরণেই সম্ভবত রাবিতা [গুরুসংযোগ] ও মুরাকিবাহ [আল্লাহর ধ্যান] তথা ফানাফিশশেখ [গুরুতে আত্মসমর্পণ] এবং ফানাফিল্লাহ [আল্লাহতে আত্মসমর্পণ] এবং পরে বাকা-বিল্লাহ (আল্লাহতে লীন) হওয়ার সাধনা চলে।

১১. নিরাকার আল্লাহ্‌কে নাথ, নিরঞ্জ, ও শূন্য [উত্তরভারতে রাম, কৃষ্ণ, হরি] বলে আখ্যাত করা আর জীবাত্মা-পরমাত্মার রূপক হিসেবে 'রাধা-কৃষ্ণ' রূপক গ্রহণ।

১২. আগেই বলেছি এ সাধনা গুরু বা পীর নির্ভর সাধনা, গুরুবাদ বিশেষ করে বৌদ্ধদেরই দান। কোন কোন খানদানের সূফীরাও বৌদ্ধ শূন্যবাদে ও পরকীয়ারতি সাধনায় আস্থা রাখেন।

১৩. 'ঘর্ম' থেকেই যে সৃষ্টিপত্তন, তা সব বাঙালী সূফীই মেনে নিয়েছেন (শূন্য পুরাণ দ্রষ্টব্য) এবং আল্লাহর নূরে মুহম্মদ সৃষ্টি ও মুহম্মদের নূরে জগৎসৃষ্টি আর আল্লাহর রসূলপ্রেমই হচ্ছে সৃষ্টির উৎস—বাঙালী তথা ভারতীয় মুসলিমের এ বিশ্বাসও দৃঢ়।

আর একটি কথা, ইরানে জীবাত্মা-পরমাত্মার মানবিক প্রেম-সাধনার রূপক ছিল প্রেম-সরাব, সাকি-গুরু, আশেক-জীবাত্মা, মাশুক-পরমাত্মা। কাজেই ওই ঐশ প্রেম গানে-কবিতায় অভিব্যক্তি পেয়েছে সাকি-প্রদত্ত সরাবে মত্ত আশেকের মাশুকের জন্যে আকুলতা প্রকাশে। বাঙলায় চৈতন্যপ্রবর্তিত নব-গৌড়ীয় বৈষ্ণব ধারণায় হৃদয়রূপ বৃন্দাবনে রাধারূপিনী জীবাত্মা কৃষ্ণরূপী পরমাত্মার সঙ্গে অনুরাগে-রাগে মানে-বিরহে মিলনে প্রেম আস্বাদন করছে, প্রেম দিচ্ছে, প্রেম পাচ্ছে। ভাবে অনুভবে তথা কল্পনায় হচ্ছে মিলন। বৈষ্ণবেরও সাধন-ভজন চলে গানের মাধ্যমে রাধা-কৃষ্ণের স্মরণে ও অনুধ্যানে। ইরানে নারী দুর্লভ বলে সেকানে আশেক বা প্রেমিক হচ্ছে পুরুষ আর আরাধ্য পরমাত্মা হচ্ছে নারীরূপ। ভারতে নারী সুলভ বলে এখানে পরমাত্মা হচ্ছে দুর্লভ পুরুষ, তাই এখানে রাধাভাবে করতে হয় সাধনা এবং নারী-পুরুষের কাম-প্রেমকে এবং প্রণয়রীতিকেই অঙ্গীকার ও অনুসরণ করা হয়েছে বৈষ্ণব-তত্ত্বেও গানে।

সেজন্যে চৌষট্টি প্রকার রসানুভূতি দিয়ে আস্বাদন করা হয় ঐশ-প্রেম। তাতে তাই রাস, মৈথুন, বস্ত্রহরণ, দান, সম্ভোগ প্রভৃতিও রয়েছে। বাঙালী সূফীরা 'রাধা-কৃষ্ণ'-এর দেশী রূপক গ্রহণ করেছে, ইরানী রূপক গ্রহণ করা সম্ভব হয়নি ভৌগলিক ও মানসিক ব্যবধানজাত অজ্ঞতার দরুন। কাজেই একেশ্বরবাদী সূফীরা কেবল রূপানুরাগ-অনুরাগ-বংশী, অভিসার-মিলনকে ও বিরহকেই অবলম্বন করেছিল তাদের ঐশ প্রেমাকৃতির অভিব্যক্তি দানের বাহন হিসেবে। মুসলিম পদকারের রচনায় অনুরাগ, বিরহ ও জিজ্ঞাসাই প্রকট।

সৃষ্টিলীলা দেখে স্রষ্টার কথা মনে পড়ে—এটিই রূপচেতনা, সৃষ্টিবৈচিত্র্য দেখে স্রষ্টার সঙ্গে সম্পর্কবোধ জন্মে—এটিই অনুরাগ এবং তাঁর প্রতি কর্তব্যবুদ্ধি জাগে—এটিই বংশী, আর সাধনার প্রথম স্তরে জাগে পাওয়া-না-পাওয়ার সংশয়বোধ—তারই প্রতীক নৌকা, পরে জাগে আত্মসমর্পণের আকাঙ্ক্ষা—এটিই অভিসার। এর পরে আল্লাহর তুষ্টি সম্বন্ধে আত্মপ্রত্যয়ী হলে, যে অধ্যাত্ম স্বস্তি মেলে-তা-ই মিলন এবং এরও পরে যে একাত্ম বা অভিন্নসত্তা হওয়ার (বাকাবিল্লাহ) আকুতি জাগে, তা-ই বিরহ। কাজেই বৈষ্ণব মহাজন-রচিত ও বৈষ্ণব আস্বাদিত পদে আর মুসলিম-রচিত পদে ভাবগত পার্থক্য মৌলিক।[১]

শঙ্কর থেকে সূফী পর্যন্ত আমরা যে-ধারার আলোচনা করলাম, তাতে সন্ন্যাস, বৈরাগ্য ও পারত্রিক কল্যাণ চিন্তাই ছিল মুখ্য এবং প্রবল। যদিও মূলে পরলোকে প্রসারিত ঐহিক জীবন সম্বন্ধীয় শ্রেয়োচেতনাই ছিল প্রণোদনার উৎস। ভারতের আবহাওয়ায় স্থূল ঐহিকতাও পারত্রিকতার, বৈরাগ্যের, ভোগবিমুখতার আবরণে ঢেকে রাখার প্রবণতাটা লক্ষণীয়।

অবশ্য এদের মধ্যে বাস্তবে ভোগমোক্ষবাদী সম্প্রদায়ও রয়েছে। প্রাচীন ভারতের মুনি ঋষি থেকে শুরু করে সন্ন্যাসী-শ্রবণ-শ্রাবণ-ভিক্ষু-বৈরাগী-ফকির-দরবেশ-গুরু-পীর-মোল্লা-পুরুত-পাদ্রী-শাস্ত্রী সবাই সাধারণভাবে হয় বৈরাগ্যবাদী, নয়তো কর্মবিমুখ ভোগমোক্ষবাদী। এঁরা সবাই এ যুগের সমাজ-সচেতন মানুষের চোখে সমাজের দায় বা বোঝা, কেননা এঁরা আবহমানকাল ধরে পরান্ন ও পরশ্রমজীবী কর্মকুণ্ঠ নিষ্ক্রিয় বা বেকার কিন্তু পূজনীয় মানুষ। এঁদের ভিক্ষাবৃত্তিও তাই সন্ন্যাসধর্ম, ফকিরি-ভিক্ষুকবৃত্তি নয়। ভিক্ষু-বৃত্তিও পবিত্র অর্ঘ্য, নৈবেদ্য, ও ভোগস্বরূপ। আগের যুগের মানুষের ধারণায় এবং এ যুগেরও শতকরা পঁচানব্বই জনের বিবেচনায় এঁরা আছেন বলেই আজো দুনিয়ার ধর্মাধর্ম আছে, আজো আকাশে চন্দ্র-সূর্য ওঠে। এঁদের জীবন-দৃষ্টি যেমন আসমানী, এঁদের উচ্চারিত কথাও তেমনি আকাশ-ছোঁয়া। এঁদের জগৎ-চেতনাও গগনচুম্বী : মাটি ও মানুষ, রূঢ় জগৎ ও বাস্তব জীবন এঁদের মনে-মননে তুচ্ছ না হলেও (এঁদের আচরণে প্রমাণ থাকে) এঁদের উচ্চারণে নিতান্ত ক্ষণস্থায়ী ও অসার, তাই তুচ্ছ। এঁদের উচ্চারিত বাণী সাধারণ মানুষকে পার্থিব কর্তব্য পালনে দ্বিধাগ্রস্ত ও অবহেলাপ্রবণ করে। মাটির ও মানুষের টানে, প্রিয়জীবনের পরিচর্যার গরজে বিষয়-বুদ্ধি ও মনীষা-মনস্বিতা সম্পন্ন মানুষ যে আবিষ্কারে উদ্ভাবনে নিষ্ঠ হয়ে ঐহিকজীবনের, তথা বাস্তব জীবনের, সমাজের, ও মানুষের জীবনযাত্রার সৌকর্য উৎকর্ষ সাধন করতে পারত, তা' এদেশে সম্ভব হয়নি—এসব পরম শ্রদ্ধাস্পদ-ভক্তি-ভাজন পরান্নাজীবীর মহৎ ও গূঢ় কথার জালে আবদ্ধ মানুষের মুগ্ধতার দরুন!

পরলোকে যে মানুষের নিসংশয় আস্থা আছে তা' নয়, যাচাই করার উপায় নেই বলে অবিশ্বাস করতে সাহস পায় না মাত্র। এ জীবনে যে অমূল্য সম্পদ, এ পৃথিবী যে অতুল্য প্রিয়, প্রেয় ও শ্রেয়, তা বেঁচে থাকার একান্ত আকাঙ্ক্ষা থেকেই বোঝা যায়। এদেশের সাহিত্যে দর্শনে মধুর ও সূক্ষ্ম চেতনার, উচ্চ-মানের চিন্তার, মহৎকথার সাক্ষাৎ মেলে বটে, কিন্তু বাস্তব জীবনের

চাহিদা পূরণের প্রেরণা মেলে না, তাই এদেশে কাঙাল, মানুষের, অলস মানুষের, বৃহৎ আকাঙক্ষাহীন মানুষের দেশ।

ফলে রূঢ় বাস্তব জীবনের প্রয়োজনের তাগিদে অধিকাংশ মানুষ হয়েছে আত্মমর্যাদাবোধহীন, নৈতিকচেতনা বঞ্চিত, খল-শঠ-প্রবঞ্চক, তাই চাল-চালাকি-কাপট্যই তার জীবন ধারণে অবলম্বিত পন্থা। ওই ঈশ্বরগত প্রাণ মহৎ মানুষের প্রচারিত ভোগবিমুখতা ও মহৎ চেতনা কিংবা 'দীন' বা অনাড়ম্বর জীবন ও 'মহৎ চিন্তা'-নীতির প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ পরিণাম হল ধনে ও মনে কাঙাল ও দুর্জন মানুষের সাংখ্যাধিক্য আর বাঞ্ছিত মানের ও মাপের সুস্থ ও স্বস্থ নীতিবান-বিবেকবান মানুষের স্বল্পতা। তাই দেশে আজো ঈশ্বরে সমর্পিত-চিত্ত বেকার ও ভিক্ষাজীবী শাস্ত্রী-বৈরাগীর সংখ্যা লক্ষ লক্ষ—পরিবার সমেত কোটি কোটি। এখানেই শেষ নয়, হাজার হাজার বছর ধরে ওই পরান্ন ও পরিশ্রমজীবী ভক্তিভাজন শ্রেণী জনমনে তাঁদের সম্বন্ধে এমন দৃঢ়মূল ধারণাও দিয়েছেন যে ভাবে-চিন্তায়, কর্মে-আচরণে, সেবায়-সততায়, কৃপায়-ক্ষমায়, পুণ্যে-পবিত্রতায়, গুণে-মানে, জ্ঞানে-প্রজ্ঞায় মাহাত্ম্যে-মহিমায় এবং দেহেমনে-আত্মায় তারাই কেবল নিখুঁত আদর্শ ও পূর্ণমানুষ। কোন গৃহী মানুষে যেন সততা, সেবা, ক্ষমা, দয়া, ত্যাগ-প্রভৃতি গুণ থাকে না বা থাকতে পারে না। এজন্যেই সাহিত্যে সজ্জন-সেবক-জ্ঞানী-গুণী পরোপকারী মানুষ প্রয়োজন হলেই সাধু-সন্ন্যাসী-ব্রহ্মচারী-মুনি-ঋষি-ফকির-দরবেশ-বৈরাগী-শ্রমন-ভিক্ষু, নিদেনপক্ষে মোল্লা-পুরুত-পাদ্রী চরিত্রের অবতারণা করেন বঙ্কিম-রবীন্দ্রনাথের মতো মহৎ শিল্পীরাও।

আমরা জেনেছি, একদিকে শঙ্কর থেকে সূফী-বৈষ্ণব অবধি জ্ঞান-কর্ম-ভক্তি-প্রেমবাদী সন্তধর্মের প্রচার, প্রসার ও উৎকর্ষ যেমন ঘটেছিল, অন্যদিকে তেমনি রূঢ় বাস্তবজীবনের ও জীবিকার ক্ষেত্রে স্বস্তি-সুখ-নিরাপত্তা এবং দুঃখ-বিপদ-যন্ত্রণামুক্তির লক্ষ্যে অরি ও মিত্র দেবতার সৃষ্টি, প্রতিষ্ঠা এবং জনপ্রিয়তাও বেড়েছিল।

তদবীরে তক্‌দীর বদলানো যায়—এ বিশ্বাস মানুষ কোনোদিন হারায়নি। তাই ভাগ্য পরিবর্তনের জন্যে মানুষ জ্ঞান, বিশ্বাস ও শক্তি অনুসারে চিরকালই প্রয়াস-প্রচেষ্টা চালিয়েছে। এবং তা করেছে অদৃষ্ট, বিধিলিপি বা কপালের লিখন অমোঘ-অখণ্ডনীয় বলে বিশ্বাস করেও। মানুষ যে কেবল প্রকৃতির ও প্রাকৃতশক্তির কাছেই অসহায় তা নয়, প্রবল দুর্জন মানুষেরও পীড়ন পাত্র সে। প্রকৃতির মারে তবু নিরুপায় মানুষের প্রবোধ মেলে অমিত শক্তি দেও-দেবতার বা আল্লাহর মার বলে; কিন্তু দুরাত্মা-দুর্জনের চাপে পিষ্ট মানুষ ক্ষোভ-দুঃখ-যন্ত্রণা ভুলতে পারে না।

দুর্বল অসহায় মানুষ সর্ব প্রকার নিরাপত্তা বাঞ্ছায়—যাঁরা রোগ-শোক-মৃত্যুর, মানুষ সমেত জীব জগতের এবং সুখ-স্বাস্থ্য-সৌভাগ্যের আর দুঃখ-বিপদ-যন্ত্রণার নিয়ন্তা বলে কল্পিত, সেই অরি ও মিত্র, মন্দ ও মঙ্গল শক্তির প্রতীক দেবতাকে স্মরণ ও শরণ করেছে চিরকাল। আগেও বলেছি, এমনি প্রয়োজনে উদ্ভাবিত দেবতারা হচ্ছেন মানুষের ঐহিক জীবনের সহায় মাত্র, পারত্রিক জীবনের দিশারী নন। অন্যান্য অঞ্চলের মানুষের তুলনায় বাঙালীর দেবতার সংখ্যা বেশি। অন্যান্য প্রদেশে মানুষ সাধারণভাবে একক দেবতার উপাসক, বাঙালী হচ্ছে পঞ্চোপাসক তথা বহুদেবতার অনুগত। চিরকাল বিদেশী-বিভাষী-বিজাতির শাসনে, পীড়নে, শোষণে, পেষণে পর্যুদস্ত প্রত্যন্ত অঞ্চলবাসী এ মানুষ কারুর মার ঠেকানোর যোগ্যতা বা শক্তি রাখত না বলে, কেবল তোয়াজে-তোষামুদে, তুক-তাক-মন্ত্র-মাদুলীর প্রয়োগে আত্মরক্ষা

করতে চেয়েছে। তাই তাকে জীবন-জীবিকার সবক্ষেত্রেই সংরক্ষক-সহায়ক তদারকী দেবতা সৃষ্টি করতে হয়েছে, বাস্তবে নয়-বিশ্বাসের দুর্গে স্বস্তি সুখে বাস করবার জন্যেই।

এবার শেষ দেবতা পীর-নারায়ণ 'সত্য'-এর উদ্ভব-উদ্ভাবনার কারণ আর্থ-সামাজিক ও রাজনীতিক-সাংস্কৃতিক প্রতিবেশে সন্ধান করা যাক।

১৩৩৮ থেকে ১৫৩৮ খ্রীস্টাব্দ অবধি বাঙলাদেশ শাসন করেছেন স্বাধীন তুর্কী সুলতানেরা। এঁরা এখানেই বাস করতেন বলে তখন দেশের সম্পদ বিদেশে পাচার হত না, কিছু বিদেশী চাকুরে ও বেণে সামান্য সম্পদ মুদ্রার আকারে বাইরে নিয়ে যেত অবশ্য। সে-কারণে তখন বাঙলার ছিল সমৃদ্ধির কাল। ১৫৩৮-৩৯ সনে হুমায়ুন-শেরশাহের বাঙলাবিজয় থেকেই বাঙলার আর্থ-শাসনিক বিপর্যয় শুরু হয়। তারপর সুরদের শাসনান্তে ১৫৫৪-৬০ সনের মধ্যেকার স্বল্প সময়ে সামসুদ্দীন মুহম্মদ শাহ্‌গাজীর রাজ্যচ্যুতি ও তাঁর পুত্র গিয়াসউদ্দীন বাহাদুর শাহর পিতৃসিংহাসন উদ্ধার ও তাঁর পুত্র গিয়াসুদ্দীন জালাল শাহর রাজত্ব এবং তাঁর পরে অপর সুলতান্ গিয়াসসুদ্দীনকে হত্যা করে ১৫৬০ সনে তাজখান কররানীর ও সোলায়মান কররানীর গৌড়-সিংহাসন অধিকার, ১৫৭৫ খ্রীস্টাব্দে মুঘল বাহিনীর বঙ্গবিজয় প্রভৃতি ১৫৩৮-৭৫ খ্রীস্টাব্দের সাঁইত্রিশ বছরের পরিসরে বাঙলায় প্রশাসনিক অস্থিরতার এবং তজ্জাত বিশৃঙ্খলার ও অনিশ্চয়তার কাল।

১৫৭৫ সনে যুদ্ধক্ষেত্রে মুঘলবিজয় ঘটলেও দেশে স্বাধিকার ও শাসন প্রতিষ্ঠা করতে ১৬১৭ খ্রীস্টাব্দ অবধি বিয়াল্লিশ বছর ধরে স্থানীয় ভূঁইয়া-সামন্তদের সঙ্গে মুঘলসেনানী-সুবাদারকে অনেক খণ্ড-যুদ্ধ করতে হয়েছে। এ সময়টা ছিল দ্বৈত-শাসনের নয়—দ্বৈত শোষণের। তখন মুঘল ও স্থানীয় ভুঁইয়া সামন্তরা প্রজার পালন-পোষণের কোন দায়িত্ব গ্রহণ করেনি, কেবল শাসন-শোষণের তথা শাসনের ও যুদ্ধকালীন রাজস্ব আদায়ের নামে উভয়পক্ষই ত্রাসের ও লুঠের রাজত্ব চালিয়েছে।

তারপর জাহাঙ্গীরের আমলে ১৬১৭ খ্রীস্টাব্দে গোটা বাঙলা-বিহার-উড়িষ্যার মুঘল শাসন দৃঢ় ও সুষ্ঠুভাবে প্রতিষ্ঠিত হল বটে, কিন্তু ততদিনে অন্য উপসর্গও গুরুতর রূপ নিয়ে প্রকট হয়ে উঠেছে। মুঘলরা ছিল সাত সাগরের না হলেও তেরো নদীর ওপারের সাম্রাজ্যবাদী শাসক। কাজেই ভূমিরাজস্ব, বাণিজ্যশুল্ক, আবগারীকর, সেনাবাহিনীর ও শাসক-প্রশাসকদের জায়গীর ও মাসমাইনে প্রভৃতির আকারে ও নামে শোষিত বাঙলার সম্পদ মুদ্রার আকারে নিত্য চালান হচ্ছিল বাঙলার বাইরে। আর পর্তুগীজ প্রভৃতি য়ুরোপীয় বেণেরা এখানে প্রায় অবাধে বাণিজ্য তো করতই, তার ওপর পর্তুগীজ জলদস্যুরা বঙ্গোপসাগরের উপকূলাঞ্চলে তো বটেই, ভাগীরথী, পদ্মা, মেঘনা, শীতলক্ষা প্রভৃতি নদীর তীরাঞ্চলেও বহুদূরব্যাপী লুটপাট করত এবং মানুষও ছিল সে লুটের মালের অন্তর্ভুক্ত। পরে পর্তুগীজ হার্মাদদের সঙ্গে জুটে যায় আরাকানী দস্যুরাও।

১৬৬৬ খ্রীস্টোব্দে সুবাদার শায়েস্তা খান তাঁর পুত্র বুজুর্গ উমেদ খানের নেতৃত্বে চট্টগ্রাম জয় করে পর্তুগীজ ও আরাকানী দস্যুদের হামলা থেকে বাঙলাকে চিরকালের মতো উদ্ধার করেন বটে, কিন্তু দেশী বেণেদের বঞ্চিত করে সুবেদার শায়েস্তাখানের, আজিমুশশানের ও ফররখশিয়রের নুন-সুপারীর একচেটিয়া ব্যবসায়ে ব্যক্তিগত সম্পদ আহরণ, পুরো সতেরো শতকে এবং আঠারো শতকের প্রথমার্ধে য়ুরোপীয় বেণেদের বাঙলাদেশে বাণিজ্যের নামে বাঙলার সম্পদের অবাধ লুণ্ঠন বাঙলার আর্থিক জীবন পঙ্গু করে দিচ্ছিল। তারপরে ১৭০৭ খ্রীস্টাব্দে আওরঙ্গজেবের মৃত্যুর পরে বাঙলাদেশে দুঃশাসন এবং দেশী-বিদেশীর পীড়ন শোষণ

বাড়ল। চারবছুরে ছকে বিন্যস্ত সুবাদারী বংশগত নওয়াবীতে হল পরিণত দিল্লীর কেন্দ্রীয় সরকারের দুর্বলতার ফলে। মুরশিদ কুলিখাঁর দৌহিত্র সরফরাজখানের বিশ্বাসঘাতক নায়েব নাজিম আলিবর্দী গিরিয়ার প্রান্তরে নামে মাত্র যুদ্ধে সরফরাজখানকে পরাজিত ও নিহত করে বাঙলার মসনদে বসে সতেরো বছর রাজত্ব করেন বটে, কিন্তু তাঁকেও বারোখানা যুদ্ধের এবং মারাঠার হাতে পরাজয়ের ও বার্ষিক বিশ লক্ষ টাকা চৌথদানের মতো বিপুল অর্থব্যয়ের বিপর্যয়ের ঝুঁকি নিতে হয়েছিল, এমনকি সিরাজুদ্দৌলাকেও তেরো মাসের নবাবী কালে তিনখানা ব্যয়বহুল যুদ্ধাভিযান করতে হয়। তারপরের ইতিহাসও ভয়ঙ্কর ও জটিল। বিশ্বাসঘাতক মীরজাফরকে ক্লাইভদের ঘুষ দিয়েই করতে হয়েছে বশ ও রাখতে হয়েছে বশে, আবার তাঁর জামাতা মীর কাসিমকেও কোম্পানী-কর্তাদের ঘুষে বশ করেই কাড়তে হয়েছে শ্বশুরের মসনদ। তারপর কোম্পানীর দেওয়ানী লাভ ও লুণ্ঠন, দ্বৈতশাসনের নামে অশাসনের কালে প্রজার পালন-পোষণ-শাসনকর্তার অভাবে উদ্ভূত জীবন-জীবিকার ক্ষেত্রে অনিয়ম ও অনিশ্চয়তা; মন্বন্তর, রাজস্বাদি সর্বপ্রকার কর বৃদ্ধি এবং বিলেতী পণ্যের বাজার বৃদ্ধির লক্ষ্যে কোম্পানী প্রতিকূলতায় দেশী বৃত্তিজীবীদের সর্বনাশের সূচনা প্রভৃতির সামষ্টিক, সামূহিক ও সামগ্রিক ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার ও প্রভাবের ফলে বাঙলার তথা বাঙালীর আর্থিক-সামাজিক, নৈতিক সাংস্কৃতিক জীবন হয়েছিল সর্বাংশে বিপর্যস্ত। অতএব ১৫৩৮ খ্রীস্টাব্দে যে দুর্ভোগ-দুর্দশার সূচনা, তার চরম অবস্থা মারাত্মক হয়ে প্রকট হল আঠারো শতকের শেষার্ধে।

আসলে চিরশ্রুত পারলৌকিক জীবন সম্বন্ধে কোনো মানুষেরই সংশয় কখনো ঘোচে না, সাহস নেই বলে অস্বীকার করতে কিংবা সংশয় ব্যক্ত করতে পারে না, এ-ই যা। তাই মৃত্যুকে এতো ভয়। মানুষের মনে সুনিশ্চিত পারত্রিক প্রত্যাশা নেই বলেই এ প্রাণ এতো প্রিয়, এ ভুবন এতো সুন্দর, এ জীবন এমন অতুল ঐশ্বর্য, এ মাটির এমন আকর্ষণ। তাই এ মানুষের ব্যক্তিক, স্থানিক ও সামাজিক জীবনে ও জীবিকায় যখন সঙ্কট দেখা দেয়, যখন বিপদ আপদ আসন্ন বা আপন্ন হয়, তখন অসহায় অজ্ঞ মানুষ বাঁচবার তাগিদেই অলৌকিক শক্তির শরণ সন্ধান করে দেবতা-প্রতীকে। সে-শক্তি অপ-উপ-দেবতা কিংবা অরি-মিত্র দেবতা হতে পারেন কিংবা পারেন জীন-পরী-ভূত-প্রেত-পিশাচ হতে। অথবা হতে পারে প্রেত-পিশাচ-দেবতা-মানুষ প্রভৃতি সবাইকে, সব কিছুকে দাস বা বশ করার যাদু শক্তিরূপ ঝাড়-ফুঁক, তুকতাক, দারুটোনা, বাণ-উচ্চাটণ, তাবিজ-কবজ, মন্ত্র-তন্ত্র বা ভাগা-মাদুলী।

জীবন-জীবিকার সংকট কালে বিচলিত ত্রস্ত মানুষ প্রচলিত শাস্ত্রে, আদর্শে ও নিয়ম-নীতিতে ভরসা হারায়। আশুবিপন্মুক্তির ও নিরাপত্তার গরজে নতুন পথ-পদ্ধতি খোঁজে, নতুন উপায় উদ্ভাবনে হয় উদ্যোগী, নতুন কোন শক্তিতে আস্থা রেখে আশ্বস্ত হতে চায় অন্তত মানসিকভাবে, নতুন বিশ্বাসের ও ভরসার দুর্গে আশ্রিত হয়ে পেতে চায় প্রবোধ। এমনি সামষ্টিক সঙ্কটলগ্নে উদ্ভাবিত হয় নতুন তত্ত্ব এবং জন্ম হয় নতুন দেবতার। পীর-নারায়ণ সত্যের ও তাঁর চেলা-দেবতাদের উদ্ভব বাঙলার ও বাঙালীর এমনি এক আর্থ-সামাজিক ও নৈতিক-সাংস্কৃতিক সঙ্কট ও বিপর্যয়কালে। কোন একক ঋজু কারণে হয়তো কিছুই ঘটে না সমাজক্ষেত্রে, প্রত্যক্ষ কারণ ছাড়াও অদৃশ্য ও পরোক্ষ কারণও থাকে, সবটা চেতনায় স্পষ্ট হয়ে ওঠে না, প্রতিফলিত হয় না মনের আয়নায়।

উপরে ষোল শতকের শেষার্ধ থেকে আঠারো শতকের শেষাবধি বাঙলার ও বাঙালী জীবনের সামগ্রিক বিপর্যয় ও অবক্ষয়ের জন্যে যে-সব কারণ পরম্পরার উল্লেখ করলাম, স্মরণে রাখার সুবিধের জন্যে সেগুলো এবং সে-কারণগুলোর ক্রিয়া-করণ এখানে পুনরাবৃত্তি করছি :

বিপর্যয়ের শুরু ষোল শতকের শেষার্ধে এবং বিস্তার সতেরো শতকে আর পূর্ণতা আঠারো শতকে। ১৫৩৮ সনে শেরশাহের বঙ্গবিজয় সম্রাট ইসলাম সুরের মৃত্যুতে বাঙলার প্রশাসনিক কোন্দল ও বিশৃঙ্খল, ১৫৫৫ থেকে ১৫৭৫ সন অবধি ঘন ঘন শাসক বদল ও যুদ্ধ-বিদ্রোহ, মুঘল বিজয়ের পরে বিয়াল্লিশ বছর ধরে সামন্ত-সম্রাটের দ্বান্দ্বিক অবস্থান ও তজ্জাত নৈরাজ্য আর য়ুরোপীয় বেণেদের নতুন আন্তর্জাতিক বাণিজ্যনীতির প্রভাব, গঘ-হার্মাদের লুটতরাজ এবং মুঘলদের সাম্রাজ্যিক শোষণ প্রভৃতি জনগণের আর্থিক-নৈতিক-সামাজিক-সাংস্কৃতিক জীবনে বিপর্যয় বিকৃতি ও ক্ষয়িষ্ণুতা আনে। কোথাও বাঞ্ছিত মানের ও মাত্রার নিয়মনীতি ও স্থিতিশীলতা ছিল না বলে, জীবন-জীবিকারও নিশ্চয়তা-নিরাপত্তা ছিল না, ফলে গণমানবকে সর্বক্ষণ উদ্বিগ্ন শঙ্কিত থাকতে হত।

এমনি অবস্থায় গীতায়-কোরআনের ভরসা, মহৎ তত্ত্বেও আদর্শে আস্থা কিংবা মন্দিরে-মসজিদে বিশ্বাস রাখা, পুরোনো মন্ত্র-মাদুলীতে নির্ভর করা সম্ভব হয়নি, আশু বিপদ-মুক্তিলক্ষ্যে দিশেহারা বিমূঢ় মানুষ জরুরী নিদান ও দ্রুত ফলপ্রাপ্তি কামনা করেছে এবং বিশ্বাস-ভরসার নতুন বন্দরে নোঙর ফেলে আশ্বস্ত হতে চেয়েছে। রাঢ়ের ও দক্ষিণ বঙ্গের (পুরোনো চব্বিশপরগনার যশোর-খুলনা অবধি অঞ্চলের) বিপন্ন মানুষ সেদিন জাত-জন্ম-বর্ণ-ধর্মের ভেদ ও অভিমান পরিহার করে বাঁচার ও বাঁচানোর যৌথ গরজে মতের আপোস-মুখী, মনের মিলনমুখী এবং উপাস্যের বা ইষ্টদেবতার ক্ষেত্রে সমন্বয়মুখী চিন্তা-ভাবনা শুরু করে।

বাঁচার ও বাঁচানোর লক্ষ্যে চিন্তা-ভাবনার প্রসূন হচ্ছে নির্জিত-দুস্থ-মানুষের মিলনমন্ত্র। সে-মন্ত্র হচ্ছে 'সত্য', যেন শাস্ত্র-সমাজ-সংসার-বিশ্বাস-সংস্কার সব মিথ্যা ও বৃথা—অনির্বাণ-অনাদি 'সত্য' ছাড়া আর কিছু নেই, কেউ নেই, ওই অব্যয় অবিনশ্বর সত্যই কেবল ধ্রুব। এবং 'সত্য' কাউকে কখনো করে না বঞ্চনা, তাই সত্যই কেবল মানুষকে দুঃখ-বিপদ-যন্ত্রণা-দারিদ্র্য থেকে রক্ষা ও উদ্ধার করতে সমর্থ। হিন্দুরা বহু দেবতার পূজারী, তাই 'সত্য'কে তারা সহজেই 'নারায়ণ' রূপে গ্রহণ করেছে, কিন্তু একেশ্বরবাদী মুসলিম কেবল কিরামতির ফকির পীররূপেই তাঁর আনুগত্য স্বীকার করেছে। তাহলেও সত্যের গুণ-মান-মাহাত্ম্য রয়েছে অভিন্ন। আবার তখন রাজ্যেশ্বর হচ্ছে একেশ্বর-নারায়ণ 'সত্য' তাঁর মর্তবা-মর্যাদা অনুযায়ী উর্দু-হিন্দুভাষী মুসলিম হওয়াই বাঞ্ছনীয়। তাদের শাসকগোষ্ঠীর কাছে যেমন, তেমনি একেশ্বরের সংস্কার-পুষ্ট দেশজ মুসলমানের কাছেও তিনি সহজে হন স্বীকৃত ও বরেণ্য। একারণেই পীর-নারায়ণ সত্যের ভোগ হচ্ছে শিরনী, পূজায়-আবাহনে হিন্দু-মুসলিম একত্রে সাগ্রহ সভক্তি আস্বাদন করেছে নিবেদিত শিরনী-প্রসাদ-তবারুক হিসেবে—জাত-জন্মের-ছোঁয়াছুঁয়ির প্রশ্ন তোলেনি কোন পক্ষই, কেবল তা নয়, শিরনী চেটে খেয়ে তালুতে হাত মুছেছে বামুন-পুরুত-মোল্লা—সত্যের অসন্তুষ্টি কিংবা অবমাননার ভয়ে হাত ধুয়ে ফেলেনি শিরনীর লেশ। উল্লেখ্য যে দীন-ই ইলাহি প্রবর্তক-প্রচারক আকবরের ও জাহাঙ্গীরের উদারতায় সৃষ্ট প্রতিবেশের আনুকূল্য ও রাজশক্তির কৃপালোভী উচ্চবিত্তের সমাজের প্রশ্রয়ও বাঙলার এক বিস্তৃত অঞ্চলে এ পীর-নারায়ণ 'সত্য' মতবাদ প্রচারের ও গ্রহণের সাহস যুগিয়েছে পরোক্ষে। কিন্তু সেকালেও শাসক-শোষক ওই ধূর্তবুদ্ধিমানরা জানত ও বুঝত সবই। তাই তারা বলেছে—

'হিন্দুর দেবতা হৈল মুসলমানের পীর।
দুই কুলে সেবা লয় হৈয়া জাহির।

শুনেছি, বন্যার তোড়তাড়িত সাপ ও মানুষ একই ভেলায় নির্ভয়ে সহাবস্থান করে। একদিন ভাতে কাপড়ে স্বস্তিতে বাঁচবার গরজে জীবনযুদ্ধে ক্লান্ত-নির্জিত বিপন্ন দীনদুঃখী হিন্দু-মুসলিম

বাঙালী 'সত্য' নামের ভেলায় চড়ে বসেছিল। সেদিন ভিন্ন অবয়বের শাস্ত্রের ও মানব-সত্যের অভিন্নতা অবলীলায় স্বীকৃত হয়েছিল—সেদিন নবী-কৃষ্ণও অভিন্ন আত্মা নন কেবল, অভিন্নকায়ও ছিলেন:

মক্কার রহিম আমি অযোধ্যার রাম
ফকির হয়ে ভ্রমি আমি তোমার কারণ
কলিতে সম্প্রতি আমি সত্যনারায়ণ।

নবী-কৃষ্ণের সমন্বিত রূপও কল্পিত :

অর্ধেক মাথায় কালা একভাগে চূড়া টানা
বর্ণমালা ছিলিমিলি তাতে
ধবল অর্ধেক কায় অর্ধনীল মেঘপ্রায়
কোরান পূরাণ দুই হাতে। (রামামঙ্গল : কৃষ্ণরামদাস)

সত্যনারায়ণ পাঁচালীতেই স্বীকার করা হয়েছে যে বিষ্ণু আর বিসমিল্লা কিছু ভিন্ন নয়।

ঐহিক জীবনের চাওয়া-পাওয়ার, বল-ভরসার-ইষ্টদেবতা হলেন 'সত্য', কিন্তু তিনি একা মানুষের দিকের এতো প্রয়োজন কত সামলাবেন!

তাই কল্পিত হয়েছে তাঁর চেলা দেবতা। এবং মিলনরাখী দৃঢ় রাখার অভিপ্রায়ে চেলা দেবতাদেরও চিহ্নিত করল যুগ্ম নামে : বাঘের দেবতা দক্ষিণরায়-বড়খাঁগাজী, কুমীরের দেবতা—কালুরায়-কালুগাজী, এমনি নাম আরো আছে। বনদেবী-বনবিবি, ওলাদেবী, ওলাবিবি প্রভৃতি আর তুক-তাকের ডাকিনী-যোগিনী এবং কামরূপ-কামাখ্যা অভিন্ন নামে-গুণে-মাহাত্ম্যে সবারই প্রিয় ও প্রয়োজনীয়। পূর্ববঙ্গে অবশ্য পীর-নারায়ণ 'সত্য' দূরশ্রুত দেবতা-মাত্র। ক্বচিৎ চৈত্র-বৈশাখ মাসে সত্যের মাহাত্ম্য গান গেয়ে তোলা চাঁদের পয়সায় ও চালে সত্যপীরের শিরনী-উৎসব করত গাঁয়ের কিশোর তরুণরা।

পীর-নারায়ণ সত্য যে বাঙলার একবিরাট অঞ্চলের দুর্দশাগ্রস্ত হিন্দু-মুসলিমের দুর্বহ প্রাত্যহিক জীবনের ত্রাতা হিসেবে কল্পিত, স্বীকৃত ও পূজিত, তার প্রমাণ সত্যনারায়ণের স্তব-স্তুতি, মাহাত্ম্য গান, গাথা-পাঁচালী যত রচিত হয়েছে, ততটি কৃষ্ণ, বিষ্ণু, শিব, কালী, মনসা, চণ্ডী, ধর্মঠাকুর প্রভৃতি পৌরাণিক-লৌকিক কোন দেবতা সম্বন্ধেই রচিত হয়নি। জ্ঞাত অজ্ঞাত প্রায় শতেক কবির রচিত সত্যনারায়ণের গাথা-পাঁচালী পাওয়া গেছে। এমনকি স্কন্দ ও বৃহদ্ধর্মপুরাণেও ঠাঁই করে নিয়েছেন সত্যনারায়ণ দেবতা হিসেবে। এবং প্রায় সবাই রাঢ়ের কিংবা দক্ষিণ বা নিম্নবঙ্গের কবি। সত্যের পাঁচালীর জ্ঞাত প্রথম কবি ষোল শতকের শেখ ফয়জুল্লাহ (১৫৭৫ খ্রী:) এবং সতেরো শতকের কবি কৃষ্ণরামদাস কেবল সত্যের নয়, তাঁর চেলা দেবতাদের (ষষ্ঠী, শীতলা, দক্ষিণরায়) পাঁচালী রচনা করেছেন। একটা সুপ্রাচীন দেশের উঁচুমানের সভ্যতা-সংস্কৃতির ও শাস্ত্র-সমাজের দৃঢ় ভিত্তি ও ঐতিহ্য থাকা সত্ত্বেও সব কিছুকে তুচ্ছ জেনে প্রাত্যহিক জীবনে বাঁচার ও বাঁচাবার আপাত প্রয়োজনে গভীর তত্ত্ব ও গূঢ় তাৎপর্যহীন দেবতা বানিয়ে পূজা করার প্রণোদনা পায় যে শ্রেণীর মানুষ, তারা যে কত দুস্থ ও বিপন্ন ছিল, তা কেবল হৃদয় দিয়ে অনুভব করা কিংবা বুদ্ধি দিয়ে অনুমানও করা সম্ভব, কিন্তু যুক্তি দিয়ে বোঝানো কঠিন। আঠারো শতকের কবি ভারতচন্দ্র রায়কে (১৭১২-৬০ খ্রীঃ) দেশের চরম আর্থ-সামাজিক ও প্রশাসনিক দুর্নীতি-দুঃশাসন-দুর্গতির ও দুরবস্থার শিকার হিসেবে ধরলে, তাঁর রচনায় পরিব্যক্ত তাঁর মন-মনন-রুচি-বুদ্ধি-আদর্শের বিকৃতির ও অপকর্ষের কারণ বোঝা সহজ হবে।

ভারতচন্দ্রও ছিলেন দু'দুটো সত্যনারায়ণ স্তব-স্তুতি রচক। জমিদারনন্দন হওয়া সত্ত্বেও সে-যুগের প্রশাসনিক দুর্নীতির শিকার রূপে বর্ধমানের মহারাজার হাতে তাঁর শৈশবেই ঘটে তাঁর পরিবারের সম্পদচ্যুতি, ফলে পরিবারে নেমে আসে আর্থিক-সামাজিক অবস্থান বিপর্যয়। আশৈশবের তিক্ত অভিজ্ঞতা ও দারিদ্র্য-যন্ত্রণা তাঁকে আস্থাহীন করে তুলেছিল মানুষের নীতিতে, আদর্শে, সততায় ও মহত্ত্বে। সমাজে ভালো-মন্দের ভারসাম্য নষ্ট হলেই অর্থাৎ ভালোর সংখ্যাল্পতা এবং মন্দের সংখ্যা-গুরুতাই শান্তি-সুখ-স্বস্তি ও স্থিতি বিনষ্ট হওয়ার কারণ। সমাজে দুষ্টের সংখ্যা বৃদ্ধি পেলেই ঘটে প্রশাসনিক, আর্থিক, নৈতিক, শাস্ত্রিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক বিপর্যয় ও বিকৃতি, তখন আর আইনের ও ন্যায়ের শাসন, বিবেকের বা হিতবুদ্ধির তাড়না কিংবা সততার মূল্য-মর্যাদা লোপ পায় কিংবা ক্ষীণ হয়ে পড়ে। আবাল্য দুঃখের আগুনে পোড়-খাওয়া ভারতচন্দ্রের দেশ-কালেরও সমাজের, রাজার ও রাজ্যেল, মাসকের ও শাষিতের হাব-ভাব হাল-হকিকত সব জানতেন ও বুঝতেন। কারণ বোঝার দুর্লভ মনীষাও ছিল তাঁর। সে-জন্যে তিনি সংক্ষেপে 'মসনদ' কাড়াকাড়ির, প্রশাসনিক অস্থিরতার বর্ণনা দিয়েই শুরু করেছিলেন কাব্যরচনা। সেদিন ওই নৈরাজ্যজাত বিশৃঙ্খলার মধ্যে সব চেয়ে গুরুতর সমস্যা ছিল অন্নের। তা-ই তাঁর কাব্যের নাম প্রত্যাশিত কালিকামঙ্গল নয়—'অন্নদামঙ্গল'। তাই তাঁর হাভাতে ঈশ্বরীপাটনী দেবীর সাক্ষ্যাৎ পেয়েও ধন-যশ-মান নয়, চায় সেদিনের 'চরম চাওয়া ও পরম পাওয়া' 'আমার সন্তান যেন থাকে দুধে ভাতে'। এভাবেই সেদিন মানুষ মনেও হয়ে পড়েছিল কাঙাল। ভারতচন্দ্রের ভাষায় এ সময়কার বাঙলা ও বাঙালীর (দিল্লীতে ভূতের উৎপাত বর্ণনাচ্ছলে) অবস্থান এরূপ :

একি ভূতগত দেশেরে
না জানি কি হবে শেষেরে।
উত্তর অধম না হয় নিয়ম
কেহ নাহি ধর্মলেশে রে।

দাতা ছিল যারা ভিক্ষা মাগে তারা
চোর ফিরে সাধু বেশে রে
যবনে ব্রাহ্মণে সমভাবে গণে
তুল্যমূল্য গজ মেষে রে।

'দাতা ছিল যারা ভিক্ষা মাগে তারা' আর 'চোর ফিরে সাধু বেশে রে'—ভারতচন্দ্রের কালে এ ছিল বাঙলার বাস্তবচিত্র।

ঈশ্বরীপাটনী তথা ভারতচন্দ্র এ-ও জানেন—'যেখানে কুলীনজাতি, সেখানে কন্দল', খাওয়া-পরার সুব্যবস্থা থাকলেই মানুষ আত্মপ্রসারের কথা ভাবে, তখন ধন-মান-ক্ষমতা লাভের কিংবা বৃদ্ধির জন্যে মানুষ জাত-জন্ম-বর্ণ-ধর্মের স্বাতন্ত্র্য সচেতন হয়। স্বার্থবুদ্ধির প্রণোদিত হয়ে শত্রুমিত্র চিহ্নিত করে, দ্বেষ-দ্বন্দ্ব জিইয়ের রাখে; দল করার ও রাখার প্রয়োজনে, দলে টানার গরজে, শাস্ত্র, সমাজ, সংস্কৃতি, রীতি-নীতি, নিয়ম-পদ্ধতি, স্বদেশ, স্বধর্মী, স্বজাতি প্রভৃতি বিচিত্র বিষয়ের ও অনুভূতির সযত্ন অনুশীলন করে কেবল মান-যশ-ক্ষমতা লাভের পন্থা হিসেবে আত্মপ্রতিষ্ঠার প্রেরণায় তারাই বাধায় প্রতিদ্বন্দ্বী-প্রতিযোগীর সঙ্গে কোন্দল। অন্নবস্ত্রের কাঙাল মানুষের এসব ভাববার সময়-সুযোগ ঘটে না জীবনে। সারাজীবন সকালে ঘুম ভাঙার পর সে-একটি প্রার্থনাই করে—আজে যেন ক্ষুধার অন্ন জোটে বা যোগাড় হয়। ভারতচন্দ্র ছিলেন বিদ্বান ও চোখ-কান খোলা পরিবেশ-সচেতন সতর্ক মানুষ। তিনি বুঝেছিলেন—শেষ প্রান্তে না ঠেকা পর্যন্ত এ পতন রোধ করা যাবে না। তাই হতাশ কবি মহৎ-বৃহতের ধ্যান বর্জন করে তাঁর কাব্যের সর্বত্র বাঁদুর আর বাঁদরামি দেখাতে ছিলেন উৎসুক। দেবতা মানুষ কেউ তাঁর ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ থেকে অব্যাহতি পাননি। তাঁর অন্নদামঙ্গল তাই বেপরওয়া বাচালতার ও অশ্লীল রসিকতার কাব্য। শ্রেয় কিংবা প্রেয় বোধ তাতে অনুপস্থিত। অবশ্য এমনো হতে পারে যে

'ঠোঁটে যখন হাসির ছটা চোখে তখন অশ্রুজল।' অথবা হতে পারে তাঁর 'কাব্যমর্মছেঁড়া অসহ যন্ত্রণায় আপাতদৃষ্ট অট্টহাসি'। এমনি ভাবে দুঃখ-দৈন্যের দিনে নিরুপায় হিন্দু-মুসলিম সর্বপ্রকার দ্বিধা-দ্বন্দ্ব ও ভেদবুদ্ধি ত্যাগ করে সমস্বার্থে সহিষ্ণুতায় সহযোগিতায় সহাবস্থানের উপায় বের করেছিল। এ 'সত্য' তত্ত্ব দেশকালোচিত একটি হিতকরভাববিপ্লব যে ছিল, তা অস্বীকার করা যাবে না। আপোসের, মিলনের ও মত-সমন্বয়ের এ সূত্র, এ মিলন ময়দান চিরস্থায়ী হলে বাঙালীর শাস্ত্র, সমাজ ও সংস্কৃতি সম্পৃক্ত গুরুতর দ্বন্দ্ব-সংঘাত ও সমস্যা মিটে যেত। বাঙালীর বর্তমান ও ভাবী ইতিহাসের রূপ যেত বদলে।

ভারতচন্দ্রের মৃত্যুর (১৭৬০ খ্রীঃ) পরে বাঙলাদেশের আর্থ-সামাজিক রাজনীতিক-প্রশাসনিক বিপর্যয় আরো শতগুণে বেড়েছিল। ১৭৫৭ সন থেকে বা ১৭৬৫ সনে কোম্পানীর দেওয়ানী প্রাপ্তি থেকেই তার শুরু। নিস্তরঙ্গ গ্রামীণ জীবনে ক্ষুদ্র বৃত্তিজীবী দরিদ্র মানুষের জীবনে-জীবিকায়, চিরকেলে জীবনাচারে পরিবর্তন বা তরঙ্গ ছিল দুর্লভ-দুর্লক্ষ্য। কোম্পানী রাজত্বে পণ্য-বিনিময় নির্ভর দৈশিক অর্থনীতিতে এলো আন্তর্জাতিক মুদ্রাবিনিময় ব্যবস্থার অভিঘাত, কোম্পানীর বাণিজ্যিক স্বার্থে ও শোষণের প্রয়োজনে গ্রাম্য বৃত্তি-জীবীদের পণ্য বিক্রয়ের বাজার হল হয় মন্দা, নয়তো হাত-ছাড়া। নতুন ভূমিবন্দোবস্তনীতি প্রয়োগের ফলে সামন্তরা হারাল সম্পদ, নতুন জমিদার রাজবৃদ্ধির, উচ্ছেদের ও বেগার খাটানোর অধিকার পাওয়ার কৃষকরা অবস্থানে হল কার্যত ভূমিদাস আর দারিদ্র্য হল তাদের নিত্যসঙ্গী। আঠারো শতকের গোটা শেষার্ধটাই ছিল কোম্পানীর ও তার কর্মচারীদের বেপরোয়া বেদেরেগ সম্পদ লুঠের কাল। এ সময়েই পুরোনো বন্দর ও নতুন শাসন-কেন্দ্র কোলকাতায় দেশী মনীষার অবক্ষয় ও বিকৃতি প্রকট হয়ে দেখা দিল হিন্দু সমাজের কবিগানে এবং হাওড়া-হুগলী বন্দরে নিবসিত অবাঙালীদের বংশধর আধাবাঙালীদের সমাজের দোভাষী রচনায়। এঁরা হলেন সমকালীন নিরাশ নির্লক্ষ্য দিশেহারা মানুষের প্রতীক-প্রতিভূ। পুরোনো প্রতিবেশ যখন অপসৃয়মান এবং নতুন সৃজ্যমান পরিবেশ অনায়ত্ত তখনকার সে-গোধূলি লগ্নের বা উষালগ্নের কিংবা শীতের শেষে পাতা ঝরার কালের নকীব হলেন এঁরাই— কবিওয়ালারা ও শায়েরেরা।

মধ্যযুগের গোধূলি লগ্নে মুসলিমদের পতন-প্রতিরোধ প্রয়াস

আঠারো শতকের প্রথমার্ধে দিল্লীর শাহ ওয়ালিউল্লাহ (১৭০৩-৬২) ভারতে মুঘল রাজত্বের তথা মুসলিম শক্তির পতন আসন্ন বুঝে উন্মেষযুগের বিশুদ্ধ ইসলামের রূপায়ণে পতন রোধ করার আহ্বান জানিয়েছিলেন মুসলমানদের আর উনিশশতকে সে-আহ্বানে সাড়া দিয়েছিলেন রাজশক্তির পতনে বিচলিত ওয়াহাবী ফরায়েজীরা। এবং সৈয়দ জামাল উদ্দীন আফগানীও [১৮৩৯-৯৭] বিশুদ্ধ শরীয়তী ইসলাম বরণেই ভারতের ও বিশ্বের মুসলিমদের রাজনীতিক বা সামাজিক সৌভাগ্য পুনঃপ্রাপ্তি সম্ভব বলে বিশ্বাস করতেন। তার কারণ ইসলামের উদ্ভব যুগে ধর্মপ্রচার ও রাজ্যজয় ছিল পরস্পরের পরিপূরক। প্রচার ও যুদ্ধ অভিন্ন প্রয়োজনে, উদ্দেশ্যে ও লক্ষ্যে পরিচালিত বলে মুসলিম মনে ও মননে ইমান, পার্থিব সম্পদ, রাজ্য ও জাতীয় উন্নতি অভিন্নার্থক ও অভিন্নাত্মক আর অভিন্ন তত্ত্বের উৎস তথা সবটা অভিন্নমূল রশুনের মতো প্রতীয়মান হয়। সে-ধারণা আজো শিক্ষিত-অশিক্ষিত সব মুসলিমদের মনে ইমানের মতোই দৃঢ়মূল। ফলে দৈশিক কালিক ভৌগোলিক চেতনা অস্বীকৃত এবং জাত-জন্ম বর্ণ নিরপেক্ষ বিশ্ব-মুসলিম ভ্রাতৃত্বে, ঐক্যে এবং স্বধর্মীর জাতীয়তায় আস্থাবান এই মুসলিমের চিন্তায়-চেতনায় মুসলিমের জীবনে একমাত্র দায়িত্ব ও কর্তব্য হচ্ছে শাস্ত্রানুগত্য। কোরআন হাদিসে যেহেতু

সর্বকালীন সর্বদৈশিক ও সর্বমানবিক জীবননীতির ও জীবনাচারের আকর, সেহেতু কোরআন-মানা মানুষের জীবনে কোন অসমাধ্য নতুন পার্থিব সমস্যা থাকতেই পারে না। যন্ত্রাদি মানা কলা-কৌশল জীবনযাত্রায় সৌকর্যসাধন ও ঔষধাদির আবিষ্কার দ্রুত নিরাময়ের ব্যবস্থা করেছে বটে, কিন্তু এসব জীবনে মূল লক্ষ্য নয়, পরলোকে প্রসারিত জীবনে পার্থিব নশ্বরতা স্মরণে রেখে ভোগে-বিমুখতায় চাহিদাসংকোচনে বাঁচাই মুমীনের লক্ষ্য হওয়া বাঞ্ছনীয় ইত্যাদিই তাঁদের যুক্তিতর্কের সারকথা। ইসলাম যে মক্কা-মদিনাবাসীদের ছাড়া আর কোন দেশের কোন দীক্ষিত মুসলিমের জন্যে পার্থিব ধন-মান-রাজ্য প্রাপ্তির সহায়ক হয়নি; জীবন-জীবিকা যে দেশ-কালের চাহিদা নির্ভর, চলমান জীবনের বাঁকে বাঁকে চলার পথ ও পাথেয় যে বদলাতে হয়, প্রতি নতুন সূর্যের উদয়ের যে নতুন জীবন ও নতুন প্রয়োজন শুরু হয়, কোন পুরোনোই যে নতুন দিনের নতুন চাহিদা পূরণ করতে পারে না, পুরোনো ঘরে, পুরোনো আসবাবে পুরোনো পোশাকে যে নতুনের রূপ-জৌলস শত চেষ্টায়ও আরোপ করা সম্ভব হয় না, অতীতে যে কখনো ভবিষ্যতের পাথেয় কিংবা দিশারী হতে পারে না, ঐতিহ্য যে প্রাত্যহিকতায় সম্পদ নয়, তা মুসলিমরা আজকের দিনেও একবারও ভেবে দেখে না, অন্তত স্বীকার করে না। সাধারণ ভাবে বলতে গেলে বিজ্ঞানের কারণ-করণতত্ত্ব জীবনের, সমাজের, রাষ্ট্রের বা ইতিহাসের ক্ষেত্রে কখনো প্রযোজ্য হতে পারে না। কেননা মানবিক কর্মে-আচরণে ও ঘটনায় ফল অভিন্ন হলেও কারণ কখনো অবিকল পুনরাবৃত্ত হয় না। কাজেই এক্ষেত্রেও অতীত অভিজ্ঞতা কাজে লাগে না। তা ছাড়া শাহ ওয়ালীউল্লাহ, তাঁর সন্তান আবদুল আজিজ, আবদুল হাই ও সৈয়দ আহমদ ব্রেলবী, এনায়েত আলি, বেলায়েত আলি, কেরামত আলি প্রমুখ প্রতীচ্য শিক্ষায় ছিলেন বঞ্চিত, কাজেই যুগের চাহিদানুগ বিপ্লবচেতনা ছিল না তাঁদের মধ্যে, তা-ই বহুত্যাগ ও সংকল্প সত্ত্বেও রাজনীতিক্ষেত্রে তাঁদের আন্দোলন হয়েছিল নিষ্ফল। আবার প্রতীচ্য জগতের সঙ্গে অল্পবিস্তর পরিচয় থাকা সত্ত্বেও আলতাফ হোসেন হালী-ইকবাল-ফররুখও ইসলামী প্রেরণায় ও পন্থায় পুনরুত্থানের বৃথা স্বপ্ন ছাড়েন নি।

দেশ-কালচেতনা ও যুক্তি-বুদ্ধি-বিবেক-বিবেচনা জাত স্বচ্ছ-দৃষ্টির অভাবে উপর্যুক্ত সদিচ্ছাপ্রসূত আন্দোলন, সংগ্রাম ও জান-মাল কুরবানী যেমন বৃথা ও ব্যর্থ হয়েছিল, তেমনি ইতিহাসে সম্যকজ্ঞানের অভাবে লব্ধ ভুল ধারণাবশে উনিশ-বিশ শতকে বাঙালী মুসলিমরা অকারণ ক্ষোভে-ক্রোধে-দ্বেষে-দ্বন্দ্বে মানস-যন্ত্রণা ভুগেছে। বাঙলার দেশজ মুসলিমরা যে নিম্নবর্ণের ও নিম্নবৃত্তির নিঃস্ব হিন্দু-বৌদ্ধের বংশধর ছিল এবং সে-কারণে প্রাচীন ও মধ্যযুগেও নিঃস্ব-নিরন্ন-নিরক্ষর ছিল, ব্রিটিশ আমলে তাদের দুর্ভাগ্য বৃদ্ধি [মুদ্রার বহুল প্রচলনের ফলে] পেলেও তার মধ্যে হিন্দুর সুপরিকল্পিত মুসলিম-লুণ্ঠন নীতি কিংবা ব্রিটিশ ষড়যন্ত্র ছিল না, তা ইদানীং পূর্বকালে কারো উপলব্ধিগত হয়নি। দেশজ চাষী মজুর মুসলিমদের দারিদ্র্যের মূলে ছিল অধিকাংশ মুসলিমের শিক্ষার ঐতিহ্যহীনতা ও সনাতন গৌত্রিক বৃত্তি নির্ভরতা। এ-ও উল্লেখ্য যে প্রাচীনকালে এবং তুর্কী মুঘল আমলেও গাঁয়ে মুসলিমরা ছিল সংখ্যালঘু, তাদের মধ্যে স্বাক্ষরও বিত্তশালীর সংখ্যা ছিল নগণ্য। গাঁয়ে-গঞ্জে বিত্তশালী স্বাক্ষর-সমাজনেতা-জমিদার-মহাজন-প্রশাসক ছিল কিছু সংখ্যক ব্রাহ্মণ-কায়স্থ-বৈদ্যই।

গাথায় ঐহিক জীবন-চেতনা

প্রণয়োপাখ্যান ব্যতীত মধ্যযুগের লিখিত রচনাগুলো সাধারণভাবে ধর্মসম্পৃক্ত। যদিও ঐহিক জীবনের প্রয়োজনেই দেও-দেবতা এসেছে মানুষের সুখ-দুঃখ, আনন্দ-বেদনা, লাভ-ক্ষতি

কিংবা সাফল্য-ব্যর্থতার অরি-মিত্র রূপে, তবু একালের মতো ঐহিক চেতনা সেকালের সাহিত্যে দুর্লক্ষ্য। একালের গল্প-উপন্যাসের মতো জীবনে কাম-প্রেমের, দাম্পত্যের, লাম্পট্যের, আভিজাত্যের, বর্ণ বিদ্বেষের, সাম্প্রদায়িক স্বাতন্ত্র্যের এবং সর্বোপরি হৃদয়বৃত্তির ব্যক্তিক, সামাজিক ও নৈতিক জীবনে গুরুত্ব, প্রভাব ও পরিণামচেতনা নিয়ে গাথা রচিত হয়েছে ময়মনসিংহ থেকে চট্টগ্রাম অবধি অঞ্চলে। অন্যত্রও হয়তো এমনি মৌখিক রচনা গদ্যে পদ্যে অল্প বিস্তর ছিল, উৎকর্ষ লাভ করেনি বলে কালান্তরের হাওয়ায় লোপ পেয়েছে বা পাচ্ছে। ধর্ম-সম্পৃক্ত এমনি গাথা ময়নামতী-মানিকচন্দ্র-গোপীচাঁদ-মীননাথ-গোরক্ষানাথ-বৃত্তান্ত ছিল জনপ্রিয়। আর সম্ভবত উৎকর্ষের অভাবে তাৎপর্যবিরহী যোগীপাল-ভোগীপাল-মহীপাল গীত (সম্ভবত যোগের, ভোগের ও ঐহিকতার রূপক কাহিনী ভিত্তিক) হয়েছে বিলুপ্ত।

বৈচিত্র্যহীন নিস্তরঙ্গ প্রাত্যহিক জীবনে সংঘটিত আকস্মিক ঘটনার তাৎক্ষণিক প্রভাবে সংবেদশীল মানুষের কণ্ঠে ওঠে ঘটনার প্রকৃতি অনুসারে আনন্দের কিংবা বেদনার গান। আকস্মিক বেদনার অভিঘাতে বাল্মীকি-উচ্চারিত শ্লোক এ সূত্রে স্মরণ করা যেতে পারে। তাবৎ লোকরচনার তথা লোকসাহিত্যের উদ্ভব এমনি আকস্মিক অপ্রত্যাশিত ঘটনার অভিঘাতজাত আন্তরিক অনুভূতির অভিব্যক্তিতেই। তাই সে-সাহিত্যে জীবনের ঋজু আনন্দ-উল্লাস ও বাস্তব বেদনা-বিলাপ হৃদয়গ্রাহী হয়ে পরিব্যক্ত।

গাথা-গীতিকাগুলোর প্রধান বিষয় কাম-প্রেম—এ দুটোই শাস্ত্র ও সমাজদ্রোহী বৃত্তি-প্রবৃত্তি। কাজেই এ তাৎপর্যে এগুলো হচ্ছে দ্রোহী মানুষের কাহিনী। প্রচলিত শাস্ত্র ও সমাজ, নিয়ম ও নীতি, রীতি ও রেওয়াজ বহির্ভূত জীবন-জিজ্ঞাসার এবং প্রাণধর্মের প্রসূন এ সব ঘটনা ও চেতনা। শাস্ত্রচেতনা, সমাজভীতি ও প্রয়োজন বুদ্ধি উপেক্ষা করে সবকিছুর ওপরে হৃদয়বৃত্তিকে, প্রাণের আকুতিকে, প্রাণের চাহিদাকে গুরুত্ব দেয়া, হৃদয়ের মূল্য-মর্যাদাকে শাস্ত্রের ও সমাজের ওপরে ঠাঁই দেয়া, পারত্রিক জীবনের চেয়ে ঐহিক জীবনের অধিক গুরুত্ব, মূল্য ও মহিমা স্বীকার করা, জীবনে মাটির ও মানুষের, কামের ও প্রেমের, নীতিবোধের ও আদর্শচেতনার, ক্ষমার ও ত্যাগের, লোভের ও রিরংসার, দ্বেষের ও দ্বন্দ্বের, ক্রিয়ার ও প্রতিক্রিয়ার গুরুত্ব ও বাস্তবতা এই লোকগাথাতেই প্রথম অসংকোচ অভিব্যক্তি পায়। সংস্কৃত কিংবা বাঙলা লিখিত সাহিত্যে এমনটি দেখা যায় না, শাস্ত্র ও সমাজকে তুচ্ছ জেনে এ গণমানুষেরা উচ্চ করে তুলে ধরেছিল হৃদয়বৃত্তিকে। শাস্ত্রীরা সেদিন এ অঞ্চলে হার মেনেছিল গণমতের ও গণরুচির কাছে। গাথাগুলো মুখ্যত হৃদয়ানুভূতির ওপর নিষ্ঠুরতম পীড়ন-নির্যাতনের ইতিকথা। এবং সে নির্যাতনের শিকার সাধারণ ভাবে অবলা অখলা রূপসী ও যৌবনবতী নারী। সেইদিনকার এ অঞ্চলের জীবনবাদী-বাস্তববাদী মানুষ পাপ-পুণ্যের কথা ভাবেনি, ভাবেনি দোষী নির্দোষের কথা, কেবল ব্যথিত হৃদয়ে সকরুণ দীর্ঘশ্বাসের মধ্যে দিয়ে সবটাই নিয়তির লীলা বলে জেনে ভাগ্যকেই স্বীকার করে নিয়েছিল, পরাধীনের মনে এর বেশি যুক্তি-বুদ্ধি কিংবা দ্রোহ জাগেনি।

আধুনিক যুগের উষালগ্নে

১৭৫৭ সনে পলাশীর প্রান্তরে ব্রিটিশবিজয়ে কিংবা ১৭৬৫ সনে কোম্পানীর দেওয়ানী প্রাপ্তিতে মধ্যযুগের অবসান ও নতুন যুগের সূচনা আভাসিত হলেও নতুনযুগ যথার্থভাবে শুরু হয় বাঙালীর ইংরেজী ভাষা বরণের সঙ্গে ও ফলে। তাই আঠারো শতকের শেষার্ধও ছিল ক্ষীয়মান মধ্যযুগের আওতায়। এসময়টা সুদীর্ঘ হলেও একে যুগসন্ধির কাল, পুরাতনের ক্রান্তি আর নতুনের আবির্ভাবকাল বলেও চিহ্নিত করা চলে।

মনীষাসম্পন্ন যে-ব্যক্তি প্রথম ইংরেজি ভাষার মাধ্যমে য়ুরাপীয় তথা ইংরেজের শাস্ত্র, সাহিত্য, দর্শন, ইতিহাস, বিজ্ঞান ও রাজনীতি সম্বন্ধে জ্ঞান লাভ করে মনে-মননে, জ্ঞান-বুদ্ধি-রুচিতে তাঁর সমকালীন প্রথম সারির যে-কোন য়ুরোপীয় নাগরিকেরও সমকক্ষ হয়ে উঠেছিলেন, তিনি রাজা রামমোহন রায় (১৭৭৪-১৮৩৩)। ১৮১৫ সনে তাঁর কোলকাতায় বসবাস থেকেই কোলকাতায় তথা বাঙলায় ও ভারতে আধুনিক যুগের সূচনা। আর মুসলিম সমাজে যুগ-পুরুষের আবির্ভাব ঘটে আরো চল্লিশ বছর পরে অবাঙালী স্যার সৈয়দ আহমদ খানের (১৮১৭-৯৮) যুগোচিত চিন্তা-চেতনার মাধ্যমে। উভয়েই ছিলেন মুখ্যত যুগের চাহিদানুগ যুক্তিবাদী ধর্ম-সংস্কারক দুইজনেরই ছিল চিন্তায়-কর্মে ও আচরণে ক্রটি ও অসঙ্গতি। কিন্তু সে-বৃত্তান্ত আমাদের আলোচ্য নয়।

আমরা তিনটে বক্তৃতায় বাঙলার ও বাঙালীর শাস্ত্র, সমাজ ও সংস্কৃতি সংক্রান্ত মনন-চিন্তনের ও কর্ম-আচরণের বিবিধ ও বিচিত্র গতি-প্রকৃতির ধারা ও ধারাবাহিকতা জ্ঞান-বিশ্বাস-অনুসারে যথাসাধ্য আভাসিত করার প্রয়াস পেয়েছি। এ ধরনের আলোচনায় ব্যক্তিক জ্ঞান-প্রজ্ঞার, রুচি-বুদ্ধির, জীবন-দৃষ্টির ও জগৎ-জিজ্ঞাসার ছাপ মুখ্য হয়ে ওঠে—নৈর্ব্যক্তিক নিরপেক্ষতা কাম্য হলেও বজায় থাকে না। আমাদের এ আলোচনায় ফাঁকির না হলেও অজ্ঞতার ফাঁক, মূল্যায়নের ক্রটি রয়ে গেল। তা ছাড়া টীকাভাষ্য যতোই রচিত হোক, এ ধরনের বিষয়ে কোনো শেষ কথা বলা চলে না। এমনি আলোচনায় জিজ্ঞাসাই কেবল বাড়ে, আর জটিল ও সূক্ষ্ম হয়। তাই জিজ্ঞাসা জাগানো আর বাড়ানোই এ ধরনের আলোচনার লক্ষ্য।

তথ্য নির্দেশ

১. Historical Fragments of the Mogal Empire, Edited by J.P. Guha, New Delhi, 1978, p. 271.
২. JASP (Dhaka) Vol IX No 1, June 1964, p. 89.
৩. পূর্বপাকিস্তানে ইসলাম-ডক্টর মুহম্মদ এনামুল হক, ১৯৩৫ সন দ্রষ্টব্য;
History of Sufism in Bengal—ibid, Asiatic Society of Bangladesh 1976.
৪. মধ্যযুগে জাতিবৈর ও তার স্বরূপ : বাঙালী ও বাঙলাসাহিত্য ১ম খণ্ড, পৃ: ৬৪-৮২।
৫. বাঙালীর ইতিহাস, আদিপর্ব, পৃ: ৫৬৭।
৬. Development of Metaphysics in Persia, Sir Dr. Muhammad Iqbal, p. 83.
৭. জাতি, সংস্কৃতি ও সাহিত্য, পৃ : ২৫-২৬।
৮. হিন্দু-মুসলিমে যুক্ত সাধনা, ক্ষিতিমোহন সেন, পৃ : ১৭-১৮।
৯. শ্রীরাধার ক্রমবিকাশ : দর্শনে ও সাহিত্যে : ডক্টর শশিভূষণ দাশগুপ্ত, পৃ : ৩২১-৩০।

মধ্যযুগের বাঙলায় জীবন ও জগৎ-জিজ্ঞাসার রূপ-স্বরূপ

১.

জগৎ ও জীবন, স্রষ্টা ও সৃষ্টি সম্বন্ধে মানুষের কৌতূহল ও জিজ্ঞাসা মানুষ প্রজাতির উদ্ভবের সমকালীন। বলা যায় এ জিজ্ঞাসা মানুষের সহজাত। মানব-সভ্যতার শৈশবে সীমাহীন অজ্ঞতা ও অদম্য কৌতূহল নিয়ে মানুষ জগৎ ও জীবনে, স্রষ্টা ও সৃষ্টি সম্বন্ধে নানা জিজ্ঞাসার মনোময় উত্তর সন্ধান করেছে। গোড়ায় গ্রীক দার্শনিকদের কেউ আগুন, কেউ পানি, কেউ মাটি এবং কেউ বা বায়ুকেই জগৎ-কারণ বলে অনুমান করেছিলেন। অবশ্য মৌল উপাদান হিসেবে এটমের বা অণু'র ধারণাও কিছুকালের মধ্যেই তাঁদের হয়েছিল। ভারতবর্ষে বৈশেষিক দর্শনেও 'অণু'ই সৃষ্টির মৌলভিত্তিরূপে স্বীকৃত। পূর্ব মীমাংসকরাও জগৎকেই সত্য বলে জানতেন এবং তাঁরা ঈশ্বর বলে কোন নিয়ন্ত্রক শক্তি মানতেন না। তবু অসহায় ভোগলিপ্সু মানুষ এ বিশ্বাসে স্থির থাকতে পারেনি, তারা মানুষের জীবনের চাওয়া-পাওয়ার ক্ষেত্রে, সাফল্যে ও ব্যর্থতায় এক বা একাধিক তৃতীয় শক্তির প্রভাব অনুভব করে এবং সাফল্য-সহায় মিত্র শক্তি বা ব্যর্থকারী অরিশক্তি মানুষের মনোভূমে অস্তিত্ব পায় এভাবেই। ভয় থেকেই বিশ্বাসের উৎপত্তি। ভয় অপ্রাপ্তির, ক্ষতির এবং অসুখের। অতএব ভয়-ভরসাগত দৈবশক্তির উৎসমূল অভিন্ন।

মানুষের জ্ঞান-বুদ্ধি-অভিজ্ঞতার ক্রমিক, গৌত্রিক ও স্থানিক বিকাশের পরিণামে মানুষের মনে জগতের ও জীবনের স্রষ্টার ও নিয়ামক-নিয়ন্ত্রক শক্তির কল্পনা বা ধারণা গড়ে ওঠে, ক্রমে এর সঙ্গে যুক্তি-বুদ্ধি ও বিবেচনা যুক্ত হয়ে কল্পনা দৃঢ় সংস্কারে, বিশ্বাসে ও প্রত্যয়ে প্রতিষ্ঠা পায়। এখন থেকে ইন্দ্রিয়জ জ্ঞানের সঙ্গে অতীন্দ্রিয় প্রজ্ঞার অনুভব-সংস্কারও প্রশ্রয় পেতে থাকে। এ শক্তির কাছেই আদিসাম্যের সমাজে সুখী মানুষ মৃত্যুর কবল এড়ানোর জন্যে করেছিল অমৃত কামনা। পরে জনবৃদ্ধির ফলে নিশ্চিন্ত সুখের জীবন দুঃখাক্রান্ত হতে থাকে, তখন মানুষ কামনা করেছে মোক্ষ, অর্থাৎ দুঃখ-যন্ত্রণার মুখে সুখের চেয়ে স্বস্তিই হয়ে ওঠে কাম্য। প্রতিযোগিতা-প্রতিদ্বন্দ্বিতার প্রসারে অভাব-দারিদ্র্যজাত দুঃখ-যন্ত্রণা যখন বাড়তে থাকে, তখন বাস্তব-জীবনের বঞ্চিত মানুষে জাগে সান্ত্বনা-পুরস্কার রূপ স্বর্গসুখে ভোগের বাঞ্ছা আর প্রতিহিংসাবশে বঞ্চক-পীড়কের জন্যে নরক-শাস্তির স্বপ্ন।

এ কালে জ্ঞান-বুদ্ধি-অভিজ্ঞতার বৃদ্ধির ও বিকাশের ফলে মানুষ হয়েছে ঐহিক জীবনবাদী—নগদ সুখ-স্বস্তি-ভোগ-উপভোগে আস্থাবান। তাই আজ আর অমৃত নয়, মোক্ষ নয়, নির্বাণ নয় স্বর্গসুখ, চরম কাম্য হয়েছে অশন-বসন-নিবাস-নিদান, দাবি উঠেছে স্বার্থের, স্বাধিকারের আর সমতার ও সম্মানের।

শাহ-সামন্ত-বুর্জোয়া তন্ত্রের বিরোধীও হয়েছে ঐহিকতাবাদী এ মানুষ পারত্রিক জীবনে ও সুখে আস্থা হারিয়েছে বলেই। আজ তাই ভূতে-ভগবানে মানুষের বিশ্বাস হয় সামান্য অথবা শূন্য। এজন্যেই মানুষের কাম্য হয়েছে স্বাধিকারে স্বশাসনে স্বাধীন স্বচ্ছন্দ জীবন। জনবহুল বিশাল দেশে গ্রীক নগররাষ্ট্রের মতো রাষ্ট্র ব্যবস্থা সম্ভব নয় বলেই গণপ্রতিনিধিত্বে জনগণতান্ত্রিক রাষ্ট্রই হয়েছে বাঞ্ছিত। এ উপলব্ধির স্তরে উত্তীর্ণ হতে মানুষকে বুনো-বর্বর-ভব্যযুগ অতিক্রম

করতে হয়েছে কয়েক হাজার বছরের মননে, অনুশীলনে, সাধনায় ও দ্বন্দ্ব-সংঘাত-সঙ্কুল প্রয়োগ মাধ্যমে পরীক্ষা-নিরীক্ষায়।

কাজেই বহু যুগের বহু মানুষের চিন্তার, চেতনার, মননের, অনুশীলনের, সাধনার ও ত্যাগের প্রসূন হচ্ছে আজকের মানুষের জীবন ও জগৎ সম্বন্ধীয় জ্ঞান-প্রজ্ঞা। অবশ্য এ উপলব্ধির জগৎ ঋজুও নয়, অভিন্নও নয়। দেশ-কাল পরিবেশ-প্রতিবেশ ভেদে ঘটেছে প্রয়োজনভেদ, সে-প্রয়োজনে সাড়া দিতে হয়েছে বলেই জীবন-জীবিকা সমস্যার সমাধান উদ্ভাবিত হয়েছে বহু, বিবিধ ও বিচিত্র পথে ও পদ্ধতিতে।

ভারতবর্ষেও আমরা তাই বিভিন্ন গোত্রের মধ্যে জীবন-চেতনার ও জগৎ-ভাবনার ভিন্নমুখী বিচিত্র বিকাশ-বিবর্তন যেমন প্রত্যক্ষ করি, তেমনি কালিক ও স্থানিক প্রয়োজনে, গৌত্রিক সান্নিধ্যে ও মিশ্রণে, অনুকরণে ও অনুসরণে সঙ্গত-অসঙ্গতের যৌক্তিক-অযৌক্তিকতার মাত্রা ছাড়িয়ে এক সময়ে জটা-জটিল চেতনা-ভাবনা হয়ে অভিন্ন সত্তায় ও উপলব্ধিতে একীভূত হতে দেখি।

সন্তান উৎপাদন প্রক্রিয়া আদিম মানুষকে করেছিল কৌতূহলী, তাই মৈথুনতত্ত্ব হয়েছিল তাদের চিন্তার ও চর্চার বিষয়। মৈথুনতত্ত্ব ভিত্তি করেই তাই গড়ে ওঠে আদিম শাস্ত্র ও দর্শন। মৈথুন ও প্রজনন তাদের চেতনায় অঙ্গাঙ্গী সম্পর্কে যুক্ত ছিল[১] বটে, তবে প্রজননে নারী-পুরুষের মধ্যে কার ভূমিকা বা গুরুত্ব বেশী তা নিঃসংশয়ে নিরূপণ করা কখনো সম্ভব হয়নি। এজন্যেই কেউ গুরুত্ব দিয়েছে নরে, কেউ বা প্রাধান্য দিয়েছে নারীতে। ফলে লিঙ্গায়েত-শৈব মত যেমন প্রতিষ্ঠা পেয়েছে, তেমনি পেয়েছেন আদ্যশক্তি প্রকৃতি—যিনি সৃষ্টির উৎসস্বরূপা—শাকাম্ভরী।[২] আবার সংশয়বাদীরা আপোসও করেছে, যা থেকে সাংখ্যমতের ও দর্শনের উদ্ভব ঘটেছে।

সন্তান উৎপাদন আর শস্য উৎপাদন পদ্ধতির অভিন্নতার ধারণা থেকেই যাদু-বিশ্বাসী মানুষ ক্ষেতে মৈথুনক্রিয়া ফসল উৎপাদনের আবহ সৃষ্টির সহায়ক বলে মনে করেছে। এ কারণেই জাভা, নিউগিনি, অস্ট্রেলিয়া, মেক্সিকো প্রভৃতি দেশের আদিবাসীদের মধ্যে এবং ভারতের আরণ্য অঞ্চলের সাঁওতাল, হো, মুণ্ডা, পাঞ্জা, কোটার প্রভৃতি গোত্রের মধ্যে আজো মৈথুন উৎসব বিদ্যমান।[৩] ইরানী কবি নিযামীর 'সিকান্দরনামা'য়ও এমনি মৈথুন-উৎসবের বর্ণনা রয়েছে। আমাদের হোলিও সেই আদি মৈথুন উৎসবের স্মারক। পিতৃপ্রাধান্য অর্থে বীজ প্রাধান্য এবং মাতৃপ্রাধান্য অর্থে ক্ষেত্র প্রাধান্য অভিধার প্রয়োগও সন্তান ও শস্য উৎপাদন পদ্ধতির অভিন্নতার ধারণার সমর্থক। বাজসনেয়ী সংহিতা, ব্রাহ্মণ, বৃহদারণ্যক, ছান্দোগ্য প্রভৃতিতেও তাই মৈথুন প্রজনন, জীবন সম্পদ প্রভৃতির ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক স্বীকৃত হয়েছে। তন্ত্রমতের ও সাধনপদ্ধতির উদ্ভবও এ মৈথুনতত্ত্ব থেকেই। ছান্দোগ্য উপনিষদে এর আভাস আছে : হে গৌতম স্ত্রীলোকই হল যজ্ঞীয় অগ্নি, তার উপস্থই হল সমিধ। ওই আহ্বানই হলো ধূম। যোনিই হলো অগ্নিশিখা। প্রবেশক্রিয়াই হলো অঙ্গার। রতি সম্ভোগই হলো স্ফুলিঙ্গ। ৫/৮/৯। এই অগ্নিতে দেবতারা রেতর আহুতি দেন। সেই আহুতি থেকেই গর্ভ সম্ভব হয়। ৫/৮/২ .... মিথুন থেকে সন্তান উৎপন্ন হয়। সে পূর্ণজীবী হয়, পশু ও কীর্তিতে মহান হয়, কোন স্ত্রীলোককে পরিহার করবে না—এই-ই ব্রত। ২/০৩/২।[৪]

তান্ত্রিক শৈব, সহজিয়া ও বাউল সাধনায় আজো তাই লতা, স্ত্রীভগ, যন্ত্র, মণ্ডলচক্র, যোগিনীচক্র, গোপীচক্র, নৈশচক্রে, সাধনা-পূজনের আবশ্যিক উপকরণ। তাছাড়া ডালিম হচ্ছে রজঃরক্তের প্রতীক, তেমনি সিন্দুরও রজঃ-প্রতীক আর পদ্ম হচ্ছে যোনিপ্রতীক। এসূত্রে বৌদ্ধতন্ত্রের বজ্র-কমলও স্মর্তব্য। মননের ও সভ্যতার বিকাশের ফলে উৎপাদন ব্যবস্থায়

ঘটেছে উৎকর্ষ, সমাজ ব্যবস্থায় ঘটেছে বিবর্তন, আদিম সংস্কারও হয়েছে পরিস্রুত, নতুন তাৎপর্য-মণ্ডিত ও নবব্যঞ্জনাঋদ্ধ। ফলে সাংখ্যের পুরুষ-প্রকৃতির, মৈথুনের ও সৃষ্টিতত্ত্বের কালিক বিবর্তনে, আধ্যাত্মিক বিশ্লেষণে ও তাত্ত্বিক উৎকর্ষে সৃষ্টিসম্ভব বীজ-ক্ষেত্র পরিণামে মায়া-ব্রাহ্ম, শিব-শিবানী, পুরুষ-প্রকৃতি, বিষ্ণু-লক্ষ্মী প্রভৃতি মৈথুনাত্মক আদ্যশক্তিকল্পিত। সাংখ্যে, যোগে, তন্ত্রে এবং শৈব-শাক্ত-বৈষ্ণব-গাণপত্য-লিঙ্গায়েতে এ আদি মতের জড় ও জের রয়েই গেছে।

J. Frazer বলেছেন "Thus from the same crude philosophy, the same primitive nations of nature and life, the savage may derive by different channels a rule either of profligacy or lf asceticism."[৫] অতএব ঐ সিদ্ধান্তের অনুসরণে আমরাও অনুমান করতে পারি যে মৈথুন যেমন শস্য উৎপাদনের সহায়, আমরাও তেমনি রতিনিরোধজাত শক্তিসংরক্ষণও শস্য-বৃদ্ধির সহায় হতে পারে—এ ধারণা বশেই কামবর্জিত সাধনা ব্রহ্মচর্যও অবলম্বিত হয়েছে। অতএব বামাচারী ও কামবর্জিত সাধনার উৎস অভিন্ন হতে বাধা নেই।

সাংখ্য, যোগ ও তন্ত্র অভিন্ন মূল অর্থাৎ সাংখ্য হচ্ছে মৌলতত্ত্ব, যোগ ও তন্ত্র ছিল গোড়ায় সাধন পদ্ধতি মাত্র। পরে জনপ্রিয় হয়ে বিকাশ-বিস্তার লাভ করে তিনটে স্বতন্ত্র দর্শনে ও চর্যায় পরিণতি পেয়েছে। গীতার যুগেও সাংখ্য ও যোগ অভিন্ন ছিল—একটি ছিল তত্ত্ব এবং অপরটি ছিল সাধনপদ্ধতি। এবং সাংখ্য, যোগ ও তন্ত্র যে আর্যেতর মানস-উদ্ভূত আদিম মত ও আচার, আজ তা আর বিতর্কের বিষয় নয়।[৬] যোগটা সম্ভবত মঙ্গোলগোত্রের লোকেরই হাতে পুষ্ট, সাংখ্য আদিম অস্ট্রিক-দ্রাবিড় বা ভেড্ডিডদের মানস-প্রসূন আর তন্ত্র ভারতে মঙ্গোলগোত্রের দান বলে অনুমান করা অসঙ্গত নয়।[৭]

উক্ত তিন মতের ধারক ও সাধকরা জৈন-বৌদ্ধ-ব্রাহ্মণ্যবাদীদের কাছে ঘৃণ্য 'লোকায়তিক' নামে চিহ্নিত। এতেই বোঝা যায়, এ তিন মত আদিম এবং দেশজ; তবে কালক্রমে ভারতের আর্য-অনার্য সব মতের ও শাস্ত্রের মধ্যে সাংখ্যদর্শন এবং যোগ ও তন্ত্র পদ্ধতি অনুপ্রবিষ্ট হয়ে সব শাস্ত্রকে ও চর্যাকে প্রবলভাবে প্রভাবিত করেছে, হয়েছে অপরিহার্য অঙ্গ। যোগতান্ত্রিক মিশ্রধারায় বৌদ্ধ, শৈব, শাক্ত, বৈষ্ণব ও বাউল[৮] মত আর দেশজ সুফীমত গড়ে উঠেছিল এভাবেই।

সাংখ্য, যোগ ও তন্ত্র মূলত দেহবাদী ও দেহাত্মবাদী নাস্তিক মত। চৈতন্যের আধার দেহতত্ত্ব জানা এবং দেহের নিয়ামক ও নিয়ন্ত্রক হওয়াই এ সাধনার ও চর্যার লক্ষ্য। দেশজ এই আদি মতকে ব্রাহ্মণ্যবাদীরা অসুর মত[৯] বলে অভিহিত করেছে এবং এ মতানুসারে 'অপরস্প রসসম্ভূত কিমনং কামহৈতুকম' [১৬/৮] অর্থাৎ জগৎ নারী-পুরুষের মিলনজাত এবং কামোদ্ভূত বলে গীতায় উল্লেখ করা হয়েছে। দেহাত্মবাদ নির্ভর সব আদি মতই লোকায়ত মত বলে সাধারণভাবে নিন্দিত হয়েছে। শীলাঙ্ক-রচিত 'সূত্র-কৃতাঙ্গ' সূত্রের ভাষ্যে সাংখ্যে ও লোকায়তে বিশেষ পার্থক্য স্বীকৃত হয় নি।[১০] যদিও কেবল বৌদ্ধমত নয়, বিভিন্ন শাখার, পুরাণের, উপনিষদের ব্রাহ্মণ্যমতও—যেগুলো যোগ ও তন্ত্রকে চর্যার অবলম্বন করেছে—কম বেশি লোকায়ত মতাদর্শ প্রভাবিত হয়েছে। অতএব, সাংখ্য, যোগ ও তন্ত্র একাধারে লোকায়ত চিন্তা-চেতনারই অবদান।

২.

মধ্যযুগের বাঙলাদেশে বাঙলা ভাষায় জীবনতত্ত্বের ও জগৎ-চেতনার যে কালিক স্থানিক, গৌত্রিক, সাম্প্রদায়িক ও শাস্ত্রিক অভিব্যক্তি ঘটেছে, গোড়ায় ছিল তার দুটো রূপ : একটি

ঐহিক ও দৈনিক এবং অপরটি ছিল পার্থিব-জীবনসম্পৃক্ত হলেও আধ্যাত্মিক এবং পারত্রিক। আমরা জানি, বাঙলাদেশ স্বরূপত আর্য অধ্যুষিত নয়, আর্যরক্ত-শঙ্কর মানুষও এখানে সুদুর্লভ। এ জন্যেই বাহ্যত আর্যীকৃতি ও আর্যায়ণ সম্ভব হলেও অন্তরে বাঙালীরা লোকায়ত বিশ্বাস-সংস্কার, আচার-আচরণ রক্ষা করেই চলেছিল। তার প্রমাণ একদিকে তাদের সৃষ্ট মধ্যযুগীয় দেবতা শিব, চণ্ডী, মনসা, ধর্মঠাকুর, ক্ষেত্রপাল, ষষ্ঠী শীতলা, ওলা, বৎসলা, যক্ষ, পীর-নারায়ণ সত্য ও তাঁর চেলা প্রভৃতি হিন্দুর ও প্রচ্ছন্ন বৌদ্ধদের দেবতার উপস্থিতি ও পূজা, অন্যদিকে যোগে-তন্ত্রে দেহাত্মবাদের প্রসার এবং বৌদ্ধ, বৈষ্ণব ও বাউল সহজিয়া মতের এবং দেশজ সুফীতত্ত্বের অবিলুপ্তি।

চিরকাল বিজাতি-বিভাষী বিজিত-দলিত ও শাসিত-শোষিত ছিল বলে বাঙালীর জীবনের, জয়ের, সাফল্যের, ভোগ-উপভোগের উল্লাস কিংবা আকস্মিক বঞ্চনার, পরাজয়ের, ব্যর্থতার ক্ষোভ-ক্রোধ-বেদনা তেমন অভিব্যক্তি পায়নি। মর্ত্য জীবনের বঞ্চনা-নিরাশা তাকে দেবাশ্রিত ও অন্তর্মুখী করেছে, বাস্তবে ব্যর্থতা কল্পজগতের আশ্বাসকামী করেছে তাকে। তাই পার্থিবজীবনের নিরাপত্তার ও সুখ-শান্তি-আনন্দ-আরামের জন্যে বাঙালীর দেবতা সৃষ্টিতে ও দেবতা পূজাতে কোন মনন ছিল না, ছিল মতলব মাত্র। ঐহিক জীবনের অরি ও মিত্রশক্তি-প্রতীক এ সব দেবতার সঙ্গে মানুষের পাপ-পুণ্য সম্পৃক্ত স্বর্গ-নরক প্রাপ্তির কোন সম্পর্ক নেই, অন্যদেশে অন্য মানুষ এক্ষেত্রে ঝাড়-ফুঁক-কবজ, মন্ত্র-মাদুলী, তুক-তাক, বাণ-উচ্চাটন ও দারু-টোনা, আশ্রিত হয়। এটাও বাঙালীর ঐহিকজীবন প্রবণতার প্রমাণ। এ ভোগে-সুখ লোগী কর্মকুণ্ঠে বাঙালীর কৃপা-করুণায়, দয়া-দাক্ষিণ্যে বাঁচার ঘৃণ্য আগ্রহেরও সাক্ষ্য। তোয়াজে-তোষামোদে অরি দৈবশক্তিকে বশ করার আর মিত্র শক্তিকে বশে রাখার প্রয়াস বাঙালীর পৌরুষের, উদ্যমের, আত্মপ্রত্যয়ের, সাহসের, সদিচ্ছার ও আত্মসম্মানবোধের স্বল্পতারই প্রমাণ।

কর্মকুণ্ঠ অথচ ভোগলিপ্সু এ মানুষ তাই ভিক্ষা, চুরি, মিথ্যাচার, তোয়াজ, প্রতারণা, প্রভৃতিকেই করেছিল জীবিকা অর্জনের পুঁজি। এ জন্যে বাঙালী চিরকাল বিদেশীর নিন্দা পেয়েছে। আর স্বাধীন, স্বনির্ভরও হতে পারেনি একারণেই। এমন উদ্যম-উদ্যোগহীন মানুষ ধনে-সম্পদে ঋদ্ধ হতে জানে না। ফলে বাঙালীরা চিরকাল বিদেশী-বিজাতি-বিভাষী-বিধর্মী শাসিত ও শোষিত জাতি। আবার পর-শাসিত-শোষিত বলেই আর্থ-সামাজিক ক্ষেত্রে ও সাংস্কৃতিক অঙ্গনে তার স্বাধীনভাবে আত্মবিকাশ ও আত্মপ্রসার সম্ভব হয়নি। কর্মকুণ্ঠ ও ভোগলিপ্সু দরিদ্র এ মানুষ পর-দলিত-বঞ্চিত বলে আত্মমর্যাদাবোধে ও আকাঙ্ক্ষায় উজ্জীবিত হয়ে সে আত্মপ্রসারেও হয়নি সমর্থ। মননে-চিন্তনে আচারে-সংস্কারেও তাই আবর্তিত হয়েছে তাদের জীবন—অগ্রসর হয়নি দু'হাজার বছরেও। এ জন্যেই ধর্মমঙ্গলে, চণ্ডীমঙ্গলে, গৌরী-মঙ্গলে যুদ্ধ-বিগ্রহের, সংঘর্ষ-সংঘাতের কথা থাকলেও তা যেন দেবাসুরের, রাজা-রাজড়ার যুদ্ধ-সংগ্রাম, তার সঙ্গে যেন গণমানবের কোন সম্পর্ক নেই।

সাংখ্য, যোগ ও তন্ত্র গোড়ায় ছিল নিরীশ্বর ও ঐহিক জীবন বৃদ্ধি লক্ষ্যে শরীর ও স্বাস্থ্য সুষ্ঠু রাখার শাস্ত্র, সাধনা ও চর্যা। পরে ক্রমে উত্তর-ভারতীয় ব্রাহ্মণ্য শাস্ত্র, শাসন ও সংস্কৃতি প্রভাবে তাতে ঈশ্বরের ঠাঁই হয়ে যায়। ঐহিক নাস্তিক্য দর্শন ও চর্চা এভাবে আধ্যাত্মিক ও পারত্রিক জীবন চেতনায়, পরিণাম-পরিণতি কল্পনায় নতুনতর বোধের জগতে প্রসার ও উত্তরণ লাভ করে। লক্ষণীয় যে, বাঙালীর উঁচুমানের সব চিন্তা-চেতনাই আধ্যাত্মিক ও অন্তর্মুখী প্রাণ-চৈতন্য সম্পৃক্ত। এ হচ্ছে মর্ত্যজীবনে বঞ্চিত, পরাজিত, হতোদ্যম মানুষের আত্মপ্রবোধের ও

স্বস্তির অবলম্বন সন্ধানের প্রয়াস। মর্ত্যে যা কাম্য তা সাধ্যাতীত, স্বর্গে যা বাঞ্ছিত, তা অনিশ্চিত, তবু মর্ত্যে বাঁচতে হলে সেই ভরসাতেই নিঃস্ব লোকের বাঁচা সম্ভব।

বলেছি, কণাদের বৈশেষিক দর্শনে 'অণু'কেই জগৎকারণ বলে চিহ্নিত করা হয়েছিল, তাতেও স্রষ্টার বা ঈশ্বরের ভূমিকা ছিল অনুক্ত। বৃহদারণ্যকে আছে, 'যে ব্যক্তি আত্মাব্যতীত অন্য কোন দেবতার আরাধনা করে, সে দেবগণর গৃহপালিত পশু বিশেষ'। ১/৪/১০। এখানে উল্লেখ্য যে যজ্ঞ দেবপূজা নয়, কোন কিছু প্রাপ্তি লক্ষ্যে দেব-মানবের চুক্তিসম্পৃক্ত জাতবেদ (অগ্নি) মাধ্যমে অনুষ্ঠানমাত্র।

বৃদারণ্যকে ও ছান্দোগ্যে [১১] বলা হয়েছে 'আত্মাই ব্রহ্ম'।

বৃহস্পতিলৌক্য বা ব্রাহ্মণস্পতি 'বস্তুকেই চরম সত্য' বলে ঘোষণা করেন। চার্বাক ছিলেন এ বৃহস্পতিলৌক্যের মতানুসারী। তাই চার্বাকপন্থীদের বার্হস্পত্য বা 'লোকায়তিক' নামে অভিহিত করা হয়। কাজেই চার্বাকরা জড়বাদী বা বস্তুবাদী নাস্তিক[১২] নিরীশ্বর। এদের মতে 'জড় পদার্থ থেকেই চৈতন্যের উৎপত্তি'। এ মতের সমর্থন বৃহদারণ্যক উপনিষদেও মেলে। এদের মতে দেহের বিনাশে চৈতন্য লোপ পায়, এবং দেহের উপাদানগুলো স্ব স্ব ভূতে অর্থাৎ পঞ্চভূতে বিলীন হয়। কাজেই কর্মফল ভেদে আত্মার জন্মান্তর প্রভৃতি ভুল ধারণা। এ জড়বাদী চিন্তার প্রসূন হচ্ছে ইন্দ্রিয়াত্মবাদ, প্রাণাত্মবাদ ও মনশ্চৈতন্যবাদ। এ ঐহিকতাবাদের বা নাস্তিক্যবাদের বিভিন্নকালে ধারক-বাহক ছিলেন জবালিমুনি, হরিবংশের রাজা বেণ, গৌতমবুদ্ধের সমকালীন কেশকম্বলী, তাঁর শিষ্য পায়াসি, এবং ভাগুরি, পুরন্দর পুরানকসসপ, মকখলি গোসাল, নাথপুত্র প্রমুখ অনেকেই। ইন্দ্র-বিরোচনা উপাখ্যানে বিরোচন বলেছেন :

'এ পৃথিবীতে দেহেরই পূজা করবে, পরিচর্যা করবে দেহেরই, —দেহকে মহীয়ান করলে, তার পরিচর্যা করলে ইহ-পর দুইলোকই পাওয়া যায়'।[১৩] তন্ত্রেরও সারকথা হচ্ছে 'যা আছে ভাণ্ডে (দেহে), তা-ই আছে ব্রহ্মাণ্ডে'। অতএব ভাণ্ডের তথা দেহের সন্ধান নাও, কায়াসাধনে দেহের নিয়ামক ও নিয়ন্ত্রক হলেই অজরামরবৎ সর্বশক্তির অধিকারী হয়ে জীবনকে ইচ্ছাসুখের ও ইচ্ছামৃত্যুর অধীন করা সম্ভব হয়।

৩.

প্রাচীন ও মধ্যযুগের বাঙলার মৈথুনতত্ত্বচিন্তার, সাংখ্যের, যোগের ও তন্ত্রের ঐহিকতার এবং দৈহিক জীবন-চেতনার গুরুত্ব ছিল অশেষ, ঐতিহ্য ছিল গভীর ও ব্যাপক। তাই মধ্যযুগের সাধারণ হিন্দু বাঙালীর এবং বাউল-সূফীশ্রেণীর মুসলিম বাঙালীর মনে-মননে, শাস্ত্রে-সমাজে-আচারে-সংস্কারে ও তাত্ত্বিক শিক্ষাসংস্কৃতিতে ঐহিকতা ও দৈহিকতা পেয়েছিল বিশেষ প্রাধান্য। বলেছি জীবনের অরি-মিত্র শক্তিরূপে ভয়-ভরসার আধার লৌকিক দেবতা সৃষ্টি যেমন ঐহিক জীবন ও বাস্তব প্রয়োজন চেতনায় সাক্ষ্য, তেমনি দেহের অস্থি-সন্ধি জেনে দেহোত্থিত ও দেহস্থিত চৈতন্যের স্বরূপ উপলব্ধির এবং দেহাত্মার নিয়ামক ও নিয়ন্ত্রক হয়ে স্বেচ্ছাসুখের, স্বেচ্ছানির্বাণের বা সহজানন্দের কিংবা অনস্তিত্ব রূপ শূন্যতার অধিকারী হওয়ার বাঞ্ছাও মূলে তাদের এ জগৎসীমায় নিবদ্ধ জন্মে ও জীবনে নিরীশ্বর ঐহিকতায় আস্থার প্রমাণ। বুদ্ধবাণী— 'সব্বেসত্তা সুখিতা হোন্তু, অবেরা হোন্তু, সব্বেসত্তা দুকখাপুমুঞ্চন্তু'—সব জীব সুখী হোক, শত্রুতামুক্ত হোক, সব জীব দুঃখমুক্ত থাকুক—এতেও রয়েছে ঐহিক জীবনের প্রাধান্য।

বারো শতকের উষাকালীন তুর্কীবিজয়কে আমাদের দেশে প্রাচীন যুগের অবসান এবং মধ্যযুগের আরম্ভ মুহূর্ত বলে স্বীকার করা হয়। বাঙলাভাষার লক্ষণাক্রান্ত কিন্তু পূর্বভারতের

আধুনিক আধুনিক মৈথিল-উড়িয়া-বাঙলা-আসামীভাষার মাতৃস্বরূপা লেখ্য অর্বাচীন শৌরসেনী অবহটঠে লিপিবদ্ধ চর্যাগীতি ও দোহাগুলোতে ওই নিরীশ্বর নির্বাণকামী কায়াসাধকদেরই মন, মনন, এবং জগৎ-চেতনা ও জীবন-ভাবনা অভিব্যক্তি পেয়েছে। সাধ্য, সাধনলক্ষ্য ও সাধন-পদ্ধতিই ওই সব গীতির ও [কাহ্নের ও সরহের] দোহার রূপক-সাংকেতিক [সন্ধা বা সন্ধ্যা] ভাষায় বিবৃত। সে-কালে বাঙলায় শাস্ত্র, সাহিত্য, দর্শন প্রভৃতি সব কিছুই ছন্দে বিবৃত হত, লিখিতও হত পদ্যে—সমিল পয়ারে, এসব ক্ষেত্রে গদ্যের ব্যবহার ছিলই না।

'কায়া তরুবর পঞ্চবি ডাল।'—দেহতরুর পঞ্চ ইন্দ্রিয়জ স্কন্দ—রূপ, বেদনা, সংজ্ঞা, সংস্কার ও বিজ্ঞান। এর থেকেই মন বা চিত্ত নামের চেতনা প্রবাহের সঞ্চার। এর তাত্ত্বিক নাম মনশ্চৈতন্য, ইন্দ্রিয়াত্মা, প্রাণাত্মা—মনশ্চৈতন্যবাদে বা ইন্দ্রিয়াত্মবাদে কিংবা প্রাণাত্মাবাদে তাই আত্মার অমরত্ব স্বীকৃত নয়, দেহেই চৈতন্যরূপ ওই আত্মার স্থিতি এবং বিকল দেহেই তার বিলুপ্তি। এ চৈতন্যের স্থিতির বাহ্যলক্ষণ শ্বাস-প্রশ্বাস রূপ বায়ু। তাই দম বা শ্বাস নিয়ন্ত্রণও সাধনার আবশ্যিক অংশ। দেহস্থ বায়ু বা অনিল নিয়ন্ত্রণের প্রধান পদ্ধতি হচ্ছে যৌগিক পদ্ধতি, আবার বৌদ্ধ বজ্র-সহজযানী মতে চেতনার বীজ হচ্ছে বজ্র বা শুক্র। বজ্র দৃঢ়তার ও কাঠিন্যের প্রতীক। বজ্রসত্ত্ব দৃঢ়, সার, অচ্ছিদ্র, অভেদ্য ও অবিনাশী। বজ্রসত্ত্ব শূন্যতাসত্ত্বেরই নামান্তর। বজ্রনিয়ন্ত্রণে জীবন জীবের নিয়ন্ত্রণে আসে। এ বজ্রেই বৌধি-চিত্তের স্থিতি —বজ্রই বৌধিচিত্ত। তাই বজ্রসত্ত্ব, বজ্রধর, বৌধিচিত্ত ও বুদ্ধ নামভেদে অভিন্ন।

দেহের তিনটি প্রধান নাড়ী ইড়া-পিঙ্গলা-সুষুম্না [গঙ্গা-যমুনা-সরস্বতী] মাধ্যমে লিঙ্গমূল থেকে শুক্রধারায় [কাম-কুণ্ডলিনী শক্তির] উর্ধ্বস্রোত ঘটিয়ে ক্রমে ললাটে-দেশে সহস্রা নামের সহস্রদল পদ্মে সঞ্চয় করে রাখাই বজ্র-সহজযানী কায়াসাধকদের লক্ষ্যে। শুক্র মৌজুত রাখার এ সাধনায় সিদ্ধি হলে লাভ হয় অদ্বয়-শূন্য বা প্রজ্ঞা-উপায়ে মিলনজাত শূন্যাবস্থা তথা নির্বেদ সমাধি অবস্থা বা সহজানন্দ কিংবা মহাসুখ অবস্থা। এ অবস্থায় :

'ঘুমই ণ চেবই সপরিবিভাগা/চিঅ সহজে শূন সংপুন্ন/
চেঅন ন বেঅন ভর নিদ গেলা/সঅল মুকল কবী সুহে সুতেলা। [কাহ্ন]
অদ্বয় চিত্ততরু অবহু গউ তিহু আঁন বিথার/করুণা ফুল্লাফল ধরই ণাউ পর উগার [সরহ]
তখন—কাহ্ন বিলসঅ আসব মাতা/সহজ নলিনীবন পইসি নিবিতা [কাহ্ন]
দেহ সরসিঅ তিথ মইঁ সুহ অণণন দিটঠঅ/আই ণ অন্ত ণ মজঝ ণউ ণউ
ভব ণউ নির্ব্বাণ/এহ সো পরম মহাসুহ ণউ পর অপ্পাণ [সুরহ]
স্বপনে মইঁ দেখিল তিহু বণ সুণ/ঘোরিঅ অবণাগবণ বিহণ/ [কাহ্ন]
তখন—কমল কুলিসবেরি মজঝঠিউ জো সো সুরঅ বিলাস/কোন ণ রমই তহ তিহু অণেহি কস্‌স ন পুরই আস [সরহ]-অর্থাৎ "সে ঘুমায়ও না, [আবার]

আপন পর [স্ব-পর] সম্বন্ধে তার চেতনাও থাকে না। চিত্ত তার সহজ [সাধনায় সিদ্ধির ফলে] শূন্য ও সম্পূর্ণ থাকে। চেতনা ও সংবেদনহীন হয়ে সে পূর্ণ [গভীর] নিদ্রায় মগ্ন হল। সকল [কিছু থেকে] মুক্ত হয়ে সে সুখে সুপ্ত রইল। অদ্বয় চিত্ততরু এখন ত্রিভুবনে বিস্তার পেল। করুণা [রূপ] ফুল-ফল পর-উপকারার্থে ধরে না, [তখন] আসবমত্ত কাহ্ন বিলাস করে এবং সহজ [রূপ] নলিনী বনে প্রবেশ করে নিবৃত্ত হয়। দেহরূপ সরণীতে ছাড়া অন্যতীর্থে আমি সুখ দেখি না। আদি নেই, অন্ত নেই, মধ্য নেই, নেই জন্ম, নেই নির্বাণ, —এই সেই পরম সুখ, পরও নয়, আত্মও নয়। স্বপ্নে দেখলাম আমি, ত্রিভুবন শূন্য-ঘুরে ঘুরে আসা-যাওয়া [জন্ম-মৃত্যু-পুনর্জন্ম]

বিহীন, [তখন] বজ্রকমল জড়িয়ে [অদ্বয় হয়ে] সুরত বিলাস সম্ভব। [কিন্তু] কেউ রমণ করে না। "অন্যভাবে ত্রিভুবনে কারো আশা পূর্ণ হয় না।"

এটিই অদ্বয় বজ্রতত্ত্ব তথা বজ্রসত্ত্ব ও বজ্রতারার অদ্বয় অভিন্ন অবস্থা অবস্থানতত্ত্ব। এটি বৈষ্ণবের অদ্বৈততত্ত্ব, অভেদতত্ত্ব ও সূফীর বাকাতত্ত্বের সদৃশ্য। আর বজ্র-তারা, প্রজ্ঞা-উপায়, শূন্য-করুণা প্রভৃতি মায়া-ব্রহ্মের, শিব-শক্তির, পুরুষ-প্রকৃতির, আত্ম-পরমাত্মার যুগল ও অভেদতত্ত্বের, সূফীর ফানা ও বাকাতত্ত্বের রকমফের মাত্র—সহজযানীদেরও 'চতুষ্কোটি বিমুক্ত' তথা ভব-নির্বাণ বা অস্তি-নাস্তি বোধ অবস্থা।

এ অবস্থায় উত্তরণ অবশ্য কঠোর ও দুঃসাধ্য সাধনা সাপেক্ষ। চৌরাশী আঙুল পরিমিত দেহনিয়ন্ত্রণে ও শাসনে সমর্থ হলেই সাধনায় সিদ্ধিলাভ ঘটে, চৌরাশী আঙুল পরিমাণ দেহের সাধনায় সিদ্ধ বলেই সাধক সিদ্ধ বা 'চৌরাশী সিদ্ধা নামে' পরিচিত।[১৪]

পরবর্তীকালে বজ্রকুলের সাধকরা তথা বজ্রসহজপন্থীরা মধ্যযুগের বৈষ্ণব সহজিয়া পরিচয়ে এবং গুরুপন্থী 'হিন্দু-মুসলিম বাউল' রূপে এ সাধনাই করে এসেছে। নিয়ম-নীতি রীতি-পদ্ধতিও আক্ষরিকভাবে গুরু ও শিষ্য পরম্পরায় অনুসরণের চেষ্টা ছিল। কিন্তু অশিক্ষার, অনক্ষরতার ও অজ্ঞতার দরুন এবং প্রাতিবেশিক কারণে নিয়ম-রীতিতে চর্যায় কিছুটা কালিক বিস্মৃতি-বিচ্যুতি ঘটেছে। তা ছাড়া সংখ্যাগুরু আস্তিক ও প্রবল হিন্দু-মুসলিম প্রভাবে মূলে বৌদ্ধ উপমতাবলম্বী বজ্রসহজপন্থীরা ঈশ্বরানুগত আস্তিক হয়ে ওঠে। ফলে তাদের আচারে বিশ্বাসে ও লক্ষ্যে ঘটে অসঙ্গতি ও অসামঞ্জস্য। এ মতের লোকেরা চিরকালই মধ্যযুগে এবং এ যুগেও সংখ্যায় স্বল্প, অন্তেবাসী ও গুহ্যসাধক। তবু এদের মধ্যেকার স্বাক্ষর সাধক গুরুরা কিছুটা লিখিতভাবে এবং অনেকটা শ্রুতিস্মৃতির আকারে রূপক-সাংকেতিক সন্ধ্যাভাষায় সাধ্যবস্তু ও সাধনতত্ত্ব সম্বন্ধে জ্ঞেয় ও জ্ঞান চালু রেখেছেন। রূপকের কঠিন আবরণ ভেদ করে সংকেতের অনুসরণে তত্ত্বের তাৎপর্য ও সাধ্য বস্তুর স্বরূপ আবিষ্কার করা অন্যদের পক্ষে প্রায় অসম্ভব। যেমন :

রুক্ষের তেন্তরি কুম্ভীরে খাই/বলদ বিআঅল গবিআ বাঁঝে/
বেঙ্গস সাপ বঢ়িল জাঅ/ জো সো চোরা সোই সাধু/
নিতি নিতি সিআল সিহ সম জুঝে/ পিটা দুহিএ এতিন সাঝেঁ।

এ সূত্রে এ-ও উল্লেখ যে সব গুপ্ত ও গুহ্য কর্মের, সাধনার ও আচরণের জন্যে একটা সাংকেতিক ভাষা প্রয়োজন হয়। এ প্রয়োজনে কোড (code) শব্দের ও কোড ভাষার সৃষ্টি ও ব্যবহার বিপ্লবী বিদ্রোহীর মধ্যে নয় শুধু, চোর-ডাকাত-পকেটমার-চোরাকারবারী, গুণ্ডা-জোচ্চোর-ঘুষখোর সমাজেও চালু রয়েছে।

এই সাধনা-ধারার সঙ্গে এরূপ রূপক স্যাংকেতিক বচন, ধাঁধা বা প্রহেলিকাও চালু রয়েছে এ যুগের সহজিয়া-বাউল-সূফী বৈরাগীদের মধ্যে।

জৈন-বৌদ্ধ প্রভাবেই ব্রাহ্মণ্যবাদীদের মধ্যে সন্ন্যাস তথা বৈরাগ্য মত ও পথ সৃষ্টি হয়। যদিও কাপালিক, চার্বাক, লোকায়তিক, আজীবিক নামের সংসারে বিরাগী-বিবাগী ভবঘুরে সম্প্রদায়ের অস্তিত্ব সুপ্রাচীন। বামাচারী বা বামাবর্জিত একপ্রকারের কায়াসাধক যোগী-সন্ন্যাসী-ব্রহ্মচারী বৌদ্ধ-বিলুপ্তির পরে নানা নামে বৌদ্ধ-বৈরাগ্যের ও কায়াসাধনের ঐতিহ্য চালু রাখেন। এঁরা প্রাচীন ভিক্ষু-শ্রবণ-শ্রাবক-যোগী-ডাক-কাপালিকেরই উত্তর-সাধক। গোরক্ষপন্থী, শৈবনাথ পন্থী, শৈব সন্ন্যাসী নাগা-অবধূত, আনন্দ, পুরী, ভারতী প্রভৃতি বিভিন্ন গুরুবাদী সাধকরা বিভিন্ন নামে বিচিত্র পন্থায় শূন্যতা, নির্ধাণ, সহজানন্দ, সচ্চিচানন্দ, অদ্বৈত ও অভেদ অবস্থায় উত্তরণ

লক্ষ্যে এবং পরিণামে জন্মান্তর এড়িয়ে মোক্ষ প্রাপ্তিপ্রত্যাশায় সাধনা করেন। এ সাধনায় সেই যোগতন্ত্রই তাঁদের অবলম্বন, বৌদ্ধযুগে যেগুলোর বিশেষ অনুশীলনে বিকাশ হয়েছিল। বাঙলায় বৌদ্ধ, ব্রাহ্মণ্য ও সূফী মতের তত্ত্বদর্শন এ যোগতন্ত্র ভিত্তি করেই বিকাশ লাভ করে। বৌদ্ধ চতুষ্পদ্ম বা চক্র কিংবা কায় হিন্দু যোগতন্ত্রে ষড়পদ্ম ও ষটচক্র হয়েছে। সূফীরা কখনো বৌদ্ধ, কখনো বা হিন্দু যোগতন্ত্র অবলম্বন করেছেন। নিরাকার ব্রহ্ম ও আল্লাহ 'শূন্য'-এ বৌদ্ধ পরিভাষায় হয়েছেন পরিব্যক্ত। বৌদ্ধ যুগলতত্ত্ব এবং অভেদ তত্ত্বও বৈষ্ণবের যুগল ও অভেদ তত্ত্বে আর সূফীর ফানা ও বাক্যতত্ত্বে অবিলুপ্ত রয়েছে।

৪.

এজন্যেই ডক্টর সুকুমার সেন বলেন :

'নাথপন্থী গোরক্ষপন্থী সাধকেরাও চর্যা সাধনার ঐতিহ্য অনুসারী...চর্যাকারদের সাধনা বাহিরের দিকে অবলুপ্ত হইলেও ভিতরে ভিতরে প্রবহমান ছিল। সে-সাধনার উত্তরাধিকারী ষোড়শ ও পরবর্তী শতাব্দীর রাগানুগ বৈষ্ণব ও মরমীয়া সহজ সাধকেরা। ...শৈব যোগীদের বৌদ্ধ যোগীদের এবং চর্যাগীতির পরবর্তীকালের শিবসঙ্গীতের যোগসূত্র লক্ষ্য করা যায়। ...চর্যামতের এ ধারাটি বাউলদের সাধনায় অব্যাহত রহিয়া গিয়াছে।'[১৫]

ডক্টর মুহম্মদ শহীদুল্লাহও বলেছেন :

'নাথপন্থা যে বৌদ্ধ মন্ত্রযান হইতে উদ্ভূত বা প্রভাবিত তাহাতে কোনই সন্দেহ নাই। এই নাথপন্থ বৌদ্ধ ধর্মের মহাযান শাখার শূন্যবাদের ওপরে প্রতিষ্ঠিত..., এই নাথ পন্থারই অপর নাম সহজসিদ্ধি।'[১৬]

বাঙলায় সূফীমতবাদও একটা দৈশিক রূপ লাভ করেছিল। তাই সূফী-সাধনার ভিত্তি ছিল যোগ ও কায়াসাধন-তান্ত্রিকপদ্ধতি ছিল গ্রাহ্য, লক্ষ্য ছিল ফানাফিল্লাহ বা বাকাবিল্লাহ হওয়া, আল্লাহ্‌তে আত্মসমর্পণ এবং আল্লাহ্‌তে আত্মার নিশ্চিহ্ন বিলুপ্তি।

এখানে উল্লেখ্য যে যদিও জগৎ ও জীবন-জিজ্ঞাসা থেকেই অধিবিদ্যার (Metaphysics) ও দর্শনের (Philosophy) তথা জিজ্ঞাসার যৌক্তিক উত্তর সন্ধানের শুরু, তবু প্রাচীন গ্রীসে, প্রাচীন ভারতে ও আধুনিক জগতে ব্যতীত অন্যত্র ক্বচিৎ শাস্ত্রনিরপেক্ষ অধিবিদ্যার ও দর্শনের চর্চা দেখা যায়। সুপ্রাচীন-কাল থেকেই জগৎ, জন্ম ও জীবন সম্বন্ধীয় তত্ত্বালোচনা ঐহিক-পারত্রিক জীবন নিয়ামত-নিয়ন্ত্রক ধর্মশাস্ত্রকে অবলম্বন করেই বিকাশ-বিস্তার লাভ করেছে। ভারতে যদিও সাংখ্য, যোগ, তন্ত্র আর চার্বাক-কনাদীয় দর্শন ধর্মশাস্ত্র নিরপেক্ষ নিরীশ্বর, নির্লক্ষ্য ঐহিক জীবন-জিজ্ঞাসা সম্পৃক্ত তত্ত্ব-ভাবনারূপে উদ্ভূত হয়, তবু বিচিত্র মতের ও বিভিন্ন গোত্রের মানুষের মন-মননের প্রভাবজাত প্রাতিবেশিক কারণে কালিক ও স্থানিক প্রয়োজনে সাংখ্য, যোগ ও তন্ত্র আস্তিকদর্শনে পরিণত হয়, আর চার্বাক, কনাদ ও আজীবিক দলের মতবাদ এবং বৌদ্ধবিলুপ্তির ফলে ঐহিক জীবন-কেন্দ্রী নাস্তিক্য দেহবাদী অন্য মতগুলোও ক্রমে লোপ পেতে থাকে। এ যুগের কাপালিক-লোকায়তিক, সহজিয়া-বাউল—সব কায়াসাধকই আস্তিক এবং আদি মত ও লক্ষ্য ভ্রষ্ট। তাই 'যাবৎ জীবেৎ সুখং জীবেৎ/ঋণং কৃত্বা ঘৃতং পিবেৎ' কেননা, 'ভস্মীভূতস্য দেহস্য পুনরাগমনং কুতো'—আজ এ নীতির যৌক্তিকতা উচ্চারণ করবার লোক নেই সমাজে।

যদিও গোরক্ষপন্থীদের মতো সবাই জানে ও মানে যে—

মন থির তো বচন থির/পবন থির তো বিন্দু থির।

বিন্দু থির তো কন্দ থির। বলে গোরখদেব সকল থির। [হঠযোগ প্রদীপিকা।]

অথবা, শব্দ স্থির হয় যদি স্থির হয় মন। মন স্থির হন্তে অতি স্থির হয় তন/তন স্থির হন্তে
হয় কায়ার সাধন [আলিরজ।]

কিংবা বাউলদের কেউ কেউ স্বীকার করে যে—

সখি গো জন্মমৃত্যু যাঁহার নাই
তাঁহার সঙ্গে প্রেম গো চাই।
উপাসনা নাই গো তাঁর
দেহের সাধন সর্বসার
তীর্থব্রত যার জন্য—
এ দেহে তার সব মিলে।

তবু প্রত্যাশী আস্তিক মানুষ কেবল কায়-সাধনে তৃপ্ত নয়, ঈশ্বরের স্তুতি-প্রশস্তিতেই স্বস্তি সুখ ও বাঞ্ছাপূর্তি সম্ভব—এ বিশ্বাসে আশ্বস্ত থাকে। বৈষ্ণসহজিয়া পদ বিশেষ করে বাউল গানগুলো এ সাক্ষ্যই বহন করে।

৫.

আনুমানিক তোরো-চৌদ্দ শতকে রচিত, রামাই পণ্ডিতের শূন্যপুরাণে বর্ণিত হয়েছে সৃষ্টিপত্তন। সতেরো শতকের সহদেব চক্রবর্তীর অনিলপুরাণেও বর্ণিত রয়েছে দেহ-সাধন কথা। বায়ু, দম তথ্য শ্বাস-প্রশ্বাস নির্ভর দেহের ও চৈতন্যের তত্ত্ব কথাই এতে বর্ণিত। দেহের এজন্যেই রূপক নাম 'মন-পবনের নাও'। আবার 'মন হয় পবন, পবন হয় সাঞ্রি! কাআ ণাবড়ি ঘাণ্টি মণ কেড়ুআল।

[সরহ, ৩৮নং পদ]

ধর্মঠাকুরের গাজনে ও নাথসাহিত্যে এমনি কিছু প্রহেলিকা পাওয়া যায়, এগুলোও উপাখ্যানের আবরণে জন্ম ও জীবন সম্পর্কিত, সাধনা ও সিদ্ধি বিষয়ক তত্ত্বকথার আধার।

ধর্মপূজাপদ্ধতির প্রাণসংকলিতে পাই—

১. নমহোঁ আদিনাথ সুন নাথ সচ্ছেদ
কহ কহ দেব কায়ার সভেদ—
কোন মতে নাদ-বিন্দু হয় পবন সঞ্চয়
কোথা বৈসে রবি-শশী কোথা বল রয়।
কোন্ মতে নাদ-বিন্দু-কায়ার বিচার।

গোরক্ষ বিজয়েও এমনি কথা মেলে–

২. দীপ নিবিলে জ্যোতি কোথা গিয়া রহে?
শরীর বিয়োগে প্রাণী কোথা যাইয়া বহে?
শব্দ উঠিলে ধ্বনি রহে গিয়া কোথা?
কোন্ নালে আইসে প্রাণ কোন নালে যায়?
কোথায় বৈসে মন কোথায় পবন?
সহস্রার বলি তারে সেবা কোন্ হয়?
কোথা রয় মনুরায় কোথাত সঞ্চার?
কোথায় বৈসএ শিব কোথায় শকতি?

কিংবা দ্বিজ লক্ষ্মণের অনিলপুরাণেও রূপকাশ্রিত কায়া ও সাধনতত্ত্ব মেলে :

১. সরুআ সংকীর্ণ নালে ধরিছে উজান
অক্ষয় অমর দেখ পদ নির্বাণ।
২. মৎস্য নাহি চিনে বক জল কৈল ঘোলা।
৩. মধ্য সমুদ্রে নৌকা, রাখিনু/কাঁকড়া ধরিল কাছি।
মশার লাথিতে দেউল ভাঙ্গিল/পিপিড়ার মনে হাসি।
৪. দূর্বার ডালে ঘুঘুর বাসা তায় কেন কাকের ছা।
৫. গাই বুড়াইল, বলদ বিয়াইল/চিঙ্গিড়া ঘন দেয় স্তন।
৬. আকাট বাঁঝার পুত্র হইয়াছে/ সে খাত্যে চায় পায়রার দুধ।
৭. শকুনি দুগধে লাকড়ি শুষিল/বিলাই পলায় তরাসে।—
৮. মৎস্য বলিয়া দোয়াড়ি গুনিতে যাই/হরিণী পলায় লাফে লাফে।
৯. বাঘে বলদে হালখানি জুড়িলাঙ/মন-পবন তাহার কৃষাণ।
১০. তালের গাছে শোলের পোনা/সয়চানে ধরি ধরি খায়।
১১. পর্বত শিখরে পানি উজাইল/চোরঙ্গী পলু লয়্যা ধায়।

সহদেব চক্রবর্তীর অনিল পুরাণেও এমনি হেঁয়ালি রয়েছে :

১. পুতকীর দুগ্ধে উথলিল পর্বত ভাসিয়া যায়।
সরিয়া বুড়িতে জলবিন্দু নাই ডুবিল দেউলের চূড়া।
বাঘে বলদে হাল জুড়ি মর্কট হৈল কৃষাণ।
পানির কুম্ভীরে হুড়া হাড়ি গেল মুষাএ বুনিল ধান ইত্যাদি।

১৫৭৫ সনে রচিত শেখ ফয়জুল্লাহ্‌র গোরক্ষবিজয়েও এ হেঁয়ালি প্রত্যক্ষ করি। সেই চর্যাগীতির প্রতিধ্বনি :

১. পুকুরে পানি নাই পাড় কেন ডুবে
বাসাঘরে ডিম্ব নাই ছাও কেন উড়ে।
নগরে মনুষ্য নাই ঘরে ঘরে চাল
আন্ধলে দোকান দিল, খরিদ করে কাল।
২. গুরু মীননাথের উল্টা ধারা
পুকুরের মুড়ি ধান শুকাইয়া উগার তলে বাড়া।
৩. মরা মানুষে ভাত রান্ধে জিতা মানুষের পেটে।
৪. ভরিল ইন্দুরে না্ও বিড়াল কাণ্ডারী
সুতিয়া আছেন ব্যাঙ ভুজঙ্গ প্রহরী।
৫. বলদ প্রসব কৈল গাই হৈল বাঁঝা
বাছুরক দোহএ সে তিন সাঁজা।
শুয়াপাখী বসিয়া বিড়াল ধরি খাএ।
শৃগাল হইয়া সিংহের সঙ্গে বুঝে।
[এ যেন চর্যাগীতির আক্ষরিক অনুবাদ।]

কায়াসাধন পদ্ধতি হচ্ছে ফয়জুল্লাহর ভাষায় গোরক্ষনাথের মুখে এরূপ :

আত্তমা নিচল কর শরীর ভিতর
বারে বাউরে প্রবোধ দিয়া বায়ু কর বন্দী।

মূল-কমল মধ্যে বায়ু কর সন্ধি
শরীর সংযোগ বায়ু কমল শোধন।
ইঙ্গলা পিঙ্গলা দুই বশ কর ভালা
রবিশশী চলি যায় তারে কর বন্দী
মন হয় পবন, পবন হয় সাঞি।
পবন নিচল কর চিন রবি-শশী
কারা সাধিয়া গুরু জিন সমকাল।

শুকুর মাহমুদের গোপীচাঁদের সন্ন্যাস কাব্যে দেহের অঙ্গ ও অন্তর এরূপ :

খাকের খুটি নৌকা টাটী আবের গড়া
পবনে গুণ টানে নৌকা আতসেত মোড়া।
কাক কাণ্ডারী নায়ের শকুন ভাণ্ডারী।

অতএব শূন্যপুরাণ, ধর্মপূজাবিধান, সহদেব চক্রবর্তীর ও দ্বিজ লক্ষ্মণের অনিল-পুরাণ, গোরক্ষবিজয়, ময়নামতীর গান, শুকুর মাহমুদের, দুর্লভ মল্লিকের ভবানী দাসের গোপীচাঁদের সন্ন্যাস, যোগীকাচ, যোগচিন্তামণি শেখ জাহেদের আদ্য পরিচয়, শেখ চান্দের হর-গৌরী সম্বাদ এবং হাড়মালা, সাধনামালা, হঠ-যোগপ্রদীপিকা প্রভৃতি বৌদ্ধযুগের ঐতিহ্য তত্ত্ব সম্বলিত কায়াসাধন তত্ত্বগ্রন্থ।

৭

চৈতন্যের আবির্ভাবের পরে কায়াসাধক বজ্র-সহজযানী প্রচ্ছন্ন বৌদ্ধরা নিত্যানন্দ এবং তাঁর স্ত্রী জাহ্নবা ও বীরভদ্রের নেতৃত্বে বাহ্যত বৈষ্ণব মত তথা 'রাধা-কৃষ্ণ' তত্ত্ব বরণ ক'রে। এ সময়ে আউলচাঁদ ও মাধববিবি নামের আরো দু'জন প্রচ্ছন্ন সহজযানী বৈষ্ণব নামের আবরণে রাধাকৃষ্ণ তত্ত্ব অঙ্গীকার করে সহজিয়াদের সঙ্ঘবদ্ধ করে সহজিয়াবৈষ্ণব সম্প্রদায় দৃঢ়মূল করেন। বৈষ্ণব সহজিয়ারা কোন অর্থেই চৈতন্য প্রবর্তিত প্রেম-ধর্মের অনুসারী নয়। নাস্তিক গুরুবাদী কায়াসাধক বৈষ্ণব হয়ে হল আস্তিক এবং কিছুটা ভক্তিবাদী। ঐহিকতাও গেল উবে, ফলে ঘটল মূলতত্ত্ব ও লক্ষ্য নির্বাণ থেকে বিচ্যুতি। সহজিয়ারা বামাচারী ও পরকীয়া সাধক। এরা স্বমত বিশ্বাসযোগ্য এবং সাধারণ বৈষ্ণবদেরও গ্রাহ্য করার জন্যে প্রখ্যাত বৈষ্ণব মহাজদনদের নামে সহজতত্ত্বের গ্রন্থ রচনা করেছে। গৌরপারম্যবাদের (তথা চৈতন্য স্বয়ং বিষ্ণু অবতার, এ মত) ও গৌরনাগরবাদের [চৈতন্য স্বয়ং কৃষ্ণের মতোই নাগর হয়ে প্রেম দিয়েছেন ও নিয়েছেন এ-মত] ও মঞ্জরীতত্ত্বের [রাধাকল্প প্রেমানুভূতি) বিকৃত ব্যাখ্যা ও বিকাশ ঘটে এদের হাতেই। নরোত্তম দাসের নামে চালু নানা গ্রন্থ ছাড়াও অকিঞ্চন দাসের বিবর্তবিলাস, নিত্যানন্দ দাসের প্রেমবিলাস, রামদাসরচিত অভিরাম-লীলামৃত, বৃন্দাবনদাসরচিত নিত্যানন্দের বংশবিস্তার, কৃষ্ণদাস কবিরাজের নামে চালু 'বীর ভদ্রের শিক্ষামূলক কড়চা, মুকুন্দের সিদ্ধান্তচন্দ্রোদয় এবং আগমসার, আনন্দবৈভব, অমৃতরত্নাবলী, অমৃতরসাবলী প্রভৃতি বেনামী সহজিয়া গ্রন্থ সহজিয়াদের প্রিয় তত্ত্বগ্রন্থ। বৈষ্ণব সহজিয়া পদও রাধাকৃষ্ণ রূপকে রচিত হলেও তাতে দেহ চৈতন্য মনশ্চৈতন্য ও ইন্দ্রিয়াত্ম তত্ত্বই পেয়েছে প্রাধান্য, এখানেও রয়েছে সেই প্রহেলিকা :

১. সাপের মুখে ভেকেরে খেলাবি/না হইবি সতী, না হবি অসতী থাকিবি লোকের মাঝে।
২. তোরা পরপতি সনে/শয়নে-স্বপনে/সতত করিবি লেহা

তোরা সিনান করিবি/নীর না ছুঁইবি/ভাবিনী ভাবের দেহা ইত্যাদি বৈষ্ণব সহজিয়ারাও আদর্শভ্রষ্ট, তারা নির্বাণকামী নয়, নাদ-বিন্দু নিয়ন্ত্রণে জীবনী শক্তি বর্ধনে নিরত মোক্ষকামী তান্ত্রিক মাত্র।

যারা বৈষ্ণব নামের আড়াল সৃষ্টি করল না, সেই নামে-হিন্দুও নামেমাত্র মুসলিম সাঁইবাদী তথা গুরুবাদী বাউলরা মূলকায়াসাধন তত্ত্ব ও লক্ষ্য ভ্রষ্ট, ঈশ্বরে সমর্পিতচিত্ত, বিচ্ছিন্ন জীবাত্মার সঙ্গে পরামাত্মার মিলনকামী, ভক্তিবাদী মরমী সাধক মাত্র। অনাত্মনিরীশ্বর ঐহিক ও দৈহিক জীবন-চেতনায় তারা নিবদ্ধ নয়, দেহস্থ আত্মাকে তারা পরমাত্মারই অংশ বলে জানে ও মানে এবং মন ও চৈতন্যসম্পন্ন ব্যক্তি যখন 'মানুষ' নামে পরিচিত, তখন পূর্ণ ও অখণ্ড চৈতন্যরূপ পরমেশ্বরকে বা পরমাত্মাকেও তারা মনের মানুষ, অটল মানুষ, রসের মানুষ নামে অভিহিত করে। এখন তারা যোগ-তান্ত্রিক চর্যানুরাগী নাদ-বিন্দু রহস্য সচেতন ঈশ্বর কৃপাকামী মরমী সাধকমাত্র। বজ্রীরা খুঁজত দেহে স্বাধিকার ও নির্বাণ, সহজিয়ারা খোঁজে মোক্ষ। আর বাউলরা চায় অদ্বৈত সিদ্ধি।

বাউলরা সাধারণভাবে অশিক্ষিত ও অন্ত্যজ বলে গুরু-শিষ্য পরম্পরায় শ্রুতিস্মৃতির মাধ্যমে তাদের সাধনতত্ত্ব ও সাধ্যবস্তু সম্বন্ধে ধারণা দেয়া-নেয়া করে, ফলে অজ্ঞতা ও বিস্মৃতি এবং অনুপলব্ধিজাত বিকৃতি ও অসঙ্গতি বাউল মতের সুস্পষ্ট পরিচয় দেয়া-নেয়ার পক্ষে দুর্লঙ্ঘ্য বাঁধা হয়ে দাঁড়িয়েছে। এখনকার দিনে বজ্র-সহজযানী বৌদ্ধে, বৈষ্ণব-সহজিয়ায় ও বাউলে কেবল যে ঐহিকতায়-পারত্রিকতায়, নাস্তিক্যে-আস্তিক্যে, দেহতত্ত্বে ও ঈশ্বর-তত্ত্বে, সাধন লক্ষ্যে ও সিদ্ধি চেতনায় পার্থক্য ঘটেছে, তা নয়, জগৎ-চেতনায় ও জীবনভাবনায় এবং পরিণাম চিন্তায়ও ঘটেছে, তা মৌলিক পার্থক্য। মননের ও দৃষ্টির এ বিবর্তন ও পার্থক্য সত্ত্বেও তিনটেই যে অভিন্ন মূল তা লাক্ষণিক ও আচারিক পরিচয়ে আজো স্পষ্ট। অশিক্ষিত বলে অথবা গুহ্য বলে বাউলরা তাদের শাস্ত্র লিপিবদ্ধ করে রাখতে পারেনি। উনিশ শতকের শেযার্ধের বাউল সাঁই [স্বামী, গোস্বামী] লালনের পূর্বেকার কারো রচিত বাউলগান মেলে না। উনিশ-বিশ শতকের বহু বাউল অনেক অনেক গান বেঁধেছেন। সেগুলোর মধ্যে দেহস্থ চৈতন্য রূপ আত্মার—মানুষের তথ্য পরমাত্মার স্বরূপ জিজ্ঞাসাই বিশেষ প্রকট। তাদের গানে অদ্বৈত-তত্ত্ব, লীলা-তত্ত্বই প্রধান, যদিও নীর-ক্ষীর, রজঃশুক্র, নাদ-বিন্দু সাধন সংকেতও দুর্লভ নয়।

যেমন : ১. কোন্ সুখে সাঁই করেন খেলা এই ভবে।
২. কথা কয় দেখা দেয় না।
নড়ে চড়ে হাতের কাছে, খুঁজলে জনমভর মেলে না।
৩. আমার ঘর খানায় কে বিরাজ করে।
৪. আমার বাড়ির কাছে আরশী নগর/তথা এক পড়শী বসত করে।
৫. এই মানুষে সেই মানুষ আছে।
৬. অনুরাগ নইলে কি সাধন হয়!
৭. একবার আপনারে চিনলে পরে যায় অচেনারে চেনা।
৮. খাঁচার ভিতর অচিন পাখী কেমনে আসে যায় [লালন]
৯. মানুষে গোঁসাই বিরাজ করে [পোদো]
১০. ভাঙা ঘরে টিকবে কি রে রসের মানুষ আর [পোদো]
১১. মানুষে মানুষ রয়েছে মিশে [রাধাশ্যামদাস]

আবার, ১২. শৃঙ্গার রস যে জেনেছে তার কি ভয় আছে?

১৩. তরিতে কি কামসাগরে রসিকে কি ভয় করে; [ঈশান]
১৪. ও কেউ দেখবি যদি সহজ মানুষ রূপের ঘরে চাও [এরফান]
১৫. কামের মধ্যে প্রেমের মর্ম বুঝে উঠা হল ভার।
১৬. দিয়া মাটি পরিপাটি, আগুন, জল আর হাওয়ার ভরে
গাড়ী চলছে আজব কলে [আফসার]
১৭. যোগমাহাত্ম্য রূপের তত্ত্ব জানে কেবল রসিক যারা।
১৮. দেহের মধ্যে পরমবস্তু/রক্ত ধাতু শুক্র ধাতু মা-বাপ দুইজন/
কুণ্ডলিনী সহায় রেখে উর্ধ্বে বাদাম তোল। [গোঁসাই চাঁদ]

এমনিভাবে বাউলরা সাঁইতত্ত্ব, সৃষ্টিতত্ত্ব, আত্মতত্ত্ব, দেহতত্ত্ব, অভেদতত্ত্ব, গুরুতত্ত্ব, সাধনতত্ত্ব, প্রেমতত্ত্ব, ভক্তিতত্ত্ব ও আত্মবোধন, প্রার্থনা প্রভৃতিমূলক গান রচনা করেছেন। এসব গান সংগৃহীত হয়ে লিপিবদ্ধও হয়েছে এবং হচ্ছে।

বাউল গানেও গুহ্যতত্ত্ব হেঁয়ালি করে প্রকাশ করা হয়েছে। যেমন :

১. এমন ছেলে কে জন্মালো রাই। যে তাহারে জন্ম দিল সে ধরেছে তাহার পায়।
২. মেয়ের বয়স তিন মাস ছিল, ছয় মাসে তার গর্ভ হল।
তার পেটে তিন সন্তান হল, পতিপুত্র সেই পেয়েছে। [আহাদ]
৩. বাপের নামটি মায়ের বাবা, বিনা গর্ভে জন্ম হয়।
ভগ্নিপতির পত্নী পিতা, আমি তার পুণ্য। [মমিজান]
৪. মাতৃগর্ভে পুত্রের জন্ম শুনতে পাই ওর পতি ঐ।
পিতার যখন হয়নি বিয়ে আমি এলাম ঘটক হয়ে।

আমরা যাকে বলি অ্যাবসার্ড, তেমন রূপক-সাংকেতিক কথায় চর্যাগীতি থেকে বাউল গীতি অবধি তত্ত্ব কথা পরিব্যক্ত হয়েছে।

৭.

আজকের যন্ত্র যুগে সংহত পৃথিবীটা যথার্থই সবার মতোই ক্ষুদ্র। এখন যে কারো চিন্তা-চেতনায়, আবিষ্ক্রিয়ায়, যন্ত্রে, প্রকৌশলে, জ্ঞান-প্রজ্ঞায় বিশ্ব মানবিক উত্তরাধিকার। এখনকার যন্ত্রনির্ভর জীবনে স্বাতন্ত্র্য তাই দুর্লক্ষ্য কিন্তু আগেকার দিনে মত-পথের, জীবনযাত্রার, নিয়ম-নীতির, রীতি-পদ্ধতির সহজে লক্ষণীয় পরিবর্তন হত না, কেননা তখন জীবন ছিল স্থানের ও কালের সীমায় নিবদ্ধ। সে-যুগে দূরদেশের নতুন মানুষের নতুন মানসের ও রীতি-নিয়মের এবং তাদের সভ্যতা-সংস্কৃতির সঙ্গে পরিচয় ঘটত রাজকীয় জয়-পরাজয়ের মাধ্যমে। এমনকি বাণিজ্যিক আদানে-প্রদানেও ঘনিষ্ঠ পরিচয়ের সুযোগ হত না, তার প্রমাণ ষোল শতক থেকে য়ুরোপীয়রা ভারতে বাণিজ্য করেও উনিশ শতকের ঊষাকাল থেকে ইংরেজী শেখার আগে ইংরেজের ও য়ুরোপীয় সভ্যতা-সংস্কৃতির, মনন-চিন্তনের ও আচার-আচরণের প্রভাব পড়েনি এদেশের মানুষের ওপর।

হেজাজের কাসিম-পুত্র মুহম্মদের সিন্ধু বিজয়ের ফলে মুসলিমদের একেশ্বরবাদের প্রভাব এখানে শঙ্করের নেতৃত্বে অদ্বৈতবাদভিত্তিক নতুন শাস্ত্রের ও সমাজচিন্তার উদ্ভব ও প্রসার ঘটে, ক্রমে দক্ষিণ ভারতের ভাস্কর, রামানুজ, বিষ্ণু স্বামী, নিম্বার্ক, মাধ্ব ও বল্লভ অদ্বৈতবাদ সম্বল করে তাঁদের নব নব মত প্রচার করেন।

উত্তর ভারতে মাহ্‌মুদ গজনবীর ও ঘোরীদের ভারত-বিজেতা হিসেবে বারবার অনুপ্রবেশের

এবং পরিণামে দিল্লীরাজ্য প্রতিষ্ঠার ফলে উত্তর ভারতেও ইসলামী সাম্যের এবং একেশ্বরবাদের আশুপ্রভাবে দলিল-শোষিত-বঞ্চিত নিম্নবর্ণের অচ্ছুতদের মনে জাগে শোষণ ও লাঞ্ছনা মুক্তির আকাঙ্ক্ষা, জাগে আত্মপ্রতিষ্ঠার ও আত্মবিকাশের সুখ-স্বপ্ন, জাগে দেব-দ্বিজ-বেদের নামে পীড়ক-শোষক ব্রাহ্মণ্য শাস্ত্রী-শাসকদের বিরুদ্ধে ক্ষোভ ও দ্রোহ। ফলে যারা ইসলামে সরাসরি দীক্ষিত হতে চায় নি, তারা রামানন্দ, রামদাস, কবীর, নানক, দাদু, একলব্য প্রমুখ প্রচারিত স্রষ্টাভক্তি ও মানবসাম্য ভিত্তিক একেশ্বরবাদী অপৌত্তলিক ভক্তিবাদী মত বরণ করে সম্প্রদায়গুলো গড়ে তোলে। সাধু বা সন্তসাধন প্রচারিত বলেই এগুলোর নাম সন্তধর্ম।

বাঙলাদেশে তুর্কীবিজয়ের ফলে শাসক-শাসিতের পরিচয় মুহূর্তে এখানেও নিম্নবর্ণের ও নিম্নবিত্তের মানুষের মনে দেখা দেয় বিচলন, ক্ষোভ ও দ্রোহ ওই উত্তর ভারতীয় একই কারণে। প্রথমে ন্যায়-স্মৃতি-পুরাণ সংস্কার করে শাস্ত্রে আস্থা ও সমাজে আনুগত্য রাখাবার চেষ্টা করেন ব্রাহ্মণ্য শাস্ত্রী ও সমাজপতিরা। তাতেও যখন ভাঙন রোধ করা সম্ভব হচ্ছিল না, তখন নিমাই ওর্ফে বিশ্বম্ভর সন্ত চৈতন্যদের রূপে অদ্বৈতবাদ ভিত্তিক প্রেমধর্ম প্রচার করে ইসলামের দ্রুত প্রসার রোধ করেন।

চৈতন্য-প্রবর্তিত এ অদ্বৈতবাদমূলক প্রেমধর্মে ইসলামের ও সূফীমতের প্রভাব ছিল প্রত্যক্ষও গভীর। এ তথ্য এখন আর কেউ অস্বীকার করেন না।[১৭] ফলে ইসলাম বরণ না করেও গণমানবকাম্য ব্যক্তির মানবিক মর্যাদা, বর্ণগত বৈষম্যবিহীন সাম্য, যোগ্যতা ও কর্মসূত্রে জীবন নিয়ন্ত্রণ প্রভৃতি মৌল মানবাধিকারে স্বীকৃতি পাওয়ায় জন্মসূত্রে দলিল ও বঞ্চিত ব্যক্তির জীবনে আত্ম-প্রতিষ্ঠার ও বিকাশের সম্ভাবনার দিগন্ত হল প্রসারিত। সামাজিক সাম্য, তালাক, পুনর্বিবাহ, দেব-দ্বিজ-বেদ-বিরোধী নিবর্ণ সমাজ গঠন প্রভৃতি যেমন ইসলামের প্রত্যক্ষ প্রভাবজ, তেমনি ভগবৎভক্তির প্রেমে উত্তরণ, এবং নৃত্যগীত মাধ্যমে সাধন-ভজন, জীবে-দয়া, নাম কীর্তন, বিনয়, নামেরুচি, দশা, সখীভাব, ঐশ্বর্য-প্রদর্শন, রাগানুগাভক্তি প্রভৃতি চর্যা নীতির ও পদ্ধতির প্রবর্তনও সূফীদের ফিকর, খিদমত, সামা, হাল সদা-সোহাগ, কেরামতি, সাধন মার্গের চার স্তরের—শরীয়ত তরিকত হকিকত মারফত—সরাসরি অনুকরণ মাত্র। সূফীর ফানাফিশ-শেখ, ফানাফিল্লাহ্ ও বাকাবিল্লাহ্ ও বৈষ্ণবের গুরুবাদ, যুগলতত্ত্ব ও অভেদসিদ্ধির সদৃশ। বেদান্ত প্রভাবে সূফীরা যেমন অদ্বৈতবাদী, তেমনি বৈদান্তিক অদ্বৈতবাদ অঙ্গীকার করেও বৈষ্ণবরা ইসলামের প্রভাবে অচিন্ত্যদ্বৈতা-দ্বৈতবাদী। জীবাত্মা ও পরমাত্মা প্রায় সূর্যের ও সূর্যালোকের বা পানির ও ঢেউয়ের মতো অবিচ্ছিন্ন বটে, ভিন্নরূপে আলাদাও বটে।

ভক্তিরত্নাকর ও উজ্জ্বলনীলমণির মতো বৈষ্ণবতত্ত্ব গ্রন্থগুলো সাধারণভাবে সংস্কৃতে রচিত—এ মতের ব্যাখ্যাতা হলেন রূপ-সনাতন ও জীব গোস্বামী প্রভৃতি ষড় গোস্বামী। বাঙলায় কৃষ্ণদাস কবিরাজ রচিত 'চৈতন্যচরিতামৃত'কেই একটি শ্রেষ্ঠ বৈষ্ণবতত্ত্ব গ্রন্থ বলে স্বীকার করা হয়, বৃন্দাবন দাসের চৈতন্য-ভাগবতেও কিছু তত্ত্ব মেলে। পরে সতেরো-আঠারো শতকে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অনেক বৈষ্ণব সাধনা নিবন্ধ গ্রন্থে সহজিয়া, তান্ত্রিক, যৌগিক মত, পথ ও সাধন পদ্ধতি আলোচিত হয়েছে। এগুলো চৈতন্যযুগের মত, পথ ও সাধন পদ্ধতির বিকৃত ও গুরু-নির্দেশিত সাম্প্রদায়িক রূপ। ইতিহাসে চৈতন্যপ্রবর্তিত এ নবভাব বিপ্লবের নাম 'গৌড়ীয় নব বৈষ্ণব মতবাদ'।

কৃষ্ণদাস কবিরাজের জবানীতে চৈতন্য-উচ্চারিত অভেদ ও প্রেমতত্ত্ব এই :

'অনন্ত স্ফটিকে যৈছে এক সূর্য ভাসে। তৈছে জীব গোবিন্দের অংশ প্রকাশে'। জীবাত্মা রাধা হৃদয়রূপ বৃন্দাবনে পরমাত্মা কৃষ্ণের সঙ্গে প্রণয়লীলা অনুভব ও আস্বাদন করে। কেননা :

রাধা পূর্ণশক্তি কৃষ্ণ পূর্ণ শক্তিমান
দুই বস্তুভেদ নাহি শাস্ত্র পরমাণ।
মৃগমদ তার গন্ধ যৈছে অবিচ্ছেদ
অগ্নি জ্বালাতে যৈছে নাহি কভু ভেদ।
রাধ কৃষ্ণ ঐছে সদা একই স্বরূপ
লীলারস আস্বাদিতে ধরে দুই রূপ।
কিংবা রাধা কৃষ্ণ এক আত্মা দুই দেহ ধরি
অন্যোন্যে বিলাসয় রসাস্বাদন করি।

এ প্রেমের স্বরূপ এই : আত্মেন্দ্রিয় প্রীতি ইচ্ছা তারে বলি কাম
কৃষ্ণেন্দ্রিয় প্রীতি ইচ্ছা ধরে প্রেম নাম।

এ প্রেম-সাধন পদ্ধতি ও স্তর হচ্ছে এই :

সাধন ভক্তি হইতে হয় রতির উদয়
রতি গাঢ় হৈলে তার প্রেম নাম হয়।
প্রেম বৃদ্ধি ক্রমে স্নেহ মান প্রণয়
রাগ অনুরাগ ভাব মহাভাব হয়।
সেই মহাভাব রূপ রাধা ঠাকুরানী
এবং এ হেন মহা ঠাকুরানী ভাব যার মনে উপজিয়
বেদ ধর্ম তেজি সেই কৃষ্ণকে ভজয়।
অথবা সেই গোপিভাবামৃতে যাঁর লোভ হয়
বেদধর্ম তেজি সেই কৃষ্ণকে ভজয়।

ভজন কীর্তনের প্রয়োজনে প্রেমিক-প্রেমিকারূপে রাধা-কৃষ্ণের রূপকে রচিত হয়েছে প্রায় দশ হাজারের মতো পদ বা গান। বৈষ্ণব ধর্ম হচ্ছে 'রূপ-ধর্ম' অর্থাৎ রূপময় এ সৃষ্টিবৈচিত্র্য দেখেই স্রষ্টাকে উপলব্ধি করা ও ভালোবাসাই অধ্যাত্মচেতনার বিকাশের উপায়। এ জন্যেই 'রূপ দেখে আপনার কৃষ্ণ হয় চমৎকার/আস্বাদিতে সাধ উঠে মনে/এবং জীবাত্মা পরমাত্মারূপ ব্রহ্মে লীন হয়ে আত্মার চিরস্থিতি লাভের জন্যেই বিরহাকৃতি প্রকাশ করছে। 'রূপের পাথারে আঁখি ডুবিয়া রহিল/যৌবনের বনে মন হারাইয়া গেল। ঘরে যাইতে পথ মোর হৈল অফুরান/অন্তরে অন্তর কান্দে কিবা করে প্রাণ।' এবং 'রূপ লাগি আঁখি ঝুরে গুণে মন ভোর/প্রতি অঙ্গ লাগি কান্দে প্রতি অঙ্গ মোর। হিয়ার পরশ লাগি হিয়া মোর কান্দে/পরাণ পিরীতি লাগি থির নাহি বান্ধে। সখি কি পুছসি অনুভব মোয়/সোই অনুরাধ বাখানিতে/তিলে তিলে নূতন হোয়/জনম অবধি হাম রূপ নেহারলুঁ/নয়ন না তিরপিত ভেল।' এ অধ্যাত্ম প্রেম বলেই 'ন সো রমণ, ন হাম রমণী/দুহুঁ মন মনোভব পেখল জনি।' তুলনীয় 'অভেদ পুরুষ নারী যখন বুঝিবে/তখন প্রেমের তত্ত্ব হৃদয়ে স্ফুরিবে।'

৮

সূফীবাদ তথা মরমীবাদ অনারব ও অনৈসলামিক মননজাত মতবাদ ও জীবন-চর্যা। এর উদ্ভব মিসরে, সিরিয়ায়, ব্যাবিলনে-ইরাকে আর বিকাশ ইরানে ও মধ্য এশিয়ায়। সূফীবাদ বলতে কোন একটি বিশেষ মতকে নির্দেশ করে না। গুরু বা পীরবাদী এ মতও বিভিন্ন গুরুর মন, মনন ও উপলব্ধি অনুযায়ী লক্ষ্যে, চর্যায় ও পরিণামে বিভিন্ন। সূফী মত ও পথগুলো সাধারণ

ভাবে প্রবর্তকগুরুর নামে সোহরওয়াদিয়া, মাদারিয়া, নকশবন্দিয়া, কাদেরিয়া, চিশতিয়া, কলন্দরিয়া, শাত্তারিয়া, গওসিয়া, নিজামিয়া প্রভৃতি নামে চলে। এসব মত যে ইসলাম সম্মত তা প্রমাণের জন্য রসুলের হেরাগুহায় ধ্যানে ও কোরআনের কয়েকটি আয়াতে সূফী মতের সমর্থন আবিষ্কার করা হয়েছে।

ইসলামে কোন হেঁয়ালি নেই। সৃষ্টির ও স্রষ্টার তথা মানুষের ও আল্লাহর সম্পর্ক হচ্ছে আব্‌দ ও রবের, দাস-প্রভুর, উপাসক-উপাস্যের, সেবক-সেবিতের। মানুষের দায়িত্ব ও কর্তব্য হচ্ছে অনুগত থেকে ব্যক্তিক, পারিবারিক সামাজিক জীবনে অন্য মানুষের সঙ্গে কর্মে-আচরণে আল্লাহ-নির্দেশিত বিধি নিষেধ মেনে চলা।

আটশতকের হাসান বসরী, রাবিয়া বসরী, ইব্রাহিম আদহম, আবু হাশিম দায়ুদ ত্বয়য়ী এবং নয় শতকের মারুফ করকী, জুননুন মিসরী প্রমুখই আদি মরমী বা সূফী বলে স্বীকৃত। সূফীবাদের উদ্ভবের মূলে রয়েছে মানী, মজদকী গ্রীক, খ্রীষ্টীয় বৈরাগ্যবাদ,বৈদান্তিক অদ্বৈতবাদ, সর্বেশ্বরবাদ, বৌদ্ধ নির্বাণবাদ আর ইরানী ভক্তি বা প্রেমবাদ। ইরাকে-ইরানে-মধ্য এশিয়ায় এ প্রভাব বৌদ্ধ-যুগেই মানুষের মর্মমূলে প্রবিষ্ট ছিল। বাঙলাদেশে তথা ভারতে বহিরাগত বিভিন্ন শাখার এবং স্থানীয়ভাবে উদ্ভূত সূফীমতগুলো বৌদ্ধ-হিন্দু যোগের ও তন্ত্রের প্রভাবে পড়ে একটি দৈশিক রূপ লাভ করে লক্ষ্যেও চর্যায়। উল্লেখ্য যে এ প্রভাব অর্জিত নয়, দেশজ মুসলিমদের বৌদ্ধ-হিন্দু পূর্ব প্রজন্ম থেকে উত্তরাধিকারসূত্রে পাওয়া। তাই তারা মুসলিম হয়েও এবং মুসলিম থেকেও মীননাথী গোরক্ষনাথী রিরংসা বর্জিত যোগ এবং ময়নামতী-হাড়িফা-গোপী চাঁদ চর্চিত বামাচারী যোগ, বৌদ্ধ সহজিয়াদের তান্ত্রিক-বামাচারী সাধনা রজঃশুক্র; নাদ-বিন্দু তত্ত্ব কখনো পরিহার করেনি কিংবা করতে পারেনি পারিবেশিক-প্রাতিবেশিক প্রতিকূলতায়।

ভারতে যাঁরা ইসলাম প্রচার করেছেন, তাঁরা মুখ্যত ইরাক-ইরানের ও মধ্য এশিয়ার সূফী দরবেশ, দীক্ষিতে-দীক্ষাদাতায়, পীরে-সাগরিদে ভাষার ব্যবধান ছিল জানার ও জানানোর পক্ষে প্রবল বাধা। তাছাড়া তাঁরা ছিলেন স্থানিক, সামাজিক, শৈক্ষিক ও তাত্ত্বিক অবস্থানে মানসিক ভাবে সাধারণ অনক্ষর অজ্ঞ অবুঝ মানুষের কাছে বহু বহু দূরের মানুষ। কাজেই নিম্নবিত্তের অন্যসব অশিক্ষিত মানুষের পক্ষে স্বল্পজ্ঞাত ইসলামী শরীয়তে কিংবা সূফীমতে স্থির ও স্বস্থ থাকা সম্ভব হয়নি।

শেখ শুভোদয়া বর্ণিত সূফী দরবেশ জালালউদ্দীন তাবরেজীই প্রথম বাঙলাদেশে রাজা লক্ষ্মণের আমলে বারো শতকের শেষ পাদে কেরামতি যোগে স্থানীয় লোকেদের ইসলামের ও সূফীসাধনার প্রতি আকৃষ্ট করেন। তারপর এ দেশে যাদুপ্রবণ মাদারিয়া ও যোগনির্ভর কলন্দরিয়া ফকিরেরা আসতে থাকেন ও ইসলাম প্রচার করতে থাকেন। চট্টগ্রামে বদরউদ্দীন বদরে আলম, গৌড়ে শেখ শরফউদ্দীন তউয়ামাহ, বদর আলম যাহিদী, বিক্রমপুরে বাবা আদম, বর্ধমানে বদরউদ্দীন, মঙ্গলকোটে মাহমুদ গজনভী ওর্ফে শাহরাহী, দিনাজপুরে বদরউদ্দীন, সিলেটে জালালউদ্দীন কুনিয়াঈ, ময়মনসিংহের মদনপুরে শাহ সুলতান রুমী, পাবনার শাহজাদপুরে শাহদৌলা, বগুড়ায় মাহী আসওয়ার প্রমুখ বাঙলাদেশের নানা অঞ্চলে ইসলাম প্রচারক দরবেশ বলে প্রখ্যাত। এঁরা সবাই বিদেশী ও বিভাষী। কাজেই এঁদের পক্ষে দেশজ মুসলিমের ঐতিহ্যসূত্রে পাওয়া লোকায়ত বিশ্বাস-সংস্কারের, চিন্তা-চেতনার, আচার-আচরণ ধারার পরিবর্তে ইসলামী কিংবা বহির্ভারতীয় জীবনচেতনা ও জগৎ-ভাবনা সৃষ্টি করা ও তাদের মর্মে প্রোথিত করা সম্ভব ছিল না। তাই আমরা যোগ-তন্ত্র নির্ভর হিন্দুর মতো অদ্বৈতসিদ্ধি লক্ষ্যে কিংবা বৌদ্ধের মতো নির্বাণ বা শূন্যতা প্রাপ্তি মুসলিমদেরও চারচক্র বা

ষড়চক্র বা পদ্মযুক্ত দেহের নিয়ন্ত্রণে কারা-সাধনে নিষ্ঠ নিরত দেখি। মুসলিম-রচিত তত্ত্ব গ্রন্থও অনেক। ষোল-শতকের ফয়জুল্লাহর গোরক্ষবিজয়, সৈয়দ সুলতানের জ্ঞান-প্রদীপ, হাজী মুহম্মদের নুরজামাল, সতেরো শতকের মীর মুহম্মদ সুফীর নুরনামা, শেখ চান্দের তালিবনামা এবং হরগৌরী সম্বাদ, আবদুল হাকিমের সাহাবুদ্দীন-নামা; আঠারো শতকের শেখ মনসুরের শির্নামা, শেখ জাহিদের আদ্যপরিচয়, অজ্ঞাত লেখকের যোগকালন্দর, আঠারো-উনিশ শতকের আলি-রজার আগন-জ্ঞানসাগর, শেখ জেবুর আগম, উনিশ শতকের রমজান আলির আদ্যব্যক্ত, রহিমুল্লাহর তন তেলাওত, আবদুর রহিমের মুহম্মদী বেদতত্ত্ব, শাহেজুল্লাহ খানের যোগীকাচ, শেখ কিনুর আশেকী কামাল প্রভৃতি দেশজ-সূফীতত্ত্বের ও চার্যাপদ্ধতির আধার গ্রন্থ। এবার মুসলিম সূফী বর্ণিত দেহতত্ত্বের, শূন্যতত্ত্বের ও অদ্বৈত-তত্ত্ববের নমুনা দিচ্ছি :

১. সাধিলে পরমতত্ত্ব হইবা অমর।
...অমর হয় যোগের কারণ।

২. শরীরের মধ্যে জান চারিচন্দ্র হয়
আদি সিজ গরল উন্মত্ত নিশ্চয়।..
অজুদের চক্রের মধ্যে ঋতুর উদয়।

৩. বায়ুত করহ নর আয়ুর উদ্দেশ,

৪. সহস্রার : সহস্র দলেত গুরু শতদলে শিষ
ষটচক্র ভেদিয়া তাতে করহ উদ্দেশ।

৫. শিব শক্তি : শিব-শক্তি দোহ এক ভিন্নমাত্র নাম
শিব ধরিতে শক্তির লিঙ্গেতে বিশ্রাম। [সৈয়দ সুলতান]

৬. চন্দ্রসূর্য কামবিন্দু শরীর মাঝার
অনাহত পুরুষ পরাণ পুরে বাস।

৭. শূন্যে আয়ু শূন্যে বায়ু শূন্যে মোর মন...
শূন্যে জীউ, শূন্যে পিউ, শূন্যে সব জিন্দা।.. [শেখচান্দ]
নাম শূন্য কাম শূন্য শূন্য যার স্থিতি
শূন্যেতে পরমহংস শূন্যে ব্রহ্ম-জ্ঞান...
সেইসব শুদ্ধযোগী হয় শূন্য ভোগী। [আলিরজা]

৮. দ্বৈতাদ্বৈত তত্ত্ব : বীজ হতে বৃক্ষ যেন বৃক্ষ হোন্তে ফল
একে হয় তিন জান তিনে এক হয়
বীজ বৃক্ষ ফল হোন্তে কেহো ভিন্ন নহে।
তথাপি ফলেরে বৃক্ষ কহন না যায়
তেনমত জানিও যে আল্লা আর বান্দা...
যদিও সিন্ধু ঢেউ সিন্ধু হোন্তে কেহ ভিন্ন নহে
আল্লা হোন্তে বান্দাসব কেহ ভিন্ন নহে।...
তবু—ঢেউ মৈলে কভু সাগর না মরয়।
তেমমত জানিয়া বান্দা আর খোদায়।
পুষ্পের মধ্যেত গন্ধ গন্ধেত স্বরূপ
বেকত গোপত বেশ গোপত স্বরূপ। [হাজী মুহম্মদ]

৯. আত্মা : পুষ্পের অন্তরে গন্ধ যেমন নিশ্চয়
গোঠের অন্তরে দুগ্ধ আছএ যেমত

তেন মত প্রাণি আছে শরীরে গোপত।

১০. দম বা শ্বাস বায়ুই ঈশ্বর : ঈশ্বর পুরান জান সেই এক দম
সে দমেতু হইয়াছে এ দুই আলম
[শেখ মনসুর]

১১. সৃষ্টিতত্ত্ব, ঘর্ম : নুরের সকল অঙ্গে ঘর্ম নিকলিল
সে ঘর্মে উপজিল যত কুদরুতি।
[মীর মুহম্মদ সূফী]

১২. প্রেম ও ঘর্ম তত্ত্ব : নৈরাকার মগ্ন হৈল প্রেম রস ভাবে
নুর মুহম্মদ' পরে দর্শিলা গৌরবে।
প্রেমরস তেজ হৈতে দোহান ঘর্মিল।
সেই ঘর্ম-নীর হৈতে সংসার সৃজিল।

এবং আল্লাহর অবয়বে মানুষ সৃষ্ট। নিরঞ্জন
জানিলা দর্পণে ছায়া আপনা সুরত
নুর মুহম্মদ কারা সেরূপ সৃজিলা। [আলিরজা]

দেশজ সুফীতত্ত্ব ও চর্যাপদ্ধতির বিস্তৃত আলোচনা ও মূলগ্রন্থ রয়েছে আমার 'বাঙলার সূফী সাহিত্য' গ্রন্থে।

এভাবে আঠারো শতক অবধি বাঙলার তথ্য ভারতের দেশজ মুসলিমরা দৈশিক আচার-সংস্কারকে তাদের হিন্দু-বৌদ্ধ পিতৃপুরুষের রিকথ হিসেবে গ্রহণ করে সুস্থ জীবন যাপন করত। উনিশ-বিশ শতকে ওয়াহাবী-ফরায়েজী আন্দোলনের লক্ষ্যই ছিল মুসলিমদের দৈশিক সত্তা ও চেতনা ঘুচিয়ে তাদেরকে দেশকালহীন শরীয়তপন্থী আদর্শনিষ্ঠ ও নির্বিশেষ বৈশ্বিক মুসলিম বানানো। রাজনীতিক স্বার্থে এ শতকের ইংরেজী শিক্ষিতরাও এ পন্থা অবলম্বন করে। যন্ত্রের ও যুক্তির যুগের ও জগতের প্রসারে বিশ্বাসের যুগ ও জগৎ ক্ষীয়মাণ হওয়ায় দেশজ মুসলিমদের বাঙালীত্ব লোপ করার প্রয়াস পুরো সফল হয়নি। তবে যেহেতু যুক্তির ও যন্ত্রের যুগ ও জগৎ বর্ধমান, সেহেতু মানুষের জীবন-চেতনার ও জগৎ-ভাবনার দ্রুত পরিবর্তন ঘটছে, সে-সঙ্গে অবশ্যম্ভাবী রূপে ঘটছে, মত-পথের ও জীবনাচারের বিবর্তন। ফলে সমাজ পরিবর্তিত হচ্ছেই—হবেই এবং সে-পরিবর্তন আর কখনো শাস্ত্রানুগ কিংবা অতীতাশ্রয়ী হবেই না।

৯.

গৌড়ীয় নববৈষ্ণব মতের প্রভাবে রক্তখেকো অসুর-দলনী ভয়ঙ্করীদেবী চণ্ডী-কালী ভক্তবৎসলা জগজ্জননী রূপে ভক্তিবাদের অবলম্বন হয়ে ওঠেন আঠারো শতকের দিকে। তখন তিনি অন্নদা এবং স্নেহময়ী জগন্মাতা। সংহারের নন—কেবল পালন-পোষণের দেবতা। তখন বলি-পূজা নয়—ভক্তিই তাঁর প্রাপ্য ও কাম্য। তখনকার গান হচ্ছে :

মজল আমার মন-ভ্রমরা কালীপদ নীলকমলে। [কমলাকান্ত]

এখানেও সেই অদ্বৈতবোধ জেগেছে :

কালী হবি মা রাসবিহারী নটবর বেশে বৃন্দাবনে।
মহাকাল কানু, শ্যামাশ্যামতনু, একই সকল বুঝিতে নারে। [রামপ্রসাদ]
তুমি নারায়ণ হরি/তুমি হর ব্রহ্মা গৌরী/ দেবের দেবতা তুয়া মূল। [আলিরজা]

তন্ত্রেও আছে : কলৌ কালী কলৌ কৃষ্ণ কলৌ গোপাল কালিকা।

কালী কেবল মেয়ে নয়

সে যে মেয়েরই বরণ করিয়া ধারণ
কখন কখন পুরুষ হয়। [কমলাকান্ত]

উনিশ শতকের রামকৃষ্ণ পরমহংসে এ ভক্তিতত্ত্বের ও কালীর জগৎ-কারণ জগজ্জননী তত্ত্বের পূর্ণবিকাশ ঘটেছে। এরপরে উনিশ শতকে প্রতীচ্য জ্ঞান-বিজ্ঞান-মননের সঙ্গে পরিচয়ের ফলে কোলকাতার শিক্ষিত বাঙালীরা মুক্তচিন্তার স্বাদ পেতে থাকেন, কেউ কেউ খ্রীস্টান হতে থাকেন। রামমোহনের বিমূর্ত নিরাকার ব্রহ্মবাদ প্রচারের ফলে খ্রীস্ট ধর্মের প্রসার রুদ্ধ হয় বটে, তবু কেউ কেউ নাস্তিক, কেউ কেউ সংশয়বাদী, কেউ কেউ উপযোগীবাদী, হিতবাদী কিংবা প্রত্যক্ষবাদী হয়ে পড়েন প্রতীচ্য দর্শনের প্রভাবে। এসব হচ্ছে নতুন যুগের নতুন বৃত্তান্ত।

তথ্যনির্দেশ

১. Ancient Symbol Worship, H. M. Westrop p. 23-29.

২. লোকয়তদর্শন, দেবীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়, পৃ. ৩৫৭-৭৯, ১ম নং এবং মার্কণ্ডেয়পুরাণ ৭২:৪৩-৪৪ শ্লোক।

৩. লোকায়তদর্শন, পৃ. ১০১, ১১৩-১৪, ১১৭-৩৪, ১ম সং।

৪. লোকায়তদর্শন অনুবাদ।

৫. Golden Bought, James Frazer পৃ. ১৩৮।

৬. ক. History of Indian Philosophy, pp. 81, 45-52m, 1st edition, Belvel-Kar & Ranade.

খ. Philosophy of the Upanisads & Ancient Indian Metaphysics.
—A.E. Gough, p.8.

গ. রচনাবলী ২য় খণ্ড, পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায়, পৃ. ২৭৪-৭৩।

ঘ. The Obsucure Religious Cults as background for Bengali Literature Dr.S. B. Dasgupta, Ist edition, p. 527.

৭. শাক্তসাহিত্য, শশিভূষণ দাসগুপ্ত, পৃ. ১২-১৩।

৮. Ibid, p. 27.

৯. বিষ্ণু পুরাণ এবং ছান্দোগ্য ও মৈত্রেয়ী উপনিষদ।

১০. History of Indian Philosphy — Dr. S.N. Dasgupta, Vol III, p. 527.

১১. স বা ইয়মাত্মাব্রহ্ম-বৃহদারণ্যক ৪/৪/৫ এবং ৩/৭/১৫,
—ছান্দোগ্য ৬/৮/৭।

১২. 'নাস্তিক' শব্দে গোড়ায় 'বেদ'কে যারা অপৌরুষেয় বলে মানত না [জৈন-বৌদ্ধ প্রভৃতি] তারাই নাস্তিক বা নির্গ্রন্থ বলে নিন্দিত হত। পরে যোগরূঢ় হয়ে নাস্তিক অর্থে ঈশ্বরে অবিশ্বাসী বোঝায়।

১৩. ছান্দোগ্য : ৮/৮/৪।

১৪. চৌরাশীসিদ্ধাতত্ত্ব : বাঙালী ও বাঙলাসাহিত্য, পৃ. ২৩৮-৪৪।

১৫. চর্যাগীতিপদাবলী, সুকুমার সেন পৃ. ৪৭, ৪৫, ৪৩, ৪২।

১৬. ক. বাংলা সাহিত্যের কথা (১ম খণ্ড) মুহম্মদ শহীদুল্লাহ পৃ. ১৭, ২২, ২৮।
খ. বাঙালী ও বাঙলা সাহিত্য (২য় খণ্ড), পৃ. ৬৫-৬৯।

১৭. ক. Influence of Islam on Indian Culture : Tarachand/ খ. বঙলার জাগৃতি-বিনয়ঘোষ গ. ভারতদর্শনসার-উমেশচন্দ্র ভট্টাচার্য/ঘ. সুরজিৎ সেনকে লিখিত সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়ের পত্র-পরিচয়, আগস্ট-সেপ্টেম্বর ১৯৭৭ সন/ঙ. বা/সা/ই-সুকুমার সেন।

বাঙলা সাহিত্যে প্রগতিশীল চিন্তা-চেতনার ধারা

১.

গোড়াতেই প্রগতির প্রগতিশীলতার সংজ্ঞা দেয়া প্রয়োজন। কেননা 'প্রগতি' মাত্রই এগিয়ে চলা নয়, প্রগতিশীলতাও তেমনি অগ্রসর চিন্তা-চেতনা-কর্ম-আচরণ নয়। যদিও আমরা একক অভিধায় ও একক ব্যঞ্জনায় এ শব্দ দুটো উচ্চারণে অভ্যস্ত। সুস্পষ্ট বাক্‌বদ্ধ সংজ্ঞা দেয়া সহজ ও সম্ভব নয় বলে আমরা দৃষ্টান্তের আশ্রয় নিচ্ছি, ব্যাখ্যায় পার্থক্য বিশ্লেষণের প্রয়াস পাচ্ছি। উনিশ শতকের ওয়াহাবী-ফরায়েজী কিংবা রাধাকান্ত-রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ বা আর্যসমাজী উচ্চারিত মতবাদে অবশ্যই ছিল প্রগতিশীল চিন্তা-চেতনা। কিন্তু এগুলো ছিল শাস্ত্রের খুঁটি ও ডিগ্‌দড়ি অঙ্গীকার করেই অবচেতন আবর্তনের সাধ মেটানো ও আনন্দপ্রাপ্তি মাত্র।

আসলে তাঁরা ছিলেন সংস্কারক বা রিফমারস্। সংস্কারকদের পুরানো প্রীতি এতো প্রবল যে তাঁরা কিছুতেই তা ছাড়তে চান না। অথচ নতুনের জৌলুস, যৌক্তিকতা ও শ্রেয়স্করতাও অস্বীকার করতে পারছেন না, এমনি অবস্থায় দু'কূল বজায় রাখার অপচেষ্টায় নামেন সংস্কারকরা। পুরোনো বিশ্বাস-সংস্কার মেরামতে টিকিয়ে রাখার এ আন্তরিক প্রয়াস পরিণামে ব্যর্থ হলেও ঢক-ডৌলের সামান্য সংস্কার তাদের আশৈশবের শাস্ত্র-বুদ্ধি শাস্ত্রের কালোপযোগী রূপে-রঙে তুষ্ট ও তৃপ্ত থাকে। বিনাশ-বিলুপ্তি এড়ানো গেল বলে স্বশাস্ত্রের কালজয়িতায় আস্থাও বাড়ে। ফলে তাঁরা আবর্তনকে বিবর্তন, সচলতাকে প্রাণশক্তি এবং মেরামতের উপকরণ ও ঢক-ডৌলকে তথা সমন্বয়কে প্রগতিশীলতা বলেই মানেন, কিন্তু লেপনে চুনকামে ঘর যেমন পরিচ্ছন্ন হয়, নতুন হয় না, তেমনি এ ধরনের প্রগতিচেতনা যে পরিণামে বৈনাশিক জড়তার ও জীর্ণতার শিকার হয়, ইতিহাসের সাক্ষ্যে তা প্রমাণ করা যায়। এমনি প্রগতিশীল প্রতিবদীরাই হয় অতীতাশ্রয়ী, ঐতিহ্যপ্রিয়, মেরামতকামী সংস্কারক। তারা কখনো বিশ্বাস-সংস্কারের, শাস্ত্র-সমাজের, আচার-আচরণের পুরানো দুর্গ-ধ্বংস করে নতুন ইমারত তৈরীর কথা ভাবে না, তাই বলে না। ব্যক্তিক, পারিবারিক, নৈতিক, সামাজিক, শাস্ত্রিক এমনকি রাষ্ট্রিক জীবনেও যখন কোন সাময়িক দুর্যোগ দেখা দেয়, তখন সেই আসন্ন আপন্ন বিপদ এড়ানোর জন্যে ওই আপাত মুক্তবুদ্ধি যুক্তিবাদী প্রগতিশীল কিন্তু ছদ্মবেশী মেরামতকারী সংস্কারক মানুষকে নির্ভেজাল-বিশুদ্ধ শাস্ত্রশ্রয়ী হয়ে বিপদমুক্ত হওয়ার উপদেশ দেয়। তদের চোখে শাস্ত্রই ঐহিক-পারত্রিক জীবনের সর্বপ্রকার বিপদমুক্তির ও জন্ম-জীবন-মৃত্যু সম্বন্ধীয় নিরাপত্তার অভয় শরণ। এর একটা বাস্তব ও প্রত্যক্ষ উদাহরণ হচ্ছে মুসলিম শাস্ত্রবেত্তারা ও সমাজনেতারা।

ইসলামের উন্মেষকালে দেশ-কাল-পরিবেশগত কারণে আত্মরক্ষার, আত্মপ্রসারের ও আত্মপ্রতিষ্ঠার প্রয়োজনে নবদীক্ষিত মুসলিমদের ঈমানের জোর, বাহুবল ও রসুলের প্রতি আনুগত্য, সর্বোপরি জীবনের সার্বক্ষণিক নিয়ন্তারূপে আল্লাহ্‌র সর্বদা উপস্থিতিতে আস্থা প্রভৃতির রসুল-নেতৃত্বে সফল সুপ্রয়োগ, একাধারে ও যুগপৎ যুদ্ধে জয়, ইসলামে দীক্ষিতের সংখ্যা বৃদ্ধি,

রাজ্যের প্রতিষ্ঠা ও বিস্তার এবং সম্পদপ্রাপ্তি ঘটিয়েছিল। এর মধ্যে যে কারণ-কার্য সম্বন্ধ ছিল না—নিতান্তই প্রায়োজনিক ও আকস্মিক যোগাযোগে অপ্রত্যাশিত ভাবেই ঐহিক-পারত্রিক জীবন চেতনার সামমাত্রিক ও অভিন্নমাত্রিক মিলন-মিশ্রণ ঘটেছিল কিছুকালের জন্যে এবং কেবল আরবদের জীবনেই, তার সঙ্গে ঈমানের বা ইসলামের যে কোন কারণ-কার্য সম্পর্ক নেই, তা তখন থেকেই মুসলিমরা আলেকজাণ্ডার, সাইরাস, চেঙ্গিস, হালাকু-কুবলাই-এটিলা-তৈমুর, নেপোলিয়ন, হিটলার প্রভৃতির বিজয় ও প্রতিষ্ঠা দেখেও বুঝে উঠতে পারে না। মুসলিমরা মনে করে কেবল সাচ্চা ঈমানই-শাস্ত্রানুগত্য ও আচারনিষ্ঠাই নিষ্ক্রিয়-নির্বুদ্ধি-নির্জ্ঞান মুসলিমের জীবনের, জীবিকার, সমাজের, রাষ্ট্রের সর্ব প্রকার চাহিদা মেটাতে পারে, পারে ইহলোকে-পরলোকে প্রসারিত জীবন-জীবিকায় নিরাপত্তার, স্বাচ্ছন্দ্য-সাচ্ছল্য-সুখের আশ্বাস ও নিশ্চয়তা দিতে। আরব বহির্ভূত ও আরব-বিজিত দেশে দীক্ষিত মুসলিমরা যে দিগিজয়ীও হয়নি, সম্পদশালীও হয়নি বরং দৈশিক ও গৌত্রিক জাতিসত্তা পরাজয়ের ও পরাধীনতার গ্লানিই ভোগ করেছে, তা আজ অবধি তাদের বোঝানো যায়নি। তুর্কী-মুঘলরা যে পরাক্রান্ত ও পরশাসক হয়েছিল তা মুসলিম বলে নয়, মধ্য এশিয়ার চির পরাক্রম, চির বিজয়ী, শক হুন কৃষাণের গোত্রভুক্ত ও অনুর্বর অঞ্চলের অধিবাসী ছিল বলেই।

মুসলিমরা এসব যুক্তি ও ইতিহাসের সাক্ষ্য গ্রাহ্য করে না বলেই স্বধর্মে নিষ্ঠাকে উন্নতির ও অবনতি-অবক্ষয় রোধের উপায় বলে মানে। দেশ-কাল-প্রতিবেশ-প্রয়োজন চেতনাবিরহী বলেই মুসলিমরা আজো সাচ্চা ঈমান প্রত্যাশী ও মুনাযাতে প্রাপ্তিকামী এবং আল্লাহর কৃপা-করুণা-দান-দাক্ষিণ্য প্রার্থী। এ পথে কারুর উন্নতি হতে পারে না বলেই গোটা দুনিয়ায় মুসলিমরা আজো প্রায় সর্বক্ষেত্রে অনুন্নত।

মার্টিন লুথার [১৪৮৩-১৫৪৬] থেকে আমাদের রাজা রামমোহন [১৭৭৪-১৮৩৩] অবধি সবাই নতুনে-পুরাতনে সমন্বয় সন্ধানী ছিলেন। ফলে তাঁদের চোখ-ধাঁধানো মোহ-জাগানো প্রগতিশীল প্রাগ্রসর চিন্তা-চেতনা, মত-পথ পরিণামে রক্ষণশীলতার মরুবালিতে পথ হারিয়েছে। এক বন্ধন ছিঁড়ে অন্য বন্ধনে অজ্ঞাতেই দিয়েছে ধরা। তবু মার্টিন লুথার কিংবা আমাদের উপমহাদেশের শঙ্কর কবীর দাদু নানক চৈতন্য পুরোনো বর্জনে নতুন বরণে কিছু কিছু সাহসিক সংযোজনের, কিছু নির্ভীক বর্জনের স্বাক্ষর রেখেছেন। কিন্তু যেহেতু কোন পুরাতনই নতুন দিনে নতুন প্রজন্মের মানুষের জীবনযাত্রায় ব্যবহারিক কিংবা মানসিক জীবনের প্রয়োজনানুগ পুঁজি পাথেয় হতে পারে না, যেহেতু পুরোনো বস্তুতে ও পিতৃধনে ক্ষয় আছে বৃদ্ধি নেই, ম্লানিমা আছে জৌলুস নেই, সে জন্যে নতুন যুগের নতুন প্রজন্মের নতুন মানুষের চলার পথের বাঁকে বাঁকে যে নতুন সমস্যা ও নতুন চাহিদা দেখা দেয়, তার সমাধান ও যোগান কেবল তার পক্ষেই সম্ভব। কেননা আন্তরিক প্রয়োজন-চেতনাই উদ্ভাবন ঘটায়। অতএব শঙ্কর-লুথার-রামমোহনরা প্রাতিবেশিক কারণে বাহ্যত নতুনে পুরাতনে সমন্বয়কারী হলেও, নিজেরা অবিশ্বাসী, সংশয় আক্রান্ত কিংবা দ্বিধাগ্রস্ত ছিলেন বলে জোড়াতালির মেরামতের সঙ্গে দু'চারটে দরজা-জানালা-গবাক্ষেরও ব্যবস্থা করে তাঁদের স্ব স্ব মত-পথ-কর্ম-আচরণ অনেকের কাছে আকর্ষণীয় করে তুলেছিলেন। তাঁদের সৃষ্টিশীলতার ও মৌলিকতার অংশটুকুই প্রগতিশীলার সাক্ষ্য।

অন্ধ প্রয়োজনে পথ চলে বটে, কিন্তু চলার আনন্দ উপভোগ করতে পারে না। তেমনি আস্তিক মানুষের প্রগতি ও প্রগতিশীলতা, পরিচ্ছন্ন ও প্রাগ্রসর চিন্তা-চেতনা খুঁটিবদ্ধ বিশ্বাসের সীমিত আয়তনে স্বাধীন বিচরণে মুক্তির ও যুক্তির মিথ্যা প্রসাদ উপভোগ করে তুষ্ট ও তৃপ্ত থাকে। এ হচ্ছে লাঠিমের আবর্তিত গতির আনন্দ—সম্মুখ গতিজাত অর্জন বা উত্তরণ নয়।

২.

প্রগতির ও প্রগতিশীল চিন্তা-চেতনার উৎস ও ভিত্তিই হচ্ছে চালু বিশ্বাসে-সংস্কারে, শাস্ত্রে-সমাজনীতিতে, আচার-আচরণ রীতিতে, রাষ্ট্র-ব্যবস্থায়, জীবনাচারের নিয়ম-নীতিতে অতৃপ্তি অসন্তোষ অনাস্থা সংশয়-সন্দেহ এবং নতুন আকাঙ্ক্ষা না জাগলে, এসবের স্বাকালিক উপযোগ সম্বন্ধে প্রশ্ন না জাগলে, এগুলোর থেকে উন্নততর ও উৎকৃষ্টতর কোন নিয়ম-নীতির, রীতি-পদ্ধতির পরিকল্পনা ও প্রবর্তন সম্ভাব্যতা মনের কোণে উন্মেষিত না হলে কোন মানুষের পক্ষেই নতুন তত্ত্ব, তথ্য বা কথা উচ্চারণ করা, নতুন কিছু উদ্ভাবনে ও আবিষ্কারে অনুপ্রাণিত হওয়া সম্ভব নয়।

এক কথায় চালু বিশ্বাস-সংস্কারের, নীতি-নিয়মের, রীতি-রেওয়াজের, আচার-আচরণের ঔচিত্য তথা উপযোগ সম্বন্ধে মনের মধ্যে প্রশ্ন, জগৎ ও জীবন সম্বন্ধে নতুন জিজ্ঞাসা এবং শাস্ত্রে-সমাজে-জীবনে-জীবিকায় চিন্তার, চেতনার, রুচির, নীতি-নিয়মের উৎকর্ষ সাধন, জীবনযাত্রার ও জীবিকাপদ্ধতির উন্নয়ন, ঐহিক জীবন আবিষ্কারে উদ্ভাবনে ঋদ্ধকরণ প্রভৃতির আকাঙ্ক্ষার ও প্রয়াসের নামই প্রগতিশীলতা। অতএব প্রগতি-চেতনার মূলে রয়েছে পুরোনো-দ্রোহিতা। অনাস্থা, অতৃপ্তি, জিজ্ঞাসা ও আকাঙ্ক্ষাই প্রগতির, গতিশীলতার, প্রাগ্রসর চিন্তা-চেতনার এবং যুগসৃষ্টির, যুগান্তরের, মননের উৎকর্ষের আর সংস্কৃতি সভ্যতার অগ্রগতির উৎস ও ভিত্তি। কাজেই যা কিছু পুরোনো তার প্রতি অনাস্থা ও দ্রোহজাত, নতুন জিজ্ঞাসা সঞ্জাত, নতুন চিন্তা-চেতনা সৃষ্ট, আবিষ্কার-উদ্ভাবনপ্রসূত, এবং যা কিছু ব্যবহারিক মানস জীবনে উৎকর্ষ ও বিকাশপ্রসূ তা-ই প্রগতিশীলতা। জীবনে সমাজে শাস্ত্রে ও রাষ্ট্রে মানুষের কালিক ও স্থানিক প্রয়োজনে বিঘ্ন ও সমস্যা এড়িয়ে সমাজস্বাস্থ্য রক্ষা এবং জীবিকার নিশ্চয়তা ও বিস্তার-বিকাশ সাধন লক্ষ্যে পুরোনো চিন্তা-চেতনা, নিয়ম-নীতি-পদ্ধতি প্রয়োজন মতো পরিহারে ও নতুন নিয়ম-নীতি-পদ্ধতি নির্মাণে আগ্রহী, দ্রোহী ও জিজ্ঞাসু মানুষই প্রগতিশীল। সুতরাং মননে ও জীবনাচারে তথা ভাব-চিন্তা-কর্ম আচরণে, আবিষ্কারে-উদ্ভাবনে নিত্যগতিশীলতা, নিত্য-সৃজনশীলতা ও নিত্যবিকাশমানতাই প্রগতি। আর চলমান জীবনে স্থান-কালের পরিপ্রেক্ষিতে জীবন-জীবিকার মান উন্নয়নের প্রয়োজনে শাস্ত্র-সমাজ-রাষ্ট্র নীতির ও ব্যবস্থার পরিবর্তনে এবং যন্ত্রের ও কৌশলের উৎকর্ষ সাধনে আগ্রহী থাকাই প্রগতিশীলতা। এক কথায় মেরামত প্রবণতা হচ্ছে রক্ষণশীলতা আর নতুন কিছু নির্মাণ-উদ্ভাবন প্রবণতা হচ্ছে প্রগতিশীলতা। আর জীবনাচারের বিকাশমানতাই প্রগতি। সংজ্ঞাবদ্ধ করে বললে চলে, দেশ-কালের প্রতিবেশে জীবন-জীবিকার প্রয়োজনে শ্রেয়স্কর নতুন পন্থা বা উপায় অবলম্বনে চলাই প্রগতি।

৩.

অভাববোধজাত আকাঙ্ক্ষাই মানুষের চালিকা শক্তি। অভাব বা আকাঙ্ক্ষাপূর্তি লক্ষ্যেই মানুষের ভাব-চিন্তা-কর্ম-আচরণ নিয়োজিত থাকে। একটা অভাব মিটলে, একটা আকাঙ্ক্ষা পূরণ হলে নতুন অভাববোধ, নতুন আকাঙ্ক্ষা জাগে মনে। এভাবে কাঙ্ক্ষাপূর্তি লক্ষ্যে কৃত কর্মের এবং কাঙ্ক্ষার পূর্তি-অপূর্তির সামষ্টিক ও সামগ্রিক অনুভবের রূপই জীবন। জীবনে বাঞ্ছিত লক্ষ্যের স্বপ্নদেখা এবং তার ক্রমবাস্তবায়নের প্রয়াস রাখাই জীবন।

ব্যক্তিবিশেষে এ অভাববোধ ও আকাঙ্ক্ষা যখন ব্যক্তির স্বার্থসীমার বেড়া ভেঙে বহুজনহিত ও বহুজনসুখ লক্ষ্যে বহুজনের হয়ে বহুজনের জন্যে সঞ্চারিত হয় ব্যক্তিমনে, সে-ব্যক্তিই স্বকালের স্বদেশের স্বজনের হয়ে তখন শাস্ত্র সমাজ দেশ জাত রাষ্ট্র গড়েন কিংবা ভাঙেন,

অথবা মানুষের মনোজগতে নতুন বৈজ্ঞানিক, দার্শনিক, ঐতিহাসিক, সমাজতাত্ত্বিক কিংবা সাহিত্যিক, শৈল্পিক চিন্তা-চেতনা জ্ঞান-প্রজ্ঞা, যুক্তি-বুদ্ধি সঞ্চারিত করে ভাববিপ্লব ঘটান—বাস্তব অবস্থায় ও অবস্থানে যার রূপায়ণ, অবশ্যম্ভাবী ও আবশ্যিক হয়ে ওঠে। এভাবে ব্যক্তিমনীষার প্রসূন ও ফসলই প্রকাশ-প্রচার লাভ করে লোকগ্রাহ্য হয়ে জাতীয় অবদান, গৌরব, বৈশিষ্ট্য, চারিত্র, সংস্কৃতি কিংবা আচাররূপে অভিহিতি ও প্রতিষ্ঠা পায়। এভাবে ব্যক্তির চিন্তা-চেতনা ও আবিষ্কার-উদ্ভাবন জাতির ও মানুষের হয়ে ওঠে।

সাম্প্রতিক উৎখননে প্রাপ্ত নির্দশনাদির সাক্ষ্যে জানা যাচ্ছে রাঢ়-সুহ্ম এলাকায় অর্থাৎ এখনকার প্রেসিডেন্সি ও বর্ধমান বিভাগ অঞ্চলে আজ থেকে তিন হাজার বছর আগেও জৈন-বৌদ্ধ-ব্রাহ্মণ্য শাস্ত্র-সমাজ-সংস্কৃতি ও ভাষা এ অঞ্চলে প্রভাবে ফেলার ও প্রতিষ্ঠা পাবার পূর্বেই সভ্যতা-সংস্কৃতি বিকাশ পেয়েছিল এবং আন্তর্জাতিক বাণিজ্য সম্পর্কও গড়ে উঠেছিল। অজয় তীরে পাণ্ডুরাজার ঢিবিতে, বেড়াচম্পায়, ও নারায়ণপুরে, দেগঙ্গায় চন্দ্রকেতুর গড়ে যে-সব নিদর্শন মিলেছে, তাতে বোঝা যায় সুদূর ক্রীট দ্বীপের সঙ্গেও ছিল এদের বাণিজ্য সম্পর্ক এবং বৌদ্ধ জাতক-গল্পের কোন কোন বৃত্তান্ত এ অঞ্চলেই উদ্ভূত।

প্রমাণে ও অনুমানে বোঝা যায় একালের বাঙলাভাষী অধ্যুষিত অঞ্চলের মানুষদের প্রায় সবই বেশি মাত্রায় ও বিভিন্ন গোত্রের রক্তমিশ্রণে সঙ্কর। মঙ্গোল দ্রাবিড় (ভেড্ডিড) অস্ট্রিক নিগ্রো আলপাইনীয় রক্তের মিশ্রণ ছাড়াও ইন্দ্রো-ইরানী আর্য রক্তের ছিটেফোঁটাও মিশেছে ওই মিশ্রপ্রবাহে। ফলে আদিকাল থেকেই এবং জৈন-বৌদ্ধ-ব্রাহ্মণ্য প্রভাব কালে কিংবা মধ্যযুগে এদের ট্যাবু-টোটেমসম্পৃক্ত বিশ্বাসের, ঐতিহ্যের, আচারের, জীবিকার স্বাতন্ত্র্য থাকলেও রক্ত স্বাতন্ত্র্য চিহ্নিত করা ছিল দুঃসাধ্য।

ইতিহাসের দূরাগত ধ্বনি ও কিংবদন্তী সূত্রে জানা যায় বঙ্গের বিভিন্ন অঞ্চলে বঙ্গবহির্ভূত এলাকার নন্দ মৌর্য শুঙ্গ কণ্ব বংশীয়েরা রাঢ়ে-পুণ্ড্রে রাজত্ব করেছেন। আলেকজন্ডারের সময়ে এখানেই 'গঙ্গাহৃদয়' নামের রাজ্যে প্রতাপে প্রবল হস্তীবাহিনীপতি রাজা ছিলেন। তারপরে গুপ্তরা, পালেরা, সেনেরা, তুর্কী-মুঘল-ব্রিটিশরা রাজত্ব করেছে এখানে। আওরঙ্গজেব-পূর্বকালে গোটা বাঙলাভাষী অঞ্চল কখনো একচ্ছত্র শাসনে ছিল না। এবং গত আড়াই হাজার বছর ধরে বাঙলাদেশ [বাঙালাভাষী অঞ্চল] শাসন করেছে বিদেশী-বিজাতী-বিভাষী-বিধর্মীরা।

মধ্যরাত্রের দুঃস্বপ্নেও মানুষ জাগে, জাগে ঝড়-ঝঞ্ঝা-বন্যা-খরা-কম্পন-আগুনের হামলায়ও। সাধারণভাবে ভারতবাসী বিশেষ করে বাঙালী জেগেছে বিদেশীর আঘাতে পীড়নে দলনে শোষণে এবং অবমানিতের গ্লানিবোধে। অতএব, বিরুদ্ধ পরিবেশে বাঙালী স্থানে স্থানে কালে কালে মরীয়া হয়ে মাথা চাড়া দিয়ে উঠেছে, শির উঁচু করে দাঁড়িয়েছে নিষ্ক্রিয় নিশ্চিত মৃত্যুর কবল এড়িয়ে বাঁচবার আর স্বজনকে বাঁচাবার তাগিদেই।

তা ছাড়া মানুষ তো শরীরে বাঁচে না, বাঁচে মনে। জাগ্রত অবস্থার অনুভবগুলোর সমষ্টিই তো জীবন। অতএব, যেহেতু মানুষ ছিল, মানুষের প্রজন্ম-স্রোত ছিল, সেহেতু নতুন প্রজন্মের নতুন প্রবাহের চলমান জীবনে পথের বাঁকে বাঁকে নতুন সমস্যা, নতুন সম্পদ, নতুন আনন্দ, নতুন যন্ত্রণা যেমন মিলেছে, নতুন জ্ঞান-বুদ্ধি-বিশ্বাস-কৌশলও তেমনি এসেছে আয়ত্তে। কাজেই কারুর ব্যক্তিক, সামাজিক কিংবা আর্থিক-নৈতিক-রাষ্ট্রিক বা জাতীয় জীবন এক ঋজুধারায় একহারা চলে না। আজকের বাঙলাভাষীর এলাকায়ও জীবন বিপদ-বিপর্যয় ও বৈচিত্র্যহীন ছিল না কখনো। এখানকার দুঃস্থ অনগ্রসর দুর্বল মানুষরা শত শত বছর ধরে বারবার পরাক্রান্ত বিদেশীর খপ্পরে পড়েছে, শোষিত দলিত হয়েছে প্রভুগোষ্ঠীর দাস, সেবাদাস

ও তাদের ভোগ-উপভোগের যোগানদার হিসেবে। তবু এরই মধ্যে ঐতিহাসিক নিয়মেই প্রভুগোষ্ঠীর প্রয়োজনে সহায়-সহচর রূপে অনুগৃহীত শ্রেণীও গড়ে উঠেছিল নিশ্চয়ই। কিংবদন্তীর আদিশূর কিংবা বল্লালসেন প্রমুখের জাতিনিরূপণ ও বর্ণবিন্যাস অপরিহার্য হয়ে উঠেছিল বৌদ্ধ বিলুপ্তির পরে। মেল পটি বর্ণ গোত্র নির্ধারণের কাজ জাতিমালা কাচারী মাধ্যমে লঘু-গুরুভাবে ষোল-সতেরো শতক অবধি চলেছিল—কুলজী গ্রন্থগুলোই তার সাক্ষ্য।

দেশজ একটা শাসক-সহচর অনুগৃহীত ও চাকুরে মধ্যশ্রেণী সব সময়ে থাকলেও তারা পরাধীন বলেই শাস্ত্রে সমাজে শাসনে সংস্কৃতিতে ব্যবসা-বাণিজ্যে স্বাধীনভাবে আত্মবিকাশের ও আত্মবিস্তারের সুযোগ পায়নি। তাই আমরা বাঙলাদেশে যে-সব পুরাকীর্তির কথা শুনি বা সাহিত্য-ব্যাকরণ-অলঙ্কার-স্মৃতি-দর্শন-পুরাণকথার নিদর্শন পাই, সে-সব অভিজাত উচ্চবিত্তের শাসকগোষ্ঠীরই অবদান। এ মধ্যশ্রেণীর ও শাসকগোষ্ঠীর তুলনায় দীন দুর্বল গণমানবের ও সামান্য আয়ের বৃত্তিজীবীর সংখ্যা ছিল বিপুল—এযুগের সাক্ষ্যেও বলা চলে জলচল ও অস্পৃশ্য মিলে অন্তত ছত্রিশ শ্রেণীর[১] কিংবা পেশার লোক ছিল শতকরা পঁচানব্বইজনই। এ-ই হচ্ছে আবাদ করা সমতল ভূমির সমাজের কাঠামো। আমাদের নিকট-জ্ঞাতিরা যারা সত্তার ব্যবহারিক ও মানসিক স্বাতন্ত্র্য বজায় রাখতে চেয়েছিল, তারা পরাক্রান্ত বিদেশী শাসক-গোষ্ঠীর কবলমুক্ত থাকার জন্যে উড়িষ্যার, ঝাড়খণ্ডের, ছোটনাগপুরের এবং বাঙলার চারদিককার প্রত্যন্ত জঙ্গলে আরণ্য জীবন যাপনে তৃপ্ত ও তুষ্ট ছিল। আজো সাঁওতাল কোল কুণ্ডা রাজবংশী কোচ গারো কুকি নাগা ত্রিপুরা চাকমা মারমা প্রভৃতির মধ্যে আমাদের বিভিন্ন এলাকার মানুষের ট্যাবু-টোটেম সম্পৃক্ত মানসিক ও আচরিক বিশ্বাসে সংস্কারে সাদৃশ্যের ও জ্ঞাতিত্বের নিদর্শই মেলে।[২] আধুনিক বাঙালী সমাজের আদিপর্বে মঙ্গোলীয়রা কিরাতীয় ও অস্ট্রিক ভেড্ডিডরা নিষাদীয় জীবন-জীবিকা পদ্ধতি পরিহার করে ক্রমে বর্ণে ও কর্মে বিন্যস্ত সমাজে বিভিন্ন বৃত্তিজীবীর সমন্বিত ও যৌথ সমাজ গড়ে তুলেছে। প্রত্যন্ত অঞ্চলের অনুন্নত মানুষের লিখিত শাস্ত্র, শাসন-নীতি, ভাষা প্রভৃতি গড়ে না ওঠায় এ অঞ্চলের মানুষকে উত্তর ভারতীয় জৈন-বৌদ্ধ-ব্রাহ্মণ্য ভাষা ও শাস্ত্র এবং সে-সূত্রে উত্তর ভারতীয় জীবনযাত্রার ও জীবনাচারের অনেক কিছুই গ্রহণ ও বরণ করতে হয়েছে বিদেশী শাসক-গোষ্ঠীর মাধ্যমেও অনুকরণে। চিরকাল বিদেশী-শাসিত হলেও, যেহেতু দেশের আদি বাসিন্দারের তুলনায় বিদেশাগত শাসকগোষ্ঠীর সংখ্যা ছিল নিতান্ত নগণ্য, সেহেতু এদের বিশ্বাস-সংস্কার, জীবনচর্যার নিয়ম-নীতি, জীবনাচারের রীতি-রেওয়াজ চালু রাখা সম্ভব হয়েছিল। ফলে আরোপিত বা বৃত জৈন-বৌদ্ধ-ব্রাহ্মণ্য ও ইসলামী শাস্ত্র ও শাস্ত্রাচার এখানে কোনদিনই পুরো চালু হতে পারেনি—তাৎপর্য ও লক্ষ্যভ্রষ্ট হয়ে কেবলই বিকৃত হয়েছে। এ জন্যেই বাঙালী সৃষ্ট ভূত-প্রেত, উপ-ও অপ-দেবতা, দেবতা বহু ও বিচিত্র এবং এঁরা লৌকিক ও লোকজ দৈবশক্তি হিসাবে অমূর্ত বা প্রমূর্তভাবে পূজা-শিরনী পেয়ে এসেছেন চিরকাল। এঁদের কিছু আঞ্চলিক আর কিছু সর্ববঙ্গীয় দেবতা। এঁরাই ছিলেন প্রাত্যহিক জীবনের নানা ক্ষেত্রে চাওয়া-পাওয়ার নিয়ামক-নিয়ন্ত্রক দেবতা।

এ প্রত্যন্ত ভূমের মানুষের সত্তার এ স্বাতন্ত্র্য, মন-মননের এ মৌলিকতা, জীবন-চেতনার ও জগৎ-ভাবনার এ অনন্যতাই যুগে যুগে স্থানে স্থানে বাঙালীকে বিদেশী বিজাতি বিভাষী বিধর্মী হামলার মোকাবেলায় বারবার দ্রোহী হয়ে, বেতস্ হয়ে প্রতিরোধে টিকে থাকার, আত্মবিশ্বাস নিয়ে বেপরওয়া হয়ে শির উঁচু করে সম্মুখ যুদ্ধে জয়ী হওয়ার প্রেরণা যুগিয়েছে। যতই নির্জিত ও নির্যাতিত হোক, প্রাকৃতিক নিয়মেই স্বভাব-ধর্মে প্রজন্মধারায় মৃদুমন্থর গতিতে হলেও মানুষ ক্রমবিবর্তন ও ক্রমবিকাশ লাভ করে। আমাদের দেশেও তা-ই ঘটেছিল, কিন্তু ইতিহাসবিরল এ

দেশে সাক্ষ্য মেলে না, প্রমাণও পাথুরে হয় না, প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ ক্ষীণ প্রমাণে ইতিবৃত্তের বা ইতিবৃত্তান্তের যে রূপরেখা তৈরী করা যায় ও হয়, তা কোথাও ছায়া, কোথাও বা মায়া এবং কৃচিৎ কঙ্কালসার কায়া।

৪.

ইতিহাস না থাকলেও পৃথিবীর অন্যান্য দেশের সাক্ষ্যে ও অভিজ্ঞতায় বলা চলে পরাক্রান্ত বিজয়ী বিদেশী বিজাতি বিভাষী শাসকগোষ্ঠীর সঙ্গে সংঘাত সঙ্কুল পরিচয় মুহূর্তে বিচলন-বিপর্যয় যেমন স্বাভাবিক, তেমনি শাসক-গোষ্ঠীর মন-মননের, রুচি-সংস্কৃতির, প্রাশাসনিক নিয়ম-নীতির প্রভাব শাসিত সমাজের ওপর পড়েই। তাতে জনজীবনে ও জীবনযাত্রায় রূপান্তর ঘটে, ঘটে যুগান্তরও।

এমনি প্রতিবেশে মানুষের ভাব-চিন্তা-কর্ম-আচরণে, হাতিয়ারে, প্রশাসনে, রীতি-নীতি-নিয়মে যে পরিবর্তন ঘটে, তাকে যদি বোঝার সুবিধের জন্যে মাপে মানে মাত্রায় বিপ্লব বা ভাববিপ্লব কিংবা সংস্কৃতিবিপ্লব নামে অভিহিত করি, তাহলে বিদেশী নতুন নতুন রাজশক্তির কবলিত বাঙলায় স্তরে স্তরে মানুষের মনে মননে, আচারে আচরণে, জীবনযাত্রায়, জীবিকা-পদ্ধতিতে, হাতিয়ারে নানা রূপান্তর ও যুগান্তর ঘটেছে। হাতে প্রমাণ নেই বলেই কেবল তাত্ত্বিকভাবে বলা চলে বাঙলার একাংশে পুণ্ড্র বৌদ্ধ মগধ সাম্রাজ্যের প্রসারে এবং অবসানে প্রথম বিপ্লবাত্মক পরিবর্তনের শুরু ও শেষ। দ্বিতীয় বিপ্লব ঘটে ব্রাহ্মণ্যবাদী গুপ্তদের রাজত্বে রাঢ়ে পুণ্ড্রে বঙ্গে। তৃতীয় বিপ্লবের শুরু ও শেষ ঘটে মগধে উত্থিত বৌদ্ধ পালবংশীয় রাজাদের চার'শ বছর ব্যাপী শাসনকালে। চতুর্থ বিপ্লব হচ্ছে ব্রাহ্মণ্য বিপ্লব। এটি গভীর ও ব্যাপকভাবে ঘটে দাক্ষিণাত্য থেকে আগত উগ্র ব্রাহ্মণ্যবাদী সেনরাজাদের আমলে। পঞ্চম বিপ্লব ঘটে তুর্কী আমলে ব্রাহ্মণ্য শাসকদের হুকুম-হুমকি-হামলামুক্ত গণমানবের দেব-ধর্মের প্রতিষ্ঠায় ও প্রসারে। ষষ্ঠ বিপ্লব হচ্ছে চৈতন্য-নেতৃত্বে ভাববিপ্লব। সপ্তম বিপ্লব ঘটে সাম্রাজ্যবাদী মুঘল-শোষণ কালে নির্জিত মানুষের জীবন-জীবিকার অবলম্বন লৌকিক দেবতা পীরনারায়ণ 'সত্য'-এর ও তাঁর চেলা দেবতাদের উদ্ভবে। অষ্টম বিপ্লবের সূচনা ঘটে ব্রিটিশ প্রবর্তিত শাসন-শোষণের নতুন নিয়ম-নীতির প্রতিবেশে ইংরেজী ভাষার মাধ্যমে প্রতীচ্য বিদ্যায় এ দেশের প্রথম স্বশিক্ষিত ও সুশিক্ষিত মনীষী রাজা রামমোহনের নেতৃত্বে। তারপর থেকে উনিশ-বিশ শতকে শিক্ষার ও জ্ঞানের প্রসারে যুক্তির ও যন্ত্রের উৎকর্ষে জগৎ-চেতনার ও জীবন-ভাবনার মৌলিক পরিবর্তনে মানসিক ও ব্যবহারিক জীবনে প্রায় সর্বক্ষণেই ঘটছে বিবর্তনক্রিয়া। নতুন নতুন বৈজ্ঞানিক তত্ত্বের ও তথ্যের আবিষ্কারে নতুন নতুন যন্ত্রের উদ্ভাবনে আশৈশব লালিত বিশ্বাস-সংস্কারের দুর্গে কেবল ফাটল নয়, তার কোন কোন দেয়াল অগোচরে ধসেও পড়ছে রোজই। তবে মুক্তবুদ্ধির, প্রগতির, দ্রোহের, জিজ্ঞাসার, অসাম্প্রদায়িকতার, নাস্তিক্যের প্রমূর্ত প্রতীক হচ্ছে কম্যুনিস্টরা। এরাই মানুষকে ও মানুষের ঐহিক জীবনকেই সর্বপ্রকার মুখ্য বিবেচনার বিষয় বলে জানে ও মানে। ১৯২১ সন থেকে এরা এ দেশে সক্রিয়।

পর পর বিদেশীর নব নব শাসনকালে দেশবাসী যে কেবল বুঝে না-বুঝে, ভয়ে ভরসায়, লাভে লোভে ফেরুপালের মতো কিংবা গড্ডলিকার মতো নতুন জগৎ-চেতনা ও জীবন-ভাবনা বরণ করেছিল, নতুন শাস্ত্রের নিয়মনীতি, নতুন সমাজব্যবস্থা গ্রহণ করেছিল এমন ধারণা শুধু ইতিহাসের সাক্ষ্য বিরোধীই নয়, মানুষের স্বভাব-ধর্মের-বৃত্তি-প্রবৃত্তির গতি-প্রকৃতি বিরোধীও। সেকালেও নিশ্চয়ই দেশে এমন কিছু উন্নত মননের, বুদ্ধির ও চেতনার মানুষ ছিল, যারা পুরাতন

নীতি-নিয়মে অশ্রদ্ধা ও সন্দেহ পোষণ করত, নতুন জিজ্ঞাসায় ছিল উদ্বুদ্ধ, এবং নতুন আকাঙ্ক্ষায় ছিল প্রবুদ্ধ। ফলে পুরোনো বিশ্বাস-সংস্কার ও নিয়ম-নীতি পরিহারে ছিল আগ্রহী আর ভাব-চিন্তা-কর্ম-আচরণে নতুনের প্রতিষ্ঠায় ছিল উৎসাহী। তারাই যথাসময়ে ও যথানিয়মে পিতৃধর্ম ও সমাজদ্রোহী হয়ে জৈন-বৌদ্ধ-ব্রাহ্মণ্য মত বরণ করে সমকালে প্রগতি মনস্ক হয়ে শ্রেয়ঃপথ ধরে প্রাগ্রসর চেতনার ও সুদূরবিসারী দৃষ্টির পরিচয় দিয়েছিল। সে-ইতিহাস আজ নিশ্চিহ্নে হারিয়ে গেছে বটে, কিন্তু সভ্যতা-সংস্কৃতির ক্রমবিকাশের ধারায় আস্থা থাকলে আমাদের এ অনুমান অস্বীকার করা যাবে না।

সেদিনকার ব্যক্তি ও পরিবার প্রয়োজনবোধে সমাজদ্রোহী হত, হত গোত্রদ্রোহী, সেকালেও বিশেষ স্থানের ও গোত্রের লোকেরা রাজদ্রোহী হত, মারত আর মরত। সেকালেও গোত্রে গোত্রে লড়াই চলত। সে-লড়াইয়ের হার-জিতেও হত 'কারুর পৌষমাস, কারুর সর্বনাশ।' পালসাম্রাজ্যের ভেতরেই এগারোশতকে একালের বগুড়া অঞ্চলে ঘটে নিম্নবর্ণের, নিম্নবৃত্তির ও নিম্নবিত্তের কৈবর্তদের রাজদ্রোহ। শোষণ পীড়ন নির্যাতন অসহ্য হয়েছিল নিশ্চয়ই, নইলে এমন নিঃস্বশ্রেণীর মানুষ সর্বনাশের ঝুঁকি নেয়ার সাহসই বা পেত কোথা থেকে! দ্রোহী কৈবর্ত্য নেতা দিব্য-রুদ্রক-ভীম পালদের হটিয়ে দিয়ে স্বাধীন ভাবে রাজত্ব করেছেন দুই পুরুষ ধরে।[৩] আব্রাহ্মণচণ্ডাল ছিল তাঁদের শাসনপাত্র। সেদিন ব্রাহ্মণ বৈদ্য কায়স্থ ঘৃণায় অবজ্ঞায় মুখ ফিরিয়ে থাকতে পারেনি, কৈবর্তরাজের আনুগত্য স্বীকার করে মান-বিত্ত-বেসাত অর্জন ও রক্ষা করেছে। দেশকালের রীতি ও বিশ্বাস বিরোধী এ রাজদ্রোহ কৈবর্তদের পক্ষে পাপভীতি ও সংস্কার মুক্তির সাক্ষ্য। এ দ্রোহ তাই সেকালের প্রতিবেশে প্রগতি মনস্কতা ও প্রগতিশীলতা। ভীমের জাঙালের লেশ এখনো রয়ে গেছে বগুড়ায়। এ বৃত্তান্ত তাই সত্যাশ্রিত। হোক বানানো বৃত্তান্তও, মনের মধ্যে বাঞ্ছার বা আকাঙ্ক্ষার স্বপ্ন হয়ে বা বীজ হয়ে না জাগলে চণ্ডাল নায়ক কালকেতুই বা আব্রাহ্মণবাগদীর ওপর রাজা হয়ে সবাইকে শাসনপাত্র করার উপাখ্যান গড়ে ওঠে কি করে।[৪]

রাজদ্বারে নির্যাতিত ও পরে অনুগৃহীত গোয়ালা সোম ঘোষের ও তাঁর পুত্র বিদ্রোহী বীর ইছাই ঘোষের কাহিনী কিংবা কালুডোমের, তাঁর পুত্র লখাই ডোমের রণনৈপুণ্য আর রানী কলিঙ্গার, কানড়ার ও ধমনীর রণে অংশগ্রহণ ও যুদ্ধজয় বৌদ্ধপাল আমলে কিছু কালের জন্যে বর্ণের ও বৃত্তির বাধা অতিক্রমণের, যোগ্যতাবলে স্বাধীনভাবে আত্মবিকাশের এবং সমাজ পরিবর্তনের ইঙ্গিতবাহী।[৫] এ পরিবর্তন নিশ্চিতই প্রগতির ও মুক্ত জীবনচেতনার সাক্ষ্য। এখানে নারী, ডোম, গোয়ালা, চণ্ডাল, কৈবর্ত প্রভৃতি সবাই সমাজের পূর্ণ ও স্বাধীন সদস্য। নিম্নবর্ণের ও নিম্নবৃত্তির মানুষের পক্ষেও আত্ম-প্রত্যয়, নতুন চেতনা, নতুন জিজ্ঞাসা ও আত্মপ্রতিষ্ঠার নতুন আকাঙ্ক্ষা নিয়ে জীবন-পথে অগ্রসর হতে বাধা ছিল না বৌদ্ধ পাল রজত্বের মধ্যাহ্ন কালে। প্রাচীন যুগের অনুমান-নির্ভর ইতিবৃত্তান্ত এখানেই শেষ। সেন আমল থেকেই শুরু হবে আমাদের বাঙলা ভাষা-সাহিত্য সম্পৃক্ত 'প্রগতি' বিষয়ক আলোচনা।

৫.

আগের বঙ্গবিজেতারা এসেছিল আর্যাবর্ত বিদেহ তথা অযোধ্যা-বিহার থেকে। জৈন-বৌদ্ধ-ব্রাহ্মণ্য শাস্ত্রে সংস্কৃতিতে ও আচারে আচরণে সাদৃশ্য ছিল অনেক। কাজেই এদের প্রভাব [মৌর্যদের পরে] দেশবাসীর মর্মে আঘাত হানেনি, কিংবা বিশ্বাস সংস্কারের, শাস্ত্রীয় ও নৈতিক চেতনার গোড়ায় বা শিকড়ে নাড়া দেয়নি। এবার ভারতের বাইরে থেকে যারা এল, তারা ছিল

সর্বপ্রকারে অপরিচিত নতুন মানুষ। ৭১১ খ্রীস্টাব্দে হেজাজের কাসিম-পুত্র মুহম্মদ সিন্ধু জয় করে আরব শাসন প্রতিষ্ঠা করেন, এগারো শতকের গোড়া থেকেই মাহমুদ গজনী উত্তর-পশ্চিম ভারতে সসৈন্য অভিযানে আসেন সতেরো বার, দিল্লীতে শিহাবুদ্দীন ঘোরীর প্রতিনিধি কুতুবউদ্দীন আইবেক ১১৯১ খ্রীস্টাব্দ থেকেই সম্রাট রূপে সুপ্রতিষ্ঠিত হন। আর বাঙালায় ১২০১ সনেই[৬] ইখতিয়ার উদ্দীন মুহম্মদ বখতিয়ার খালজী তুর্কী শাসন শুরু করেন। এভাবে দাক্ষিণাত্যে উত্তর ভারতে ও বাঙলায় বিভিন্ন সময়ে আরব ও মধ্য এশিয়ার শাসন চালু হয়। এ বিদেশী-বিজাতি-বিধর্মী-বিভাষীরা নিয়ে এল একটা বিশেষ একেশ্বরবাদ, একটা অপরিচিত ভাষা, একটা অজ্ঞাত সংস্কৃতি, একটা অচেন জীবনাচার, যা বিজেতা-বিজিতের, শাসক-শাসিতের পরিচয় মুহূর্তে কেবল লোকক্ষয়ী বাহ্য নয়, তরঙ্গ-ক্ষুব্ধ মানস দ্বন্দ্বও সৃষ্টি করেছিল শাসিতদের অন্তরে। বিজেতাদের ছিল তুরঙ্গ বাহন, উপাস্য নির্ভরতাজাত অসামান্য মনোবল, বাহুবল,ত উন্নততর অস্ত্রবল, সে-সঙ্গে ছিল বিশ্বের নতুনতর শাস্ত্রে আস্থাজাত স্বধর্মীর সাম্যে, ভ্রাতৃত্বে ও সংহতিতে অটল বিশ্বাস। আল্লাহ্ই জন্ম-জীবন-মৃত্যুর, জয়-পরাজয়ের, সাফল্য-ব্যর্থতার নিয়ন্তা, মানুষের জীবনে কর্মে ও আচরণে কেবল আল্লাহ্‌র ইচ্ছাই রূপায়িত হয়—এমনি এক অবিচল বিশ্বাসবশে মুসলিমরা সারা-বিশ্বে পনেরো শতক অবধি বিধর্মীর মোকাবেলায় ছিল প্রায় অপরাজেয়।

এদের একেশ্বরবাদ, মানবসাম্য, যোগ্যতায় ও কর্মে ব্যক্তির আত্মবিকাশের ও আত্মবিস্তারের অশেষ সম্ভাবনা, একেশ্বরবাদ প্রসূত ব্যক্তিসত্তার অনমনীয় স্বাতন্ত্র্য ও স্বমর্যাদাচেতনা প্রভৃতি বর্ণের ও বৃত্তির চির দৃঢ় নিগড়ে আবদ্ধ নিম্নবর্ণের, নিম্নবিত্তের ও নিম্নবৃত্তির লোকমনে জাগায় বিচলন, ক্ষোভ এবং পরিণামে দ্রোহ। তাই ব্রাহ্মণ্য সমাজ ক্রমে ক্রমে ও স্থানে স্থানে ভাঙল। দাক্ষিণাত্যে শঙ্কর, রামানুজ, মাধ্ব, নিম্বার্ক, ভাস্কর , উত্তর ভারতে কবীর, নানক, দাদূ, রামানন্দ, রামদাস এবং বাঙলার চৈতন্যদেব প্রমুখ অনেকে দিলেন নেতৃত্ব।[৭] আরব-তুর্কী বিজয়ের সঙ্গে সঙ্গেই সূচিত হল প্রাচীন যুগের অবসান ও মধ্য তথা তখনকার আধুনিক যুগের শুরু। বলাবাহুল্য মধ্যযুগের শুরু ও শেষ বিশেষ বিশেষ দেশ-কালগত। অতএব, দাক্ষিণাত্যে মধ্যযুগের আরম্ভ আট শতকের প্রথম পাদ থেকেই।

উত্তরভারতে মাহমুদ গজনীর অভিযানকাল থেকেই অর্থাৎ এগারো শতকের উষাকাল থেকেই হয় শুরু আর বাঙলায় শুরু হয় লক্ষ্মণ সেনের রাজত্বকাল বারোশতকের অবসানকালের গৌড়ের দেওতলায় (মালদহ) দরবেশ জালালউদ্দিন তাবরেজীর (১২০০-১২) উপস্থিতিতে এবং নিশ্চিতভাবে বখতিয়ার খালজীর বিজয় মুহূর্ত থেকেই।

একালে কোন দেশে সমাজে মননে চিন্তনে হাতিয়ারে সহজেই ঘটে যুগান্তর। কিন্তু এ যন্ত্রযুগের আগে পৃথিবী এমন সবার মতো ছোট ছিল না, দূরের সবটাই সবকিছুই ছিল অজ্ঞাত। সে-জন্যে ভিন্নদেশের ভিন্নজাতির সঙ্গে মনের ও মতের, আচারের ও আচরণের ঘনিষ্ঠ পরিচয় হত বাণিজ্যেও নয়, প্রবলের বিজয়ের, শাসনপ্রতিষ্ঠার এবং ভাষা প্রয়োগের ফলে। আমাদের দেশে যেমন ব্রিটিশ বিজয়ের ফলে য়ূরোপীয় ভাষার জ্ঞান-বিজ্ঞান সাহিত্য দর্শন ইতিহাস কৃৎকৌশল ও যন্ত্র মাধ্যমে আধুনিক যুগ সূচিত হয়েছে, তেমনি এদেশে আরব-ইরানী-তুর্কী-আফগানদের সঙ্গে বিজেতা ও শাসক হিসাবে পরিচয়ের ফলেই ঘটেছিল প্রাচীন যুগের অবসান এবং উন্নততর যুগের সূচনা, একালের দৃষ্টিতে আমরা সেই নবযুগকে অবশ্য মধ্যযুগ বলেই চিহ্নিত করে থাকি।

বাসন্তী হাওয়া বইতে শুরু করলে যেমন প্রকৃতির জগতে জীবনের নবজাগরণ ঘটে, জড়তা ও জীর্ণতা ঘোচে, নবযুগের সূচনায়ও তেমনি শাস্ত্রে-সমাজে, মনে-মননে, জীবনাচারে, জীবিকাপদ্ধতিতে, পোশাকে-প্রশাসনে, অস্ত্রে-যন্ত্রে, নতুনের জৌলুস ও উৎকর্ষের লাবণ্য ছড়িয়ে পড়ে। যুগান্তরে শহুরে শিক্ষিত সমাজে চিন্তায় কর্মে আচরণে নতুন জীবনদৃষ্টির ও নতুন জগৎ-চেতনার আভা ও প্রভা ফুটে ওঠে। মানব সাম্যে আস্থাবান ইরানী-তুর্কীর ধর্ম-মনন-জীবনাচারের ও সংস্কৃতির প্রভাবে যে-নতুন জীবনযাত্রাপদ্ধতির উৎকর্ষ ও চিন্তা-চেতনার লাবণ্য এদেশে প্রকাশ পেল, তাও উত্তরকালের ইংরেজের ও ইংরেজীর প্রভাবের মতোই ছিল ব্যাপক ও গভীর। শাসকগোষ্ঠীর মানুষদের সামাজিক ও সামগ্রিক প্রভাবে এদেশের মানুষের মনোজগতে যে ভাববিপ্লব ঘটল, তার প্রসূন হচ্ছে জ্ঞান বা মায়াবাদ, ভক্তিধর্ম, সন্তধর্ম ও বাঙলার গৌড়ীয় প্রেমধর্ম।[৮] এ প্রভাবে উচ্চমানের বিজ্ঞানবুদ্ধি ছিল না বটে, কিন্তু উচ্চামার্গের তাত্ত্বিকচেতনা ও রস-রুচিবোধ ছিল, ছিল নতুন জ্ঞানের আলো আর মানসিকতার ও সংবেদনশীলতার স্নিগ্ধতা। শাসকগোষ্ঠীর প্রভাব সেদিন নিম্নবৃত্তিজীবী নিম্নবর্ণের মানুষের মনে আর্থ-সামাজিক পীড়ন-মুক্তির আকাঙ্ক্ষা ও দ্রোহের সাহস যুগিয়েছিল, ব্রাহ্মণ্যমত পরিহারে মুক্তি-সন্ধানে উৎসাহ দিয়েছিল, শাস্ত্রনীতিতে সমাজতত্ত্বে ফাঁকির ফাঁক গণমানবের চোখে প্রকট হয়ে ধরা পড়েছিল। শাস্ত্রসম্মত জন্ম কিংবা বর্ণসূত্রে নয়, সামর্থ্য ও আত্মপ্রত্যয় অনুসারেই জীবনের ও জীবিকার সম্ভাবনার সীমা হয় নির্ধারিত ও নিয়ন্ত্রিত—এ তত্ত্বও সমাজ দেখে নয় শুধু, শাসকগোষ্ঠী দেখেও হল উপলব্ধিগত। দেখল, আজ যে দাস বাজারে ক্রীত, কাল সে রাজজামাতা এবং কিছু কাল পরে যোগ্যতা বলে তার বাদশাহ হতেও বাধা নেই।[৯] এ প্রভাব ভারতের যে-কোন উদ্যমশীল বুদ্ধিমান ও আত্মপ্রত্যয়ী মানুষের মনে জীবনের ও জীবিকার উন্নয়ন সম্ভাবনার আশ্বাস ও আকাঙ্ক্ষা জাগাল। সেদিন এভাবে সুপ্রাচীন অচলায়তন অটল অবিচল সমাজে শাস্ত্রের ও সমাজের নিয়মনীতিতে প্রতি গণমানবের মনে যে সন্দেহ সংশয় ক্ষোভ ও দ্রোহ জাগল, যে-চেতনা নতুন জীবন-জিজ্ঞাসা ও জীবিকাভাবনা উদ্দীপ্ত করল, যে কাঙ্ক্ষা ও প্রত্যাশা উদ্যম যোগাল, যে-আত্মপ্রত্যয় কর্মে ও আত্মবিস্তারে প্রবর্তনা দিল, তা ক্রমে ধর্মান্তরে, কর্মান্তরে, চিন্তা-চেতনার রূপান্তরে এবং সাহিত্যে শিল্পে ভাস্কর্যে ও রস-রুচির স্থাপত্যে সঙ্গীতে শস্ত্রে সমরে পোশাকে প্রশাসনে সাংস্কৃতিক আচারে-আচরণে ও রস-রুচির চর্চায় অভিব্যক্তি পেতে থাকে, পলাশীযুদ্ধোত্তর আর এক নতুন যুগ সূচিত হওয়ার মুহূর্ত অবধি।

৬

অবক্ষয় শুরু হলেই মনে মানসে রসে রুচিতে কর্মে আচরণে বিকৃতি আসে কিংবা বিকৃতি সূচিত হলেই অবক্ষয় দ্রুততর হয়; তা ঠিক বোঝা যায় না বটে, প্রাণ-মনের তারুণ্য তরল ও কচি হরিৎ রঙ গাঢ় হলেই জোয়ার যায় থেমে, ভাটার ক্ষয় শুরু হয় তখন থেকেই। বিদ্বানদের মতে গোটা ভারতে বৌদ্ধ বিকৃতি ও বৌদ্ধবিলুপ্তি ত্বরান্বিত হয়েছিল বৌদ্ধরা তন্ত্রাশ্রিত হয়েছিল বলেই।[১] বাঙলাদেশে পালদের পতন যুগ—নয়-দশ-এগারো শতক থেকে মহাযানী বৌদ্ধ উপশাখা মন্ত্র-বজ্র-সহজযানী শ্রমণ সমাজে আমরা তা প্রত্যক্ষ করেছি। 'চর্যাগীতি' রতি নিরোধকামী সহজিয়াদেরই রতি সাধননীতি। চর্যাগীতি বাঙলা নয়, বাঙলার পূর্বরূপ তথা পূর্বাঞ্চলে শৌরসেনী প্রভাবিত অর্বাচীন অবহট্‌ঠ। এ গীতিগুলো দেখেই বোঝা যায় গৌতমবুদ্ধ প্রচারিত তত্ত্বের ছিটেফোঁটাও অবশিষ্ট ছিল না এ বামাচারী তান্ত্রিক-কাপালিক চর্যায় ও সাধনায়। তবু বৌদ্ধ মতের ও সম্প্রদায়ের এ বিকৃতির সাক্ষ্য দেয় যে কায়া-সাধক মোক্ষ বা

নির্বাণ কামীরা বিপথগামী হলেও বিধিবদ্ধ ও লিপিবদ্ধ শাস্ত্রও সাধনপন্থা দ্রোহী হবার মতো সাহস ও শক্তি সঞ্চয় করেছিল। তারাও হয়তো সেদিন পুরোনো তত্ত্ব ও পদ্ধতি পরিহার করেছিল। তারাও হয়তো সেদিন পুরোনো তত্ত্ব ও পদ্ধতি পরিহার করেছিল দেশকালগত জীবনে প্রগতি অঙ্গীকার করেই। তার প্রমাণ মেলে সরহের দোঁহায়,

কিন্তহ দীবেঁ কিন্তহ্ নিবেজ্জে
কিন্তহ্ কিজ্জই মন্তহ সেব্বঁ।
কিন্তহ্ তিত্থ তপোবনে জাই
মোকখ কি লবভই পাণী হ্নাই।

—কি হবে তোর দীপে, কি হবে নৈবেদ্যে, মন্ত্রের সেবাতেই বা তোর কি কাজ হবে, কি হবে তোর তীর্থ তপোবনে যেয়ে, স্নানেই কি মোক্ষ লাভ হয়? অন্যত্র 'দেহ সরিসঅ তিত্থ মই সুহঅ ণ দীটঠও' [সরহ] —দেহ সদৃশ তীর্থ কোথাও দেখিনি। এর প্রতিধ্বনি শুনি একালের বাউল মতে ও গানে :

সখি গো, জন্ম মৃত্যু যাঁহার নাই
তাঁহার সনে প্রেম গো চাই।
উপাসনা নাই গো তাঁর
দেহের সাধন সর্বসার
তীর্থব্রত যার জন্য
এদেহে তার সব মিলে।

লালনও বলেন :
দেহরতি খুঁজলে পাবি
সকল তীর্থের ফল তাহে।

সরহ বলেন : ঘরে আচ্ছে, ঘরে আচ্ছই
বাইরে কুই পুচ্ছই।

—ঘরে আছে, ঘরেই আছে, বাইরে কেন জিজ্ঞসা করছ?
লালনেও মেলে এ তত্ত্ব :

আপন ঘর খুঁজলে রতন পায় অনায়াসে।

তিলপাও স্পষ্ট ভাষায় বলেন :

দেব ন পূজহ তিত্থ ন জাবা
দেব পূজাহি ন মোখক পাবা।

—দেব পূজা করো না, তীর্থে যেয়ো না, (কারণ) দেব পূজায় মোক্ষ বা মুক্তি পাবে না।
কাহ্নপাও বলেছেন : এক্কুণ কিজ্জই ণ মন্ত ণ তন্ত

—মন্ত্রতন্ত্র কোন কাজই করে না।
সরহ সবাইকে সর্তক করেও দিয়েছেন :

ঝাণে মোক্খ কি চাহুরে আলোঁ
মা আজালকিঁ লেহুরে কোলে।[১০]

—ধ্যানে মোক্ষ সন্ধান করছ! কেন মায়াজালে (নিজেকে) জড়াচ্ছ? এসব আক্রমণের ও বিদ্রূপের লক্ষ্য বৌদ্ধ-ব্রাহ্মণ্য আচারিক ধর্ম। এসব কথায় পিতৃপুরুষের শাস্ত্র দর্শন সমাজনীতি প্রভৃতির প্রতি অনাস্থা ও দ্রোহ প্রকাশ পেয়েছে।

মনে সন্দেহ, অবিশ্বাস, ও 'জিজ্ঞসা' না জাগলে এবং বুকে সাহস ও আত্মবিশ্বাস আর মাথায় যুক্তি-বুদ্ধি না থাকলে এ দ্রোহ এবং ঐতিহ্য ও বিশ্বাস পরিহার সম্ভব হত না কিছুতেই। পিতৃপুরুষের শাস্ত্র, সমাজ ও জীবনদর্শন পরিহারের মূলে মনে হয় দারিদ্র্যক্লিষ্ট বঞ্চিত জীবনের যন্ত্রণা-মুক্তির অবচেতন প্রেরণা রয়েছে, সেই যন্ত্রণা-মুক্তি লক্ষ্যেই হয়তো অজ্ঞ অসহায়

দিশেহারা মানুষ অলৌকিক অধ্যাত্মতত্ত্বে স্বস্তির ও মুক্তির, প্রবোধের ও প্রশান্তির পন্থা খুঁজছে। পার্থিব জীবনে বঞ্চনার ও পরাজয়ের গ্লানি, ক্ষোভ ও বেদনা ভুলে থাকার জন্যেই তারা কায়াসাধনে স্বস্থ হতে চেয়েছে। এ-ই পরিণামে দুঃখদীর্ণ ও দ্বন্দ্বভীরু পলাতক মনের অভয় আশ্রয় হয়েছে বটে, তবে এ-ও যে জীবনের প্রয়োজনে তাদের দ্রোহজত এবং শ্রেয়স্কর বলে বিবেচিত স্ব-আবিষ্কৃত ও স্ব-নির্বাচিত পন্থা, তা অস্বীকার করা যাবে না। বাঙলার বৈষ্ণব সহজিয়ায় ও গুরুবাদী বিভিন্ন বাউল সম্প্রদায়ে এ তাত্ত্বিক ধারা ও রজঃবীর্য নিয়ন্ত্রণ লক্ষ্যে কায়াসাধন আজো অবিরল।[১১]

বৌদ্ধ বিলুপ্তির সময়ে (দশ এগারো শতকে) এবং পরেও ব্রাহ্মণ্য সমাজভুক্ত তান্ত্রিকরা পূর্ব ঐতিহ্য ও সাধনা সোৎসাহে চালু রেখেছিল, আজো রেখেছে, বিভিন্ন পদ্ধতির বা আচারের (বীরাচার, চীনাচার, বীভৎসাচার প্রভৃতি) তান্ত্রিক মত ও চর্যা চালু রয়েছে। এ অবক্ষয় যুগে বামাচারী পন্থার প্রভাবে জনসমাজে শৃঙ্গাররসের আস্বাদন স্পৃহা বেড়ে যায়। কাম-প্রেমের কথাই সাহিত্যে সঙ্গীতে প্রাধান্য পেতে থাকে। তখন হর-গৌরী, রাম-সীতা এবং রাধা-কৃষ্ণ হলেন এ আদিরসসিক্ত সাহিত্য-সঙ্গীতের অবলম্বন। বারো শতকে বাঙলাঘেঁষা সংস্কৃতে জয়দেব-রচিত 'গীতগোবিন্দ' প্রণয়গীতি বা কাব্য বটে, তবে এ শারীর প্রেমের কাব্য পাঠের যোগ্য স্থান রাতের আলোকোজ্জ্বল নাচঘর। এ হচ্ছে বাঙালীর সর্বাত্মক অবক্ষয় কালের সাক্ষ্য। বারোশতকের বাঙলা-বাঙালী সম্বন্ধে নীহার রায় বলেন :

'তখন (তুর্কীবিজয় কালে) রাষ্ট্রে, ধর্মে, শিল্পে, সাহিত্যে দৈনন্দিন জীবনে যৌথ অনাচার, নির্লজ্জ কামপরায়ণতা, মেরুদণ্ডহীন ব্যক্তিত্ব, বিশ্বাসঘাতকতা, রুচিতারল্য এবং অলঙ্কার বাহুল্যের বিস্তার—সমাজদেহে দুষ্টক্ষতের মত প্রকট হইয়াছিল।[১২]

ডক্টর সুকুমার সেনও সেন-আমলের বাঙালীর বলবীর্যহীনতার, যুদ্ধভীরুতার ও শত্রু বিতাড়নে মন্ত্রনির্ভর তার সাক্ষ্য প্রমাণ উদ্ধার করেছেন।[১৩]

কাশ্মীর রাজমন্ত্রী বিদ্যাধরের কবিতায় 'ভএ ভজ্জি বঙ্গা-ভয়ে বাঙালী ভাগল/বঙ্গলা ভঙ্গলা-(রণে) বাঙালী ভঙ্গ দিল' বলে উল্লেখ করেছেন।[১৪]

এসব সত্ত্বেও রক্ত-সঙ্কর বাঙালী বুদ্ধিকে ধূর্ততায় ও প্রতারণাকে কৌশলে পরিণত করে, বিশ্বাসকে ও নৈতিক চেতনাকে জীবনের জীবিকার প্রয়োজনে সংকুচিত-প্রসারিত করে, মুখে উচ্চারিত সত্যকে বাণীর সত্যের স্বাতন্ত্র্য দিয়ে বুকে-পোষা মতলবচালিত জীবনে স্বস্থ থাকাই তার স্বভাব করে নিয়েছে। এমনি অসংকোচ গ্রহণ-বর্জনশীলতাই বাঙালী সত্তার স্বাতন্ত্র্য লক্ষণ ও বৈশিষ্ট্য। এ শক্তিবলেই বাঙালী আজো বেঁচে-বর্তে রয়েছে। যদিও পৃথিবী-শুদ্ধ লোক কয়েকশ' বছর আগে থেকেই জানত এবং এখনো জানে যে ভেতো ভীতু বাঙালী বাঁচে ছল-চাতুরী-প্রতারণায়, মিথ্যা ভাষণে-বিবাদে-বঞ্চনায়। আবার তোয়াজে-তোসামোদে দেব-মানবের মন গলিয়ে কিংবা মহাজ্ঞান ডাক-ডাকিনী-যোগী-যোগিণী শেখানো তুকতাকে দারুটোনায় ঝাড়ফুঁকে বাণ উচ্চাটনে, মন্ত্রে-মাদুলীতে, তাবিজে-কবচে বশ করে দেব-মানবের কৃপায় করুণায় দানে দাক্ষিণ্যে বাঁচাও তাদের চির আয়ত্তে।[১৫]

তাই ডক্টর নীহাররঞ্জন রায়ও বলেছেন : 'সমন্বয়, সাঙ্গীকরণ ও সমীকরণ যেন বাঙালীর চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য...বাঙালীর বৃত্তি যথার্থ বৈতসী। যে আদর্শ, যে ভাব স্রোতের আলোড়ন, ঘটনার যে তরঙ্গ যখন আসিয়া লাগিয়াছে, বাঙলাদেশ তখন বেতস লতার মত নুইয়া পড়িয়া অনিবার্য বোধে তাহাকে মানিয়া লইয়াছে এবং ক্রমে নিজের মত করিয়া তাহাকে গড়িয়া লইয়া নিজের ভাব ও রূপদেহের মধ্যে তাহাকে সমন্বিত ও সমীকৃত করিয়া লইয়া আবার বেতস

লতার মতই সোজা হইয়া স্বরূপে দাঁড়াইয়াছে। যে দুর্মর অন্তর্নিহিত প্রাণশক্তি বেতস গাছের, সেই দুর্মর প্রাণশক্তিই বাঙালীকে বারবার বাঁচাইয়াছে।[১৬]

ঐতিহাসিকের বাঙালী সম্বন্ধে এ ধারণা প্রায় আক্ষরিকভাবেই সত্য। বাঙালীরা তুর্কীবিজয়ের সঙ্গে সঙ্গেই সেন আমলের ব্রাহ্মণ্য সমাজপতির ও শাস্ত্রীদের হুকুমের হুমকির ও হামলার আশঙ্কা মুক্ত হয়েই সে-আমলের বারোমাসে তেরো পার্বণের দায়িত্ব এড়িয়ে অর্থাৎ পরে উপনিবিষ্ট জৈন-বৌদ্ধ-ব্রাহ্মণ্য শাস্ত্রারোপিত জীবনাচারে ও জগৎ-ভাবনায় আস্থা হারিয়ে নিজেদের আদি কিরাতীয় নিষাদীয় জীবন-চেতনা ও জগৎ-জিজ্ঞাসা লব্ধ নানা গুণ ও শক্তি-প্রতীক স্বকল্পিত মূর্ত ও বিমূর্ত দেবতার পুনঃপ্রতিষ্ঠায় সোৎসাহে উদ্যোগী হয়। তাই তেরোশতক থেকেই ধামালী ও কথকতার মাধ্যমে চণ্ডী, চামুণ্ডা, জাঙ্গুলী-বিষালাক্ষী, বৎসলা, ষষ্ঠী, শনি, লক্ষ্মী, সরস্বতী, ভৈরব, যক্ষ, ক্ষেত্র-পাল, গণেশ, হর-গৌরী, ধর্ম, তারা প্রভৃতির মাহাত্ম্য প্রচারে ও পূজা অনুষ্ঠানে আগ্রহী হয়ে ওঠে। এসব উদ্যোগ আয়োজনের তরঙ্গ-তোড়ে গীতা-স্মৃতি-শ্রুতি-পুরাণ শাসিত সেন আমলের ব্রাহ্মণ্য সমাজ ভেঙে ও ভেসে যাওয়ার উপক্রম হল :

ধর্মকর্ম লোক সভে এই মাত্র জানে
মঙ্গলচণ্ডীর গীত করে জাগরণে।
দম্ভ করি বিষহরী পূজে কোন জন
পুত্তলি করএ কেহো দিয়া বহুধন।
ধন নষ্ট করে পুত্র-কন্যার বিভায়
এইমত জগতের ব্যর্থ কাল যায়।...
সকল সংসার মত্ত ব্যবহার রসে
কৃষ্ণপূজা বিষ্ণুভক্তি কারো নাহি বাসে।
বাসুলী পূজএ কেহো নানা উপচারে
মদ্যমাংস দিয়া কেহো যক্ষ পূজা করে।
নিরবধি নৃতগীত বাদ্য কোলাহল
না শুনি কৃষ্ণের নাম পরম মঙ্গল।[১৭]

জৈন-বৌদ্ধ-ব্রাহ্মণ্য যুগেরও পূর্বকার লোকবিশ্বাসজ লৌকিক দেবতার নব অভ্যুত্থান দেখে উচ্চ বর্ণের রক্ষণশীল ব্রাহ্মণ-বৈদ্য-কায়স্থরা ব্রাহ্মণ্য শাস্ত্রের বিলুপ্তি আশঙ্কায় শঙ্কিত হয়ে উঠল। কৃত্তিবাস ব্যতীত অন্যান্য ব্রাহ্মণরা পাপভয়ে সাহস না পেলেও তুর্কী দরবারের চাকুরে সংস্কারমুক্ত বৈদ্য-কায়স্থরা রাজশক্তির আশ্রয়ে থেকে রামায়ণ, মহাভারত ও ভাগবত বাঙলায় তর্জমা করে দিয়ে শূদ্রদের ব্রাহ্মণ্য ধর্মে ও সমাজে ধরে রাখার চেষ্টায় হলেন ব্রতী। বললেন সংস্কৃত ভাষায় লিখিত পবিত্র 'পুরাণ পড়িতে নাই শূদ্রের অধিকার'। অতএব বাঙলা পাঁচালী পড়িয়া তর এ ভব সংসার'।[১৮]

গণমানবের সঙ্গে উচ্চবর্ণের ও বিত্তের সংস্কৃতিবান ব্রাহ্মণ্যবাদীর শাস্ত্রে সমাজে এ যে দ্বন্দ্ব সৃষ্টি হল, তা লঘু গুরু ভাবে প্রায় দেড়শ বছর (তেরো-চৌদ্দ শতকে) ধরে চলছিল। অবশেষে লৌকিক হর-দুর্গা, রাধা-কৃষ্ণ এবং পূর্ববঙ্গে মনসা পশ্চিমবঙ্গে চণ্ডী আর রাঢ়ে ধর্ম প্রভৃতি মুখ্য দেবতাকে পূজার অঙ্গীকার করে তাদের পুরাণে ঠাঁই দিয়ে সেদিনকার ব্রাহ্মণ্যবাদীরা শাস্ত্র, সমাজ ও সংস্কৃতি ক্ষেত্রে গীতা-স্মৃতি-শ্রুতি-পুরাণের ছিটেফোঁটা প্রভাব স্বীকার করিয়ে দ্রোহী ও স্বধর্মের স্বাতন্ত্র্যকামী লোকসাধারণকে বশে ও সমাজে রাখতে সমর্থ হয়েছিল। বিদেশী বিভাষী

বিধর্মী বিজাতি শাসকগোষ্ঠী আরব-ইরানী-তুর্কীর উপস্থিতিতে (পরবর্তী কালে ব্রিটিশ আমলে উনিশ শতকে যেমন দেখা গেছে) সর্বশ্রেণীর শাসিত মনে নতুন প্রাশাসনিক শাস্ত্রিক ও সাংস্কৃতিক প্রতিবেশ ও নতুন নীতি-নিয়ম চিন্তায় চেতনায় যে-অভিঘাত তরঙ্গ তুলল, তাতে কম বেশী সবাই আকস্মিকভাবে জাগল এবং দিশাহারাভাব কাটিয়ে স্বস্থ ও সুস্থ হয়ে স্ব স্ব শাস্ত্রে, আচারে ও আচরণে সুস্থির থাকার চেষ্টা করল, তবু নতুন শাসকগোষ্ঠীর প্রভাব, নব ঋতুর ও নতুন মৌসুমের প্রভাব ঠেকানো যায়নি। সে-প্রভাবে সেদিন এদেশের শূদ্রগণমানব নবজীবন রচন লক্ষ্যে প্রগতির পথই খুঁজছিল। কিন্তু অজ্ঞ অনক্ষর হওয়ায় ঐতিহ্যের নবায়নে ও অবলম্বনেই তারা জাগতে জাগাতে এবং এগুতে ও এগিয়ে নিতে চেয়েছিল (এ সূত্রে রেনেসাঁস যুগে য়ুরোপে গ্রীক ও খ্রীস্টান ঐতিহ্যাবলম্বন স্মর্তব্য)।

এদিকে বিদ্যায় বিত্তে মননে মনীষায় অগ্রসর উচ্চবর্ণের ও উচ্চশ্রেণীর রক্ষণশীল ব্রাহ্মণ্যবাদীরা সর্বনাশের মুখে লৌকিক দেবতাদের স্বীকার করে তাদের সঙ্গে সন্ধি করায় তাদের প্রগতিচিন্তা ও আত্মোন্নয়ন পন্থা পরিত্যক্ত হল। রক্ষণশীল ব্রাহ্মণ্যবাদীরা হার স্বীকার করেই, সংস্কারক হয়েই হল পরিণামে জয়ী। এভাবে চৌদ্দশতকের শেষার্ধ থেকে প্রথমে মৌখিকভাবে পরে লিখিতভাবে লৌকিক অরি-মিত্র দেবতামাহাত্ম্য প্রচার ও দেবপূজা শুরু করল ব্রাহ্মণ বৈদ্য কায়স্থরা। তবু শেষরক্ষা হচ্ছিল না, শাসকগোষ্ঠীর ভ্রাতৃত্বের সাম্যের সমাজে ব্যক্তির আত্মবিকাশের ও আত্মপ্রতিষ্ঠার আপাত সুযোগ ইসলামের দিকে নির্জিতদের আকৃষ্ট করছিল। অবশেষে বিশ্বম্ভর চৈতন্যদের উত্তর ভারতীয় সন্তমতের আদলে রাধাকৃষ্ণ নামের মাধ্যমে সুফীর প্রেমবাদ অঙ্গীকার ও প্রচার করে ইসলামের প্রসার রোধে সমর্থ হন। চেতনার গভীরে ব্রাহ্মণ্যসমাজ রক্ষার প্রেরণায় সময়োপযোগী ব্যবস্থা গ্রহণে উদ্যোগী চৈতন্যদেব তাঁর গৌড়ীয় বৈষ্ণব প্রেমবাদে অতি উদারভাবে ইসলামের ও সুফীর সামাজিক, নৈতিক এবং সাধন-ভজন সম্পৃক্ত নিয়ম-নীতি গ্রহণ-বরণ করায় (যেমন বিয়ে, তালাক, সাম্য, বৈরাগ্য, নামকীর্তন, সেবা, প্রভৃতি) চৈতন্য-মত বাস্তবে শাস্ত্রিক আচারিক ব্রাহ্মণ্য ধর্ম রইল না: 'হেন মহাঠাকরণীভাব যার মনে উপজয়/বেদধর্ম তেজি সে কৃষ্ণক ভজয়।' চৈতন্যদেব অস্পৃশ্যতাদুষ্ট বর্ণ বিদ্বিষ্ট দেশে 'নরে নারায়ণ' ও 'জীবে ব্রহ্ম' প্রত্যক্ষ করে ঘোষণা করেছিলেন 'চণ্ডালোহপি দ্বিজশ্রেষ্ঠ হরিভক্তি পরায়ণ।' এ প্রথম শাসকগোষ্ঠীর প্রভাবে এদেশে নির্বিশেষ মানুষের ব্যক্তিসত্তা পেল মর্যাদা, মনুষ্যত্ব হল মহিমান্বিত। এ চৈতন্য দ্রোহী, জিজ্ঞাসু, মানব সাম্যে আস্থাবান প্রগতিপন্থী। তাই চৈতন্য-প্রভাবিত যুগকে আমরা চিন্তা-চেতনার ক্ষেত্রে রেনেসাঁস যুগ বা ভাববিপ্লব যুগ নামে অভিহিত করি। যদিও চৈতন্যের ঐহিকতা বিরোধী বৈরাগ্যবাদ (তথা গার্হস্থ্য, সামাজিক ও রাষ্ট্রিক জীবনের গুরুত্ব প্রায় অস্বীকার করে আকাশচারিতায় উৎসাহদান) বাঙালীকে কর্মকুণ্ঠ, ভাবপ্রবণ ও ভিক্ষাজীবী হতে পরোক্ষে উৎসাহিত করেছে। মধ্যযুগে অতুল্য তত্ত্ব দর্শন এবং গীতিকবিতার অনুপম উৎকর্ষ চৈতন্যান্দোলনেরই দান। অবশ্য চৈতন্যমতবাদ বাঙলাদেশে তেমন প্রসার লাভ করেনি।

৭.

যারা ইসলাম বরণ করেছিল, তারা ছিল দুই প্রকারের মানুষ—এক ইসলামের সঙ্গে পরিচয়ের ফলে তাদের মনে পিতৃ ধর্মের ও আচারের প্রতি সন্দেহ, অশ্রদ্ধা ও অনাস্থা জেগেছিল, আর নতুন জিজ্ঞাসায়, আকাঙ্ক্ষায় ও প্রত্যাশায় প্রবুদ্ধ হয়ে আত্মসত্তার মুক্তি ও মর্যাদা অর্জনের এবং আত্মবিকাশের ও আত্মপ্রতিষ্ঠার সুযোগ পাবার জন্যে ইসলাম বরণ করেছিল। অন্য দল

শাস্ত্রবিশ্বাসে শিথিল নিঃস্ব-নিরন্ন অজ্ঞ অক্ষম মানুষ (ব্রিটিশ আমলের মিশনারীদের দুস্থ ও আরণ্য মানব সেবা স্মর্তব্য) যারা পীর-ফকীর-দরবেশদের কৃপা-করুণা-দান-দাক্ষিণ্য-সেবা-সহায়তা লাভের লোভে ইসলাম গ্রহণ করেছিল। প্রথমোক্ত দলটিও মুসলিম হয়েও প্রত্যাশিত মানসিক কিংবা আর্থ-সামাজিক বিকাশ পায়নি। কারণ তাদের দীক্ষাদাতারা ছিলেন বিবাগী দরবেশ, শাস্ত্র ও তার ভাষা ছিল আরবের, শাসন-প্রশাসনের, সাহিত্য-সংস্কৃতির ও ইতিহাস-দর্শনের বাহন ছিল ফারসী—ইরানে মধ্যএশিয়ায় যার উদ্ভব। ফলে সবটাই ছিল পনেরো শতক অবধি তিনশ' বছর ধরে গাঁয়েগঞ্জে দেশজ মুসলিমের সংখ্যা স্বল্পতার জন্যে নাগালের বাইরে। পাপের ভয় গাঢ় গভীর ছিল বলে শাস্ত্র অনূদিত হয়নি ষোল শতকের প্রথমার্ধ অবধি। তাই তাদের পক্ষে পিতৃ-পুরুষের লৌকিক বিশ্বাস-সংস্কার, আচার-আচরণ পরিহার করা উনিশ শতকের আগে সম্ভব হয়নি। রস পিপাসা চরিতার্থ করার জন্যে তারা প্রথমে ইউসুফ-জুলেখা, লায়লী-মজনু প্রভৃতি ইসলাম-পূর্ব পশ্চিম এশিয়ার প্রণয়কথা শুনে শুনে অনুশীলন করে, পরে উত্তর ভারতের প্রণয়োপাখ্যান এবং শেষে ফারসী কাব্যধৃত উপাখ্যান বাঙলায় মৌখিক ও লিখিত ভাবে বর্ণনা করতে থাকে। বিদেশের শাস্ত্র ও সংস্কৃতি, জীবনদর্শন ও আদর্শ অঙ্গীকার করায় তারা হয়েছে ছিন্নমূল বিদেশমুখী মানস-পথিক। দেশের মাটির সঙ্গে শিকড়ের এবং প্রতিবেশীর সঙ্গে আত্মীয়তার বন্ধন না থাকায় তারা স্বদেশে প্রবাসীর জীবনযাপনই করেছে। তেমন কৃত্রিম জীবন বন্ধ্যাই থাকে। এ অবস্থা 'না ঘরকা না ঘাটকা—ঘরেরও নয়, ঘাটেরও নয়' অবস্থা। তাই এদের রচনায় স্বদেশী জীবন সম্পৃক্ত কোন মৌলিক চিন্তা-চেতনার পরিচয় সুদুর্লভ।

বরং ওই দ্বিতীয় প্রকারের দীন দুর্বল মুসলিমাই অজ্ঞতাবশেই দেশের মাটির ও মানুষের সঙ্গে একাত্ম হয়েছিল চিরকাল, এরাই লোকজ বিশ্বাস-সংস্কার-আচার-আচরণ নির্ভর তথাকথিত আজলাফ বা অনভিজাত আতরাফ। এরাই স্থানিক লোক-ঐতিহ্যের, লোকসংস্কার-সংস্কৃতির ধারক, বাহক, প্রচারক ও স্রষ্টা। এমনি মুক্তবুদ্ধির এ সরল বিশ্বাসের মানুষের সৃষ্টিও হচ্ছে স্বল্পায়ু, প্রণয় ও ভাবগীতি, আর বিশেষ অবদান হচ্ছে ওদের সৃষ্ট ও লালিত গাথা, গীতিকা ও উপকথা। এরা মানুষের হৃদয়বৃত্তিকে, প্রাণের তৃষ্ণাকে, জীবনের চাহিদাকে শাস্ত্রের চেয়ে বেশী গুরুত্ব দিয়েছে।—মানুষের জন্যে, জীবনের জন্যেই যে শাস্ত্র-সমাজ, শাস্ত্র-সমাজের জন্যে যে জীবন নয়, তা নির্যাতন সহ্য করে বিড়ম্বনাকে বরণ করে এবং প্রাণ দিয়ে প্রমাণ করার চেষ্টা করেছে এরা গাথা-গীতিকায় ও উপকথায়।

৮.

সতোরো-আঠারো শতকে মঘ-হার্মাদের লুণ্ঠন-নির্যাতনে এবং তেরো নদীর ওপারের দিল্লীর সাম্রাজ্যবাদী মুঘলের শোষণে বিপর্যস্ত নিঃস্ব নিরন্ন নিরক্ষর হিন্দু-মুসলিম বাঙালী ভাতে-কাপড়ে বাঁচবার ও স্বজনকে বাঁচাবার শেষ প্রয়াস হিসেবে কোরআন-পুরাণ ও মন্দির-মসজিদ এড়িয়ে উপচার লোভী মোল্লা-পুরুতের সহায়তায় ও সহযোগিতায় সচেলা এক দেবতা সৃষ্টি করে তাঁর নাম 'সত্য'—তিনি নামে-একেশ্বরবাদী মুসলিমের পীর এবং নামে-হিন্দুর নারায়ণ রূপে পরিকল্পিত ও বৃত।

'হিন্দুর দেবতা তিনি মুসলমানের পীর।
দুই কুলে সেবা লয় হইয়া জাহির।'

এবং সে-জন্যেই

'মক্কায় রহিম আমি অযোধ্যার রাম–
কলিতে সম্প্রতি আমি সত্য নারায়ণ'।

তাঁর চেহারা-সুরতও তাই

'অর্ধেক মাথায় কালা, এক ভাগে চূড়া টানা
বনমালা ছিলিমিলি তাতে,
ধবল অর্ধেক কায় অর্ধ নীল মেঘ প্রায়,
কোরান পুরাণ দুই হাতে।'[১৯]

পীর নারায়ণ 'সত্য' পাপ-পুণ্যের নন, কেবল মর্ত্য মানবে জীবন জীবিকার নিরাপত্তা দানের দেবতা। তাঁর হিন্দু-মুসলিম চেলা দেবতাও বহু বড়খাঁগাজী-দক্ষিণরায়, কালুগাজী-কালুরায়, বনদেবী-বনবিবি প্রভৃতি। প্রতাপে প্রবল মুঘল আমলে সৃষ্ট ত্রাণকর্তা এ দেবতার সাধারণ ভোগ শিরনী।'[২০]

এক হিসেবে 'সত্য' পূজারীরাও দ্রোহী, জিজ্ঞাসু এবং প্রগতিপন্থী। কেননা অজ্ঞ হয়েও এরা কোরআন-পুরাণোক্ত জগৎপাতায় প্রতি ভয়-ভরসা-আস্থা হারিয়ে আত্মবিশ্বাস ও সাহস নিয়ে প্রমূর্ত সত্য (ট্রুথ ও অনেস্টি) নির্ভর হয়ে বাঁচার ঝুঁকি নিয়েছিল। এ যুগে শিক্ষিত লোকের 'মার্কসবাদ' অঙ্গীকার করা আর ওই মধ্যযুগে গাঁ-গঞ্জের নিঃস্ব মানুষের 'সত্য' বরণ করা কালের ধারায় প্রায় অভিন্ন দ্রোহের ও মানসমুক্তির পরিচালক। সেদিনকার সেই স্তরের মানুষের এর চেয়ে বেশী জীবনমুখী প্রগতি-চেতনা ও প্রগতিশীলতা প্রত্যাশা করা যেত না।

তুর্কী-বিজয়ের পরে চণ্ডী-মনসার ধামালী-পাঁচালীতে কাহিনীর তাৎপর্যগত পরিবর্তন এসেছিল—'আল্লাহ ছাড়া স্বর্গে মর্ত্যে আর কারো কাছে মানুষের—মুসলিমের মাথা নত করতে নেই।' ইসলামের এই বাণীর প্রত্যক্ষ প্রভাবে পশ্চিবঙ্গের ধনপতি সদাগর এবং পূর্ববঙ্গের চাঁদদাগর একক দেবতা শিবের ব্যতীত অন্য দেবতার অনুগত ও পূজারী হতে চায়নি। রাঙামাটির ধনপতি ধৈর্য হারিয়ে চণ্ডীর কাছে নতি স্বীকার করেছিল, কিন্তু কূলভাঙা নদীতীরের মানুষ চাঁদের জেদ, ধৈর্য ও সংগ্রামের সাহস ছিল অসামান্য। তাই যে মনসার কাছে হার মানেনি, হার স্বীকার করেছিল বেহুলার কৃচ্ছ সাধনার কাছে। চাঁদ-বেহুলা চরিত্র বাঙলা সাহিত্যে অনন্য এবং বিশ্ব সাহিত্যেও দুর্লভ এমন তেজবীর্য আদর্শবান উন্নত শির চরিত্র। বাঙালীর মনন ও কল্পনা সৃষ্ট ধনপতি ও চাঁদ চরিত্রে একেশ্বরবাদের প্রভাব ছাড়াও রয়েছে—উচ্চবিত্তের লোকের লোকজ লৌকিক দেবতা পূজায় গোড়ার দিককার অস্বীকৃতির লেশ।[২১] এখানেই আমরা মধ্যযুগের সাহিত্যালোচনা শেষ করছি।

তবে তার আগে আরো দু'টো বিষয় উল্লেখ করা আবশ্যিক। একটি ফকির-সন্ন্যাসী বিদ্রোহের কথা। মীরজাফর-সন্তানের নওয়াবী আমলে নওয়াবের সৈন্যবাহিনী ভেঙে দেয়া হয়, ফলে আকস্মিকভাবে বেশ কয়েক হাজার লোক বেকার হয়ে পড়ে। বাঙালীর সামরিক ঐতিহ্য না থাকায় সে-যুগে বাঙলাদেশেরই সৈন্যবাহিনীর সিপাহীদের প্রায় সকলেই ছিল উত্তরবিহার থেকে ভারতের, ইরানের এবং মধ্য এশিয়ার নানাস্থানের লোক। মোটামুটি এলাহাবাদ থেকে উত্তর বিহার অবধি অঞ্চলের চাকরীচ্যুত বেকার-বিক্ষুব্ধ সিপাহীরা কর্মচ্যুত সেনানী মজনুশাহর ও ভবানী পাঠকের নেতৃত্বে যথাক্রমে বুরহান ফকির ও নাগা সন্ন্যাসীবেশে স্বভূম ও স্বভাষী অঞ্চল ব্রিটিশ-শাসিত বিহার বাদ দিয়ে ব্রিটিশ-বাঙলার উত্তর সীমায় প্রতিবছর এসে সচ্ছল গৃহস্থ-সম্পদ লুঠ করত। চিরকেলে নিয়মে দুষ্ট-দরিদ্র নিঃস্ব স্থানীয় লোকেরাও যোগ দিত লুঠতরাজে। এরা বাহ্যত সরকার-দ্রোহী বটে, কিন্তু বাস্তবে ছিল নির্লক্ষ্য দস্যু। দেশের

স্বাধীনতাকামী দ্রোহী হলে তারা বিহারেও কেবল ব্রিটিশ সরকারের ও সৈন্যের বিরুদ্ধে উৎখাত লক্ষ্যে লড়ত। অতএব, দ্রোহ মাত্রই প্রগতি লক্ষণ নয়।

আঠারো শতকের মধ্যভাগে দিল্লীর শাহ ওয়ালিউল্লাহ (১৭০৩-৬৩) বিশ্বমুসলিমদের বিশেষ করে ভারতের মুঘলশক্তির পতনরোধ কল্পে আদি অকৃত্রিম বিশুদ্ধ ইসলামের আলোকে মুসলিম সমাজের ও প্রশাসননীতির তথা রাজনীতির সংস্কারের প্রয়োজনীয়তার বিষয়ে একখানা মূল্যবান গ্রন্থ লেখেন। মূলত শাহ ওয়ালিউল্লাহর পরোক্ষ প্রভাবে এবং আঠারো শতকের শেষার্ধে আরবের ওয়াহাবপুত্র মুহম্মদের [১৭০২-৯১] শাস্ত্র ও আচার সংস্কার আন্দোলনের প্রত্যক্ষ প্রভাবে ভারতেও সৈয়দ আহমদ ব্রেলভীর [১৭৮৬-১৮৩১] নেতৃত্বে মুহম্মদীয়া তথা ওয়াহাবী আন্দোলন শুরু হল উনিশ শতকের গোড়ার দিকেই। এঁদেরও ছিল সেই গতানুগতিক ধারণা: ইসলামের উদ্ভব যুগের বিশুদ্ধ ইসলামানুসরণে ইমানের জোর, আচার-আচরণ শরীয়ৎ মুসলিমদের প্রাত্যহিক জীবনে রূপায়িত বা বাস্তবায়িত হলে কেয়ামত-তক্ মুসলিম সমাজের ও রাষ্ট্রের কোন ক্ষয়ক্ষতি বা পতন হতে পারেই না। এর সঙ্গে পরে বাঙলায় একই তত্ত্বভিত্তিক ফরায়েজী (ফরজ পালনে নিষ্ঠ থাকা) আন্দোলনও যুক্ত হয় হাজী শরীয়তুল্লাহর (১৭৮১-১৮৪০) নেতৃত্বে। এ আন্দোলন ছিল মুখ্যত ইংরেজী না-জানা মৌলবী-মুসল্লিদের এবং সাড়া দিয়েছিল গাঁ-গঞ্জের অজ্ঞ অশিক্ষিত মুসলিমরা। অতএব, এ আন্দোলন ছিল নিতান্ত অসঙ্গত অযৌক্তিক ভুল ধারণা ভিত্তিক অতীতাশ্রয়ী। তারা আজকের মওদুদীপন্থী মৌলবাদীদের মতোই নিজেদের প্রগতিবাদী বলে বিশ্বাস করলেও আসলে তারা ছিল একান্তভাবে বন্ধ্যাচেতনার অতীতমুখী রক্ষণশীল মানুষ। পরিকল্পনায় ও লক্ষ্যে দেশ-কাল-প্রয়োজন-চেতনা ছিল না বলেই প্রায় ষাট বছরেরও বেশী কাল ধরে শিখরাজ্যের, জমিদারের ও ব্রিটিশের বিরুদ্ধে যুদ্ধে ও আন্দোলনে দুই প্রজন্মব্যাপী তাদের জান-মাল-রক্তক্ষয়ী আন্তরিক প্রয়াস বৃথা ও ব্যর্থ হল। ওয়াহাবী ফরায়েজী সিপাহী—এ তিনটে সংগ্রামে পরাজিত এবং জানে-মালে দেহ-মনে পর্যুদস্ত ও লাঞ্ছিত হয়ে মুসলিমরা ভারতব্যাপী সৈয়দ আহমদ খানের (১৮১৭-৯৮) প্রবর্তনায় ১৮৬০-৭০ সনের দিকে ব্রিটিশ-সরকার সমর্থক হয়ে যায়।

৯

আধুনিক কালের প্রগতি আন্দোলন সম্বন্ধে আমাদের সবারই কমবেশি ধারণা রয়েছে। কাজেই বিস্তৃত আলোচনার প্রয়োজন নেই। ব্রিটিশ আমলের প্রথম ইংরেজী শিক্ষিত ও প্রতীচ্য চিন্তা-চেতনাপুষ্ট মানুষ হচ্ছেন রামমোহন রায় (১৭৭৪-১৮৩৩)। বাল্যকাল থেকে তাঁর মনে জগৎ-চেতনা ও জীবন-জিজ্ঞাসা জেগেছিল, তাই তিনি প্রচলিত শাস্ত্রেই খুঁজছিলেন সত্য ও সারতত্ত্ব। পূর্বপুরুষের শাস্ত্রের প্রতি কৈশোরে-জাগা সন্দেহ সংশয় অনাস্থা তাঁর জীবনে কখনো ঘোচেনি। নাস্তিক না হলেও তাঁকে সংশয়বাদী বলে চিহ্নিত করতে বাধা দেখিনে। সমকালীন প্রতীচ্য চিন্তা-চেতনার প্রত্যক্ষ প্রভাবে তিনি তাঁর স্বজাতি-স্বধর্মীর জন্যে প্রতীচ্য আদলের চিন্তা-চেতনা সমাজ-সংস্কৃতি প্রশাসন-প্রগতি কামনা করেছিলেন। সনাতনী ও মধ্যযুগীয় শাস্ত্রিক, সামাজিক, নৈতিক ও মানসিক নিয়মনীতির বন্ধনমুক্তিই ছিল তাঁর কাম্য। নিজের জন্যে নয়, আস্তিক স্বজাতি স্বধর্মীর জন্যেই তিনি অপৌত্তলিক একেশ্বরবাদই বাঞ্ছিত মনে করেছিলেন, তাই তিনি বেদ-উপনিষদ ঘেঁটে বিমূর্ত নিরাকার একেশ্বরবাদ প্রচার করতে থাকেন। এ জন্যে তাঁর মুখ্য আশ্রয় ছিল যুক্তি এবং অবলম্বন ছিল বেদ-উপনিষদের কয়েকটি তত্ত্ব। কাজেই রামমোহনই উনিশ শতকের গোড়ায় গোটা ভারতে নতুন যুগের প্রবর্তক প্রথম যুক্তিবাদী প্রগতিপন্থী মানুষ।

তাঁর ব্যক্তিক ও বৈষয়িক জীবনে নিন্দনীয় নানা দোষ-ত্রুটি-অসঙ্গতি থাকলেও বিদ্যায় বিত্তে জ্ঞানে প্রজ্ঞায় মনীষায় মনস্বিতায় তিনি তাঁর স্বকালের প্রথম সারির যে-কোন প্রাগ্রসর চিন্তা-চেতনাসম্পন্ন য়ুরোপীয় নাগরিকের সমকক্ষ ছিলেন তাঁর স্বদেশ স্বকালে তিনিই ছিলেন একাধারে নবযুগের উদগাতা, দূরদৃষ্টিসম্পন্ন এবং বিশ্বমনস্ক বিশ্বম্ভর পুরুষ। কলেবরে ছোট হলেও কিন্তু মৌলিক ও অনুবাদ মিলে রামমোহনের রচনা বহু ও বিবিধ এবং যুক্তি ও মনীষাদীপ্ত।

যুক্তিবাদের প্রসার ঘটে ডিরোজিওর (১৮০৯-৩১) প্রভাবে ও প্রচারে হিন্দু কলেজের ছাত্রদের মধ্যে। শাস্ত্রিক সমাজিক লৌকিক বিশ্বাস-সংস্কার-মুক্তি ও সত্যপ্রীতিই চিল তাদের জীবনে নবলব্ধ যুক্তিবাদের অবদান। হিন্দু কলেজের ছাত্ররা তথা এজুরা মিথ্যে বলতে জানে না—কথাটা প্রাবচনিক মর্যাদায় স্বীকৃত ছিল বহু বছর অবধি। এঁরা সবাই গোড়ার দিকে মুক্তিবুদ্ধি যুক্তিবাদী পজিটিভিস্ট প্রত্যক্ষবাদী ও ভাব-চিন্তা-কর্ম-আচরণে ছিলেন ষোল-আনা প্রগতিপন্থী। কিন্তু চল্লিশোত্তর জীবনে হৃতযৌবন এজুরা, নিষ্ঠাবান, হিন্দু রক্ষণশীল ব্রাহ্ম কিংবা গোঁড়া খ্রীস্টান হয়ে প্রগতির পথ পরিহার করেন। তবু তাঁরা বিদ্যা-বুদ্ধি-বিশ্বাসের ক্ষেত্রে রস-রুচি-সংস্কৃতি বিষয়ে এবং প্রতীচ্য জীবন-ভাবনা ও জগৎ-চেতনা সঞ্চারে কেজো ভূমিকা পালনের স্বাক্ষর রেখে গেছেন। কোলকাতায় একটা কৃত্রিম লণ্ডন নির্মাণের সূচনাও হয়েছিল তাঁদের হাতেই। তাঁরা নতুন যুগের প্রতিবেশস্রষ্টা উজ্জ্বল জ্যোতিষ্ক। ব্যক্তির সত্তার স্বাতন্ত্র্য ও মর্যাদা চেতনার শুরুও হয় তাঁদের থেকেই।

কবি ঈশ্বরগুপ্তের (১৮১২-৫৯) প্রগতিশীলতা আমরা স্বীকার করি না বটে, কিন্তু তিনিই প্রথম বুঝেছিলেন যে সাহিত্য ব্যক্তির রস-বিনোদনের বস্তু নয় কেবল, জাতীয় জীবন বিকাশের ভিত্তি এবং অবলম্বনও। তিনিই প্রথম পুরোনো সাহিত্যের রক্ষণ, সাহিত্যিকের জীবনবৃত্তান্ত সংকলন, সাহিত্য সম্মেলন, পত্র-পত্রিকার মাধ্যমে সাহিত্য ও সাহিত্যিক সৃষ্টির প্রয়োজনীয়তা এবং চিন্তা-চেতনার স্বাধীন অভিব্যক্তি নবযুগের নবসমাজ গঠনের জন্য যে আবশ্যিক তা উপলব্ধি করেছিলেন। সরকার অনুগত হলেও স্বদেশ-স্বধর্মী প্রীতি এবং অপসংস্কৃতি (তাঁর দৃষ্টিতে) বিরোধিতা তাঁর রচনাতে ও সংবাদ প্রভাকর পত্রিকায় প্রকাশ পেতে থাকে। কবিতায় ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ করলেও তিনিও নারী শিক্ষার পক্ষে লিখেছেন।

এর পর জিজ্ঞাসু ও দ্রোহী বিদ্যাসাগরের (১৮২০-৯১) শাস্ত্র ও সংস্কার-মুক্তি, নাস্তিক্য, আধুনিকতা, চিন্তায় প্রাগ্রসরতা, মানবিকতা যুক্তিনির্ভরতা, জ্ঞানমনস্কতা ও শিক্ষাবিস্তার আন্দোলন প্রভৃতি তাঁর প্রগতিপ্রিয়তার ও প্রগতিশীলতার এবং প্রতীচ্য প্রভাবিত প্রাগ্রসর চিন্তা-চেতনারই উজ্জ্বল নির্দশন। বিদ্যাসাগর যে উনিশ শতকের কোলকাতার ও বাঙলার একজন আদর্শ মানুষ, সে-বিষয়ে আজ আর কারো কোন সন্দেহ নেই।

আর একজন জিজ্ঞাসুদ্রোহী ছিলেন অক্ষয় কুমার দত্ত [১৮২০-৮৬]। তাঁর যুক্তিনিষ্ঠা, বিজ্ঞানচেতনা ও নাস্তিক্য তাঁকে উনিশ শতকের একজন বিশিষ্ট চিন্তাশীলরূপে চিহ্নিত রেখেছে, যদিও অক্ষয় দত্তের নাম আজকাল ক্বচিৎ উচ্চারিত হয়। বাঙলা গদ্যের উৎকর্ষ সাধনে তাঁর দান বিদ্যাসাগরের চেয়ে কম নয়, কিন্তু তিনি সে-খ্যাতি থেকে বঞ্চিত। তিনি ইংরেজী, সংস্কৃত ছাড়াও জানতেন গ্রীক, ল্যাটিন, হিব্রু। অধ্যয়ন করেছিলেন পদার্থ-গণিত-জ্যোতিঃভূগোল-মনোবিজ্ঞান প্রভৃতি। মধুসূদন ও অক্ষয় দত্তই ছিলেন সেকালে প্রখ্যাত বহুভাষাবিদ। তাঁর উপর কোঁতে, মিল ও স্পেনসারের দার্শনিক মতবাদের প্রভাব ছিল। চারুপাঠ নামে তিন খণ্ডে

প্রকাশিত বিদ্যালয়ের জনপ্রিয় পাঠ্যগ্রন্থ এবং নাস্তিক্য, বহুজনহিতচেতনা এবং যুক্তি ও তথ্য-নিষ্ঠা তাঁকে তাঁর স্বকাল প্রগতি ও প্রাগ্রসর চিন্তা-চেতনার প্রতিভূ করে তুলেছিল।

রামমোহনের ব্যক্তিত্বমুগ্ধ দেবেন্দ্রে নাথ ঠাকুর (১৮১৭-১৯০৫) রামমোহনের টানে ব্রাহ্মণ্য শাস্ত্রের জটিল বন্ধনমুক্ত হলেও তাঁর চিন্তা-চেতনার গভীরে প্রায় সর্ব প্রকার রক্ষণশীলতা ছিলই। কেশবচন্দ্র সেনের (১৮৩৮-৮৪) বিদ্যা-বুদ্ধি-উদ্যোগ ছিল, কিন্তু তাঁর আদর্শে সংকল্পে কিংবা চরিত্রে দৃঢ়তা ছিল না, আভিজাত্য ও মানলোভী কেশব সেন নারীর উচ্চ শিক্ষার পক্ষপাতী ছিলেন না। যদিও ব্রাহ্ম সমাজে চেতনা সঞ্চার আন্দোলনে ও সমাজ উন্নয়নে তাঁর কর্মবহুল জীবন উৎসর্গিত ছিল, তবু তাকে প্রগতিবাদী বলা চলে না—তাঁকে বলা চলে নিজের দলের উন্নতিবাদী।

মাইকেল মধুসূদন দত্তের (১৮২৪-৭৩) রচনায় তাঁর সমকালীনতা ছিল না। তাঁর মানস-বিচরণক্ষেত্র ছিল প্রাচীন গ্রীক, সংস্কৃত ও ল্যাটিন সাহিত্য এবং সতেরো শতক অবধিকালের ইংরেজী ও ফরাসী সাহিত্য। ঠুলিপড়া ঘোড়ার দৃষ্টি নিয়ে তিনি একাগ্রচিত্তে কেবল কাব্যলোকেই বিচরণ করে কাব্যের দেহের ও প্রাণের অন্দি-সন্ধি জানবার-বুঝবার জন্যেই যেন তিনি ভাষাগুলো শিখেছিলেন এবং তাঁর রচনায় প্রাচীন শ্রেষ্ঠকাব্যের আলোকে আঙ্গিক নির্মাণে ও প্রাণরস সঞ্চারে ছিলেন সচেষ্ট। উক্ত ভাষাগুলোতে ধৃত বিচিত্র জ্ঞান ও তত্ত্ব তাঁকে আকৃষ্ট করেনি। তাঁর রচনার বিষয়েও (প্রহসন দুটো ব্যতীত) ছিল না স্বকাল, রামায়ণ মহাভারত পুরাণ ও মধ্যযুগ ছিল তাঁর মুখ্য অবলম্বন। তাই লন্ডন-প্যারিসে থেকেও তিনি তাঁর স্বকালের য়ুরোপীয় দার্শনিক, ঐতিহাসিক, নৈতিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক কিংবা রাজনীতিক চেতনায় উদ্বুদ্ধ হননি। এমনকি তাঁর সমকালের ইংরেজী-ফরাসী সাহিত্যের ভাব, বিষয়বস্তু, আঙ্গিক ভাষাভঙ্গিও তাঁকে আকৃষ্ট করেনি। বাঙলা ভাষা-সাহিত্যে তাঁর দান আমাদের দেশে অভিনব ও বিপ্লবাত্মক অবশ্যই, যদিও তা য়ূরোপে পরিত্যক্ত পুরাতন, অতিক্রান্ত অতীত মাত্র। তাঁর রচনার মাধ্যমে কাব্যে নাটকে আমাদের প্রাচীন ও মধ্যযুগ ঘুচল বটে, কিন্তু এ-ও উল্লেখ্য যে তাঁর সমকালের কোলকাতায় বিলেত না গিয়েও ইংরেজী বইয়ের মাধ্যমেই অনেকেই হয়েছিলেন বিদ্যায়, বুদ্ধিতে, চিন্তা-চেতনায় রস-রুচিবোধে সমকালীন য়ুরোপীয় শিক্ষিত মানুষের সমকক্ষ। এক হিসেবে জগৎ-জীবন-মানুষ ও সমাজ-সাহিত্য সম্পর্কে সংকীর্ণ চেতনার কবি-মনীষী তিনি। এ কারণেই কোন অর্থেই তাঁকে প্রগতির ও প্রাগ্রসর চিন্তা-চেতনার ধারক বাহক বলা চলে না। তিনি ছিলেন প্রাণের ঐশ্বর্যে দুরন্ত সুন্দর পুরুষ। ইংরেজী শিক্ষা সবাইকে মনে-মননে বিচলিত করেছিল, তাদের মনে জেগেছিল বন্ধনমুক্তির আকাঙ্ক্ষা। তবে কেউ কেউ সরব সক্রিয় হলেও অন্যরা ছিল নীরব নিষ্ক্রিয়। একে প্রগতি নয়, তার বীজ বা অঙ্কুর বলা চলে। মধুসূদনে আমরা এই অঙ্কুরই দেখেছি।

রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায়ে (১৮২৭-৮৭) জেগেছিল স্বধর্মীর জাতীয়তা-চেতনাজাত স্বদেশপ্রেম। ইংরেজী না জানা কবি বিহারীলাল চক্রবর্তীর (১৮৩৫-৯৪) কাব্যে প্রকটিত হয়েছে নব যুগের কবির ঐহিক জীবনের গুরুত্ব ও মহিমা চেতনা, মর্ত্যপ্রীতি, সৌন্দর্য-পিপাসা, প্রেমতৃষ্ণা। পরিণামে মরমী সুলভ জগৎ-জীবনরহস্য-চেতনারূপে প্রবল হলেও, তাঁর 'সাধের আসন' কাব্যে প্রিয়া ও পৃথিবী, ভূমি ও ভূমা একাকার হয়ে গেলেও তাঁকে ইহজীবনবাদী বলে চিহ্নিত করা চলে। এদিক দিয়ে তাঁর ছিল সংস্কারমুক্ত মন, নতুনের আকর্ষণ এবং তাতে ছিল নবজীবনবোধের আভাস। একেও প্রগতিমনস্কতা বলে অভিহিত করতে হবে।

হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় (১৮৩৮-১৯০৩) ও নবীনচন্দ্র সেন (১৮৪৭-১৯০৯) ব্রিটিশ ভারতে আধুনিক য়ুরোপীয় আদলে হিন্দুজাতি গঠনে প্রেরণাদান লক্ষ্যেই মুখ্যত কলম ধরেছিলেন। এদিক দিয়ে তাঁদের কাব্য নিতান্ত সংকীর্ণচেতনার সাধারণ অভিব্যক্তিমাত্র। নবীনসেনে অবশ্য প্রতীচ্য মানবিকতার ছোঁয়াও লেগেছিল।

১৮৫২ থেকে ১৮৮০ সন অবধি সমাজ-সংস্কার লক্ষ্যে মৌলিক নাটক-প্রহসন রচিত হতে থাকে। য়ুরোপীয় প্রভাবে কোলকাতার শিক্ষিত সমাজে বিশেষত ব্রাহ্মণ্য সমাজে নারীর ও নারীত্বের প্রতি শ্রদ্ধা জাগে। তাই ঘরে-সংসারে সমাজে-শাস্ত্রে নারীর বন্ধন-পীড়নমুক্তি এবং ঘরে-সমাজে, নারীর মর্যাদা ও প্রতিষ্ঠা লক্ষ্যে নাবালিকা বিবাহ, বহু বিবাহ, বিধবা বিবাহ, আভিজাত্যের বা কৌলীন্যের বিড়ম্বনা, জমিদার-মহাজনের, ধনীর চারিত্রিক অবক্ষয়, শিক্ষিতদের 'মদ-মাগ' আসক্তি প্রভৃতি বিষয়ে প্রায় তিনশ'র মতো অধুনালুপ্ত ও প্রাপ্ত নাটক-প্রহসন (প্রহসনের সংখ্যাই বেশী) রচিত হয়। রামনারায়ণ তর্করত্ন (১৮২২-৮৬) দীনবন্ধু মিত্র (১৮২৯-৭৪) মাইকেল মধুসূদন প্রমুখ অনেকেই সমাজেরও নীতি-নিয়ম সংস্কারে পক্ষপাতী ছিলেন বলে এঁদের নাট্যান্দোলনকে প্রগতিশীল আন্দোলন নামে চিহ্নিত করতেই হবে। দ্বিজেন্দ্রলাল রায় (১৮৬৩-১৯১৩), গিরিশচন্দ্র ঘোষ (১৮৪৪-১৯১২), অমৃতলাল বসু প্রমুখ নাট্যকার হিসেবেই দক্ষ, তাঁরা বক্তব্যে যুগন্তকারী নন—যুগ স্রষ্টা। এ সূত্রে সুরেন্দ্র নাথ মজুমদারের (১৮৩৮-৭৮) মহিলা-কাব্যও স্মর্তব্য।

ভূদেব মুখোপাধ্যায় (১৯২৫-৯৪) রাধাকান্তদেব (১৭৮৪-১৮৬৭) রামকৃষ্ণ (১৮৩-৮৬) বঙ্কিমচন্দ্র, বিবেকানন্দ (১৮৬২-১৯০২) প্রমুখেরা মতোই প্রতীচ্য শিক্ষার ও জ্ঞানের অনুরাগী কিন্তু সনাতন ব্রাহ্মণ্য শাস্ত্রের আচরণ এবং রীতি-নীতি ঈষ্য সংশোধিত রূপে সংরক্ষণ প্রয়াসী ছিলেন।

১০.

উনিশ শতকের তিন অনন্য ব্যক্তিত্ব আজো হিন্দু সমাজের চোখে তিনটে বাতিঘরের কিংবা তিনটে সুউচ্চ মিনারের মতো সদা প্রতিভাত রয়েছে—রামমোহন, বিদ্যাসাগর ও বঙ্কিমচন্দ্র (১৮৩৮-৯৪)। বঙ্কিমচন্দ্র আবাল্য মুক্তিবুদ্ধির জিজ্ঞাসু বিচারশীল যুক্তিপ্রবণ ব্যক্তি ছিলেন। প্রায় চল্লিশ বছর বয়স অবধি তিনি ছিলেন নাস্তিক ও মোহমুক্ত। তাঁর পরিচ্ছন্ন জীবনদৃষ্টির, জগৎচেতনার, প্রতিবেশজ্ঞানের-উন্নত রস-রুচিবোধের ও তীক্ষ্ম বুদ্ধির স্বাক্ষর রয়েছে লোকরহস্যে ও কমলাকান্তের দপ্তরে এবং অনেকগুলো দেশ ও মানুষসম্বন্ধীয় বিবিধ প্রবন্ধে। উত্তরচল্লিশে জীবনের প্রান্তপর্বে একাধিক (হাঁপানি-বহুমূত্র) রোগগ্রস্ত অপুত্রক, পারিবারিক জীবনে অস্বস্থ উদ্বিগ্ন, ভগ্নস্বাস্থ্য বঙ্কিমচন্দ্র হিন্দুর ও হিন্দুয়ানীর সেবায় মন ও মনন নিয়োগ করে স্বস্তি ও তৃপ্তি খুঁজেছেন। উপন্যাসে তিনি বারো থেকে উনিশ শতক অবধি বাঙলার একটা ঐতিহাসিক, রাজনীতিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক অবস্থার রূপরেখা অঙ্কিত করতে চেয়েছিলেন নিষ্ঠার সঙ্গেই। তাই তিনি মৃণালিনীতে, দেবীচৌধুরানীতে, আনন্দমঠে, সীতারামেও পরিণামে হিন্দুর পরিহার, পলায়ন, ও পরাজয়ই দেখিয়েছেন, হতোদ্যম করেছেন হিন্দুদের। রাজসিংহও বিবর্তিত হয়ে মোবারক-জেবন্নিসার অনুপম আলেখ্য হয়ে স্থিতি পেয়েছে।[২২] দেশ-কাল-জীবন-মানুষ ও জগৎ সম্বন্ধে বঙ্কিমের দার্শনিক চেতনার মান, মাত্রা ও মাপ ছিল সুউচ্চ। এতো বিস্তৃত পরিসরে জগৎ, জীবন, সমাজ ও মানুষ বাঙলাদেশের উনিশ শতকে ও বিশ শতরেক প্রথম পাদ

অবধি—রামমোহন-রবীন্দ্রনাথকে স্মরণে রেখেও বলা চলে—আর কারো উপলব্ধিগত হয় নি।২৩

বঙ্কিমচন্দ্রের অনন্য অসামান্য মনীষা মনস্বিতা অবশ্যই স্বীকার্য। বঙ্কিমচন্দ্র সাম্যের প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করেছেন, কিন্তু তেইশ বছর পরে জন্মেও, রাশিয়া দেখেও এবং ১৯৪১ সন অবধি বেঁচে থেকেও রবীন্দ্রনাথ এ তত্ত্ব বরণ করতে পারেননি। বঙ্কিমচন্দ্র স্বদেশের স্বাধীনতার গুরুত্ব বুঝতেন, স্বাধীনতার স্বপ্নও জেগেছিল তাঁর মনেই, দেশকে মা বলে জেনেছেন প্রথম তিনিই। মাতৃমূর্তিতে প্রত্যক্ষ করেছিলেন মাতৃভূমিকে। স্বাধীনতার স্বাপ্নিকের অঙ্কিত দেশমাতা বাঙলা-বিহার-উড়িষ্যার সাতকোটি অধিবাসী হিন্দু-মুসলিম-বৌদ্ধ-জৈন-খ্রীষ্টান সন্তানের মাতা।

উচ্চশিক্ষিত ঔপন্যাসিক রমেশচন্দ্র দত্ত (১৮৪৭-১৯০৯) ও নাট্যকার দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ে (১৮৬৩-১৯১৩) স্বজাতিপ্রীতি প্রবল হলেও বিধর্মী প্রতিবেশীর প্রতি সহিষ্ণুতা ও কিঞ্চিৎ উদারতা প্রতীচ্য শিক্ষালব্ধ সংস্কৃতিবানতার প্রসূন।

সাতচল্লিশ বছর অবধি (১৯০৮ সন অবধি) রবীন্দ্রনাথ (১৮৬১-১৯৪১) দেশ কাল সমাজ সরকার শাস্ত্র সংস্কৃতি সম্পৃক্ত চিন্তা-চেতনায় ছিলেন ভারতীয় হিন্দুব্রাহ্ম। প্রাচীন আর্য ভারত আর্যাবর্ত ব্রহ্মাবর্ত ব্রাহ্মণ্য শাস্ত্র পুরাণ ও বৌদ্ধ-জৈন ঐতিহ্য (রাজপুত মারাঠা শিখ ইতিবৃত্ত) তাঁর মানস বিহারের ও মানস নিবাসের বাঞ্ছিত ক্ষেত্র। রবীন্দ্রচিন্তা-চেতনার স্ফুরণ ঘটেছে প্রাচীন ভারতকে ও উনিশ শতকের য়ুরোপকে তথা ইংলণ্ডকে অবলম্বন করেই। ১৯০৫ সনের সেপ্টেম্বরে শুরু বঙ্গভঙ্গরদ আন্দোলনে আকর্ষণ হারিয়ে রবীন্দ্রনাথ ১৯০৮ সনে বিশ্বনাগরিক চেতনার দিকে ঝুঁকে পড়েন। পাঁচ বছর পরে (১৯১৩ সনে) নোবেল পুরস্কার পেয়ে তিনি বিশ্ববন্দ্য কবির খ্যাতি ও মর্যাদা লাভ করেন। আন্দোলনে কিংবা সন্ত্রাসে বিশ্বেপরিব্যাপ্ত সাম্রাজ্যশাসক ব্রিটিশকে বিতাড়ন সম্ভব বলে তিনি মনে করতেন না।[২৩] এজন্যে তিনি কখনো স্বাধীনতার স্বপ্নও দেখেননি, তিনি চাইতেন আপোসে বোঝা-পড়ার ভিত্তিতে শাসক-শাসিতের সহাবস্থান, এক কথায় তিনি সুশাসন সুপোষণ চাইতেন, স্বদেশীর স্বশাসন কামনা করতেন না। জমিদারীর ক্ষেত্রেও তিনি ন্যায্য দেনা-পাওয়ার সম্পর্কে আস্থা রাখতেন ও আশ্বস্ত থাকতেন। এ জন্যেই ঘরে বাইরেও চারঅধ্যায় উপন্যাসে কিংবা কালের যাত্রা (বা রথের রশি) নাটিকায় রাজনীতিকদের নিন্দিত করেছেন। রক্তকরবী, অচলায়তন, মুক্তধারা, তাসের দেশ কিংবা প্রায়শ্চিত্ত সহজেই হতে পারত গণ-আন্দোলন উদ্দীপক নাটক। বিপ্লব বিরোধী বলেই তিনি মহৎকথার ও গুঢ়চেতনার প্রলেপে সেগুলোকে নির্বিষ সর্পের মতো নিষ্ফল-নির্লক্ষ্য করে সমাপ্তি দান করেছেন। অমনোযোগী পাঠকেরও এ তথ্য দৃষ্টি এড়ান না যে রবীন্দ্র মনে-মানসে সামন্তসুলভ আভিজাত্য গর্ব ও অভিজাত-সুলভ বিলাস ও আড়ম্বরপ্রিয়তা ছিল। দেবতা-রাজরানী-জমিদার-অভিজাতরাই তাঁর রূপক-সাংকেতিক রচনার অবলম্বন। তাঁর গল্প উপন্যাস নাটকেও নেই মুখ্য-চরিত্র রূপে মজুর-গৃহস্থদের কেউ। জনসাধারণের মতো রবীন্দ্রনাথেরও ধারণা ছিল সাধু সন্ন্যাসী ভিক্ষুব্রতচারী শ্রমণ শ্রাবক না হলে কেউ পরোপকারী নির্ভরযোগ্য সৎ ও সেবক মানুষ হয় না। তাঁরও আদর্শ মহৎ মানুষ তাই বৈরাগী-বিরাগী। নিরাকার ব্রহ্মবাদী রবীন্দ্রনাথের সৃষ্টি-সহায় কল্পসহচর ছিলেন পৌত্তলিকদের দেবতারা। য়ূরোপে নেই, সাহিত্যে তেমন কোন ভাব, চিন্তা, বিষয়ক, শাখা, আঙ্গিক রবীন্দ্রনাথের মৌল সৃষ্টি বা আবিষ্কাররূপে যদিও পাইনে, তবু রবীন্দ্রনাথের অনন্য অসামান্য সৃষ্টিশক্তি এবং আত্মীকরণ, সামর্থ্য আমাদের বিস্মিত করে। য়ূরোপে বিভিন্ন দেশে ও কালে শেক্সপীয়ার, গ্যয়টে, টলস্টয়, দস্তয়ভস্কি প্রমুখ অনেকেই

আরো উঁচুমানের ও মহত্তর চেতনার ব্যক্তিত্ব ছিলেন বটে, কিন্তু রবীন্দ্রনাথের মতো সাহিত্যে এমন সর্বত্রগামী, সর্বব্যাপী সর্বাত্মক চেতনার বিচিত্র অভিব্যক্তিদানের বহুমুখী শক্তি ও দক্ষতা অন্যদের মধ্যে দেখা যায়নি। তা সত্ত্বেও রবীন্দ্রনাথ সামন্ত-বুর্জোয়া-বেণে মেজাজের একজন ভাববাদী উদার মানবিকতার সমর্থক ও প্রচারক হিন্দুব্রাহ্ম কবিই থাকতেন, কিন্তু রবীন্দ্রনাথ তাঁর সৃজনশীল সুদীর্ঘ জীবনের পরিপক্ব পরিণত মনীষার শেষ বত্রিশ (পুরস্কারোত্তর আটাশ) বছরকাল যাবৎ তাঁর ভাব-চিন্তা-কর্ম-আচরণে বৈশ্বিকচেতনা অনুশীলনের, লালনের ও বিকাশ-বিস্তারের সুযোগ পেয়ে প্রথম বিশ্বশ্রুত ও বিশ্ববন্দ্য কবি-মনীষীর মর্যাদা পেয়েছিলেন। ফলে তাঁর প্রথম সাতচল্লিশ বছর বয়স অবধি গড়া চিন্তা-চেতনার সংকীর্ণ বিশ্বচেতনার ঔজ্জ্বল্যের ও বিপুলতার আড়ালে ঢাকা পড়ে যায়। এ বৈশ্বিক চেতনা তাঁকে মানবিকতাবাদী ও মানবতার অনুশীলনে উৎসাহিত কিংবা নির্বিশেষ মানুষের শান্তি-স্বস্তি-কল্যাণকামী করে বটে, কিন্তু গনমানুষের মৌলমানব অধিকার স্বীকারে অনুপ্রাণিত করে না। সব ভাববাদীই মানুষকে কৃপায় করুণায় দানে দাক্ষিণ্যে কেবল কৃতজ্ঞ রাখতে চায়, চায় অনুগৃহীত রাখতে পুণ্য অর্জনের ও আত্মতৃপ্তি অনুভবের আনন্দ লোভে। অতএব, রবীন্দ্রনাথও নির্লক্ষ্য শ্রেয়োবাদী মাত্র। তবু তিনি উনিশ-বিশ শতকের ভারতের সর্বশ্রেষ্ঠ এবং পৃথিবীর একজন শ্রেষ্ঠ সাহিত্যস্রষ্টা মনীষী মনস্বী। কিন্তু আমাদের সংজ্ঞানুযায়ী তিনি প্রগতিবাদী হলেও প্রগতিশীল কি! স্মর্তব্য যে অসামান্য-অমিত শক্তিমান কবি-মনীষী হলেও রবীন্দ্রনাথও দুনিয়ার অন্যসব কবির মতোই রক্ত-মাংসের মানুষ হিসেবে দোষ-ত্রুটিমুক্ত ছিলেন না।

উঁচুমানের তীক্ষ্ণ নৈয়ায়িক মুক্তবুদ্ধির ও অতিপরিশীলিত রুচি সংস্কৃতির ধারক ছিলেন উদার বুর্জোয়া প্রথম চৌধুরী (১৮৭১-১৯৪৬)। সাহিত্যে চলতি রীতির প্রবর্তন-প্রচলনই তাঁর প্রগতিশীলতার সাক্ষ্য। শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় (১৮৭৬-১৯৩৭) অন্তরে ছিলেন রক্ষণশীল। ফাঁকে ফুকুরে ক্বচিৎ কখন শাস্ত্র-চিন্তা-কর্মে-আবরণে সমাজ বিরোধী দু'চারটে কথা অসতর্ক মুহূর্তে উচ্চারিত হলেও শরৎচন্দ্র কখনো শাস্ত্রের বেড়া এবং সমাজের নীতিনিয়ম ভাঙতে এমনকি মেরামত করতেও চাননি। তাঁর লক্ষ্যই ছিল, যৌবনবতী বিড়ম্বিতা নারীর হয়ে সমাজের কৃপা ও করুণা যাঞ্চা করা মাত্র। এ সংবেদনশীলতার লক্ষণ, প্রগতি বাঞ্ছার নয়। তার ছিল করুণাগলিত বেদনাকাতর হৃদয়।

ডক্টর নরেশ সেনগুপ্ত (১৮৮২-১৯৬৪) সাহিত্যে বাস্তবতা ও নিঃসংকোচ যৌনজীবন-কথা প্রচারে ছিলেন অগ্রণী। বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় (১৮৯৮-১৯৫০) উনিশ-বিশব্যাপী শত বছরের পল্লী মানুষের ও পল্লী প্রকৃতির নিষ্ঠ, সংবেদনশীল নিপুণ চিত্রী কিন্তু মুক্তচিন্তক নন। তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় (১৮৯৮-১৯৭১) সামন্ত যুগের অবসানে এবং সামন্ত পরিবারের অবক্ষয়ে বেদনাকাতর।

অস্থির দুরন্ত দুর্মদ নজরুল ইসলাম (১৮৯৯-১৯৭৭) কোন আদর্শের, লক্ষ্যের ও সংকল্পের বাঁধন স্বীকার করেন নি। তিনি ছিলেন যখন যেমন তখন তেমন হওয়ার ও চলার লোক। তাঁর অন্তরের গভীরে ছিল আভিজাত্য ও আড়ম্বর চেতনা। দু'টো সাক্ষ্য স্মরণ করছি এখানে। আলি আকবরের নামে প্রচারিত তাঁর বিষয়ে কনে পক্ষের নিমন্ত্রণ পত্রটি ছিল তাঁরই রচিত। তাঁর খ্যাতি ও প্রতিভা বিষয়ে যে-সব বিশেষণ এবং তাঁর পরিবারের আভিজাত্য সম্বন্ধে যে-সব অতিশয়োক্তি রয়েছে, তা কোন কাণ্ডজ্ঞান সম্পন্ন ব্যক্তি উচ্চারণ করতে তো বটেই, লিখতেও সংকোচবোধ করত। অন্য প্রমাণটি এই চিরদরিদ্র ও চিরবঞ্চিত নজরুল যখন মোটা অঙ্কের অর্থাগমের আভাস ও আশ্বাস পেলেন তখনই ভাড়া করলেন অট্টালিকা, কিনলেন গাড়ী, রাখলেন

হিন্দুস্তানী দ্বারবান, আর গৃহভৃত্য ভৃত্যা-তো ছিলই। এ ঋণ-নবাবীই বা সাম্যবাদী স্বাধীনতা সংগামী কবির কোন্ পরিচয় বহন করে! নজরুল কখনো কম্যুনিস্ট, কখনো কংগ্রেসী নিয়মতান্ত্রিক, কখনো সন্ত্রাস সমর্থক, কখনো ভারতীয় জাতীয়তাবাদী, কখনো বিশ্বমুসলিম ভ্রাতৃত্বে ও জাতীয়তায় আস্থাবান, কখনো ভূত প্রেত দেও দানু মন্ত্র মাদুলী নির্ভর কুসংস্কারদুষ্ট ভীরু মানুষ, কখনো বা একান্ত মুমীন, কখনো আবার উদার হরকালীভক্ত। বৈনাশিকশক্তির হোতা রণ-রক্ত-অগ্নি-ঝড়-বন্যা-মহামারী প্রিয় এ দ্রোহী সংগামী কবি বাঙলার আকাশে বাতাসে সংগ্রামী প্রেরণার প্রবর্তনার উত্তেজনার উদ্দীপনার তীব্র সফল ঝড় বইয়ে দিয়েছিলেন। যুগান্তরের ধ্বজাবাহী শোষণ মুক্তি ও সাম্যকামী এ মানুষ কি অন্তরেও প্রগতিপন্থী! তবু বাঙলা-বিমুখ মুসলমানেরা নজরুল সাহিত্যে অনুরাগবশেই দ্বিধামুক্ত হয়ে বাঙলাকে মাতৃভাষারূপে বরণ করে।

১১.

প্রথম মহাযুদ্ধোত্তর কালে বাঙলার মুসলিম সমাজে উচ্চশিক্ষিত লোকের সংখ্যা দ্রুত বৃদ্ধি পেতে থাকে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক সৈয়দ আবুল হোসেন উদ্যোগী হয়ে কবি আবদুল কাদির প্রভৃতি কয়েকজন ছাত্র নিয়ে মুসলিম সাহিত্য সমাজ নামে এক প্রতিষ্ঠান গঠন করেন ১৯২৬ সনে। অচিরে কাজী আবদুল ওদুদ, কাজী মোতাহার হোসেন, কাজী আনোয়ারুল কাদির এ প্রতিষ্ঠানে কর্মসংসদের সদস্য হন। সমিতি গঠন লক্ষ্যে অনুষ্ঠিত প্রথম সভায় সভাপতিত্ব করেন (ডক্টর) মুহাম্মদ শহীদুল্লাহ। সমাজের মুখপত্র ছিল 'শিখা'। শিখার শিরে সমাজের motto রূপে মুদ্রিত হয় 'জ্ঞান যেখানে সীমাবদ্ধ, বুদ্ধি সেখানে আড়ষ্ট, মুক্তি সেখানে অসম্ভব'। অতএব বুদ্ধির জ্ঞানজ-মুক্তিই ছিল সমাজের লক্ষ্য। অজ্ঞ অনক্ষর পিছিয়ে-পড়া দরিদ্র মুসলিম সমাজকে শিক্ষায় শাস্ত্রে চিন্তায় চেতনার সমকালীন করে তোলার লক্ষ্যেই সমাজের মুখপত্র শিখা-আশ্রয়ী শাস্ত্র ও সমাজ সংস্কার আন্দোলন লেখার মাধ্যমে রামমোহনী কায়দায় আরম্ভ করেন তাঁরা—শত বছর আগেকার রামমোহনের ব্যক্তিত্বে চিন্তা-ধারায় ও আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়েই। এ আন্দোলনের উদ্যোক্তাদের স্বঘোষিত নাম 'বুদ্ধির মুক্তি আন্দোলন'। বাঙালী মুসলিমদের মধ্যযুগীয় অযৌক্তিক বিশ্বাস-সংস্কার থেকে মুক্ত করার, যুক্তিবাদী প্রগতিশীল করার লক্ষ্যে তাঁদের রচনাগুলো ছিল নিবেদিত।

প্রথম মহাযুদ্ধোত্তর ভারতে তথা বাঙলায় খেলাফত ও রাজনীতিক মন্টেগু-চেমসফোর্ড রিফরমস্ বিষয়ক দাবি প্রভৃতি নিয়ে হিন্দু-মুসলমান সবাই তখন ক্ষুব্ধ ও আন্দোলনমুখর। তবু মুসলিম সমাজে তখনো শহুরে শিক্ষিত লোকের অভাবে তাদের বাণীর ও প্রচারের প্রত্যাশিত প্রভাব পড়েনি। পরেও মার্কসীয় চিন্তাধারার প্রসারের ফলে অতিক্রান্ত কালে জীবনজীবিকা সম্পৃক্ত শ্রেয়োবোধও জীবন-সমাজ-শাস্ত্র-সরকার ও চেতনা পালটে যাওয়ায় তাঁদের বাণী অকেজো হয়ে গেল।

লেখা দেখে মনে হয় আবুল হোসেন নাস্তিক্যঘেঁষা সংশয়বাদী ছিলেন। কিন্তু চিন্তায় পরিচ্ছন্ন, বক্তব্যে ঋজু, ভাষায় পুষ্ট, ভঙ্গিতে দক্ষ কাজী আবদুল ওদুদই ইসলামনিষ্ঠ সংস্কারক মাত্র ছিলেন। শুরু আবুল হোসেনে হলেও নেতৃত্ব ছিল মনীষার শ্রেষ্ঠ কাজী আবদুল ওদুদের। কাজেই বাঙলায় কম্যুনিজমের ও কম্যুনিস্টের উন্মেষ হওয়ার ফলে তাঁরা প্রগতির ও প্রাগ্রসর চিন্তা-চেতনার দাবিদার হতে পারেন না। যদিও মুসলিম সমাজ-প্রতিবেশে তাঁরা প্রগতিবাদী ও প্রগতিশীল অবশ্যই। তাঁদের ও তাঁদের স্বকালের 'সওগাত' পত্রিকার ভূমিকা ছিল অভিন্ন।

দুটোতেই আত্মোন্নয়ন স্পৃহা যুগিয়েছিল প্রতীচ্য শিক্ষা ও হিন্দুর উন্নতি। তবু তাঁরা মূলত সংস্কারকই।

মানসিক ও ব্যবহারিক জীবনে অতীতের সর্বপ্রকার বন্ধন—শাস্ত্রের, সমাজের, রাষ্ট্রের, নৈতিকতার, ন্যায়বোধের, শ্রেয়োচেতনার, নিয়তিবাদের, দেও-দানু-দেবতার এবং আত্মার পারলৌকিক বন্ধন ছিন্ন করে দিয়ে সংস্কারমুক্ত ঐহিক জীবনে আস্থাবান, জিজ্ঞাসু দ্রোহী ও যুক্তিবাদী এবং স্বাধিকারে সমস্বার্থে সহিষ্ণুতায় সহযোগিতায় সহাবস্থানের অঙ্গীকারবদ্ধ নতুন চেতনার নতুন মানুষ হলেন মার্কসবাদীরা। এই প্রথম অতীতবিরহী বর্তমানে স্থিত নাস্তিক মানুষ সৃষ্টি হচ্ছিল ১৯২১ সন থেকে। মার্কসবাদ প্রগতিবাহন। মার্কসীয় তত্ত্বানুগ আর্থিক-সামাজিক-নৈতিক জীবন চর্চাই প্রগতিশীলতা। সারা বিশ্বে মার্কসীয় চিন্তা-চেতনা ধারাই বিশুদ্ধ প্রগতির ও প্রাগ্রসর চিন্তার আকর বলেই সমাজ পরিবর্তনকামীরা জানে ও মানে।

১৯৩০ সনের পর থেকেই শিল্পোত্তীর্ণ মার্কসীয় সাহিত্য রচিত হচ্ছে। বহু বহু সাহিত্যিকের মধ্যে প্রথম দিককার কবি সুভাষ মুখোপাধ্যায়, সুকান্ত ভট্টাচার্য, বিষ্ণু দে, গল্প উপন্যাস লেখক শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়, গোপাল হালদা, মানিক বন্দ্যোপাধায়, মহাশ্বেতা দেবী জনপ্রিয় স্রষ্টা। মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় (১৯০৮-৫৬) মার্কসীয় ফ্রয়েডীয় এবং চিন্তাপ্রবাহ তত্ত্বভিত্তিক রচনার ক্ষেত্রে যুগস্রষ্টা। আমাদের এদিকে তরুণ আলাউদ্দীন আল আজাদের 'জেগে আছি', 'ধানকন্যা' গ্রন্থ দিয়ে এ সাহিত্যের শুরু, সত্যেন সেনের উপন্যাসে এ তত্ত্বের সার্থক রূপায়ণ ঘটেছে এবং অসংখ্য কবি লেখকের পরিচর্যায় দু'বঙ্গেই এ সাহিত্যে ঋদ্ধ। ১৯৩৬ সনে প্রগতি-লেখক সঙ্ঘ ভারতীয় গণনাট্য আন্দোলন শুরু করে। আর ১৯৪৩ সনে বাঙলায় গণনাট্য সঙ্ঘ প্রতিষ্ঠিত হয়। বিজন ভট্টাচার্যের নবান্ন প্রভৃতির, তুলসী লাহিড়ীর ছেঁড়াতার, দুঃখীর ইমান প্রভৃতির এবং একালে মনোরঞ্জন বিশ্বাস প্রমুখের ঢাকার ইন্দু সাহা, সেলিম আলদীন, মামুনুর রশিদ প্রমুখের রচনার মাধ্যমে গণনাট্য আন্দোলনের প্রসার। এবং জ্যোতিরিন্দ্র মৈত্র, সলিল চৌধুরী, হেমাঙ্গ বিশ্বাস প্রমুখের গণসঙ্গীত আন্দোলনও এ সূত্রে স্মর্তব্য। এদেশে কম্যুনিস্টরাই গণসাহিত্যের, গণনাটকের ও গণসঙ্গীতের স্রষ্টা।

তবে মার্কসবাদের প্রসার এদেশে আশানুরূপ হচ্ছে না। এর কারণ বোধ হয় আমাদের কম্যুনিস্টরা বড় মাত্রায় কেতাবনিষ্ঠ ও ব্যক্তিত্ব পূজারী হয়ে পড়েছেন, তাঁদের রক্ষণশীল, বন্ধ্যা ও গতানুগতিক অনুশীলনে নতুন চিন্তা-চেতনার চমক নেই, মত-পথ-পদ্ধতির উৎকর্ষ নেই, স্থানের কালের দাবি অনুযায়ী কর্মপন্থা নিরূপণের নির্দ্বিধ সামর্থ্য নেই, আন্তর্জাতিকতার গুরুত্ব কমে গেলেও তারা পরমুখাপেক্ষী। এমনি গতানুগতিক বক্তব্যে ও চিত্রে মার্কসীয় সাহিত্য আকর্ষণ হারাবে, বিপ্লবও আশু সংগঠিত না হলে মার্কসীয় তত্ত্বালোচনাও হারাবে জনপ্রিয়তা। কারণ এমনি রচনায় বক্তব্যের, কাহিনীর ও বর্ণনার, অনুভূতির ও অভিব্যক্তির পুনরাবৃত্তিই ঘটবে কবিতায়, গল্পে, উপন্যাসে, নাটকে ও প্রবন্ধে। উল্লেখ্য যে মার্কসবাদীরা শ্রেণীদ্বন্দ্বের উপস্থাপনার সংগ্রাম প্রবণতার বা প্রতিকারের উপায় নির্দেশনার আলোকেই সাহিত্যে প্রগতিশীলতা নিরূপণ করে।

এবার আর একটি গুরুত্বপূর্ণ সাহিত্য আন্দোলনের কথা বলে আমাদের আলোচনা শেষ করব। একেত মার্কসবাদ এদেশে চালু হওয়ার পরে অন্যদের বিশ্বাস-সংস্কারে, ভাব-চিন্তা-কর্মে-আচরণে উৎকর্ষ, পরিবর্তন কিংবা সংশোধন বা নতুনতর ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ সাধিত হলেও তা হবে চিরকেলে মৌল চেতনা বা স্বীকৃত নীতিদর্শন ভিত্তি করেই। কাজেই তা হবে অতীতাশ্রয়ী ও ঐতিহ্যানুগ মেরামত বা যুগোপযোগী ঢক-ঢৌল বদলানো মাত্র। কেননা তাতে

আমূল পরিবর্তন কিংবা অঙ্গীকৃত বিশ্বাসের শেকড় উৎপাটন সম্ভব হবে না। এ জন্যেই অন্য যে-কোন নতুন আন্দোলন নতুন চেতনা ও নতুন জীবন দৃষ্টিজাত হলেও তাকে আমাদের নিরূপিত সংজ্ঞানুসারে নির্ভেজাল প্রগতির লক্ষণ কিংবা যুগান্তকর প্রাগ্রসর চিন্তা-চেতনা, জিজ্ঞাসা বা দ্রোহ বলা যাবে না। যদিও চিন্তা-চেতনার সূক্ষ্মতায়, প্রসারে, উজ্জ্বল্যে বৈচিত্র্যে তা মনোজগতের দিগন্ত করবে সদাবিস্তৃত, রস-রুচি-অনুভবে আনবে ক্রম-উৎকর্ষ, যোগ করতে থাকেব নতুন মাত্রা। যেহেতু একজন সনাতনপন্থী রক্ষণশীল নিজেকে ঐতিহ্যপ্রিয় এবং চালু নীতি-নিয়ম-আচার-আদর্শনিষ্ঠ সজ্জন সুজন বলে জানেন, যেহেতু তাঁর দার্শনিক-মরমী-আধ্যাত্মিক-আস্তিক্য চিন্তা-চেতনা সূক্ষ্মতায় গভীরতায় ও ব্যাপকতায় ঋদ্ধ হলেও এবং তাঁদের রচনা রসে রূপে শিল্পসুষমায় উৎকর্ষ পেলেও তা প্রগতিশীলতা হবে না। পুরোনো বোঝা বর্জন প্রগতির প্রথম শর্ত, দ্বিতীয় শর্ত শ্রেয়োবুদ্ধি প্রয়োগে কল্যাণকর নতুন ভাব-চিন্তা-কর্ম-আচরণ বরণ।

১৯১০ সনের পর থেকে প্যারিসে বার্লিনে লণ্ডনে সাহিত্যে নতুন জীবন চেতনা ও জগৎ-দৃষ্টি আভাসিত হচ্ছিল। যুদ্ধত্তোর কালে তা পল্লবিত ও প্রসারিত হয়ে বাঙালীদেরও প্রভাবিত করতে থাকে ১৯২০ সনের পর থেকে। বলেছি সাহিত্যে বাস্তবতার নিঃসঙ্কোচ উপস্থাপনার শুরু নরেশচন্দ্র সেনগুপ্তকে দিয়েই, এঁর রচনায় মার্কসবাদের পরোক্ষ প্রভাবও মেলে। রবীন্দ্র সাহিত্য-বিরোধী একটা দল গড়ে উঠছিল (দেশবন্ধু) চিত্তরঞ্জন দাশ (১৮৭০-১৯২৫) সম্পাদিত ও বিপিন চন্দ্র পাল (১৮৫৭-১৯৩২) প্রভাবিত 'নারায়ণ' (১৯১৩) পত্রিকায়। নরেশচন্দ্র সেনগুপ্ত-প্রভাবিত তরুণ কয়েক জন লেখক ১৯২৩ সনে বের করলেন কল্লোল, ১৯২৬ সনে বের হল কালি-কলম এবং ১৯২৭ সনে ঢাকায় 'প্রগতি পত্রিকা'। এই তিন পত্রিকাই কারণে অকারণে রবীন্দ্র-প্রভাবমুক্তির সংগ্রামে অবতীর্ণ হল পুরোনো রস-রুচির ও নীতির ধারা-ধরন পরিহার করে। 'সম্মুখে থাকুন বসে পথ রুধি রবীন্দ্র ঠাকুর। আপন চক্ষের থেকে জ্বলিবে যে তীব্র তীক্ষ্ণ আলো। যুগসূর্য ম্লান তার কাছে। মোর পথ এ নহে, দূর'। (অচিন্ত্য কুমার সেনগুপ্ত। কল্লোল, কার্তিক ১৩৩৬, সুকুমার সেন, পৃ: ২৫৫)

পুরোনো দৃষ্টিতে এরা বাস্তবতার নামে অশ্লীলতা, নতুন বিষয়েরও ভাষা-ভঙ্গির প্রয়োগের নামে উচ্ছৃঙ্খল অরুচিকর বর্ণনার ও বক্তব্যের উপস্থাপন, অশ্লীল শব্দের ব্যবহার প্রভৃতি যোগে রবীন্দ্রপন্থীদের উত্তেজিত করতে থাকেন। এঁদেরই অভিহিত করা হয় ১৩৩০-উত্তর কবি সাহিত্যিক। এঁদের কারো কারো প্রথম প্রকাশিত গ্রন্থ অশ্লীলতার অভিযোগে বাজেয়াপ্ত হয়েছিল। অচিন্ত্যকুমার, বদ্ধদের বসু, প্রেমেন্দ্র মিত্র, শৈলজানন্দ, সজনীকান্ত দাস, মোহিতলাল মজুমদার প্রমুখ অনেকেই রবীন্দ্রপ্রভাব-মুক্তির সাধনা করেছেন। কবিতার ক্ষেত্রে প্রখ্যাত ও প্রতিষ্ঠিত তিরিশের কবিদের মধ্যে জীবনানন্দ দাশ (১৮৯৯-১৯৫৪), সুধীন্দ্রনাথ দত্ত (১৯০১-৬১), অমিয় চক্রবর্তী (১৯০১-৮৬), বদ্ধদেব বসু (১৯০৮-৭৭) প্রমুখের রচনায় দেশ কাল মানুষ ও সমাজচেতনা প্রবল ও প্রত্যক্ষ নয়। এমনকি পরাধীনদেশের এসব কবি-গাল্পিক-ঔপন্যাসিকের রচনায় স্বাধীনতার কামনা ও প্রয়াস কখনো অভিব্যক্তি পায়নি। এঁরা অন্তর্মুখী কবি। বিষ্ণু দে [১৯০১-৮৩] বরং গণ-মানবের প্রতি তাঁর দায়িত্ব ক্বচিৎ কখনো পালন করেছেন। এঁরা শক্তিমান জনপ্রিয় কবি, তবে প্রগতি পন্থী কি? অবশ্য এঁদের দিয়ে সাহিত্যশিল্পের উৎকর্য এবং মনমনন-মনীযার বিকাশ সাধিত যে হয়েছে তা অবশ্যই স্বীকার্য। অন্নদা শঙ্কর রায় (১৯০৪) জীবনের ও জীবনাচারের দার্শনিক তত্ত্ব ও তথ্য সন্ধানী মুক্তবুদ্ধি কিন্ত গান্ধীয় শ্রেয়োবাদী মনীষাদীপ্ত সাহিত্যিক।

শক্তিমান তরুণ ও মধ্যবয়সীদের সম্বন্ধে মত প্রকাশ করা, সমীচীন মনে করিনে, সুভাষ মুখোপাধ্যায়, আল মাহ্‌মুদ প্রমুখ অনেকের মতো কে কখন মত-পথ বদলে দলছুট হবেন, তা বলা যায় না।

ইতোমধ্যে দেশভাগ, স্বাধীনতাপ্রাপ্তি, ভাষা আন্দোলন, সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা, মুক্তিযুদ্ধ, রাজনীতিক মত-পথ, লুটপাট, প্রশাসনিক ও আর্থিক বিপর্যয় প্রভৃতি নানা কিছু ঘটে গেছে। তবু বিভিন্ন মত-পথ সাহিত্যক্ষেত্রে, রয়েছে চালু। নাস্তিক্য, আস্তিক্য, প্রগতিশীলতা, প্রতিক্রিয়াশীলতা, রক্ষণশীলতা বর্জন-প্রবণতা, জিজ্ঞাসা, অনাস্থা, দ্রোহ সবকিছুই পাশাপাশি সহাবস্থান করবে বুর্জোয়া সমাজে। প্রগতির প্রাণ হচ্ছে সৃষ্টিশীলতা ও গতি। প্রগতির পথ তাই অশেষ, গতিও নিরন্তর অনিঃশেষ।

তথ্যনির্দেশ

১. বৃহদ্ধর্মপুরাণ ও ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণ, মুকুন্দবান চক্রবর্তীর চণ্ডীমঙ্গল, ভারতচন্দ্র রায়ের 'অন্নদা-মঙ্গল'।
২. বাঙালী ও বাঙলা সাহিত্য : আহমদ শরীফ, ১ম খণ্ড পৃ. ১৪-১৬।
৩. History of Bengal, Vol I. D.U. এবং প্রাচীন বাঙলার অন্যান্য যে-কোন ইতিহাস।
৪. চণ্ডীমঙ্গল পাঁচালী।
৫. ধর্মমঙ্গল পাঁচালী।
৬. ১২০১ থেকে ১২০৪ সনের মধ্যে বলে বিদ্বানদের কারো কারো মত।
৭. মধ্যযুগের ও বাঙলা সাহিত্যে চিন্তা-চেতনার বিবর্তন ধারা, এ গ্রন্থে পৃ. ৪৭-৫৫।
৮. বাঙালী ও বাঙলা সাহিত্য ১ম খণ্ড : আহমদ শরীফ 'শেখ শুভোদয়া' পরিচ্ছেদ। ১ম নং।
৯. ভারতীয় বৌদ্ধ সম্প্রদায়ের ধ্বংস : সতীশচন্দ্র বিদ্যাভূষণ, বাঙালীর ধর্ম ও দর্শনচিন্তা : অসিত কুমার বন্দ্যোপাধ্যায় সম্পাদিত, ১৯৮০ পৃ. ৫৪-৬১।
১০. হাজার বছরের পুরানা বাংলায় বৌদ্ধগান ও দোহা : মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী।
১১. বাউলতত্ত্ব : আহমদ শরীফ/বাংলার বাউল ও বাউল গান। উপেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য/বাঙালী ও বাঙলা সাহিত্য ২য় খণ্ড : পৃ. ৮৭-১১৫
১২. বাঙালীর ইতিহাস : আদিপর্ব : নীহাররঞ্জন রায়।
১৩. মধ্যযুগের বাঙলা ও বাঙালী : সুকুমার সেন।
১৪. বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস : সুকুমার সেন, ১ম/ পূর্বার্ধ ৩য় নং পৃ. ৫৪।
১৫. বাঙালী ও বাঙলা সাহিত্য : আহমদ শরীফ পৃ. ১০৫৪-৫৭।
১৬. বাঙালীর ইতিহাস আদিপর্ব।
১৭. চৈতন্য ভাগবত : বৃন্দাবন দাস।
১৮. শ্রীকৃষ্ণ বিজয় : মালাধরবসু।
১৯. রায়মঙ্গল : কৃষ্ণরাম দাস।
২০. বাঙালী ও বাঙলা সাহিত্য ২য় খণ্ড, পঞ্চদশতম অধ্যায়/পৃ. ৭৯৭-৮২৬।
২১. প্রাগুক্ত : ১ম খণ্ড : ৩৯৬-৪৪১/২য় খণ্ড একদশতম অধ্যায়।
২২. বিস্তৃত ব্যাখ্যার জন্যে 'বঙ্কিমবীক্ষা' প্রত্যয় ও প্রত্যাশা : আহমদ শরীফ, ১৯৭৮, পৃ. ১৮২-২০৫ দ্রষ্টব্য।
২৩. রবীন্দ্রনাথের নিজের উক্তি, দ্রষ্টব্য; রবীন্দ্রনাথ ও বিপ্লবী সমাজ : চিন্মোহন সেহানবীশ, পৃ: ৪১, ১২৪।

আবদুল করিম
সাহিত্যবিশারদ

১৮৭১ — ১৯৫৩

১. দেশ-কাল-সমাজ

১. আবদুল করিম সাহিত্যবিশারদের মন মানসের সম্যক পরিচিতির ও তাঁর সাধনার এবং অবদানের যৌক্তিক মূল্যায়নের জন্যে তাঁর জন্ম ও জীবন পরিসরের স্বদেশ, স্বকাল ও স্বসমাজ প্রতিবেশ সম্বন্ধে আমাদের অন্তত একটা স্থূল ধারণা থাকা আবশ্যিক।

উনিশ শতকের শেষ পাদেই আবদুল করিমের শৈশব-বাল্যের অবসান এবং যৌবনের পরিপূর্ণ বিকাশ ঘটে। প্রাচীন ও মধ্যযুগের ঐতিহ্যধারক ব্রাহ্মণ-কায়স্থ-বৈদ্যশ্রেণীর শিক্ষিত হিন্দুরাও তখন আরো প্রবলভাবে ও বিপুল সংখ্যায় দেশের অর্থ সম্পদ শিক্ষা প্রশাসন প্রভৃতির ধারক ও নিয়ামক। বিদেশী তুর্কী-মুঘল শাসনকালেও এরাই ছিল গাঁয়ে-গঞ্জে-নগরে-বন্দরে বিচার-কার্য ব্যতীত ব্যবসা-বাণিজ্য, রাজকর, প্রশাসন, শিক্ষা, চিকিৎসা, অর্থ-সম্পদ, বিধি-বিধান প্রভৃতির প্রকৃত নিয়ামক ও নিয়ন্ত্রক। চাকলায়, কুশবায়, চৌকিতে, তকসীমে, মহলে, থানায়, বন্দরে ও শহরে অবশ্য সেনানী শাসক-প্রশাসক ছিলেন শাসকগোষ্ঠীর বিদেশাগত বিভাষীরা। এঁরা ছিলেন পরবর্তীকালের ইংরেজ প্রশাসক ম্যাজিস্ট্রেট-কালেকটর-জজদের মতোই। ব্যবসায়ী পর্তুগীজ-ইংরেজ-ফরাসীদের বেণে-ফড়ে-মুৎসুদ্দী হিসেবে হিন্দুরা গোড়া থেকেই ছিল য়ুরোপীয়দের সহযোগী। কাজেই ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী দেওয়ানী পেয়েই এদের সাহায্য-সহযোগিতায় রাজস্ব-প্রশাসন চালাতে থাকে। এ কারণেই প্রশাসনিক ভাষা হিসেবে ইংরেজী নির্বাচিত ও চালু হবার আগেই হিন্দুরা ইংরেজী শিখতে থাকে। কোলকাতায় এ যুগের কিণ্ডার-গার্টেনের মতোই ব্যক্তিগত উদ্যোগে ইংরেজী শেখা-শেখানোর জন্যে ঘরোয়া বিদ্যালয় গড়ে ওঠে, যার পরিণামে ১৮১৭ সনেই হিন্দু কলেজ এবং বিশপস কলেজ প্রভৃতি প্রতিষ্ঠিত হয়। কোলকাতায় এ সময়ে দেশজ মুসলিম ছিল গোড়া থেকেই অনুপস্থিত। তাই বঞ্চিত রইল নতুন যুগের প্রসাদ থেকে। কোলকাতা ছিল হিন্দুঅধ্যুষিত এলাকা। ১৭৬৫ সন থেকে ইংরেজী সহকারী-সহযোগী হিসেবে কোলকাতা হল হিন্দুরই শহর-বন্দর। আন্তর্জাতিক বাণিজ্যবহুল মুদ্রাবিনিময়-নির্ভর প্রতীচ্য শিক্ষা-সংস্কৃতি-ফ্যাক্টরীধন্য কোলকাতাতেই নতুন যুগের সূচনা ও দ্রুত প্রসার বিকাশ ঘটে। ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির মুদ্রানির্ভর নতুন ভূমিরাজস্ব সংগ্রহনীতি, নতুন আন্তর্জাতিক বাণিজ্যনীতি, স্বদেশে সম্পদ পাচারনীতি এবং স্বদেশী পণ্যের বাজার দখলনীতি প্রভৃতি মুখ্যত পণ্য-বিনিময় ভিত্তিক ক্ষুদ্র বৃত্তিজীবী গঠিত স্বনির্ভর গ্রামীণ সমাজের ভিত আকস্মিকভাবে ভেঙে দেয়। শিক্ষিত ব্রাহ্মণ-কায়স্থ-বৈদ্য ও নতুন জমিদার-তালুকদার-মুৎসুদ্দী-দেওয়ান-গোমস্তা-মহাজন আর চাকুরে শ্রেণী ছাড়া অন্য সর্বপ্রকার হিন্দু-মুসলিম পেশাজীবীর ও চাষী-মজুরের জীবন-জীবিকা ক্ষেত্রে দেখা দেয় অশনে বসনে নিবাসে নিদানে চির অনিশ্চয়তার, অনিরাপত্তার ও অসচ্ছলতার অবস্থা এবং ঝড় ঝঞ্ঝা-বন্যা-খরা কবলিত জীবনে বেড়ে যায় রোগ-মারী-অপুষ্টি-অনাহারজনিত মৃত্যুর হার।

২. সাধারণভাবে এখন এ তথ্য স্বীকৃত যে দেশজ মুসলমানদের প্রায় সবাই নিম্নবর্ণের ও নিম্নবৃত্তির হিন্দু-বৌদ্ধের বংশধর। শিল্পবিপ্লবের মতো কিছু এদেশে তখনো ঘটেনি বলে দীক্ষিত মুসলিমদের মধ্যে পেশাবদল হয়েছে কৃচিৎ কারো কখনো। তাই বিদেশাগত প্রশাসকগোষ্ঠীর

কাছে তারা ছিল অবজ্ঞেয় আতরাফ-আজলাফ নিম্নবৃত্তিজীবী জুলহা নিকেরী মুলুঙ্গী কাগজী কৈবর্ত প্রামাণিক চাষী গৃহস্থ মজুর প্রভৃতি; যদিও এদের মধ্যে থেকেই ক্রমে কাজী, উকিল, মুনশী-মোল্লা-মৌলবী-মুয়াজ্জিন-হেকিম হতে থাকেন বটে, তবু শিক্ষিতের সংখ্যা ছিল নগণ্য, শিক্ষিত লোক ছিল বিরল। আবার তাদের মাদ্রাসাশিক্ষায় ফারসী-আরবী ভাষাই ছিল বাহন [পরে উর্দূও] প্রায় ১৯৩০ সন অবধি। বাঙলার আদর-কদর ছিল না বলে মাদ্রাসায় বাঙলা হরফ শেখানোও হতো না। এ প্রসঙ্গে উল্লেখ্য যে তাদের বাঙলা বই পড়ার সাধ মেটানোর জন্যে এদেরই উদ্যোগে চট্টগ্রামে উনিশ শতকে আরবী হরফে কিছু পুথির প্রতিলিপি তৈরির রেওয়াজও চালু হয়েছিল।*

ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানি শাসিত সুবেহ বাঙলায় মুসলিমরা সৈন্যবিভাগে চাকরিচ্যুত হয়ে উত্তর ভারতের দিকে চলে যায়। আত্মমর্যাদায় বাধে বলে অন্য কোনও বেসামরিক চাকরির তদবীরও করেনি। নওয়াবীর অবসানে মুর্শিদাবাদ শহরের উর্দূভাষী মুসলিম বৃত্তিজীবী, ব্যবসায়ী এবং উকিলরা কোলকাতায় এল বটে, কিন্তু কোলকাতার জীবিকাক্ষেত্র গোড়া থেকেই হিন্দু-অধিকারে থাকায় এবং সেখানে বাঙলাভাষী মুসলিমের বিরলতার দরুন সহায়তার আশ্বাসের অভাবে দেশজ মুসলিমরা কোলকাতায় বহু বহু কাল অনুপস্থিতই ছিল। অথচ ইংরেজি শিক্ষার উন্মেষ ও বিকাশ বহুকাল সীমিত ছিল নগর-বন্দর কোলকাতাতেই। ফলে ইংরেজি শিক্ষার আলো বাঙালী মুসলিম ঘরে পৌঁছতে উনিশ শতকের শেষপাদে এসে গেল।

ওয়াহাবীরা ১৮২২ সন অবধি ব্রিটিশ বিদ্বেষী ছিল না। ইংরেজী প্রশাসনের বাহনরূপে গৃহীত হয় ১৯৩৮ সনে। অতএব ১৮৩৮– ৬০ সন অবধি নিরক্ষর ওয়াহাবী ও ফরায়েজী সমর্থকদের মধ্যে ইংরেজ ও ইংরেজি বিদ্বেষ থাকলেও ১৮৬০ সনের পর থেকে স্যার সৈয়দ আহমদ খানের প্রভাবে সাধারণভাবে মুসলিম-মনে ব্রিটিশ প্রীতি জাগতে থাকে। কাজেই দেশজ মুসলিম সমাজে ইংরেজী শিক্ষার বিলম্বিত প্রসারের কারণ তাদের অধিকাংশের মধ্যে সাক্ষরতার বা শিক্ষার ঐতিহ্যের অভাব, কোলকাতায় তাদের স্বধর্মী জ্ঞাতির অনুপস্থিতি এবং গাঁয়ে-গঞ্জে ইংরেজী বিদ্যালয়ের বিরলতা।

১৮৩৮ সনে কাজী কমিশনারের পদ উঠে গেল, মুনসেফের পদ সৃষ্টি হল দেওয়ানী মামলার বিচারের জন্যে। তার আগে ১৮৩২ সন থেকেই ডেপুটি কালেক্টর নিযুক্ত হচ্ছিল। ইংরেজী শিক্ষার অভাবে দেশজ মুসলিমেরা এসব পদ থেকে বঞ্চিত হল এবং ১৮৬০ সনের দিকে আদালত ইংরেজি জানা-মনুসেফ ম্যাজিস্ট্রেট উকিল আকীর্ণ হওয়ায় শুধু ফারসীজানা মুনসী উকিলের প্রয়োজন ফুরোল। এখন থেকে বিদ্যালয় ও অফিস-আদালত হিন্দু অফিসারের, হাকিমের, কেরানীর, উকিলের ও শিক্ষক-শিক্ষার্থীর পুরো দখলে চলে গেল। এভাবে জমিদার-মহাজন-ডাক্তার-উকিল-শিক্ষক-ছাত্র-দোকানদার-ব্যবসাদার-চাকুরে এক কথায় ধনী মানী শিক্ষিত চাকুরে মাত্রই হিন্দু এবং দরিদ্র চাষী কুলি মজুর মাঝি-মাল্লা ও তুচ্ছ বৃত্তিজীবী (বৃত্তিজীবী নিম্ন বর্ণের হিন্দু ছাড়া) মাত্রই যেন নিরক্ষর মুসলিম—এমনি একটা প্রায় বাস্তব ধারণা ও অবস্থা গড়ে উঠল।

তুর্কী-মুঘল আমলের অফিস এবং শিক্ষিত বিরল নিস্তরঙ্গ ও পরিবর্তনরিক্ত বৃত্তিজীবীর গ্রামীণ সমাজ-সংস্কৃতি দুর্লক্ষ্য হয়ে উঠল। এ নব জাগরণে ও জীবনে নির্জিত মুসলিম সর্বত্র

* কন হরফে কন লফজ ন বুঝিএ অর্থ/বাঙ্গালা অক্ষর হেরি আরবীর পুস্ত। নসরুল্লাহ খোন্দকারের শরীয়তনামার লিপিকর আলিজানের উক্তি। অন্য পুথিথেও এ সংবাদ মেলে।

অনুপস্থিত। তখন মুনশী-মোল্লা-মুয়াজ্জিন-মৌলবীরাও হিন্দুর মোকাবেলায় অজ্ঞতায় নিরক্ষরতায় ও হীনমন্যতায় ভুগছে। তখন উদ্যমশীল উচ্চাভিলাষী মুসলিম মাত্রই হিন্দুর অনুকারক। তাদের পাবলিক ও অফিসী পোশাক তখন ধুতি-পাঞ্জাবী-চাদর। বৈষয়িক কাজ কারবারও হিন্দু-নির্ভর। মুসলিমমাত্রই আত্মবিস্মৃত। কোলকাতা শহরে তাদের নেতাও বিদেশী উর্দূভাষী এবং তাদের সঙ্গে সর্বপ্রকার শৈক্ষিক আর্থিক সামাজিক ও সাংস্কৃতিক সম্পর্ক বিরহী। সেসব শহুরে শিক্ষিত উর্দূভাষী নেতারা আত্মবিস্মৃত অজ্ঞ বিভ্রান্ত নবশিক্ষিত দেশজ মুসলিমদের মন থেকে স্বদেশ ও স্বভাষা চেতনা মুছে দেওয়ার চেষ্টায় বাঙলাদেশ ও বাঙলাভাষা হিন্দুর বলেই প্রচারণা চালায়। এবং স্বল্প সংখ্যায় ইংরেজী শিক্ষিত কিন্তু প্রজন্মক্রমে দেশজ বাঙালী মুসলিম মনে স্বধর্মীয় জাতীয়তাবোধ জাগিয়ে তাদেরকে স্বদেশে প্রবাসীমনস্ক করে তোলে এবং সর্বক্ষেত্রে প্রাগ্রসর ধনী মানী শিক্ষিত প্রশাসক, চিকিৎসক, শিক্ষক হিন্দুদেরকে মুসলিমদের প্রতিদ্বন্দ্বী-প্রতিযোগী শাসক শোষক পীড়ক বলে ভাবতে শেখায়।

কোলকাতায় পত্র-পত্রিকা প্রকাশনার ফলে লিখিত আধুনিক বাঙলায় হিন্দু রচিত বইপত্রেও কেবল হিন্দুর লেখা ও হিন্দুর কথা এবং মুসলিমের প্রতি অবজ্ঞা, ক্ষোভ ও নিন্দা প্রকাশ পেতে দেখে দেশজ মুসলিমরাও ভাবল বুঝি বাঙলা হিন্দুর ভাষা এবং বাঙলাদেশের সব ইতিবৃত্ত ও ঐতিহ্য-সংস্কৃতিও বুঝি হিন্দুর। নির্জিত মুসলিমদের এ বুঝি সত্যই বিদেশ বিভুঁই। স্বদেশে ঐতিহ্য-শিকড়ের সন্ধান না পেয়ে আধুনিককালের সাধারণ শিক্ষিতরা, মুসলিমরা এবং কবি-সাহিত্যিকরা দেশ-কাল-জাত-বর্ণ-রাষ্ট্র-ভাষা-সংস্কৃতি ও অবস্থান নিরপেক্ষ স্বধর্মীয় ভ্রাতৃত্বে, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক অভিন্নতায় আর আদর্শিক ঐক্যে এবং লক্ষ্যে ও অভিন্ন পরিণামে আস্থাবান হয়ে যে-মাটিতে দাঁড়িয়ে আছে তার প্রতি দায়িত্ব ও কর্তব্য বিস্মৃত হয়ে ঐতিহ্যের ও শিকড়ের বিষয় সন্ধানে সাধারণভাবে পনেরো শতকের পূর্বেকার আরবে-ইরানে-স্পেনে ও মধ্য এশিয়ায় সোৎসাহে মানস পরিভ্রমণ করেছেন নজরুল ইসলামের কাল অবধি। কারো কারো লেখার কিছু কিছু বিষয় দেশীয় হলেও অভিন্নমূল রশুনের মতো কাল ও স্থান নিরপেক্ষ বিশ্বমুসলিম অভিন্ন সত্তা ও স্বার্থ চেতনা ছিল প্রবলভাবে প্রবহমান।

২. জন্ম, বংশ, শিক্ষা, আর্থ-সামাজিক অবস্থান

এমনি দৈশিক, সামাজিক আর্থিক, সাংস্কৃতিক ও মানসিক প্রতিবেশে ১২৩৩ মঘী সনে বা ১৭৯৩ শকাব্দে পঁচিশে আশ্বিন মঙ্গলবারে সূর্যোদয়ের একঘণ্টা ৩৬ মিনিট ক্ষণে আবদুল করিমের জন্ম হয় [১৮৬১ সনে ১১ ই অক্টোবর মঙ্গলবারে][১] যিনি কর্ণফুলী নদীর পূর্বতীর থেকে টেকনাফ অবধি প্রাক্তন চট্টগ্রাম জিলার অর্ধাংশে ১৮৯৩ সনে একমাত্র এন্ট্রান্স পাশ মুসলিম এবং ১৮৯৫ সন অবধি সে অঞ্চলের একমাত্র এফ-এ পড়ুয়া ছাত্র।

বর্তমান পটিয়া উপজিলার পটিয়ার পাশের সুচক্রদণ্ডী গ্রামের এক উচ্চমধ্যবিত্ত পরিবারে আবদুল করিমের জন্ম। তাঁর পিতৃব্য মুনশী আইনউদ্দীন ছিলেন রাশভারী জেদী মানুষ। তিনি জজকোর্টে নকলনবীশ ছিলেন। মধ্য বয়সে চাকুরিচ্যুতও হয়েছিলেন সেরেস্তাদারের সঙ্গে উদ্ধত ব্যবহারজাত অবাধ্যতার দরুন। ওই জেদের জন্যেই মুখ্যত তিনি নানা ফৌজদারী ও দেওয়ানী

মামলায় জড়িয়ে পড়েন এবং জমিদারি তালুক ও বহু খাস জমি হারিয়ে পরিবারকে ক্রমে দারিদ্র্য কবলিত করেন।[২] এর ফলে যৌবনোন্মেষ কালেই আবদুল করিমের পরিবার আর্থিক প্রাচুর্যজাত সাচ্ছল্য-স্বাচ্ছন্দ্য থেকে বঞ্চিত হতে থাকেন এবং ১২৫৯ মঘী সালের তথা ১৮৯৭ সনের প্রলয়ঙ্কর ঝড়ে[৩] তাঁদের ঘর-বাড়ি বই পত্রসহ প্রায় সমস্ত আসবাব তৈজস বিনষ্ট হয়, এর পরেও বহু বছর ধরে মামলা মোকদ্দমার জের চলে ও আর্থিক সঙ্কট বাড়তে থাকে।[৪]

পারিবারিক শ্রুতি-স্মৃতি সূত্রে জানা যায়—আবদুল করিমের আদি পূর্ব পুরুষ হাবিলাশ [অভিলাষ?] মল্ল। গৌড় সুলতানের [সম্ভবত ১৫৩৮-৩৯ সনে শের শাহর চট্টগ্রাম অভিযানে] সৈনিক ছিলেন, যুদ্ধে আহত হওয়ায় তাঁকে চট্টগ্রামেই থেকে যেতে হয়, তিনি যে স্থানে নিবসিত [তাঁবু (হাবিলাশ) গাড়েন স্মারকগ্রস্থ পৃঃ ৪১] হন তা হাবিলাশ দ্বীপ গ্রাম নামে আজো অভিহিত হয়। হাবিলাস তথা তাবুবাসী বলেই কি ইনি হাবিলাশ মল্ল অথবা ইনি কি হিন্দু ছিলেন? আবদুল করিমের একক আদি পুরুষ পরম্পরা এরূপ : হাবিলাশ মল্ল—পাহাড় খাঁ মল্ল—দরিয়া খাঁ মল্ল— সিফৎমল্ল—দোস্ত মুহম্মদ আবদুল কাদির ওরফে কাদির রাজা [আনু: ১৭২০-৯০]-মুহম্মদ লোদী-মুহম্মদ নবী [১৭০০-১৮৯৮] -নুরউদ্দীন [১৮৩৮-৭১]–আবদুল করিম [১৮৭১-১৯৫৩]।

ষষ্ঠ প্রজন্মের কাদির রাজাই সুচক্রদণ্ডী গাঁয়ে এসে বসবাস করতে থাকেন, কাদির রাজা শিক্ষিত ছিলেন। তিনি তাঁর তৃতীয় সন্তান সামাদ আলীর পাঠের জন্যে আনুমানিক ১৭৬০-৭০ সনের দিকে কাজী দৌলতের সতীময়না-লোর-চন্দ্রাণী কাব্যের প্রতিলিপি তৈরি করেছিলেন [পুথি পরিচিতির পুথি সং ৫৭৭ ঢা. বি.] এরপর থেকে এ বংশে বা এ পরিবারে কেউ কখনো নিরক্ষর ছিলেন না। আবদুল করিমের পিতৃব্য কায়েমউদ্দিনের পটিয়া উচ্চ ইংরেজি বিদ্যালয়ে এ্যানট্রান্স শ্রেণীর ছাত্র অবস্থায় মৃত্যু হয় ১৮৬৭ সনে। অতএব সরকারি ভাষা হিসেবে ইংরেজী চালু হবার সময় থেকেই এ পরিবার প্রতীচ্য শিক্ষা গ্রহণে আগ্রহী হয়। লেখা পড়ার চর্চা ছিল বলে বাড়িতে অমুদ্রিত আরবী ফারসী বাঙলা পুঁথি ও বইপত্রের সংগ্রহ ছিল।

আবদুল করিমের পিতার নাম মুন্‌শী নুরউদ্দীন [১৮৩৮–৭১] এবং তাঁর মাতা মিস্‌রীজান ছিলেন হুলাইনের প্রাচীন প্রখ্যাত পাঠান তরফদার দৌলত হামজা বংশের মেয়ে। অপুত্রক মাতামহের নাম ছিল মুশাররফ আলি। পিতৃ বিয়োগের তিন মাস পরে আবদুল করিমের জন্ম এবং ১৮৮৮ সনে সতেরো বছর বয়সে আবদুল করিম হারালেন মাকেও। করিম যাতে মৌরসী সম্পত্তি থেকে একেবারেই বঞ্চিত না হন, সে ব্যবস্থা করলেন পিতামহ মুহম্মদ নবী [১৭০০ – ৯৮] ও পিতামহী জোলেখা খাতুন। তাঁদের মেজো ছেলে আইনউদ্দীনের [১৮৪০–১৯৩৭] ও আফাজুন নিসার [মৃত্যু ১৯৩৩] জ্যেষ্ঠা কন্যা নয় বছরের বদিউননিসার সঙ্গে এগারো বছরের করিমের বিয়ে দিলেন ১৮৮২ সনে। ১৯২১ সন অবধি আবদুল করিম চাচার সঙ্গে বৃহৎ যৌথ পরিবারেই ছিলেন।

বাড়ির দহলিজেই [দেউরী নামে আখ্যাত] হয় আবদুল করিমের আরবী-বাঙলা-ফারসীতে হাতে খড়ি। তারপর তিনি ভর্তি হন সুচক্রদণ্ডী মধ্যবঙ্গ বিদ্যালয়ে। সেখানে একবছর পড়ে ভর্তি হন বাড়ির অদূরে অবস্থিত পটিয়া উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয়ে। সেখানে থেকেই ১৮৯৩ সনে দ্বিতীয় বিভাগে প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে জেলার অর্ধাংশে প্রথম মুসলিম ইংরেজী শিক্ষিতের অসামান্য গৌরব অর্জন করেন। সম্ভবত স্কুলে মৌলবী শিক্ষকের অভাবেই আবদুল করিমকে সংস্কৃত পড়তে হয়। চট্টগ্রাম কলেজে দু'বছর এফ-এ পড়ার পর পরীক্ষার পূর্বে

সন্নিপাত (টাইফয়েড) রোগাক্রান্ত হন, ফলে পরীক্ষা দেওয়া হল না, উচ্চ শিক্ষারও ইতি ঘটে এখানেই। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে পিতৃব্য আইনউদ্দীনেরও ইংরেজী অক্ষরের সঙ্গে পরিচয় ছিল এবং তাঁর সব সন্তানই ইংরেজী শিক্ষিত শিক্ষক ও কেরানী ছিলেন বিভিন্ন অফিসে।

কলেজ জীবনে আলতাফ আলি চৌধুরী [১৮৯৩ সনে] নামে এক সহপাঠীকে আবদুল করিম অভিন্ন হৃদয় বন্ধুরূপে পেয়েছিলেন। তাঁর কোষ্ঠীপত্রের পিঠে লেখা থেকে তারই প্রমাণ মেলে।[৫] তাঁর আকস্মিক মৃত্যুতে অন্তরে প্রচণ্ড আঘাত পেয়েছিলেন আবদুল করিম। এ বন্ধুকে তিনি সারাজীবন স্মরণ করেছেন। একমাত্র সন্তান কন্যার নামও রেখেছিলেন তাই আলতাফুন নিসা [১৯০১ -৭৭ সন]।

আবদুল করিম শৈশবে-বাল্যে দেখা বাড়ির পুথি-কেতাব ও মুদ্রিত বইপত্র প্রভৃতির প্রতি স্কুলজীবনেই আকৃষ্ট হন। ফলে স্কুল জীবনেই তিনি হাতে লেখা জটিল-কলমী পুথি পড়তে শেখেন। বাড়ির পুথি-কেতাব-বইপত্রের মূল্যবান সংগ্রহটি ১৮৯৭ সনের ঝড়ে ঘর ভাঙার ও উড়িয়ে নেয়ার ফলে নিশ্চিহ্ন হয়ে যায়।

আবদুল করিম গৈরলাবাসী দুই সহপাঠীকে সাপ্তাহিক 'অনুসন্ধান'-এর গ্রাহক হতে দেখে নিজেও নবম [সেকালের দ্বিতীয়] শ্রেণীর ছাত্র থাকাকাল থেকেই নানা পত্রিকায় গ্রাহক হতে থাকেন। স্কুল ছাত্র হিসেবেই তিনি উইকলি 'হোপ' সাপ্তাহিক প্রকৃতি এবং আটখানা মাসিক পত্রের গ্রাহক হন। [স্মারক গ্রন্থ, প : ৪২]। ক্রমে তিনি বিভিন্ন ধরনের চল্লিশখানি পত্রিকার গ্রাহক ও পাঠক হয়েছিলেন। দৈনিক-সাপ্তাহিক-পাক্ষিক-মাসিক পত্রিকা পড়ার আগ্রহ বা নেশা তাঁর সারা জীবন অব্যাহত ছিল।

কলেজ ছাড়ার পর তিনি চট্টগ্রাম মিউনিসিপাল স্কুলে শিক্ষক হন। কিন্তু কিছুদিনের মধ্যেই সীতাকুণ্ড মধ্য ইংরেজি বিদালয়ে প্রধান শিক্ষকের অস্থায়ী পদ গ্রহণ করেন। সেখানে কার্যকাল শেষ হলে আবদুল করিম চট্টগ্রাম প্রথম সাবজজ আদালতে 'এপ্রেন্টিস' বা শিক্ষানবীশ পদে যোগ দেন এবং ১৮৯৭ সনে বদলী হয়ে আসেন পটিয়া মুন্সেফ আদালতে।

কবি নবীনচন্দ্র সেন অক্ষয়চন্দ্র সরকার-সম্পাদিত সেকালের প্রথম শ্রেণীর মাসিকপত্র 'পুর্ণিমা'য় আবদুল করিমের প্রবন্ধ দেখেই তার সঙ্গে পত্রালাপে পরিচয় করেন। কবি নবীন সেন চট্টগ্রামে কমিশনারের পার্সোন্যাল অ্যাসিস্ট্যান্ট হয়ে এসেই ১৮৯৮ সনে আবদুল করিমকেও কমিশনার অফিসের কেরানী করিয়ে শহরে নিয়ে আসেন।

এ সময়ে সুচক্রদণ্ডী গাঁয়ের কালীশঙ্কর চক্রবর্তী সাপ্তাহিক 'জ্যোতিঃ' পত্রিকার মালিক, সম্পাদক ও প্রকাশক ছিলেন। এই ব্রাহ্মণ পরিবার ছিল করিমের পিতামহ মুহম্মদ নবীর অনুরাগী ও অনুগত। পুথি-পাগল আবদুল করিম পুথি যোগাড় মানসে জ্যোতিঃ পত্রিকায় এক আবেদনে জানান, যাঁরা তাঁকে পুথি সংগ্রহ করে দেবেন বা পুথির সন্ধান দেবেন, তাঁদেরকে একবছর বিনামূল্যে জ্যোতিঃ পত্রিকার গ্রাহক করে নেয়া হবে। কমিশনার অফিসে জ্যোতিঃ পত্রিকায় ও এ বিজ্ঞাপনের সঙ্গে নবীন সেনেরও সম্পর্ক আবিষ্কার করেন। ফলে ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট নবীন সেন হলেন কুমিল্লায় বদলী আর কেরানী করিম হারালেন চাকরি। কেবল তা নয়, সরকারি চাকরি প্রাপ্তির অধিকারও হারালেন। পরে অবশ্য আপিলে তা রহিত বা বাতিল হয়। রেঙ্গুনযাত্রার জন্যে তৈরি হচ্ছিলেন আবদুল করিম চাকরির সন্ধানে। কিন্তু পরিবারের সম্মতি না থাকায় বার্মা যাওয়া হয়নি। কিছুদিন বেকার থাকার পর তিনি আনোয়ারা মধ্য ইংরেজী বিদ্যালয়ে প্রধান শিক্ষক পদে নিযুক্ত হন। এ স্কুলের প্রতিষ্ঠাতা আনোয়ারাবাসী

রাজচন্দ্র সেন ছিলেন আবদুল করিমের গুণমুগ্ধ। তিনিই স্কুলে মুসলিম প্রধানশিক্ষক নিয়োগ করে কালিক-প্রথা ভঙ্গ করেন। এখানে তিনি সুযোগ্য শিক্ষক, প্রশাসক ও লেখক হিসেবে বিশেষ জনপ্রিয়তা ও খ্যাতি অর্জন করেন। আবদুল করিম তাঁর আনোয়ারা স্কুলে শিক্ষকতার কালকে পুথি সংগ্রহের এবং লেখক হিসেবে পরিচিত হওয়ার স্বর্ণযুগ বলেই পরবর্তী জীবনে সানন্দে স্মরণ করতেন। তারপর ১৯০৬ সনে চট্টগ্রাম বিভাগের ইন্‌সপেক্টর অব স্কুলস ভারতবর্ষে মুসলমান রাজত্বের ইতিবৃত্ত প্রণেতা (১৮৯৮ সন) আবদুল করিমের আগ্রহে তাঁর অফিসে দ্বিতীয় কেরানীর পদে যোগ দেন। এখান থেকেই তিনি ১৯৩৪ সনের ১৫ ফেব্রুয়ারি তারিখে অবসর গ্রহণ করেন।

অতএব, তাঁর কর্মজীবনের ফিরিস্তি এরূপ : ১. চট্টগ্রাম মিউনিসিপ্যাল স্কুলে শিক্ষক — কয়েক মাস ১৮৯৫ সন। ২. সীতাকুণ্ড মধ্য ইংরেজী স্কুলে প্রধান শিক্ষক —এক বছর —১৮৯৫-৯৬ সন। ৩. জজ আদালতে এ্যাপ্রেন্টিস [শহরে ও পটিয়ায়] —১৮৯৬-৯৭ সন। ৪. কমিশনার অফিসে ক্লার্ক—১৮৯৮ [জানুয়ারি থেকে] সন। ৫. আনোয়ারা মধ্য ইংরেজী স্কুলের প্রধান শিক্ষক— ১৮৯৯-১৯০৫ সন। ৬. বিভাগীয় স্কুল ইন্সপেক্টর অফিসে ক্লার্ক—১৯০৬—৩৪ সন। সার্টিফিকেট অনুসারে ৫৬ বছর বয়সে [অতিরিক্ত এক বছর চাকরি করে] এবং বাস্তবে ৬৫ বছর বয়সে তিনি অবসর গ্রহণ করেন। তখন তিনি মাসিক বেতন পেতেন ১২০ টাকা, অবসর ভাতা পেতেন ৬০ টাকা এবং ১৯৩৯ সন থেকে সরকার থেকে সাহিত্যিক বৃত্তি পেতেন ৬০ টাকা। আমৃত্যু মাসিক আয় ছিল ১২০ টাকা।

এ সূত্রে বিশেষ উল্লেখ্য যে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা পর্বে ১৯২০ সনে স্পেসিয়াল অফিসার ছিলেন পূর্ববাঙলার শিক্ষাবিদ অবসরপ্রাপ্ত স্কুল ইন্সপেক্টর খানবাহাদুর আবদুল আজিজ বি-এ। তিনি তাঁর পূর্বতন কেরানী আবদুল করিমের গুণগ্রাহী ছিলেন। এই মুসলিম লেখক-সাহিত্যগবেষকের সুবিধে হবে মনে করে বিশ্বদ্যিালয়ের সর্বাধ্যক্ষ Stapleton-কে সুপারিশ করে আবদুল করিমকে সদ্যপ্রতিষ্ঠিত ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রন্থাগারিক পদ গ্রহণের প্রস্তাব দিয়েছিলেন। বুদ্ধিপরামর্শ দেয়ার লোকের অভাবে আবদুল করিম সরকারি চাকুরির পেনশনের লোভে বিশ্ববিদ্যালয়ে পেনশনহীন চাকুরি নিতে রাজী হননি[৭]।

কাদির রাজা পরিবারের আঞ্চলিক খ্যাতি ও প্রতিপত্তি ছিল চিরকাল। কাদির রাজা, লোদী, নবী, আইনউদ্দীন ছিলেন প্রজন্মক্রমে স্থানীয়ভাবে ধনবান, প্রভাবশালী, দর্প-দাপটের লোক। আর পারিবারিক শ্রুতিস্মৃতি এই যে, ১১৭৬ সালের [১৭৬৯-৭০] মন্বন্তর ছিল স্থানীয় ভাষায় 'সাত পইস্যার রাট' অর্থাৎ প্রতি সের চাউলের দাম হয়েছিল সাতপয়সা—সেকালের কড়ির যুগে এ ছিল অগ্নিমূল্য। চারদিককার গাঁয়ের অনাহারক্লিষ্টদের নঙ্গরখানা খুলেও ধান-চাউল খয়রাত করে বাঁচিয়ে ছিলেন বলে তাঁকে লোকে [আবদুল] 'কাদির রাজা' নামে অভিহিত করে। এ সূত্রেই তিনি কর্ণফুলী ও শঙ্খ-নদীর মধ্যবর্তী অঞ্চলে বিশেষ খ্যাতিমান ছিলেন। 'দুর্ভিক্ষের সময় অন্নদান করে তাঁর এক পূর্বপুরুষের জন-সমাজে রাজাখ্যাতি লাভ হয়েছিল।'

আর আবদুল করিম বঙ্গবিখ্যাত হন তাঁর সাহিত্যকৃতির জন্যেই। অবসর জীবনে তিনি বাস করতেন গাঁয়ের বাড়িতে। এ সময়ে তিনি ইউনিয়নবাসী অনেকের আগ্রহে ইউনিয়ন বোর্ডের সদস্য হয়ে বোর্ডের ও বেঞ্চের প্রেসিডেন্ট হিসেবে দশ বছর [১৯৩৫—৪৫] ধরে জনগণের সেবা, সালিশ ও বিচারকার্য চালিয়েছেন। তিনি পটিয়া আঞ্চলিক ঋণ সালিশী

বোর্ডেরও ছিলেন চেয়ারম্যান বা প্রেসিডেন্ট।

তার এক ঈর্ষ্যভক্ত অন্য এক প্রার্থীকে জব্দ করার উদ্দেশ্যে ১৯৩৮ বা ১৯৩৯ সনে তাঁকে চট্টগ্রাম জিলাবোর্ডের সদস্য পদপ্রার্থীরূপে দাঁড় করিয়ে ছিলেন এবং তিনি ভোটে পরাজিত হয়েছিলেন। তবে পটিয়া উচ্চ ইংরেজি বিদ্যালয়ের ও দক্ষিণ ভূর্ষি মধ্য ইংরেজী বিদ্যালয়ের কার্যনির্বাহী পর্ষদের তিনি ছিলেন দীর্ঘকাল ধরে মৃত্যুপুর্বাবধি সভাপতি। ১৯৪৭ সন অবধি বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদে তাঁর ও তার গবেষণাকর্মের বিশেষ আদর কদর ছিল। বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদেরও তিনি কয়েকবছর কার্যনির্বাহী কমিটির সদস্য ছিলেন। সহসভাপতি পদে বৃত করেও বিদ্বৎসমাজ তাকে সম্মানিত করেছেন একবার [১৩২৬ সালে, সভাপতি ছিলেন সে বছরের জন্যে রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী।] ইতোপূর্বে ১৯০৩ সনেই তাঁকে পরিষদের বিশিষ্ট সদস্য (Fellow)[৮] করে সম্মানিত করা হয়। চট্টল ধর্মমণ্ডলী তার সাহিত্যকৃতির স্বীকৃতিস্বরূপ তাঁকে 'সাহিত্য বিশারদ' [১৯০৯ সনে] উপাধি দান করেন। এবং নদীয়ার সাহিত্য সভাও তাঁকে 'সাহিত্য সাগর' [১৯২০ সনে] উপাধি দিয়ে সম্মানিত করেন, তবে তিনি কেবল প্রথমটাই নামের সঙ্গে যোগ করতেন।

অক্ষয়চন্দ্র সরকার, কবি নবীনচন্দ্র সেন, হরপ্রসাদ শাস্ত্রী, রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী, ব্যোমকেশ মুস্তফী, রাজদূত-গবেষক শরচ্চন্দ্র দাশ, সুরেশচন্দ্র সমাজপতি, দীনেশচন্দ্র সেন, সৈয়দ এমদাদ আলী, কবি জীবেন্দ্রকুমার দত্ত, শশাঙ্কমোহন সেন, ইয়াকুব আলী চৌধুরী, মুহম্মদ নাসিরউদ্দীন, ডক্টর মুহম্মদ শহীদুল্লাহ, ডঃ মুহম্মদ এনামুল হক প্রমুখ অনেকেই তাঁর বিশেষ গুণগ্রাহী ছিলেন এবং সম্পর্কানুযায়ী করিম ছিলেন এঁদের স্নেহ-প্রীতি-শ্রদ্ধা ভাজন। গুণগ্রাহী স্যার আশুতোষ মুখোপাধ্যায় কেরানী আবদুল করিমকে প্রথমে প্রবেশিকার ও পরে বি-এ-র বাঙলার পরীক্ষক নিয়োগ করেছিলেন। ১৯৪৭ সন অবধি তিনি কোলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বি-এ পরীক্ষার বাঙলা ভাষাসাহিত্যের পরীক্ষক ছিলেন। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ও ১৯৫১ সনে বাঙলা অনার্সের একটি পত্রের প্রশ্নকর্তা ও পরীক্ষক নিয়োগ করেছিল। তিনি যেসব সম্মান পেয়েছিলেন, সেগুলো :

১৯১৮ সনে চট্টগ্রাম সাহিত্য সম্মেলনে অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি। ১৯২৯ [৩০?] সনে রাউজানে কেন্দ্রীয় মুসলিম তরুণ সঙ্ঘ আয়োজিত সাহিত্য সম্মেলনে সভাপতি। ১৯৩৩ সনে চট্টগ্রাম সাহিত্য পরিষদের সম্মেলনে সম্বর্ধনা লাভ। ১৯৩৬ সনে 'পূরবী' সাহিত্য সমিতির সম্বর্ধনা প্রাপ্তি। ১৯৩৭ সনে বঙ্গীয় সাহিত্য সম্মেলনে উদ্বোধনী বক্তৃতাদান। ১৯৩৯ সনে কলিকাতা মুসলিম সমিতির সাহিত্য সম্মেলনের সভাপতি। ১৯৪৫ সনে প্রগতি সাহিত্য সম্মেলনে সম্মানিত অতিথি। ১৯৫০ সনে চট্টগ্রামে নিয়াজ স্টেডিয়ামে অনুষ্ঠিত প্রদর্শনীর সাহিত্য সম্মেলনে উদ্বোধন অনুষ্ঠানে সভাপতির ভাষণ। ১৯৫১ সনে চট্টগ্রাম সংস্কৃতি সম্মেলনে মূল সভাপতি। ১৯৫২ সনে কুমিল্লা সংস্কৃতি সম্মেলনে মূল সভাপতি।

এছাড়া কোলকাতায় ও নাটোরে তিনি বঙ্গীয় সাহিত্য সম্মেলনে বিশেষ আমন্ত্রণে যোগ দিয়েছিলেন।

সাহিত্য জগতে তাঁর খ্যাতির কারণেই পত্রিকার মর্যাদা ও গুরুত্ব বৃদ্ধির জন্যেই চার চারটি সাময়িক সাহিত্য পত্রেরও আত্মপ্রকাশকালে তাঁকে অবৈতনিক সম্পাদক করা হয়েছিল। সৈয়দ এমদাদ আলি প্রকাশিত ও সম্পাদিত 'নবনূর' [১৯০৩ সনে প্রকাশিত], এয়াকুব আলি চৌধুরী প্রকাশিত ও সম্পাদিত 'কোহিনূর' [১৩০৯ সাল, মোহাম্মদ নাসিরউদ্দীন প্রকাশিত ও সম্পাদিত

'সওগাত' [১৯১৮], আবদুর রশিদ সিদ্দিকী প্রকাশিত ও সম্পাদিত 'সাধনা' [১৩২৭] এবং 'পূজারী' নামের একটি পত্রিকাও প্রধান সম্পাদক হিসেবে তাঁর নামাঙ্কিত হয়েই গোড়ার দিকে প্রকাশিত ও সমাজে পরিচিত হয়। এতেই বোঝা যায় এ শতকের গোড়ার দিকে মুসলিম সমাজে তিনি ছিলেন গবেষক-প্রাবন্ধিক হিসেবে প্রায় মধ্যাহ্ন মার্তণ্ড। বস্তুত আবদুল করিমই কাজী নজরুল ইসলামের আবির্ভাব পূর্বকালে ছিলেন একমাত্র মুসলিম লেখক, যিনি হিন্দু মুসলিম সমাজে সমভাবে ছিলেন পরিচিত, স্বীকৃত, খ্যাত এবং সমাদৃত।

৩. আবদুল করিমের স্বভাব ও জীবনাচার

এবার আবদুল করিম সাহিত্যবিশারদের স্বভাব-চরিত্রের, মন-মননের, ভাব-চিন্তাকর্ম-আচরণের কিছু পরিচয় দিচ্ছি :
আবদুল করিম সারা জীবন সৎ, সরল, নির্বিরোধ, পরউপকারী, অত্যন্ত স্নেহপরায়ণ, ভৃত্যবৎসল ও পাঠনিষ্ঠ লোক ছিলেন।

ক. তাঁর সততা, ঘৃণা-হিংসা-অসূয়ামুক্ত সহৃদয়তা ছিল প্রশ্নাতীত। তাঁকে যাঁরা ঘনিষ্ঠভাবে জানতেন, তেমন স্বল্পসংখ্যক মানুষ যাঁরা আজো জীবিত রয়েছেন বাঙলাদেশে তাঁরাই এর সাক্ষ্য। পরিবারের সামান্য জমিদারি ঋণজালে বিজড়িত হয়ে পড়েছিল, যমের দোসর মহাজনদের উৎপাতরূপ ঝড়েও তাঁদের শান্তিময় জীবন বিক্ষুব্ধ হয়ে ওঠে, মামলা-মোকদ্দমা ও ঋণের দায়ে ক্ষুদ্র সম্পত্তি একরূপ ছারখার হয়ে যায়, তখনো আবদুল করিম নিজেকে এসবের সঙ্গে জড়িত রাখেননি। [জীবেন্দ্র দত্ত পৃঃ ২৭ স্মারকগ্রন্থ, বা. এ] তিনি সংসারে থেকেও বিষয়কর্মের ঝামেলা এড়িয়ে চলেছিলেন সারা জীবন। গাঁয়ের নিরক্ষর সচ্ছল গৃহস্থ মকবুল আলির সঙ্গে ছিল তাঁর আবাল্য সখ্য। এ মকবুল আলির সঙ্গে তাঁর পরিবারের চলছিল দীর্ঘকাল ধরে বহু ফোজদারী ও দেওয়ানী মামলা, দাঙ্গা বা মারামারি হয়েছিল কয়েকটা, তবু মকবুলের সঙ্গে তাঁর সখ্যে ও আড্ডায় ছেদ পড়েনি কখনো, ছেদ পড়ল ১৯৪৪ সনে মকবুলের মৃত্যুতে। আগে আড্ডা বসত ছুটিছাটায়, অবসর গ্রহণের পরে ঘণ্টা দুয়েক আলাপচারিতা চলত রাত্রে আহারের পরে। মাহবুব-উল –আলম লিখেছেন 'যৌবনে প্রতিবেশী মকবুল তাঁর সান্নিধ্য সুখের দোসর হয়ে পড়ে। মকবুল ছিল চাষী মানুষ, কিন্তু মামলাবাজ । তাঁদের সঙ্গেও মামলা লাগিয়ে দিয়েছিল। কিন্তু, তা সত্ত্বেও আবদুল করিম ঘণ্টার পর ঘণ্টা তাকে সামনে বসিয়ে হুঁকা টানতেন, তাঁর অপূর্ব ভঙ্গিতে আলাপ করতেন।' (স্মারকগ্রন্থ, পৃঃ ৩৩)।

খ. আবদুল করিম ছিলেন শিশুগত প্রাণ। বাড়ির কারো না কারো একটা শিশুকে কোলে নিয়ে আদর না করলে যেন তাঁর দিন কাটত না। চার-পাঁচ বছর বয়স হয়ে গেলেই কেবল আর কোলে নিতেন না, নতুন শিশুর জন্যে উন্মুখ হয়ে থাকতেন। বাড়িতে শিশু না থাকলে প্রতিবেশীর শিশুকে আদর করে সাধ মেটাতেন। প্রত্যক্ষদর্শী মাহ্বুব-উল আলমের ভাষায় 'সারাজীবন একটা না একটা শিশুর স্নেহ-ডোরে বাঁধা ছিলেন তিনি'। [স্মারকগ্রন্থ পৃঃ ৩৪] শৈশব-বাল্য অতিক্রান্ত হলেও বিশেষ স্নেহবশে তিন ভ্রাতৃকন্যাকে বিবাহকাল অবধি এবং আহমদ শরীফকে ও এক দৌহিত্র সৈয়দউদ্দীনকে [২৩ বছর বয়সে তাঁর যক্ষ্মা রোগে ১৯৪৬ সনে মৃত্যু ঘটে] তিনি লালন করেছেন।

গ. তাঁর চাকুরে জীবনে বাসার এবং বাড়ির ব্যক্তিগত ভৃত্যকে তিনি চিরকাল সন্তানের মতো ভালো বেসেছেন, এবং তাঁর জীবনে যে-কয়জন ভৃত্য বা গৃহকর্মের লোক ছিল, প্রত্যেককেই তিনি সাধ্যমতো অর্থ সাহায্য করে চাষী হিসেবে কিংবা অফিসে-কারখানায়-দোকানে কাজ যোগাড় করে দিয়েছেন, সব ভৃত্যকেই তিনি স্বয়ং সাক্ষর করেছিলেন। এক বালক ভৃত্যের আকস্মিক মৃত্যু হলে তিনি তার মা-বাবাকে সামান্য অর্থ সাহায্য করতেন। পরে তাঁর বিধবা মাকে তিনি তাঁর মৃত্যুকাল অবধি ভাত কাপড় যুগিয়েছেন। আনসার, মুসা খাঁ, আমজু, গণি, সালামত খাঁ, গফুর, আবুলের মা প্রভৃতির নাম গাঁয়ের বৃদ্ধ লোকের এখনো স্মরণে রয়েছে।

ঘ. গাঁয়ের এক পুকুর ছিল করিম পরিবারের অধিকারে, যদিও সে পুকুর গাঁয়ের আরো দুটো পরিবারের পরোক্ষ স্বত্ব ছিল, কিন্তু তাদের দখলে ছিল না। ওরা দখল পাবার জন্যে আদালতে মামলা করে। প্রমূর্ত সততা আবদুল করিম স্বস্বার্থেও মিথ্যে বলবেন না—এ দৃঢ় বিশ্বাস বশে জেনে-বুঝেই তারা সাক্ষী মানে আবদুল করিমকেই। বলাবাহুল্য তাঁর সাক্ষ্যতেই ওরা মামলায় জয়ী হয়।

ঙ. আবদুল করিম আবাল্য তামাক খেতেন। বিধবা মায়ের কোলে বসেই নাকি তামাক খাওয়া শুরু করেছিলেন বাল্যে, বাড়িতে সর্বক্ষণই হুঁকা টানতেন, তবে বাইরে খেতেন চুরুট। বিড়ির প্রতি ছিল অবজ্ঞা আর সিগারেটের প্রতি ছিল বিদ্বেষ। বিদ্বেষ ছিল চা'-এর প্রতিও, জীবনে কখনো সর্দি-কাশিতেও তিনি চা পান করেননি, যদিও তাঁর পত্নী সকালে বিকেলে চা খেতেন, আর শারীরিক কারণে আফিমও সেবন করতেন। সে-আফিম একসঙ্গে বেশি মাত্রায় ক্রয় করতে হলে সরকারের অনুমোদন প্রয়োজন হত। সে-অনুমতি নিতে একবার অতিরিক্ত জেলা ম্যাজিস্ট্রেট সাহিত্যিক অন্নদাশঙ্কর রায়ের কাছেও গিয়েছিলেন, তাতে রায়ের ধারণা হয়েছিল বুঝি সাহিত্যবিশারদ আফিমখোর [১৯৮৪ সনের ২১ ডিসেম্বর 'দৈনিক বাংলা'-য়। অধ্যাপক মুহম্মদ মনসুরউদ্দিন বর্ণিত]।

চ. আবদুল করিম সাধারণভাবে শান্ত প্রকৃতির ছিলেন বটে, কিন্তু 'জেদ' ছিল অসামান্য। ক্বচিৎ কখনো ক্রোধে-অভিমানেও দু-চারবার সবাইকে চমকে দিয়েছেন। শুধু তা নয় সঙ্কটও সৃষ্টি করেছেন। তাঁর বাল্যের-যৌবনের বিষয় জানাবার লোক নেই এখন। কিন্তু চারটে ঘটনা আমাদের জানা আছে। চট্টগ্রাম বিভাগীয় ইন্সপেক্টর অব স্কুলস ছিলেন তখন প্রখ্যাত লেখক শিক্ষাবিদ খান বাহাদুর আহসান উল্লাহ [মুকদুমী আহসানউল্লাহ লাইব্রেরির মালিক] দ্বিতীয় কেরানী আবদুল করিমকে কোনো ফাইলের বিষয় নিয়ে তিনি বকাবকি করলে ক্রুদ্ধ আবদুল করিম তাঁর গায়ের উপর ফাইল ছুঁড়ে ফেলে অফিস ছেড়ে চলে আসেন। চাকুরি যায় আর কি! তখন সহকারী ইন্সপেক্টর প্রখ্যাত শিক্ষাবিদ খানবাহাদুর আবদুল আজিজ বি-এ-র অনুরোধে এ প্রখ্যাত লেখককে আহসানউল্লাহ নিজগুণে ক্ষমা করে দেন বটে, কিন্তু আবদুল করিম বেঁকে বসেন, তিনি চাকরি আর করবেনই না। আত্মীয়-স্বজন-বন্ধুর সাধাসাধিতে এবং আবদুল আজিজের উপদেশে অবশেষে তিনি চাকরিতে যোগ দেন এবং আহসানউল্লাহ সাহেবও পরম উদারতায় তাঁর সঙ্গে মালিন্যমুক্ত সৎ ও সদয় ব্যবহার করতে থাকেন। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য তাঁর পিতৃব্য মুনশী আইনউদ্দিনও সেরেস্তাদারের সঙ্গে উদ্ধত আচরণের জন্যে ১৮৮০-৮২ সনের দিকে চাকুরিচ্যুত হয়েছিলেন। আর একবার পত্নীর সঙ্গে কথা কাটাকাটির ফলে প্রায় চল্লিশ ঘণ্টা অন্নজল গ্রহণে বিরত থাকেন। বাড়ির লোকের সাহস হয়নি সাধাসাধি করবার, বাইরের

শ্রদ্ধেয় আত্মীয়-বন্ধুর বহু অনুরোধে উপরোধে অবশেষে অন্ন গ্রহণে সম্মত হন। তাঁর একমাত্র মেয়েও অল্প বয়সে বিয়ে দিয়েছিলেন তাঁর ভালো-লাগা একটি ছেলের সঙ্গে পিতৃব্যসহ পরিবারের সদস্যদের অমতে। ইউনিয়ন বোর্ডের প্রেসিডেন্ট থাকাকালে [১৯৩৬ সনে] সার্কল অফিসারের সঙ্গে পটিয়া রেলস্টেশনেই তাঁর কোনো বিষয়ে বচসা শুরু হয়, তিনি ছাতা দিয়ে অফিসারকে মারতে উদ্যত হন। ট্রেনের দর্শকদের কেউ কেউ দৈনিক পাঞ্চজন্যে এবং সাপ্তাহিক সত্যবার্তায় অফিসারকে ঐ ঘটনার জন্য দায়ী ও নিন্দা করে চিঠি প্রকাশিত করেন। সেরেস্তাদার আবদুল ওদুদের মধ্যস্থতায় এ বিবাদ মেটে।

আর একবার ক্রুদ্ধ আবদুল করিমকে মূর্চ্ছিত হতে দেখা গেছে। ১৯৫৩ সনের মার্চ মাসে পত্নী বিয়োগের মাসতিনেক পরে এবং তাঁর নিজের মৃত্যুর মাসতিনেক আগে কি কারণে বাড়ির উপর অভিমান করে শহরে ভ্রাতুষ্পুত্রদের কারো বাসায় কিংবা কন্যার বাড়ি না গিয়ে সাহিত্যিক আবুল ফজলের বাড়িতে ওঠেন। ভ্রাতুষ্পুত্রদের সাধাসাধিতেও তিনি টলেন নি। অবশ্য দুদিন পরে নিজেই গাঁয়ের বাড়ি ফিরে যান।

ছ. কেবল ভৃত্যদের নয়, গাঁয়ের কিছু দরিদ্র পরিবারকে তিনি মাঝে মধ্যে গোপনে (তাঁর পত্নী সমর্থন করতেন না বলে) অর্থ সাহায্য করতেন। তার অবসর ভাতা ষাট টাকা ও সাহিত্যবৃত্তি ষাট টাকা স্ত্রীর হাতেই তুলে দিতে হত এবং ১৯৪৫ সন থেকে আহমদ শরীফ প্রেরিত টাকাও। কাজেই নানা অজুহাতে কিছু টাকা তার থেকে পাওয়া গেলেও তা দিয়ে তাঁর দানপাত্রদের প্রয়োজন মিটত না। ফলে তিনি সময়ে সময়ে এক সওদাগর ও পটিয়া স্কুলের দুজন শিক্ষক থেকে ধার করতেন। [সম্ভবত দু একবার ডক্টর মুহম্মদ এনামুল হক থেকেও, যা শোধ করতে হয়নি]। আহমদ শরীফও তাঁর ওই সব গোপন খরচের জন্যে তাঁর নির্দেশে মনিঅর্ডার পাঠাতেন উক্ত সওদাগর ও শিক্ষকদের নামে। তবু এভাবে তাঁর মৃত্যুর পরে তাঁর লেখা ঋণের হিসাব-খাতায় প্রায় দেড় হাজার টাকা অপরিশোধিত দেখা গেল। সে-ঋণ অবশ্য কড়ায়গণ্ডায় তাঁর উত্তরাধিকারী পরিশোধ করেছে।

জ. চাকরি জীবনে দশটা থেকে পাঁচটা অবধি ফাইল পড়ে-লিখে শ্রান্ত হলেও সকালে ও রাত্রে তিনি সোৎসাহে পুথিপত্র বই পড়ে ও লিখে অবসর মুহূর্তগুলো কাজে লাগিয়েছেন। এভাবে সময়সাপেক্ষ কষ্টসাধ্য পুথি পাঠ করে পাঁচ-ছয় শতাধিক পুথি পরিচায়ক ও গবেষণামূলক প্রবন্ধ ও ভূমিকা লিখেছেন, লিখেছেন ইতিহাস বিষয়ক প্রবন্ধ, গ্রন্থ সমালোচনা কিংবা পুস্তক পরিচিতি। সর্বোপরি অনেকগুলো পুথির পাঠ সংশোধন করে সম্পাদনা করেছেন। এ কাজে ধৈর্য শ্রম ও সময় লেগেছে অপরিমেয়। সাহিত্য সেবাই ছিল তাঁর সাধনা ও এবাদত।

ঝ. আচারিক ধর্মে আবদুল করিম বিশেষ নিষ্ঠ ছিলেন না, কখনো রোজা রাখতেন তবে নামাজ সব সময়ে পড়তেন না। এমন কি বার্ধক্যেও অবিচ্ছিন্নভাবে নিয়মিত নামাজ পড়েন নি। অবশ্য জুম্মা নামাজে হাজির থাকতেন। উল্লেখ্য এ পরিবার ছেলেমেয়েদের নামাজ পড়বার বা রোজা রাখবার তাগিদও দিত না। ধর্মশিক্ষা দানেও তেমন গুরুত্ব দেয়নি। ছেলেরা সংস্কৃত, পালি, ফারসী ও আরবী পড়েছে ইচ্ছেমতো ৭ম শ্রেণী থেকে। হিতাকাঙ্ক্ষীদের পরামর্শেও তিনি হজ করতে রাজি হননি আর স্নেহের পাত্র ভ্রাতৃষ্পুত্র আহমদ শরীফকে বঞ্চিত করে আত্মীয়-স্বজনের অনুরোধ সত্ত্বেও পিতৃপুরুষের মসজিদে কয়েক কানি সম্পত্তির সামান্য অংশ দিতেও রাজি হননি। লোভ করেননি সওয়াবের। স্নেহের দায়িত্বের কাছে হার মানল সওয়াবের লোভ। অর্থ-সম্পদ থাকা সত্ত্বেও কাদির রাজা থেকে এ বংশের কেউ ১৯৫৪ সনের আগে হজব্রতও পালন করেননি।

ঞ. আবদুল করিম ছিলেন স্নেহান্ধ ব্যক্তি। স্নেহভাজনের জন্যে তিনি হৃদয় মন-অর্থ ঢেলে দিতেন। আনোয়ারা মধ্য ইংরেজী স্কুলের প্রধান শিক্ষক থাকাকালে দুইজন স্থানীয় দরিদ্র সন্তান আজিজুর রহমান [আনোয়ারার সোলকাটা গ্রামবাসী] ও নিশিচন্দ্র ঘোষ [কবি জীবেন্দ্রকুমার দত্তের প্রতিবেশী আনোয়ারা গ্রাম] তাঁর এতই প্রিয় ছিলেন যে তিনি চট্টগ্রাম শহরে ইন্সপেক্টর অফিসে কেরানী হয়ে আসার পরেও তাঁদের বিদ্যালয়ের ব্যয় স্বেচ্ছায় বহন করে প্রথম জনকে এন্ট্যাস পাশ করিয়ে তাঁর নিজের অফিসে কেরানী পদে নিয়োগের ব্যবস্থা করেন এবং নিশি ঘোষও তাঁর অর্থেই বি-এ পাশ করে সীতাকুণ্ড উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয়ে সুদীর্ঘকাল প্রধান শিক্ষক থেকে অবসর গ্রহণ করেন। এঁরা দুজনেই দীর্ঘজীবী ছিলেন এবং সত্তরের দশকের শুরুতে তাদের মৃত্যু হয়। তাঁর জামাতা আবদুল মোনাএমও তাঁর তেমন একজন স্নেহভাজন তরুণ ছিলেন। স্নেহবশেই তাঁকে পরিবারের সবার অমতেই জামাতা করেছিলেন। বৃদ্ধ বয়সেও গাঁয়ের দু'একজন গরীব ছাত্রকে অর্থ সাহায্য করেছেন।

ট. নির্বিশেষ মানুষের প্রতি আবদুল করিমের একটা স্বাভাবিক শ্রদ্ধা ছিল। এ জন্যেই সারাজীবনে তাঁর চিন্তায় চেতনায় কর্মে আচরণে জাত বর্ণ-ধর্ম বা আর্থিক অবস্থান ভেদের জন্যে ঘৃণা-বিদ্বেষ প্রকাশ পায়নি। তাঁর সাহিত্য চর্চার শুরুও হিন্দু রচিত পদাবলীর পরিচিতি দানের মাধ্যম। বিদ্যালয়েও প্রধান শিক্ষক হিসেবে পেয়েছিলেন মুখ্যত হিন্দু সন্তানদেরই। মুসলিম ছাত্র ছিল নগণ্য। হিন্দু ছাত্রদের অনেকেই ছিলেন তার স্নেহধন্য, বড় পদে অধিষ্ঠিত হয়েও তাঁরা মধ্য ইংরেজী বিদ্যালয়ের এ শিক্ষককে পরবর্তী জীবনেও শ্রদ্ধা সঙ্গে স্মরণ করতেন।

ঠ. পুথিও সংগ্রহ করেছেন হিন্দু-মুসলিম অভেদে, তাঁর আগে এমন অসাম্প্রদায়িক চেতনা নিয়ে কেউ পুথি সংগ্রহ করেননি, কলিকাতা ও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, এশিয়াটিক সোসাইটি অব বেঙ্গল কিংবা বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের বিভিন্ন শাখা, আর কারো কারো ব্যক্তিগত সংগ্রহশালাই তার প্রমাণ।

আবদুল করিমের পুথি সংগ্রহপদ্ধতি সম্বন্ধে ডক্টর মুহম্মদ এনামুল হক বাগজন্তুতি অলঙ্কার প্রয়োগে এক রসাল 'ঘুষতত্ত্ব' প্রচার করেন, তা আজকাল অধ্যাপক আহসাবউদ্দিন আহমদ, ডক্টর আশরাফ সিদ্দিকী প্রমুখ সবাই তাঁর মৃত্যুবার্ষিকী উপলক্ষে প্রচারিত রেডিয়ো ভাষণে কিংবা পত্রিকায় প্রকাশিত প্রবন্ধেও স্মৃতিসভায় ইচ্ছেমতো পল্লবিত করে বক্তৃতা দিয়ে থাকেন। তাঁরা বলেন স্কুলের শিক্ষক সেক্রেটারিরা তাঁর কাছে স্কুলের সরকারি মঞ্জুরি প্রভৃতির তদবিরে গেলে তিনি পুথি যোগাড় করে দেয়ার শর্তসাপেক্ষে তাঁদের কাজ আটকাতেন কিংবা পুথি পেলেই কাজ করে দিতেন। এ কথার মধ্যে স্থূল রস-রসিকতা থাকলেও এতটুকু সত্য বা তথ্য নিহিত নেই, তা প্রত্যক্ষদর্শী হিসেবে এ লেখক দৃঢ়তার সঙ্গে বলছে। তাছাড়া গোটা চট্টগ্রাম বিভাগে হাইস্কুল কয়টিই বা ছিল। শিক্ষকরাও ছিলেন সাধারণভাবে হিন্দুই, মুসলিম ঘরে পুথি থাকার সম্ভাবনা হিন্দু মনে কখনো জাগেইনি, ইন্সপেক্টর অব স্কুলস অফিসে স্কুলের বারোমেসে কাজ থাকে না। কাজেই সেভাবে কয়টা পুথিই বা সংগৃহীত হয়েছে। বরং আবদুল করিম সংকলিত পুথির বিবরণ ও পুথিপরিচিতি গ্রন্থের সাক্ষ্যে দৃঢ়তার সঙ্গে বলা চলে যে ত্রিপুরা-নোয়াখালীর পুথি নিতান্ত স্বল্প সংখ্যক। মঘী সনের উল্লেখ ও লিপিকরের বা পুথির মালিকের নাম নিবাস থেকে জানা যায় যে প্রায় সব পুথিরই সংগ্রহস্থান চট্টগ্রাম। অতএব 'ঘুষতত্ত্ব'টি বানানো। অধ্যাপক আসহাবউদ্দিনের বর্ণিত 'পকেটমার' গল্পটিও ভিত্তিহীন। করিম চরিত্রে মহিমাদানের জন্যেই কল্পিত। বাস্তবে আবদুল করিম আমৃত্যু আত্মীয়-বন্ধু পরিচিত-অপরিচিত যে-কোনো শিক্ষিত লোকের সঙ্গে যে-কোনো স্থানে, সময়ে ও উপলক্ষে দেখা হলেই পুথির সন্ধান চাইতেন, পুথি

যোগাড় করে দিতে বলতেন, সন্ধান দেয়ার জন্যে অনুরোধ জানাতেন। কারো কাজ করে দেয়ার শর্ত হিসেবে পুথি দাবি করেননি কখনো। চাকুরি জীবনে In cash না হলেও এটাও হত ঘুষ In kind, সে-ধরনের আত্মমর্যাদারিক্ত মানুষই ছিলেন না তিনি। ইউনিয়ন বোর্ডের কাজে বিভিন্ন গাঁয়ে যখন যেতেন, তখনো তিনি পুথির খোঁজ করতেন। দৈনিক পত্রিকাই তিনি প্রতি পুথির আবরণ হিসেবে ব্যবহার করতেন, প্রতি পুথির নামের সঙ্গে কোন্ গ্রামের কে পুথি দিয়েছেন, তাও লেখা থাকত পুথির আবরণের উপর। তিনি বহু বহু পুথি নগদ অর্থে ক্রয়ও করেছেন। সে অর্থের মোট অঙ্ক হয়তো তিন-চার হাজারের বেশি হবে।

ড. সূর্যসেনপন্থী সন্ত্রাসবাদী ও পটিয়ার ভাটিখাইনবাসী হরিপদ ভট্টাচার্য চট্টগ্রামের পুলিশ-সুপার খান বাহাদুর আহসাউল্লাহকে নিজাম পল্টনে ফুটবল খেলার মাঠে হত্যা করেন [১৯৩১ সনের ৩০শে আগস্টের বিকেলে] এবং পলায়নকালে মাঠেই ধৃত হন। এ মামলায় একজন জুরার ছিলেন স্বদেশের স্বাধীনতকামী আবদুল করিম সাহিত্যবিশারদ। তিনি হরিপদকে নির্দোষ বলে মত দেন এবং একজন জুরারকে অনুনয় করে স্বমতে আনেন। ফলে সংখ্যাগুরুর মতে হরিপদ নির্দোষ সাব্যস্ত হন, তবু সংখ্যাগুরুর মত অগ্রাহ্য করে ষোল বছর বয়স্ক হরিপদকে ফাঁসির বদলে জেল দেয়া হল। এদিকে অন্যান্য মুসলিম জুরার এবং শহরের মুসলমানরা আবদুল করিমের প্রতি ক্ষুব্ধ ও ক্রুদ্ধ হলেন। কয়েক মাস তাঁকে ভয়ে ভয়ে পথ চলতে হয়, উল্লেখ্য যে আহসানউল্লাহ হত্যার সঙ্গে সঙ্গে সরকারের তথা ইংরেজ ম্যাজিস্ট্রেট কমিশনারের গোপন প্ররোচনায় ও নিরাপত্তার আশ্বাস পেয়ে মুসলিম গুণ্ডারা হিন্দুর দোকান-পাট লুট করে। কিন্তু প্ররোচনা সত্ত্বেও সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা বাধেনি।

ঢ. আবদুল করিমের কিছু সাহিত্যকর্ম অন্যরা আত্মসাৎ করলেও, আবদুল করিম ক্ষুব্ধ হলেও মামলায় কিংবা বাদ প্রতিবাদে উৎসাহ বোধ করেননি। তবু এ অপকর্মের কথা সারা দেশে যথাসময়ে জানাজানি হয়ে গেল। নিন্দিত হয়েছিলেন দায়ী ব্যক্তিরা।[১০]

ণ. আবদুল করিমই প্রথম বাঙলা ভাষাকে নির্ভীক চিত্তে উচ্চকণ্ঠে কেবল মাতৃভাষা বা স্বদেশী ভাষা নয় মুসলিমদের জাতীয়ভাষা বলে ঘোষণা করেন, যখন অনেক মুসলমানই বাঙলাভাষা বর্জনের জন্যে প্রচার চালাচ্ছিল।[১১] পরে পাকিস্তানে ভাষা-বির্তকে বাঙলা ভাষার পক্ষে অন্যদের সঙ্গে বিবৃতিতে ও স্মারকলিপিতে সই দিয়েছিলেন।[১২] বাঙলাভাষার বিশুদ্ধতা রক্ষার কথাও বলেছেন, উচ্চশিক্ষার মাধ্যমও বাঙলা করার দাবি জানিয়েছেন তিনি।[১৩] পূর্ব পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা হিসেবে বাঙলার দাবি জানিয়ে তিনি প্রবন্ধও লিখেছেন।[১৪] তাঁর মনের দর্পণে ছিল বাঙলার ও বাঙালীর মধ্যযুগের জীবনচিত্র, চোখের সামনে ছিল বাস্তব বর্তমান আর কল্পনায় ছিল ভবিষ্যৎ। বাঙলাদেশ, বাঙলাভাষা ও বাঙালী জাতি ছিল সারা জীবন ধরে তাঁর অনুধ্যানের বিষয়।

ত. সাহিত্য সম্মেলনাদিতে আসকান-পাজামা পরলেও আবদুল করিম অফিসে ও সভায় যেতেন ধুতি-পাঞ্জাবি ও চাদর পরে। মাথায় থাকত অবশ্য ফেজটুপির আকারের মাড় দেয়া ফুলেল সাদা টুপি। শীতকালে পরতেন ধুতি, ফ্লানেলের শার্ট, গলাবন্দ বা বুকখোলা কোট। জঙ্ঘা অবধি ঝুললে আসকান, হাঁটুর উপরে সীমিত থাকলে হয় শেরওয়ানী, নিতম্বে নিবদ্ধ থাকলে হয় গলাবন্দ কোট, বোতামবিহীন হলে হয় গাউন বা চৌকা আর বুকের উপর দুই অংশ গোলচক্র বিশিষ্ট হলে হয় চাপকান। আবদুল করিম প্রথম তিনটেই পরেছেন, প্যান্ট চাপকান পরেননি কখনো। পাকিস্তান-উত্তর কালে অবশ্য দায়ে পড়ে পাজামা পরতেন। সু-ই পরতেন, স্যাণ্ডাল জনপ্রিয় ছিল না সে যুগে, কৃচিৎ পরেছেন পাম সু, ঘরে প্রায়ই পরতেন কুমিল্লাখ্যাত

বোলের খড়ম, কৃচিৎ বাইরে কোথাও যেতে ও থাকতে হলে সঙ্গে নিতেন চটি। চল্লিশের দশক থেকে তিনিও পরেছেন স্যাণ্ডাল।

থ. ঘরোয়া জীবনে তাঁর সৌজন্যও ছিল অনন্য। কোনোদিন কোনো ব্যঞ্জন বিস্বাদ লাগলে, সেদিন তখনই তা বলতেন না, অন্যদিন সেই ব্যঞ্জনে যদি স্বাদ পেতেন, তা হলে পূর্বদিনে তা যে বিস্বাদ লেগেছিল, সে কথা ব্যক্ত করতেন। কোনো খাদ্যবস্তু পিঠা কিংবা মিষ্টি বা আম-জাম-কাঁঠাল-তরমুজ-আপেল-আনারস দিলে খেতেন, কিন্তু কোনোদিন চেয়ে খেতে দেখা যায়নি। যদিও তিনি বাজার থেকে যখন যে ফলের মৌসুম, তখন তা ক্রয় করে আনতেন, তার পত্নীও ছিলেন ভোজনবিলাসী। তাঁর অতিথিপরায়ণতার কথা অনেকেই বলেছেন ও লিখেছেন নানা প্রসঙ্গে।

দ. আবদুল করিমের দেহাকৃতি ছিল একহারা মাঝারি, উচ্চতা ছিল পাঁচ ফিট আট ইঞ্চি। গায়ের রঙ নির্দ্বিধায় গৌর বলা যাবে না বটে, তবে শ্যামলও নয়, ফর্সা-কালোর মাঝামাঝি। চোখ ছিল উজ্জ্বল, দৃষ্টি ছিল তীক্ষ্ণ। ১৯৩০ সনে অধিকাংশ দাঁত পড়ে যাওয়ায় কৃত্রিম দাঁত বাঁধানোর জন্যে চীনা দোকানে গিয়ে বাকি দাঁতগুলো উৎপাটন করান, ত্রিশটাকায় দু'পাটি দাঁত বাঁধানোর কথাও হয়, কিন্তু তিনি আর দাঁত গ্রহণ করেননি, ফলে তাঁর চেহারাই পালটে যায়। প্রৌঢ়বয়সে ১৯২৬-২৭ সনে শীতকালে তাঁর গুরুতর রোগ হয়, প্লীহা বাড়ে এবং কান ধরে যায়। ফলে তিনি কানে কম শুনতেন। আর আবার ১৯৪২ সনের ডিসেম্বরে রক্ত আমাশয়ে আক্রান্ত হয়ে ১৯৪৩ সনের জানুয়ারি মাসেও ভোগেন।

ন. স্বদেশ ও বর্ণ-ধর্ম নির্বিশেষে স্বজাতি সম্বন্ধে তাঁর উদার অসাম্প্রদায়িক চেতনা ছিল বলেই অপমান ও বিড়ম্বনা সহ্য করেও হিন্দুঘরের পুথি সংগ্রহ করেছেন। আবদুল করিম বলেছেন,

> 'হিন্দু বাড়ি গিয়া এমনও দেখিয়াছি— গোঁড়া হিন্দু আমাকে পুথি ছুঁইতে দেয় নাই— সে পাতা মেলিয়া ধরিয়াছে— আর আমি নোট লিখিয়া লইয়াছি।'

প্রাচীন পুথি সংগ্রহণে ও এর সংরক্ষণে সাহিত্যবিশারদের অক্লান্ত পরিশ্রম ও একান্ত নিষ্ঠার বর্ণনা দিতে গিয়ে ব্যোমকেশ মুস্তফী বলেন,... তাঁহার গৃহে তাঁহার অদম্য উৎসাহ, যত্ন, চেষ্টা ও আগ্রহের ফলে আজ সহস্রাধিক প্রাচীন পুথি আসিয়া জমিয়াছে। ইহার জন্য তাঁহার অপরিমেয় শারীরিক পরিশ্রম ও আর্থিক ক্ষতিও হইয়াছে। সর্বাপেক্ষা তাঁহাকে যে উৎপীড়ন সহিতে হইয়াছে, তাহা যেমন অদ্ভুত, তেমনি বিস্ময়কর। তিনি মুসলমান, কোন হিন্দুর আঙ্গিনায় তাঁহার প্রবেশাধিকার নাই, কিন্তু হিন্দুর ঘরে পুথি আছে শুনিয়া তিনি ভিখারীর মত তাঁহার দ্বারে গিয়া পুথি দেখিতে চাহিয়াছেন। পুথি সরস্বতী পূজার দিন পূজিত হয়, অতএব মুসলমানকে ছুঁইতে দেওয়া হইবে না বলিয়া, অনেকে তাঁহাকে দেখিতেও দেন নাই। অনেকে আবার তাঁহার কাকুতি-মিনতিতে নরম হইয়া নিজের পুথি খুলিয়া পাতা উল্টাইয়া দেখাইয়াছেন মুন্সী সাহেব দ্বারের বাহিরে দাঁড়াইয়া হস্তস্পর্শ না করিয়া কেবল চোখে দেখিয়া নোট করিয়া সেই সকল পুথির বিবরণ লিখিয়া আনিয়াছেন। এত অধ্যবসায়ে, এত আগ্রহে, এমন করিয়া কোন হিন্দু অন্ততঃ নিজের ঘরের পুথিগুলির বিবরণ লিখিতে বা অন্য কোন কার্যে হাত দিয়াছেন কিনা, জানিনা। [বাঙ্গালা প্রাচীন পুথির বিবরণ, ১ম খণ্ড ২য় সংখ্যার ভূমিকা ১৩২০ সাল]

আবদুল করিম বলেছেন :

> "আলোক আঁধারে এই সংসার। আমার সাহিত্যিক জীবনের অন্ধকার দিক আছে। মুসলমানের ঘরে জন্মিয়া দেব ভাষা (সংস্কৃত) পড়িতে গিয়াছিলাম বলিয়া কৈশোরে একদিন

হিন্দু সতীর্থদিগের কত টিটকারী আমাকে সহ্য করিতে হইয়াছিল। আজ আবার মনে পড়িতেছে, মুসলমান হইয়া হিন্দুর পুথি দেখিতে গিয়াছিলাম বলিয়া কত হিন্দু ভ্রাতা তীব্র অবজ্ঞায় আমার প্রতি বঙ্কিম চাহনি নিক্ষেপ করিয়াছিলেন। খোদা'তালাকে ধন্যবাদ, তাঁহাদের সেই ঘৃণা ও শ্লেষ-দুষ্ট বক্র দৃষ্টিতে ব্যাহত না হইয়া আমার সাহিত্যানুরাগ বরং বাড়িয়াই চলিয়াছিল। তাহারই ফলে আজ আমার পর্ণকুটীর হিন্দু-মুসলমানের অতীত সাহিত্যসম্পদে পূর্ণ।"

[বঙ্গীয় মুসলমান সাহিত্য-পত্রিকা, শ্রাবণ ১৩৩০, ৬ষ্ঠ বর্ষ ৪র্থ সংখ্যা]

১৯৫৩ সনের ২৫ শে মার্চ বুধবারে তাঁর পত্নী বদিউন্নিসার [১৮৭৩-১৯৫৩] মৃত্যু হয়। আর পত্নীবিয়োগের ছয় মাস পাঁচদিন পরে ১৯৫৩ সনের ৩০শে সেপ্টেম্বর বুধবার সকাল সাড়ে দশটার সময়ে আবদুল করিমের হৃদযন্ত্রের ক্রিয়া বন্ধ হওয়ার তাঁর প্রয়াণ ঘটে। মৃত্যুর দুঘণ্টা পূর্বে পর্যন্ত তিনি পূর্ণ সুস্থ ছিলেন। তাঁর মৃত্যুসংবাদ বিশেষ গুরুত্বের সঙ্গে বর্ণিত ও পরিবেশিত হয়েছিল ঢাকার সেকালের সব ইংরেজি-বাঙলা-উর্দু দৈনিকে এবং সাপ্তাহিকে। কোলকাতার কাগজেও তাঁর মৃত্যু সংবাদ পরিবেশিত হয়েছিল। বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ আয়োজিত শোকসভায় অধ্যাপক সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়, অধ্যাপক জনার্দন চক্রবর্তী প্রমুখ বিখ্যাত বিদ্বানেরা তাঁর গুণের ও অবদানের কথা বক্তৃতায় শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করেন। ঢাকায় পূর্বপাকিস্তান সাহিত্য সংসদও শোক সভা করে। ঢাকায়-চট্টগ্রামে এবং অন্যত্রও অনেক শোকসভা অনুষ্ঠিত হয়। চট্টগ্রামে, পটিয়ার স্থানীয় বিদ্যালয়গুলোও তাঁর মৃত্যু-সংবাদে ছুটি হয়ে যায়। 'আজাদ' পত্রিকা ঘটা করে তাঁর 'চেহলাম' উপলক্ষে সচিত্র বিশেষ বিবরণ প্রকাশিত করে।

আবদুল করিমের জন্ম শতবার্ষিকীও ১৯৬৯ সনে [তখনো এইটিই তাঁর জন্ম সন বলে স্বীকৃত ছিল] নানাস্থানে পালিত হয়। এশিয়াটিক সোসাইটি অব পাকিস্তান [এখন বাঙলাদেশ] এবং বাঙলা একাডেমী আবদুল করিম সাহিত্যবিশারদ স্মারকগ্রন্থ প্রকাশিত করে তাঁর স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শন করেছেন। বাঙলাদেশে রেডিয়ো কেন্দ্রগুলোতে প্রতিবছর ৩০শে সেপ্টেম্বর এক একটি 'কথিকা' মাধ্যমে তাঁকে দেশবাসীর পক্ষে স্মরণ করা হয়। চট্টগ্রামে আবদুল করিম সাহিত্যবিশারদ স্মৃতিপরিষদ নামে একটি স্থানীয় প্রতিষ্ঠানও রয়েছে। জয়তু আবদুল করিম সাহিত্যবিশারদ।

৪. আবদুল করিমের চোখে দেশ, মানুষ, সমাজ ও সাহিত্য

সাহিত্যিকদের মধ্যে তিনিই সাহিত্যে জাত-বর্ণ-ধর্ম-অঞ্চল-বিষয়ভেদ মানেননি। তাঁর প্রথম দিককার সম্পাদিত গ্রন্থগুলোও হিন্দু লিখিত ও হিন্দু বিষয়ক। পূর্ববর্তী ও সমকালীন মুসলিম সাহিত্যিকদের মধ্যে তিনিই কেবল সংগ্রহের, সংরক্ষণের, অনুশীলনের, আলোচনার, গবেষণার, লেখার ও প্রচারের বিষয় করেছিলেন স্বদেশের মাটিলগ্ন মানুষকে, তাদের কৃতিকীর্তিকে ও তাদের জীবনজিজ্ঞাসাকে ও জগৎ-ভাবনাকে। আবদুল করিমের মধ্যে সামগ্রিকভাবে স্বদেশ ও বাঙালীচেতনাই যে-চিরকাল প্রবল ছিল, দেশপ্রচলিত সাম্প্রদায়িক ভেদবুদ্ধি যে তাঁর ছিল না, এমনকি সাম্প্রদায়িক স্বার্থে গঠিত মুসলিমলীগও যে তাঁর সমর্থন পায়নি, ফলে পাকিস্তান

প্রতিষ্ঠায়ও যে তাঁর কোনো উল্লাস ছিল না, তা তাঁর সে-সময়কার লেখার ও অভিভাষণ থেকেই অনুমান করা সহজেই সম্ভব। তাঁর অনেক প্রবন্ধে ও অভিভাষণে তাঁর সর্বসংস্কারমুক্ত উদার মানবিক ও প্রগতিশীল চিন্তা-চেতনার সাক্ষ্য ও স্বাক্ষর রয়েছে। বিশেষ করে জীবনের অন্তিমলগ্নে চট্টগ্রাম সম্মেলনে [১৯৫১] এবং কুমিল্লা সম্মেলনে [১৯৫২ সনে] প্রদত্ত তাঁর ভাষণ দুটো সমকালীন যে-কোনো সাধারণ প্রগতিবাদী উদার তরুণের চিন্তা-চেতনার ও জীবনদৃষ্টির চেয়েও প্রাগ্রসর চিন্তা-ভাবনার ও পরিচ্ছন্ন দৃষ্টির পরিচায়ক। তাঁর মনোজগতের নিবিড় ও তাঁর সত্তার অকৃত্রিম পরিচয়বাহী ভাষণ দুটোর বিস্তৃত অংশ তাই এখানে উদ্ধৃত করছি। লক্ষণীয় যে এসব ভাষণে সদ্য প্রতিষ্ঠিত পাকিস্তান রাষ্ট্রগর্বের কিংবা মুসলিমগৌরবের অথবা ইসলামপ্রীতির লেশমাত্রও নেই। এবং এ সঙ্গে তাঁর যৌবনে ও প্রৌঢ়জীবনে লালিত দেশ, ধর্ম, সমাজ, সাহিত্য, সংস্কৃতি সম্বন্ধে উদার মত আর মন্তব্যও বিধৃত হল।

চট্টগ্রামে ১৯৫১ সনের ১৬ই মার্চে অনুষ্ঠিত সংস্কৃতি সম্মেলনে মূল সভাপতির ভাষণে আবদুল করিম বলেন :

> ঐতিহ্যের সহিত দেশের ইতিহাস, ধর্ম, ভাষা, লৌকিক আচার, বায়ু, গাছ-পালা, এমনকি তরুলতা পর্যন্ত জড়িত। বুকে দেশ-প্রেম না থাকিলে তাহা কাহাকেও বুঝাইয়া দেওয়া মুশকিল। অনেকে সবগুলি মানেন না। দেশের কোন একটি বিশেষ অঙ্গের উপর জোর দেন। এমন ক্ষেত্রে দেশ অঙ্গস্ফীতি পীড়ায় ভুগিবে। কোন একটি অঙ্গের উপর জোর দিলে তা হয়ত মোটা দেখাইতে পারে— অন্যগুলি শুষ্ক হইয়া যাইবে। ইহা স্বাস্থ্যের লক্ষণ নয়—স্বাস্থ্যের অভাবের লক্ষণ।

দেশের মাটির ও মানুষের রিক্থ অস্বীকার করে নতুন পাকিস্তানী তথা কৃত্রিম ইসলামী তমদ্দুন প্রচারকারীদের প্রতি দৃষ্টি রেখে আবদুল করিম সাহিত্যবিশারদ বলেন :

> অনেকে ঐরূপ কার্যে অগ্রসর হইয়া দেশের মাটিকে পর্যন্ত অস্বীকার করেন। ইহা বাতুলতা। অবশ্য এমন বাতুলেরা সাময়িকভাবে জাতীয় জীবনের বিকাশ পথে নানা অমঙ্গল ডাকিয়া আনে। উদাহরণ দেওয়া যাক। ইঙ্গভারতীয় সমাজ বা অ্যাংলোইণ্ডিয়ান সমাজ অবিভক্ত ভারতে দেড়শত বৎসর আমাদের সহিত বাস করিয়া আসিতেছিল। তাহারা কোন কৃষ্টি সৃষ্টি করিতে পারে নাই। দেড়শত বৎসর একটি সমাজের পক্ষে কম সময় নয়। ইহার কারণ, তাহারা এই দেশকে নিজের দেশ বলিয়া মনে করে নাই। তাহারা মনে করিত, তাহাদের জন্মভূমি ইংলন্ড। মহারাণী ভিক্টোরিয়া তাহাদের পিতামহী কি মাতামহী। দেশের জলবায়ু ও ঐতিহ্যের বিরুদ্ধে গমন করিলে সংস্কৃতির এমনই দুর্দশা ঘটে। সুধীগণের নিকট এই ইঙ্গিতই যথেষ্ট।
>
> ... ঐতিহ্যের এমনই শক্তি। ইহার শক্তিকে স্বীকার করিতে হইবে। কিন্তু স্বীকার করিয়া বসিয়া থাকিলে চলিবে না। তাহা হইবে গতানুগতিক। আর গতানুগতিকতার অর্থ শিল্প-সংস্কৃতির মৃত্যু। ঐতিহ্যকে স্বীকারের পর তার প্রবাহকে অগ্রসর করিয়া লইয়া যাইতে হইবে। সংস্কৃতির বিকাশের সার্থকতা সেইখানে। ... ঐতিহ্যকে একদিকে স্বীকার ও অন্যদিকে অস্বীকার এই টানা-পড়নেই সংস্কৃতির অগ্রগতি সম্ভব।
>
> ... পূর্বেই উল্লেখ করিয়াছি, আমি কঙ্কালের ব্যবসায়ী, পুরাতন পুঁথি কঙ্কালেরই মতো। কিন্তু আমি তাহার ভিতর যুগযুগান্তের রক্তধমন ও নিঃশ্বাসের প্রবাহ ধ্বনি শুনিয়াছি। আমার বিশ্বাস সে-যুগের শিল্প-স্রষ্টাদের পক্ষে যাহা সত্য ছিল, আজ তাহার বিশেষ ব্যতিক্রম ঘটে নাই। এইজন্য কয়েকটি কথা বলা দরকার।

প্রাচীন মধ্যযুগীয় মঙ্গলকাব্য ও অন্যান্য কাব্যরীতির সাধকদের মূল প্রেরণা ছিল সমাজ। দৈনন্দিন জীবনই ছিল রসের উৎসবক্ষেত্র। তাই কোথাও দেখা যায়, কবি দেবতার ছবি আঁকিতেছেন কিন্তু অজ্ঞাতসারে তাহা তদানীন্তন বাঙলার সমাজচিত্র হইয়া গিয়াছে। আপনারা ইহাকে শিল্পীর কৌশল বলিতে পারেন। কিন্তু একথা ধ্রুব সত্য, সমাজের দিকে তাঁহারা চোখ খোলা রাখিয়াছিলেন বলিয়া এমন অঙ্কন-দক্ষতা লাভ করিয়াছিলেন। তাহার আস্বাদ যুগ-যুগান্তর অতিক্রম করিয়া আজও অবিকৃত অম্লান রহিয়াছে। আপনারা পূর্বসূরীদের এই কৌশল বা দক্ষতা যাই বলুন—আজও অবহেলা করিতে পারেন না। সমাজেই জীবন। জীবনের শিল্পী কি সমাজকে অস্বীকার করিতে পারে?

যুগে যুগে সমাজের নানা পরিবর্তন ঘটিয়াছে। এক যুগের শিল্পরীতি দিয়া অন্য যুগের সমাজকে আঁকা চলে না। রীতিও তেমন পরিবর্তিত হইয়াছে। নক্ষত্রের গতিশীলতা দেখিয়া জ্যোতির্বিদগণ পৃথিবীর গতিশীলতা স্থির করিয়াছেন। আমরা শিল্পরীতি দেখিয়া সমাজের গতিশীলতা বুঝিতে পারি। আবার সমাজের কলেবর দর্শনেও শিল্পরীতির গতিশীলতা অনায়াসে ধরা পড়ে। এইভাবে স্থান কাল ভেদে সাহিত্যের আদর্শ পরিবর্তনশীল। ইহা লক্ষ্য করিবার জন্য সমাজের দিকে দৃষ্টিপাত ছাড়া অন্য কোন উপায় নাই।

সেইজন্য দৃষ্টিশক্তির সাধনার প্রয়োজন আছে। প্রাচীন কবিরা তাহারও পথ দেখাইয়াছেন। তাহা একটি শব্দে বলা যায়—উদারতা। যে যত উদার, তাঁহার দৃষ্টি তত স্বচ্ছ।

নানা জাত-বর্ণ-ধর্ম-গোত্রের ও ভাষার মানুষ অধ্যুষিত দেশে বা রাষ্ট্রে সহিষ্ণুতায় সহাবস্থান করার গুরুত্ব উপলব্ধি করে সাহিত্যবিশারদ বলেন :

'আমার পথ ঢাইক্যাছে মন্দিরে মসজেদে
ওরে ও পরম গুরু সাঁই
তোর পথ দেখতে না পাই
আমায় রুখে দাঁড়ায় গুরুতে মুরসেদে'

প্রাচীন বাউল কবির মুখে সহজেই এই মনোহারিণী বাণীর উদয় হইয়াছিল। অশিক্ষিত, অজ্ঞাতকুলশীল কবির হৃদয়ের আর্তনাদ আজও কানে আসে। মানুষে মানুষে ঐক্যের প্রচেষ্টা ছিল তাঁহাদের সাধনা। উদারতার এই এক অদ্বিতীয় সংজ্ঞা। কিন্তু প্রাচীন কবির বাণী আজও সার্থক হয় নাই। ভ্রাতৃদ্বন্দ্ব, হানাহানি, লোভ, জিঘাংসা প্রভৃতি রিপুর অন্যান্য জঘন্য চিত্র আজও আমাদের দৈনন্দিন ঘটনার পটভূমি। সাম্প্রদায়িকতা মহামারীবীজের মতো শত শত গ্রামে মানুষের নীড় ধ্বংস করিয়াছে। তাই এই জাতীয় দুর্দিনে সেই প্রাচীন সাধক কবিদের পথের হদিস ভালোরূপে জানা দরকার আছে। মানুষে মানুষে বিভেদ আছে সত্য। এই বিভেদকে জয় করাই সংস্কৃতি। সংস্কৃতি ঐক্যের বাহন, বিভেদের চামুণ্ডা নয়।"

এ ভাষণের গুরুত্ব ও তাৎপর্য সম্বন্ধে জনাব বদরউদ্দীন উমর বলেন :

আবদুল করিম সাহিত্যবিশারদের এই অমূল্য ভাষণটি সম্পর্কে মন্তব্য করতে গিয়ে সংস্কৃতি সম্মেলনের জনৈক প্রত্যক্ষদর্শী সম্মেলনের উপর একটি প্রতিবেদনমূলক প্রবন্ধে বলেন যে, 'সভাপতির ভাষণের সময় বিপুল জনতা তাদের অর্দ্ধশতাব্দীর সংস্কৃতির ধারক ও বাহক এই জ্ঞানবৃদ্ধের বাণী অন্তরে অন্তরে সঞ্জীবিত করছিল। একটি জীবন্ত অস্তমান মানুষ তাঁর জীবনব্যাপী সাধনার সম্পদ তাঁর উত্তরাধিকারী জনতার সামনে তুলে ধরলেন। আর জনতা তাঁকে আপন জন বলে গ্রহণ করে তার নিজের চলবার পথ বেগবান করলো।'[৫]

১৯৫১ সালের ১৬ই মার্চের পরবর্তী সাংস্কৃতিক আন্দোলনের ইতিহাসের দিকে তাকালে প্রত্যক্ষদর্শীর এই প্রতিবেদনের সত্যতাই আশ্চর্যভাবে প্রতিভাত হয়। চট্টগ্রাম সংস্কৃতি সম্মেলনের পর থেকে পূর্ব বাঙলায় বিশ বৎসরকাল ধরে যে সাংস্কৃতিক আন্দোলনের বিকাশ ঘটে আবদুল করিম সাহিত্যবিশারদের এই অভিভাষণকে সেই আন্দোলনের ঘোষণা বললে বিন্দুমাত্র অত্যুক্তি হয় না।"।

১৯৫২ সনের ২২শে আগস্ট কুমিল্লায় অনুষ্ঠিত পূর্ব-পাক সাংস্কৃতিক সম্মেলনে মূল সভাপতির ভাষণে আবদুল করিম বলেন :

> সংঘাত ক্ষুব্ধ ইয়োরোপের বিগত ষাট-সত্তর বছরের বিচিত্র ও বিস্ময়কর বিবর্তনের সাথে আমার প্রায় প্রত্যক্ষ পরিচয় আছে। এক দিকে বিসমার্ক-গ্যারিবলিড্র, হিটলার-মুসোলিনী, এব্রাহাম লিঙ্কন, লেনিন প্রমুখ রাজনীতিবিদ অপর দিকে কান্ট, বার্গস, নিটশে, হেগেল, কোঁতে, মিল, বেন্থাম, মার্কস, গোর্কি প্রমুখ সমাজতত্ত্ববিৎ ও দার্শনিকের প্রভাব প্রতিপত্তিসংক্ষুব্ধ ইয়োরোপের সংঘাত, বিবর্তন ও রূপান্তরের খবর জানি। তাহাতে এই অভিজ্ঞতা হয়েছে যে, মানুষ চিরকাল একাধারে স্বার্থ-সর্বস্ব ও নূতনের পিপাসু থাকিবে। কোন নিয়ম-নীতির বন্ধন দিয়া তাহাকে চিরন্তন স্থিতিশীল বন্ধনে বাঁধা যাইবে না। মানুষের দেহ শুধু সচল নয়, তাহার মনও চঞ্চল এবং গতিশীল। তাই মানুষ চিরকাল পুরাতনকে বর্জন করিয়া নতুন কিছু অবলম্বন করিবার জন্য ব্যগ্র থাকিবে। ধর্ম, সমাজ ও রাষ্ট্রব্যবস্থা বরাবর বিবর্তিত হইতে থাকিবে।
>
> মানুষের এই স্বার্থপরতা, নতুনের পিপাসা, চিত্তচাঞ্চল্য ও গতিশীলতাই সংস্কৃতির উৎস অর্থাৎ ইহাদের সম্মিলিত অভিব্যক্তিই সংস্কৃতি। কারণ সংস্কৃতির মূল প্রবৃত্তি হইল উত্তম্মন্যতা (superiority complex) নিজকে সর্ব ব্যাপারে শ্রেষ্ঠ প্রতিপন্ন করা অর্থাৎ অপর দশ জনের উপরে থাকার আকাঙ্ক্ষাই মূলত সংস্কৃতি-পরায়ণতার প্রেরণা যোগায়। এই উত্তম্মন্যতাই স্বার্থপরতার জন্ম দেয়, এই নূতনের পিপাসা ও গতিশীলতাই মানুষের রুচি, প্রকৃতি ও প্রবৃত্তিকে সুষমা দান করে। বলিতেছিলাম সংস্কৃতির মূল উৎসের কথা। সংস্কৃতির জন্ম-প্রেরণা যেখান হইতেই আসুক না কেন, সংস্কৃতির উন্মেষ, বিকাশ ও প্রসার পরিবেশ-নিরপেক্ষ নহে। এই পরিবেশের প্রধান উপাদান ঐতিহ্য। ঐতিহ্যকে অস্বীকার করার অর্থ ভিত্তিকে অস্বীকার করা। মাটি ভিত্তি করিয়া তাজমহল দাঁড়াইয়া আছে। সেই মাটির গুরুত্ব অনেকখানি। ইহা ছাড়া তাজমহল তৈরি সম্ভব ছিল না। তেমনি ঐতিহ্য-সম্পর্ক-বিহীন সংস্কৃতি-সাধনও অসম্ভব। ঐতিহ্যে যাহা কিছু ভালো তাহার অনুসরণ এবং যাহা কিছু নিন্দনীয়, তাহার বর্জনেই নূতন জীবনাদর্শের সন্ধান মিলে। সংস্কৃতির রূপান্তর ও এই ভাবেই ঘটে। অগ্রগতিও আসে এই পথে।
>
> আমি এই প্রসঙ্গেই দুই চারিটি কথা বলিব। আগে বলিয়াছি ইয়োরোপের কথা। এখন আমাদের ঘরের কথায় আসা যাউক। ইংরেজ রাজত্ব সুপ্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর অর্থাৎ ১৮৪০ খ্রিস্টাব্দ কি ১৮৫০ খ্রিস্টাব্দের পর বাঙলা দেশে যে বিস্ময়কর হিন্দু জাগরণ আসিয়াছিল, আমার যৌবনকালে তাহার প্রত্যক্ষ প্রভাব অনুভব করিয়াছি। যেই সকল যুগন্ধর মনীষী এই হিন্দু-রেনেসাঁর মূলে ছিলেন, তাঁহাদের অনেককেই স্বচক্ষে দেখিবার এবং অনেকের সংস্পর্শে আসিবার সুযোগ আমার হইয়াছিল। উনবিংশ শতাব্দীর শেষের দিকে মুসলিম জাগরণের ক্ষীণ ধারা বেগবতী হিন্দুধারার পাশাপাশি চলিতে আরম্ভ করিল, তাহার সঙ্গে আমারও

প্রত্যক্ষ যোগ ছিল। আজ যদি আমার নিজের সম্বন্ধে একটি সত্য কথা বলি, তবে জীবন-সায়াহ্নে উপনীত মৃত্যু-প্রতীক্ষু এই বৃদ্ধকে আশা করি, আপনারা অবিনীতের অপবাদ দিবেন না। আমিই প্রথম হিন্দু-মুসলমান নির্বিশেষে বাঙালীর কাছে বিস্মৃত মুসলিম সাহিত্য-অবদানের সন্ধান দিয়াছিলাম। মধ্যযুগের এই সাহিত্যের সন্ধান, উদ্ধার, পঠন ও গবেষণা কার্যে কৈশোর হইতে আজ পর্যন্ত অক্লান্ত ভাবে জীবনের প্রতিটি দিন ব্যয় করিয়াছি। আমার বিদ্যা, বুদ্ধি, ধন-সম্পদ কিছুই ছিল না। তাই এক জীবনে যাহা সম্ভব ছিল, তাহা করিতে পারি নাই। সারা জীবন মুসলমান ভাইদিগকে এই পথে আকুল আহ্বান জানাইয়াছি, কিন্তু কেহই সাড়া দিলেন না। সেই জন্য যে দুঃসাধ্য সাধনায় ব্রতী হইয়াছিলাম, তাহা সহায়-সম্বল, সহযোগী, সম্পদের অভাবে সফল হয় নাই। তবু যতটুকু সন্ধান দিয়াছি, তাহাতে মুসলমানদের হীনমন্যতা ঘুচিয়াছে। এই মধ্যযুগের সাহিত্য চর্চা করিতে যাইয়া যাহা উপলব্ধি করিয়াছি, তাহা আজ আপনাদের কাছে মৃত্যুর আগে শেষ বারের মতো বলিয়া যাইতে চাহি। মুসলমান হিসাবে আরব-পারস্যের সঙ্গে চিরকাল আমরা একটি আন্তরিক যোগ অনুভব করিয়াছি। আবার এই দেশী আবহাওয়ায় ও অন্নে গঠিত দেহে নাড়ীর সম্পর্ক ছিল একান্তভাবে এই দেশের সঙ্গেই। ফলত আমাদের সাধনা চিরকাল দুই ধারায় প্রবাহিত হইয়াছে। একটি এই দেশের সহজে অনুভূত প্রাণবন্ত জাতীয় ধারা, অপরটি মনন-চিন্তনের ধর্মীয় বা আদর্শবাদমূলক ধারা। একদিকে ধর্মবোধে স্বাতন্ত্র্য-সাধনা, অপর দিকে জাতীয়তাবোধে সমন্বয়-সাধনা। এই দুই ধারায় আমাদের সাধনা চলিয়াছে। হিন্দুদের সাধনায়ও অনুরূপ দুইটি ধারা ছিল। ভারতবর্ষে যখন মুসলমানগণ শাসক ও অধিকারী বেশে আসিলেন, তখন রক্ষণশীল ভারতবাসিগণ এই নূতন আকৃতি প্রকৃতি এবং সম্পূর্ণ বিপরীত ধর্ম, সমাজ, রীতিনীতি, আচার, আদর্শ-বিশিষ্ট জাতির অধীনে নিজদিগকে সম্পূর্ণ অসহায় বোধ করিল। শাসক-শাসিতের মধ্যে সমঝোতা, পারস্পরিক জানাজানি অপরিহার্য হইয়া উঠিল। ফলে ধর্ম সমন্বয়ের জন্য "অল্লোপনিষৎ" রচিত হইল। দাদু, নানক, কবীর, চৈতন্যদেব প্রমুখ সাধকগণ এ পথে জীবন উৎসর্গ করিলেন; আকবর হইতে মহাত্মা গান্ধী পর্যন্ত অনেক রাষ্ট্রসাধকও এ ব্যাপারে কম চেষ্টা করেন নাই। বাঙলাদেশে চরম বাণী প্রচারিত হইল :

> "'নানা বরণ গাভীরে ভাই একই বরণ দুধ
> জগৎ ভরমিয়া চাহিলাম একই মায়ের পুত॥"
>
> "সবার উপরে মানুষ সত্য তাহার উপরে নাই।"

অথবা

দুই সমাজেই স্বাতন্ত্র্যপ্রয়াসী স্বধর্মানুগ অপর একটি দল ছিল। তাহারা সর্বত্রই মিলন-মুখী সাধনার বিরুদ্ধাচরণ করিয়া আসিয়াছেন। ভারতের অন্যান্য অঞ্চলের ন্যায় বাঙলা দেশেও মধ্যযুগীয় সাহিত্যে এই দুই ধারার সাধনা চলিয়াছে চিরকাল। আধুনিক সাহিত্যে তো আপনারা তাহা দেখিতেছেন। শেষ পর্যন্ত স্বাতন্ত্র্যবাদীরাই জয়ী হইয়াছে। ভারতে ধর্মে, সমাজে, রাষ্ট্রে কোথাও হিন্দু-মুসলমানের মিলিত জাতীয়তা গড়িয়া উঠে নাই। শেষ পর্যন্ত হিন্দু মুসলমান পৃথক হইতেও পৃথক থাকিতে বাধ্য হইয়াছে। অসংখ্য সমন্বয় সাধকের সকল সাধনা ব্যর্থ হইয়াছে।

সাহিত্য যদি জাতীয় জীবনের মুকুর-স্বরূপ হয়, তবে স্বীকার করিতে হইবে যে, যখন যে আদর্শ সাহিত্যে প্রভাব বিস্তার করে, সে-আদর্শের অন্ততঃ সাময়িক জয় সুনিশ্চিত। বস্তুতঃ জগতে, মানব জীবনে, সমাজে, ধর্মে ও রাষ্ট্রে অসাময়িক বলিয়া কিছুই নাই। সুতরাং এই সাময়িক জয়কেই চরম সাফল্য বলিতে হইবে।

আর একটি কথা বিশেষ প্রণিধানযোগ্য। তাহা এই যে সাহিত্যে জাতির ধর্ম-বোধ ও রাষ্ট্রীয় বোধের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িত। আমার নিজের কথা নয়, ইতিহাস এ সাক্ষ্যই দিতেছে। আমার বিশ্বাস, হয় সাহিত্য ধর্ম ও সমাজ তথা রাষ্ট্রীয় বোধের প্রেরণা যোগায় অথবা বিশিষ্ট ধর্ম ও রাষ্ট্রাদর্শ সাহিত্যকে প্রভাবিত করে। যে ভাবেই হউক, ফল একই দাঁড়ায় অর্থাৎ ধর্মবোধ ও রাষ্ট্রাদর্শ সাহিত্য-নিরপেক্ষ নয় অথবা সাহিত্য একধারে প্রেরণার উৎস এবং জীবনবোধের মুকুর-স্বরূপ হইয়া থাকে। যদি তাহাই হয় তবে স্বীকার করতে হইবে যে, অধুনা আমাদের সাহিত্য-সাধনা স্পষ্টতঃ দুইটি ধারায় অগ্রসর হইতেছে। একটা ঐতিহ্যানুসারী ইসলামমুখী ধারা অপরটি ইয়োরোপীয় ism অনুগ সাধনা। সত্যের খাতিরে বলিতে হয়, ইসলাম-মুখী ধারা বড়ই ক্ষীণভাবে প্রবাহিত হইতেছে; যদিও আমরা মুখে ইসলাম প্রীতি জাহির করিতেছি, কার্যতঃ তাহার যেন আশানুরূপ প্রতিফলন হইতেছে না। অপর ধারাটি তরুণ-মন আচ্ছন্ন করিয়া আছে। এমত অবস্থায় চিরদিন যাহা ঘটিয়াছে, তাহাই ঘটিবে বলিয়াই আমার আশঙ্কা। তাহা হইল আদর্শ-সংঘাত, ফলতঃ বিপ্লব অনিবার্য। অনভিপ্রেত হইলেও তাহা এড়াইয়া যাওয়া সম্ভব হইবে না। সকল দেশেই তাহা ঘটিয়াছে ও ঘটিতেছে। অবশ্য এক পক্ষ যদি নিতান্ত দুর্বল হয়, তবে আশঙ্কার কিছুই নাই। প্রতিদ্বন্দ্বিতা বা মোকাবেলা করিবার সামর্থ্য না থাকিলে দুর্বল সবলের বশ্যতা নীরবেই স্বীকার করিবে। আমি পশ্চিম পাকিস্তানের খবর জানি না। এই অঞ্চলের অবস্থা যাহা দাঁড়াইতেছে, তাহারই উল্লেখ করিলাম।

আজ প্রশ্ন উঠিয়াছে, "বাঙলা আমাদের সংস্কৃতির ভাষা হইতে পারে না। আমাদের ধর্ম, ঈমান এই ভাষায় অটুট থাকিতে পারে না।" এই প্রশ্নের কোন জবাব দেওয়া আমার কাছে লজ্জার ব্যাপার। বাদুরের ডানার ঝাপটায় চাঁদ কি মুখ কুণ্ঠিত করিয়া থাকে? না, চাঁদ বাদুরের মোকাবেলা করিতে আকাশ ছাড়িয়া নিচে নামিতে থাকে?

এই ক্ষেত্রে আমি প্রাচীন কবি-মনীষীদের কয়েকটা কথা ঐ প্রশ্নের জবাব স্বরূপ আপনাদিগকে শুনাইব মাত্র।

কবি সৈয়দ সুলতান তাঁহার "ওফাতে রসুল" [নবীবংশ] গ্রন্থ বাঙ্গালায় রচনার কারণ দর্শাইতেছেন—

> বঙ্গদেশী সকলেরে কিরূপে বুঝাইব।
> বাখানি আরব ভাষা এ বুঝাইতে নারিব॥
> যারে যেই ভাষে প্রভু করিছে সৃজন।
> সেই ভাষা তাহার অমূল্য সেই ধন॥

চট্টগ্রামের কবি বদিউদ্দিন তাঁর "সিকতে ঈমান" গ্রন্থে বলিতেছেন

> দীন ইস্‌লামের কথা শুন দিয়া মন।
> দেশী ভাষে রচিলে বুঝিব সর্বজন॥

সন্দ্বীপ-নিবাসী কবি আবদুল হাকিম তাঁর "নূরনামা" গ্রন্থে লিখিতেছেন—

যে সব বঙ্গেত জন্মি হিংসে বঙ্গ বাণী।
সে সব কাহার জন্ম নির্ণয় না জানি॥
মাতা পিতামহ ক্রমে বঙ্গেত বসতি।
দেশী ভাষা উপদেশ মনে হিত অতি॥
দেশী ভাষা বিদ্যা যার মন না জুড়ায়।
নিজ দেশ তেয়াগি কেন বিদেশে না যায়॥

নসরুল্লাহ্ খোন্দকার তাঁর "মুসার সওয়াল" নামক ধর্ম বিষয়ক গ্রন্থে বাঙ্গালায় রচনায় হেতু নির্দেশে বলিতেছেন—

... বুঝিবারে বাঙ্গালে সে কিতাবের বাণী।
আপনে বুঝন্ত যদি বাঙ্গালের গণ।
ইচ্ছা সুখে কেহ পাপে না দেয়ন্ত মন॥

অর্থাৎ ধর্ম কথা বাঙ্গালায় বুঝিলে কেহ স্বেচ্ছায় পাপে মন দিবে না।

আজ বোধ হয় তাঁহারা দেশকে পাপে ডুবাইতে চাহেন, যাঁহারা প্রশ্ন তুলিয়াছেন বাঙ্গালা ভাষা আমাদের সংস্কৃতি বাহন হইতে পারে না।

১৩৪০ সালে চট্টগ্রাম জেলা সাহিত্য-সম্মিলনীর সভাপতি রূপে আবদুল করিম তাঁহার অভিভাষণে বলেন—

"বাঙ্গলার যে-যুগে মুসলমানদের মধ্যে আধুনিক বাঙ্গলা সাহিত্য-চর্চার উন্মেষ হয়, আমরা সেই যুগেরই উদয় এবং সেই যুগেরই অস্তভাগী।... এই যুগে যাঁহারা বাঙ্গালা ভাষার সেবায় বিভিন্নভাবে আত্মনিয়োগ করিয়া ছিলেন, তন্মধ্যে আমিই ছিলাম পাল হইতে পলাতক।... আমার সহকর্মীরা আরবী-ইরানী-তুরানী জাতভাইদের কীর্তিকলাপ আলোচনা করিয়াছেন, বাঙ্গালা ভাষার ভিতর দিয়া তাহা আমাদের সমীপে উপস্থিত করিয়াছেন। আমি ছিলাম বাঙ্গলা ভাষায় মুসলমানদের প্রাচীন অবদানের তথ্য উদঘাটনে তৎপর।... আমি করিয়াছি আমার পাশের বাড়ির মুসলমানের, আমার দেশের জাত ভাইদের সাহিত্যের ক্ষেত্রে কীর্তিকলাপ সংগ্রহ। তৎসঙ্গে যদি প্রতিবেশী হিন্দু ভাইদের জন্য কিছু করিয়া থাকি, তজ্জন্য আমি লজ্জা বোধ করি না; কেননা ইহাও আমার কর্তব্যের মধ্যে অন্যতম। আমি সোজা কথায় ইহাই বুঝি, আমার দেশের জাতভাইরা দেশের জন্য কি করিয়াছিলেন, তাহাই যদি জানিতে না পারিলাম, তবে পরের দেশের ও বিদেশীয় ভাইদের কথা জানিয়া কি হইবে?

তিনি ১৩৪৬ সনে কোলকাতায় বঙ্গীয় মুসলমান সাহিত্যসম্মেলনে মূল সভাপতির ভাষণে বলেন,

'সাহিত্য জাতিধর্মের গণ্ডী আমি কখনো স্বীকার করি নাই, এখনো করি না, কিন্তু ইহার বৈচিত্র্য স্বীকার করি। সাহিত্য হিন্দু-মুসলমান-বৌদ্ধ খ্রিস্টান যে জাতিরই হইক, ইহা সাহিত্য পদবাচ্য হইলেই সর্বজনীন হইয়া থাকে।... সাহিত্যিক সৌন্দর্যের পরিসর বহু বিস্তৃতির সম্ভাবনায় পূর্ণ। শুধু জাতিধর্মের ক্ষুদ্র গণ্ডীতে ইহাকে আবদ্ধ করিয়া রাখিলে ইহার পরিসর সীমাবদ্ধ হয়, সৌন্দর্য্যের সকল দিক স্বতঃস্ফূর্ত হইতে পারে না। মুসলমানের সাহিত্য সর্বজনীন সাহিত্যিক সৌন্দর্যের বিচিত্র ভঙ্গীর একদিক মাত্র। হিন্দুসাহিত্যও তদ্রূপ আর একদিক।... আমার দেশের সাহিত্য বহু প্রসারিত হউক, বহু বৈচিত্র্য ও গুণের আধার হইয়া উঠুক, ইহাই আমার চিরজীবনের কামনা।'

প্রথম যৌবনেও এ উদারপ্রাণ অসাম্প্রদায়িক চেতনার সংস্কৃতি বান পুরুষ যারা বাঙলাভাষার বিরোধিতা করে, সেসব দেশজ মুসলিমকে লক্ষ্য করে বলেছেন, "কেনে অধঃপতিত সমাজের বা জাতির যদি কখনও কিছু হওয়ার আশা থাকে, তবে তাহা জাতীয়ভাষার সহায়তাতেই হইবে, অন্য কিছুতেই হইতে পারে না। বঙ্গভাষা ত্যাগ করিতে গেলে একই ভাগ্যসূত্রে গ্রথিত আমাদের হিন্দুভ্রাতৃগণকেও ত ত্যাগ করা হইবে। [অথচ] হিন্দু মুসলমান একই পাদপের দুইটি প্রধান শাখা বা একই দেহের দুইটি অবয়ব ভিন্ন আর কিছু নহে।

—ইসলাম প্রচারক, জানুয়ারি, ১৯০৩, পৃঃ ২১-২২ [শ্রাবণ। ফাল্গুন ১৩১০?]

আবদুল করিম বলেছেন :

'মুসলমান দাত্রীর ক্রোড়াশ্রয়েই ইহা [বঙ্গভাষা] প্রতিপালিত ও পরিবর্ধিত হইয়াছে।' হিন্দু-মুসলমানেরা এ যৌথ সম্পদ ছাড়া স্বেচ্ছায় 'স্বাধিকারচ্যুত' হওয়ারই নামান্তর।

[নবনূর, জ্যৈষ্ঠ ১৩১১, পৃ. ৫৯।

তিনি আরও বলেছেন,

এ-"কথা আমি জোর করিয়া বলিতে পারি, মুসলমানেরা আপন জাতীয় ধর্মীয়, সংস্কৃতি ও সভ্যতা-গত বৈশিষ্ট্য ও বৈচিত্র্য লইয়া বাঙ্গলা ভাষার সেবা করিলে বাঙ্গলা ভাষা ও সাহিত্য অতুল ও অনুপমেয় মূর্তি ধারণ করিবে।"

[মাসিক মোহাম্মদী : জ্যৈষ্ঠ, ১৩৪৬]

"আমার এই বিশ্বাস আছে যে, আমার দেশের মৃত্যু নাই; আমার দেশের আত্মা যে জনগণ, তাহারও মৃত্যু নাই; তেমনই অমর আমার এই বাঙ্গলা ভাষা।"

দিলরুবা : ভাদ্র, ১৩৫৯।

[কুমিল্লা সম্মেলনে প্রদত্ত বক্তৃতা ১৩৫২ সন]

আবদুল করিম লিখেছেন,

'হিন্দু ও মুসলমানের ধর্ম, আদর্শ ও ঐতিহ্য ভিন্ন হইতে পারে। তাহাদের সৃষ্ট সাহিত্য ও স্ব স্ব ধর্ম, আদর্শ ও ঐতিহ্য অনুরূপ হইতে পারে, কিন্তু পদ্ম-যুই-শেফালিকার পার্শ্বে, গুলাব-নার্গিস-হাস্নাহেনার বাগান গড়িয়া উঠিলে শোভা দ্বিগুণ বর্ধিত হইবে বই কমিবে না, কোকিল ও বুলবুলের পরস্পর জানাজানির মধ্যে এক মহাবাণী ফুটিয়া উঠিবে। হিন্দু-মুসলমান ও পাশ্চাত্য ভাবধারা মিলিয়া বঙ্গ-সাহিত্য ভাবের ত্রিবেণী সঙ্গম সৃষ্ট হইবে। সেই ভাবের তীর্থ-সলিলে অবগাহন করিয়া বাঙ্গালীর মন পবিত্র হইবে, বাঙ্গালী ধন্য হইবে।

[স্মারকগ্রন্থ পৃঃ ১১২]

তিনি ১৯১৮ সনে চট্টগ্রাম সম্মেলনের অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতির ভাষণে মুসলিম লেখকদের আরবী-ফারসী শব্দপ্রীতি প্রসঙ্গে বলেন :

'আধুনিক সাহিত্যে নূতন ব্রতী হইলেও সাহিত্যক্ষেত্রে আমরা নূতন ব্রতী নহি। হিন্দুর মত আমাদেরও সাহিত্যের একটা সুদৃঢ় বুনিয়াদ আছে। সেই বুনিয়াদের উপরেই আমরা সাহিত্যের নূতন হর্ম্য নির্মাণ করিতে পারি।... বাঙ্গলার বর্তমান ভাষা ব্যবহার করিয়াও আমাদের সাহিত্যকে ইসলামী সাহিত্যে পরিণত করা অসম্ভব নহে। ভাবসম্পদে সম্পন্ন না হইলে শুধু শব্দসম্পদে কোন সাহিত্য জাতি বিশেষের প্রকৃত সাহিত্য পদবাচ্য হইতে পারে না। ভাষা চিরদিন ভাবের অনুগামিনী, ভাব ভাষার অনুগামী নহে।

বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার বাহন সম্পর্কে তিনি তাহাতে দৃঢ়তা-সহকারে বলেন :

> "মাতৃভাষার সহায়তা ভিন্ন জাতীয় উন্নতি কেবল সুদূর পরাহত নয়, সম্পূর্ণ অসম্ভব। এজন্য আমাদের শিক্ষার বাহন মাতৃভাষা বাঙ্গলাই হওয়া উচিত। ... আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়ে আমাদের মাতৃভাষা বাহন হইবে না কেন, তাহা আমি বুঝিতে পারি না।"

তিনি আরো বলেছেন :

> বাংলাদেশ ছিল পরাধীন এবং বাঙলা ভাষা রাজভাষা বা আদালতের ভাষা ছিল না। যাঁহারা জ্ঞানী তাঁহারা দর্শনশাস্ত্র, ধর্মীয়শাস্ত্র প্রভৃতি চর্চা করিতেন। কিন্তু তাঁহারা বাঙলা ভাষার দিকে ফিরিয়াও তাকান নাই। ফলতঃ বাঙলা ভাষা অশিক্ষিত গ্রাম্য কবির কবিত্ব প্রকাশের বাহনরূপ হইয়া রহিল। উৎসাহ, পৃষ্ঠপোষকতা, ভাষার সর্বজনীন চর্চা ও শিক্ষিত মননশীলতার অভাবে তৎকালীন বাঙলা ভাষায় উৎকৃষ্ট সাহিত্য গড়িয়া উঠিতে পারে নাই। মাতৃভাষার ভিতর দিয়া ধর্মীয় ও নৈতিক আদর্শের বিষয় জানিতে না পারিলে এবং জ্ঞানী ও দার্শনিকের ভাবগত সঙ্গ না পাইলে সামাজিক উন্নত আদর্শের আশা করা বিড়ম্বনামাত্র। সুকর্ষিত ক্ষেত্রের অভাবে উত্তম বীজও অঙ্কুরিত হয় না।
>
> [স্মারকগ্রন্থ : পৃ. ১১৩]

৫. আবদুল করিমের সত্তার ও সাধনার স্বরূপ

আবদুল করিম সাহিত্যবিশারদ প্রাতিষ্ঠানিক সাহায্য-সহায়তা বা প্রেরণা ছাড়াই পুথির সংগ্রহের, সংরক্ষণে ও পরিচায়নে সারাজীবন অতিবাহিত করেছেন, তাছাড়া বিদ্বৎসমাজ থেকে দূরে মফস্বল শহরে এ নিঃসঙ্গ কেরানী দেশের মানুষের ও সাহিত্যের প্রতি অকৃত্রিম প্রীতিবশেই বিরামহীন ক্লান্তিহীনভাবে সময়, শ্রম, ধৈর্য ও অধ্যবসায়-সাধ্য এ কর্মে সারা জীবন নিষ্ট থাকতে পেরেছিলেন, কাছে ও পাশে সমঝদার পাঠক, প্রকাশক ও পরামর্শদাতা বন্ধু বা অনুরাগী থাকলে তিনি হয়তো আরো কিছু মূল্যবান পুথি সম্পাদনা করতেন, তাঁর আবিষ্কৃত পুথি ও কবিদের নিয়ে বাঙলা প্রণয়োপাখ্যান, জঙ্গনামা, মুসলিম ধর্মসাহিত্য, লোকশিক্ষামূলক সওয়াল-সাহিত্য, জীবনীসাহিত্য, অবৈষ্ণব-পদাবলী প্রভৃতি সম্বন্ধে বাঙলা সাহিত্যের ইতিহাসের নতুন অধ্যায়গুলো তাঁর আকাঙ্ক্ষানুযায়ী রচনা করে যেতে পারতেন।

এ শতকের প্রথম দুই দশকের মধ্যেই 'বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদে'র উদ্যোগে লালগোলার উদারহৃদয় বিদ্যোৎসাহী সংস্কৃতিপ্রাণ দানবীর জমিদার রায় যোগীন্দ্রনারায়ণ রাও বাহাদুরের অর্থানুকূল্যে আবদুল করিমের সম্পাদিত কয়েকখানি কাব্য মুদ্রিত ও প্রকাশিত হয়েছিল। মাঝারি কলেবরের কাব্য কাজী দৌলতের 'সতীময়না-লোরচন্দ্রানী'র কিংবা দৌলতউজির বাহরাম খানের 'লায়লী-মজনু'র প্রতিলিপি সম্পাদনার উদ্দেশ্যে স্বহস্তে তৈরি করলেও প্রকাশক পাওয়া অসম্ভব বুঝেই সম্পাদনার কাজে হাত দেন নি। পণ্ডিতকবি আলাউলের 'পদ্মবতী'র অর্ধাংশ সম্পাদনা করে পত্র মাধ্যমে ও লোক মারফৎ ধনীর কাছে ধর্না দিয়ে, প্রকাশকের দয়া চেয়ে সুদীর্ঘ দুই যুগ ধরে কেবল প্রত্যাখ্যাতই হয়েছিলেন। তাই তিনি পুথি সম্পাদনায় ও গ্রন্থ রচনায় উৎসাহ হারিয়ে কেবল প্রবন্ধ রচনায় ছিলেন নিরত। বাঙলাদেশে একসময়ে হেন

সাময়িক পত্রিকা ছিল না, যাতে আবদুল করিমের ছোট-বড়-মাঝারি যে-কোনো মাপের কোনো একটি প্রবন্ধ অন্তত প্রকাশিত হয় নি। পুথি পরিচিতির বা বাঙলা একাডেমী প্রকাশিত স্মারকগ্রন্থের পরিশিষ্টে মুদ্রিত তাঁর প্রবন্ধের অসম্পূর্ণ তালিকাই তার সাক্ষ্য। বাঙলা একাডেমীর মতো প্রতিষ্ঠান তার জীবৎকালে থাকলে তিনি বহুকাব্য সম্পাদনায় এবং মধ্যযুগের সমাজ, সাহিত্য, লোক-সাহিত্য ও সংস্কৃতি বিষয়ক মৌলিক গ্রন্থ রচনায় আগ্রহী হতেন ও উৎসাহ পেতেন। প্রতিকূল পরিবেশে দেশ-জাতি এভাবে তাঁর সাধনার প্রত্যাশিত প্রসূন ও ফসল থেকে রইল বঞ্চিত।

আবদুল করিম যে কেবল যান্ত্রিক পদ্ধতিতে পুথির পরিচায়ক মাত্র ছিলেন না, তাঁর চোখ-কান-বুদ্ধি ও বিবেক-বিবেচনা যে-সমকালীন দেশ-দুনিয়া, সমাজ-সংস্কৃতি সচেতন ছিল, তাঁর সাক্ষ্য মিলবে তাঁর রচিত প্রায় পাঁচ-ছয়শ' প্রবন্ধের সংগ্রহ কয়েক খণ্ডে বাঙলা একাডেমী বা অন্য কোনো প্রতিষ্ঠান প্রকাশিত করে লোক-গোচরে আনার ব্যবস্থা করলে। ইতিহাস ও অন্যান্য সাময়িক বিষয়েও যে আবদুল করিমের আগ্রহ ও রচনা ছিল, তার প্রমাণস্বরূপ পুথি-বহির্ভূত বিষয়ে তাঁর প্রবন্ধাবলীর একটি অসম্পূর্ণ তালিকা এ পুস্তিকায় সংকলিত হল। পুথি-পরিচিতিতে ও স্মারকগ্রন্থে রয়েছে বলে তাঁর প্রবন্ধাবলীর তালিকা এখানে সংযোজিত হল না। তিনি যে ১৯০৫ সনে বঙ্গভঙ্গের বিরুদ্ধে এবং স্বদেশী আন্দোলনের ও অসহযোগের পক্ষে ছিলেন তা কোন কোন প্রবন্ধ থেকে জানা যাবে।

সাহিত্যবিশারদ-লিখিত ও বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ প্রকাশিত দুই খণ্ড পুথির বিবরণ ধৃত অনেক পুথিই তিনি সংগ্রহ করতে পারেন নি, মালিকেরা পুথি স্বেচ্ছায় তাঁকে দিতে বা তাঁর কাছে সংস্কার ও মমতাবশে বিক্রয় করতে রাজী হন নি বলে। সেগুলোর বিবরণ তিনি স্বয়ং বহুবছর ধরে গ্রামে গ্রামে ঘরে ঘরে মালিকের বাড়িতে বসে বহু সময় ও শ্রম ব্যয় করে শারীরিক কষ্ট ও আর্থিক ক্ষতি স্বীকার করে পুথি পড়ে প্রয়োজনীয় অংশ নকল করে পরিচায়ক বিবরণ লিখেছেন। এমনি ধৈর্য-অধ্যবসায়-আগ্রহ সহকারে আর কোনো ব্যক্তি দেশের ও জাতির খাতিরে সাহিত্যের সেবা ও অনুশীলন করেছেন বলে আমাদের জানা নেই। বৈষয়িক স্বার্থোদ্ধারের কিংবা পারমার্থিক সিদ্ধির জন্যেই বা এমনি কৃচ্ছ্রসাধনা জগতে কয়জনে করে ও করেছে। সাধারণের চোখে নিতান্ত তুচ্ছ অনাকর্ষণীয় ও অপাঠ্য পুথির জন্যে আত্মোৎসর্গ করেছেন বলেই হয়তো অসামান্য অতুল্য সাধক আবদুল করিমের গুণ-মান-মাহাত্ম্য রয়েছে অস্বীকৃত আর তাঁর শ্রম-সাধনা-একাগ্রতা এড়িয়েছে লোকের দৃষ্টি। তাই তিনি সারাজীবন প্রাপ্য সম্মান-শ্রদ্ধা-সাহায্য-সমর্থন পান নি প্রত্যাশিত মাত্রায় ও প্রয়োজনীয় পরিমাণে। তাঁর প্রিয় কবি আলাউলের 'পদ্মাবতী' মুদ্রণের জন্যে অর্থসাহায্য মেলে নি, তিনি ব্যর্থতার বেদনা নিয়ে বিদায় নিয়েছেন জগৎ-সংসার থেকে।

এ সূত্রে তাঁর নামের সঙ্গে যুক্ত 'মুনশী' শব্দের তাৎপর্য ভুল ধারণা অপনোদনের জন্যে ব্যাখ্যা করা প্রয়োজন মনে করছি। মুঘল আমলে ফারসীতে পণ্ডিত-বিদ্বান-শিক্ষিতদের 'মুনশী' নামের সম্বোধন ও অভিহিত করা হত। ব্রিটিশ আমলের গোড়ার দিকেও তাই উকিল, লেখক, নকলকার প্রভৃতি 'মুনশী' নামে ছিলেন আখ্যাত! ইংরেজী শিক্ষা ও ইংরেজী ভাষা অফিসে চালু হওয়ার পরে মর্যাদার পার্থক্য জ্ঞাপন লক্ষ্যে বড় চাকুরেরা 'মিস্টার', বি-এ পাশেরা 'মৌলবী' এবং তার চেয়ে কম শিক্ষিতরা 'মুনশী' নামে অভিহিত হতে থাকেন। আবদুল করিমও সে-সংজ্ঞায় মুনশী।

আবদুল করিমের পরিচায়িত সব পুথি তাঁর সংগ্রহে ছিল না। অর্থের বিনিময়েও সংস্কার বা মমতাবশে পূর্বপুরুষের রিক্থ হাতছাড়া করতে চাইত না, তেমন লোকের সংখ্যাই ছিল বেশি। কাজেই আবদুল করিমের পুথিশালায় ছিল হাজার খানেক পুথি [এর মধ্যে ডক্টর মুহম্মদ এনামুল হক-সংগৃহীত ত্রিশ খানার মতো পুথি ছিল]।

ডক্টর মুহম্মদ শহীদুল্লাহ পুনরায় ১৯৪৮ সনের দিকে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাঙলা বিভাগে যোগদান করেই সাহিত্যবিশারদের সংগ্রহশালা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্যে ক্রয় করার প্রস্তাব দেন। সাহিত্যবিশারদ নৈতিক চেতনাবশে পুথি বিক্রয়ে রাজি হন নি। তাঁর যুক্তি ছিল—'সব পুথি আমি ক্রয় করি নি, লোকে স্বেচ্ছায় যেসব পুথি আমাকে দিয়েছেন, সে-সব পুথি বিক্রয় করে অর্থভোগ করা নীতি-ধর্ম-বিবেক বিরোধী নয় কেবল, আত্মসম্মানেরও হানিকর। ডক্টর শহীদুল্লাহর আগ্রহাতিশয়তায় ও মধ্যস্থতায় তিনি মুসলিম রচিত পুথিগুলো ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে বিনাশর্তে দান করলেন ১৯৫০ সনে।

সাহিত্যবিশারদের ইচ্ছার ও নৈতিকচেতনার গুরুত্ব স্বীকার করেই আমি তাঁর হিন্দু-রচিত পুথিগুলো ১৯৫৩ সনে রাজশাহীর বরেন্দ্র রিসার্চ মিউজিয়ামে দান করি। আর তাঁর সাময়িক পত্রিকার বিপুল সংগ্রহই ১৯৭৮ সনে চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের দান করি। দেশ-দুনিয়ার খুব কম লেখক-মনীষী-বিদ্বানই নিজের বইপত্র দান করেছেন। বিক্রয় করেছেন অনেকেই। এ ক্ষেত্রে আবদুল করিমের নির্লোভতা ও নীতি-আদর্শে নিষ্ঠা অবশ্য স্বীকার্য। এ সূত্রে উল্লেখ্য যে তাঁর গৃহ-পরিচালিকার সন্তান ওলি হোসেনকে তিনি নিজ ব্যয়ে স্কুলে পড়াতেন, সে যখন সপ্তম-দশম শ্রেণীর ছাত্র তখন শেলফে দু'প্রস্ত করে রাখা সাময়িক পত্রিকা পেছনের সারি থেকে নিয়ে মুদির দোকানে বিক্রি করে পান-বিড়ি-চা-নাস্তা খেতে থাকে। যখন টের পাওয়া গেল তখন অর্ধেকের মতো পত্রিকা এভাবে খোয়া গেছে। তবু চারহাজারোর্ধ্ব সংখ্যার সাময়িকপত্র চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় দান করা সম্ভব হয়েছে। অধ্যাপক মুহম্মদ আবদুল হাইয়ের ব্যবস্থায় পুথিগুলোর বিবরণ 'পুথি-পরিচিতি' নামে যথাসময়ে ১৯৫৮ সনে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাঙলা বিভাগ থেকে প্রকাশিত হয়েছিল। এবং ডক্টর সৈয়দ সাজ্জাদ হোসাইন-কৃত ইংরেজী অনুবাদও প্রকাশিত হয়েছিল ঢাকার এশিয়াটিক সোসাইটি অব পাকিস্তান [এখনকার বাঙলাদেশ] থেকে ডক্টর আহমদ হাসান দানীর প্রবর্তনায় ১৯৬০ সনে। এ সংগ্রহে মোট পুথি সংখ্যা বাঙলা ৫৮৫, ফারসী-১০, উর্দু-২। রাজশাহী কলেজের তখনকার বাঙলার অধ্যাপক ডক্টর মুহম্মদ এনামুল হকের আগ্রহে ও পরামর্শে সাহিত্যবিশারদের মৃত্যুর পরে ১৯৫৩ সনেই হিন্দু রচিত পুথিগুলো দান করলাম রাজশাহীর বরেন্দ্র রিসার্চ মিউজিয়ামে। তখন তার সেক্রেটারি ছিলেন অধ্যাপক মীর জাহান। পুথির সঙ্গে সাহিত্যবিশারদ লিখিত পুথির বিবরণের পাণ্ডুলিপি এবং সাহিত্যবিশারদ সম্পাদিত পদ্মবতীর অর্ধাংশের পাণ্ডুলিপিও জমা দেয়া হল। এ দুটো এবং সাহিত্যবিশরাদ রচিত প্রবন্ধাবলীর সংকলন অবিলম্বে প্রকাশিত করবে মিউজিয়াম—এমন লিখিত শর্ত ছিল*। কিন্তু অর্থাভাবে সুদীর্ঘকাল এ অঙ্গীকার পালন করতে পারেন নি কর্তৃপক্ষ। বরেন্দ্র রিসার্চ মিউজিয়াম থেকে ফেরত প্রাপ্ত আবদুল করিম সম্পাদিত পদ্মাবতীর 'একতৃতীয়াংশ' পরে 'আলাওলের পদ্মাবতী : আবদুল করিম সাহিত্যবিশারদ সম্পাদিত, নামে

* লিখিত চুক্তিপত্রের প্রতিলিপি ও বিস্তৃত বিবরণ চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের বাঙলা বিভাগ প্রকাশিত আবদুল করিম সাহিত্যবিশারদ সম্পাদিত 'পদ্মাবতীর প্রথমাংশে ভূমিকায় দ্রষ্টব্য।

চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা সাহিত্য সমিতি ১৯৭৭ সনে প্রকাশিত করেছেন। বরেন্দ্র রিসার্চ মিউজিয়ামে প্রদত্ত হিন্দু রচিত পুথির সংখ্যা — ৩৪৮ + নামহীন ৩৩ খানা, মোট ৩৮১ খানা, এগুলোর নামসার তালিকা দেয়া হয়েছে মণীন্দ্রমোহন চৌধুরী সংকলিত 'রাজশাহী বরেন্দ্র রিসার্চ মিউজিয়ামের বাংলা পুথির তালিকা' নামের ক্যাটালগে।

সাহিত্যবিশারদের সাহিত্যকর্মের সুবিন্যস্ত সামগ্রিক চিত্র পেতে হলে ১৮৯৬ সন থেকে ১৯৫৩ সন অবধি তাঁর লিখিত সর্বপ্রকার রচনার, তাঁর আবিষ্কৃত কবির কাব্যের তাঁর পরিবেশিত তথ্যের ও তত্ত্বের সামূহিক-সামষ্টিক রূপ চোখের সামনে থাকা আবশ্যিক। এ কাজ কে বা কারা কবে কোথায় কোন্ প্রতিষ্ঠানের উদ্যোগে ও অর্থে করবেন, তা আজ এ মুহূর্তে কল্পনা করাও অসম্ভব। এ সত্ত্বেও দীনেশচন্দ্র সেন, সুকুমার সেন, মুহম্মদ শহীদুল্লাহ, মুহম্মদ এনামুল হক, অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, আশুতোষ ভট্টাচার্য, সুখময় মুখোপাধ্যায় কাজী দীন মুহম্মদ, জে.সি. ঘোষ প্রমুখ মধ্যযুগের বাঙলা সাহিত্যের ইতিহাস লেখক মাত্রই তাঁর কাছে অবশ্যই ঋণী। মুহম্মদ এনামুল হকের 'মুসলিম বাঙ্গলা সাহির্ত্যের মধ্যযুগাংশ, মুহম্মদ শহীদুল্লাহর 'বাংলা সাহিত্যের কথা [মধ্যযুগ]-এর মুসলিম রচিত সাহিত্যাংশ [দোভাষী পুথির অংশ ছাড়া] এবং কাজী দীন মুহম্মদের ইতিহাসেরও ওই অংশ আর শাহেদ আলীর পুরো বই বাংলা সাহিত্যের চট্টগ্রামের অবদান' সাহিত্যবিশারদের আবিষ্কারনির্ভর।

পনেরো শতকের শাহ মুহম্মদ সগীর, জয়েনউদ্দীন, ষোল শতকের দৌলত উজির বাহরাম খান, মুহম্মদ কবির, শেখ ফয়জুল্লাহ, সৈয়দ সুলতান, শা'বারিদ খান, মুহম্মদ আকিল, হাজী মুহম্মদ নেওয়াজ, শেখ পরাণ, সতেরো শতকের কাজী দৌলত, মাগনঠাকুর, দোনাগাজী, আলাওল এবং আঠারো শতকের আলীরজা, মুহম্মদ ফসীহ প্রমুখ প্রায় শতেকজন কবির ও তাঁদের কাব্যের প্রথম আবিষ্কর্তা ও পরিচায়ক আবদুল করিমই, এঁদের মধ্যে রয়েছেন ষোল শতকের দ্বিজ শ্রীধর কবিরাজ, দ্বিজ মাধব, কবীন্দ্র পরমেশ্বর, শ্রীকর নন্দী, রতিদেব, রামরাজা, মুক্তারাম সেন, দ্বিজ লক্ষ্মণ, গোবিন্দদাসও পদকার প্রভৃতি প্রায় ত্রিশোর্ধ্ব হিন্দু কবিও। [পুথি পরিচিতির পরিশিষ্ট এবং মণীন্দ্রমোহন চৌধুরী সংকলিত 'বরেন্দ্র রিসার্চ মিউজিয়ামের তালিকা' দ্রষ্টব্য] মধ্যযুগের বাঙলা সাহিত্যের পূর্ণাঙ্গ ইতিহাসের সাত আটটি অধ্যায় আবদুল করিম আবিষ্কৃত কবি-কাব্য, তথ্য-তত্ত্ব ও নতুন বিষয় নির্ভর করেই লিখতে হয়, যেমন নাথসাহিত্য, সুফীসাহিত্য, প্রণয়োপাখ্যান, জঙ্গনামা বা যুদ্ধকাব্য, মুসলিম ধর্মসাহিত্য, লোকশিক্ষালক্ষ্যে রচিত প্রশ্নোত্তরে লিখিত সওয়াল-সাহিত্য, মুসলিম কবি রচিত বৈষ্ণবতত্ত্বরিক্ত রাধাকৃষ্ণপদ এবং অবৈষ্ণব চরিতসাহিত্য—বাঙলা-সাহিত্যের অসাম্প্রদায়িক পূর্ণাঙ্গ ইতিহাসের এগুলা অপরিহার্য আবশ্যিক অঙ্গ। আবদুল করিমের একক সাধনার গুরুত্ব তবু যেন আজো অস্বীকৃত।

আজ আর এ সত্য স্বীকার না করে পারা যাবে না যে আবদুল করিম আবিষ্কৃত মধ্যযুগের মুসলিম কবি ও কাব্য পরিচিতি এবং কাজী নজরুল ইসলামের সাড়াজাগানো, চমকলাগানো, ভয়ভাঙানো, স্বাধিকারচেতনা ঘটানো কবিতা ও গানই উর্দুভাষী নেতার খপ্পরে-পড়া মাতৃভাষা স্বীকারে দ্বিধান্বিত বাঙালী মুসলিমদের ১৯৩০ সনের দিকে নির্দ্বিধায় বাঙলা ভাষাকে মাতৃভাষা রূপে নিঃসংশয়ে গ্রহণের প্রেরণা ও প্রবর্তনা দিয়েছিল। বাঙলাকে মাতৃভাষারূপে বরণ স্বদেশে প্রবাসী মনস্ক বাঙালী মুসলিমের রাজনীতিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও আচারিক জীবনে একটি অতিগুরুত্বপূর্ণ ঐতিহাসিক ঘটনা। বাঙালী সত্তার উন্মেষ ও বিকাশ ঘটে এ চেতনাকেই ভিত্তি বা শিকড় করেই। স্বাতন্ত্র্যবুদ্ধি, আর্থিক শোষণমুক্তি, বাঙলাকে রাষ্ট্রভাষা করার দাবি, ব্যবসা-

বাণিজ্যে সেনাবাহিনীতে ও অন্যান্য চাকুরিতে জনসংখ্যা ভিত্তিতে বণ্টন ব্যবস্থার দাবি প্রভৃতি দেশ-কালহীন স্বধর্মীর ভ্রাতৃত্বের, জাতীয়তার, মোহমুক্তির ও মুসলিমমাত্রেরই অভিন্ন স্বার্থ-চেতনার বিলুপ্তির কারণ হয়ে দাঁড়ায় ওই মাতৃভাষাচেতনা —যা' যুগপৎ বাঙালীদের বিশ্বমুসলিমের অভিন্ন জাতীয়তা ও স্বার্থচেতনাজাত প্রবাসমনস্কতা ঘুচিয়ে দেশের মাটিকে, মানুষকে ও ভাষাকে নিজের সত্তা-লগ্ন বলে ভাবতে, বুঝতে ও মানতে শিখিয়েছে। আবদুল করিমের তুচ্ছ পুথি আবিষ্কার এবং কাজী নজরুল ইসলামের কবিতা ও গান এভাবে জাতি-চেতনার শিকড় এবং আত্মোপলব্ধির কারণ হয়ে দাঁড়াল। জাতীয় জীবনে আবদুল করিমের এ ঐতিহাসিক ভূমিকার তাৎপর্য জাতীয় ইতিহাসেই বিশ্লেষিত হওয়ার দাবিদার।

৬. আবদুল করিম সাহিত্যবিশারদের অবদানের মূল্যায়ন

আগেকার দিনে পৃথিবীর কোথাও সর্বজনীন শিক্ষা চালু ছিল না। প্রায় সব দেশের সব নারী-পুরুষই থাকত নিরক্ষর। হাজারে পাঁচ সাতজন থাকত শিক্ষিত। সেকালে শাস্ত্র জানার ও প্রয়োগের জন্যে কিছু লোক এবং রাজস্ব আদায় প্রভৃতি কাজের জন্যে কিছু লোক স্বাক্ষর বা স্বল্পশিক্ষিত হলেই দেশ চলত। এ কালের মতো এতো লোকসংখ্যাও ছিল না, ছিল না এমন বিশ্বজোড়া আন্তর্জাতিক সম্পর্ক। ফলে ছিল না এতো কাজকর্ম ও এতো সরকারি বেসকারি অফিস-কারখানা-আড়ৎ-গদী।

আমাদের দেশ চিরকাল বিদেশী-বিজাতির শাসনে ছিল বলে আমাদের দেশে শিক্ষার প্রসার আরো কম ছিল। কিছু মুনশী-মোল্লা-মুয়াজ্জিন মৌলবী কাজি উকিল-কায়েত-মুহরী-নায়েব -গোমস্তা-পাটোয়ারি দিয়েই দেশ চলত। হিন্দুদের মধ্যেও শাস্ত্রী-পূজারী-বামুন আর কিছু কায়স্থই ছিল অল্প-স্বল্প-শিক্ষিত। এরাই রাখতেন দেশের মানুষের শাস্ত্রের, সাহিত্যের, সঙ্গীতের ইতিবৃত্তের খবর। এদেরই কেউ পুথি-পাঁচালী পড়ে পড়ে বা উৎসবে পার্বণে আসরে গেয়ে গেয়ে নিরক্ষর গ্রামবাসীদের জানাতেন শাস্ত্রকথা, পরিবেশন করতেন সাহিত্যরস, শোনাতেন সঙ্গীত, উপকথা-রূপকথার মতো করে বলে বেড়াতেন সে-যুগের রাজা রাজড়ার কথা, বেণে-সাদগরের কিস্সা, দেশ-দেশান্তরের খবর।

সেকালে পুঁথি-পাঁচালী ছিল, লেখা হত ভূর্জপাতায়, তালপাতায় ও পুরু তুলোট কাগজে। যত্নের সঙ্গে হাতে লিখতে হত বলে একটা বই নকল করতে ছয় মাস কিংবা বছর লেগে যেত একজনের। যত্ন ও পরিশ্রম-সাধ্য ছিল বলে পুঁথির পাণ্ডুলিপি বা অনুলিপি-প্রতিলিপি ছিল দুর্লভ।

এদিকে ইংরেজদের চেষ্টায় বাঙলা ছাপাখানাও চালু হল ১৭৭৮ সন থেকে। বাঙালীরাও কোলকাতায় উনিশ শতকের উষাকাল থেকেই ছাপাখানা স্থাপন করে, এমনকি কোথাও কোথাও মফস্বল শহরেও। তখন থেকে ছাপা বই মুদ্রিত গ্রন্থ স্বল্পসময়ে সস্তা দামে পাওয়া যেতে থাকে। পড়তে, ধরতে, বয়ে নিতে সুবিধে এই ছাপা বই পেয়ে গাঁ-গঞ্জের শহরে-বন্দরের মানুষ ক্রমে অল্পকালের মধ্যেই হাতে লেখা পুঁথি-পাঁচালীর কথা ভুলে গেল।

আবার কোলকাতা তখন সারা ভারতের রাজধানী এবং প্রধান বাণিজ্য বন্দর। এখানে তখন বেণে-সদাগর-চাকুরে, ফড়ে-দালাল গোমস্তা, দেওয়ান ও সারা ভারতের শিক্ষিত, ধনী-মানী ও প্রভাব-প্রতিপত্তিশালী মানুষের বাস ও আড্ডা, এঁদের প্রায় সবাই হিন্দু, মুসলিম

সমাজের প্রতিনিধিত্ব করছেন তাঁদের সবাই ছিলেন উর্দুভাষী। বাঙলা তাঁরা জানতেন না; ফলে সমাজ, সাহিত্য, সঙ্গীত, সংস্কৃতি, শিক্ষা ও সরকারি প্রশাসনক্ষেত্রে দেশী মুসলিম ছিল দুর্লভ। শ্রীরামপুর-কোলকাতার মিশনারী যখন হিন্দুদের সাহায্য-সহযোগিতায় রামায়ণ-মহাভারত-ভাগবত কিংবা কবিকঙ্কণ মুকুন্দরামের চণ্ডীমঙ্গল, ভারতচন্দ্রের অন্নদামঙ্গল প্রভৃতি ছাপছেন, কিংবা কোলকাতার এশিয়াটিক সোসাইটি (১৭৮৪ সনে স্থাপিত) যখন রাজেন্দ্রলাল মিত্র প্রমুখের সাহায্যে দেশের হিন্দু লিখিত বাঙলা ও সংস্কৃত শাস্ত্র ও সাহিত্য গ্রন্থ সংগ্রহ করছেন, তখন দেশী মুসলিমদের এ সংবাদ ছিল অজ্ঞাত। এমনকি হরপ্রসাদ শাস্ত্রী, দীনেশচন্দ্র সেন প্রমুখ যখন বাঙলার হিন্দু পুঁথির অধিকাংশ সংগ্রহ করেছেন, রামগতি ন্যায়রত্ন 'বাঙ্গালা ভাষা ও সাহিত্য বিষয়ক প্রস্তাব' নামের ইতিহাস (১৮৭২) এবং বঙ্কিমচন্দ্র ও রমেশচন্দ্র দত্ত (১৮৭৭) প্রমুখ অনেকেই বৃহৎ প্রবন্ধের আকারে বাঙলা সাহিত্যের আনুপূর্বিক ইতিবৃত্ত রচনা করেছেন বা দীনেশচন্দ্র সেন 'বঙ্গভাষা ও সাহিত্য' (১৮৯৬) নামে সাহিত্যের বিপুলকায় ইতিহাস রচনা করেন, তখনো বাঙালী মুসলিমরা তাদের নিজেদের কোনো খবর জানত না। ফলে দেশজ মুসলিমরা হীনমন্যতায় ভুগত, তারা মনে করত নিরক্ষর চাষী মজুর বলেই তাদের সমাজে সাহিত্য সংস্কৃতি, শাস্ত্র, সঙ্গীত প্রভৃতির কোন চর্চা হয়নি। ওসব বামুন-কায়েত-বৈদ্য হিন্দুরাই করেছে ও করছে।

কোলকাতার ও অন্যান্য শহরের উর্দুভাষীরা মনে করেছে তারা তো আরব-ইরান-সমরখন্দ-বোখারা থেকে এসেছে, কাজেই অবজ্ঞেয় প্রজা, হিন্দুর এ সবে তাদের কোন প্রয়োজনও ছিল না। অনুরাগও ছিল না। তাদের থেকে শুনে শুনে মক্তব-মাদ্রাসায় পড়া ও পড়ুয়া মোল্লা-মুনশী মুয়াজ্জিন-মুহুরীরাও জানল এবং মানল যে তারা তো তুর্কী মুঘল শাসক গোষ্ঠীর জ্ঞাতি ও স্বধর্মী, কাজেই তাদের পূর্বপুরুষের এ হিন্দুয়ানী বাঙলা ভাষায় অবজ্ঞা ছিল কুফরী কথার ভাণ্ডার বলে। তাদের ধর্মের ও সংস্কৃতির ভাষা হচ্ছে আরবী-ফারসী ও উর্দু। নিরক্ষরদের তো পুঁথি-পাঁচালীতে বা শাস্ত্রগ্রন্থে কোনো প্রয়োজন নেই, মৌলবী-মোল্লা-মুনশী-মুয়াজ্জিন-কাজীরা তো তাদের হয়ে আরবী-ফারসী উর্দুর সঙ্গে তালেক রেখেছে। কাজেই হিন্দুয়ানী কুফরী বাঙলার সঙ্গে আমাদের কোন সম্পর্ক ছিল না, নেই এবং ভবিষ্যতেও থাকা বাঞ্ছনীয় নয়। এ যুক্তিও বিশ্বাস্য হয়ে উঠল অন্য এক কারণে—মুসলিমরা দেখল, আধুনিক বাঙলা ভাষায় মুসলিমের লেখা ও মুসলিমদের কথা অনুপস্থিত, অন্যদিকে উর্দু লেখক-লেখামাত্রই প্রায়ই যথাক্রমে মুসলমান ও মুসলিম বা ইসলামবিষয়ক। অজ্ঞ দেশজ বাঙালী মুসলিমের পক্ষে এ ভুল ধারণা মারাত্মক হয়ে উঠেছিল। এ কারণেই ১৯৩০ সন অবধি ইংরেজী শিক্ষিত দেশজ বাঙালী মুসলিমরা তাঁদের মাতৃভাষা বাঙলা কি উর্দু তা স্থির করতে পারেন নি। মুসলিম পরিচালিত সাময়িক পত্র-পত্রিকায় ও বহু সভা-সমিতিতে প্রায় সত্তর বছর [১৮৬০—১৯৩০] ধরে উর্দু-বাঙলা বিতর্ক চলেছে। শিক্ষিতের সংখ্যা বৃদ্ধি পাওয়ায় উনিশশ' ত্রিশোত্তর কালে বাঙলার পক্ষে শতকরা নব্বই ভাগের রায় মিললো বটে, কিন্তু কিছু প্রতাপে প্রবল ধনী-মানী শহুরে ও বিশ্বমুসলিম ঐক্যবাদী তথা ধর্মীয় জাতীয়তাবাদী রয়ে গেলেন উর্দুর পক্ষে। তাঁরাই পাকিস্তান আমলে উর্দুর ও উর্দুওয়ালার পক্ষে থাকতেন সবক্ষেত্রে ও সব সময়ে।

গোটা বাঙলাদেশের মুসলিমদের মধ্যে আবদুল করিম সাহিত্যবিশারদই প্রথম [এবং ষাট বছর ধরে প্রধানও ছিলেন।] বাঙলা ভাষী ও উর্দুওয়ালা দেশী মুসলিমদের জানিয়ে দিলেন যে বৌদ্ধ-হিন্দু সমাজ থেকে দীক্ষিত দেশজ মুসলিমরা চিরকালই বাঙলাভাষী গাঁ গঞ্জের মানুষ।

এদেশের মাটির ও মানুষের সঙ্গে তাদের সম্পর্ক প্রাগৈতিহাসিক। তাদের সঙ্গে তুর্কী-মুঘল শাসক কিংবা আরবের ইরানের ও মধ্য এশিয়ার মুসলিমদের কোনও রক্তের ভাষার, ঐতিহ্যের, সংস্কৃতির অর্থবিত্তের এবং সামাজিক-বৈবাহিক সম্পর্ক-সম্বন্ধ কখনো ছিল না। দেশজ মুসলিমদের জীবনাচারে এ দেশের প্রাকৃতিক প্রতিবেশের ও বৌদ্ধ-হিন্দু ঐতিহ্যের বিশ্বাস-সংস্কারের, আচার-আচরণের সাদৃশ্য ছিল গভীর নিবিড় ও ব্যাপক। তাদের খাদ্যে, পোশাকে, শাস্ত্রে, সমাজে, সাহিত্যে, সঙ্গীতে ছিল দেশ-কালের রূপ। তারা স্বদেশের স্বকালের স্ব-জীবনের ও স্বসমাজের চাহিদানুগ জীবনই যাপন করেছে। সুখে-দুঃখে, আনন্দে-বেদনায়, রোগে-শোকে, বিত্তে-বেসাতে এবং দারিদ্র্যে-অনাহারে, ঝড়-বন্যা-খরায় এই আকাশের নিচে মাটি কামড়েই বেঁচেছে কিংবা মরেছে প্রজন্মক্রমে আজকের মতোই। হিন্দুদের মতোই হিন্দুদের সমকালেই এবং সঙ্গেই তুর্কী-মুঘল আমলে বাঙালী মুসলিমরা লেখনী ধারণ করেছিল বাঙলাভাষার মাধ্যমে সাহিত্য সৃষ্টিতে, শাস্ত্র প্রচারে,সঙ্গীত রচনায়, সমাজ সংস্কারে, সংস্কৃতি নির্মাণে ও প্রসারে।

১৮৯৩ সন থেকে শুরু হয়েছিল তাঁর স্বঘরে ও পরঘরে পুথি আবিষ্কার ও পুথি সংগ্রহ, আমৃত্যু তাঁর এ কাজে বিরাম বিরতি বিরক্তি ছিল না। তিনি একাধারে পুথি সংগ্রহ, সংরক্ষণ, পরিচিতি রচন এবং সাময়িক পত্রিকায় তার পরিচিতি প্রচার লক্ষ্যে প্রবন্ধ লেখনে ও প্রকাশনে নিরত ছিলেন সারাটা জীবন। তাঁরই ত্রিশ বছরের একক প্রয়াসে ও প্রচারে এটিই প্রতিষ্ঠিত হয়েছে যে বাঙালী মুসলমানদের ক্বচিৎ কেউ বহিরাগত হলেও তারা দেশজ মুসলিম, এবং তাদের মাতৃভাষা বাঙলা। বাঙলা ভাষায় রয়েছে হিন্দুদের মতোই তাদের পূর্ব পুরুষের বিপুল ও বিচিত্র অবদান। সাহিত্য, সঙ্গীতে, শাস্ত্রে, ইতিবৃত্তে ও জীবনচরিত্রে যা রয়েছে তা আবিষ্কৃত ও মুদ্রিত হলে গুণে-মানে-মাহাত্ম্যে ও কলেবরে ভুঁইফোড় অর্বাচীন উর্দুর গৌরব ম্লান হয়ে যাবে।

সাহিত্যবিশারদের আগে এবং সমকালে এশিয়াটিক সোসাইটিতে, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদে, কিংবা দীনেশচন্দ্র সেনের, রাজেন্দ্রলাল মিত্রের, হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর অথবা ঢাকা ও কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় প্রভৃতির উদ্যোগে পুথি সংগ্রহ হয়েছে বটে, কিন্তু সবাই হিন্দু ঘর থেকে হিন্দু পুথিই সংগ্রহ করেছেন; মুসলিম ঘরে বাঙলা পুঁথি থাকতে পারে বলে হয়তো তাঁরা কল্পনাও করতে পারে নি।

তাঁদের ধারণা ছিল দেশজ মুসলিমরা যেহেতু নিরক্ষর জোলা-নিকেরী-কৈর্বত চাষী-মজুর সুতরাং তাদের, সাহিত্যে-সংস্কৃতির কোন চর্চা থাকার কথা নয়। আর গ্রামের ও শহরের উর্দুভাষী খান্দানী ধনী-মানী জমিদাররা তো বাঙলা জানেই না, লিখবে কি! এ ধারণা বশেই হিন্দু পুস্তকসমালোচকরা মীর মশাররফ হোসেন, কায়কোবাদ প্রমুখের পুস্তক সমালোচনা সূত্রে লিখতেন যে আমাদের শোনাও ছিল এবং জানাও ছিল যে মুসলিমরা বাঙলা জানে না, কিন্তু এঁর মতো বিশুদ্ধ বাঙলা অনেক হিন্দুতেও লিখতে পারেন না ইত্যাদি। আবদুল করিম সাহিত্যবিশরাদই হিন্দুদের সে অজ্ঞতা ও অবজ্ঞা ঘুচিয়েছিলেন, মুসলিমদের মনেও জাগিয়েছিলেন আত্মসম্বিৎ, আত্মপ্রত্যয় ও আত্ম-জিজ্ঞাসা ওই পুথির পাথুরে দলিল আবিষ্কার ও প্রদর্শন করে। আবদুল করিম সাহিত্যবিশারদই গোটা বাঙলাদেশে প্রথম ব্যক্তি যিনি হিন্দু-মুসলিম নির্বিশেষের পুথি সংগ্রহে সংগ্রহ ও সংরক্ষণ করেছিলেন, পরিচিতি লিখেছিলেন ও প্রচার করেছিলেন এবং গ্রন্থ সম্পাদনা করেছিলেন জাত বর্ণ ধর্ম বিষয় অভেদে,তাঁর সম্পাদিত গ্রন্থের নাম—সারদামঙ্গল, গোরক্ষবিজয়, গৌরাঙ্গ সন্ন্যাস, গঙ্গামঙ্গল, সত্যনারায়ণ, মৃগলুব্ধ মৃগলুব্ধ সম্বাদ প্রভৃতি এর প্রমাণ। এ অসাম্প্রদায়িক চেতনা সে-কালে দুর্লভ ছিল। এক্ষেত্রে আবদুল

করিম সাহিত্যবিশারদ অনন্য। আর এক ক্ষেত্রেও আবদুল করিম সাহিত্যবিশারদ অতুল্য। উনিশ শতকের মুসলিম লেখকদের রচনার বিষয়বস্তু ছিল সাধারণভাবে বহির্বঙ্গীয়, এমনকি বহির্ভারতীয়ও এবং পনেরো শতকের পূর্বেকার আরবের ইরানের ইরাকের স্পেনের ও মধ্য এশিয়ার ইসলাম ও মুসলিম সুলতান দরবেশ প্রভৃতি [মীর মশাররফ হোসেন প্রমুখ ক্বচিৎ কেউ দেশী মুসলিম নিয়েও লিখেছেন] এবং বাঙালী হিন্দুরা যেমন সারা ভারত চুঁড়ে হিন্দুর প্রাচীন পৌরাণিক মধ্যযুগীয় ঐতিহ্যকে গৌরব-গর্বের বিষয় নিয়ে সাহিত্য রচনা করেছেন, মুসলিমরাও তেমনি স্বধর্মী নিয়ে সাহিত্য রচনা করেছেন। ফলে বাঙালী হিন্দু যেমন এভাবে স্বধর্মসচেতন কেবল হিন্দু হতে চেয়েছেন, তেমনি মুসলিমরাও দেশ-কাল নিরপেক্ষ বিশ্বমুসলিম জাতি-চেতনায় উদ্বুদ্ধ হতে প্রয়াস পেয়েছেন। এক্ষেত্রে কম্যুনিস্ট লেখকদের আগে মুসলিমদের মধ্যে কেবল সাহিত্যবিশারদই তাঁর সাহিত্য-সংস্কৃতি-সমাজ ইতিহাস প্রভৃতি চিন্তা-চেতনার ক্ষেত্রে বাঙলার এবং বাঙালীর মধ্যেই তাঁর মানস বিচরণ সীমিত রেখেছিলেন। বাঙলার মাটি ও মানুষই ছিল তাঁর সারাজীবনের অনুধ্যানের বিষয়। স্বধর্ম বা বহির্বঙ্গীয় স্বধর্মী তাঁর চিন্তা-চেতনায় কখনো প্রশ্রয় পায় নি। এমন হিন্দুও ছিল সেকালের বাঙলায় বিরল। তাই সাহিত্যবিশারদের এ যুগদুর্লভ ও দেশদুর্লভ মানববাদ এবং স্বদেশের মাটি ও নির্বিশেষ মানুষপ্রীতি তাঁর চিন্তা-চরিত্রের অসামান্য লক্ষণ বলে গুরুত্বপূর্ণ। কেননা যে-পরিবেশে একালে যেখানে-সেখানে আমরা সংস্কারমুক্ত অনেক উদার মানুষ পাচ্ছি সে-পরিবেশ আবদুল করিমের ছিল অভাবিত। কর্ণফুলী নদী তীর থেকে টেকনাফ অবধি স্থান পরিসরে তিনিই ছিলেন মুসলিদের মধ্যে প্রথম প্রবেশিকা পাশ ইংরেজী শিক্ষিত মুসলমান। সাহিত্য-সংস্কৃতি মনস্ক হওয়াটাই ছিল একটা অপ্রত্যাশিত আকস্মিক প্রবণতা, সে-মানুষ আবার গল্প-উপন্যাস না লিখে যে ঐতিহ্য ও প্রত্ন চেতনায় প্রবুদ্ধ হয়ে মানুষের জাতির বিস্মৃত বা লুপ্ত ঐতিহ্য সাহিত্যাদি বিষয়ে লিখিত পুঁথি সংগ্রহে হলেন আগ্রহান্বিত। এক্ষেত্রে প্রেরণা-প্রবর্তনা দেয়ার কেউ ছিল না তাঁর। যে-বিষয়ে লক্ষ লক্ষ লোকের কোনো ধারণাই নেই, সে-বিষয়ে স্বলব্ধ গুরুত্ববোধ তাঁর দেশ-কাল-পরিবেষ্টনীর পরিপ্রেক্ষিতে বিবেচনা করলে তাঁর মনমানসের, তাঁর মনীষার ও মনস্বিতার গভীরতা ও ব্যাপকতা উপলব্ধি করা আমাদের পক্ষে সম্ভব হবে। স্বয়ং প্রায় অশিক্ষিত সম্প্রদায়ের স্বল্পশিক্ষিত ব্যক্তি হয়েও তিনি আত্মবিশ্বাস নিয়ে প্রবন্ধ লিখে কোলকাতার জাঁদরেল হিন্দু লেখকদের প্রখ্যাত পত্রিকায় পাঠিয়েছেন। তাঁর জীবনে গোড়া থেকেই কোন প্রবন্ধ ভাব-ভাষা-বিষয় ও বক্তব্যের কারণে ফেরত আসে নি। যে পত্রিকায় যা দিয়েছেন ছাপা হয়েছে। সংখ্যায় কম হলেও তিনি অন্য অনেক বিষয়েই প্রবন্ধ লিখেছেন, সেগুলো যথা সময়ে ছাপা হয়েছে। তাঁর যৌবনে দেশে হেন সাময়িক পত্রিকা ক্বচিৎ ছিল যাতে তিনি কম-বেশি অন্তত একটি হলেও লেখেন নি। এক সময়ে তিনি বাঙলা ভাষার প্রকাশিত প্রায় চল্লিশ খানা পত্রিকার গ্রাহক ছিলেন।

১৯০৩ বা ১৯০৭ সনের পরেও ১৯১৮ সনেও যখন বাঙলাকে মাতৃভাষা রূপে স্বীকৃতি দানে কিছু কিছু মুসলিম দ্বিধাগ্রস্ত, তখন আবদুল করিম সাহিত্যবিশারদই নির্ভীকউদাত্ত কণ্ঠে বাঙলার বুকে প্রথম ঘোষণা করলেন যে, বাঙলাভাষা বাঙালী মুসলিমদের কেবল মাতৃভাষাই নয়, মুসলিমদের জাতীয় ভাষাও [১৩২৫ আশ্বিন সংখ্যা, আল ইসলাম] সেদিন এ মত লিখিতভাবে উচ্চারণ সহজ ছিল না, প্রতিবাদ করেছিলেন অনেকেই, কিন্তু সাহিত্যবিশারদ অটল ছিলেন স্বমতে।

অতএব বাঙালী মুসলিমকে আত্মচেতনা দিয়ে মানব-প্রবাস থেকে স্বদেশে স্বঘরে ফেরানোতে, তাদের পিতৃপুরুষের সাহিত্যিক-সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের সন্ধান দিয়ে মাতৃভাষার প্রতি অনুরাগসৃজনে, মাতৃভাষাকে জাতীয়ভাষারূপে বরণের প্রবর্তনা দানে, দেশের মাটি ও মানুষের প্রতি ভালোবাসা বৃদ্ধির প্রেরণা দানে, দেশজ মুসলিমের হিন্দু-বৌদ্ধ ঐতিহ্যের, বিশ্বাস-সংস্কারের ও আচার-আচরণের যুক্তিসঙ্গত ঐতিহাসিক কারণ নিরূপণ করে তাদের হীনমন্যতা ঘুচিয়ে আত্মপ্রত্যয় ও আত্মমর্যাদাবোধ জাগানোর [এবং একালে নববর্ষ, বসন্ত মেলা, যাত্রা, চর্যাগীতি প্রভৃতির প্রতি মুসলিমদের সগর্ব-আসক্তি আর এসব নিয়ে আবহমান বাঙালী পরিচয়ে গৌরববোধ প্রভৃতি এ সূত্রে স্মর্তব্য] আবদুল করিম সাহিত্যবিশারদের একক দান অশেষ অপরিমেয়। তাঁর কাছে আজকের বাঙালী মুসলিমের অদৃশ্য ঋণ অশেষ। দেশ-কালের প্রতিবেশে তাঁর অবদানের গভীর ও ব্যাপক গুরুত্ব উপলব্ধি করেই সম্ভবত মেদিনীপুরের আজহারউদ্দিন খান তাঁর লিখিত 'সাহিত্যবিশারদ জীবনীর নাম রেখেছেন 'মাঘ নিশীথের কোকিল।' বলতে গেলে মধ্যযুগের প্রায় সব মুসলিম লেখক এবং অনেক হিন্দু লেখক তথা কবি তাঁরই আবিষ্কার। তাঁর আবিষ্কার ভিত্তি করেই রচিত হয়েছে বাঙলা সাহিত্যে মুসলিম অবদান নিয়ে কয়েকটি বিপুলকায় ইতিহাস গ্রন্থ। এসূত্রে সুফিয়ান মোহাম্মদ নাজিরুল ইসলামের, মুহম্মদ মনসুরউদ্দীনের, ডঃ মুহম্মদ শহীদুল্লাহর, শাহেদ আলির, সুকুমার সেনের ইতিহাস উল্লেখ্য। তাঁর এসব দানে গুরুত্ব দিলে তাঁকে সীমিত অর্থে একজন যুগ-পুরুষ বলেই মানতে হবে।

আবদুল করিম জন্মেছিলেন পটিয়া অঞ্চলে জোতদার-তালুকদার নামে প্রখ্যাত সেকালের মাপের এক সাক্ষর-শিক্ষিত পরিবারে। সামান্য আরবী ও ফারসী এবং বাংলা লিখতে পড়তে জানতেন তাঁর পূর্বপুরুষেরা। সুচক্রদণ্ডী গাঁ নিবাসী তাঁর আদি পুরুষ ও তাঁর প্রপ্রপিতামহ কাদির রাজা যে শিক্ষিত ছিলেন তার প্রমাণ রয়েছে। ১৭৭০ সনের দিকে তাঁর দ্বিতীয় পুত্র সামাদ-এর পাঠের জন্যে কাজী দৌলতের 'সতীময়না-লোর-চন্দ্রানী' কাব্যের তিনি স্বহস্তে প্রতিলিপি তৈরি করেছিলেন [পুঁথি পরিচিতি পৃ. ৬৫০ পুঁথি ক্রমিক নং ৫৭৭], চাচা কাইমউদ্দীন পটিয়া স্কুলে প্রবেশিকা শ্রেণীতে পাঠকালে আকস্মিক মৃত্যুবরণ করেন। অতএব ১৮৪৫ সনে পটিয়া স্কুলে ইংরেজী ভাষা চালু করার সঙ্গে সঙ্গেই আবদুল করিমের পরিবারে ইংরেজী বিদ্যা চালু হয় বটে, কিন্তু বাঞ্ছিত শিক্ষা সম্পূর্ণ করে কেউ বড়ো চাকরির প্রসাদ লাভ করেন নি উনিশ শতকের ও বিশ শতকের প্রথম তিন দশক অবধি। তাঁর মধ্যম পিতৃব্য মুনশী আইনউদ্দীন ১৮৫৭ সন থেকে প্রথমে মুন্সেফ আদালতে, পরে জজ আদালতে স্কুলনবিশ ও কেরানীর কাজ করেছেন। কেউ কেউ প্রথম জীবনে কিছুকাল শিক্ষকতা করলেও সাহিত্যবিশারদ এবং তাঁর চাচাতো ভাইরাও ছিলেন বিভিন্ন অফিসের কেরানি।

জোতে তালুকে বার্ষিক দু'তিন হাজার টাকা খাজনা আয়ের সম্পত্তি ছিল বটে, তবে উসুল হতো না সবটা, আদায় আর মামলা খরচ তো ছিলই। কাজেই পরিবারের নির্ভর ছিল দ্রোণ আটেক খাস দখলের ধানী জমির উপর। পিতৃবিয়োগের পূর্ব থেকেই মোটামুটি আঠারো শ' আশির দশক থেকেই চাকরিচ্যুত মুনশী আইনউদ্দীন যখন গৃহপতি, তখনই নানা মামলায় জড়িয়ে পড়েন তিনি। ফলে জোতজমার কিছু প্রয়োজনে বিক্রয়ের ফলে, কিছু নিলাম হয়ে অল্পকালের মধ্যেই অধিকাংশ সম্পত্তি হাতছাড়া হয়ে যায়। খাস জমিরও অনেকটা পরে পরিবারের ও দীর্ঘ সময় ধরে মামলার ব্যয় নির্বাহের জন্যে বিক্রয় করতে হয়। ফলে আবদুল

করিম যৌবনেই যৌথ পরিবারের দারিদ্র্য কবলিত হন। প্রায় প্রৌঢ় বয়স অবধি তাঁকেও ঋণ শোধ করতে এবং মামলার খরচ যোগাতে হয়েছে, যদিও অপুত্রক বলে পিতামহ অঙ্গীকৃত ভূসম্পত্তির ভাগ তিনি নেন নি।

১৮৭১ সনের ১১ই অক্টোবর মঙ্গলবারে আবদুল করিম ভূমিষ্ঠ হওয়ার তিন মাস আগে মাত্র ছত্রিশ বছর বয়সে তাঁর পিতা মুনশী শেখ নূরউদ্দীনের আকস্মিক মৃত্যু হয়, তাঁর মাতা মিসরী জানও তাঁর সতেরো বছর বয়সকালে প্রয়াত হন। আবদুল করিম পিতামহ মুহম্মদ নবীর চোখের মণি হয়ে চাচা আইনউদ্দীনের সংসারে লালিত হন এবং তাঁর মাতার জীবিতকালেই পিতামহের উদ্যোগে এগারো বছর বয়সে মুনশী আইনউদ্দীনের নয় বছরের কন্যা বদিউননিসার (১৮৭৩-১৯৫৩, বুধবার ২৫শে মার্চ) সঙ্গে তাঁর বিয়ে হয় এবং ১৯২১ সন অবধি যৌথ পরিবারে জীবন অতিবাহিত হয়। তাই আনোয়ারার কবি জীবেন্দ্রকুমার দত্তকে এক চিঠিতে লেখেন—সংসার চাচা দেখেন, আমি দায়িত্বমুক্ত, কেবল সাহিত্যসেবা করি। তাঁর একমাত্র কন্যাসন্তানের নাম রাখেন প্রিয়বন্ধু যৌবনে প্রয়াত রাউজানের কবি বাকের আলী চৌধুরীর পুত্র আলতাফ আলীর চৌধুরীর স্মারকরূপে আলতাফুন্নিসা (১৯০১-৭৭), আলতাফুন্নিসার দুটো পুত্র ও এক কন্যা রয়েছেন। নাম যথাক্রমে সৈয়দ জিয়াউল হক, সৈয়দ মাহবুবুল আলম ও সৈয়দা নুরুননাহার। তাঁকে জানত তেমন লোক বিরল হয়ে গেছে, কাজেই সাক্ষ্যাসমর্থন যোগাড় করা যাবে না বটে, তবু বলছি মানুষ হিসেবে আবদুল করিম ছিলেন শিশু ও ভৃত্যবৎসল, পরোপকারী, দান-প্রবণ হৃদয়বান, ন্যায়নিষ্ঠ, সৎ ও সুবিবেচক, ন্যায়বিচারক [ইউনিয়ন বেঞ্চের বিচারক ছিলেন ১৯৩৫ -৪৫ সন অবধি], উদার ও সংস্কারমুক্ত বিবেকবান আধুনিক মানুষ, সংস্কৃতিবান পুরুষ।

আবদুল করিমের নানামুখী চিন্তা-চেতনা জ্ঞাপন প্রবন্ধাবলী

আবদুল করিম কেবল মধ্যযুগে রচিত পুথির সংগ্রাহক, সংরক্ষক, পরিচায়ক, গবেষক ছিলেন না, তিনি নবনূর ও কোহিনূর পত্রিকায় রসিক পুস্তক সমালোচক তথা রসগ্রাহী সাহিত্যালোচকও ছিলেন অনেককাল। তা ছাড়া ইতিহাসে ছিল তাঁর আকর্ষণ। সমকালীন কোন কোন রাজনীতিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও সাহিত্যিক বিষয়েও তিনি তাঁর মত-মন্তব্য নির্ভীক ও স্পষ্টভাবে ব্যক্ত করেছেন। সরকারি চাকুরে ছিলেন বলে কোন কোন প্রবন্ধ তিনি তাঁর প্রাক্তন প্রিয় ছাত্র আজিজুর রহমান (চৌধুরী)-র ও জামাতা আবদুল মোনাএম-এর নামেও প্রকাশিত করেছিলেন। তেমন কিছু বিবিধ প্রবন্ধের ও পত্রিকার নাম প্রকাশকাল সহ এখানে উদ্ধৃত করছি। ১৩১৫ -১৮ এবং ১৩২৮-৪০ সালে তথা ১৯০৮-১১ আর ১৯২১-৩৩ সন অবধি প্রায় সতেরো বছরের পরিসরে রচিত ও প্রকাশিত শতোর্ধ্ব প্রবন্ধের তালিকা এখানে পত্র-পত্রিকার দুষ্প্রাপ্যতার জন্যে আজো তৈরি হয় নি বলে রচনার বিষয় ও শীর্ষনাম অজ্ঞাতই রয়ে গেছে।

আবদুল করিমের দেশ-কাল-শিক্ষা-সমাজ-ভাষা-সাহিত্য-সংস্কৃতি-রাজনীতিক সমস্যা ও ইতিহাস বিষয়ক প্রবন্ধের এ তালিকাটি 'পুঁথি-পরিচির্তির পরিশিষ্টানুগ :

৩৩. চট্টগ্রামের নবাবগণ। সাহিত্য : আশ্বিন, ১৩০৯।

৩৮. চট্টগ্রামী ছেলেভুলান ছড়া। সাহিত্য-পরিষৎ পত্রিকা : আশ্বিন, ১৩০৯।

৪০. ছেলে ঠকান ধাঁ ধাঁ। সাহিত্য-পরিষৎ পত্রিকা, ১৩০৯।
৪২. সাহিত্য সংবাদ। সাহিত্য-পরিষৎ পত্রিকা? ১৩০৯।
৫০. মুসলমানের প্রতি হিন্দু লেখকের অত্যাচার। নবনূর : ভাদ্র, ১৩১০।
৫৭. শিক্ষাতত্ত্বে! সাহিত্য :আষাঢ়, ১৩১০।
৬৩. চট্টলে ইছামতী। সাহিত্য : ফাল্গুন, ১৩১০।
৬৪. প্রাচীন বঙ্গসাহিত্য ও ছাত্রবৃন্দ। প্রকৃতি : শ্রাবণ, ১৩১০।
৬৯. সাহিত্য-প্রসঙ্গ। কোহিনূর : কার্তিক : ১৩১০।
৭০. মুসলমান বঙ্গসাহিত্য সমিতি। কোহিনূর : কার্তিক, ১৩১০।
৭১. মাসিক সাহিত্য সমালোচনা। কোহিনূর : চৈত্র. ১৩১০; শ্রাবণ, ১৩১১, ফাল্গুন-চৈত্র, ১৩১১ ; জ্যৈষ্ঠ, ভাদ্র, ১৩১২; অগ্রহায়ণ ১৩১৩; বৈশাখ, ১৩১৪।
৭৯. বঙ্গভাষা ও সাহিত্যে মুসলমানী প্রভাব। নবনূর : জ্যৈষ্ঠ, ১৩১১।
৮০. বাঙ্গালির চরিত্র-চিত্র। নবনূর : ভাদ্র, ১৩১১।
৮৬. জাপানী বিবাহ। ইসলাম প্রচারক : ১৩০১।
৮৮. হিন্দু-মুসলমান বিরোধের পূর্বাভাস। জ্যোতি : ১৩ই মাঘ, ১৩১১।
৯২. বঙ্গভাষার আদিম গদ্য। প্রকৃতি : বৈশাখ, ১৩১১।
৯৫. বৌদ্ধধর্মের সারমর্ম। প্রকৃতি : পৌষ, ১৩১১।
৯৭. বাঙ্গালির চরিত্র-চিত্র। রঙ্গালয় : ১৯ শে ভাদ্র, ২৬ শে ভাদ্র, ১৩১১।
৯৮. মহারাজ রাজবল্লভ সেনের জীবন চরিত্র। নবনূর : পৌষ, মাঘ, ফাল্গুন, চৈত্র, ১৩১১।
১০১. প্রাচীন কীর্তিরক্ষা। বীরভূমি : পৌষ, ১৩১১ (১৩১০?)
১০৩. ব্রহ্মরাজ্যের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস। ইসলাম-প্রচারক : মাঘ, ফাল্গুন, চৈত্র, ১৩১১।
১০৮. গন্তব্য পথ। অবসর : শ্রাবণ ১৩১২।
১১৩. ঐতিহাসিক যৎকিঞ্চিৎ। কোহিনূর : শ্রাবণ, ১৩১২।
১১৬. প্রতিভা পূজা। কল্পতরু? ১৩১২।
১২৬. ফররোখ শিয়রের পুত্রকলত্র। প্রকৃতি ? : ১৩১২।
১২৭. মুসলমান ইতিহাসের উপকরণ সংগ্রহ। নবনূর? ১৩১২।
১২৮. স্বদেশী দ্রব্যের ব্যবহার। জ্যোতি?: ১৩১২
১৩০. চট্টগ্রামে মঘীসন। বৌদ্ধ পত্রিকা?: ১৩১২।
১৩১. মুসলমান সমাজে পাপের প্রশ্রয়। জ্যোতি : ১লা চৈত্র, ১৩১২।
১৩৪. সুধাকরের স্বদেশদ্রোহিতা। সুলতান? : ১৩১২।
১৩৫. স্বদেশী আন্দোলন ও মুসলমান সমাজ। অর্চনা : বৈশাখ, ১৩১২।
১৩৬. আত্ম-নিবেদন। কোহিনূর : বৈশাখ, ১৩১৩।
১৫০. নবাব সামস জাহান বেগম। স্বদেশী : অগ্রহায়ণ, ১৩১৪।
১৫৪. দেওয়ান রামদুলাল রায়। সাহিত্য : ১৩১৯।
১৫৭. 'যবন' সম্বন্ধে পরিষদে পত্র। সাহিত্য-পরিষৎ পত্রিকা : ১৩১৯।
১৫৯. গোবিন্দচন্দ্র রাজার কথা। ভারতবর্ষ : আশ্বিন, ১৩২০।
১৬৯. জনশ্রুতি ও ইতিহাস। সম্মিলনী : ভাদ্র, ১৩২০।

১৭০. 'পাণ্ডুয়া কাহিনী' প্রবন্ধের প্রতিবাদ। সম্মিলনী : ভাদ্র, ১৩২০।
১৭১. ইংরেজ ও মুসলমান। হাবলুল মতিন : ১৩২০
১৭৩. মোহভঙ্গ। হাবলুল মতিন: ১৩২০।
১৭৪. মুসলমানদের একতা। হাবলুল মতিন : ১৩২০।
১৭৭. মোগল রাজত্বে পররাষ্ট্র নীতি। সুপ্রভাত : অগ্রহায়ণ, ১৩২০।
১৮৩. ওয়ারেন হেষ্টিংসের মীর মুনশী। সংকল্প : ১৩২০।
১৮৮. আদিনাথ তীর্থের উৎপত্তি। সম্মিলনী : মাঘ, ১৩২০।
১৯১. বাঙ্গালার মুসলমানগণের মাতৃভাষা। সাহিত্য : শ্রাবণ, ১৩২১।
১৯৯. চট্টগ্রামে মগধেশ্বরী। তপোবন : অগ্রহায়ণ, ১৩২১।
২০৪. বঙ্গীয় মুসলমানের বঙ্গ-সাহিত্য চর্চা। কোহিনূর : অগ্রহায়ণ, ১৩২২।
২২০. দানিশন্দ। মানসী ও মর্মবাণী : ১৩২৫।
২২৩. প্রত্নতত্ত্বের যৎকিঞ্চিৎ। জ্যোতি : ১৩২৫।
২২৬. বঙ্গভাষা ও সাহিত্য বনাম বঙ্গীয় মুসলমান। আল এসলাম : ১৩২৫।
২৩৪. সাহিত্য সম্মিলনের অভিভাষণ। সম্মিলনী : ১৩২৫।
২৫১. চট্টগ্রামের কথ্যভাষা। সম্মিলনী : ১৩২৭।
২৭৪. আরবী অক্ষরে বাঙ্গালা লেখা। সত্যবার্তা : ১৩৪৩।
২৮৬. উদ্বোধনী বক্তৃতা (বঙ্গসাহিত্য সম্মিলন)। পাঞ্চজন্য : ১৩৪৪।
২৯৯. মহারাজ রাজবল্লভের জীবনী। মদিনা : ১৩৪৭।
৩২০. এবারকার সাহিত্য সম্মেলন। বাঙ্গালী : ৩১ শে মে ১৯৪৩।
৩৩৯. পূর্ব পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা। দৈনিক পূর্ব পাকিস্তান : ১৩৫৪।
৩৮৯. পূর্ব পাকিস্তান সংস্কৃতি সম্মেলনে সভাপতির অভিভাষণ। দিলরুবা : ভাদ্র, ১৩১৯।
৩৯২. চট্টগ্রামের নামতত্ত্ব প্রাচীন সীমা। কোহিনূর : (২য় বর্ষ ২৯-৩০ সংখ্যা) ১৩৫৯।
৪০৪. বঙ্গসাহিত্য পরিক্রমা। কাফেলা : ১৩৫৯।

সমকালীন জীবন, সমাজ, সংস্কৃতি, ইতিহাস, রাজনীতি ও সমস্যা সম্বন্ধে যে আবদুল করিম সদা-সচেতন ছিলেন, তার কিছু প্রমাণ এই প্রবন্ধগুলো।

১৩০৯ সনেই (১৯০২) আবদুল করিম লোকসাহিত্যেরও গুরুত্ব উপলব্ধি করেন এবং বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষৎ পত্রিকায় চট্টগ্রামে ছেলে ভুলান ছড়া, ছেলে ঠকান ধাঁ ধাঁ প্রকাশিত করতে থাকেন। সমকালীন সাহিত্য বা সদ্য প্রকাশিত পুস্তক-সমালোচনাও শুরু করেন ১৯০৩ সন থেকেই। স্বদেশী দ্রব্যের ব্যবহার, স্বদেশী আন্দোলন ও মুসলিম সমাজ, বাঙালী মুসলমানের মাতৃভাষা, বঙ্গভাষা ও সাহিত্য বনাম বঙ্গীয় মুসলমান, পূর্ব পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা, শিক্ষাতত্ত্ব, বাঙালীর চরিত্রচিত্র, জাপানী বিবাহ, হিন্দু-মুসলিম বিরোধের পূর্বাভাস; বাঙলা ভাষার আদি গদ্য, বৌদ্ধধর্মের সারমর্ম, ইতিহাসের নানা খুঁটিনাটি, সুধাকর পত্রিকার স্বদেশদ্রোহিতা, ইংরেজ ও মুসলমান, মুঘল রাজত্বে পররাষ্ট্রনীতি, তুরস্কের পরিণাম প্রভৃতি বিষয়ক প্রবন্ধও লেখেন।

আবদুল করিম সাহিত্যবিশারদ সম্পাদিত ও রচিত গ্রন্থাবলী

	সম্পাদিত গ্রন্থ	কবি	প্রকাশকাল	প্রকাশ
১.	রাধিকার মানভঙ্গ	: নরোত্তম ঠাকুর	১৯০১ [১৩০৮]	বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ
২.	সত্যনারায়ণের পুঁথি	: কবিবল্লভ	১৩২২ সন 1915	,,
৩.	মৃগলুব্ধ	: দ্বিজ রতিদেব	১৩২২ সন 1915	,,
৪.	মৃগলুব্ধ সম্বাদ	: রামরাজা	১৩২২ সন 1915	,,
৫.	গঙ্গামঙ্গল	: দ্বিজ মাধব	১৩২৩ সন 1916	,,
৬.	জ্ঞানসাগর	: আলিরাজা ওর্ফে কানুফকির	১৩২৪ সন 1917	,,
৭.	শ্রীগৌরাঙ্গ সন্ন্যাস	: বাসুদেব ঘোষ	১৩২৪ সন 1917	,,
৮.	সারদামঙ্গল	: মুক্তারাম সেন	১৩২৪ সন 1917	,,
৯.	গোরক্ষবিজয়	: শেখ ফয়জুল্লাহ	১৩২৪ সন 1917	,,
১০.	পদ্মাবতী (খণ্ডাংশ)	: আলাওল	১৯৭৭ সাল	বাংলা সাহিত্য সমিতি, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়

সংকলিত ও রচিত গ্রন্থ

১. বাংলা প্রাচীন পুঁথির বিবরণ, ১ম ও ২য় সংখ্যা (পরিষৎ পত্রিকা) ১৩২০ সন 1913।

২. বাঙ্গালা প্রাচীন পুঁথির বিবরণ, ১ম খণ্ড, ১ম সংখ্যা (গ্রন্থাকারে) ১৩২১ সন 1914।

৩. পুথি পরিচিতি (আহমদ শরীফ সম্পাদিত) বাংলা বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রকাশিত ১৯৫৮ সাল।

(Descriptive Catalogue of Bengali Manuscripts) নামে সৈয়দ সাজ্জাদ হোসাইন অনূদিত এবং এশিয়াটিক সোসাইটি অব পাকিস্তান (এখনকার বাঙলাদেশ) থেকে প্রকাশিত, ১৯৬০ সাল।

৪. প্রাচীন পুঁথির বিবরণ [হিন্দু রচিত পুঁথির বিবরণ, রাজশাহী বরেন্দ্র রিসার্চ মিউজিয়াম কর্তৃক প্রকাশিতব্য, কিন্তু আজো অপ্রকাশিত]।

৫. ইসলামাবাদ (চট্টগ্রামের সচিত্র ইতিহাস, ১৩২৫-২৭ সনে 'সওগাত' পত্রিকায় ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত)। সৈয়দ মুর্তাজা আলী সম্পাদিত ও বাঙলা একাডেমী প্রকাশিত, ১৯৬৪ সন।

৬. আরকান রাজসভায় বাঙ্গালা সাহিত্য [মুহম্মদ এনামুল হকের সহযোগে রচিত], প্রকাশক : গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স, কলিকাতা, ১৯৩৫ সন।

এ যাবৎ প্রকাশিত আবদুল করিম সাহিত্যবিশারদ বিষয়ক অপার তিনটি গ্রন্থ :

১. আবদুল করিম সাহিত্যবিশারদ স্মারকগ্রন্থ, বাঙলা একাডেমী, ১৯৬৯ সন।

২. Abdul Karim Sahity Visharad Commemoration Volume, 1972. Asiatic Society of Bangladesh.

৩. মাঘনিশীথের কোকিল, আজহারউদ্দিন খান, [সাহিত্যশ্রী, ১৯৮৬] ৭৩, মহাত্মা গান্ধী রোড, কলিকাতা। অবশ্য বালক-কিশোর পাঠ্য আরো দু'টো চটি বই রয়েছে।

সমকালীন বিদ্বানদের চোখে আবদুল করিম

ক. মুসলমানদের মধ্যে বোধ হয় সর্বপ্রথমে আবদুল করিম সাহেবই হিন্দু সম্পাদিত পত্রিকায় লিখতে প্রবৃত্ত হন। ...

... তিনি যথার্থই একজন উদার মতাবলম্বী। তাঁহার মতে ধর্মমতের পার্থক্য বিভিন্ন ধর্মাবলম্বীদের মধ্যে সম্প্রীতি স্থাপনের অন্তরায় নহে। এইরূপ বিশাল সহৃদয়তার গুণেই আজ বাঙ্গালার হিন্দু সম্পাদকগণের নিকটও তিনি অভিন্নভাবে সমাদৃত। হিন্দুগণ হইতে এতটা প্রীতি ও সহানুভূতি অত্যল্প মুসলমান লেখকের ভাগ্যেই ঘটিয়াছে।

[জীবেন্দ্রকুমার দত্ত (মৃত্যু ১৯২১ সন), বাংলা একাডেমী প্রকাশিত (১৯৬৯ সন) স্মারক গ্রন্থ : পৃ. ৩০-৩১। প্রথমে এ প্রবন্ধ ১৩১২ সালের বৈশাখ সংখ্যা কোহিনূরে প্রকাশিত]

খ. ডক্টর কাজী মোতাহার হোসেনের [১৮৯৭-১৯৮১] মতে :
আবদুল করিম সাহিত্যবিশারদ "সত্যি সত্যিই এই পৃথিবীকে তিনি খেলাঘর বলেই জানতেন, তাই বিলাস, আড়ম্বর বা সম্মানের লোভ তিনি কোনও দিন করেন নি। ... তাঁর অসাধারণ ঔদার্যগুণে তিনি সকলের অকুণ্ঠ ভক্তি-শ্রদ্ধা অর্জন করেছেন—সাহিত্যিক হিসাবে তো বটেই, কিন্তু মানুষ হিসাবে হয়তো আরো বেশী। ... তাঁর সুচিন্তিত ভাষণ পড়ে দুইবারই চমৎকৃত হয়েছিলাম। চমৎকৃত হওয়ার প্রধান কারণ, তাঁর আধুনিক এবং সংস্কারমুক্ত দৃষ্টিভঙ্গি।

[স্মারকগ্রন্থ, পৃ. ১৭]

গ. সাহিত্যিক মুহম্মদ বরকতুল্লাহর [১৮৯৮ – ১৯৭৫] মতে :
"বাংলা দেশের মুসলমান সমাজে এমন জ্ঞান-তাপস আর জন্মেছেন কিনা জানা যায় নি। আমাদের পূর্ব-পুরুষদের চিন্তাধারা ও সাহিত্যকর্মের সঙ্গে বর্তমানের গণমানসের সেতুবন্ধন রচনা আবদুল করিমই করে গিয়েছেন।"

[স্মারকগ্রন্থ, পৃ. ২১-২২]

ঘ. সৈয়দ এমদাদ আলী [১৮৮০-১৯৫৬] এক পত্রে লিখেছেন : পণ্ডিত সুরেশচন্দ্র সমাজপতি সম্পাদিত "সাহিত্য" একদিন বাঙ্গালা দেশে সর্বশ্রেষ্ঠ মাসিক পত্র ছিল। গত শতাব্দীর শেষ দশকে "সাহিত্য পত্রিকা"য় যাহাদের প্রবন্ধ বাহির হইত, তাঁহাদের দেশে সাহিত্যমোদীরা বঙ্গসাহিত্যের শ্রেষ্ঠ লেখক বলিয়া মনে করিতেন। বাঙ্গালার মুসলমানদের মধ্যে এ গৌরবের অধিকারী একমাত্র আপনিই হইয়াছিলেন। তখন তরুণ জীবনের শত আগ্রহ লইয়া আপনার রচনা পাঠ করিতাম—অপরিসীম মুগ্ধও হইতাম। বাঙ্গালার মুসলমানদের যে একটা নিজস্ব শক্তিশালী সাহিত্য ছিল, সে কথা আপনিই নিজের অক্লান্ত ও উজ্জ্বল সাধনা দ্বারা প্রমাণ করিতে সক্ষম হইয়াছিলেন। আপনার এই অবদান মুসলিম বঙ্গসাহিত্যকে যেমন ধন্য করিয়াছে এমন আর কিছু নয়।

ঙ. "সাহিত্যিক মাহবুব-উল আলম [১৮৯৮-১৯৮১] লিখেছেন :
পটিয়ায় আমার বাসায় তাঁকে একবার খানার দাওয়াত দিয়েছিলাম। এসে একটু বাইরে গেলেন। আসলেন অনেকক্ষণ পরে। আমি জিজ্ঞেস করলাম : এতক্ষণ কি করলেন? বললেন : কচুরি-পানায় দেশ ছেয়ে গিয়েছে। আমি নিয়ম করেছি : প্রত্যেক দিন কিছু কচুরিপানা উঠাব। আজও রোজের কাজ করে এলাম।"

চ. ডক্টর দীনশেচন্দ্র সেন [১৮৬৬-১৯৩৯] ১০ টাকা মূল্যের 'বঙ্গভাষা ও সাহিত্য' [২য় সং] একখানি উপহার দিয়ে যে পত্র লিখিয়াছেন, তাহার কিয়দংশ দেখিলেই পাঠকগণ আমাদের উক্ত কথার সত্যতা কতকটা উপলব্ধি করিতে পারিবেন। তিনি লিখিয়াছেন 'আপনি যে সকল প্রবন্ধ নানা পত্রিকায় লিখিয়া আমার পুস্তকের দ্বিতীয় সংস্করণের জন্য উপকরণ প্রস্তুত করিয়া রাখিয়াছিলেন, তাহা দেখার সুযোগ ঘটে নাই; আমি প্রায়ই অত্যন্ত পীড়িত থাকি। ... নতুবা আপনার ন্যায় পণ্ডিতের মত উপেক্ষা করিয়া দ্বিতীয় সংস্করণটা পঙ্গু করিবার ইচ্ছা হওয়া পাগলেরই শোভা পায়। ... আপনাকে আমার একখানি পুস্তক উপহার দিয়াছিলাম, তাহা গ্রহণ করিয়া আপনি আমাকে অনুগৃহীত করিয়াছেন।

[জীবেন্দ্রকুমার দত্ত-উদ্ধৃত, স্মারকগ্রন্থ, পৃ. ৩০]

ছ. মুহম্মদ হবীবুল্লাহ বাহারে [১৯০৬-৬৬] চোখে :

'হিন্দু পুরাণে দধীচি মুনির উল্লেখ আছে। দেবাসুরের যুদ্ধে দেবতাদের সাহায্যের জন্য তিনি স্বেচ্ছায় অস্থিদান করেছিলেন। বাঙ্গলা সাহিত্যের ইতিহাসের মালমসলা সংগ্রহ করতে গিয়ে একটি লোক অর্ধশতাব্দী ধরে তিল তিল করে জীবনদান করেছেন, ইনি আবদুল করিম সাহিত্যবিশারদ।'

[স্মারকগ্রন্থ, পৃ. ৪০]

জ. তাঁহার সম্পাদিত "রাধিকার মানভঙ্গ" সাহিত্য পরিষৎ কর্তৃক প্রকাশিত হয়; ভূমিকায় পণ্ডিত মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী [১৮৫৩-১৯৩১] তাঁহার সম্বন্ধে লিখিয়াছিলেন :

"শ্রী আবদুল করিম চট্টগ্রামের একটি বাঙ্গালা বিদ্যালয়ের পণ্ডিত। তাঁহার সাংসারিক অবস্থা ভাল নহে। তথাপি তিনি সাহিত্য-সেবায় অকাতরে পরিশ্রম করিয়া থাকেন। বাঙ্গালা সাহিত্যের প্রতি তাঁর অনুরাগের প্রশংসা না করিয়া থাকা যায় না। তিনি এই দুর্লভ গ্রন্থের সম্পাদন কার্যে যেরূপ পরিশ্রম, যেরূপ কৌশল, যেরূপ সহৃদয়তা ও যেরূপ সূক্ষ্মদর্শিতা প্রদর্শন করিয়াছেন, তাহা সমস্ত বাঙ্গালায় কেন—সমস্ত ভারতেও বোধ হয়, সচরাচর মিলে না। এক একবার মনে হয় যেন কোন 'জার্মান এডিটর' এই গ্রন্থ সম্পাদন করিয়াছেন।"

ঝ. সাহিত্য-পরিষৎ কর্তৃক প্রকাশিত তাঁহার "বাঙ্গালা প্রাচীন পুঁথির বিবরণ"–এর ভূমিকায় রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী [১৮৬৪-১৯১৯] লিখেছেন :

"সঙ্কলন কর্তার অধ্যবসায়, পরিশ্রম, বাঙ্গালা –সাহিত্য অনুরাগ ও ধর্মমত সম্বন্ধে উদারতার প্রশংসা করিয়া শেষ করা যায় না। ... এই বিবরণের মধ্যে আলোচনার অনেক নূতন কথা আছে। চট্টগ্রাম প্রদেশে মুসলমান লেখকের প্রাধান্যও আলোচনার যোগ্য। হিন্দু-মুসলমানের সম্মিলনের এতটা পরিচয় আর কোথাও পাওয়া যায় না। কাথাও বাঙ্গালা ধর্মেতিহাসের আলোচনায় এই পুঁথির বিবরণ প্রচুর সাহায্য করিবে। বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের ও

বাঙ্গালা সাহিত্য-সমাজের পক্ষ হইতে আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জানাইয়া আমরা এই মুসলমান লেখকের অসামান্য অধ্যবসায়ের ফল প্রকাশ করিতে প্রবৃত্ত হইলাম।"

ঞ. রামেন্দ্র সুন্দর ত্রিবেদী আবদুল করিমকে একপত্রে লিখেছিলেন :

"আপনি যেরূপ অফুরন্ত অধ্যবসায়, যত্ন ও পরিশ্রম করিয়া বাঙ্গালা প্রাচীন পুঁথির বিবরণ সংগ্রহ করিয়া পাঠাইতেছেন, তাহাতে আপনার নিকট বঙ্গ সমাজ চিরঋণী থাকিবে। ... আপনার ঋণের পরিশোধে আমরা অক্ষম। ... আপনার প্রবন্ধগুলি পাঠকসমাজে প্রকাশ করিয়া কথঞ্চিৎ আপনার নিকটে ঋণমুক্ত হইতে পারিলেই আমরা যথেষ্ট জ্ঞান করিব। আপনার পুরষ্কার ভবিষ্যৎ ইতিহাস লেখকের হস্তে। বর্তমানের অধম সমাজ আপনার পুরস্কার দিতে পারিবে না।

ট. জাতীয় জীবনে সাহিত্য বিশারদের ভূমিকারও অসামান্য অবদানের সম্যক গুরুত্ব উপলব্ধি করে স্বল্পকথায় তার যথার্থ মূল্যায়ন করেছেন প্রাবন্ধিক আবদুল হক। তাঁর মতে :

"রাষ্ট্রভাষা আন্দোলনের পেছনে সমাজের সর্বাত্মক এবং অনমনীয় সমর্থনকে অন্যতম উপাদান হিসাবে প্রেরণ দিয়েছে বাংলাভাষা ও সাহিত্যে বাঙালী মুসলমানের উত্তরাধিকার স্বত্বের চেতনা। এই চেতনা সমাজে যাঁরা সঞ্চারিত করেছেন তাঁদের মধ্যে সর্বাগ্রগণ্য আবদুল করিম সাহিত্যবিশারদ —এই অর্থে যে, পুঁথি সংগ্রহ এবং এ সংক্রান্ত গবেষণায় বাঙালী মুসলমানদের মধ্যে তিনিই ছিলেন অগ্রণী এবং মহত্তম কর্মী। এই চেতনার ঐতিহাসিক ধারাবাহিকতা বিশেষভাবে আবদুল করিম সাহিত্যবিশারদেরই অবদান। তাঁরই আজীবন সাধনার ফলে আহৃত বিপুল তথ্যপুঞ্জ সমাজ মানসে ঐ চেতনার জন্ম দিয়েছে এবং আত্মঘোষণার এক অনমনীয় সঙ্কল্প সঞ্চারিত করেছে।"

[স্মারকগ্রন্থ, পৃ. ১৪৪]

তথ্য -সূত্র

১. জন্ম পত্রিকার চিত্র দ্রষ্টব্য।

২. জীবেন্দ্রকুমার দত্তের উক্তির উদ্ধৃতি এবং করিমের পত্রাংশ :

বিগত ১৮৯৭ খ্রিস্টাব্দের নভেম্বর মাসে চট্টগ্রামে যে ভয়ানক লোকক্ষয়কারী মহাঝটিকা প্রবাহিত হয়, তাহাতে অপর সকলের ন্যায় মৌলবী সাহেবেরও প্রভূত ক্ষতিসাধন হয়। তাঁহার পিতা-মহের শেষ জীবনে তাঁহাদের সামান্য জমিদারী ঋণজালে বিজড়িত হইয়া পড়িয়াছিল। উক্ত বাত্যাবর্তের অব্যবহিত পরেই যমের দোসর মহাজনদের (!) উৎপাতরূপ ঝড়েও তাঁহাদের শান্তিময় সংসার নিতান্ত বিক্ষুব্ধ হইয়া উঠে। এই দুর্দিনে আবার কিছু দিন মধ্যে তিনি কমিশনার অফিসের চাকরি হইতে বরখাস্ত হন। ফলে সমস্ত দুর্দৈব একত্রে আপতিত হইয়া তাঁহাদের পারিবারিক অবস্থা একান্ত শোচনীয় করিয়া তোলে। মামলা-মোকদ্দমা ও ঋণের দায়ে ক্ষুদ্র সম্পত্তি একরূপ ছারখারই হইয়া যায়। বর্তমানেও তাঁহাদের অবস্থা সাধারণ দৃষ্টিতে নিতান্ত খারাপ না হইলেও, তাহাকে কখনও উন্নত বলা যায় না। সুবৃহৎ যৌথপরিবারের ভরণ-পোষণের জন্য আজও তাঁহাদিগকে বাঙ্গালির একমাত্র অন্তিম সম্বল 'চাকুরির' ভাবনাই করিতে হয়।

[জীবেন্দ্রকুমার দত্ত : ১৩১২ সালে কোহিনূরে প্রকাশিত প্রবন্ধাংশ]

উক্ত বিপর্যস্ত অবস্থায় কবি জীবেন্দ্রকুমার দত্তকে লিখিত আবদুল করিমের পত্রাংশ "... এত অশান্তির মধ্যেও আমি সাহিত্য-সেবা করি কিরূপে? তাহার কারণ, আমার হাতে গৃহস্থালীর কোন কাজের ভার রাখি নাই। সমস্ত আমার পিতৃব্যের হাতে দিয়া আমি নিশ্চিন্ত আছি। সাংসারিক ঝঞ্ঝাটে আবদ্ধ হইবার আমার ইচ্ছা নাই। সাহিত্য-ধন ভিন্ন অপর ধন আমার হইবার নহে, আমি চাইও না। এ সুখের ইংরেজ রাজত্বে সামান্য ২০ টাকার চাকুরিতে ভরণ-পোষণই চলে না। তাহাতে আবার জায়গা জমিদারী যোগাইবার ইচ্ছা। ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করি, তিনি আমার জীবনযাত্রার অবশিষ্ট পথটুকু এরূপ নির্বিঘ্নেই যেন আমাকে চলিতে দেন। স্বদেশ ও মাতৃভূমির প্রাচীন পুণ্যময়ী গাথা গাহিতে গাহিতে আমার এ তুচ্ছ জীবন অতিবাহিত হইয়া যাউক, ঈশ্বরকে প্রার্থনা করিবেন।"

'এই গাথা গাহিতে গাহিতে'ই আবদুল করিম ১৯৫৩ খ্রিস্টাব্দের ৩০শে সেপ্টেম্বর [তথা ১৩৬০ সনের ১৩ই আশ্বিন বুধবারে] ইহধাম ত্যাগ করেন।

[পুঁথি পরিচিতি, মুনশী আবদুল করিম সাহিত্যবিশারদ : মোহাম্মদ ইদরিস আলী, পৃ. ছ.]

৩. বড়তুফানের কবিতা, পুঁথি —পরিচিতি, পৃ. ৩৬৭-৬৮, ১৯৫৮

৪. ২য় সংখ্যক তথ্য দ্রষ্টব্য।

৫. আবদুল করিমের ইংরেজি হস্তাক্ষর চিত্র দ্রষ্টব্য।

৬. বিজ্ঞাপন ও জীবেন্দ্রকুমারের এ বিষয়ক মন্তব্য : প্রাচীন পুঁথি প্রভৃতি সংগ্রহের জন্যে মৌলবী সাহেব 'জ্যোতি'-তে একখানি বিজ্ঞাপন প্রচার করেন। তাহার কিয়দংশ এইরূপ :
"প্রাচীন গীত, পুঁথি, বারমাস প্রভৃতি যিনি সংগ্রহ করিয়া দিবেন, তাঁহাকে 'আমরা' এক বৎসর কাল 'জ্যোতিঃ' বিনামূল্যে দান করিব।" বলা বাহুল্য, উক্ত সংগ্রহের কার্যে জ্যোতিঃ সম্পাদক মহাশয়েরও সহানুভূতি ছিল, তিনি মৌলবী সাহেবের অনুরোধেই জ্যোতিঃ বিনামূল্যে দিতে স্বীকৃত হন। এই বিজ্ঞাপন একদিন এমন সর্বনাশ উপস্থিত করিবে জানিলে তাহা সম্পাদক মহাশয়ের নামেই দেওয়া যাইতে পারিত। নবীন বাবুর শত্রুপক্ষীয়েরা এই বিজ্ঞাপন "আমরা এক বৎসরকাল 'জ্যোতি'ঃ বিনামূল্যে দান করিব", এই কথাগুলি দ্বারাই 'জ্যোতিঃ'র সহিত তাঁহার সম্বন্ধ আছে বলিয়া মিঃ ম্যানেস্টি বাহাদুরকে বুঝাইয়া দেন। সত্য কথা বলিতে গেলে, 'জ্যোতি:'র সহিত তাঁহার কোনই সম্বন্ধ ছিল না এবং কোন গুপ্ত সংবাদও তাঁহার দ্বারা প্রকাশিত হয় নাই। সে সম্বন্ধে অনেক কথা আছে। এখানে বলিবার স্থান নাই।" [কবি নবীনচন্দ্র সেন (১৮৪৬-১৯০৯) রচিত 'আমার জীবন' ৫ম খণ্ডে এর বিস্তৃত বিবরণ রয়েছে]।
ফলত : এই সকল অমঙ্গলজনক অনর্থরাশির বশবর্তী থাকিয়াও মৌলবী সাহেব কিরূপে বাঙ্গালা লেখকরূপে পরিণত হইলেন, তাহাই একান্ত ভাবনা ও বিস্ময়ের বিষয় সন্দেহ নাই। যাহা হউক, উক্তরূপ ভাগ্য-বিড়ম্বনার পরে তাঁহার অকৃত্রিম হিতৈষী কবিবর নবীন বাবুর পরামর্শে তিনি অর্থ চেষ্টায় রেঙ্গুন যাইতে সঙ্কল্প করেন। তথায় গেলে সম্ভবতঃ তাঁহার সংসারভাগ্য সুপ্রসন্নই হইয়া উঠিত। কিন্তু স্নেহময়ী জননী সদৃশী মাতৃভূমির পুণ্য অঙ্ক ছাড়িয়া যাইতে মাতৃভক্ত আবদুল করিম ইতস্ততঃ করিতে লাগিলেন; এমন সময় আনোয়ারা মধ্য ইংরেজি বিদ্যালয়ে প্রধান শিক্ষকের পদ শূন্য হওয়ায় তিনি সামান্য বেতনে তাহাতেই নিযুক্ত হইয়া গেলেন।

[স্মারকগ্রন্থ, পৃ. ২৬-২৭]

৭. খান বাহাদুর আবদুল আজিজ, স্পেশিয়াল অফিসার, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় –তাঁর চিঠি ৬৮ পৃষ্ঠায় দ্র.।

'রাজা' খ্যাতি সাহিত্যবিশারদ-স্মারকগ্রন্থ, বাংলা একাডেমী, ১৯৬৯। মাহবুব-উল আলমের প্রবন্ধ পৃ. ৩৪।

৮. পরিষৎ পরিচয় : ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, পৃ. ৯৬। সে-বছর সভাপতি ছিলেন রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী।

৯. বিস্তৃত বিবরণ, ২৮শে আগস্ট, শুক্রবার ১৯৮১-র সাপ্তাহিক বিচিত্রায় প্রকাশিত সঞ্জীবপ্রসাদ সেনের পত্রে দ্রষ্টব্য।

১০.সাহিত্য বিশারদের হস্তাক্ষর দ্রষ্টব্য।

১০. ক. বিস্তৃত বিবরণ মুহম্মদ হবীবুল্লাহ বাহারের প্রবন্ধে দ্রষ্টব্য, স্মারকগ্রন্থ পৃ. ৪৬। 'ময়নামতীর গান' নামে যে পুঁথি এখন কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে এম-এ পরীক্ষায় পাঠ্য হয়েছে, তা মূলতঃ করিম সাহেবেরই সম্পাদিত পুঁথি। ত্রিপুরা জেলা থেকে এই বই তিনি সংগ্রহ করেছিলেন। সাহিত্য পরিষদ থেকে প্রকাশ করার জন্য তিনি এ পাণ্ডুলিপি তৈরি করেন। এর কিছু পরেই দীনেশচন্দ্র বিশ্ববিদ্যালয়ের তরফ থেকে প্রকাশ করার জন্য এ বইয়ের পাণ্ডুলিপি ও মূল পুঁথি তাঁর কাছ থেকে চেয়ে নেন। দীনেশবাবু লিখেছিলেন, "It will be a work of joint editorship." সাহিত্যবিশারদ ভেবেছিলেন তাঁকেও এ বই-এর editor করা হবে। বই যখন প্রকাশিত হল, তখন দেখা গেল বইখানি বেরিয়েছে দীনেশচন্দ্র, বিশ্বেশ্বর ভট্টাচার্য বি-এ ও বসন্তরঞ্জন রায়- এই তিন জনের নামে। সাহিত্য-বিশারদের পুঁথি ও পাণ্ডুলিপি থেকে বিস্তর সাহায্য গ্রহণ করা হয়েছে বলে তাঁকে দেওয়া হয়েছে ধন্যবাদ। এ সম্পর্কে ডক্টর নলিনীকান্ত ভট্টশালী তাঁর 'শুকুর মামুদের ময়নামতীর গান' পুস্তকে বিস্তারিত আলোচনা করেছেন।

সবচেয়ে মজার কাণ্ড করেছিলেন মহেন্দ্রনাথ বিদ্যানিধি মহাশয়। সাহিত্য বিশারদ 'সাহিত্য-সংহিতা' পত্রিকায় 'বঙ্গ-সাহিত্য পঞ্চম বিদ্যাসুন্দর' নামে প্রবন্ধ পাঠিয়েছিলেন। সেই প্রবন্ধ বিদ্যানিধি মহাশয় 'প্রদীপ' কাগজে নিজের নামে ছেপেছেন। 'সুধাকর' ও 'নবনুর' কাগজে এ সম্পর্কে যখন প্রতিবাদ করা হয়, চারদিকে হৈ চৈ পড়ে যায়।

১১. বঙ্গভাষা ও সাহিত্য বনাম বঙ্গীয় মুসলমান, আল্ ইসলাম, ১৩২৫ সাল মোহাম্মদ ওয়াজেদ আলী এবং আরো কেউ কেউ তীব্রভাষায় লিখিতভাবে প্রতিবাদ করেছিলেন।

১২. ১৯৪৭ সনে নভেম্বরে বিশজনের সই করা স্মারকলিপি মুখ্যমন্ত্রীর হাতে দেয়া হয়। —ভাষা আন্দোলনের কিছু অজানা কথা : বিশজনের স্মারকলিপি —অনুপম হায়াৎ। ১৬.২.৮০ সচিত্র বাংলাদেশ'।

১৩. অভিভাষণে ও ১৯১৮ সনের নভেম্বরে চট্টগ্রামে অনুষ্ঠিত সাহিত্য সম্মেলনে অভ্যর্থনা সমিতি সভাপতির ভাষন। বঙ্গীয় মুসলমান সাহিত্য পত্রিকা, মাঘ, ১৩২৫ সাল।

১৪. পূর্বপাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা, দৈনিক পূর্বপাকিস্তান ১৩৫৪ সালের কোন সাপ্তাহিক সাহিত্য সংখ্যা।

১৫. পূর্ব বাঙলার ভাষা আন্দোলন ও তৎকালীন রাজনীতি, ১৯৮৫, বইঘর প্রকাশিত, ৩য় খণ্ড, পৃ. ৯৭।

Ramna, Dacca.

The 31st August 1920

(D) ear Abdul Kareem
Will you send me copies of your publised works. (Let) me know what manuscripts of your own writing you (have) in store? I should also like to (have) a list of (manuscripts you have collected.
I had a (talk) with Mr. Stapletion about you. He desires to enquire whether you are in a position to retire from (govt) ment service and to accept a post in the Dacca (Univer) sity if so, what salary you will like to have? Let (me have) clear idea about your research work. Can you (say if) old coins are avilable in Chittagong?

I remain,
Yours sincerely.
S/d—Adbul Aziz .

(M) aulvi Abdul Karim
Sahitya Visharad.
Chittagong

উল্লেখ্য যে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের office of the special officer Dacca University থেকে No.1049 Ramna the 27th Septemer 1920 তারিখে অন্তত আরো একটি পত্র আবদুল করিমের কাছে লেখেন খান বাহাদুর আবদুল আজিজ।

এবং আরো ইত্যাদি

উৎসর্গ

আবদুল করিম সাহিত্যবিশারদের কন্যা-জামাতা
মরহুম আলতাফুন্‌নিসা—আবদুল মুনাএম-এর সন্তান
সৈয়দ নুরুন নাহার
সৈয়দ আবু তাহের জিয়াউল হক
সৈয়দ মাহবুবুল আলম
স্নেহাস্পদেষু

আঠারো-উনিশ শতকের বাঙলা ও বাঙালী সম্বন্ধে দু-একটি ধারণার পুনর্বিবেচনা

ভুল বা ত্রুটিজড়িত তথ্য-বা তত্ত্ব-জাত ধারণাভিত্তিক সিদ্ধান্ত, পরিকল্পনা, কর্ম ও আচরণ পরিণামে ক্ষতির কারণ হয়। ভুল প্রত্যয় ভুল সিদ্ধান্তে পৌঁছায় এবং সে-সিদ্ধান্ত প্রণোদিত কর্ম ও আচরণ কাম্য ফল দিতেই পারে না। বিষয়, কাল ও ক্ষেত্র ভেদে ব্যক্তিক, পারিবারিক, সামাজিক কিংবা রাষ্ট্রিক জীবনে তা মারাত্মক ক্ষতিপ্রসূ হতে পারে। অভিসন্ধি কিংবা অজ্ঞতা বশে ব্রিটিশ ঐতিহাসিক লিখিত বাঙলার ও ভারতবর্ষের ইতিহাস এবং বিধৃত কোন কোন তথ্য, তত্ত্ব ও সিদ্ধান্ত পড়ার, শোনার, জানার ও বিশ্বাস করার বিষক্রিয়া আজো সামাজিক, সাংস্কৃতিক, সাম্প্রদায়িক ও রাষ্ট্রিক জীবনে তীব্র তীক্ষ্ণ হয়ে ব্যক্তিমানুষেরও জীবনে ভয়ের, ত্রাসের ও অনিরাপত্তার যন্ত্রণা হয়ে রয়েছে। ইতিহাসকার পরিবেশিত সব তথ্য ভুল, এমন কথা অবশ্যই বলা যাবে না, তবে স্থান-কাল-প্রতিবেশ-প্রয়োজনের, শাসক-শাসিতের সম্পর্কের, শাসক-প্রশাসকের জ্ঞান-বুদ্ধি-বিশ্বাসের, তাদের ব্যক্তিগত স্বার্থচেতনার, ত্রুটির ও চরিত্রের পরিপ্রেক্ষিতে কারণ-কার্য বিশ্লেষিত হলে অনেক অপরাধ-অপকর্মের, কোন কোন শোষণ-পীড়ন-বঞ্চনার ভিন্নরূপ ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ টীকা-ভাষ্য সম্ভব হতো। এ কালের একটা দৃষ্টান্ত দিয়ে আমাদের বক্তব্য স্পষ্ট করা যায়, পাকিস্তানে অমুসলিম বিরল বলেই সেখানে দাঙ্গা বাধে আহমদিয়া, শিয়া কিংবা বিহারিদের সঙ্গে স্থানীয় অধিজনদের। ধনী মুসলিম অধ্যুষিত উত্তর ভারতে ঘন ঘন মুসলিম নিধন চলে অথচ দাক্ষিণাত্যের এক বিস্তৃত অঞ্চলে মুসলিম বিদ্বেষ কখনো দাঙ্গার রূপ পায়নি, সেখানে পাকিস্তানি হিন্দু উদ্বাস্তু বিরল বলে। উৎকলে ও আহমদাবাদে মুসলিম হত্যার কারণও ছিল ভিন্ন ও সাময়িক। বাঙলাদেশে ১৯৬৫ সনের পরে যে হিন্দু খেদানো দাঙ্গা বাধে নি তার প্রত্যক্ষ কারণ ধনী হিন্দুর বিরলতা এবং পরোক্ষ কারণ পাকিস্তানি-বিদ্বেষ এবং ভারত-ভীতি। আসামে-ত্রিপুরায় বাঙালী বিতাড়ন লক্ষ্যে অনুষ্ঠিত হত্যাকাণ্ড ভিন্নতর ব্যাখ্যার দাবিদার। এ-ও স্মর্তব্য যে দাঙ্গা মাত্রই শহুরে শিক্ষিতের সৃষ্টি। অতএব স্থানিক, কালিক ও প্রতিবেশিক প্রয়োজনের বাস্তব পরিস্থিতিই অর্থ-বৃত্তি-বিত্ত-বেসাত এবং প্রভাব-প্রতিপত্তি ক্ষেত্রে প্রতিযোগী-প্রতিদ্বন্দ্বী হননে বিতাড়নে প্রবৃত্তিপরবশ মানুষকে প্ররোচিত করে। আমরা এ-ও জানি ব্যক্তিগতভাবে কচিৎ কোন মানুষ বিদেশী- বিজাতি-বিভাষী-বিধর্মী বিদ্বেষী। ব্যক্তিগতভাবে এদের মধ্যে প্রেমের, বিবাহের, প্রীতির, বন্ধুত্বের, ব্যবসার, সহযোগিতার ও সহাবস্থানের সম্পর্ক সহজেই গড়ে ওঠে, কেবল দলগত বা সমষ্টিগতভাবেই বিদেশীর বিজাতির, বিভাষীর, বিধর্মীর প্রতি আশৈশবের সংস্কারজাত অবজ্ঞা, অনাত্মীয়তার ভাব সুপ্ত থাকে মনের গভীরে। এবং দলীয় স্বার্থে তা যথাপ্রয়োজন প্রকাশও পায় চিন্তায় কর্মে আচরণে। তাই যে-কোন অপকর্মের কারণ হিসেবে বিজাতি-বিধর্মী-বিভাষী-

বিদেশী বিদ্বেষকেই দায়ী করলে বোধ-বুদ্ধি-জ্ঞান-প্রজ্ঞার অপচয় হয় মাত্র। বিশেষ করে আমরা যখন জানি যে কোন একক ঋজু কারণে জগতে-জীবনে কোথাও কিছু ঘটে না।

মনু বলেছেন 'বিদ্যা [এবং শাস্ত্রও] ব্রাহ্মণ সেবধি' অর্থাৎ বিদ্যা ব্রাহ্মণের গচ্ছিত ধন। ইতিহাসের সাক্ষ্যে আমরা জানি কিছু সংখ্যক ব্রাহ্মণ চিরকালই শাস্ত্রজ্ঞ ছিলেন, তাঁরা বেদ, ব্রাহ্মণ, স্মৃতি, পুরাণ, উপনিষৎ, ন্যায় ও ষড়দর্শন অধ্যয়ন করতেন। কেউ কেউ সর্ব শাখায়, কেউ বা কোন বিশেষ শাখায় পারঙ্গম-পারদর্শী হতেন। সৎশূদ্র কায়স্থরা রাজ্যের বিভিন্ন প্রাশাসনিক বিভাগে লেখকের-লিপিকারের পেশায় থাকতেন, কাজেই 'কায়স্থ' নামে পরিচিত বর্ণের কেউ কেউ চিরকাল লেখাপড়া জানত আর 'বৈদ্য' বর্ণের কেউ কেউ চিকিৎসা শাস্ত্র অধ্যয়ন করে চিকিৎসক বৃত্তি বরণ করত। অতএব বর্ণহিন্দুদের কিছু সংখ্যক লোকের মধ্যে লেখাপড়া চিরকাল চালু ছিল। তেমনি চালু ছিল উচ্চ বৃত্তির ও উচ্চ বিত্তের বৌদ্ধদের মধ্যেও। অতএব, রাজ্যে, প্রশাসনে ও মানুষের সামাজিক-বৈষয়িক-শাস্ত্রিক জীবনে প্রয়োজনীয় লেখা-পড়ার কাজমাত্রই ছিল ব্রাহ্মণ-বৈদ্য-কায়স্থের অধিকারে। এগুলো ছিল তাদের কারো কারো প্রজন্ম ক্রমিক বাঁধা বৃত্তি। হিন্দু-বৌদ্ধ আমলে তারাই ছিল রাজ্যের শিক্ষা শাস্ত্র, সংস্কৃতি প্রভৃতির ধারক বাহক রক্ষক এবং সর্বপ্রকার শাস্ত্রিক, সামাজিক ও রাষ্ট্রিক শাসন প্রশাসনের কর্তা-কর্মী ও ধারক-চালক। এখনকার বিদ্বানদের মতে শাস্ত্র ও সমাজ নিয়ামক-নিয়ন্ত্রক ব্রাহ্মণ গোষ্ঠীর পুরোহিতের উদ্ভব ঘটে আর্যপূর্ব যুগেই, সম্ভবত মহেনজোদারো-হরপ্পা সভ্যতার আদিকালে।

তুর্কো-আফগানেরা যখন উত্তরভারত দখল করে, কিংবা সিন্ধুতে ও দক্ষিণ-ভারতে বিদেশীর শাসন প্রতিষ্ঠিত হয়, তখন গাঁয়ে-গঞ্জে নিশ্চয়ই মুসলিম ছিল না। তখনও গাঁয়ে-গঞ্জে-শহরে-বন্দরে রাজস্বাদি কর আদায়ের, শান্তি-শৃঙ্খলা-রক্ষার ও বিচারের দায়িত্বে ছিল নিশ্চয়ই ওই শিক্ষিত ব্রাহ্মণ-বৈদ্য-কায়স্থরাই। পনেরো-ষোল শতক থেকে গাঁয়ে গাঁয়ে স্বল্প-সংখ্যায় দীক্ষিত তথা দেশজ মুসলিম সুলভ ছিল বটে, তবে তাদের প্রায় সবাই নিম্নবর্ণের, বৃত্তি ও নিম্নবিত্তের হিন্দু-বৌদ্ধ গোষ্ঠীর এবং সামান্য সংখ্যক উচ্চ বর্ণের হিন্দু ও বৌদ্ধ জাত বলে আজকাল নানাসূত্রে সাক্ষ্য প্রমাণ মিলছে। তারাই ভারতের ও বাঙলার সর্বত্র আজলাফ বা আতরাফ মুসলিম হিসেবে শাসকগোষ্ঠীভুক্ত কৃত্রিম-অকৃত্রিম অভিজাতদের চোখে আজো অবজ্ঞেয়। জুলহা, নিকেরী, কাহার, কৈবর্ত, মুলঙ্গী, তেলী, ধূনকর, শালকর, বারুই, মুজারী, শিকারী, বাউল, হাজাম প্রভৃতি নানা ক্ষুদ্রপেশার মুসলিমদের প্রজন্মক্রমিক নিরক্ষরতা, নিঃস্বতা, নিরন্নতা, ও ব্রাত্যাবস্থা স্মর্তব্য। কাজেই তুর্কো-আফগান-মুঘল আমলেও গাঁয়ে গঞ্জে ধনী-মানী, ভৌমিক, সচ্ছলচাষী, শিক্ষক, চিকিৎসক, মহাজন, প্রশাসক, রাজকর আদায়কারী, দোকানদার, গোমস্তা, বেপারী, ব্যবসায়ী বৈষয়িক ক্ষেত্রে দলিল-দস্তাবেজ, পাট্টা কবুলিয় লেখক প্রভৃতি ছিল গাঁয়ের সচ্ছল অধিজন-শিক্ষিত বর্ণহিন্দুই। জরিপ ও রাজস্ববিভাগের গাঁয়ে-শহরে-চৌকিতে প্রায় সব কর্মচারীই ছিল নওয়াব মীরজাফরের আমল অবধি হিন্দুই। শেষ দেওয়ান ছিলেন ব্রাহ্মণ মহারাজ নন্দকুমার। ব্রিটিশ ও পাকিস্তানি আমলে যেমন বড়ো কয়েকজন চাকুরে ব্যতীত অফিসে আদালতে আর সবাই ছিল স্থানীয় লোক, তেমনি অবস্থা ছিল তুর্কি-মুঘল যুগেও কাজেই ব্রিটিশ শাসনামলে মুসলিম অধিকারের অবসানের সুযোগে হিন্দুরা সরকারি চাকুরি নতুন করে ব্রিটিশ প্রশ্রয়ে জবরদখল করেনি। কাজীর, ফৌজদারের, সেনার, সেনানীর চাকুরি ও জায়গির হারাল বটে শাসকগোষ্ঠীভুক্ত উচ্চবিত্তের দেশী-বিদেশী মুসলমানরা, কিন্তু দেশজ

মুসলিমরা সেখানে আগেও অনুপস্থিত ছিল বলে তাদের কোন ক্ষতি হয়নি শাসকের জাত বদলের ফলে। উল্লেখ্য যে বাঙলাদেশে দেশজ মুসলিম সমাজে মুন্সী-মোল্লা-খোন্দকার-মৌলবী-মুয়াজ্জিন-উকিল-কাজী এবং কৃচিৎ কেউ ফৌজদার-সেনা-সিপাহি থাকলেও বড় চাকুরে বা দরবারের আমির-উজির-লস্কর-ছিলেন না কেউ। বড় পদে বহাল হত আরব-ইরান-মধ্যএশিয়া ও উত্তরভারত থেকে আগত মুসলিমরাই। তাই সিরাজুদ্দৌলা-মীর কাসিমের দরবারেও মেলে না দেশজ আমির মুসলিম।

তুর্কি-মুঘল আমলে বিচার বিভাগে দেশি কাজী-সদর আমিন থাকলেও সামরিক ও উচ্চতর প্রাশাসনিক কর্মচারী ছিলেন শাসকগোষ্ঠীভুক্ত বিদেশী মুসলিমরা, আর রাজকোষের ও রাজস্বের সার্বিক দায়িত্ব বিদেশাগত মুসলিম চাকুরেদের ওপর অর্পিত থাকত বলে কিছু জায়গিরদার এখানে সেখানে মুসলিম থাকলেও সিকদার, জমিদার, তালুকদার, তরফদার, ইজারাদার, হাওলাদার ছিল সাধারণভাবে হিন্দুই। উল্লেখ্য যে মুরশিদ কুলি খানের ইজারাদারেরা ছিল প্রায় সবাই হিন্দু এবং চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত-পূর্ব বাঙলার ছয়টি বৃহৎ জমিদারির পাঁচটি ছিল হিন্দুর হাতে আর একটি ছিল মাত্র বিদেশাগত মুসলিমের। আরো আগের কথা স্মরণ করলে দেখা যাবে ১৫৭৫-১৬১৬ সাল অবধি কালের বাঙলার তথাকথিত বার ভুঁইয়ার অধিকাংশ ছিলেন হিন্দু অর্থাৎ সুলতানি আমলেও জমিজমা ছিল স্থানীয় বর্ণহিন্দুর অধিকারে। কাজেই নিম্নবর্ণের ও নিম্নবৃত্তির হিন্দুর, বৌদ্ধের ও দেশজ মুসলিমের আয়ত্তে ছিল না তুর্কি-মুঘল আমলেও ধন-মান-ক্ষমতা।

বলতে গেলে প্রাচীনকাল থেকেই অর্ধনগ্ন অজ্ঞ নিম্নবৃত্তিধারী মানুষেরা ছিল নিঃস্ব ও অনাহার-অর্ধাহারক্লিষ্ট। ভাতচুরি, উপবাস, ভিক্ষাবৃত্তি, ভাঙাঘর, ছেঁড়াকাপড়, কানি-তেনা, দাসত্ব, দুর্ভিক্ষ, অস্পৃশ্যতা প্রভৃতির খবর দু'হাজার বছর আগে থেকেই মিলছে নানাসূত্রে। বাস্তবে রূপ-কথার গোয়ালভরা গরু, গোলাভরা ধান ও পুকুরভরা মাছ ক্বচিৎ কোথাও কারো ছিল বটে, কিন্তু কিছুকালের মধ্যেই সন্তানদের মধ্যে ভাগ হয়ে কমে যেত। তেমন বিত্তবান লোকও সংখ্যায় ছিল চিরকালই নগণ্য বা করগণ্য। শাস্ত্রে, সাহিত্যে বিদেশির বর্ণিত বৃত্তান্তে ও রূপকথায় আমরা মানুষের দারিদ্র্যচিত্র পেয়েছি। তাই তো 'ওগ্‌গার ভত্তা ও নালিতাগচ্ছা' যোগাড়ের সঙ্গতিকেই সুখ-সৌভাগ্য-স্বস্তি-স্বাচ্ছন্দ্য বলে মানা হয়েছে সানন্দে 'দিজ্জই কন্তা খাই পুণবন্তা' [কান্তা দিচ্ছে, খাচ্ছে পুণ্যবন্ত]।

গোড়ার দিকে হয়তো বিভিন্ন বৃত্তিতে নিযুক্ত উচ্চবর্ণের মানুষও প্রজন্মক্রমে একই পেশায় লেগে থাকত। এ স্থায়ী অথচ নিতান্ত স্বল্প আয়ের বৃত্তিতে বা শ্রমে নিঃস্বতা ঘুচাবার উপায় ছিল না। দেহে মনে-বস্ত্রে-আবরণে দারিদ্র্যের তথা কাঙালপনার স্থায়ী ছাপযুক্ত মানুষকে স্বাভাবিকভাবেই ঘৃণা-অবজ্ঞা করতে থাকে উচ্চ বৃত্তির, বিত্তের, গুণের ও জ্ঞানের মানুষেরা। সেই ঘৃণা-অবজ্ঞা থেকেই অস্পৃশ্যতার উদ্ভব এবং দীন-দুর্বল-অজ্ঞ মানুষকে প্রাজন্মিক পেশায় আবদ্ধ রেখে অর্থ-বিত্ত-ক্ষমতা চির আয়ত্তে রাখার কুমতলবে শাস্ত্রের আসমানি দোহাই প্রয়োগে তাদের চিরসেবক-দাস-ভূমিদাস এবং ভোগ-উপভোগের সামগ্রীর যোগানদাররূপে দেহে-মনে-বিশ্বাসে-আচরণে চির অনুগত করে নিরুপদ্রব দাসপ্রথা চালু রেখেছিল শাস্ত্রী ও সমাজপতিরা। কাজেই আদিকাল থেকে ওরা দরিদ্র, অজ্ঞ ও কাঙ্ক্ষাহীন এবং প্রভুদের হুকুম-হুমকি-হুঙ্কার-হামলার পাত্র শোষিত-শাসিত মানুষ। এভাবে পেশায় ও শ্রমে বিভক্ত সমাজ ক্রমে বর্ণে বিন্যস্ত স্থায়ী সমাজে পরিণতি পায়। দেশজ মুসলিমরা মুখ্যতা ওই গোষ্ঠীরই জ্ঞাতি।

অতএব ব্রিটিশ আমলেই সুপ্তোত্থিত মুসলিম গাঁয়ে-গঞ্জে-নগরে-বন্দরে-উঠানে দাঁড়িয়ে ক্ষোভ-বিদ্বেষ-ঈর্ষার জ্বালা নিয়ে ধন-মান-শিক্ষা-ক্ষমতা এবং উচ্চতর বৃত্তি-বেসাত, জমিদারি, মহাজনি ও চাকরি প্রভৃতি আকস্মিকভাবে হিন্দু কবলিত দেখল, তা নয়। আগে সচেতন ছিল না বলে জ্বালা অনুভব করেনি। ইংরেজী শিক্ষার বদৌলত ব্রিটিশ শাসনে তারা তাদের দৈন্য সম্বন্ধে ভুল তথ্যের ও তত্ত্বের প্ররোচনায় যন্ত্রণাগ্রস্ত হল মাত্র এবং এতকালের প্রতিবেশী ব্রিটিশ-কৃপাপুষ্ট হিন্দুকেই তাদের দুঃখ-বঞ্চনার-শোষণ-নিঃস্বতার জন্যে দায়ী বলে জানল, বুঝল এবং মানল। সেদিন থেকেই হিন্দু হল কাঙ্ক্ষী মুসলিমদের প্রতিযোগী ও প্রতিদ্বন্দ্বী, পয়লা নম্বরের শত্রু। মোটামুটিভাবে উনিশ শতকের শেষপাদ থেকেই মুসলিম সমাজে শোষক-শোষিত, বঞ্চক-বঞ্চিত চেতনার উন্মেষ ঘটে ইংরেজী শিক্ষার মন্থরভাবে প্রসারের ফলে। কাজেই সাম্প্রদায়িক চেতনারও ওই সময় থেকেই উন্মেষ এবং তা দ্রুত বৃদ্ধি পেতে থাকে।

আমরা জানি কংগ্রেসের কৃত্রিম প্রচার সত্ত্বেও কমিউনিস্টদের সংখ্যা-বৃদ্ধির পূর্বে হিন্দু-মুসলিমদের মধ্যে অভিন্ন দৈশিক জাতীয়তাবোধ তেমন গুরুত্ব পায়নি। রামমোহন-বিদ্যাসাগর নন, বরং বঙ্কিমচন্দ্রই প্রথম উপলব্ধি করেছিলেন যে মুসলিমদেরও উন্নতি না হলে গোটা বাঙলার শ্রীবৃদ্ধি সম্ভব হবে না।

কলকাতা-মুরশিদাবাদের বিদেশির বংশধর উর্দুভাষী মুসলিমরাই ছিল নিরক্ষর নির্জিত গ্রামবাসী [শহরে অনুপস্থিত] অপরিচিত মুসলিমদের স্বঘোষিত ও ব্রিটিশ নিয়োজিত নেতা। ওদের দেখেই হিন্দুরা মুসলিমদের তুর্কী-মুঘল শাসকদের জ্ঞাতি ভাবতে শেখে। দেশজ মুসলিমরাও এ গৌরবের অংশভাগ হতে চায় যদিও দেশজ খ্রিস্টান যেমন ইংরেজ জাতি নয়, এরাও তেমনি তুর্কি-মুঘলের কেউ ছিল না। ফলে বাঙলায় তথা ভারতে সবাই দেশজ ও শাসকগোষ্ঠী নির্বিশেষে মুসলিম আর তুর্কি-মুঘল শাসকগোষ্ঠী অভিন্নার্থক কিংবা সমার্থক বলে মানল। এভাবে মুসলিম মাত্রই হল তুর্কি-মুঘলের জ্ঞাতিত্বগর্বী আর হিন্দু মাত্রই শাসিতের দলিতের ক্ষোভ ও জ্বালা নিয়ে হল মুসলিম-বিদ্বেষী। দুটোই ছিল হাওয়াই অনুভবের বিড়ম্বনা। কিন্তু দেড়শ দু'শ বছর ধরে এ মিথ্যা ধারণা দেশে-সমাজে সরকারে অনেক অনর্থ ঘটিয়েছে।

একালে হিন্দুদেরও বোঝানো যায় না যে জাতি বা গোষ্ঠী হিসেবে মানুষ ভালো বা মন্দ হয় না। ব্যক্তিক জ্ঞান-বুদ্ধি-বিশ্বাস, মন-মত স্বভাব-চরিত্রই সুকর্ম-অপকর্মের জন্যে দায়ী। পৃথিবীতে কোন কালেই নরদেবতার ও নরদানবের অভাব ছিল না। তুর্কি মুঘল শাসকমাত্রই হিন্দু প্রজাপীড়ন করেনি। তা ছাড়া শাসক-শাসিত চিরকালই দুই ভিন্ন শ্রেণীর মানুষ এবং জাত-জন্ম-বর্ণ-ধর্ম নির্বিশেষে স্ব স্ব স্বার্থেই তাদের ভাব-চিন্তা-কর্ম-আচরণ নিয়ন্ত্রিত ও প্রকটিত হয়। পৃথিবীর সব জাতিরই কিছু রাজারও প্রজাপীড়নের এবং বিজাতি-বিধর্মী-বিভাষী বিদেশী পীড়নের সাক্ষ্য-প্রমাণ-নজির রয়েছে। আজো এ গণতন্ত্রের যুগেই চোর-ডাকাত-খুনি-গুণ্ডার অধম অমানুষ রাজনীতিক নেতা-উপনেতা-কর্মী দেখা যায়। আফ্রো-এশিয়ার অনুন্নত রাষ্ট্রে আজো গণতন্ত্রের অপর নাম গুণ্ডাতন্ত্র বা মস্তানতন্ত্র আর জঙ্গির তথা সামরিক শাসন মানে স্বৈর গুণ্ডাতন্ত্র।

আবার গরজে পড়ে প্রবল পক্ষ যা করে, লাঞ্ছিত দলিতপক্ষ তা কখনো ক্ষমা করতে পারে না। যেমন আগেও হিন্দুরাজ্যে গোবধ কিংবা আজান নিষিদ্ধ ছিল, মুসলিমরাজ্যে যেমন ছিল মূর্তি-মন্দির নির্মাণ অনুমতি সাপেক্ষ। এসব ব্যবস্থাকে রাজা-বাদশাহর খেয়াল-খুশি মনে করলে যে সুবিচার হয় না, তার প্রমাণ এখনকার ধর্ম-বর্ণ নিরপেক্ষ দিল্লিসরকারকেও অধিজনের

আবদারের কাছে নতি স্বীকার করে গোবধ নিষিদ্ধ করতে হয়েছে ধর্মনিরপেক্ষ-ভারতরাষ্ট্রে। বঞ্চিত করতে হয়েছে মুসলিমদের তাদের ন্যায্য শাস্ত্রীয় অধিকার থেকে। শোনা যায় একালের বঙ্গ-সংস্কৃতির স্রষ্টা-ধারক ও বাহক জোড়াসাঁকোর ঠাকুরদের জমিদারীরও নাকি কোথাও কোথাও গোবধ ও আজান নিষিদ্ধ ছিল। গান্ধীর গুজরাটে-বোম্বাইতে-আহমদাবাদে ও অন্যত্র বর্ণহিন্দুরা হরিজন হত্যা করে নিরপেক্ষ কংগ্রেস-সরকারকে উপেক্ষা করেই। সেক্যুলার সরকারের বিরুদ্ধেও দুঃশাসনের ও অবিচারের কত অভিযোগ রয়েছে শিখ- নাগা-মিজু-মনিপুরী-গুর্খা-ত্রিপুর -অহোমীদের। এমনি সেকালের সব তুর্কী -মুঘল শাহ্-সামন্তও ছিল না সব কুশাসন নির্যাতন অবিচারের সঙ্গে যুক্ত।

যে কারণেই বা যে- প্রয়োজনেই হোক, যে জুলুম করে সে মনে রাখে না, কিন্তু যে মজলুম সে তা কখনো ভুলে না—ঐতিহ্যের মতো প্রজন্মক্রমে শ্রুতিস্মৃতি রূপে ক্ষোভ-রোষ-জ্বালা তাজাই রাখে। তাই গোটা উনিশ শতকে এবং বিশ শতকের প্রথম পাদে বাঙালী হিন্দুমাত্রেরই লেখায় মুসলিম প্রসঙ্গে ক্ষোভ-জ্বালা -ঘৃণা -অবজ্ঞা প্রত্যক্ষে কিংবা পরোক্ষে জ্ঞাতে বা অজ্ঞাতে প্রকাশ পেয়েছে আর মুসলিম-মনে জমা হয়েছে হিন্দু-বিদ্বেষবিষ।

কিন্তু একালের শিক্ষিত সংস্কৃতিবান, বাস্তব সমাজ ও রাষ্ট্র সচেতন, যুক্তি-বুদ্ধি চালিত মানুষেরা অতীতের চশমা পরে বর্তমানকে প্রত্যক্ষ করলে , তার বোধশক্তিতে ও মানবিকতায় আস্থা রাখা অসম্ভব হয়ে পড়ে । কাজেই জাতিবৈরে ও জাতিদ্বেষণায় যে সমূহ ক্ষতি ছাড়া কল্যাণ কিছুই নেই, তা বুঝিয়ে দেয়া আজকের ঐতিহাসিক, রাজনীতিক, সাহিত্যিকও সমাজকর্মী প্রভৃতির বিশেষ দায়িত্ব ও কর্তব্য।

এখনকার দিনে একটা ভুল ধারণা বদ্ধমূল হয়ে সত্য ও তথ্য রূপে সর্বজন স্বীকৃত হয়ে প্রতিষ্ঠা পেয়েছে, তা হল -রাজ্যহারা মুসলিমরা ব্রিটিশ বিদ্বেষী হল এবং তারা ইংরেজ ও ইংরেজী বর্জন করে চলল—এ ধারণা। অথচ রাজতন্ত্রের সেযুগে রাজ্য ও রাজত্ব হাত বদল হলে তা নিছক খবর হিসেবেই গ্রহণ করত। আনুগত্য ছাড়া দেশের ও রাজ্যর সঙ্গে প্রজার আর কোন সম্পর্ক চেতনার উন্মেষই ঘটেনি তখনো । প্রমাণ গোয়া-দামন -দিউ-পণ্ডীচেরী কিংবা বোম্বাই -মাদ্রাজ-কলকাতা -চন্দননগর -চুঁচড়া বিদেশী বেণে কবলিত হলেও ভারতের রাজন্যও তাতে বিচলিত হয়নি। দেশের প্রতি দায়িত্ব ও সরকারে অধিকার -চেতনা এবং স্বধর্মীর ও স্বাদেশিক জাতীয়তাবোধ উনিশ শতকে ইংরেজের ও ইংরেজীর অবদান।

কাজেই ইংরেজ কোম্পানি-অধিকারে মুসলিমরা স্বজাতির সদ্য রাজ্য হারানোর বেদনা ও ক্ষোভ অসহযোগ করবার মতো তেমন গভীরভাবে অনুভব করেনি। প্রথম বিলেত গিয়েছিলেন দুই মুসলমানই—আজিমুল্লাহ ও শেখ ইহতেশামউদ্দীন। কোলকাতায় মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠার আবেদন করেছিল হেসটিংসের কাছে মুসলিমরাই। ১৮২৪ সনে নওয়াবই মুর্শিদাবাদে ইংরেজী স্কুল প্রতিষ্ঠার দাবী জানিয়েছিলেন সরকারের কাছে। সরকার-গঠিত কমিটিতে কাজ করতে কোন মুসলিম কখনো অসম্মত হয়নি। সিপাহী বিপ্লবের আগে ও পরে মহারানী প্রদত্ত উপাধি গ্রহণে কোন মুসলিমের অনীহা দেখা যায়নি। ১৮৬০ সন থেকে কোলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের আওতায় মুসলিমরাও প্রতীচ্যবিদ্যা গ্রহণ করতে থাকে। ওয়াহাবী নেতা সৈয়দ আহমদ ব্রেলভীর ব্রিটিশ প্রীতি ছিল। কাজেই ১৮২২ সনের পূর্বে ওয়াহাবীরাও ছিল না ব্রিটিশ বিদ্বেষী, বাঙলায় তিতুমীরের বিদ্রোহ-কাল থেকেই ওয়াহাবীরা [তথা মুহম্মদীরা] হল ব্রিটিশ-বিদ্বেষী—তারা ছিল মুখ্যত নিরক্ষর গ্রামবাসী মুসলিম।

বাঙলা-বিহার-উড়িষ্যা নিয়ে ছিল সুবেহ বাঙ্গালা বা বেঙ্গল প্রেসিডেন্সি। বাঙলার বিষয় আলোচনাকালে আমরা ওই দুটি অঞ্চলের কথা ভাবি না। ওয়াহাবী আন্দোলনের কেন্দ্র ছিল বিহারে পাটনায়। নেতৃত্বও ছিল ইনায়েত বিলায়েত কেরামত আলীদের। সেখানে অভিজাত পরিবারের সংখ্যা বেশী ছিল বলে বিহারে হিন্দুর চেয়ে নিতান্ত উনজন মুসলিমরা ধনে-মানে ও প্রতীচ্য শিক্ষায় এগিয়েছিল, যেমন ছিল উত্তর ভারতেরও দাক্ষিণাত্যে। ওইসব অঞ্চলে ব্রিটিশ আমলে সরকারী চাকরীতে জনসংখ্যার অনুপাতে মুসলিমের সংখ্যাই ছিল বেশি।

অতএব, স্বজাতির রাজস্ব হারানোর ক্ষোভজাত কিংবা ওয়াহাবী-ফরায়েজী আন্দোলন প্রসূত ইংরেজী বিদ্বেষ তেমন কেজো ছিল না প্রতীচ্য বিদ্যা গ্রহণের ক্ষেত্রে। এসব আলোচনাকালে আমরা বেঙ্গল প্রেসিডেন্সির অংশ বিহার-উড়িষ্যার মুসলিমের অবস্থা ও অবস্থান বিবেচনা করি না। আর এ-ও মনে রাখি না যে বাঙলা দেশে মুসলিমরা সামাজিক আর্থিক-নৈতিক-শৈক্ষিক প্রভৃতি সর্ব ব্যাপারে দুই পৃথক ও স্বতন্ত্র সত্তায় বাস করত। একদল ছিল বিদেশীর উর্দুভাষী ধনী-মানী ফারসী-আরবী শিক্ষিত অভিজাত মুসলিম, গাঁয়ে এসব পরিবার ছিল দুর্লভ, তুর্কি-মুঘল আমলের প্রশাসনকেন্দ্রে ও বন্দর এলাকায় ছিল [এবং এখনো আছে] এদের নিবাস। এরা সংখ্যায় নগণ্য বটে, কিন্তু ধন-মন-বিদ্যাবলে বাঙালীর স্বঘোষিত ও ব্রিটিশ সরকার স্বীকৃত নেতারা ছিলেন এদেরই গোষ্ঠীভুক্ত।

কৃত্রিম কাঞ্চন-কৌলিন্যে দেশজ কিছু মুন্‌শী-মোল্লা-মৌলবী-মুয়াজ্জিন-খোন্দকার-উকিল-হাকিম পরিবার অভিজাতরূপে স্বীকৃত ছিল, তবে উর্দুভাষীর কাছে হীনমন্যতায় ভুগত ও পাত্তা পেত না বলে এরা কখনো নেতৃত্ব দাবি করেনি। এ অভিজাতবর্গের মধ্যে শিক্ষার ঐতিহ্য ছিল। ব্রিটিশ আমলে এরাই গোড়া থেকে ইংরেজী পড়া শুরু করে। বন্দর-নগরী কলকাতা ও তার চার পাশের জেলাগুলো ছিল বর্ণ হিন্দু অধ্যুষিত। শহরে চাকরীর, ব্যবসার ও শিক্ষার অবাধ সুযোগ পেয়েছিল তারাই। গোড়ায় দেশজ মুসলিমের অনুপস্থিতির দরুণ গাঁয়ের মুসলিমরা কলকাতা শহরে নিরাশ্রয় বোধ করেছে। কাজেই অভিজাত মুসলিম পরিবারে বিদ্যালয়ের দুর্লভতার দরুন ইংরেজী শিক্ষা প্রত্যাশিত সংখ্যার মধ্যে ছড়িয়ে পড়েনি। কিন্তু বিদ্যালয়ে যে এসব ঘরের সন্তানরা প্রেরিত হয়েছিল, তার প্রমাণ মীর মশাররফ হোসেন [১৮৪৭-১৯১২?], আবদুল হামিদ খান ইউসুফজায়ী [১৮৪৫-১৯১০], মীর্জা মুহম্মদ ইউসুফ আলী [১৮৫৮-১৯২০], কায়কোবাদ [১৮৫৮-১৯৫২], রেয়াজউদ্দীন আহমেদ আলহাদী [১৮৫৯-১৯১৯], নওশের আলী খান ইউসুফজায়ী [১৮৬৪-১৫২৪], শেখ আবদুর রহিম [১৮৫৯-১৯৩৩], মোজাম্মেল হক [১৮৬০-১৯৩৩], শেখ মুহম্মদ জমিরউদ্দীন [১৮৭০-১৯৩০], আবদুল করিম সাহিত্য বিশারদ [১৯৭১-১৯৫৩], মতিয়র রহমান খান [১৮৭২-১৯৩৭], শেখ উসমান আলী [১৮৭২-১৯৫২] প্রমুখ অনেকেই আর কলকাতার আবদুল লতিফ, আমীর আলী, আমীর হোসেন, বেলায়েত হোসেনদের কথা তো আমরা জানিই।

আর গোটা বাঙলাদেশের গাঁয়ে গাঁয়ে যে-সব আতরাফ-আজলাফ নামে অবজ্ঞাত নিম্নবৃত্তির ও নিম্নবিত্তের এবং নিঃস্ব মুসলিম ছিল, তারাই ছিল সমাজে শতকরা নব্বই জন। যদিও সব গাঁয়েই দু' একজন সাক্ষর লোক মিলত, তবু সাধারণভাবে বলা যায় তাদের মধ্যে লেখা-পড়ার কোন ঐতিহ্য ছিল না, যেমন ছিল না, তাদের জ্ঞাতি তাঁতী-হাড়ি-ডোম-বাগদী-কেউট-চাড়াল-কামার-কুমার-বারুই-তেলী প্রভৃতির মধ্যেও। শিক্ষার ঐতিহ্য থাকলে এরা ইংরেজ ও ইংরেজি বিদ্বেষ বশে ইংরেজী বিদ্যা গ্রহণ না করলেও বাঙলা, ফারসী বা আরবী তো শিখত। কিন্তু এদের মধ্যে—এদের জীবনে কোন প্রকার সাক্ষর শিক্ষার আভাস মাত্র মেলেনি। আজো যে

পরিবার নিরক্ষর-তা স্মরণাতীত কাল থেকেই ছিল নিরক্ষর। কাজেই ব্রিটিশ-বিদ্বেষ বশে নয়, শিক্ষার ঐতিহ্য-বিরহী বলেই প্রথম বিশ্বযুদ্ধ পূর্বে আতরাফ ও চাষী মুসলিমদের শিক্ষায় ছিল অনীহা-অবহেলা। আমাদের এ ধারণার সমর্থনে আরো একটি তথ্য উপস্থিত করা যায়। ইংরেজী প্রাশাসনিক ভাষারূপে দেশের বিদ্যালয়ে চালু হয়' ১৮৩৮ সনে। ওয়াহাবী আন্দোলনের অবসান ঘটে মোটামুটিভাবে ১৮৬০ সনে, সম্ভবত রেশ থাকে ১৮৬৫ সন অবধি। ওয়াহাবী মামলাই শেষ হয় ১৮৭০ সনের দিকে। তবু উনিশ শতকের শেষপাদে মুসলিম সমাজে ইংরেজী শিক্ষার প্রত্যাশিত বিস্তার ঘটেনি পূর্বোক্ত কারণেই। প্রমাণ, হুগলী মোহসিন কলেজে বাঞ্ছিত সংখ্যায় মুসলিম ছাত্র মেলেনি অনেক অনেক কাল। ঢাকা-চট্টগ্রাম-রাজশাহী কলেজেও মুসলিম ছাত্র ছিল দুর্লভ। বাঙলার বুকে কলকাতায় সরকারি মাদ্রাসা স্থাপিত হল ১৭৮০ সনে অথচ মাদ্রাসায় পড়াল-পড়ল অবাঙালীরাই। তাই পঠন-পাঠনের মাধ্যম ছিল উর্দু-ফরাসী। পরবর্তীকালে বাঙালী প্রতিষ্ঠিত গ্রামীণ মাদ্রাসায়ও ওদের প্রভাবে আরবি পঠন-পাঠনের মাধ্যম হল উর্দু-ফারসী-আরবী। ১৯৩০-৩৫ সন অবধি বাঙালী মৌলবিদের তথা মাদ্রাসায় পড়ুয়াদের বাঙলা বর্ণজ্ঞান পর্যন্ত ছিল না। শাস্ত্র শিক্ষার্থী বলেই মাদ্রাসার অবাঙালী ছাত্ররাও ইংরেজী ভাষা শেখা অবাঞ্ছিত বলে মনে করেছে।

মুসলিম সমাজে প্রতীচ্য শিক্ষা বিস্তারে আর একটি বাধার কথা বলা হয়। তা হচ্ছে; মুসলিমদের ওয়াকফ-আদি আয়মা-লাখরাজ সম্পত্তিচ্যুতি। আসলে ১৮২৮ সনে মাত্র আয়মা সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত আইন পাস হলেও ১৮৪৬ সন অবধি সম্পত্তির দাবি নিয়ে সরকারের সঙ্গে আয়মাদারদের মামলা চলে। অতএব ১৮২৮ বা ৪৬ সন অবধি আয়মাদারেরা জমিচ্যুত হয়নি। অর্থাৎ উনিশ শতকের প্রথমপাদ বা প্রথমার্ধ অবধি অভিজাত সম্পদশালী পরিবারগুলো সম্পদরিক্ত হয়নি। যদিও ১৭৬৫ সন থেকেই এ শ্রেণীর লোকেরা সামরিক, প্রাশাসনিক ও রাজস্ব বিভাগে কয়েক বছরের মধ্যেই পদচ্যুত হয়। কিন্তু বিচার বিভাগে ১৮৩৮ সন অবধি কাজী-কমিশনার রূপে এবং ১৮৬০ সন অবধি ফারসি জানা মুনশি উকিল হিসেবে বহুসংখ্যক মুসলিম আদালতে সুলভ ছিলেন। সামরিক প্রাশাসনিক-রাজস্ব বিভাগের পদস্থ মুসলিমরা সাধারণভাবে অবাঙালীই ছিলেন। তাদের অনেকেই উত্তর ভারতের দিকে চলে যান।

কাজেই শিক্ষিত মধ্যবিত্ত বা উচ্চবিত্ত মুসলিমদের আর্থিক দুর্ভাগ্য-দুর্যোগের এবং হতাশার-নৈরাশ্যের আঁধার যুগ হচ্ছে উনিশ শতকের শেষার্ধ। কারণ ইংরেজী মাধ্যমে রুজি-রোজগারের পথ-পদ্ধতি বদলে গেল। তার আগে-পরে তাদের জীবনে এমন দুঃসহ যন্ত্রণার কালরাত্রি কখনো দেখা দেয়নি। আর বাঙলার নিম্ন বৃত্তিজীবী ও চাষী জীবন চির নিঃস্বতার শিকার হয় লুণ্ঠন-প্রবণ কোম্পানি সরকারের স্বৈর বাণিজ্য নীতি এবং চিরস্থায়ী ভূমি বন্দোবস্ত নীতি গ্রহণের ও প্রবর্তনের ফলে। প্রথমটায় উৎপাদন নির্ভর গ্রামীণ পণ্য-বিনিময় ভিত্তিক আর্থিক জীবন পদ্ধতি ভেঙে গেল আকস্মিকভাবে। বিমূঢ় গ্রামীণ মানুষের ভাগ্যসূত্র গলগ্রহরূপে গাঁথা হয়ে গেল কোম্পানি মাধ্যমে আন্তর্জাতিক বাজারের সঙ্গে। এভাবে তাদের বর্ণে ও বৃত্তিতে বিন্যস্ত নিস্তরঙ্গ জীবনে ঘটল আর্থিক ও বৃত্তিক বিপর্যয়, উবে গেল বৃত্তি-বেসাত। বেকারত্ব, নিঃস্বতা ও অনাহার হল তাদের নিত্যসঙ্গী। আর চিরস্থায়ী ভূমি বন্দোবস্তে চাষীরা হল করভার ও ঋণভার পীড়িত ভূমিদাস। জমিদারের হুকুম-হুমকি-হামলার নিত্য শিকার।

অতএব উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে ইংরেজী শিক্ষা দানে আগ্রহ জাগলেও দারিদ্র্যের দরুন, শিক্ষার অনকূল পরিবেশের ও সন্নিকটে বিদ্যালয়ের অভাবে নিম্ন মধ্যবিত্ত মুনশি মোল্লা পরিবারের শিক্ষার প্রত্যাশিত প্রসার ঘটেনি এবং বৃত্তিজীবী ও চাষী-মজুর পরিবারেও একালে

শিক্ষার ও প্রতীচ্যশিক্ষার প্রতি আগ্রহ জাগলেও দারিদ্র্যই বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছিল। তবু একালে ও বিশ শতকের প্রথমপাদে অনেক পরিবারই সাধ্যমতো অন্তত একটা সন্তানকে বিদ্যালয়ে পাঠানোর প্রেরণা অনুভব করেছে। লক্ষণীয় যে হিন্দু-প্রতিষ্ঠিত স্কুলের কাছাকাছি এলাকার মুসলিমদের মধ্যেই ঘটেছে শিক্ষার প্রসার। অন্যত্র মুসলিম সমাজে অশিক্ষার অন্ধকার দীর্ঘকাল স্থায়ী ছিল। আবার এ-ও সত্য যে প্রথমে কলকাতার পরে সারা বাঙলার বর্ণ হিন্দু সমাজে ইংরেজী শিক্ষা সীমিত থাকায় নতুন যুগের ঐশ্বর্য তাদের আয়ত্তে এল বটে, কিন্তু ইংরেজ আমলে শিল্প-বাণিজ্য বা চাকুরি কমই ছিল। তাই দেশের লোকসংখ্যার তুলনায় শিক্ষিতের ও ধনীর সংখ্যাও ছিল কম।

তবু স্বধর্মীর রাজ্য হারানোর বেদনা ও ক্ষোভ লঘু-গুরুভাবে মুসলিম মনে জেগেছিল। ওয়াহাবী-ফরায়েজী আন্দোলনে এবং সিপাহী বিদ্রোহে পূর্বাবস্থা ফিরে পাবার ব্যর্থ চেষ্টাও হয়েছিল। সে বেদনা-ক্ষোভ-জ্বালার অভিব্যক্তি দেখি উনিশ শতকের শেষার্ধে মুসলিম-প্রচারিত পত্র-পত্রিকায় ও পুঁথি-পুস্তকে। ইংরেজী শিক্ষিতরা বিশ্ব-মুসলিমের অতীত কৃতি-কীর্তি স্মরণ করে একাধারে আর্তনাদ ও আস্ফালন করে আত্মপ্রবোধ পেতে ও প্রবুদ্ধ হতে চেয়েছেন, আর স্বল্পশিক্ষিত দোভাষী পুথিকারেরা উনিশ শতকের শেষার্ধ থেকে বিশ শতকের প্রথমপাদ অবধি শাস্ত্রানুশীলনের মাধ্যমে ধর্মনিষ্ঠ করে মুসলিমদের জীবন-জীবিকা ক্ষেত্রে দুর্ভাগ্য দূর করার পন্থা বাতলিয়েছেন। এসময় রাজ্য হারানোর ক্ষোভ থেকে জমিদার-মহাজন-চাকুরে হিন্দুর ধন-মান প্রতিপত্তিই তাদের মনে পরাভূত প্রতিদ্বন্দ্বীর-প্রতিযোগীর ঈর্ষা ও ক্ষোভ জাগিয়েছে বেশি। ফলে বাঙালী মুসলিমরা ব্রিটিশ ভারতে অর্থ-বিত্ত মননের কোন ক্ষেত্রেই স্বচ্ছ ও সুস্থ থাকতে পারেনি। অথচ বর্ণ হিন্দুরা যে দেশজ মুসলিমদের ধন-সম্পদ লুট করে নি, তারা যে বৃত্তিজীবী শ্রেণী হিসেবেই চিরকাল দরিদ্র ছিল এবং ব্রিটিশ শাসন-শোষণ-বাণিজ্য-নীতিই যে তাদের দুর্ভোগ বৃদ্ধি করেছিল, উকিল-ডাক্তার-জমিদার-মহাজন-চাকুরে বর্ণ হিন্দুরা কেবল নিমিত্ত মাত্র, ওরা মুঘল আমলেও যে এমনি ধনী মানী ও প্রতিপত্তিশালী ছিল গাঁয়ে গাঁয়ে, তা তাদের জানিয়ে দেয়ার লোক ছিল না দেশে, আর তাদের এ বিভ্রান্তি মুক্ত করা ছিল ব্রিটিশ স্বার্থ-বিরোধী। ভোটাধিকার পাওয়ার পরে রাজনীতিকরাই তাদের মনে বঞ্চনার ক্ষোভ বেশি করে জাগিয়ে দেয়। ফলে মুসলিম মনে সুযোগ পাওয়ার আশা এবং হিন্দু-মনে লব্ধ সুযোগ হারানোর ভয় সাম্প্রদায়িক-চেতনা তীব্র করে তোলে।

কিন্তু এ যুগে আধুনিক রাষ্ট্রে বাস্তব জীবন-জীবিকার প্রয়োজনেই অতীত জীবনের পুঁজি-পাথেয়, স্মৃতি-শ্রেয়স বর্জন করে মনে-মননে নতুন ও সমকালীন হতে হবে। শাসক-শাসিতের মধ্যকার সম্পর্ক চিরকালই প্রতিপক্ষের। আর ক্ষমতার প্রয়োগ মাত্রই কারো কারো প্রতি জুলুমরূপে প্রতিভাত হয়— অপব্যাখ্যাও পায়। তাছাড়া মধ্যযুগীয় সংস্কারাচ্ছন্ন পরিবেশে সাম্রাজ্যলোলুপ পরাক্রান্ত শাহ-সামন্ত শাসিত ও গোত্র চেতনাপুষ্ট অশিক্ষা-দুষ্ট বিধর্মী-বিজাতি-বিভাষী-বিদেশী বিদ্বেষী আস্তিক মানুষের ভাব-চিন্তা-কর্ম আচরণে গুরুত্ব দিয়ে, প্রজন্মক্রমে শ্রুতি-স্মৃতির মাধ্যমে শাসকগোষ্ঠীর পীড়ন-দলন-বঞ্চনার ক্ষোভ-জ্বালা-বিদ্বেষ ও প্রতিশোধবাঞ্ছা জিইয়ে রাখা এবং সুযোগ মতো কর্মে-আচরণে তা প্রকাশ করা এ যুগের গণতন্ত্রমনস্ক সমনাগরিকত্বকামী মানুষের চোখে গর্হিত কর্মাচরণ। বাবুরী মসজিদ-মন্দির দ্বন্দ্ব-দাঙ্গা তারই প্রকৃষ্ট প্রমাণ। যদিও কোন আস্তিক মানুষের পক্ষেই চিত্তের গভীরে প্রোথিত স্বধর্মী-প্রীতি ও বিধর্মী-বিজাতি-দ্বেষণা অতিক্রম করে মানুষ নির্বিশেষকে সম চোখে দেখতে কখনো পুরোসম্ভব

হবে না। তবু এ যুগে রাষ্ট্রের নাগরিক হিসেবে আস্তিক ব্যক্তিকে সহিষ্ণুতার ও উদারতার অনুশীলন করতেই হবে। একালে যানবাহন বিরল প্রাচীন ও মধ্যযুগের মতো গোত্রীয়, ধর্মীয় ও ভৌগোলিক স্বাতন্ত্র্য নিয়ে বাস করা কিংবা রাষ্ট্র গড়া সম্ভব নয়। এমনকি ইসরাইল রাষ্ট্রও খ্রিস্টান-মুসলিমকে বাদ দিয়ে অবিমিশ্র ইহুদি রাষ্ট্র হতে পারল না। কাজেই এ যুগে রক্তের, গোত্রের, ধর্মের, ভাষার স্বাতন্ত্র্য রক্ষার জন্যে একক ধার্মিক ভাষিক জাতির গোত্রিক রাষ্ট্র গড়া বা রাখা সম্ভব নয়। শ্রম-ব্যবসা-বাণিজ্য-শিক্ষা-স্বাস্থ্য-পর্যটন-দৌত্য-জ্ঞান-বিজ্ঞান-প্রযুক্তি প্রভৃতি সংক্রান্ত নানা প্রয়োজনে বিভিন্ন ধর্মের, ভাষার ও বর্ণের মানুষের যাতায়াত, বসবাস ও মিশ্রণ অব্যাহত ও অপরিহার্য হয়ে থাকবে। পৃথিবীর আমেরিকা নামের গোলার্ধে বিভিন্ন রাষ্ট্রের ইউরোপীয় মানুষের মিশ্রণে ও সমন্বয়ে সর্বত্র রাষ্ট্রিক জাতীয়তা গড়ে উঠেছে—অস্ট্রেলিয়ায়-নিউজিল্যাণ্ডে- দক্ষিণ আফ্রিকায়ও শ্বেতকায় মানুষের তেমনি রাষ্ট্রিক জাতীয়তাবোধ দানা বেঁধেছে। কিন্তু স্থানীয় আদিবাসী ও কৃষ্ণকায়দের সমনাগরিক অধিকার দেয়নি বলে সে-সব রাষ্ট্র দ্বেষ-দ্বন্দ্ব-সংঘাত বহুল হয়েই রয়েছে। তাছাড়া পৃথিবীর প্রায় সব রাষ্ট্রই উনজন সম্প্রদায় বাঞ্ছিত ন্যায্য নাগরিক অধিকার পায়নি বলে স্বাধিকার প্রতিষ্ঠা লক্ষ্যে সংগ্রামরত।

তবু আমাদের স্বদেশেই ইসলামী প্রজাতন্ত্র বা ইসলামিক রিপাবলিক ঘোষণার দাবি উঠেছে, পাঁয়তারা চলছে। তাতে অমুসলিমরা নাগরিক অধিকার বঞ্চিত জিম্মি হয়ে যাবে। ফলে হিন্দু, বৌদ্ধ, খ্রিস্টান, আহমদিয়া, সাঁওতাল, গারো, খাসিয়া, চাকমা, ত্রিপুরা, মগ, মুরং, মার্মা, শিখ, গুর্খা প্রভৃতি ধার্মিক ও ভাষিক সম্প্রদায় ও জাতিসত্তা স্ব স্ব স্বার্থের ও স্বাতন্ত্র্যের দাবি উঠাবে, রাষ্ট্র দ্বেষ-দ্বন্দ্ববহুল ও সংঘাতসঙ্কুল হয়ে উঠবে। এতে দেশ হবে মারাত্মক ক্ষতির শিকার আর রাষ্ট্র পড়বে স্থায়ী সমস্যার কবলে।

যেহেতু সব মানুষ কখনো নাস্তিক বা নির্বিশেষে মানবপ্রেমী হবে না, সেহেতু সমাজতান্ত্রিক সরকারই কেবল এ সব রাষ্ট্রিক-নাগিরিক সমস্যার সমাধান দিতে পারে। পুঁজিবাদী সাধারণ গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রেও স্ব স্ব স্বার্থে স্বাধিকারে সহিষ্ণুতায়, সহাবস্থানের নীতি গ্রহণ ও মেনে চলার অঙ্গীকারাবদ্ধ হলে রাষ্ট্রে বিভিন্ন ভাষিক, ধার্মিক, গৌত্রিক, বার্ণিক ও আবস্থানিক মানুষ যে-কোন রাষ্ট্রে শান্তিতে সহাবস্থান করতে পারবে।

জনজীবনধারার ইতিহাস চাই

রাজা-বাদশাহ্‌রা যে পীড়নের, শোষণের ও দলনের সংকল্প নিয়েই শাসনদণ্ড গ্রহণ করেন, তা বোধ হয় না। লোভ-ক্ষোভ-প্রতিহিংসা বশে, স্থিরবুদ্ধির ও ধীরচিন্তার অভাবে কিংবা অন্যের কোন কথার প্রভাবে অথবা সমস্যার শিকড় সন্ধানে ব্যর্থতার দরুন ভুল সিদ্ধান্ত গ্রহণের তথা উপদেষ্টাদেরও বিচারবুদ্ধির স্বল্পতাহেতু ভুলনীতি প্রয়োগের ফলে রাজা-বাদশাহ্‌রা স্বৈরাচারী, প্রজাপীড়ক, অবিবেচক, অযোগ্য, দুঃশাসক, দুর্জন, বিজাতি-বিধর্মী বিদ্বেষী নরদানব নামে ইতিহাসে কুখ্যাত হয়ে থাকে।

কাজেই পূর্বলব্ধ ধারণা নিয়ে কোন রাজগোষ্ঠীর বা রাজবংশের চরিত্র ঢালাওভাবে নিরূপণ করা বিজ্ঞানসম্মত বা যুক্তিসঙ্গত নয়। তাছাড়া ভাব-চিন্তা-কর্ম-আচরণ বহুলাংশে ব্যক্তিক জগৎ-চেতনার ও জীবন-ভাবনার প্রসূন অর্থাৎ ব্যক্তিগত চরিত্রজাত। তাকে বংশগত কিংবা জাতিগত কর্ম-আচরণ বলে অভিহিত করা ন্যায়সম্মত নয়।

ভারতবর্ষের ইংরেজ লিখিত ও ব্যাখ্যাত ইতিহাস এবং ইংরেজ প্রভাবে দেশীলোক লিখিত ও ব্যাখ্যাত অনুকৃত ইতিহাস ভারতবর্ষের বিগত দুশ বছরের হিন্দু-মুসলিমের মানসিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও রাষ্ট্রিক অনেক অনেক অশান্তির, অস্বস্তির, দ্বিধার, দ্বন্দ্বের, সংঘাতের ও সংঘর্ষের কারণ হয়েছে। তার জের ত্রিধা বিভক্ত হয়েও উপমহাদেশ এড়াতে পারেনি— পারছে না। সাম্প্রতিককালে নানা ছলে সংখ্যাগুরু হিন্দুর প্রত্যক্ষভাবে সংখ্যালঘু মুসলিম হনন ছাড়াও হিন্দুরা নিজেদের মধ্যকার বিবাদেও মুসলিমদের ওপর চড়াও হয়ে মুসলিম নিধনে হয় নিরত। আসামী-বাঙালী দাঙ্গায় আকস্মিকভাবে মোড় নিল গাঁয়ে গাঁয়ে মুসলিম হত্যায়, সিংহলী-তামিল বিবাদ রূপ নিল মুসলিম হননের, হরিজন বিরোধী বর্ণহিন্দু আন্দোলনও হয়ে ওঠে মুসলিম নিধনমুখী। পাকিস্তানেও সুন্নী-আহমদিয়া, শিয়া-সুন্নী, কিংবা সিন্ধী-বিহারী দাঙ্গা ঘটেই চলছে আজকাল। এসব হত্যাকাণ্ডের আশু প্রেরণা অর্থসম্পদ-বৃত্তি-বেসাত সম্পৃক্ত হলেও, উত্তেজনার অজুহাতের জড় রয়েছে প্রবর্তনাদাতা নেতাদের ইতিহাসপাঠ প্রভাবিত মনস্তত্ত্বে। বিধর্মীর প্রতি ব্যক্তিগত উদারতা এবং বিধর্মীর সঙ্গে ব্যক্তিগত প্রেম-প্রীতি-বন্ধুত্ব সম্পর্ক যতই গভীর হোক, জাতি বা সম্প্রদায় সম্পর্কে আস্তিক মানুষ মাত্রেরই বিধর্মী-দ্বেষণা মজ্জাগত। কাজেই অবজ্ঞার বিদ্বেষের বা স্বাতন্ত্র্য-চেতনার দেয়াল দুর্লঙ্ঘ্য হয়ে জাতি বা সম্প্রদায়গত ব্যবধান চিরন্তন করে রাখেই।

তবে আজকের যন্ত্রনিয়ন্ত্রিত সংহত পৃথিবীতে মানবগোষ্ঠীগুলোর স্বাতন্ত্র্যে বিচ্ছিন্নতায় বাস অসম্ভব বলেই সমস্বার্থে-স্বাধিকারে স্বমত নিয়ে সহিষ্ণুতায়, সহযোগিতায় সহাবস্থান করা জীবন-জীবিকার প্রয়োজনেই আবশ্যিক হয়ে উঠেছে জেনে-বুঝেই উক্ত সব শর্ত অঙ্গীকার করে দেশকালের চাহিদা মেনে সহাবস্থানে আগ্রহী হওয়াই সুবিবেচনার সৌজন্যের ও সুবুদ্ধির পরিচায়ক।

ভরসার কথা এই, আজকাল অসাম্প্রদায়িক চেতনালব্ধ আস্তিক, সংশয়বাদী, নাস্তিক ও বাস্তব জীবননিষ্ঠ তত্ত্বাশ্রয়ী শিকড় সন্ধানী ইতিহাসবেত্তার সংখ্যা বৃদ্ধি পাচ্ছে। এদের রচিত সমাজবিজ্ঞান সম্মত ইতিহাসের সংখ্যা বৃদ্ধি পেলে পুরোনো বিকৃত ইতিহাসগুলো হবে অচল। অতীত তখন উপমহাদেশের মানুষের ক্ষোভ-উত্তেজনা-বিদ্বেষ-প্রতিহিংসা স্মারক থাকবে না, হবে না বিদ্বেষ বিষ ছিটানোর ছড়ানোর পিচকারী। তখন উনজনের [সংখ্যালঘুর] সর্বক্ষণ বিপন্ন জীবনের ভার বইতে হবে না। শঙ্কামুক্ত জীবনে মিলবে স্বস্তি। আর এর বিকল্প ব্যবস্থা হচ্ছে সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করা।

গোত্রবদ্ধ বুনো-বর্বর সমাজসুলভ সাম্প্রদায়িক বার্ণিক দাঙ্গা এড়ানোর জন্যে হিন্দু-মুসলিমদের মধ্যে চালু দুটো ধারণার আশু পরিহার ও বিলুপ্তি প্রয়োজন। একটি হচ্ছে প্রাচীন ভারত মানেই হিন্দু ভারত— এ ধারণা। প্রাচীন বা তুর্কি-মুঘল পূর্ব যা কিছু ভারতীয় তার সবটা হিন্দুর নয়—যে হিন্দু নিজেদের কেবল আর্য বা বেদানুসারী বলে জানে, সেখানে মহেনজোদারো, হরপ্পা, লোথাল, কালিবগাঁন সভ্যতা সংস্কৃতির জড় আছে, আছে দ্রাবিড়, পারসিক, গ্রিক, শক, হুন, কুষাননাদি নানা গোত্রের অবদান এবং আর্যদের দান এতে স্বল্প ও

সামান্য। আর আর্যদের ঋণই বরং ওজনে ও বৈচিত্র্যে বেশি। এ সত্যের আশু স্বীকৃতি আবশ্যিক।

আর একটি হচ্ছে : দেশ-কাল-জাত-জন্ম-বর্ণ-পরিবেশ-পরিবেষ্টনী নিরপেক্ষ ভূত-বর্তমান-ভবিষ্যৎ বিহীন বৈশ্বিক মুসলিম সত্তার অভিন্ন অবিনশ্বর অস্তিত্বের ধারণা— এ মিথ্যা ধারণারও আশু অবসান আবশ্যিক। কেননা মানুষের জীবন-জীবিকা চিরকালই স্বদেশের ও স্বকালের প্রতিবেশে নিয়ন্ত্রিত। যে মাটিতে বসবাস সে মাটিকে অবহেলা করে এবং যে মনুষ্য-পরিবেষ্টনীতে বাস, সে মানুষের সহযোগিতা ব্যতীত মানসিক, বৈষয়িক, আর্থিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক, নৈতিক ও রাষ্ট্রিক জীবনে ব্যক্তির বা পরিবারের স্বচ্ছন্দ আত্মবিকাশ ও আত্মবিস্তার সম্ভব হয় না। কেননা মানুষ বাঁচে স্বদেশে ও স্বকালে স্ব স্ব জীবনের সর্বপ্রকার চাহিদা পূরণের প্রয়াসে।

আরো একটি তথ্য অঙ্গীকার করে ইতিহাস রচন, পঠন ও শ্রবণ শুরু করলে স্বচ্ছ চেতনালব্ধ নিরপেক্ষ দৃষ্টির প্রসাদে ইতিহাসের সত্য ও তথ্য বোধগত হয় সহজেই। তথ্যটি হচ্ছে এই—কোন বোধ-গত কারণে কিছুই ঘটে না—যা ঘটে তা অনেক কিছুরই প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ, দৃশ্য ও অদৃশ্য সহযোগিতায় বাস্তব রূপ লাভ করে। এ উপলব্ধি যে-কোন ব্যক্তির পারিবারিক, বৈষয়িক ও সামাজিক জীবনেও কেজো এবং বাঞ্ছিত ফলপ্রদ।

সব লোক ইতিহাস পড়ে না, আবার সময় ও শ্রম দিয়ে কিছু জানা বোঝার আগ্রহ সামান্যই থাকে সাধারণ মানুষের। তারা পথ-চলতি জানা এবং বৈঠকে তথা আড্ডায় শোনা কথার পুঁজি নিয়েই থাকে তুষ্ট। এমনি উদাসীন শ্রোতার উদ্দেশ্যে অধুনা আবিষ্কৃত ও স্বীকৃত ভারত ইতিহাসের কিছু তথ্য এখানে পেশ করছি।

শাহজাহান-পুত্র দারাহ শুকোহ [জন্ম : ২০ মার্চ ১৬১৫ খ্রিঃ— মৃত্যু ৩০ আগস্ট ১৬৫৯ খ্রিঃ] প্রায় সব উপনিষদের ফারসি তর্জমা করেছিলেন এবং স্বয়ং ছিলেন সিদ্ধ যোগী সাধক। তাঁর পীর ছিলেন কাদেরিয়া মতের মোল্লাশাহ বদখ্শানী এবং গুরু ছিলেন গোঁসাই বাবা-লাল। দুই সূফী শাহ্ মুহিবউল্লাহ এলাহাবাদীর এবং শাহ দীলরুবার সাহচর্যজাত প্রভাবও পড়েছিল তাঁর ওপর। 'সারমদ' সুফির সঙ্গেও তাঁর তত্ত্বালোচনার সুযোগ হয়েছিল। সৃষ্টি ও স্রষ্টা সম্পৃক্ত মৌলতত্ত্বে তিনি ইসলামে ও ব্রাহ্মণ বৈদান্তিক সিদ্ধান্তে কোন পার্থক্য খুঁজে পাননি। বরং সাদৃশ্য নয় শুধু, অভিন্নতাও দেখেছেন। তাঁর 'মাজমা আল বাহেরাইন' গ্রন্থে তাঁকে আমরা ধর্ম-সমন্বয় প্রয়াসী ও হিন্দু-মুসলিমের সমঝোতা ও মিলনের দূত হিসেবেই দেখতে পাই।

প্রত্ন উৎখনন এবং ভাষা বিশ্লেষণ থেকে এখন জানা গেছে যে, মহেনজোদারো, হরপ্পা, লোথা, কালিবগাঁন সভ্যতা আর্যভাষীদের সভ্যতা থেকে অনেক উন্নত ও বিকাশশীল ছিল। এমনকি গাঙ্গেয় উপত্যকায়ও তিন হাজার বছরের পুরোনো এক উচ্চমানের সভ্যতা ছিল। পশ্চিমবঙ্গের অজয়তীরে পাণ্ডুরাজার ঢিবিতে, দেগায় চন্দ্রকেতুর গড়ে, হরিনারায়ণপুরে প্রাপ্ত নিদর্শনের ভিত্তিতে এ দাবি প্রায় দৃঢ়ভাবেই করা চলে। আরব বিজয়ে আট শতকে (৭১২ সন থেকে) দাক্ষিণাত্যে এবং সবুক্তগীন, মাহমুদ ও মুহম্মদ ঘুরী প্রমুখের এগারো শতক অবধি অভিযানে-অনুপ্রবেশে উত্তরা-পথে ভারতবর্ষের প্রাচীন যুগের অবসান ঘটে এবং নতুন চিন্তা-চেতনা ও উন্নততর কর্ম-আচরণ ঋদ্ধ নবযুগের সূচনা হয়। এর একালের মানুষের দেয়া নাম 'মধ্যযুগ' বটে, কিন্তু গুণে-মানে-মাহাত্ম্যে-তাৎপর্যে যুগান্তরই। তখন থেকেই চিন্তায়, চেতনায়, শিল্পে, সাহিত্যে, স্থাপত্যে, সঙ্গীতে, আদব-কায়দায়, পোশাক-পরিচ্ছদে, আচার-আচরণে,

রান্নাবান্নায়, আহার্যে, প্রশাসন পদ্ধতিতে পরিবর্তন ও উৎকর্ষ সূচিত হয়—আসে সমাজে সংসারে নিয়ম-নীতিতে রীতি-রেওয়াজে পরিবর্তন এবং সুরুচির ও উৎকর্ষের লাবণ্য।

জোর করে ইসলামে দীক্ষিত করা হয়নি রাজনীতিক স্বার্থেই । ফলে তুর্কি-মুঘল রাজধানীতেও প্রায় প্রত্যেক প্রশাসন কেন্দ্রেই মুসলিমরা আজো উনজন। নিম্নবর্ণের নিম্নবিত্তের এবং নির্বৃত্ত নিঃস্ব অবস্থানের মানুষ ভাগ্যপরিবর্তনের আশায় ও অবজ্ঞামুক্তির আশ্বাসে দরবেশের হাতে স্বেচ্ছায় ইসলাম বরণে হয়েছিল আগ্রহী— ব্রিটিশ আমলে সে-শ্রেণীর নিঃস্ব মানুষে ও আরণ্য সমাজে একই কারণে যেমন খ্রিস্টধর্ম হয় জনপ্রিয়।[১] এবং দেশজ মুসলিমদের সঙ্গে শাসক তুর্কি-মুঘলের কোন আত্মীয়তার বন্ধন ছিল না। কাজেই তুর্কি-মুঘল নিন্দা তাদের গায়ে লাগা সঙ্গত নয়।

ইংরেজদের মতোই তুর্কি-মুঘলরা বিদেশি হওয়ায় গোটা মধ্যযুগেই গাঁ-গঞ্জের বিস্তৃত এলাকার মালিক ছিল ছোট-বড় সামন্তরাই, জমিদার-জায়গিরদারগণই এবং ব্রাহ্মণ-কায়স্থ-বৈদ্যই গ্রাম্যপঞ্চায়েত, রাজস্ব-আদায়কারী, শিক্ষক, চিকিৎসক, বিত্তবান কৃষক ও অন্যান্য ধনী-মানীরাই ছিল প্রতাপে প্রভাবে প্রধান। দেশজ গাঁ-গঞ্জবাসী মুসলিমরা, ক্ষুদ্রবৃত্তি-জীবীরা ও অচ্ছুতরা ছিল ওদের তথা বর্ণহিন্দুর শাসন-শোষণ-দলন-দমনের তথা হুকুম-হুমকি-হামলার পাত্র।

কাজেই ইক্‌তায়, কশ্‌বায়, থানায় ব্যতীত সাধারণ লোকের পক্ষে তুর্কি-মুঘল শাসক-প্রশাসকদের চোখে দেখাও সম্ভব ছিল না। ফলে গণমানবের ওপর জুলুম করার সুযোগই ছিল না তুর্কি-মুঘল শাসক-প্রশাসকদের। তবে দুই বিপরীত ধর্ম-সংস্কৃতি, ভাষা, আচার-আচরণ, জগৎ-চেতনা, জীবন-ভাবনা প্রভৃতির ধারক মানুষের মধ্যে মানস দ্বন্দ্ব ও অন্তরে অপ্রীতি থাকা ছিল স্বাভাবিক। তাই শাস্ত্রী ও সমাজপতি 'ব্রাহ্মণে-যবনে বাদ যুগে যুগে' লঘু গুরুভাবে ছিলই। সে কারণে মিশ্রণ ঘটলেও শাসক শাসিত সমাজের মিলন ঘটেনি, নানা স্বার্থে যৌথকর্মে একত্রিত হলেও একতা হয়নি কখনো। এ-ও সত্য যে শাসকরা তাদের স্বার্থে প্রয়োজন মতো হিন্দুদের দমন ও দলন করেছে, ভেঙেছে মন্দির, লুট করেছে সম্পদও।

রাজস্ব বিভাগ তো প্রায় হিন্দুরই একচেটে ছিল, এমনকি সামরিক বিভাগেও হিন্দু বিরল ছিল না কখনো। হিন্দু মন্ত্রী তো থাকতই। বাঙলায় তেরো শতকের গোড়া থেকেই ছিল হিন্দু পাইক বা পদাতিক বাহিনী। এমনকি হিন্দু-বিদ্বেষী বলে নিন্দিত আওরঙজেবের আমলেও হিন্দু সেনাপতির সংখ্যা কম ছিল না। বরং আওরঙজেবের আমলেই সাম্রাজ্যে হিন্দু কর্মচারীর সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়ে মোট কর্মচারীর এক-তৃতীয়াংশে দাঁড়ায়। অর্থাৎ শতকরা তেত্রিশ শতাংশে দাঁড়ায়—যা আকবর-জাহাঙ্গীরের রাজত্বকালেও ছিল কল্পনাতীত।[২] দিল্লিতে, বাহমনী রাজ্যে— বিজাপুরে, গোলকুণ্ডায়, আহমদাবাদে, বেরারে, বিদরে, গুজরাটে, বাঙলায়, কাশ্মীরে হিন্দুকন্যা বিবাহ রাজপরিবারে আকবরের আগেই চালু হয়েছিল।[২] এতে হিন্দুরা ক্ষুব্ধ ছিল বলে প্রমাণ নেই। আপোসে-প্রস্তাবে হিন্দুকন্যা বিবাহ মালাবারে কেরালায় শুরু হয়েছিল আট শতকেই। হিন্দু প্রজার ধর্ম-সংস্কৃতি মেনে চলার স্বাধীনতা দিয়েছিলেন প্রথম বিজয়ী ও শাসক কাসিম।[৪]

কাজী-মোল্লা উপদেষ্টাদের অনুরোধ সত্ত্বেও হিন্দু প্রজার অসন্তোষের আশঙ্কায় ইলতুতমিশ, বলবন, আলাউদ্দিন খালজী, মুহম্মদ তুঘলক, আওরঙজেব প্রমুখ কোন বাদশাহই[৫] শরিয়তসম্মত আইন-কানুন দেশে প্রজাসাধারণের ওপর চাপাতে সাহস পান নি। আকবর-জাহাঙ্গীর তো ইসলাম ছেড়ে দীন-ই-ইলাহী বরণ করেছিলেন সাম্রাজ্যিক স্বার্থেই।

আমরা জানি আস্তিক মানুষমাত্রেরই রয়েছে পরধর্মে অবজ্ঞা ও বিধর্মীর প্রতি সুপ্ত বিদ্বেষ। এ কারণেই সম্ভবত আঠারো শতকে আওরঙজেবের পরে দুর্বল দিল্লি সম্রাটের শিথিল শাসনের সুযোগে বিকেন্দ্রিত ও বিখণ্ডিত ভারতবর্ষের নানাস্থানে বিশেষ করে উত্তরভারতে, মারাঠারাজ্যে ও পাঞ্জাবে ধনী-মানী প্রাক্তন শাসকগোষ্ঠী নবোত্থিত শিখের, রাজপুতের ও মারাঠার হামলায় পর্যুদস্ত হতে থাকে।[৬] গো-বধ নিষিদ্ধ করা, অমৃতসরে আজান বন্ধ করা, নানা স্থানে মসজিদ ভাঙা প্রভৃতি ব্যবস্থা ও ঘটনা আঠারো শতকের গোড়া থেকেই সূচিত হতে থাকে। ব্রিটিশ আমলে [উনিশ শতকের শেষার্ধ থেকে] শাসকগোষ্ঠীর সুপরিকল্পিত ভেদনীতি প্রয়োগের ফলে তা সর্বত্র ছড়িয়ে পড়ে ও চালু থাকে। এবং সব কিছুর মূলে সমাজের উচ্চ ও মধ্যশ্রেণীর বিত্ত-বৃত্তি-বেসাতের স্বার্থ জড়িত থাকা সত্ত্বেও তা ধর্মীয় দাঙ্গার আকারেই আত্মপ্রকাশ করে (নইলে স্বধর্মীর সমর্থন ও স্বধর্মীগুণ্ডা মেলে না) আর রাজনীতিক দ্বেষ-দ্বন্দ্বরূপে চালু থাকে। প্রতীচ্য প্রভাবে এবং এসব দ্বন্দ্বের প্রত্যক্ষ ফলে স্বধর্মীয় স্বজাত্যবোধ, স্বাতন্ত্র্যচেতনা ও জাতিদ্বেষণা জাগতে ও বাড়তে থাকে। অথচ প্রতাপে প্রবল তুর্কী-মুঘল আমলে দেশি প্রজার ও বিদেশী শাসকের মধ্যে ভাব-চিন্তা-কর্ম-আচরণের ক্ষেত্রে আপসরফা নয় কেবল, গ্রহণে-বরণেসমন্বয়ও সাধিত হয়েছিল।[৭]

মুসলমানেরা বুঝতে চায় না যে আরবী ও ফারসী ইসলামপূর্ব যুগের ভাষা। এভাষা দুটোর বিকাশে পৌত্তলিক, অগ্নিউপাসক জোরাস্ট্রিয়ান, ইহুদি, খ্রিস্টান, হানিফ, বৌদ্ধ, প্যাগান প্রভৃতির অবদান ও ঐতিহ্য রয়েছে। এ ভাষা-দুটোর শাব্দিক ব্যঞ্জনাও একান্তভাবে ইসলামী নয়। দৈশিক, ভাষিক, সাংস্কৃতিক ও সাহিত্যিক ঐতিহ্যও ইসলামপূর্ব ও ইসলামোত্তর কালের মানুষের চলমান জীবনাচারের, মনন-চিন্তনের মিশ্রণ সঞ্জাত। কাজেই আরবী-ফারসী শব্দে, ভাষায়, কিসসায় এবং জনজীবনের বৃত্তান্তে আত্মসত্তার সন্ধান এক অন্ধ অবুঝ অশোভন আবেগ তাড়িত, ফলে বাস্তব জীবনে ক্ষতিকর প্রবণতার অভিব্যক্তি মাত্র। তাও আবার তার মধ্যে সমকালীনতা নেই। পনেরো শতক অবধি সীমিত আরব-ইরান-ইরাক-মধ্য এশিয়াই কেবল এ উপমহাদেশের মুসলিমদের অনুধ্যেয় এবং অনুপ্রেরণার বিষয়। অতএব এ আত্মীয়তাবোধ ও স্বধর্মচেতনা পশ্চাৎমুখী ও অতীতাশ্রয়ী— যা কোন শ্রেয়োচেতনা কিংবা কর্মপ্রেরণা জাগায় না। এ হচ্ছে নিরুদ্যম নিঃস্বের ধনীর সঙ্গে জ্ঞাতিত্বের নিষ্ফল গৌরব চেতনামাত্র।

দেশজ মুসলিমদের তুর্কি-মুঘল শাসকগোষ্ঠীর সঙ্গে অভিন্ন করে দেখা এবং শাসকদের অবাঞ্ছিত কর্ম-আচরণের জন্যে দেশজ মুসলিমদেরও দায়ী ভাবা ও তাদের প্রতি ক্ষোভ-বিদ্বেষ-ঘৃণা পোষণ করা অমুসলিমদের উচিত নয়। কালের মাপেতো বটেই, যুক্তির প্রয়োগে কিংবা ন্যায়ের তৌলেও একালের মুসলিমদের সেকালের প্রতিবেশ-চেতনা প্রসূত কৃত্রিম ও অসুস্থ দৃষ্টি দিয়ে দেখা অসঙ্গত, অন্যায় ও অকল্যাণকর।

ভক্তিবাদে, অদ্বৈতবাদে, সুফিবাদে, ঈশ্বরতত্ত্বে, সাধনতত্ত্বে ও পদ্ধতিতে, ভাষায়-সাহিত্যে-সঙ্গীতে, চিত্রশিল্পে, স্থাপত্যে, মৃৎশিল্পে, গণিতে, জ্যোতির্বিদ্যায়, আরব-ইরান-মধ্য এশিয়ার ও ভারতের মিলন-মিশ্রণ কেউ আজকাল আর অস্বীকার করে না। এগারো শতকের আগেই বৌদ্ধদের মাধ্যমে এবং ভারতবিদ্যার সঙ্গে প্রত্যক্ষ পরিচয়ের আগ্রহে বাগদাদে নীত ব্রাহ্মণ পণ্ডিতের ও শাস্ত্রীর সাহায্যে ভারতীয় নানা শাখার বিদ্যা ও তত্ত্ব লঘু-গুরুভাবে বাগদাদের বিদ্বৎ সমাজে প্রচারিত হতে থাকে। এখানকার বৌদ্ধ-হিন্দু যোগ-তন্ত্র তখনো বাগদাদে একেবারে অজ্ঞাত ছিল না। তুর্কী বিজয়ে উত্তরাপথে ও দাক্ষিণাত্যে দেশীয় নানা বিদ্যার, তত্ত্বের, শাস্ত্রের

ও সাহিত্যের গ্রন্থ আরবী-ফারসীতে তর্জমা হতে থাকে। আদি অনূদিত গ্রন্থের একটি হচ্ছে যোগ-তন্ত্র শাস্ত্রের ভোজবর্মণ রচিত 'অমৃতকুণ্ড'। এটি প্রথমে আরবীতে, পরে ফারসীতে এবং দ্বিতীয়বার আরবীতে অনূদিত হয়। মরমী অধ্যাত্মতত্ত্বের ক্ষেত্রে হিন্দু-মুসলিম তত্ত্বের প্রথম সমন্বয় সাধক ও হিন্দু-মুসলিমের মিলন দূত ছিলেন কবীর, পরে দারা শুকোহ্। আর ভাষায়-সাহিত্যে-সঙ্গীতে প্রথম মিলন-মিশ্রণ পন্থার পথিকৃৎ ও দিশারী ছিলেন অসামান্য প্রতিভাধর কবি-সাধক আমীর খসরু। মুসলিম যোগীর মধ্যে তেরো শতকের শাহ কলন্দর, শাহ মাদার ও সতেরো শতকের শাহ গাউস গোয়ালিয়ন প্রখ্যাত। নিম্নবর্ণের ও নিম্নবিত্তের নিঃস্ব-নিরক্ষর ক্ষুদ্র বৃত্তিজীবীদের মধ্যে দুই সংস্কৃতির সার্থক মিলন-মিশ্রণ ঘটিয়েছেন উত্তর ও দক্ষিণ ভারতের সন্ত-সাধকেরা, বাঙলার বাউল ও বৈষ্ণব সহজিয়ারা।

রাজা-বাদশার ইতিহাসে জাতিদ্বেষণার অভিযোগ আসে যখন শাসক হয় বিদেশী, বিভাষী, বিধর্মী কিংবা স্বদেশী বিজাতি-বিধর্মী হয়। যদিও এমন সাক্ষ্যপ্রমাণ এযাবৎ কেউ দিতে পারেনি যে, শাসক তার স্বদেশী-স্বভাষী-স্বধর্মী-স্বজাতিকে করমুক্ত, শাসনমুক্ত, শোষণমুক্ত, কিংবা অপরাধে শাস্তিমুক্ত রেখেছিল। দুর্জন শাসক যেসব কারণে প্রজাপীড়ন ও প্রজাশোষণ করে, সেসব কারণ বিদ্যমান থাকা সত্ত্বেও স্বদেশী, স্বধর্মী প্রজাকে শোষণ থেকে কবে অব্যাহতি দিয়েছে, তারা স্বজাতি-স্বধর্মী বলে কবে প্রতিযোগী-প্রতিদ্বন্দ্বীকে প্রশ্রয় দিয়েছে, ক্ষমা করেছে, স্বদেশী, স্বভার্ষী-স্বধর্মী বলে তাদের প্রতি আইনের শাসন কবে শিথিল করেছে? গৃহযুদ্ধে, জাতি, বিদ্বেষে, প্রতিদ্বন্দ্বিতায়, রাজদ্রোহে, ভ্রাতৃদ্বন্দ্বে হানাহানির কালে কে কাকে কবে ক্ষমা করেছে? আফ্রিকায় গোত্রদ্বেষণা, আমেরিকায় বর্ণবিদ্বেষ, ভারতে অচ্ছুতসমস্যা পাকিস্তানে শিয়া-সুন্নী-আহমদীয় দাঙ্গা কেবল মধ্যযুগকেই স্মরণ করিয়ে দেয়। আসলে ধনে-জনে-মনে-মননে যে দুষ্ট দুর্জন দুর্বৃত্ত প্রবল, সে-ই দীন-দুর্বলকে শাসনের শোষণের পীড়নের অধিকার পায়। সামর্থ্যের ও ক্ষমতার সঙ্গে স্থানে কালে যে-কোন রকমের জুলুমের বীজ জড়িয়ে থাকেই। স্বাভাবিক বলে হয়তো তাকে নিয়ম-নীতিভুক্ত বলেই মেনে নিয়েছে মানুষ। আস্তিক মানুষ মাত্রেই বিধর্মের ও বিধর্মীর প্রতি অবজ্ঞাপরায়ণ, ধনে-মনে ঋদ্ধ মানুষের যেমন থাকে রূপ-গুণ-ধন-মানহীনের প্রতি প্রচ্ছন্ন তাচ্ছিল্য। বুনো বর্বর প্রবল মানুষ আগেকার দিনে দুর্বল মানুষকে কখনো মানবমূল্য বা মর্যাদা দেয়নি। কেবল দাসদাসী নয়, ক্ষুদ্র বৃত্তিজীবী মানুষও কখনো মানুষ হিসেবে গণ্য হয় নি উচ্চবিত্তের মানুষের কাছে। দেশ-কাল-ধর্মভেদ সত্ত্বেও গণমানব চিরকালই প্রকৃতির ঝড়-ঝঞ্ঝা-খরা-বন্যা, মহামারীর যেমন তেমনি ছিল হুকুম হুমকি-হামলারশাসন-শোষণ-পীড়ন-পেষণের শিকার। বিত্তবান প্রবলদের প্রয়োজনীয় সেবার ও সামগ্রীর যোগানদার, শাহ-সামন্ত-রাজা-রাজড়ার বা তাদের সমর্থক সহযোগী বিত্তবান মধ্যশ্রেণীর সর্বপ্রকার জুলুম-বঞ্চনার, দলন-দমনের পাত্র ছিল জাত-জন্ম-বর্ণ-ধর্ম-দেশ-কাল নির্বিশেষে ওই গণমানবেরাই— যাদের আবহমান কালের দুঃখের লাঘব বা অবসান আজো হয় নি— ক্বচিৎ কোথাও উপশম ঘটেছে মাত্র।

আমরা চিরকালের অভ্যস্ত চেতনায় আচ্ছন্ন বলেই রাজা-বাদশার ধর্ম ও জাতি পরিচয়ে গুরুত্ব দিয়ে তাদের কর্ম-আচরণ ব্যাখ্যা করি, দুষ্কর্মের জন্যে জাত তুলে গালি দিই, সুকর্মের জন্যে স্বধর্মী-স্বজাতি বলে গৌরব বোধ করি। গণজীবনের সুখ-দুঃখের বঞ্চনার নিঃস্বতার নির্যাতনের বৃত্তান্ত আমাদের চেতনায় কোন গুরুত্ব পায় না, যেমন শাশুড়ীর হাতে নির্যাতিত বউ যথাকালে শাশুড়ি হয়ে বউয়ের ওপর নির্যাতন চালায়। আর এইভাবে পরোক্ষে প্রতিহিংসাবৃত্তি

চরিতার্থ করে ও বলে, এতো সনাতন গার্হস্থ্য নীতি-রীতি। তেমনি নির্যাতিত শোষিত মানুষও বিত্ত-বিদ্যা-ক্ষমতা পেয়ে পীড়ক-শোষক হয়, পূর্ব যন্ত্রণা ও অভিজ্ঞতা স্মরণ করে প্রতিকার-পরিবর্তনের কথা ভাবে না। এ মনস্তত্ত্ব ক্রিয়াশীল বলেই রাজা-বাদশারা আমাদের প্রতি শাসনে-শোষণে-পীড়নে পেষণে কিরূপ আচরণ করেছেন, যে সব তথ্যে বা তত্ত্বে আমাদের কোন আগ্রহ নেই, নেই কোন ক্ষোভ শাহ সামন্তের দলন-দমনের স্মৃতি চারণে। এ মুহূর্তেও দাঙ্গা বাধানোর জন্যে কেবল প্রয়োজন রয়েছে বুঝি মাহমুদ গজনীর মন্দির ভাঙা, আওরঙজেবের জিজিয়া কর বা গণেশের দরবেশ হত্যা ও শিবাজীর হিন্দুরাজ্য স্মরণের!

আবার এ বিজাতি-বিদেশী দ্বেষণা যে এক গৎবাঁধা মানসধর্ম ছিল, তার প্রমাণও রয়েছে, মিথিলার হিন্দুরাজার সভাপণ্ডিত স্মার্ত ও প্রখ্যাত কবি বিদ্যাপতির কীর্তিলতায়। গো হাড়ে, দেশ আকীর্ণ, কোথাও নির্বিঘ্নে পা রাখার উপায় নেই বলে ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন, যদিও তাঁর কাছে-পিঠে তার প্রভুর রাজ্যে তখনো গোবধ শুরু হয় নি। বাঙলা সাহিত্যেও [চৈতন্যচরিত মনসামঙ্গল এবং ভারতচন্দ্র অবধি অনেক কবির রচনা স্মর্তব্য] প্রায় গোড়া থেকেই শাসকগোষ্ঠীকে যবন 'ম্লেচ্ছ নেড়ে' বলে চরম অবজ্ঞার সঙ্গে নির্দেশ করেছে নির্ভয়ে ও সক্ষোভে এবং সগর্বে ও সানন্দে। এগুলো গায়েনের মুখে ও আসরে আসরে উচ্চারিত হত। শাসকগোষ্ঠীর কানে এখবর নিশ্চয়ই পৌঁছেছিল। কারণ রাজানুগ্রহজীবী ও রাজ কৃপাকামী জগতে কোথাও কখনো দুর্লভ ছিল না। তাছাড়া বাঙলা ভাষাভাষী দেশজ মুসলিমও ছিল। কাজেই তুর্কী-মুঘলের প্রতি শাসিত হিন্দুর এ গালমন্দ-নিন্দা-তাচ্ছিল্য ছয়শ বছর ধরে শাসক গোষ্ঠীর অজানা ছিল না। এ কারণে কিন্তু কোন হিন্দু কবি-গায়েনের শাস্তি হয়নি কখনো। কিংবা দাঙ্গা বাধেনি প্রতিবেশী দেশজ মুসলিমদের সঙ্গে। অতএব তুর্কী-মুঘল শাসকগোষ্ঠীকে পরমত ও নিন্দা সহ্য করবার মতো উদার ও সহিষ্ণু বলে মানতে হবে। কিংবা বিজাতি-বিধর্মী শাসনের উন্নততর পরিশীলিত নীতি বলে জানতে হবে। অথবা এ নিন্দা-অবজ্ঞা-অভিযোগকে শাসিত সমাজের গণতন্ত্রে সরকারবিরোধী দলের মতো ক্ষোভ প্রকাশের চিরকেলে মিথ্যা মাধ্যম বা অভিযোগ বলে জেনে এ নিন্দা-অবজ্ঞায় শাসকগোষ্ঠী উদাসীন ছিল।

এ কালের উপমহাদেশের শিক্ষিত হিন্দু-মুসলিমের ব্রিটিশ প্ররোচিত বিকৃত বুদ্ধি কেবল শহুরে জীবনে নয়, গণমানবেরও জীবন-জীবিকার ক্ষেত্রে কি সমূহ বিপদের অশান্তির ও ক্ষতির কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে, বিকৃত চেতনা জাতীয় জীবনে কত সঙ্কট ও বিপর্যয় সৃষ্টি করতে পারে তা উপমহাদেশের লোকের প্রাত্যহিক জীবনে নিত্যই অনুভূত হচ্ছে।

মানুষ স্বগোত্র-স্বধর্মী স্বজাতির গৌরবে গর্ব করে তাই জাততুলে বিধর্মী বিজাতিকে গাল দিতে ভালবাসে। অথচ রাজা-বাদশাহ-স্বৈরাচারী শাসকগোষ্ঠী কখনো কারো আপন ছিল না— হয় না, এ তত্ত্ব উপলব্ধি করলে তাঁদের নিন্দা তারিফে লজ্জা গৌরব বোধ করা অযৌক্তিক ও হাস্যকর নির্বুদ্ধিতা বলে মনে হবে।

একই আকাশের রোদ-বৃষ্টি-ঝড়-খরা-মহামারী নিয়ন্ত্রিত জীবনে একই হাট-মাঠ-ঘাটের এজমালী অধিকার থেকেও অভিন্ন জীবিকাক্ষেত্রে বিচরণ করেও শাসিত-শোষিত অভিন্ন সুখ-দুঃখ-আনন্দ-বেদনার পরিবেষ্টনীর মধ্যে বাস করেও জীবনে জীবিকায় এত অভিন্নতা ও সাদৃশ্য থাকা সত্ত্বেও কেবল শাস্ত্র-চেতনার ভিন্নতাই আমাদের নরহত্যায় প্ররোচিত করে হানাহানির উত্তেজনা যোগায়। প্রাণিসুলভ এ প্রবৃত্তি মানুষে আজও প্রবলতম দেখে মানবতার বিকাশ বিস্তার সম্বন্ধে হতাশ হতে হয়। অবশ্য এ-ও মনে রাখতে হবে যে সব দ্বন্দ্বের মূলে থাকে কোন-না-

কোন দুর্বল বা প্রবল পক্ষের প্রেম-ধন-মান-ক্ষমতার ক্ষেত্রে প্রতিযোগিতায় প্রতিদ্বন্দ্বিতায় হারার ও ক্ষতির আশঙ্কাজাত ঈর্ষা-হিংসা, ফলে বাধে বা স্বজনসহ বাধায় দাঙ্গা, করে লড়াই। এতে কেউ জাত-গোত্র-বর্ণ-ধর্ম-ভাষার কিংবা পরিবারেও মাতা-পিতার অভিন্নতার বন্ধন মানে না।

কেবল শাহ্-সামন্তের রাজা-রাজড়ার ইতিবৃত্ত নয়, গণমানবের আর্থিক-সামাজিক শাস্ত্রিক নৈতিক-শৈক্ষিক-সাংস্কৃতিক জীবনের ও জীবিকার পরিপ্রেক্ষিতে দৈশিক ও কালিক প্রতিবেশে জনগণের মন-মননসহ জীবনাচারের সামূহিক, সামষ্টিক ও সামগ্রিক রূপরেখা অঙ্কিত করা ও বিবর্তন ধারা চিত্রিত করাই একালের ঐতিহাসিকদের দায়িত্ব ও লক্ষ্য। আমাদের গবেষকরা ও ইতিহাসবেত্তারা এ দায়িত্ববোধ নিয়ে যত নিষ্ঠার সঙ্গে ও যত দ্রুত এ দায়িত্বে ও কর্তব্যে সাড়া দেবেন, দেশের পক্ষে হবে ততই মঙ্গল।

লেখকের সাধ্যমত যথাসম্ভব তথ্যভিত্তিক ইতিহাস রচিত না হলে ইতিহাসের শিক্ষার আলোকে জীবিকানির্ভর সমাজবদ্ধ মানুষ স্বাধিকারে স্বমতে অবস্থান করেও সমস্বার্থে-সহিষ্ণুতায়-সহযোগিতায়-সহাবস্থানে আগ্রহী না হলে বিভিন্ন গোত্রের, দেশের ও বিভিন্ন মত-পথের মানুষের সমাজে জীবিকা ও রাষ্ট্র ক্ষেত্রে যৌথ জীবনে ঠকাঠকি, ঠোকাঠুকি এবং পরিণামে কাড়াকাড়ি ও হানাহানি এড়ানো যায় না, যায়নি, যাবেও না কখনো।

তথ্যসংকেত

পাঠকের সুবিধের জন্যে প্রচলিত ধারণার বিরুদ্ধে ইতিহাসের কিছু সাক্ষ্য এখানে উদ্ধৃত হল :

১. The Buddhist jats of Sind sided with the Arab invaders against Brahminical orthodoxy and embraced Islam similarly in Bengal, after Bakhtiyar Khalji's invasion, a large number of socially depressed and unorthodox lower classes accepted Islam in large numbers, partly lured by the prospect of bettering their social and economic status and partly attracted by the pious life and magnetic personality of the Islamic saints. As Dr. Qandungo writes "It was during this time that the saints of Islam who excelled the Hindu priesthood and monks in active piety, energy and foresight, began proselytizing on a wide scale not so much by force, as by the fervour of their faith and their exemplary character. They lived and preached among the lower class Hindus then as ever in the grip of superstition and social repression. About a century after the military and political conquest of Bengal, there began the process of the moral and spiritual conquest of the land, through the efforts of the Muslim religious fratenities that now arose in every corner. [History of Bengal, Dacca University Vol II, P 69]. It cannot be gainsaid that the Islamic saints in Bengal created a great impact upon the lower classes of Hindus and Buddhists. According to the old Bengali poem Sunya Purana, the untouchables in Bengal rejoiced over the plight of the Brahmins. What happened in Sindh and Bengal as equally true so far as Maharastra and upper India are concerned. —"Impact of Islam on Indian culture in Mediaeval Age; Dr. Atul Chandra Roy. The spirit of India Vol II, P-III.

2. Muhammad Tughlag in the fourteenth century was the first Turkish ruler who systematically tried to enrol Hindus into the central ruling elite, the nobility. In Bengal as in Guzarat, in Kashmir, as in Bahmani Kingdom Hindus were appointed ministers and they continued to man the lower rungs of the administration (p.80). During the second half of the seventeenth century, the proportion of Hindus in the nobility of various levels, from the highest to the lowest, rose to about 33 percent. (P.79)

Dr. Satish ehandra, Cultural Integration and Indian History' in `The Spirit of India' Vol, II, 1974; Indira Gandhi Abhninandan Granth. PP. 80, 79.

Other sources : a. The Mughal Nobility Under Aurangzeb : Athar Ali, P. 31.

b. The Delhi Sultanat : ed. M. Habib and K. A. Nizami; PP. 754-8, 361, 981-2 et. seq.]

৩. ক. India and Islam : B. N. Pande, The spirit of India, Vol II, P. 94.

খ. Cultural Intergration etc. Dr. Satish Chandra. P. 80-Other sources : a. Indian Antiquary, Vol. XXXVI, 1907, P.8.

b. The Bahmonis of Deccan : H. K. Shervani, 1953, P. 144 et seq.

c. The rise of Maratha power : M. G. Ranade, P. 31.

d. History of Aurangzeb : J. N. Sircar, Vol III P. 163, foot note.

e. Tuzuk-i.Jahangiri; [Roger's Translation] Vol II, P. 181.

৪. ক. Impact of Iseam on Indian culture in Mediaeval age : Dr. Atul Chandra Roy, in 'The spirit of India' Vol II PP. 109, 111.

খ. Influence of Islam on Indian culture : Dr. Tara Chand, P. 33.

৫. ক. আলাউদ্দীন খলজী ও কাজী মুগীসউদ্দীন বৃত্তান্ত [তবাকতউল-উমান] : Cultural Intergration and Indian History, P 79./ Cambride History of India, Vol III PP. 89—90.

খ. Zawabit—I— Alamgiri/Mediaeval Hindu India by C. V. Baidya Vol. III P. 362.

গ. Mahmud [of Ghazni] to the musalmans of his day, he was ghazi, a champion of faith, to the Hindus, he is till to this day an inhuman tyrant, a veritable Hun, কিন্তু নিরপেক্ষ গবেষকদের চোখে "Mahmud was a great leader of man, a just and upright ruler according to his own lights, an interpid and gifted soldier, a dispenser of justice, a patron of letters and deserves to be ranked amongest the greatest kings of the world" Dr. Iswariprasad : History of Mediaeval India, P. 91.

ঘ. Shahabuddin (Ghori) was fighting for conquest of Territory and not for extending religion. Indeed we find that conversion of the people to Mohammadanism was not his motive in conquering northern India.

"Qutubuddin and Iltutmish were not fanatical muslims and were wise rulers who, like the British, saw the justice and even the wisdom of not interfering with the religion of the people." C. V. Baidya, Mediaeval Hindu India, Vol III P. P. 361-62.

ঙ. Hajjaj, Governor of Iraq, the uncle of Muhammad bin Qasem, wrote to him "We cannot in any way stretch our hands upon their lives or property. Permission is given them to worship their gods. Nobody must be forbidden or prevented from following his own religion. They may live in their houses in whatever manner they like.' He [Muhammad bin Quasem] directed the nobles, the principal inhabitants and the Brahmins to build their Temples, Traffic with the Muhammadans, live without fear and to strive to better themselves. He also enjoined them to maintain the indignant Brahmins with kindness, observe the rites and customs of their ancestors and give oblations and alms to the Brahmins according to former practice. "[Elliot, Vol I PP. 118, 86]

চ. "On this [Hindu] population they [Muslim Rulers] relied not only for the meaus of sorpport,but also to a great extent for the subordinate machinery of Government, for their can be no doubt that practically all minor posts connected with the assessment and collection of the Land Revenue and with accounts of public and state finance generally were filled, as they were many generation later, by the Hindus. There is no reason to believe that the position of the Hindu cultivator was worse under a Muslim than under a Hindu Landlord... It was certainly possible for Hindus to obtain justice even against Muslims."

— Cambride History of Indra Vol III pp. 89—90.

ছ. "Although in the mediaeval period the head of the state in India was a Muslim, the state was not Islamic... . It is a mistake to call the Mediaeval state of India theocratic, for it did not function under the guidance of the Muslim theologians.

Almost every one of the Muslim monarchs of India from thirteenth century onwards expressed inability and indicated the impossibility of conducting government in accordance with the Shariat. Iltutmish, Balban, Alauddin khalji and Muhammad Tughlaq were among the pre-mughal sovereigns of India who questioned the suitability of applying Muslim law to India.

India and Islam, B. N. Pande, in The spirit of India, Vol. II pp. 92-98.

এ সূত্রে স্মরণীয় যে মোল্লারা সব কাফেরকে তথা জিম্মিকে ইসলাম বরণে বাধ্য করতে ও অনিচ্ছুককে হত্যা করতে পরামর্শ দিয়েছিলেন ইলতুতমিশকে, তিনি অসম্ভব বলে তা প্রত্যাখ্যান করেন। বলবনও রাজ্যে প্রশাসনের প্রয়োজনকে শরিয়তের কানুনের উপর ঠাঁই দিতেন। আলাউদ্দীন খালজিও বলতেন, 'প্রশাসনের প্রয়োজনে যা দরকার আমি ধর্মাধর্ম বিচার না করে তাই করি। জানি না আল্লাহ্ হাসরে কি করবেন আমার।" তবকত-ই-আকবরী- নিজামউদ্দীন/ তারিখ-ই-ফিরোজশাহী-জিয়াউদ্দীনবরনী। এমনকি আওরঙজেবের মতো শরিয়তপন্থী মুমীনও নাকি বলতেন 'What have the worldly affairs to do with religion? And why should bigotry intrude into matters of religion? For you there is your religion and for me

mine. If the laws [of Shariat] were followed, it would have been necessary to annihilate all the Rajas and their subjects. What concern have we with the religion of anybody? Let Jesus his own religion and Moses his own, '—Ahkam by Hamiduddin. Nimcha-I Alamgir [Dagger of Alamgir,] Dr. Tarachand 'Pate Memorial Lectures, pp. 60-1 as quoted in the article 'India and Islam' by B. N. pande the, spirit of India, Vol II p-96.

৬. The Pre-Histoy of Communalism—C. A. Bayly : modern Asian studies, 19,2 (1985) pp 184-96

৭. Letters from amahratta Camp : T. D. Broughton [London 1813] pp 129, 239-40, 191. and other sources as mentioned by C. A. Bayly, See ibid pp 181-84.

চৈতন্যমতবাদ ও ইসলাম

১.

পূর্বকথা

ইসলামের প্রভাববলয় : দক্ষিণ ভারত

ধরা আজকাল সরার মতো তুচ্ছ না হোক আকারে আয়ত্তের মধ্যে তো বটেই। এ যন্ত্রযুগে যন্ত্রনিয়ন্ত্রিত জীবনসম্পৃক্ত জগৎটি আজ মানুষের কাছে একটি গাঁয়ের বা শহরের মতোই। প্রয়োজনে আজ পৃথিবীর যে কোন প্রান্তের যে কোন গৃহকোণের মানুষকে দেখা, তার সঙ্গে কথা বলা সম্ভব। একজন জিজ্ঞাসু মানুষের কাছে জ্ঞাতব্য কোন কিছুই কোথাও আর গুহায়িত থাকতে পারে না। বইপত্র ছাড়াও রেডিয়ো-টেলিভিশন-ভি.সি. আর-কম্পিউটার প্রভৃতি নানা বিস্ময়কর যন্ত্র আজ ব্যক্তি মানুষেরও সার্বক্ষণিক সেবায় নিয়োজিত। ফলে আজ পৃথিবীর যে-কোন ঘরে যে-কোন ব্যক্তির নতুন ভাব-চিন্তা আবিষ্কার উদ্ভাবন প্রকাশ মুহূর্ত থেকেই বিশ্বমানবের সম্পদ। তাই আজকাল সভ্যতায়, সংস্কৃতিতে, যন্ত্রে, জীবনাচারে সমকালীনতা অর্জনে কিংবা প্রাগ্রসর জীবন রচনায় আর্থিক সঙ্গতি থাকলে পৃথিবীর কোথাও কারুর পক্ষে কোন বাধা নেই। একারণে আবিষ্কার-উদ্ভাবনঋদ্ধ চিন্তা-চেতনার ক্ষেত্রে আর কোন দৈশিক যুগান্তর ঘটে না—ঘটে বৈশ্বিক যুগান্তর। ঘন ঘন সৃষ্টি হয় নবযুগ।

উনিশ শতকের আগে মানুষ যন্ত্র-বিজ্ঞানের এমনি অবাধ প্রসাদ থেকে ছিল বঞ্চিত। তখন মানুষের জীবন ছিল স্থানের ও কালের সীমায় আবদ্ধ এবং সেই স্থান-কালের পরিসরও ছিল সংকীর্ণ— কাল ছিল আবিষ্কার-উদ্ভাবনরিক্ত নিয়ম-নীতির, রীতি-পদ্ধতির আবর্তনবৃত্তে লগ্ন স্থির আর স্থানও ছিল গাঁয়ে ও গঞ্জে সীমিত। তাই শাস্ত্রে, সমাজে, ব্যবহারিক ও বৈষয়িক নিয়ম-নীতিতে, জীবিকার রীতি-পদ্ধতিতে পরিবর্তন ছিল বিরল ও দুর্লভ—ভাব-চিন্তা কর্ম-আচরণে আবর্তনই ছিল নিয়ম ও রীতি। কেবল ধর্ম প্রচারক হিসেবে কিংবা দেশ-বিজয়ীরূপে বিদেশী-

বিজাতি-বিভাষীর সঙ্গে স্থানীয় লোকের ঘনিষ্ঠ পরিচয়ের ফলেই প্রাচীনকালে তথা আধুনিক-পূর্ব কালে কোন দেশে বা সমাজে ঘটত যুগান্তর। এমন কি বাণিজ্যিক সম্পর্কেও পরিচয় কখনো আন্তরিক হত না, বাজারে পণ্যেরই হত বিনিময়, হত অর্থের লেনদেন— হৃদয়ের কিংবা মননের নয়। প্রমাণ ষোল শতক থেকেই ইউরোপীয় বেণোদের সঙ্গে এ দেশের মাটিতেই ভারতবাসীর বাণিজ্যিক সম্পর্ক ও ব্যবসায়িক লেনদেন শুরু হলেও ইংরেজরা এদেশের শাসক হয়ে আমাদের ঘাড়ে এবং তাদের ভাষা আমাদের মনে-মুখে চেপে বসার আগে আমরা ইউরোপীয় সভ্যতা-সংস্কৃতির, চিন্তা-চেতনার প্রভাব থেকে ছিলাম বঞ্চিত। প্রাগৈতিহাসিক কাল থেকেই দেখা যাচ্ছে ভারতবর্ষ চিরকালই বিদেশী-বিজাতি-বিজিত দেশ বলেই ভারতবর্ষের মানুষেরা বিদেশী-বিজাতি -বিধর্মীর হাতে পরাজয়ের গ্লানিতে, পীড়িতের যন্ত্রণায় জাগে। তাঁদের মতে-মননে, পথে-পাথেয়ে, দলন-বঞ্চনাজাত দুঃখ-যন্ত্রণায় মধ্যেই বয় জীবনের জাগরণের বাসন্তী হাওয়া। এ হচ্ছে দুঃখের অভিঘাতে বাঁচার তাগিদে মরিয়া হয়ে জাগা। তখন ভাব-বিপ্লবের আকারে তাদের মধ্যে ঘটে নবজীবনের সূচনা। তাই আর্যবিজয়ের ফলে দেখেছি অনার্য মনীষার বিকাশ শাস্ত্রে সমাজে সরকারে নবচিন্তা-চেতনার উন্মেষ—নতুনতর জীবন-জিজ্ঞাসার অভিব্যক্তি। নবদূর্বাদলশ্যাম রাম, নবঘনশ্যাম কৃষ্ণ, কৃষ্ণদ্বৈপায়ণ ব্যাস, নারদ, শুক, ভীষ্ম, বিদুর, কর্ণ, প্রহলাদ প্রভৃতি অনার্য রক্তসঙ্কর মানুষ। সাংখ্যা, যোগ, তন্ত্র প্রভৃতি দর্শন ও চর্যা, লোকায়তিক, কাপালিক, আজীবিক, চার্বাক প্রভৃতি দেহাত্ম-প্রাণাত্ম-মনশ্চৈতন্যবাদী ঐহিক জীবনে আস্থাবান সম্প্রদায়ের জীবন-জিজ্ঞাসার ও জগৎ-চেতনার বিকাশ-বিস্তার ঘটে প্রতাপে প্রবল আর্যাদর সঙ্গে শাসক-শাসিত ও পীড়ক-পীড়িত সম্পর্কে সহাবস্থানের ফলে। উত্তর পূর্বভারতে বর্ধমান মহাবীরের ও গৌতম বুদ্ধের নেতৃত্বে 'দেবদ্বিজবেদ' বিরোধী ভাব-বিপ্লবও ঘটে আর্য-পীড়নের অভিঘাত ঠেকানোর লক্ষ্যেই। এ দ্রোহও সফল হয়েছিল। গোটা ভারতে নিপীড়িত গণমানব বরণ করেছিল জৈন-বৌদ্ধমত, —আশু পীড়নমুক্তির উপায় হিসেবে।

অতএব, বিদেশীর সঙ্গে বিজেতা-বিজিত শাসক, শাসিত ও পীড়ক-পীড়িতরূপে অবাঞ্ছিত সম্পর্কের অভিঘাতজাত দুঃখ-যন্ত্রণার ও দলন-বঞ্চনার মধ্যেই ঘটেছে বিজিতদের মনে-মননে, মতে-পথে, বিচলন এবং শাস্ত্রের সমাজের সরকারের নিয়ম-নীতির, রীতি-পদ্ধতির লঘু গুরু পরিবর্তন। এ আমরা আর্য-গ্রিক-শক-হুন-কুষাণ, পার্থিয়ান, আরব, তুর্কি-মুঘল ও ব্রিটিশ আমলে কম বেশি দেখেইছি। দাক্ষিণাত্যের শঙ্করাচার্য-ভাস্কর-রামানুজ-নিম্বাক-মধ্বে, উত্তরাপথের রামানন্দ-কবীর-নানক-দাদূ-একলব্য-রজব, রবিদাস-রামদাসে কিংবা বিহার-বাঙলার বল্লভে-চৈতন্যে। আর ব্রিটিশ আমলেও রামমোহনে-সৈয়দ আহমদে-সৈয়দ আহমদ ব্রেলবীতে-তিতুমীরে-শরীয়তুল্লাতে বার বার দেখেছি।

ইতিহাসরিক্ত বলেই প্রাচীন কালের পরিসর সুবিস্তৃত। ইতিহাসের কায়া-কঙ্কাল বিরল বলে, অনুমানের ছায়া অবলম্বনে প্রাচীনকালের স্পষ্ট যুগবিভাগ সম্ভব নয়, কিন্তু হেজ্জাজের কাসিমপুত্র মুহম্মদের সিন্ধু বিজয়ের ফলে যে আরবসাগর উপকূলে কেরলে-মালাবারে নবচিন্তা-চেতনার উন্মেষ ঘটেছিল, শাঙ্করদর্শনে যা অভিব্যক্ত, তা-ই ঐতিহাসিক কালে নবযুগ সৃষ্টি করে। এখন থেকেই ভারতে, ইতিহাসের সাক্ষ্যে মুখ্যত দক্ষিণ ভারতে মধ্যযুগ শুরু হল। অতএব, আরব বিজয়ে (৮ম শতকে) দাক্ষিণাত্যে এবং তুর্কিবিজয়ে (এগারো-বারো শতকে) উত্তর ভারতে মধ্যযুগ সূচিত হয়। যেমন পলাশীর যুদ্ধই (১৭৫৭) আভাসিত করে আধুনিক যুগ। এ 'মধ্যযুগ' নাম ইউরোপের ইতিহাসের তাৎপর্যে গ্রহণ করা যাবে না, প্রাগৈতিহাসিক প্রাচীনকালগত বিভিন্ন স্তরের পরিবর্তনজাত যুগান্তরসমূহের পরে ইতিহাসগ্রাহ্য যুক্তিপ্রমাণে আর

তথ্যের ও তত্ত্বের সাক্ষ্যে যে-নব যুগের সূচনা ও প্রসার স্বীকৃত, তার গুণগত নয়— কালিক নাম মধ্যযুগ। এ নামে চিহ্নিত করে প্রাচীন ও আধুনিকযুগের সীমা নির্ধারণ করা হয় মাত্র।

যে-কোন নতুনযুগ সাধারণভাবে দৈশিক মানব-প্রগতিরই নামান্তর। কেননা, পুরাতন নিয়ম-নীতির রীতি-পদ্ধতির পরিহারে নতুন ভাব-চিন্তা-আচার-আচরণ গ্রহণে বরণে ও প্রবর্তনেই সূচিত হয় নতুনযুগ। 'নতুনযুগ' তাই নতুন ভাব-চিন্তা-কর্ম-আচরণ গ্রহণ বা উদ্ভাবন নির্দেশক। সে দিনও বিদেশী-বিজাতি-বিভাষী-বিধর্মী বিজেতার মুখোমুখি দাঁড়িয়ে অসহায় বিজিত মানুষেরা বুঝল, এই নতুন আকৃতি-প্রকৃতির মানুষের শাস্ত্র-সমাজ, বিশ্বাস-সংস্কার, আচার-আচরণ এতই ভিন্ন যে এদের সঙ্গে অবস্থান হবে দ্বান্দ্বিক, মানস-মিলন হবে অসম্ভব। তবু বৈষয়িক-ব্যবহারিক-আর্থিক রাষ্ট্রিক জীবনে স্বার্থবশে হাটে ঘাটে বাটে মাঠে লঘুগুরু দ্বন্দ্বে-মিলনে, সহিষ্ণুতায় ও সহযোগিতায় সহাবস্থান করতেই হবে। আর স্বধর্মে সুস্থির থাকার জন্যে শাস্ত্রিক-সাংস্কৃতিক জীবনে স্বাতন্ত্র্য রক্ষার গরজে করতে হবে শাসকগোষ্ঠীর সমকক্ষ হওয়ার সাধনা। এ ছিল উচ্চবর্ণের ও উচ্চবিত্তের শিক্ষিত সচেতন মানুষের মনের কথা। এ শ্রেণীর মানুষেরাই শাসকগোষ্ঠী কোন্ শক্তিতে বিজয়ী ও কি কি গুণে শ্রেষ্ঠ তা জেনে বুঝে অনুকরণে-অনুশীলনে হয় প্রয়াসী। আরবদের সিন্ধু বিজয়ের পরে সেদিনকার কেরলে-মালাবারে তথা দাক্ষিণাত্যে তা-ই করেছিল উচ্চ বর্ণের শিক্ষিতরা।

সেদিন ওরা দেখল বিজয়ীদের শক্তির উৎস হচ্ছে একেশ্বরবাদ। একেশ্বরে তাদের আস্থা এমনি দৃঢ় যে তারা জানে ও নিঃসংশয়ে মানে যে তাদের জন্ম-জীবন, কর্ম-আচরণ, সুখ-দুঃখ, আনন্দ-বেদনা সবকিছুই আল্লাহর অভিপ্রায়জাত। কাজেই তাদের জীবনে আল্লাহর ইচ্ছাই কেবল রূপায়িত হচ্ছে। তারা আল্লাহর অভিপ্রায়-নিয়ন্ত্রিত আজ্ঞাবহ দাস বা সেবক মাত্র। অতএব এ আত্মসমর্পণ ও আনুগত্যই ছিল তাদের শক্তির ও সিদ্ধির মূলে। যেহেতু তারা যা করে, তা আল্লাহর হয়ে আল্লাহর জন্যই আল্লাহর নিশ্চিত অভিপ্রায়ক্রমেই করে, সেহেতু তাঁদের জয়-পরাজয়, বাঁচা মরা আল্লাহরই ইখতিয়ারভুক্ত। তাদের দায়িত্ব নির্দ্বিধায় কেবল কাজ করে যাওয়া। তাদের এ ধারণা গীতার 'কর্মণ্যে বাধিকারস্তে মা ফলেষু কদাচন,' বাণী স্মরণ করিয়ে দেয়। মুসলিমদের এ ইমান, এ বিশ্বাসই ইসলামের উদ্ভাবকালে তাদের করে ছিল অপরাজেয়, অপ্রতিরোধ্য দিগ্বিজয়ী নির্ভীক বীর। সেদিনকার কেরল-মালাবারের বিস্মিত, বিমুগ্ধ বিচলিত ও প্রলুব্ধ গণমানব নয় কেবল, শাহ-সামন্ত-ধনী-মানী-বেণেও বরণ করে ছিলেন ইসলাম আত্মোন্নয়ন লক্ষ্যে।

বিজয়ী মুসলিমদের দেখে শঙ্করও (৭৮৮—৮২০) উপলব্ধি করেছিলেন ব্যক্তির ও জাতির জীবনে একক উপাস্যের গুণ-মান-মাহাত্ম্যের প্রভাব। অনুপ্রাণিত শঙ্কর তাঁর অবক্ষয়ক্লিষ্ট গোটা জাতির জন্যেই কামনা করে ছিলেন ইসলামী আদলের জগৎ-চেতনা ও জীবন-ভাবনা। ওই একেশ্বরে আনুগত্য ও আত্মসমর্পণই জাতির জীবনে নবজাগরণ, আত্মপ্রত্যয় ও কর্মোদ্যম আনতে পারে—এ বিশ্বাস বশে তিনি উপনিষদ থেকে বের করলেন একক নিরাকার উপাস্য বা স্রষ্টা তত্ত্ব। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে বিজয়ী ব্রিটিশ সংস্পর্শে এসে রামমোহনও এমনিভাবে নিরাকার ব্রহ্মবাদী হয়ে খ্রিস্টমতের প্রসার এবং হিন্দু সমাজের ভাঙন রোধ করেছিলেন। উপনিষদে এক ও অদ্বিতীয় ব্রহ্মতত্ত্ব থাকলেও ব্রাহ্মণ্য শাস্ত্রে-সমাজে এর কোন বাস্তব গুরুত্ব স্বীকৃত ছিল না। শাঙ্কর দর্শনে পরব্রহ্মই সত্য, আর সব মায়া এবং সে কারণে জগৎ ও জীবন মিথ্যা মায়া প্রপঞ্চমাত্র। 'একম এব অদ্বিতীয়ম' — এর নাম অদ্বৈতবাদ। অর্থাৎ সৃষ্টি ও স্রষ্টা মূলে অভিন্ন সত্তা। আনন্দ— স্বরূপ ব্রহ্মই ব্রহ্মাণ্ডের সবকিছুতে বিচিত্রভাবে আত্ম-প্রকট করে বিভিন্নভাবে

আত্মোপলব্ধি, আত্মঅনুভব বা আস্বাদন করছেন (একোহম বহু-স্যাম)। কিন্তু ইসলামী একেশ্বর বা অদ্বৈততত্ত্ব ভিন্ন। ইসলামে স্রষ্টা এক এবং অদ্বিতীয় আর সৃষ্টি-সত্তা আলাদা, আল্লাহর হুকুমজাত (কুন ফায়াকুন)। ব্রহ্ম নিজেকে আস্বাদন করেন এবং আল্লাহ তাঁর শক্তি দেখে আনন্দিত হন। শঙ্করকে অদ্বৈতব্রহ্মবাদী, মায়াবাদী ও জ্ঞানমার্গী বলা হয়। শঙ্করের এ অদ্বৈতবাদের প্রভাব সারা ভারতব্যাপীও সুদূরপ্রসারী হয়েছিল। এ মহাভাববিপ্লব শাস্ত্র-দ্রোহরূপে দেখা দিয়েছিল। অদ্বৈতবাদী শঙ্করশিষ্যরা পৌত্তলিকতা, দেবপূজা, মন্দিরউপাসনা করল বর্জন। কারণ শঙ্করমতে জ্ঞানযোগেই কেবল ব্রহ্মোপলব্ধি সম্ভব। মায়াবাদী বলেই শঙ্কর বৈরাগ্যেও সন্ন্যাসে উৎসাহ দিয়েছেন। বৌদ্ধরাও জানে এ জীবন যন্ত্রণাবৃদ্ধিকর মায়ামাত্র, নির্বাণ লক্ষ্যে বৈরাগ্য তাদের ছিল কাম্য। তাই শাঙ্কর দর্শন করল তাদের আকৃষ্ট, তারাও ক্রমে বৌদ্ধমত ত্যাগ করে ভিক্ষু-বিহার ছেড়ে হল মঠাশ্রিত সন্ন্যাসী ও সংসারী। ধর্মে ভিন্ন হলেও রাজনৈতিক জাতি হিসেবে শঙ্করশিষ্যরাও রইল ব্রাহ্মণ্যসমাজভুক্ত। এক হিসেবে শঙ্করই ভারতে বৌদ্ধ বিলুপ্তি ত্বরান্বিত করে ব্রাহ্মণ্য সমাজের পুনঃপ্রসারের সহায়ক হন।

দাক্ষিণাত্যে নয়শতকের দ্বিতীয় দশকে উচ্চারিত শঙ্করের অদ্বৈতবাদের তাত্ত্বিক বিকাশ ঘটে বিভিন্ন ভক্তিবাদী সাধু-দার্শনিকদের চিন্তা-চেতনায় ও মনে-মননে। নয়-দশ শতকে ভাস্করের ভেদাভেদবাদ, বারো শতকে রামানুজের বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ, বারো-তেরো শতকে নিম্বাদিত্যের দ্বৈতাদ্বৈতবাদ এবং চৈতন্যের অচিন্ত্যদ্বৈতাদ্বৈতবাদ প্রচারিত হয়ে শাঙ্কর দর্শনের বিকাশ-বিবর্তন ধারা আজ অবধি অব্যাহত রয়েছে। শঙ্করই কেবল জ্ঞানমার্গী ছিলেন, অন্যেরা ভক্তিবাদী বৈষ্ণব, চৈতন্যেই ঘটেছে ভক্তির প্রেমে উত্তরণ। ইসলামের প্রভাবে বৈদান্তিক অদ্বৈততত্ত্বে যে সংশয় দেখা দেয়, তা থেকেই দ্বৈত-অদ্বৈত চেতনার উদ্ভব।

আটশতকের ভারতে মুসলিমদের উপস্থিতিতে জাত জন্ম-বর্ণ-নিরপেক্ষ ও ভ্রাতৃত্ব ভিত্তিক ইসলামে নির্বিশেষ মানুষের শাস্ত্রে, সমাজে, জীবিকা ক্ষেত্রে কর্মে স্বাধিকারের এবং যোগ্যতা ও প্রয়োজনানুসারে সমানাধিকারের স্বীকৃতি নিম্নবর্ণের নিম্নবিত্তের মানুষের মনে জাগিয়েছিল দলিত-বঞ্চিতের ক্ষোভ, আর আত্মপ্রত্যয় ও যোগ্যতা অনুসারে মুসলিমজীবনে মুক্তির ও জীবনের অশেষ সম্ভাবনার আশ্বাস। তাই শুরু হয়েছিল ইসলাম-গ্রহণ। সেদিন ইসলামের মোকাবেলায় দুই বিরুদ্ধ শাস্ত্র-সমাজ-সংস্কৃতি-আচার-আচরণ এভাবে স্থানীয় সমাজে যে সমস্যার সৃষ্টি করেছিল, সেই উদ্ভূত সমস্যার বাঞ্ছিত সমাধান সার্থক ও সফলভাবে দিলেন শঙ্করাচার্য। বত্রিশ বছরের এ তরুণ সেদিন জাতির সঙ্কটকালে যে অসামান্য জ্ঞান-প্রজ্ঞা-বুদ্ধি-বিবেচনা এবং অতুল্য ব্যক্তিত্ব নিয়ে জাতীয় মহানায়কের ভূমিকা নিপুণভাবে পালন করেছিলেন, তার তুলনা পৃথিবীর ইতিহাসে কেবল যিশুর জীবনেই মেলে আংশিকভাবে।

মুসলিমদের উপস্থিতিতে ইসলামের প্রভাবে ব্রাহ্মণ্য শাস্ত্রে ও সমাজে উদ্ভূত সমস্যার সমাধান খুঁজলেন ইসলাম -অনুপ্রাণিত শঙ্কর ইসলাম-প্রভাবিত উপায়ে অর্থাৎ অদ্বৈতবাদ প্রচার করে। এতে যে যুগপৎ ইসলামের প্রসার প্রতিরোধ ও ব্রাহ্মণ্য সমাজের ভাঙনরোধ করা হল তা' নয়, বৌদ্ধ বিলুপ্তিও হল ত্বরান্বিত। এসব সিদ্ধান্ত বা মত-মন্তব্য আজকাল আর অস্বীকৃত হয় না। বিনয় ঘোষ[২] তারাচাঁদ[৩] উমেশচন্দ্র ভট্টাচার্য[৪], সুনীনিকুমার চট্টোপাধ্যায়[৫] প্রমুখ বিদ্বানেরা এমনি ধারণাই পোষণ করেন।

উত্তরাপথ তুর্কীরবিজয় : ইসলামের প্রভাবজ সন্তধর্ম

গজনীর আলপতগীনের ক্রীতদাস ও জামাতা সবুক্তগীন ভারতের উত্তর-পশ্চিম এলাকায় অভিযান চালিয়ে জয়পালকে পরাজিত ও করদানে বাধ্য করে ৯৯৭ সনে মারা গেলে তার পুত্র

মাহমুদ এগারো শতকের উষাকালেই বারবার অভিযান চালিয়ে পাঞ্জাব অঞ্চলে স্বশাসন প্রতিষ্ঠা করেন। এ সময় থেকেই উত্তরভারত মুসলিমদের শাস্ত্রের, সমাজের ও জীবনাচারের সঙ্গে পরিচিত হয়। ইসলামের উন্মেষযুগের আরব-মুসলিমদের মতো তুর্কো-আফগানদের ঈমানের জোর কিংবা চরিত্রবল বা আদর্শ নিষ্ঠা ছিল না বটে, কিন্তু প্যাগান ও নিবর্ণ বৌদ্ধ সামজের ঐতিহ্য ছিল বলেই ইসলামের সাম্য, ভ্রাতৃত্ব ও মানবমর্যাদাবোধ তাদের রক্তের সংস্কারে পরিণত হয়েছিল। কাজেই শাসকগোষ্ঠী হিসেবে যারা এল, তারা যে-কোন মানুষের গুণ-মান-মাহাত্ম্য স্বীকারে ছিল উদার ও উচ্চকণ্ঠ।

ক্রীতদাসদের বলা হত 'মামলুক'। এ দাস গ্রিস-রোম কিংবা আমেরিকার নিগ্রোদাসের মতো নির্যাতিত ঘৃণ্য প্রাণী নয়। দিন-মজুরির পরিবর্তে এককালীন টাকা দিয়ে বাজার থেকেই কেনা হত মানুষ পরিবারের পশুপালনের ও কৃষিকর্মের সহায়ক শ্রমিক হিসেবে। এসব মামলুক ক্রয়ের সঙ্গে সঙ্গেই প্রায় সর্বব্যাপারে হত পরিবারের সদস্য। এ ক্ষেত্রে সাধারণ গৃহস্থ ঘরে ও শাহ-সামন্ত প্রাসাদে কোন পার্থক্য ছিল না। আজ ক্রীতদাস, কাল জামাতা, পরশু গৃহপতি, কিংবা আজ ক্রীতদাস পরে যোগ্যতানুসারে, সৈনিক-সেনানী-প্রশাসক-শাসক-সামন্ত কিংবা সুলতান হতে বাধা নেই। আজ দাস কাল প্রভু। গৃহস্থের সন্তান গরিব হয়ে অনাথ হয়ে আত্মবিক্রয় করছে, ক্রীতদাস হচ্ছে এমন ঘটনা ঘটেছে অহরহ খরা-বন্যার বিপর্যায়ে দুর্ভিক্ষকালে কিংবা যুদ্ধে লুণ্ঠনে বিধ্বস্ত এলাকায় ও প্রান্তিক জীবনে। কাজেই হরহামেশাই জন্মসূত্রে নয়— যোগ্যতাসূত্রেই হচ্ছিল তুর্কিদাসের তথা তুর্কীদের জীবন নিয়ন্ত্রিত।

বিজয়ী তুর্কিদের সঙ্গে পরিচয় মুহূর্ত থেকেই ক্রীতদাসেরও জীবনের অশেষ সম্ভাবনার বাস্তব প্রমাণ পাচ্ছিল বিস্মিত ও মুগ্ধ জনগণ। ক্রীতদাস রাজা আলপ্তগীনের দাস ও জামাতা সবুক্তগীন তাঁর পুত্র মাহমুদ, আর ক্রীতদাস শিহাবুদ্দীন ঘোরী-মুহম্মদ গোরীর ক্রীতদাস দিল্লির প্রথম সুলতান কুতুবউদ্দীন আইবক। এভাবে বলবন আদি পরপর অনেক দাসই হয়ে ছিলেন রাজজামাতা ও দিল্লির বাদশাহ। এ কারণেই ইতিহাসে এদের 'দাস বংশীয় বাদশাহ' আখ্যায় চিহ্নিত করা হয়।

তুর্কো-আফগানের এ সাম্য, ভ্রাতৃত্ব ও ব্যক্তিক যোগ্যতার স্বীকৃতি ও সামাজিক সম্মান দেখে মানবাধিকার, স্বাধিকার ও সমানাধিকার বঞ্চিত জন্মসূত্রে পেশানিয়ন্ত্রিত নিম্নবর্ণের ও নিম্নবিত্তের বিক্ষুব্ধ গণমানব 'দেব দ্বিজবেদ'-দ্রোহী হতে লাগল। এতোকাল পরে তুর্কি-আফগানদের দেখে তারা জানল ও বুঝল, ব্রাহ্মণ্যসমাজ প্রজন্মক্রমে 'দেব-দ্বিজ-বেদের' নামে তাদের ঠকিয়েছে, বঞ্চিত করেছে তাদের ন্যায্য মানবাধিকার ও স্বাধিকার থেকে জীবন-জীবিকার সর্বক্ষেত্রে। ওই শোষক-পীড়ক শাস্ত্র-সমাজপতিরা তাদের বঞ্চিত রেখেছিল মানুষ নামের মর্যাদা থেকেও। হরণ করেছিল তাদের জীবন-বিকাশের শৈক্ষিক, বিত্তিক, বৃত্তিক, আর্থিক, চৈত্তিক, সামাজিক, মানসিক, সাংস্কৃতিক প্রভৃতি সর্বপ্রকার অধিকার ও সুযোগ-সুবিধা।

সেদিন উত্তর ভারতে নিম্নবর্ণের নিঃস্ব এবং নিম্নবিত্তের জন্মসূত্রে নির্দিষ্ট বৃত্তিজীবী দুস্থ মানুষেরা ইসলামী সমাজ ব্যবস্থায় মানুষের মর্যাদা নিয়ে প্রত্যয় ও প্রবণতা অনুসারে জীবিকা গ্রহণের স্বাধীনতা ও ব্যক্তিক যোগ্যতার স্বীকৃতি ও সম্মান রয়েছে দেখে, স্ব স্ব জীবনে প্রয়াসে প্রতিষ্ঠালাভ সম্ভব জেনে আশ্বস্ত ও আত্মপ্রত্যয়ী হয়ে ওঠে। এভাবেই তাদের মধ্যে জাগে আত্মোন্নয়নের-আত্মবিকাশের সম্ভাবনাময় নব জীবনস্বপ্ন এবং সে-মুহূর্ত থেকেই উত্তর ভারতে সূচিত হয় নবযুগ ভারতের দলিতবঞ্চিত মানব-মুক্তির যুগ, যা 'মধ্যযুগ' অভিধায় চিহ্নিত।

শোষণ-পীড়ন আর সেবাদাসত্বমুক্তি ও স্বাধিকার প্রাপ্তি লক্ষ্যে উত্তর ভারতে যারা ব্রাহ্মণ্যবাদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করল তারা— নেতা ও নীত— সবাই নিম্নবর্ণের নিঃস্ব লাঞ্ছিত এবং নিম্নবিত্তের দুস্থ-বঞ্চিত মানুষ। এর পূর্বে দাক্ষিণাত্যে যাঁরা নেতৃত্ব দেন, তাঁরা সবাই ছিলেন ব্রাহ্মণ— শঙ্কর, ভাস্কর, বিষ্ণুস্বামী, রামানুজ, নিম্বাদিত্য, মধ্ব আর উত্তর ভারতের দ্রোহী নেতারা ছিলেন মুদি, মুচি, মালী, ছুতার, ধুনকর, কুমার, নাপিত, মেথর বা ঝাড়ুদার শ্রেণীর লোক। যেমন কবীর তাঁতীর, রবিদাস মুচির, সেন নাপিতের, ধর্মদাস মুদীর, দাদু ধুনকরের, বিমান চাষীর, তিরুবল্লভ পারিয়ার আর নামদেব ও নানক ছিলেন যথাক্রমে দর্জির ও রঙ-রেজের সন্তান এবং রামানন্দ, একনাথ বা রজবও ছিলেন না মানীঘরের সন্তান।

এক হিসেবে গোটা ভারতের ইতিহাসে ব্রাহ্মণ্যবাদের তথা শাস্ত্রের ও সমাজের বিরুদ্ধে এটি ছিল গণবিদ্রোহ বা গণবিপ্লব। এই প্রথম একটি সুপ্রাচীন স্বীকৃত অপৌরুষেয় শাস্ত্রের এবং দৃঢ়প্রতিষ্ঠ সমাজের নিয়ম-নীতির বিরুদ্ধে গণমানব বিদ্রোহ ঘোষণা করল। এ দিক দিয়ে বিচার করলে সেদিন ইসলাম উত্তর ভারতে মানবমুক্তি-প্রতীক হিসেবেই করেছিল প্রবেশ। অন্য 'ইজম'-এর বা মতবাদের মতো এ রক্তেরাঙা বিপ্লব কিংব রক্ত-ঝরানো দ্রোহ হয়ে আত্মপ্রকাশ করেনি বটে, কিন্তু ভারতব্যাপী এ ভাববিপ্লব সেদিনকার ভারতে ও জগতে ছিল বিস্ময়কর অনন্য ঘটনা। রোমের দাস-দ্রোহের কথা বাদ দিলে একেই জগতের প্রথম শ্রেণীদ্রোহ ও শ্রেণীসংগ্রাম বলে অভিহিত করলে অতি বা অসঙ্গত উক্তি হবে বলে মনে হয় না।

এই শাস্ত্র ও সমাজ-দ্রোহীরাও অঙ্গীকার করল নিরাকার একেশ্বরবাদ বা অদ্বৈতবাদ। এদেরও অবলম্বন দাক্ষিণাত্যের সেই ঈশ্বরভক্তি। ভক্তি দ্রাবিড় উপজি/লায়ে (উত্তরাপথে) রামানন্দ/প্রকট কিয়ে কবীরণে। এদেরও সাধন-ভজন-কীর্তন ভক্তহৃদয়ের ভক্তি ঈশ্বরের উদ্দেশ্যে কেবল ধ্বনিত করার জন্যই। এদের উপাস্য কাবা-কৈলাসে কিংবা মন্দিরে-মসজিদে থাকেন না। হৃদয়মন্দিরেই, বুকের মঠেই এদের ঈশ্বরের-ব্রহ্মের অধিষ্ঠান। তুলসী কহে 'সব খুদা ভরপুরহে রূহমে/নিরখ দীল দেখ জাই'— খোদা রয়েছেন হৃদয় পূর্ণ করে আত্মার মধ্যে। হৃদয়ের মধ্যে তাঁকে প্রত্যক্ষ কর। তাই কাবা-কৈলাস-মন্দির-মসজিদ হচ্ছে ভক্তের হৃৎ-কমলই। কবীরের ভাষায় ঈশ্বর বলেন,—

> 'মো কো কঁহা ঢুঁড়ো বন্দে মৈঁতো তেরে পাসমেঁ
> না মৈঁ দেবল না মৈঁ মসজিদ, না কাবে কৈলাস মেঁ।

— আমাকে কোথায় খুঁজছ হে বান্দা, আমি তো রয়েছি তোমার পাশেই। আমি মন্দিরে-মসজিদে-কাবায়-কৈলাসে থাকিনে। দাদু বলেন, 'না হম হিংদু হোহিগেঁ না হম মুসলমান— হম রাতে রহিমান।'

— আমি হিন্দু বা মুসলমান হতে চাইনে, আমি থাকব দয়াময়ের সঙ্গে। কর্মমার্গী মানুষ হয় দায় ও কৃত্যনিষ্ঠ, জ্ঞানবাদী হয় অনুশীলনপ্রবণ, আর ভক্তিমার্গী বরণ করে বৈরাগ্য। ভক্তিবাদ সাধারণভাবে ঐহিকতা বিমুখ করে মানুষকে। শঙ্কর থেকে যে সন্তধর্মের শুরু, তা ভক্তিবাদী সন্তনের প্রচারে ও প্রচারণায় দেশব্যাপী দীন-দুস্থ নিঃস্ব-নিরক্ষর মানুষকে অসামর্থ্যের অক্ষমতার প্রবোধের অবলম্বনরূপে বৈরাগ্য-মহিমা কীর্তনে করেছে মুখর। তাই ব্রাহ্মণ্য শাস্ত্রের ও সমাজের শাসন থেকে মুক্ত হয়েও তারা ঐহিক জীবনে গুণে-মানে-মনে ঋদ্ধ হতে পারেনি। পারেনি যন্ত্রযুগের আগে বৃত্তি বদলাতে, ভাগ্য ফেরাতে। ঐহিক-তদ্‌বিবের যোগ্যতা অর্জন করেনি বলে তাদের সম্প্রদায়গত তকদিরও ফেরেনি। তারা জীবন-জীবিকার সর্বক্ষেত্রে রয়ে গেছে সবার পিছে, সবার নিচে, সবহারাদের মাঝে। নানকপন্থী শিখরা ছাড়া আর সব

সন্তপন্থীরা আজো স্বল্প আয়ের বৃত্তিজীবী, তাই দরিদ্র ও অনুন্নত ইসলামের প্রভাবে এরাও সাম্প্রদায়িক সাম্যে ভ্রাতৃত্বে, নিরাকার একেশ্বরে আত্মসমর্পণে ভোগবৈরাগ্যে ও ভক্তিসম্বল সরল জীবনে আস্থাবান। সে-ঈশ্বর কারুর কাছে হরি, কারুর কাছে রাম, কারুর কাছে শিব, কারুর কাছে বা নাথ, নিরঞ্জন।

ইতোপূর্বে মদিনা মুলতান অবধি সর্বত্র ইসলাম জনগণকে করেছে সহজেই আকৃষ্ট। কিন্তু ওই সীমার পরে ইসলামের প্রসার হল কোথাও মন্থর কোথাও বা রুদ্ধ। উত্তম-পশ্চিম ভারত বহু বহু শতক ধরে ইরানি, গ্রিক, শক, হূন, কুষাণ শাসনে ছিল বলে ব্রাহ্মণ্য শাস্ত্রের ও সমাজের বন্ধন ছিল শিথিল। আল্ বিরুনি শাস্ত্রে এদের সীমাহীন অজ্ঞতার নিন্দা করেছেন। তাই সে-অঞ্চলে ইসলামের আকর্ষণ ছিল অপ্রতিরোধ্য। উত্তর ভারতে শাস্ত্রের গ্রন্থি ছিল দৃঢ়, সমাজের নিগড় ছিল শক্ত। তাই কেউ পূর্বসংস্কার পরিহার করে অপরিচিত বিদেশী ইসলাম বরণে সহজে এগোয়নি। ফলে সন্ত নেতৃত্বে ব্রাহ্মণ্যবাদ-দ্রোহীরা শাস্ত্র-সমাজ ও মন্দির ছাড়ল বটে, কিন্তু প্রত্যাশিত নিয়মে মসজিদে ঢুকল না। তারা সৃষ্টির প্রতি প্রীতিকে সম্বল করে এবং স্রষ্টার প্রতি ভক্তিকে পাথেয় করে ভগবানের কৃপা-প্রত্যাশায় পথকেই করল আশ্রয়। —যে পথ মোক্ষের দ্বারে ঘটাবে উত্তরণ। বলা চলে এভাবে শাস্ত্রে ও সমাজে এক অহিংস শ্বেত বিপ্লব ঘটে গেল, দ্রোহীরা হল জয়ী। সে-জয়ে না ছিল আস্ফালন, না ছিল উল্লাস।

এমনি করে ইসলামের প্রভাবে নয়শতকে দক্ষিণ ভারতে ব্রাহ্মণের নেতৃত্বে, উত্তর ভারতে এগারো-বারো শতকে নিম্নবর্ণের নিঃস্ব এবং নিম্নবিত্তের দুস্থ মানুষের দ্রোহে নব-জীবনের নব-প্রত্যাশার ও নব-যুগের সূচনা হল। আমরা দেখেছি উনিশ শতকে ব্রিটিশ সরকার যখন ইক্ষুরসের মতো কিংবা তুলা বীজের মতো অর্থ সম্পদের আকারে আমাদের জীবন-রস বা প্রাণ-প্রবাহ নিঙড়ে নিচ্ছিল, তখনই কলকাতার শিক্ষিত বাঙালীর জীবনে ঘটে জাগরণ, চিন্তায়-চেতনায় আভাসিত হয় নবজীবন স্বপ্ন, মননে আসে তীক্ষ্নতা, বিচিত্রতা ও উজ্জ্বলতা, জাগে নতুন করে ইউরোপীয় আদলে দেশ-জাত-শাস্ত্র-সমাজ ও সংস্কৃতি গড়ার আকাঙ্ক্ষা। একে যদি আমরা রেনেসাঁস বলে মানি, তাহলে আরব-তুর্কির উপস্থিতিতে যে-নব যুগের শুরু তাতেও বিদেশী-বিজাতি বিজিত ভারতে দেশ-দুর্লভ বিপরীত মত-পথের ও নিয়ম-নীতির ইসলামের প্রভাবে কিংবা অনভিপ্রেত অভিঘাতে— নব চেতনার উল্লাসে কিংবা আত্মরক্ষার গরজে বা প্রেরণায়-রেনেসাঁস এসেছিল বা ঘটেছিল অদ্বৈতবাদ ও ভক্তিমার্গ অবলম্বন করে,—এমন সিদ্ধান্ত অযৌক্তিক কিংবা অসঙ্গত বলে মনে হয় না। তুর্কি-পাঠান আমলে পনেরো-ষোল শতকে বাঙালীর চিৎপ্রকর্ষের ও অভিব্যক্ত মনীষার ঔজ্জ্বল্যের ও উৎকর্ষের তারিফ বঙ্কিমচন্দ্র ও দীনেশচন্দ্র সেন যে-ভাষায় করেছেন, তাতে তাকে রেনেসাঁস বলেই আখ্যাত করা যায়। [বাঙ্গালার ইতিহাস প্রবন্ধ/বৃহৎবঙ্গ]

২

বাঙলায় বিজয়ী তুর্কীর প্রবেশ তেরো শতকের প্রভাতকালে (১২০৪/১২০১ খ্রিস্টাব্দে)। কাজেই বাঙলার নবযুগের শুরু তেরো শতকের উষাকালেই। আর নবযুগ আভাসিত হয় রাজা লক্ষ্মণ সেনের রাজত্বের প্রান্তপর্বে দরবেশ জালালউদ্দীন তাবরেজীর আগমনে। 'শেখ শুভোদয়া' গ্রন্থে মন্ত্রী ও স্মার্ত হলায়ুধ মিশ্র এঁরই প্রশস্তি ও মাহাত্ম্যকথা বর্ণনা করেছেন। অবশ্য দাক্ষিণাত্যের শাঙ্কর দর্শনের প্রভাব বাঙালীর শাস্ত্রে ও মনে-মননে তরঙ্গ তুলেছিল অনেক আগেই। অদ্বৈতবাদ, মায়াতত্ত্ব ও জ্ঞানমার্গ এখানেও কিছু পৌত্তলিক মনে সংশয় জাগিয়েছিল, করেছিল

তাঁদের সন্ন্যাসপ্রবণ ব্রহ্মবাদী। অন্যদের ভেদাভেদ বা দ্বৈতাদ্বৈততত্ত্ব ও ভক্তিবাদের বাহন হয়ে মন্থর গতিতে লোকমন প্রভাবিত করছিল মৃদু মন্থর গতিতে। পুরী, আনন্দ, তীর্থ, গিরি, ভারতী প্রভৃতি সম্প্রদায়ের সন্ন্যাসী বাঙলায় বিরল ছিলেন না।

তুর্কী-শাসন প্রতিষ্ঠার সঙ্গে ইসলামের উপস্থিতির ফলে বাঙলাদেশেও দক্ষিণ ও উত্তর ভারতীয় আদলে উচ্চবর্ণের ব্রাহ্মণ্যবাদীদের মনে শঙ্কা ও সতর্কতা এবং নিম্নবর্ণের মনে এতোকালের লাঞ্ছনা-বঞ্চনার ক্ষোভ আর মুক্তির ও মর্যাদার আকাঙ্ক্ষা ও আশ্বাস জাগল। মন্থর গতিতে প্রশাসন কেন্দ্রে হচ্ছিল ইসলামের প্রসার। হিন্দু ও নির্জিত বৌদ্ধ সমাজ ছিল অনেক কাল বিমূঢ় ও নিষ্ক্রিয়। পনেরো-ষোল শতকে যখন গাঁয়ে গঞ্জেও ইসলাম দ্রুত বিস্তার লাভ করছিল তখন ব্রাহ্মণ্য সমাজ ভাঙার আশঙ্কায় এবং ইসলামের প্রভাব প্রতিরোধ প্রেরণায় সমকালীন শাস্ত্রী, সমাজপতি ও পণ্ডিত-মনীষীরা হলেন সক্রিয়। মাঝদরিয়ায় ঝড় কবলিত জাহাজের মাঝি-মাল্লার মতোই তাঁরা শাস্ত্র-সমাজের তরী রক্ষায় হলেন তৎপর। তাঁরা স্বকালের ব্রাহ্মণ্য সমাজে জলচল ও অস্পৃশ্য মানুষের দ্রোহ ও ধর্মত্যাগ ঠেকানোর জন্যে, অসন্তোষ দূর করার লক্ষ্যে শাস্ত্রের, স্মৃতির, ন্যায়াদি দর্শনের প্রয়োজনানুগ কালোপযোগী ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ করে, নতুন ব্যঞ্জনা ও তাৎপর্য আরোপ করে গ্রহণ-বর্জন ও সংশোধনের মাধ্যমে এবং মেল, কাপ, পট বন্ধনের নতুন নিয়মনীতি প্রবর্তনে ও প্রয়োগে সমাজের ভাঙন রোধে হলেন প্রয়াসী। এ ক্ষেত্রে স্মার্ত রঘুনন্দন ভট্টাচার্য, নৈয়ায়িক রঘুনাথ শিরোমণি, বুনো রামনাথ, মেলবন্ধন (১৪৮০) রচয়িতা দেবীবর ঘটক, মহাবংশাবলী (১৫৫৫) প্রণেতা ধ্রুবানন্দ মিশ্র, গোষ্ঠীকথা ও মেলবন্ধন (১৫৪০) রচক নুলু পঞ্চাণ প্রভৃতির ভূমিকা স্মরণীয়। এ প্রসঙ্গে পনেরো শতকের রাঢ়ের দত্তখান বা দত্তখাস কিংবদন্তীর সমীকরণ, জাতিমালা কাচারি ও বরেন্দ্রের উদয়নাচার্য ভাদুড়ীর 'পরিবর্ত' নীতিও স্মর্তব্য। কিন্তু এতেও ভাঙন রোধ করা সম্ভব হচ্ছিল না। কেননা জন্মসূত্রে বর্ণে ও বৃত্তিতে বিন্যস্ত নিঃস্ব ও দুস্থ জনগোষ্ঠী যোগ্যতা ও কর্মনিষ্ঠা দিয়ে স্বভাগ্য নির্মাণের সুযোগ প্রাপ্তিলোভে ইসলাম বরণে উৎসাহী হয়ে ওঠে।

তাদের স্বধর্মে সুস্থির রাখার শেষ চেষ্টা হিসেবে তখন শাস্ত্রীরা ও সমাজপতিরা রটিয়ে দেন যে শিগগির যবনেরা দেশ থেকে হবে বিতাড়িত, —'গৌড়েতে ব্রাহ্মণ রাজা হবে হেন আছে।' এ চালেও কেউ ভীত বা প্রলুব্ধ যখন হলই না, এ চালও যখন ব্যর্থ হল, বিশ্বম্ভর মিশ্র ওর্ফে নিমাই পণ্ডিত ব্রাহ্মণ্য সমাজ রক্ষার লক্ষ্যে তথা ইসলামের প্রসাররোধ কল্পেই দক্ষিণ ও উত্তর ভারতীয় পন্থায় অদ্বৈতবাদ ও ভক্তি অঙ্গীকার করে সেদিনকার বাঙলায় জাতির সঙ্কটকালে মহানায়কের দায়িত্ব স্বেচ্ছায় বরণ করে ত্রাণকর্তার সার্থক ভূমিকা পালন করলেন। চৈতন্যদেবের ঐতিহাসিক ভূমিকা সম্বন্ধে ডক্টর আবু মহামেদ হবিবুল্লাহও বলেন, "চৈতন্যদেবের বৈষ্ণব আন্দোলন যে হিন্দুর সমাজ সংরক্ষণেরই ইসলাম প্রতিরোধ পরোক্ষ আন্দোলন, এ সিদ্ধান্ত নিয়ে আজ আর তর্ক নেই। কেবল বৌদ্ধ ও অনুরূপ শ্রেণীকেই নয়, ধর্মান্তরিত হিন্দুকেও সমাজে পুর্নগ্রহণর সার্থক উপায় হিসাবেই যে প্রেম ও ভ্রাতৃত্বের আহ্বান ধ্বনিত হয়েছিল, তার যে প্রত্যাশিত ফলও পাওয়া গিয়েছিল, তার প্রমাণের অভাব নাই। ষোল শতক থেকেই বাঙলায় ইসলামের অব্যাহত প্রসার রুদ্ধ হয়ে গেছে, এ কথা হয়তো তাই বলা যায়"।[৬] চৈতন্যদেবের বিশেষ অবদান হচ্ছে অদ্বৈততত্ত্বের 'অচিন্ত্যাদ্বৈতাদ্বৈত' তত্ত্বে উন্নয়ন এবং ভক্তির প্রেমে উত্তরণ দান। ইসলামের স্রষ্টা-সৃষ্টি দ্বৈততত্ত্ব বৈদান্তিক নিঃসংশয় অদ্বৈতবাদে যে সংশয়ের ফাটল ধরাল, তারই মীমাংসা দেখি অচিন্ত্যদ্বৈতাদ্বৈততত্ত্বে। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে মঙ্গল পাঁচালীর ধনপতির ও চাঁদ বেণের একক দেবতার আনুগত্যচেতনাও একেশ্বরবাদের প্রভাবজ।

যদিও চৈতন্যদেবের মতবাদ ছিল বেদধর্ম বিরোধী (হেন মহাঠাকুরাণী ভাব যার মনে উপজয়/বেদধর্ম তেজি সে কৃষ্ণকে ভজয়), তবু সে-দিন মত-পথের পার্থক্য সত্ত্বেও কার্যত হিন্দুর অখণ্ড জাতিসত্তার রক্ষক বলেই তাঁর কাছে হিন্দুমাত্রই ঋণী।

চৈতন্যদেবের জীবনবৃত্তান্ত এখানে প্রাসঙ্গিক নয়। তবু যেহেতু মানুষের মানস ও ব্যবহারিক অবস্থান ও পরিবেষ্টনীই মানুষের মত-মনন গঠন ও নিয়ন্ত্রণ করে, সেহেতু চৈতন্যের চিন্তাকে ও কর্মকে তাঁর জীবনের যে যে ঘটনা গভীরভাবে প্রভাবিত করেছে, কিংবা চিন্তার ও কর্মের উদ্ভব ঘটিয়েছে সেগুলোর উল্লেখ আবশ্যিক বলে মনে করছি।

বাল্যে-কৈশোরে নিমাই দুরন্ত ও সপ্রতিভ ছিলেন। অতিক্রান্ত কৈশোরে তিনি দেশের ও যুগের রীতি-নীতি বিরোধী আচরণে সবাইকে চমৎকৃত করেছিলেন। পাড়ার মেয়ে সুন্দরী লক্ষ্মীপ্রিয়াকে বিয়ে করার জন্যে শরম-সংকোচ ত্যাগ করে বায়না ধরেন, মা অনিচ্ছায় এ জেদী ছেলের আবদার পূরণ করতে হলেন বাধ্য। মনের মতো বউকে ঘিরে তাঁর জীবনস্বপ্ন হচ্ছিল আনন্দ-সুন্দর। নিশ্চিন্ত জীবনের জন্যে প্রয়োজন অর্থ-সম্পদের। সে-অর্থ-সম্পদ সমস্যা পূরণের জন্যে তরুণ নিমাই পিতৃপুরুষের ভূসম্পত্তি বিক্রয় করে অর্থসংগ্রহের জন্যে গেলেন শ্রীহট্টে। সে যুগের ব্রাহ্মণপণ্ডিত গাঁয়ে গাঁয়ে আত্মপ্রচার ও পাথেয় যোগাড় করে করে মন্থর গতিতে যাতায়াতে লাগালেন প্রায় দু বছর। ফিরে এসে শুনলেন যাঁকে পেয়ে তাঁর জগৎ ও জীবন এমন মধুময় এমন সুন্দর, যিনি তাঁর উদ্যমের আধার ও কর্মশক্তির উৎস, তিনি হয়েছেন আকস্মিক অপমৃত্যুর শিকার।[৭] তখন পৃথিবী তাঁর আসক্তি-রিক্ত চোখে মরুমায়া, জীবনটা দুর্বহ যন্ত্রণামাত্র। বুকের এ বিচ্ছেদজ্বালার উপশম নেই, নেই এ মানস যন্ত্রণার শেষ। তাই জ্বালা-যন্ত্রণা মুক্তির লক্ষ্যে সন্ত-সাক্ষাতে ও তীর্থদর্শনে ছুটোছুটি করছিলেন অস্থির চিত্তে। ঘরে সংসারে মন বসানোর জন্যে বৃথাই স্বজনেরা আবার তার বিয়ে দিলেন বিষ্ণুপ্রিয়ার সঙ্গে তাঁর ইচ্ছার বিরুদ্ধেই। লক্ষ্মীপ্রিয়ার বিকল্প হয় না। স্বস্তি বাঞ্ছায় বিবাগী নিমাই দেহ-মন আত্মা সমর্পণ করলেন স্রষ্টার কাছে আর আত্মনিয়োগ করলেন সৃষ্টির সেবায়। অর্থ-বিত্ত-বর্ণ বৈষম্য কণ্টকিত বন্ধুর সমাজে-সংসারে তিনি সর্বব্যাপী প্রীতি-জাত সাম্যবোধে দেখলেন 'জীবে ব্রহ্ম' 'নরে নারায়ণ'। ব্যক্তি মানুষের মর্যাদা এ অঞ্চলে প্রথম স্বীকৃত হল [যদিও তিনি সমাজে বর্ণভেদ বিরোধী ছিলেন না বলেও মত চালু আছে][৮] মানবাত্মা হচ্ছে সোনার মতো, কোন আপাত মালিন্যই এর শাশ্বত রূপ নষ্ট করতে পারে না। তাই কোন মানুষেরই গুণ-মান-মাহাত্ম্য অপর কারুর চেয়ে কম নয় এমনি এক উপলব্ধি থেকেই বৈষ্ণবীয় বিনয়ের ও ক্ষমার উদ্ভব। সুবুদ্ধি রায়ের, বালবিধবা নারায়ণীর ও তাঁর অবৈধ সন্তান বৃন্দাবন দাসের বৃত্তান্ত এ ক্ষেত্রে স্মর্তব্য। অতএব আমাদের ধারণা স্ত্রীবিয়োগজাত বৈরাগ্যই ওই দাম্ভিক উদ্ধত জিগীষু তরুণ পণ্ডিতকে ঈশ্বরানুরাগে ও স্বকালের স্বদেশের মানবের শাস্ত্র-সমাজ ঘটিত লাঞ্ছনা-বঞ্চনা মোচনে অনুপ্রাণিত করেছিল এবং উপায়ের সন্ধান পেয়েছিলেন সমকালীন বিপ্লবী চিন্তা-চেতনার উৎস অদ্বৈতবাদে, ইসলামে ও সুফিমতে। বাকপটু জিগীষু, তর্কপ্রিয়, দাম্ভিক তরুণ ব্রাহ্মণ পণ্ডিত বিশ্বম্ভরের ছিল ইউসুফের মতো অসামান্য আঙ্গিকরূপ (এক অঙ্গে ব্রতরূপ নয়নে না হেরি) অতুল্য ব্যক্তিত্ব, অনন্য মনীষা, অসীম সাহস এবং একাধারে বজ্রকঠিন ও কুসুমকোমল হৃদয়। সে-হৃদয় ছিল প্রীতির প্রস্রবন। বাঙালীর চোখে নিমাই প্রমূর্ত প্রেম ও হৃদয়। মাধুর্যের নির্যাস।[৯] আর একটি কথা নিমাই ছিলেন অত্যন্ত আবেগপ্রবণ মানুষ। এরূপ ব্যক্তি কোন অনভিপ্রেত আকস্মিক ঘটনার অভিঘাত সহ্য করে স্থির থাকতে পারে না। চৈতন্যদেবের মৃগী রোগও ছিল [মৃগ ব্যাধিতে মুই কভু হই অচেতন। —চৈতন্যচরিতামৃত] যৌবনের প্রারম্ভে একবার

অল্পসময়ের জন্য এবং প্রয়াণের পূর্বে বারো বছর ধরে তিনি মতিচ্ছন্ন ছিলেন-বৈষ্ণবেরা যাকে প্রেমোম্মাদ দিবোন্মাদ, বা অধ্যাত্মসিদ্ধিজাত মরমী মতিচ্ছন্নতা বলে জানে। তাই এক হিসেবে চৈতন্যদের মাত্র বারো বছরই [১৫১০-২১] সুস্থ ও স্বস্থ থেকে স্বমত মুখে মুখে প্রকাশ ও প্রচার করতে পেরেছিলেন এবং নদীয়া ছাড়লেন ১৫১০ সনেই।

ইসলাম ও সুফিমত

সৃষ্টি ও স্রষ্টার দ্বৈততত্ত্বই ইসলামের ভিত্তি। আল্লাহ্‌র সঙ্গে মানুষের সম্পর্ক হচ্ছে দাস (আব্‌দ ও প্রভুর (রব)। নিশ্চয়ই আমরা আল্লাহর জন্যেই আমরা তাঁর কাছেই ফিরে যাব।[১০] আল্লাহ্‌র অনুগত থাকা ও আনুগত্য প্রকাশ করা, আল্লাহকে স্মরণ করা এবং চিন্তায়-কর্মে ও আচরণে আল্লাহ্‌র কোরআন-উক্ত বিধি-নিষেধ মনে চলাতেই মানুষের তথা মুসলিমের দায়িত্ব ও কর্তব্য সীমিত। মানা-না-মানার জন্যে রয়েছে লোকান্তরে বিচারসিদ্ধ পুরস্কার ও শাস্তি। এ ছাড়া আল্লাহ্‌র সঙ্গে মানুষের অন্য কোন সম্পর্ক স্পষ্টত স্বীকৃত নয়। তবে সৃষ্টিকৌশল ও বৈচিত্র্য দেখে আল্লাহ্‌র শক্তি ও মহিমা উপলব্ধি করার এবং সে-সম্বন্ধে জ্ঞান-প্রজ্ঞা লাভ করার জন্যে কোরআনে নির্দেশ রয়েছে।[১১] এ ক্ষীণসূত্র ধরেই সুফিমতকে ইসলামী মরমীমত রূপে প্রতিষ্ঠা ও মর্যাদা দানের চেষ্টা হয়েছে গোড়া থেকেই। মূল আরব উপদ্বীপে তথা সৌদী আরবে, সংযুক্ত আরব আমিরাতে, ওমানে, ইয়ামানে সুফিমত কখনো চালু হয়নি বা হতে পারে নি। এমনকি গোড়ার দিককার ইসলামে শিয়া মতটিরও উন্মেষ ঘটে ইরাকে। ইরাকে-সিরিয়ায়-ইরানে-মিশরে পূর্ব থেকেই বৈদান্তিক অদ্বৈতবাদ, বৌদ্ধ নির্বাণবাদ ও গুরুবাদ, গ্রিক প্লেটোনিক দর্শন, খ্রিস্টীয় মরমীতত্ত্ব, জোরস্ট্রিয় ও মানীয় মজদকী যিনদকী ভাল-মন্দ শক্তির দ্বৈততত্ত্ব (Dualism) প্রভৃতির প্রভাব ও স্বীকৃতি ছিল। ওই সব অঞ্চলে ইসলামের দ্রুত বিস্তৃতি ঘটেছিল বটে, কিন্তু দীক্ষিত জনেরা তাদের পূর্বেকার দৃঢ়মূল বিশ্বাস-সংস্কার-আচারের প্রভাব এড়াতে পারেনি। তাই কোরআনিক ইসলামকে ছাপিয়ে পূর্বেকার অদ্বৈতসিদ্ধি, কায়াসাধন ও মোক্ষচেতনা হয়েছিল প্রবল এবং সে-পন্থার আকর্ষণে সাড়া দিয়েছে তারা। পীরপ্রোক্ত গুরুমুখী মত এবং গুরু-নির্ভর সাধনপন্থা বলেই সুফিমত বলতে কোন একক মত নির্দেশ করে না। বিভিন্ন তাত্ত্বিকের দার্শনিক চিন্তায় সুফিমত ও চর্যা বিচিত্র অবয়ব পেয়েছে। স্থবিরের ফারসি প্রতিশব্দ হচ্ছে পীর। থেরবাদ ও পীর বা গুরুবাদ অভিন্ন। এদেশে গুরুবাদটা জৈন-বৌদ্ধ অবদান। ইসলামের উদ্ভবের শতেক বছরের মধ্যেই আরব উপদ্বীপ বহির্ভূত এলাকায় সুফিমত অঙ্কুরিত ও পল্লবিত হতে থাকে। হাসান বসোরী (মৃঃ ৭২৮ খ্রিঃ অথবা কুফার আবু হাশিমই (মৃঃ ৭৭৮ খ্রিঃ) প্রথম সুফি বলে পরিচিত। আসলে এদের এবং ইব্রাহিম আদহম (মৃঃ ৭৭৮ খ্রিঃ), ফজিল আয়াজ (মৃঃ ৮০৩ খ্রিঃ), মারুফ করকী (মৃঃ ৮১৫ খ্রীঃ) দাউদ তায়ী (মৃঃ ৭৮১ খ্রিঃ) আর রাবিয়া বসোরী (মৃঃ ৭৬৩) প্রভৃতির সাধনা ও বাণী থেকেই বহির্ভারতে বিশিষ্ট হয়ে ওঠে সুফিমত। সূফীমত সংজ্ঞাবদ্ধ করেন মিশরীয় বা নুবীয় (Nubian) লেখক জুননুন (৮৫৯-৬০ খ্রিঃ) এবং জুননুনের রচনাবলী বিন্যস্ত করে সংকলিত ও সম্পাদনা করেন জুনাইদ বাগদাদী (মৃঃ ৯০৯ খ্রিঃ)। সর্বেশ্বরবাদী ছিলেন জুনাইদ ও তাঁর শিষ্য খোরাসানবাসী আস্‌শিবলী [মৃঃ ৯২১ খ্রিঃ], আনাল হক-আমিই আল্লাহ্‌, তুল : সোহ্‌হম), আবু এজিদ ওর্ফে বায়েজীদ বিস্তামী (মৃঃ ৮৭৩ খ্রিঃ), সিরিয়ার মহীউদ্দীন ইবনুল আরাবি (মৃঃ ১২৮০ খ্রিঃ)—'এদের প্রভাবে যেমন বাকাবিল্লাহর বা বাকাসিদ্ধির তথা অভেদে ব্রহ্মে মিশ্রণতত্ত্বের উদ্ভব, তেমনি বৌদ্ধ নির্বাণতত্ত্ব হয়েছে ফানাতত্ত্ব উন্মেষের সহায়ক। যদিও নির্বাণ (বিলয়, শূন্য) ও ফানা (অহং বিলুপ্তিতে ব্রহ্মে আত্মলীন করা)

অভিন্ন নয়। সুফিরা 'হুলুলে' বিশ্বাসী, অর্থাৎ জীবাত্মাকে তাঁরা পরমাত্মার অংশ বলেই জানেন—এ বিশ্বাস মূলত ঔপনিষদিক। তবু আত্মা-পরমাত্মা সম্বন্ধে এ ধারণায় নব-প্লেটোনিক মতেরই প্রভাব বেশি।[১২]

ক. অদ্বৈতবাদ, খ. সর্বেশ্বরবাদ (হম হউস্ত-সবই আল্লাহ তুল : সর্বং খল্বিদং ব্রহ্ম)। গ. দেহতত্ত্ব, ঘ. বৈরাগ্য, ঙ. ফানাতত্ত্ব চ. মানবপ্রীতি ও মানবসেবা, ছ. গুরু বা পীর নির্ভরতা, জ. পরব্রহ্ম ও মায়াবাদ, ঝ. ইনসানুল কামেল বা সিদ্ধপুরুষবাদ, ঞ. স্রষ্টার লীলাময়তা-সৃষ্টি আনন্দজাত-এমনি নানা ধারণা রয়েছে বিভিন্ন খান্দানের সুফিমতে। আবার বিভিন্ন সুফিমতে ক. আল্লাহ আত্মসচেতন ইচ্ছাশক্তি, খ. সৌন্দর্য-স্বরূপ, গ. ভাব, জ্ঞান বা জ্যোতিঃ স্বরূপ। উল্লেখ্য যে ভোজ বা বজ্র-বর্মণের 'অমৃতকুণ্ড' বারোশতকেই আরবীতে এবং কিছু পরে ইরানে ফারসিতে অনূদিত হয়ে বহির্ভারতের সুফিদের কোন কোন শাখার বা সম্প্রদায়ের দেহচর্যার বা কায়াসাধনের অবলম্বন হয়েছিল। বহির্ভারতেই সুফিরা চিল্লা (একটানা কয়েকদিন বা মাস ধরে অনবরত নিভৃত সাধনায় রত থাকা), যিকির (নামজপ), ইরানে জালাউদ্দীন রুমী প্রবর্তিত দারায় (আসরে) হালকায় (নৃত্যযোগে) সমা (গানে প্রশস্তি কীর্তন ভজন) করত, জীবাত্মা আশেক (প্রেমিক) পরমাত্মা মাশুক (প্রেমাস্পদ), ইরানে সাকী (গুরু) শরাব (আল্লাহ প্রেম) এবং মাশুক (আল্লাহ্) ভারতের রাধা-কৃষ্ণ, রাম-সীতা, কিংবা হর-গৌরীর মতো, গজল-রুবাই-দিওয়ানের বাহন হয়েছে। এঁরা কোরআন নির্দেশিত পন্থা তথা শরিয়ত অনুসরণে উৎসাহী নন।

এগারো-বারো শতকে ভারতে প্রবেশ ও প্রতিষ্ঠা লাভ করেছিলেন মুখ্যত চিশতিয়া, কাদিরিয়া, সোহরওয়ার্দিয়া ও নকশবন্দিয়া, আর জনপ্রিয়তা লাভ করেছিল বদিউদ্দীন শাহ মাদারের মাদারিয়া ও শাহ বু আলি কলন্দরের কলন্দরিয়া, সাত্তারিয়া মতের ফকিরেরা যোগ-কিরামতি দেখিয়ে। যেহেতু বাঙলায় তথা ভারতে নিম্নবর্ণের ও নিম্নবিত্তের বৌদ্ধজ হিন্দু ও প্রচ্ছন্ন বৌদ্ধ যোগতান্ত্রিক সম্প্রদায়ের লোকই ইসলামে দীক্ষিত হয়েছিল, সেহেতু যোগ-তন্ত্র দেহতত্ত্ব প্রভৃতির গুরুত্ব ও আকর্ষণ তাদের রয়েই গেল। তারপর সুফিদরবেশদের কাছে দীক্ষিত হওয়ায় সুদূরের আরবী ভাষায় অজ্ঞতা ঘুচানোর উপায় না থাকায় এবং শরিয়তপন্থী মৌলবীর অভাবে তারা আগ্রহ থাকা সত্ত্বেও পরিবেষ্টনীর প্রভাব এড়াতে কিংবা পরিহার করতে পারেনি ষোল শতকের আগে। তাই ষোল-শতেরো-আঠারো শতকেও শরিয়তপন্থী হয়েও কোন মুসলমান সুফিমতের প্রভাব এড়াতে পারেনি, লঘু-গুরুভাবে সুফির পীরবাদের, খানকার, দরগাহর, দরবেশের, যিকিরের, ফানার ও বাকাতত্ত্বের প্রভাব স্বীকারই করেছে নির্দ্বিধায়।[১৩] কাজেই গোটা ভারতবর্ষে ও বাঙলায় চালু ধর্মটি বিশুদ্ধ ইসলাম নয়— অন্য অনেক কিছুর মিশ্রণে মুসলমান ধর্ম।

চৈতন্যপূর্বকালে, চৈতন্যসমসময়ে এবং চৈতন্যোত্তর বাঙলার তথা ভারতের সুফি মতে ও চর্যায় যেসব দেশি [যোগতান্ত্রিক] উপাদান ও পদ্ধতি গৃহীত হয়েছে, সংক্ষেপে সেগুলো এই :

ক. বৌদ্ধ চতুষ্কায়ের আদলে চার তন [কায়া] লতিফু, কসিফু, বকাউ ও ফানিকল্পিত।

খ. বৌদ্ধ চারতত্ত্বের অনুসরণে চারদীল-আম্বরী [বুকের দক্ষিণাংশ], সনুবরী [বুকের বামাংশ], মুজাওয়ারী [মস্তকে] ও নিলুফারী [উদর ও উরুর সন্ধিস্থলে] চাররুহ্ হারিস, মারিস, মুকিম ও মুসাফির। এগুলো বৌদ্ধ আত্মতত্ত্ব, মন্ত্রতত্ত্ব, দেবতাতত্ত্ব ও জ্ঞানতত্ত্ব-এর অনুকৃতিজাত বলে মনে হয়।

গ. বৌদ্ধ চার ও হিন্দুর ষড়পদ্মও স্বীকৃত : মূলাধার, মনিপুর, অনাহত ও আজ্ঞা চক্র বহুল ব্যবহৃত।

ঘ. কুণ্ডলিনী ও পরশিব শক্তিকে সুফিরা জ্যোতি : বা লতিফা নামে অভিহিত করে।

ঙ. ষড়পদ্মের আদলে ষড়লতিফাও কল্পিত : কল্‌ব [হৃদয়], রুহ্‌ [আত্মা] সির্‌ [সুপ্ত হৃদয়], খাফি [গুপ্ত আত্মা], কস্‌ফ্‌ [বিবেকী আত্মা] নফ্‌স্‌ [দুষ্প্রবৃত্তি]— এগুলো নকশবন্দিয়া মতবাদী-পরিকল্পিত। অন্যরা উৎকর্ষের স্তরানুসারে রুহ্‌ চার প্রকার বলে মানে— [উদ্ভিদের, কীট-পতঙ্গের, পশুর ও মানুষের রুহ্‌] —রুহ্‌ নাতকি, সামি, জিসিমি, নাদি [সিনার্মা-মুহম্মদ মনসুর রচিত, দ্রষ্টব্য]।

চ. ইড়া [গঙ্গা], পিঙ্গলা [যমুনা], সুষুম্না [সরস্বতী] নাড়ী, প্রাণ-অপান বায়ুর [দমের রেচক-পূরক], শ্বাস-প্রশ্বাসের নিয়ন্ত্রণ এবং উল্টা সাধনা এদেরও চর্যার অঙ্গ। আসন, ন্যাস, প্রাণায়াম, জপও যিকিরের অঙ্গ হয়েছে কোন কোন খান্দানের।

ছ. চক্রের বৌদ্ধ দেবতা—লোচনা, মামকী, পাণ্ডুরা ও তারার মতো সুফিরা চারদ্বারের জন্যে চার ফেরেস্তাকে চার প্রহরী কল্পনা করেছেন : জিব্রাইল, মিকাইল, ইস্রাফিল ও আজরাইল। আর হিন্দু যোগতন্ত্রের চক্রদেবতা হচ্ছেন ব্রাহ্ম-ডাকিনী, মহাবিষ্ণু-রাকিনী, রুদ্র-লাকিনী, ঈশ-কাকিনী প্রভৃতি।

জ. প্রবর্তের, সাধকের সিদ্ধির অনুকরণেই সম্ভবত রাবিতা [গুরুসংযোগ] ও মুরাকিবাহ্‌ [গুরু ও আল্লাহ্‌র ধ্যান]— তথা ফানাফিস শেখ [গুরুতে লীন] ও ফানাফিল্লাহ্‌ [আল্লাহতে আত্মসমর্পণ] পরিকল্পিত।

ঝ. নিরাকার আল্লাহকে বৌদ্ধদের প্রভাবে নিরঞ্জন, নাথ ও শূন্য বলেও আখ্যাত করা হয়েছে :

দেখিতে না পারি যারে তারে বলি শূন্য
তাহারে চিনিলে দেখি পুরুষ হয় ধন্য।
শূন্যেত পরমহংস শূন্যে ব্রহ্মজ্ঞান
তথাতে পরমহংস তথা যোগ ধ্যান।

[জ্ঞানপ্রদীপ—সৈয়দ সুলতান]

ঞ. পরকীয়া বা বামাচারী সাধনাও কোন কোন সুফি পছন্দ করেছেন :
পরকীয়ার সঙ্গে যোগ্য প্রেমের মানস [জ্ঞানসাগর : আলিরজা]।

ট. আদিনাথের বা স্বয়ম্ভু স্রষ্টার ঘর্ম থেকেই যে সৃষ্টির পত্তন এবং সৃষ্টিটা যে আল্লাহর মুহম্মদ প্রেম-প্রসূন-তা সব বাঙালী সূফী মেনে নিয়েছেন এবং আল্লাহর নূরে রসুল , তাঁর নূরে জগৎসৃষ্টির কথাও সূফী প্রভাবিত মুসলিমরা বিশ্বাস করে।

ঠ. উত্তর ভারতে মুসলিম সূফী কবিরা আল্লাহ্‌র পরিভাষা হিসেবে তাঁদের রচিত গানে - দোহায় 'রার্ম, কৃষ্ণা, গোপী-প্রেমাস্পদ 'হরি' প্রয়োগ করেছেন। দরিয়া, শেখ এয়ারী, কাইম, মইজউদ্দীন, আফসোস প্রমুখ কবির পদ স্মর্তব্য। গৌড়ীয় বৈষ্ণব প্রভাবে বাঙলায় মুসলিম কবির পদ স্মর্তব্য। গৌড়ীয় বৈষ্ণব প্রভাবে বাঙলায় মুসলিম কবিরা জীবাত্মা-পরমাত্মার রূপক হিসেবে রাধা-কৃষ্ণকে গ্রহণ করেছিলেন, রাধা-কৃষ্ণ কখনো কখনো কায়া সাধক সূফীর বা বাউলের রচনায় দেহ ও আত্মার রূপক হিসেবেও ব্যবহৃত।

যেমন,

ক. তন রাধা মন কানু শাহ নুরে কয়।...
রাধার মন্দিরে কানু আছিলা পরবাসী [শাহনুর]

খ. কানু রাধা এক ঘরে সদায় করে বাস
চলিয়া যাইব নিঠুর রাধা, কানু হইবা নাশ [ওসমান]

লক্ষনীয় শাহনুরে তন রাধা, আর ওসমানে তন কানু।

সৈয়দ মর্তুজা বলেন :

আনন্দ মোহন মওলা খেলায় ধামালী
আপেল মন আপে তন আপে মন হরি।
আপে কানু আপে রাধা আপে সে মুরারি।

তুল : রাধাকৃষ্ণ এক আত্মা দুই দেহ ধরি
অন্যোন্যে বিলাসয় রসাস্বাদন করি। [চৈতন্য চরিতামৃত]

এখানেই শেষ নয়, প্রেমিকা অর্থে রাই, প্রেমিক অর্থে কালা বা কানু ব্যবহৃত হয়েছে লৌকিক প্রেমের গানে। আর উর্দু কবি হাফিজ জালন্ধরী থেকে কাজী নজরুল ইসলাম ও জসিমউদ্দীন পর্যন্ত অনেককেই এ 'রাধাকৃষ্ণ' কাব্য প্রেরণা দান করেছে।

জগৎ কি, জীবন কেন, স্রষ্টা কি, সৃষ্টি কেন, জীবনের সার্থকতা কি, পরিণাম কি? —এমনি জিজ্ঞাসার উত্তর সন্ধান দুনিয়ার সব মানুষের কাছেই স্বাভাবিক। সবাই ক্ষণেক্ষণে বা মাঝে মাঝে অনুভব করে 'চিত্তকাড়া কালার বাঁশি লাগিয়ে অন্তরে' কিংবা আজিও কাদিছে রাধা হৃদয় কুটিরে।' এ হচ্ছে বিচ্ছেদকাতর বিরহী খণ্ড জীবাত্মা অখণ্ড পরমাত্মায় লীন হয়ে অনশ্বর অস্তিত্ব সম্বন্ধে নিশ্চিত হওয়ার আকুতি আকুলতা পরমাত্মার জন্যে এ বিরহ বোধই ধ্বনিত-প্রতিধ্বনিত হয়েছে সুফি-বৈষ্ণব ও বাউলের গানে।

ইসলামের ও সূফীমতের কাছে গৌড়ীয় নব বৈষ্ণব মতের ঋণ

ইসলামের একেশ্বরনিষ্ঠা, মানুষ মাত্রেরই মানবিক ও সামাজিক মর্যাদা ও সাম্য, সমমতাবলম্বীর ভ্রাতৃত্ব প্রভৃতির প্রভাবে চৈতন্যদের বর্ণে বিন্যস্ত হিন্দু সমাজের বর্ণ, বৃত্তি ও বিত্তগত ভেদ-ব্যবধান অস্বীকার করেন 'চণ্ডালোহপি দ্বিজ শ্রেষ্ঠ হরিভক্তিপরায়ণঃ।' তাঁরই প্রবর্তনায় শিষ্য বৈষ্ণবরা স্ব স্ব কুলবাচি পরিহার করে আব্রাহ্মণ চণ্ডাল সবাই 'দাস' উপাধি যুক্ত করেন স্ব স্ব নামের সঙ্গে, তাঁর সমকালে সমাজক্ষেত্রে জাতিভেদ উঠে গেল [চৈতন্যদেব কর্তৃক যবন হরিদাসের উচ্ছিষ্ট ভক্ষণ স্মর্তব্য]। নারীর তালাকে, পুনর্বিবাহে, স্বয়ম্বরে অধিকার, বিভিন্ন দেবতায় ও উপদেবতায় বিশ্বাসের বিলুপ্তি প্রভৃতিও ইসলামের প্রত্যক্ষ প্রভাবেরই ফল।

সুফির আশেক মাশুক তত্ত্বের প্রভাবে ভারতীয় ভক্তিমার্গের চৈতন্য-উদ্ভাবিত প্রেম-মার্গে উত্তরণ—চৈতন্য মনীষার অসামান্য অবদান। ভক্ত-ভগবানে অধিকার-প্রশ্রয়ের সীমা আছে, আচরণে-ব্যবহারে থাকে সংকোচের শরমের সম্মানের বালাই। প্রেমই কেবল সর্বপ্রকার শাস্ত্রিক, সামাজিক, নৈতিক বাধা-ব্যবধান ঘুচিয়ে দেহে মনে, আত্মায়-অনুভবে যুগল কিংবা অভেদ-অভিন্ন করে দেয়। কাজেই চৈতন্য প্রবর্তিত রাগাত্মিকা ও রাগানুগাভক্তি— দুটোই সুফিমতের প্রভাবজ [রাবিয়ার রাগাত্মিকা সাধনা : প্রভু আমি তোমাকেই চাই, ইব্রাহিম আদহম ও মনসুর হাল্লাজের 'আনাল হক' —'আমিই আল্লাহ' স্মর্তব্য। তুল : চৈতন্যদেবের মুই সেই মুই সেই—সোহহম।] এ 'দ্বৈতাদ্বৈত' তত্ত্ব বাঙালী সুফির ও বৈষ্ণবের ভাষায় এরূপ :

হাজী মুহম্মদের ভাষায় : [সুরতনামা]

বীজ হোন্তে বৃক্ষ যেন বৃক্ষ হোন্তে ফল।
ফল বৃক্ষ বীজ এ তিন নাম হয়

একে হয় তিন জান তিনে এক হয়।
ফল আর বৃক্ষ যেন দুই এক কায়।
তথাপি ফলেরে বৃক্ষ কহন না যায়।
তেন মত জানিও— যে আল্লা আর বান্দা
তেমনি, আল্লা হোন্তে বান্দা সব হইয়াছে পয়দা।—
সিন্ধু ঢেউ সিন্ধু হোন্তে কেহ ভিন্ন নয়
আল্লা যেন— পুষ্পের মধ্যেত গন্ধ গন্ধত স্বরূপ
বেকত গোপত বেশ গোপত স্বরূপ।
কৃষ্ণদাস কবিরাজের ভাষায় [চৈতন্যচরিতামৃত]
মৃগমদ তার গন্ধ যৈছে অবিচ্ছেদ
অগ্নি জ্বালাতে যৈছে নাহি কভু ভেদ
রাধাকৃষ্ণ ঐছে সদা একই স্বরূপ
লীলারস আস্বাদিতে ধরে দুইরূপ।...
অনন্ত স্ফটিকে যৈছে এক সূর্য ভাসে
তৈছে জীবে গোবিন্দের অংশ প্রকাশে।

বৈষ্ণবদের নামজপে ভজনে কীর্তনে নর্তনে ঈশ্বরোপাসনা, জীবে দয়া, সৃষ্টি প্রেমেই স্রষ্টা প্রেমের প্রকাশ, বলি পরিহার, বিনয় [নিজেকে তৃণাদপি ক্ষুদ্র এবং অন্যের চাইতে নির্গুণ মনে করা অর্থাৎ অহঙ্কার পরিহার করা], নামে রুচি, সখীভাব, দশা, ঐশ্বর্য প্রদর্শন প্রভৃতি সুফিদের জিকর খিদমত [স্রষ্টা প্রেম লক্ষ্যে সৃষ্টির প্রীতি ও সেবা], সামা [গান], হাল [দশা], সদাসোহাগ [সখীভাব], কিরামতি (ঐশ্বর্য প্রদর্শন] এবং পূর্ব রাগ, অনুরাগ, বিরহ, মিলন প্রভৃতি ১. শরিয়ত [স্তর]- নাসুত [স্থিতি-মঞ্জিল] ২. তরিকত মলকুত, ৩. হকিকত-জবরুত ৪. মারুফত-লাহুত প্রভৃতি সাধন স্তরের সদৃশস্তর। এর পরে আছে হাহুত (অভেদে পরমাত্মায় একাত্ম হওয়া) এগুলো সাধারণভাবে সুফিতত্ত্বের, চর্যার ও সাধনার প্রভাব বা অনুসৃতিজাত বলে মনে করা হয়। ডক্টর মুহম্মদ এনামুল হক শ্রীকৃষ্ণকীর্তন থেকেই বাঙলা সাহিত্যে ও গৌড়ীয় বৈষ্ণবতত্ত্বে ও চর্যায় সুফি প্রভাবের গভীরতর ও ব্যাপক প্রভাব লক্ষ্য করেছেন[১৪]। তাছাড়া ডক্টর সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়[১৫] প্রমুখ অন্যান্য বিদ্বনেরাও গোড়ায় বৈষ্ণব মতবাদে সুফিমতের ও সাধন-প্রণালীর লঘুগুরু প্রভাব স্বীকার করেন।

পারস্পরিক এ প্রভাবে উভয়পক্ষই পেয়েছিল প্রাণের রস, হয়েছিল সমাজের জীবনাচারের ক্ষেত্রে উপকৃত। সংস্কৃতিও পেয়েছিল সমকালীন-তার রূপ। শাসক-শাসিতের বিপরীতধর্মী মন, মত ও সংস্কৃতিজাত মানস-দ্বন্দ্ব অবসানের উপায় মিলেছিল এ ভাবেই। এমনিভাবেই আস্তিক মানুষের শাস্ত্র ,সমাজ ও সংস্কৃতি বেঁচে বর্তে থাকে। দ্বন্দ্বে-মিলনেই আস্তিক মানুষ সমস্বার্থে সহিষ্ণুতায় সহাবস্থানে থাকে সম্মত, হয় অভ্যস্ত।

তথ্যপঞ্জী :

১. সতীশচন্দ্র বিদ্যাভূষণ বলেন :

"পৌরাণিকগণ বুদ্ধকে ভগবান বিষ্ণুর অবতার মধ্যে পরিগণিত করেন। শঙ্করাচার্য বুদ্ধের মায়াবাদকে অদ্বৈতবাদ নাম দিয়া সর্বত্র প্রচারিত করেন। বুদ্ধের প্রবর্তিত ভিক্ষু ও ভিক্ষুণী সম্প্রদায়ের অনুকরণে রামানুজ, মাধবাচার্য, বল্লভাচার্য, শ্রীচৈতন্য প্রভৃতি বৈষ্ণব বৈরাগী ও

বৈরাগিনী সম্প্রদায়ের সৃষ্টি করেন। যখন বুদ্ধদেব বিষ্ণু হইলেন, শূন্যবাদ ব্রহ্মবাদে পরিণত হইল এবং ভিক্ষু ভিক্ষুণীগণ স্বীয় উপাধি ত্যাগ করিলেন, তখন বৌদ্ধ ধর্মের কিছুই অবশিষ্ট থাকিল না ক্রমে বৌদ্ধগণ বৈষ্ণব ও শৈব হইলেন।

"ব্রাহ্মণগণ তান্ত্রিক সম্প্রদায়ের সহায়তা করিয়া বৌদ্ধধর্মের স্বাতন্ত্র্য নষ্ট করিবার উপায় আরো সহজ করিলেন। বৌদ্ধগণ তান্ত্রিক ধর্মের আশ্রয় গ্রহণ করিয়া ব্রাহ্মণ্য ধর্মে পুনরাগমন করিতে লাগিলেন। সমগ্র বৌদ্ধ ধর্ম কালক্রমে তান্ত্রিক ধর্মে পরিণত হইল এবং তান্ত্রিক বৌদ্ধগণ পরিশেষে হিন্দু হইলেন। ব্রাহ্মণ্যধর্ম ও বৌদ্ধধর্ম এতদুভয়ের সমবায়ে বর্তমান হিন্দুধর্মের সৃষ্টি হইয়াছে। যিনি তন্ত্রশাস্ত্রের সৃষ্টি করিয়াছিলেন, তিনিই প্রথমত বৌদ্ধধর্মের মূলোচ্ছেদ করেন।" [ভারতীয় বৌদ্ধ-সম্প্রদায়ের ধ্বংস [প্রবন্ধ] সতীশ চন্দ্র বিদ্যাভূষণ-বাঙালীর ধর্ম ও দশর্ন -অসিত কুমার বন্দ্যোপাধ্যায় সম্পাদিত ১ম সং পৃঃ ৫৮-৫৯ ।]

২. বিনয় ঘোষ বলেন "দক্ষিণ ভারত ইসলামের আহ্বানে সাড়া দিয়েছিল।... তাই বোধ হয় অষ্টম শতাব্দীর পর থেকেই ভারতের সংস্কৃতির ইতিহাসে এক যুগান্তকারী পরিবর্তনের সূচনা হয়।... অষ্টম শতাব্দীর পর থেকেই ধর্ম সমন্বয় ও সংস্কৃতি সমন্বয়ের প্রবর্তক হল দাক্ষিণাত্য। শঙ্করাচার্য দক্ষিণ ভারতের রামানুজ, বল্লভাচার্য, নিম্বাদিত্য সকলেই দক্ষিণ ভারতের একেশ্বরবাদ, ভক্তিবাদ, বৈষ্ণবধর্ম ও শৈব-ধর্মের জন্ম হল দ্রাবিড়দেশে, নবীন ইসলাম ধর্মের সঙ্গে নব্য হিন্দু ধর্মের ঘাতপ্রতিঘাতের ফলেই দক্ষিণ ভারতে এই নতুন ধর্ম সমন্বয় ও সংস্কৃতি সমন্বয়ের ধারা প্রবাহিত হয়েছে। ...দক্ষিণ ভারতের দু-একজন রাজা পর্যন্ত যে ইসলামের ধর্মে দীক্ষা নিয়েছিলেন তা থেকেই বোঝা যায় , ইসলাম তখন হিন্দু সমাজের ওপর বেশ প্রভাব বিস্তার করেছে।... ইসলামের এক দেবতা ও এক ধর্মের বিপুল বন্যার মুখে দাঁড়িয়ে শঙ্কর আপসহীন অদ্বৈতবাদ প্রচার করেছেন।... শঙ্করের আপসহীন অদ্বৈতবাদ মনে হয় যেন নবীন আরবি ইসলামের একেশ্বরবাদের ভারতীয় রূপ। বেদ উপনিষদ তার উৎস হলেও ইসলামের প্রভাবেই যে সেই উৎস সন্ধানের প্রেরণা এসেছে এবং সেই অদ্বৈতবাদের পুনরুজ্জীবন সম্ভবপর হয়েছে তা স্বীকার না করে উপায় নেই। শঙ্করাচার্যের পরে রামানুজ, বিষ্ণুস্বামী, মাধবাচার্য ও নিম্বার্কের দর্শনের সঙ্গে ইসলামের সম্পর্ক আরো ঘনিষ্ঠ হয়েছে, দেখা যায়।" [বাঙলার নবজাগৃতি, বিনয় ঘোষ ১ম সং পৃঃ ১২১-১২৪ ।]

৩. তারাচাঁদ বলেন,"The establishment of this monotheis-tical tendency [of Sankara] received a powerful impetus from the appearance of so uncompromisingly monotheistic religion as Islam... His [Sankara] successors Ramanuja. vis-nuswami, Madhava and Nimbarka and the hymn-makers, in their speculations and religious tone, show closer parallalism [with Islam]. In the give and take of culture between Muslims and Indians, it is diffcult to assess accurately the share of each,..... But the fact remains that a number of elements were absorbed into Hinduism through its direct contact with Islam and these elements were presented ot India impressed with the Islamic mould. [pp111-12]

"Ramanujas. Prapatti and Guru.Bhakti-It is more likely however that they come from Islam.. Historically also there is no insuperable diffculty in supposing that Ramanuja adopted it [Prapanna/ prapatti] from Islam. [p. 114]

``It is diffcult to resist the influence that Lingayath-ism was a result of the influence which these Muslims exerted in these parts [Deccan] of India The abandon-ment of such deeprooted Hindu idea as that of metem-psychosis and of such Customs as cremation snd purifica-tory death cremonial. the abolition of inequalitie of cas-tand sex and the reform of marriage, the conceptious of the community of brave warriors led by their sanctifed preceptor and of God [Allama]whose very name is probably of Muslim origin point unmistakably to the source of inpiration that is Islam[pp.110-20]-Influence of Islam on Indian culture, -Dr Tarachand, edition 1,pp.111-12,114,119-20.

৪, উমেশচন্দ্র ভট্টাচার্য বলেন একেশ্বরবাদ ভারতেও ছিল বাহির হইতেও আসিয়াছিল , উভয়ে মিলিয়া দশম একাদশ শতাব্দীতে একটা পরিপুষ্ট আকারে দেখা দেয়। ঋণ স্বীকার করা ভাল। [পৃঃ৬৪-৬৭] যেমন করিয়াই হোক শঙ্করের দুইতিন শতবৎসর পরে বেদান্ত দর্শনের সাহিত্যে এই একেশ্বরবাদের প্রভাব স্পষ্ট পরিলক্ষিত হয়। [পৃ: ২৬৭] তাহাদের [মুসলমানদের] একেশ্বরবাদের সংস্পর্শে আসিয়া ভারতের একেশ্বরবাদ বিশেষত বৈষ্ণব একেশ্বরবাদ উদ্বুদ্ধ হইয়া উঠে নাই এমন কথা বলিতেও আমাদের সংকোচ বোধ হইতেছে। [পৃঃ ২৯২] ভারত দর্শনসার -উমেশচন্দ্র ভট্টাচার্য ,১ম সং, পৃঃ ৬৪-৬৭,২৬৭,২৯২।

৫. In the sphere of religion too , there has been a very strong influence of Islam. The muslim insistence upon a Saguna Brahma without any form [Nirakara] , forms the fundamiental muslim conception of the divinities and this kind of conception we find in all the saint-margi saints and poets including Kabir and Nanak- সুরজিৎ দাশগুপ্তকে লিখিত পত্র, সুনীতিকুমার স্মারক সংখ্যা , পরিচয় আগস্ট - সেপ্টেম্বর ১৯৭৭ সন পৃঃ ৫৭-৫৮।

৬. সমাজ ,সংস্কৃতি ও ইতিহাস—ডক্টর আবু মহামেদ হবিবুল্লাহ্ ১ম সং, পৃঃ ১৪৮-৪৯।

৭. চৈতন্যচরিতকার জয়ানন্দ বলেন, সর্পদংশনে লক্ষ্মীপ্রিয়ার মৃত্যু হয়, কিন্তু নদীয়ার অবৈষ্ণব সমাজে চালু কিংবদন্তী অনুসারে শাশুড়ি সচীদেবীর নির্যাতন অসহ্য হওয়ায় তিনি আত্মহত্যা করেন। উল্লেখ্য যে সচীদেবী এ বিয়েতে আদৌ রাজি ছিলেন না। হয়তো 'শাশুড়ি সাপিনী ননদী বাঘিনী—এ আপ্ত বাক্যের রূপকার্থে সর্পদংশন বলেছেন জয়ানন্দ।

৮. কোন কোন চরিতকারের এ মত। The Early History of vaisnava faith and Movement -Dr. S. K Chatterjee.

৯. (ক) প্রেম একবার পৃথিবীতে মূর্তিধারণ করিয়া আসিয়াছিল–দীনেশচন্দ্র সেন।

(খ) বাঙালীর হিয়া অমিয়া মথিয়া নিমাই ধরিল কায়া।—সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত।

১০. ইন্না লিল্লাহে অইন্নি ইলাহিরাজিউন ।

১১. ক. সুরাহ্: ৩৩, আয়াত ৪১; খ. সুরাহ্: ২, আয়াত ১৪৬, গ. সুরাহ্ : ৫১, আয়াত: ২০-২১, ঘ. সুরাহ্: ৮৮, আয়াত১০।

১২. Arabic thought in History ;Oleary. pp 180-95,20.

১৩. সূফীমতের উদ্ভব, বিকাশ ,বিস্তার, বিবর্তন ও বাঙালায় স্থানীয় রূপ সম্বন্ধে বিস্তৃত আলোচনা রয়েছে: ক. সৈয়দ সুলতান: তাঁর গ্রন্থাবলী ও 'তার যুগ—আহমদ শরীফ, পৃ: ১৩৬-৮০।

খ. বাঙলার সূফী সাহিত্য : ভূমিকা , আহমদ শরীফ পৃ: ১-৫৮।

গ. মুসলিম কবির পদসাহিত্য: ভূমিকা ঐ পৃ: ১-৪০।

১৪. ইসলামের অদ্বৈত তত্ত্বের প্রভাবেই ভারতের বৈদান্তিক অদ্বৈত-বাদে বিচলন ঘটে। ফলে দ্বৈতবাদ, দ্বৈতাদ্বৈতবাদ, বিশিষ্ট ও অচিন্ত্য দ্বৈতাদ্বৈততত্ত্ব প্রভৃতির উদ্ভব। এ প্রসঙ্গে ডক্টর মুহম্মদ এনামুল হকের মত ও মন্তব্য সবার পক্ষে সর্বাংশে গ্রহণযোগ্য না হলেও এর নতুনত্বের জন্যে আর সুফিমতের ও চর্যার সাদৃশ্য জ্ঞাপক আলোচনা বলে এখানে উল্লেখ্য : রাধাকৃষ্ণ প্রেমলীলাই শ্রীকৃষ্ণকীর্তন কাব্যের একমাত্র উপজীব্য। পদাবলীর উপজীব্যও রাধাকৃষ্ণের প্রেমলীলা। এই লীলার বর্ণনা কৃষ্ণকীর্তনে কাহিনী ভিত্তিক হইলেও পদাবলীর ন্যায় শ্রীকৃষ্ণকীর্তন পদসর্বস্ব। এই কাব্যে উল্লেখযোগ্য পাত্র -পাত্রীর সংখ্যামাত্র তিনটি; তাঁহারা হইতেছেন রাধা, কৃষ্ণ ও বড়াই। প্রেমাস্পদের ভূমিকায় কৃষ্ণ, প্রেমিকার ভূমিকায় রাধা, এবং উভয়ের মধ্যে প্রেম ঘটাইয়া দেওয়ার সহায়করূপে বড়াই পরিকল্পিত। প্রকৃতপক্ষে, ইহা হৃদয়ধর্মী গীতিকাব্য; প্রেমই ইহার প্রধান উপজীব্য।... এই কথা কয়টি মনে রাখিয়া চিন্তা করিলে দেখিতে পাই, সুফিদের গজলের মতই কৃষ্ণকীর্তন খণ্ড খণ্ড পদের সমষ্টি এবং তাঁদের ইশ্কতত্ত্বই যেন প্রেমরূপে ইহার মূল প্রেরণা যোগাইয়াছে। ইহার কৃষ্ণ যেমন সুফিদের আশিকরূপে দেখা দিয়াছে রাধিকাও তেমন মাশুক রূপে আবির্ভূতা হইয়াছে। আবার বড়াইও তেমন সূফীতত্ত্বের রাবিতা বা প্রেমিক-প্রেমাস্পদের মধ্যে মিলন ঘটাইবার যোগসূত্র পীর-ই-মসাঁ বা সিদ্ধি লব্ধ গুরুরূপে চিত্রিত হইয়াছে। কৃষ্ণকীর্তনের শেষ দুই খণ্ড অর্থাৎ বংশী ও বিরহ খণ্ড সুফিদের দিল -আজারী ও জুদায়ী -পরিকল্পনার একটি সুস্পষ্ট ছবি মানস মুকুরে ভাসিয়া উঠে। সুফিকবিদের ইয়ুসফ-জুলেখা, লাইলি-মজনু ও পদ্মাবতীর ন্যায় শ্রীকৃষ্ণকীর্তনও একটি রূপক কাব্য। ..মুসলিম সুফিতত্ত্ব প্রভাবিত প্রাণধর্মী গজলিয়াৎ জাতীয় গীতিধারা বৈষ্ণবদের পদাবলী সাহিত্যে স্ফূর্ত ও মূর্ত হইয়া উঠিয়াছিল।

সূফীদের গজলিয়াৎ এবং বৈষ্ণবদের পদাবলী শুধু সমার্থক নহে, আধ্যাত্মিকতা, ভাবৈশ্বর্য ও আঙ্গিকের দিক হইতে অনেকখানি এক। সূফী সাহিত্যের ইশক যেমন 'মৈয় ও শরাবের প্রতীক গ্রহণ করিয়া সাকীর মারফতে সরাইখানার কক্ষে কক্ষে পরিবেশিত হইয়াছে, বৈষ্ণব পদাবলীর প্রেমও তেমন পিরীতির বেশে মান অভিমানের রূপ ধরিয়া গোপিনীদের মধ্যস্থতায় বৃন্দাবনের কুঞ্জে কুঞ্জে ছড়াইয়া পড়িয়াছে। সূফী সাহিত্যের আশিক ও মাশুক , বুৎ ও বুৎগর অথবা শমা ও পারওয়ানা বৈষ্ণব পদাবলীতে রাধা, ও কৃষ্ণের প্রতীক লইয়া আত্মপ্রকাশ করিয়াছে। এই রাধা জীবাত্মার এবং কৃষ্ণ পরমাত্মার প্রতীক, কৃষ্ণের বাঁশরী জীবাত্মার প্রতি পরমাত্মার ডাক, এই দুইয়ের মিলনের অন্তরায় স্বরূপ ঐহিক জীবনের 'সংসার ধর্ম' মধ্যখানে "যমুনানদী' রূপে বিরাট ব্যবধান সৃষ্টি করিয়াছে। জীবনের পরপার হইতে কৃষ্ণরূপী পরমাত্মার বংশীধ্বনি ভাসিয়া আসিয়া রাধারূপী জীবাত্মার জীবনের ঘাটে পৌঁছিয়াছে, আর মানবাত্মাকে পরমাত্মার সহিত মিলনের জন্য উতলা করিয়া তুলিয়াছে। এই যে রাধা, এই যে কৃষ্ণ, এই যে যমুনা, এই যে বাঁশী— ইহাদের সহিত পৌরাণিক রাধাকৃষ্ণের সম্বন্ধ কোথায়?... সূফী কবিদের হাতে মানুষ 'পরওয়ানা' বা আশিক সাজিয়াছে, আর সে বৈষ্ণব কবিদের হাতে রাধিকা বা প্রেমিকা বনিয়াছে। সূফী কবিদের 'সুজ ও সাজ বা প্রেমের আকৃতি, হিজরান নামে আত্মপ্রকাশ করিয়া যেমন পাঠকের নয়ন-কোণে আঁসুর আবির্ভাব ঘটাইয়াছে, বৈষ্ণব কবিদের বিরহবেদনা বা পিরীতি-আরতি মাথুর আখ্যায় চিহ্নিত হইয়া তেমনই সকল বাঙালীকে কাঁদাইয়াছে।... কালিন্দীনদীর অপর পাড়ে অবস্থিত কৃষ্ণের বাঁশরী লীলা দেখাইবার জন্য বংশীধ্বনি অবলম্বনে বৈষ্ণব কবির যেই বিরাট পাবলী সাহিত্য রচিত হইয়াছে তাহার মমার্থ ও প্রতীক মৌলানা জালালুদদীন রুমীর (১২০৭-৭৩ খ্রীঃ) সুবিখ্যাত 'বাঁশরীবেদন' কবিতার মমার্থ

ও প্রতীক অবিকল এক, দেশভেদে কেবল ভাষাভেদ ও রূপভেদ ঘটাইয়াছে— এই টুকুই পার্থক্য। সূফীদের শিষ্য-প্রশিষ্যরা, যেমন পারশ্য 'তাজকিরা-ই আউলিয়া' এবং ভারতবর্ষে সুওয়ানহ-ই উমরী বা সাধক জীবনের কাহিনী লিখিয়াছেন, বাংলার বৈষ্ণবরাও তেমনি চৈতন্য প্রমুখ বৈষ্ণব সাধকদের জীবন-কাহিনী লিখিয়া 'মহাজন চরিত' নাম দিয়াছেন।... এই জীবনীগুলিতে ব্যবহৃত 'মহাজন ও আউলিয়া' শব্দ দুইটি শুধু সমার্থবোধক নহে, একটি যেন আর একটির অনুবাদ।" (মনীষা মঞ্জুষা : বাংলা সাহিত্যে মুসলিম প্রভাব ১ম সং পৃ: ৪৮–৫৪)।

"অতএব, নামে রুচি, জীবে দয়া—ইহাই গৌড়ীয় বৈষ্ণবমতের মূল মন্ত্র। গৌড়ীয় বৈষ্ণবদের এই 'নামে রুচি' ও 'জীবে দয়া' মুসলিম সুফি সাধকদের 'জিকর' ও খিদমৎ নীতির নামান্তর। ইহাতে ইস্‌লামের সাম্য, উদারতা ও ভ্রাতৃত্বের ছাপও সুস্পষ্টই। সূফীদের সমা ও বৈষ্ণবদের কীর্তনে কোন তফাৎ নাই। এই কীর্তনের শেষে বৈষ্ণবদের যে দশা হয়, তাহাতে যে শারীরিক ও মানসিক অবস্থা ফুটিয়া উঠে, সুফিদের 'হালের' অবস্থাও তাহাই। কীর্তন ও সমা এবং দশা ও হাল শব্দার্থ, ভাব, সম্পাদন ব্যবস্থা ও মানসিক অনুভূতির দিক হইতে একই বস্তুর অভিব্যক্তি। গৌড়ীয় বৈষ্ণবদের প্রেম, সুফীদের ইশক, রাধা-কৃষ্ণ সুফিদের সাকী ও বুৎ কিংবা 'শমআ' ও 'পরওয়ানা' ঐশ্বর্য সুফীদের কিরামৎ ছাড়া আর কিছুই নহে।"(মুসলিম বাঙলা সাহিত্য , ১ম সং ১৯৫৫ সন,পৃ: ৫০-৫১)

১৫. ক. The reform movement of Ramananda, Chaitanya, Kabir, Nanak show the stimulas of Islam. —The Hindu View of life, Sir Sarbapalli Radha Krishnan, p.18.

খ. Certain ideologies and practices from the Sufi form of Islam also have become accepted in to the medieval Vaisnav schools of India ,including our Goudiya Vaisnavism.

;Through Sufisim the character of Indian Civilisation—Hindu civilisation was very deeply modified, particularly in North India. In my article published long ago,`Islamic mysticism, Iran and India; I mentioned that even in our Gaudiya Vaisnavism certain Sufl influence actually strengthened it;

Dr. Suniti Kumar Chatterjee. সুরঞ্জিৎ দাস গুপ্তকে লিখিত পত্রে ,সুনীতিকুমার স্মারক সংখ্যা আগস্ট -সেপ্টেম্বর ১৯৭৭। পৃ: ৫৭-৫৮-৬৪।

চৈতন্যদেবের ভাববিপ্লব : তার তাৎপর্য ও পরিণাম

সব ক্রিয়ারই কারণ থাকে এবং একক কারণে কিছু ঘটে না; আপাত-আকস্মিক ঘটনার পেছনেও থাকে একাধিক দৃশ্য অদৃশ্য প্রত্যক্ষ পরোক্ষ কারণপরম্পরা। ষোলো শতকে চৈতন্যদেবের আবির্ভাবও কোনো আকস্মিক এবং স্থানিক কারণে ঘটেনি। গোটা ভারতের পটে রয়েছে এর রাজনীতিক, শাস্ত্রিক, সামাজিক এবং সাংস্কৃতিক কারণসমূহ।

আজকের যন্ত্রনিয়ন্ত্রিত যুগে পৃথিবীটা মানুষের চোখের আর মনের আয়ত্তে এসে গেছে। পৃথিবীর যে কোন প্রান্তের ভাব আর চিন্তা, কথা আর ঘটনা, কর্ম আর আচরণ জিজ্ঞাসুর অজানা থাকে না। ফলে এখনকার কৌতূহলী মানুষের জীবনচেতনা ও জগৎভাবনা আর গৃহগত কিংবা স্থানিক সীমায় আবদ্ধ নয়। মানুষ এখন চিন্তাচেতনায় যুগপৎ একাধারে স্থানের, কালের আর বিশ্বের বাসিন্দা। কিন্তু সেকালে মানুষের পরস্পরের কায়িক, মানসিক এবং বৈশ্বিক যোগাযোগে ছিল দুর্লঙ্ঘ্য বাধা। বাণিজ্যিক লেনদেনেও হত না কোনো ঘনিষ্ঠ মানসিক সামাজিক , শাস্ত্রিক-সাংস্কৃতিক পরিচয়। এর জন্যে প্রয়োজন ছিল বিজয়ী-বিজেতার সম্পর্ক। তখন চিন্তায়-চেতনায়, শাস্ত্রে-সমাজে , আচারে-সংস্কৃতিতে পরিচয় এবং প্রভাব হত পারস্পরিক । মানুষের মনে-মননে, শাস্ত্রে সমাজে, কর্মেআচরণে যুগান্তর ঘটত বিজেতা-বিজিতের শাসকশাসিতের দ্বন্দ্বমিলনজাত সহাবস্থানের ফলে।

৭১১ সনে একেশ্বরবাদ কাসিমপুত্র মুহম্মদের সিন্ধু -বিজয়ের ফলে জীবনচেতনায়, জগৎভাবনায় দুই বিপরীত জীবনাচারের মানুষের পরিচয় মুহূর্ত থেকে মনে মননে যে দ্বান্দ্বিক ভাবতরঙ্গ এদেশীয় মানুষের চিত্তলোকে অভিঘাত সৃষ্টি করল, তাতে মালাবার উপকূলের শঙ্করের মনে জ্ঞান-মায়া -অদ্বৈত তত্ত্বের এবং ক্রমে রামানুজ, নিম্বার্ক, মধ্ব, ভাস্কর প্রভৃতির চিত্তলোকে নতুন ভক্তিবাদ এবং ঈশ্বরতত্ত্বের উন্মেষ ঘটে। এই নতুন চিন্তাচেতনাই ঘটায় প্রাচীন যুগের অবসান, এবং সূচিত করে নতুন যুগ যার নাম আমাদের একালের পরিভাষায় 'মধ্যযুগ' । জন্ম-জীবন-মৃত্যু সম্বন্ধে উল্লিখিত সব সন্ত-সন্ন্যাসীর নতুন উপলব্ধ তত্ত্ব প্রচারের ফলে দাক্ষিণাত্যের মানুষের শাস্ত্রবোধে ,সমাজচেতনায় তথা জীবনাচারে এল প্রায় আমূল পরিবর্তন। এল জ্ঞানবাদ এল ভক্তিবাদ, বৈরাগ্য এবং শুরু হল স্বর্গ নয় মোক্ষ লক্ষ্যে অদ্বৈতসিদ্ধির সাধনা।

উত্তরভারতেও সবুক্তগীন-মাহমুদ -মুহম্মদ ঘোরী-কুতুবউদ্দীন আইবকের অভিযান এবং বিজয়-সূত্রে একেশ্বর ও সামাজিক সাম্যবাদী আফগান তুর্কির সঙ্গে পরিচয়মুহূর্ত থেকেই দেব-দ্বিজ-বেদের ভয়-ভরসা ও শাসন শোষণনিয়ন্ত্রিত বর্ণে-বিন্যস্ত সমাজে স্পৃশ্য-অস্পৃশ্য নিঃস্ব নিম্নবর্ণের তথা নিম্নবৃত্তির মানুষের মনে ডানা মেলল আত্মবিকাশের এবং আত্মপ্রতিষ্ঠার আকাঙ্ক্ষার পাখি । সাদা চোখেই দেখল, আজ যে বাজার থেকে ক্রীতদাস, কাল সে জামাতা এবং পরশু স্বপ্রতিষ্ঠ স্বাধীন সদাগর কিংবা সেনানী অথবা পদস্থ চাকুরে। দিল্লির দুর্গেদরবারেই হরহামেশা দেখছে দাস হচ্ছে বাদশা। বুঝল জন্মসূত্রে বাঁধা নয় জীবন ,জীবনে আত্মবিকাশের সম্ভাবনা অশেষ । তাই ব্রাহ্মণ্য শাস্ত্রসমাজ -মুক্তির জন্য, স্বাধীনভাবে জীবিকা নির্বাচনের অধিকার প্রাপ্তির জন্যে এবং সমাজে আত্মমর্যাদা নিয়ে যথা–যোগ্য স্বাধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য দেবদ্বিজদ্রোহী হল তারা । নেতৃত্ব দিলেন 'সন্ত নামের বৈরাগ্যপ্রবণ অদ্বৈতবাদী সাধক -সন্ন্যাসীরা ,স্রস্টার নামে আহ্বান জানালেন শাস্ত্রসমাজবর্জিত উদার আকাশের নিচে মুক্তাঙ্গনে। পুঁজি আর পাথেয় হল ভগবানে ভক্তি। এর নাম সন্তধর্ম । প্রবর্তক রামানন্দ, কবির, নানক ,দাদু একলব্য, রামদাস প্রভৃতি অনেকেই। ভারতের ব্রহ্মা-সৃষ্ট এ বর্ণে-বিন্যস্ত সমাজ ছিল স্বরূপত দাস -প্রভু সমাজেরই নিরুপদ্রব বিকল্প -ব্যবস্থা। এভাবে তুর্কি প্রভাবে নতুন চিন্তাচেতনার উন্মেষে নবযুগ তথা মধ্যযুগ বাসন্তী হাওয়া নিয়ে এল উত্তরভারতের দলিত-শোষিত-অস্পৃশ্য সমাজে। যদিও হাতিয়ারের পরিবর্তন বা উৎকর্ষ না হওয়ায় জীবিকার ক্ষেত্রে আর্থিক উন্নতি লক্ষণীয় হল না এবং পালক-পোষক স্রষ্টার অনুগত থেকেই ইসলামী একেশ্বরবাদের এবং সাম্যের সুফল ভোগ করতে থাকে। কাজেই ইসলামের আলাদা আবেদন থাকল না দক্ষিণ এবং উত্তর -ভারতে। ১২০১/০৪ সনে বাঙলা জয় করলেন তুর্কি সেনানী

বখতিয়ার খলজী। এখানেও ঘটল বিজিত শাসিত জনের মনে বিচলন। পার্থক্য ছিল— দক্ষিণভারতের দ্রোহী নেতারা ব্রাহ্মণ, উত্তরভারতে নেতৃত্ব দিলেন নিম্নবর্ণের সন্তরা। বাঙলাদেশ উত্তরভারতীয়দের কাছে অবজ্ঞেয় স্বল্পোন্নত প্রান্তিক অঞ্চল হওয়ায় এবং বিলুপ্ত বৌদ্ধজ ব্রাহ্মণ্যবাদী দিয়ে ব্রাহ্মণ্যসমাজ কৃত্রিমভাবে নববিন্যাস প্রাপ্ত হওয়ায় এখানে বিচলনটা উচ্চবর্ণের মানুষকে বিশেষভাবে উদ্বিগ্ন করে তোলে। তাই শাস্ত্র-সমাজকে তুর্কীপ্রভাব থেকে রক্ষা করার দায়িত্ব বর্তায় শাস্ত্র এবং সমাজপতি ব্রাহ্মণদের ওপর। তখন থেকেই তাই কেবল 'ব্রাহ্মণে - যবনে বাদ' শুরু হয়। এবং যুগ যুগ ধরে চলে। এ হচ্ছে দুই ধর্ম -সংস্কৃতির মোল্লা-পুরুতের শাস্ত্রিক আদর্শিক দ্বন্দ্ব-হিন্দু- মুসলিমের বা শাসক -শাসিতের নয়। কিন্তু শ্রুতি-স্মৃতি-পুরাণের বিধিনিষেধ প্রয়োজনমতো শিথিল, বর্জন কিংবা সীমিত করা সত্ত্বে সমাজের ভাঙন রোধ করা যাচ্ছিল না। নিম্নবর্ণের তথা নিম্নবৃত্তির মানুষ শাসকগোষ্ঠীর দরবেশদের (এ সূত্রে খ্রিস্টান মিশনারি প্রয়াস স্মর্তব্য) প্রচারে, চরিত্রবিভায়, উদারতায়, সৌজন্যে , আত্মিকশক্তির প্রভাবে ও সেবায় মুগ্ধ হয়ে আত্মমর্যাদা নিয়ে স্বাধীনভাবে জীবন-জীবিকার ক্ষেত্রে আত্মশক্তির বিকাশসম্ভাবনার আশায় আশ্বাসে ক্রমবর্ধমান সংখ্যায় ইসলাম বরণ করতে থাকে চৌদ্দ পনেরো শতক থেকে গাঁয়ে গঞ্জে নগরে। বাঙলাদেশেও তাই দক্ষিণ আর উত্তর ভারতের আদলে ব্রাহ্মণ্য সমাজের ভাঙন রোধ এগিয়ে এলেন নবীন সন্ন্যাসী চৈতন্যদেব [১৪৮৬-১৫৩৩] তাঁর প্রেমবাদ নিয়ে। চৈতন্যচরিকতারেরা তাঁরে শৈশব-বাল্য-কৈশোর জীবনে অবতারসুলভ গুণ এবং আচরণ আরোপ করলেও সেগুলোর ঐতিহাসিক গুরুত্ব শূন্যই। তবে পাঁচশ বছর আগেকার সমাজের এই সপ্রতিভ কিশোর গাঁয়ের এক সুন্দরীকে ভালবেসেছেন, নিঃসংকোচে নির্ভয়ে সে মেয়ে বিয়ে করার গোঁ ধরেছেন অভিভাবককে সে আবদার রক্ষাও করতে হয়েছে। এই সুন্দরী পত্নী ছিল জীবনপ্রেরণা। লক্ষ্মীপ্রিয়াকে অবলম্বন করেই লতিয়ে উঠেছিল তাঁর জীবন স্বপ্ন। পত্নীর মৃত্যুতে তাঁর জগৎ-জীবন যেন বৃথা হয়ে গেল। এমনি অবস্থায় কেউ করে আত্মহত্যা, কেউ হয় উম্মাদ এবং জীবনযন্ত্রণাতাড়িত অন্য অনেকে হয় সংসারধর্মে বীতরাগ বিরাগী। তখন বাঙলাদেশে গিরি, পুরী, ভারতী, আনন্দ প্রভৃতি সম্প্রদায়ের সন্ন্যাসীদের আনাগোনা ছিল। জীবনযন্ত্রণা ভুলবার জন্যে বিশ্বম্ভর ঈশ্বরে আত্মসমর্পণের জন্যে সন্ন্যাসী হলেন, নাম হয় শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য। এমনি ভাবেই মর্ত্যের নারীপ্রেম-শারীর প্রেম ভূমার-ঈশ্বরের প্রেমে পেল পরিণতি এবং কালিক তথা স্থানিক প্রয়োজনে অচেতনভাবেই শাস্ত্র-সমাজ-সংস্কারে হল তা নিয়োজিত। গৌরাঙ্গ রূপবান বলেই তিনি গৌরচন্দ্র-গোরাচাঁদ, গৌরাঙ্গ। বিষ্ণু-লক্ষ্মীর মনুষ্যাবতার রাধা-কৃষ্ণের প্রণয়লীলার অনুধ্যানই-হৃদয়রূপ বৃন্দাবনে অনুভবই হল তাঁর সাধনার বিষয়। সূফী-তত্ত্বের প্রভাবে তাঁর ভগবদ্ভক্তি প্রেমবাদে হল উন্নীত।

চৈতন্যদেবের আটচল্লিশ বছরের স্বল্পকালীন জীবনে শেষ বারো বছর ছিল বৈষ্ণবের ভাষায় দিব্যোন্মাদ কাল। কাজেই বারো বছর মাত্র [১৫১০-২১] তিনি তাঁর স্বমত প্রচারের সুযোগ পেয়েছিলেন। তীর্থভ্রমণে, দেশপর্যটনেও কেটেছে কিছুকাল। বাঙলাদেশেও তাঁর এ সময়ে অবস্থিতি স্বল্পকালের। রাজনীতিক কারণে রাজরোষের আশঙ্কায় নদীয়া ছেড়ে তাঁকে উড়িষ্যার নীলাচলে, হিন্দুরাজ্য পুরীতে আশ্রিত হতে হয়েছিল। শাস্ত্র-সমাজপ্রেমী হিন্দু জাগরণবাদী সংস্কারকরা হিন্দুমনে উদ্দীপনা এবং সাহস সঞ্চারের জন্যে এক 'ভবিতব্য রটিয়ে দিয়েছিল যে 'গৌড়ে ব্রাহ্মণরাজা হবে হেন আছে' সুলতান এ রটনায় শঙ্কিত ও সতর্ক হয়ে নাকি সৈন্য সমবেশ করেন নদীয়ায়। চৈতন্যদেব সানুচর পথে পথে পদযাত্রায় গীত-বাদ্য-নৃত্যযোগে কৃষ্ণলীলা- কীর্তন মাধ্যমে তাঁর নব প্রেমবাদ প্রচার করতে থাকেন। প্রতিবেশী সনাতন

শাস্ত্রপন্থীরা একে স্বধর্মবিরোধী অনাচার মনে করে। চৈতন্যের বিরত করার জন্যে নদীয়ার কাজীর কাছে অভিযোগ করে। কাজী চৈতন্যের সংকীর্তনযাত্রা নিষিদ্ধ করে দেন। কিন্তু গৌড়-সুলতান গৌড়ে ব্রাহ্মণরাজত্বকামী হিন্দু সমাজে বিভেদ-বিরোধ সৃষ্টির লক্ষ্যে চৈতন্যদেবকে সংকীর্তনে এবং স্বমতপ্রচারে উৎসাহ দেয়ার গোপন নির্দেশ দেন। তবে কিছুকালের মধ্যেই চৈতন্য-দেবের জনপ্রিয়তা এবং অনুগতের সংখ্যা অভাবিতভাবে বৃদ্ধি পাওয়ায় সুলতান এঁর হাতেই রাজ্য হারানোর আশঙ্কায় উদ্বিগ্ন হয়ে ওঠেন, এবং কোনো ব্যবস্থা গ্রহণের পূর্বেই দরবারের চৈতন্যনুরাগী দবীরখাস ও সাকের মল্লিক রূপ -সনাতনের পরামর্শে চৈতন্যদেব গৌড় ছেড়ে চলে যান। এর ফলে বাঙলাদেশে চৈতন্যদেবের নব গৌড়ীয় বৈষ্ণব মত আশানুরূপ প্রসার লাভ করেনি। অদ্বৈত্য-নিত্যানন্দ এবং বৃন্দাবনের রূপ -সনাতন জীব প্রমুখ ষড়্গোস্বামীর প্রভাবও মোটামুটিভাবে পশ্চিমবঙ্গেই ছিল সীমিত। চৈতন্যদেবের দিব্যোন্মাদকালেই চৈতন্যতত্ত্ব নিয়ে অদ্বৈতাচার্যের আর নিত্যানন্দের দলে মতভেদ দেখা দেয়। অদ্বৈতাচার্যের দল যেমন চৈতন্যকে রাধাকৃষ্ণের যুগলাবতার ভাবতে শুরু করে তেমনি নিত্যানন্দের দলও চৈতন্যকে বৌদ্ধ বজ্রসহজযানের প্রবক্তা বলে বিশ্বাস করতে থাকে। প্রথমটির নাম গৌরপারম্যবাদ এবং দ্বিতীয়টির নাম গৌরনাগরবাদ। এ শেষোক্তটি থেকে সহজিয়া বৈষ্ণব মতের উদ্ভব আর প্রসার ঘটে।

চৈতন্যদেবের লিখিত কোনো বাণী বা দেশনা নেই। শিক্ষাষ্টক নামে কেবল আটটি সাধন-ভজন (সংকীর্তন, নামজপ, ভক্তি, বিনয় প্রভৃতি)-সম্পৃক্ত সংস্কৃত শ্লোক তাঁর রচিত বলে বিশ্বাস করা হয়। তাঁর উচ্চারিত কথা 'চণ্ডালোহপি দ্বিজশ্রেষ্ঠ হরিভক্তিপরায়ণ : 'কিংবা 'মুই সেই মুই সেই '(সোহহম্-তত্ত্ববাচক)। আর তাঁর জীবনে যা বাস্তবায়িত হয়েছে, তা হল রাধাভাবে কৃষ্ণারাধনা :

প্রেমের পরমসার মহাভাব জানি
সেই মহাভাবরূপ রাধা ঠাকুরানী।
সেই মহাঠাকুরানীভাব যার মনে উপজয়
বেদধর্ম তেজি সে কৃষ্ণকে ভজয়।
রাধাকৃষ্ণ এক আত্মা দুই দেহ ধরি
অন্যোন্যে বিলাসয় রসাস্বাদন করি।

বৈষ্ণব তাত্ত্বিকদের মতে, চৈতন্যদেব 'নরে নারায়ণ' ও জীবে ব্রহ্মাদর্শন করেছিলেন, অর্থাৎ অচিন্ত্যদ্বৈতাদ্বৈততত্ত্ববাদী চৈতন্যদেব নরে জীবে সর্বত্র ব্রহ্মেরই প্রমূর্ত কিংবা বিমূর্ত রূপ-স্বরূপ, প্রকাশ-বিকাশ অনুভব উপলব্ধি করতেন। 'অনন্ত স্ফটিকে যৈছে এক সূর্য ভাসে। তৈসে জীবে গোবিন্দের অংশ প্রকাশে।'—এ অনুভব উপলব্ধিই তাঁকে মানব-সাম্যে, মানবপ্রেমে, নির্বিশেষ প্রীতিতত্ত্বের, অহং-বিনাশী বিনয়ানুশীলনে আস্থাবান করেছিল, প্রেম-প্রীতি-সখ্যের—তাও হয়েছিল তাঁর বোধগত।

সখীভাবে পায় রাধা-কৃষ্ণের চরণ
সেই গোপীভাবামৃতে যার লোভ হয়
বেদধর্ম তেজি সে কৃষ্ণকে ভজয়।

কৃষ্ণরূপ সে-নারায়ণের গোপীভাবে তথা সখা-সহচররূপে কৃপা-করুণ-ক্ষমা প্রীতি-প্রসন্নদৃষ্টি লাভের সাধনাই যে শ্রেষ্ঠ মনুষ্যসাধনা, তা হয়েছিল উপলব্ধ। তাই 'রাধাকৃষ্ণনাম' জপ

আর সঙ্গীত মাধ্যমে তাঁদের প্রণয়-লীলা কীর্তনই হল সাধন-ভজনপন্থা। সূফী প্রভাবে অন্যদের মতো বৈদান্তিক অদ্বৈততত্ত্বকে সূক্ষ্মতর চেতনায় লব্ধ অচিন্ত্যদ্বৈতাদ্বৈত স্বরূপে উপলব্ধি করা এবং ভক্তিকে প্রেমে উন্নীত করাই ছিল এদেশের -ভারত বর্ষের-ধর্মদর্শনে ও দার্শনিক তত্ত্বভাবনায় চৈতন্যদেবের সর্বশ্রেষ্ঠ দান। এ দুই তত্ত্ব অবলম্বন করেই রূপ-সনাতন জীব প্রমুখ ষড়গোস্বামীরা নানা টীকা-ভাষ্য-ব্যাখ্যা- বিশ্লেষণ মাধামে বৈষ্ণবের সাধ্যসাধনতত্ত্ব 'উজ্জ্বলনীল-মণি', প্রভৃতি গ্রন্থে, ব্রজমোহন দাস 'চৈতন্যতত্ত্বপ্রদীপে' এবং কৃষ্ণদাস কবিরাজ 'চৈতন্যচরিতামৃত' নামের চৈতন্য-প্রোক্ত দার্শনিক তত্ত্বকাব্যে নিরূপণ করেছেন। বৈষ্ণবের দ্বাদশতত্ত্ব-রসতত্ত্ব এবং সহজিয়া সাধনতত্ত্বও উক্ত সব টীকাভাষ্যেরই প্রসূন।

যদিও শাস্ত্র-সমাজসংস্কারক রূপেই চৈতন্যদেবের আপাত আবির্ভাব ঘটেছিল, পরিণামে তিনি দেব দ্বিজ-শ্রুতি-গীতাবিরোধী নতুন অচিন্ত্য দ্বৈতাদ্বৈততত্ত্বভিত্তিক ভগবৎ-প্রেমবাদ প্রচার করেন । যেহেতু রাধাকৃষ্ণ-নামসম্বল এ মতবাদ, সেহেতু নবগৌড়ীয় বৈষ্ণবমতবাদ রূপে তা ব্রাহ্মণ্য শাস্ত্রের এবং সমাজের উপমত রূপে স্বীকৃতি পেল।

রূপে অসামান্য গুণে অনন্য এ তরুণ সন্ন্যাসীর ব্যক্তিত্বের প্রভাব এবং প্রভাব অনুপস্থিতি সত্ত্বেও লঘুগুরুভাবে পরিব্যাপ্ত হয়েছিল দেশের সর্বত্র। তাঁর পার্ষদপরিকরেরা নিজেদের জীবনে বিনয়, সাম্যচেতনা, মানবপ্রীতি, সততা আর বৈরাগ্যকে বাস্তব রূপ দিয়েছিলেন। বলেছি বৈষ্ণব মত খুব কম লোকেই বরণ করেছিল, কিন্তু বৈষ্ণবের জীবনাচারের, সংস্কৃতির এবং জীবনভাবনার প্রভাব গভীরভাবে পড়েছিল বাঙলার হিন্দু-মুসলিম নির্বিশেষের উপর। তাই ব্যক্তিমানুষের মর্যাদা, স্বাতন্ত্র্যচেতনা, সহিষ্ণুতা, বিনয়বোধ, সংবেদনশীলতা, প্রীতিকামিতা, জীবাত্মা-পরমাত্মার নৈকট্য ও অভিন্নতাবোধ প্রভৃতি অবচেতনভাবেই সঞ্চারিত হয়েছিল সংবেদনশীল ভাবপ্রবণ হিন্দু -মুসলিমের চিত্তে। 'রাধা ছাড়া সাধা নেই ,কানু ছাড়া গীত নেই, —এমনি নবসৃষ্টি প্রতিবেশেরই দান। তা ছাড়া , চৈতন্যভাবান্দোলনের প্রভাবে হিন্দু -মুসলিম মোটামুটি ১৫২০ থেকে ১৫৮০সন অবধি রামায়ণ মহাভারত কিংবা মঙ্গল-পাঁচালী রচনায়ও হয়ে পড়েছিল উদাসীন । এ সময়ে রচিত প্রণয়কাব্যে এবং পরবর্তীকালে রচিত রামায়ণ -মহাভারত-ভাগবত ও মঙ্গল-পাঁচালীতে চৈতন্যের প্রেমধর্মের প্রভাব উদারতায় সহিষ্ণুতায় কৃপায় করুণায় ক্ষমায় ও প্রীতিপ্রসন্নতায় সুপ্রকট, যদিও বৈষ্ণব সাধনানুগ রাগাত্মিক ও রাগানুগ রাধা-কৃষ্ণপ্রণয়গীতি এখনকার প্রেসিডেন্সি আর বর্ধমান বিভাগের বাইরে রচিত হয়নি, তবু রাধাকৃষ্ণরূপকে চট্টগ্রাম অবধি সর্বত্র হিন্দু-মুসলিম পদকাররা দেহতত্ত্বের অধ্যাত্মসঙ্গীত রচনা করেছেন বৈষ্ণব প্রভাবেই । বাঙালী মহত্তর জগৎচেতনায় এবং জীবনভাবনায় উদ্বুদ্ধ হয়েছিল, এ কারণেই আমরা চৈতন্য- প্রভাবিত ষোল শতককে বাঙলার ভাববিপ্লব বা রেনেসাঁস যুগ বলে আখ্যাত করতে চাই।

চৈতন্যচেতনা অবশ্য ঐহিকতাবিরোধী বৈরাগ্যপ্রবণ আকাশচারিতা। অধ্যাত্ম-চেতনা প্রবল হলে ঐহিক জীবনচেতনা নিষ্ক্রিয় হয়ে যায়। তাতে ঐহিক জীবনের বৈষয়িক দায়িত্ব-কর্তব্য হয় অবহেলিত। ফলে রাষ্ট্রিক আর্থিক-সামাজিক জীবনে দেখা দেয় গতানুগতিকতা, চিন্তা-চেতনায় বদ্ধতা, আবিষ্কারে-উদ্ভাবনে থাকে না আগ্রহ। ফলে মনে-মননে-শাস্ত্রে-সমাজে-সংস্কৃতিতে শীত-গ্রীষ্মের বহু ব্যবহৃত ক্ষুদ্র জলাশয়ের জলের মতো দেখা দেয় বিকৃতি আর অবক্ষয়।

চৈতন্যতিরোভাবোত্তর অল্পকালের মধ্যেই বৈষ্ণব সমাজে তত্ত্বভেদজাত মতভেদ , রক্ষণশীলতা, কর্মকুণ্ঠা, ভিক্ষাজীবিতা, দ্বেষ-দ্বন্দ্ব প্রবণতা,আভিজাত্যচেতনা,অবিনয়-অসাম্য-

অপ্রীতি অহংবোধ প্রবল হতে থাকে। যিনি আচণ্ডাল যবনে কোল দিয়েছিলেন, যবন হরিদাসের এঁটো খেয়েছিলেন, সুবুদ্ধি রায়কে এবং স্খলিত চরিত্রের বিধবা নারায়ণীকে আর তাঁর সন্তানকে সাদরে সসম্মানে সমাজে ঠাঁই দিয়েছিলেন, অহং-আভিজাত্য-বিনাশলক্ষ্যে ও বিনয়ে কুলবাচি পরিহারে , নর বা জীব সেবক 'দাস' নাম গ্রহণে ,বর্ণ বা জাতিভেদ বর্জনে, প্রীতিসূত্রে দাম্পত্য জীবন বরণে, নরে নারায়ণ জীবে ব্রহ্মদর্শনে অনুপ্রাণিত করেছিলেন পার্ষদ-পরিকরদের-মানুষের জন্যে বৃহত্তর মিলন -ময়দান তৈরির লক্ষ্যে, পরিণামে তাঁর সেই অনুগামীরাই দ্বেষ-দ্বন্দ্বের-ব্যবধানের দেওয়াল তুলে একটি নতুন খণ্ড ও ক্ষুদ্র সম্প্রদায় সৃষ্টি করল মাত্র। চৈতন্যচরিতকারগণ এবং চৈতন্যমতবাদের ভাষ্যকারগণ স্ব-স্ব জাত-বর্ণ গোত্র-আচারের বিশুদ্ধতা এবং মূল্যমর্যাদা রক্ষার উদ্দেশ্যে অস্পৃশ্যদ্বেষী জাতিভেদপ্রথার সমর্থক ব্রাহ্মণ্য আচারনিষ্ঠ শুচিবাইগ্রস্ত ব্যক্তি হিসেবে অঙ্কিত করেছেন চৈতন্যদেবকে এবং এভাবে বর্ণেবিন্যস্ত স্থিতিশীল বা স্থাবর বৈষ্ণব সমাজ নতুনভাবে গড়ে তুলেছেন—শাস্ত্রিক, বৈবাহিক, সামাজিক ও আচারিক জীবনে তথাকথিত বিশুদ্ধতার দোহাই দিয়ে। এভাবে চৈতন্য-অভিপ্রেত বৈষ্ণবের মন-মননের মহাসামুদ্রিক প্রবাহ তাঁরা সরু সংকীর্ণ খাতে বহমান রাখলেন কায়েমি সংকীর্ণ স্বার্থে। এখানেই শেষ নয় কেবল শৈব-শাক্ত পাপী-পাষণ্ডদের শিরে লাথি মেরেই তারা ক্ষান্ত হয়নি [এতো পরিহারেও যে পাপী নিন্দা করে। তবে লাথি মারোঁ তার শিরের ওপরে।-বৃন্দাবন দাস] অসহিষ্ণু ও ক্ষুব্ধ-বিদ্বিষ্টমনে 'যবন, 'ম্লেচ্ছ শাসক-গোষ্ঠীর প্রতি কিছু নিন্দা-অপবাদ উচ্চারণ করে শাসিত সুলভ মনের ঝাল মিটিয়েছেন তাঁদের রচনায়। শাসকগোষ্ঠীও তখন পরম উদারতায় তা সহ্য করেছেন কূটনীতিবেশ।

তথ্যনির্দেশ :

১। দীনেশচন্দ্র সেনও বলেছেন, 'লক্ষ্মীর অপঘাতমৃত্যুই চৈতন্যদেবের সংসারবৈরাগ্যের অন্যতম কারণ। বঙ্গভাষা ও সাহিত্য , ৮ম সং পৃঃ ১৭২, পাদটীকা। জয়ানন্দ বলেছেন, সর্পঘাতে লক্ষ্মীপ্রিয়ার মৃত্য হয়। অবৈষ্ণব সমাজে চালু কিংবদন্তী অনুসারে শাশুড়ি শচীদেবীর নির্যাতন অসহ্য হওয়ায় বধূ আত্মহত্যা করেন। শাশুড়ি সাপিনী ননদী বাঘিনী এ আপ্তবাক্যাংশই কি সর্পদংশন বলে কবি সাংকেতিক বা প্রতীকী অর্থে ব্যবহার করেছেন?

২। ডক্টর তাঁরাচাদ, বিনয় ঘোষ,সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়, সর্বপল্লী রাধাকৃষ্ণণ, উমেশচন্দ্র ভট্টাচার্য, সুকুমার সেন প্রমুখ সবাই সন্তধর্মে এবং নব গৌড়ীয় বৈষ্ণব মতবাদে ইসলামের ও সুফিমতের প্রভাব স্বীকার করেন। এখানে ডক্টর মুহম্মদ এনামুল হক-ব্যাখ্যাত প্রভাবের রূপস্বরূপ উদ্ধৃত করছি '-নামে রুচি, জীবে দয়া' -ইহাই গৌড়ীয় বৈষ্ণবমতেয় মূলশাস্ত্র।... গৌড়ীয় বৈষ্ণবদের এই 'নামে রুচি ও জীবে দয়া' মুসলিম সুফি সাধকদের 'জিকর ও খিদমৎ 'নীতির নামান্তর। ইহাতে ইসলামের সাম্য, উদারতা ও ভ্রাতৃত্বের ছাপও সুস্পষ্ট। সূফীদের 'সমা বৈষ্ণবদের 'কীর্তনে' তফাৎ নাই। এই কীর্তনের শেষে বৈষ্ণবদের যে দশা হয়, তাহাতে শারীরিক ও মানসিক অবস্থা ফুটিয়া উঠে, সূফীদের 'হালের ' অবস্থাও তাহাই। কীর্তন ও সমা, এবং দশা ও হাল শব্দার্থ , ভাব ,সম্পাদন-ব্যবস্থা ও মানসিক অনুভূতির দিক হইতে একই বস্তুর অভিব্যক্তি । গৌড়ীয় বৈষ্ণবদের প্রেম সূফীদের 'ইশক । রাধা-কৃষ্ণ সূফীদের 'সাকী ' ও ব্যৎ কিংবা 'শারআ' পরওয়ানা। ঐশ্বর্য 'সূফীদের কিয়ামৎ 'ছাড়া আর কিছুই নহে।" [মুসলিম বাঙালী সাহিত্য , ১ম সং , ১৯৫৫সন, পৃ. ৫০-৫১]

৩। দুই ভাইয়ের রূপ ও সনাতন নাম চৈতন্যদেব প্রদত্ত । 'রূপ সনাতন নাম থুইল দোহার ' চৈতন্যতত্ত্বপ্রদীপ-ব্রজমোহন দাস এবং 'দুই ভাইয়ের নাম হইল রূপ সনাতন—জয়ানন্দ।

৪। ইসলামের প্রভাবেই ভাস্কর ভেদাভেদবাদবাদী, রামানুজ বিশিষ্টাদ্বৈতাবাদী, মধ্ব দ্বৈতাবাদী, বল্লভ শুদ্ধাদ্বৈতবাদী হন। তেমনি স্রষ্টা- স্রষ্টির দ্বৈততত্ত্ববাদী সুফিরা উপনিষদের অদ্বৈততত্ত্বের প্রভাবে হয়ে পড়ে অদ্বৈতবাদী ।

৫। বৃন্দাবন দাস-প্রমুখ রচিত চরিতগ্রন্থে ব্রাহ্মণের বাড়িতে আশ্রয় ও অন্ন গ্রহণ প্রভৃতির বর্ণনা রয়েছে। সংস্কৃত চরিতগ্রন্থের সাক্ষ্যে ডক্টর সুশীলকুমার দে তাঁর 'দ্য বৈষ্ণব ফেথ অ্যানড মুভমেন্ট ইন বেঙ্গল', গ্রন্থে চৈতন্যদেব জাতিভেদ' প্রথার সমর্থক আর্লি হিস্টরি অব ছিলেন বলে উল্লেখ করেছেন।

This is enough evidence to show that chaitanya inpro-claiming obliteration of distinctions, never meant a total disruption of social usage and tradition [p-81, 1942edi.]

এবং There is no evidencc that Chaitanya ever wanted to intfere actively with the established social order with the time-honoured Varnasrama Dharma etc.[p-81, Footnote]

এ প্রবন্ধে পরিব্যক্ত প্রায় সব 'মত ও মন্তব্য', তথ্যভিত্তিক। বিস্তৃত আলোচনা মৎ- প্রণীত 'বাঙালী ও বাঙলা সাহিত্য, (২য় খণ্ড) গ্রন্থে দ্রষ্টব্য।

আমার চেতনায় জীবন ও জগৎ

জাগ্রত সময়ের পরিসরে অনুভূত চেতনার সমষ্টিই জীবন—নিদ্রিত ও মূর্ছিত মানুষে জীবন অনুপস্থিত। নব নব খণ্ড খণ্ড আকাঙ্ক্ষাপূর্তির প্রণোদনাই হচ্ছে জীবনের চালিকাশক্তি। তাই অতৃপ্তিই জীবন-প্রেরণা। মানুষের কর্মে আচরণে কাঙ্ক্ষাজাত জীবনানুভূতিরই প্রকাশ ও বিকাশ ঘটে। এতাৎপর্যে কাঙ্ক্ষার পূর্তি-অপূর্তির সামষ্টিক অনুভূতিই সুখ-দুঃখময় জীবন।

বাল্যকাল থেকেই শুনেছি -জেনেছি বটে, কিন্তু জীবনের শেষপর্বে উপলব্ধি করেছি, যে প্রত্যেক মানুষেরই জীবনের বিকাশের ও সাফল্যের সম্ভাবনা অশেষ। প্রতি মানুষের দেহে মনে অপরিমেয় শক্তি সুপ্ত থাকে। সে জড় শক্তিকে আকাঙ্ক্ষাপুষ্ট সঙ্কল্পে ঋদ্ধ করে প্রয়োগের স্থির লক্ষ্যে নিত্য অনুশীলনের মাধ্যমে জাগ্রত, বিকাশিত ও উন্নীত করলে মাত্রাভেদ সত্ত্বেও সিদ্ধি সাফল্য সুনিশ্চিত হয় । যথাসময়ে সাধনার কথা মনে জাগেনি, তই সিদ্ধি অনায়ত্ত রইল। শক্তি রইল সুপ্ত ও অপ্রযুক্ত। তাই আমিও আত্মশক্তি সম্বন্ধে উদাসীন কোটি কোটি মানুষের একজন । এখনকার এ উপলব্ধি আমার চেতনায় —আমার সত্তার গভীরে—প্রায়ই হৃতজীবনের কান্না হয়ে দেখা দেয়। শেষ বয়সে জীবনের এ ট্র্যাজেডি আহা, জীবনটা যদি গোড়া থেকে আবার শুরু করা যেত'—এমনি এক হাহাকার জাগায় কোন কোন নিঃসঙ্গ মুহূর্তে।

মানুষের শোনা-জানা থাকে অনেক কিছুই, কিন্তু জ্ঞান প্রজ্ঞায় পরিণতি না পেলে, বোধ - বুদ্ধি হৃদয়গত না হলে তা বিবেক প্রণোদিত কর্মে আচরণে অভিব্যক্ত হয় না। সবারই মতো আমি জীবনে ঠেকে ও ঠকে যা যা শিখেছি, সেগুলোর কয়েকটি এখানে ব্যক্ত করছি।

মানুষ সম্বন্ধে আমার ধারণা—দৈশিক ,কালিক, শাস্ত্রিক, বার্ণিক, আবয়বিক, আর্থিক সামাজিক ও প্রাকৃতিক অবস্থানভেদ সত্ত্বেও প্রাণি-জগতে প্রজাতি হিসেবে সারা দুনিয়ার মানুষেরই বৃত্তি-প্রবৃত্তি অভিন্ন।মানুষ ভালোও নয়, মন্দও নয়। মানুষ কখনো ভালো, কখনো মন্দ, কারুর প্রতি ভালো, কারুর প্রতি মন্দ, কারুর কাছে ভালো, কারুর কাছে মন্দ, কারুর জন্যে ভালো, কারুর জন্যে মন্দ। মানুষে মানুষে সব সম্পর্কই আপেক্ষিক। স্থান কাল-মানুষ সম্পর্ক রহিত হয়ে মানুষ একা বাঁচতে পারে না। বাঁচার জন্যেই চাই পরিবার, গোষ্ঠী, গোত্র, সহাবস্থানে দীক্ষা প্রয়োজন। এর প্রথম শর্ত বৃত্তি-প্রবৃত্তির সংযম এবং সহাবস্থানের গরজে স্বতো-উদ্ভুত নিয়মনীতির আনুগত্য। প্রয়োজনবুদ্ধির ও শ্রেয়স্‌চেতনার সঙ্গে জড়িয়ে থাকে স্বাধিকারবোধ আর দায়িত্ব ও কতর্ব্যচেতনা। মানুষের জীবনাচারের বিকাশের ধারায় স্বাধিকার চেতনা, দায়িত্বজ্ঞান ও কর্তব্যবুদ্ধি সংযম-সংস্কৃতির পরিশীলিত ও পরিমার্জিত উৎকর্ষ ঘটিয়েছে- আজো ঘটাচ্ছে। প্রয়োজন চেতনার, জীবনজিজ্ঞাসার ও মনন-উৎকর্ষের প্রসারের সঙ্গে সঙ্গে আন্তর ও বাহ্য জীবনোপকরণও আবিষ্কারে-উদ্ভাবনে বেড়েছে, বাড়ছে ও নিত্য পরিবর্তিত হচ্ছে।

যেহেতু নতুন চিন্তা-চেতনা ও আবিষ্কার-উদ্ভাবনমাত্রই ব্যক্তিমানসের প্রসূন এবং তেমন মানুষ 'কোটিকে গুটিক; আর যেহেতু দুনিয়ার তাবৎ মানুষ স্বভাবে পরবুদ্ধিজীবী, পরানুকারী, পরানুসারী, পরনির্ভর, পরাবিস্কারপ্রত্যাশী, পরশ্রমজীবী ও পরান্নজীবী, সেহেতু একের আবিষ্কার-উদ্ভাবন ,মনন-চিন্তন অনুকারক-অনুসারকের কাছে চিরাচরিত আচার-সংস্কার মাত্র। এ সবকিছু জনজীবনাচারের অন্তর্গত হয়ে দৈশিক বা জাতিক সংস্কৃতি নামে পরিচিত হয়। বিজ্ঞানের তথ্য এ তত্ত্বদর্শনের তত্ত্ব কিংবা কবিতার মতো রুচি -সংস্কৃতিও ব্যক্তির মানসপ্রসূন, ব্যক্তিক আবিস্কার উদ্ভাবন বা সৃষ্টি। অতএব, জীবনের, জীবিকার, সমাজের, রাষ্ট্রের অন্যান্য ক্ষেত্রের মতো মনন-মনীষার ক্ষেত্রেও নায়ক থাকেন।

এ নায়করাই মানুষকে অশনে বসনে নিবাসে নিদানে স্বাধিকার দান লক্ষ্যে আত্মশক্তিচেতনাবিরহী আত্মপ্রত্যয়হীন মানুষকে বিশ্বাসের, সংস্কারের,অবিদ্যার, অশিক্ষার, অজ্ঞতার, নিঃস্বতার নিগড় থেকে, দুর্জনের দুর্বত্তের ও দুঃশাসকের পীড়ন-শোষণ-শাসনের জুলুম থেকে মুক্ত করতে চেয়েছেন। যেহেতু তাঁদের দেশ-কাল-অবস্থান, মন-বুদ্ধি -রুচি, শক্তি, শ্রেয়োবোধ ও প্রতিকারের উপায়-চেতনা অভিন্ন ছিল না, সেহেতু তাঁদের প্রতিকারের প্রয়াস-পদ্ধতিও হয়েছে বিভিন্ন ও বিচিত্র। নবী-অবতারেরা প্রবল দুর্জন -দুর্বৃত্তদের মনে পাপের পারত্রিক শাস্তির ভয়-বিভীষিকা সৃষ্টি করে অন্যায় অপকর্ম থেকে তাদের বিরত রাখা সম্ভব মনে করেছেন। কেউ কেউ ভেবেছেন দুষ্টি-দুর্জন-দুর্বৃত্ত দুঃশাসক মনে কৃপা-করুণা দান-দাক্ষিণ্যের মাহাত্ম্যচেতনা জাগিয়ে দীন দুর্বলদের জুলুমমুক্ত রাখা যাবে। আমরা জানি, সেসব প্রয়াস ব্যর্থ হয়েছে। কেননা প্রলোভন প্রবল হলে লুব্ধ মানুষ করে না হেন অপকর্ম নেই—সে মুহূর্তে ভূত-ভগবান-সমাজ-শাসক, নিন্দা-শাস্তি প্রভৃতির অস্তিত্ব ওই লোভতরঙ্গের তোড়ে ভেসে যায়। তা ছাড়া নবী-অবতারের আবেদন ছিল পাপের পারত্রিক শাস্তি ভীরু আস্তিক মানুষের বিশ্বাস প্রবণ বিবেকের কাছে। ওই আবেদন বালক-বৃদ্ধ ব্যতীত লোভী-লুব্ধ মানুষে ক্বচিৎ-কদাচিৎ কেজো

ছিল। আজকের ঐহিক জীবনবাদী মানুষ ব্যক্তিক সমস্বার্থে স্বাধিকারে সহিষ্ণুতায় সহযোগিতায় সহাবস্থানে আগ্রহকেই সর্বপ্রকার জুলুম মুক্তির উপায় বলে চিহ্নিত করতে চায়।

কিন্তু যে-কোন সমাজব্যবস্থায় ও সমাজে সমস্যা হয়ে দাঁড়ায় দুর্বলচিত্ত বিশ্বাস-সংস্কার চালিত জিজ্ঞাসাহীন সাধারণ মানুষ। তারা প্রচলিত কিংবা পরিবর্তিত নিয়ম-নীতিমানা নিশ্চিন্ত জীবনে অভ্যস্ত। তাদের কাছে যুক্তির কোন গুরুত্ব নেই। বিশ্বাস সংস্কারের তথা শাস্ত্রের তাৎপর্য জানা-বোঝার গরজবোধও নেই তাদের। কেবল মেনে, অন্ধভাবে অনুকরণ অনুসরণ করেই তারা তৃপ্ত, তুষ্ট ও কৃতার্থ।

কারণ-কার্যের অজ্ঞতা থেকেই উদ্ভব বিস্ময়ের ও কল্পনার। কল্পনা স্থূলযুক্তি ও ব্যাখ্যা জড়িত হয়ে বিশ্বাসরূপে চিত্তলোকে দৃঢ়মূল হয়। এ দৃঢ় বিশ্বাসই সামাজিক প্রতিষ্ঠা পায় শাস্ত্রীয় প্রত্যয়রূপে। সবচেয়ে ক্ষতিকর হচ্ছে, ওই কল্পনাজাত প্রত্যয়কেই শাস্ত্র-ব্যাখ্যাদ্বারা যুক্তিযোগে সত্য বলে প্রমাণ করতে চায়। তারা বুঝতে চায় না যে বিশ্বাসকে 'সত্যরূপে প্রতিষ্ঠাদানের প্রয়াস পুতুলে হাত-পা চোখ বসিয়ে তাকে জীবন্ত মনে করার মতোই বিড়ম্বনা মাত্র। এই বিশ্বাসপ্রবণ বা আস্তিক মানুষ ব্যবহারিক জীবনে সব আবিস্কার উদ্ভাবনই বিনা ওজরে গ্রহণ-বরণ করে। আবিস্কৃত রোগ ও ঔষধ, উদ্ভাবিত যন্ত্র ও প্রযুক্তি গ্রহণকালে আবিস্কর্তার বা উদ্ভাবকের সততায় ও দক্ষতায় তাদের আস্থা সহজেই আসে— এমন কি সেই ঔষধ বা প্রযুক্তি তাদের শাস্ত্রীয় বিশ্বাসের বিপরীত হলেও আপত্তি থাকে না। কিন্ত চিন্তা-চেতনা মননের ক্ষেত্রে কিছুতেই তারা দক্ষ দার্শনিকের যুক্তির মূল্য-মর্যাদা দিতে হয় না। সে ক্ষেত্রে অবোধ্য ও অযৌক্তিক শাস্ত্রে ও শাস্ত্রকারে তাদের আস্থা থাকে অটল। ফলে আস্তিকরা দেড় -দুই- আড়াই তিন-সাড়ে তিন হাজার বছর আগের স্বল্পজ্ঞানের ও সংকীর্ণ চেতনার জগতে মানসবিহার করে। আস্তিক মানুষের চিন্তা-চেতনা, যুক্তি-বুদ্ধি নিয়ন্ত্রণ করে সেই অজ্ঞতার, অন্ধকার অতীতের কল্পনাজাত তত্ত্ব ও তথ্য। এ মানুষ ব্যবহারিক জীবনে আজকের যন্ত্রের ও কৃৎকৌশলের প্রসাদ উপভোগ করেও মনোজগতে হাজার হাজার বছর পিছিয়ে পড়া মানুষ -যন্ত্রের ও যুক্তির যুগে ও জগতে বাস করেও তার কল্পনাজাত বিশ্বাসের ও সংস্কারের যুগের ও জগতের বাসিন্দা । এমন মানুষ মতের ও মননের ক্ষেত্রে অতীত-মুখী, অতীতাশ্রয়ী ও ঐতিহ্যগর্বী না হয়েই পারে না। তাদের মনো জগতে দেশকালজ্ঞানবিরহী অতীত চিরনিত্য, চিরস্থির, চির অম্লান ও চির শ্রেয়সের আকর। এ ক্ষেত্রে তাদের চেতনায় নতুন জ্ঞান নতুন সত্য, নতুন তত্ত্ব ও নতুন তথ্য প্রভৃতির আবিস্কার বৃথা ও বাহুল্য মাত্র। অথচ বাস্তবে তারাও জানে, বোঝে ও মানে যে শরীরে হাত পা-চোখের অবস্থানই ইঙ্গিত দিচ্ছে যে মানুষের দৃষ্টি, গতি, কর্ম থাকবে সম্মুখেই—পশ্চাতে নয়। পিছে ফেলে আসা অতীত তা হলে কী করে দান করবে সম্মুখ গতি, কিভাবে হবে ভাবী চিন্তা-কর্ম-আচরণ প্রেরণার উৎস, তা হলে মিশর-ব্যাবিলন-গ্রিস-রোম-বাগদাদের পতন হল কেন? ঐতিহ্যশূন্য দেশ-জাতিই বা প্রতিষ্ঠা পায় কী করে? এসব যুক্তিতে তারা কান দেয় না।

আস্তিক মানুষ মাত্রই গোষ্ঠী বা দলচেতনা বশে বিধর্মী-বিজাতি-বিভাষী-বিদেশী-বিদ্বেষী। তারা ভিন্ন দলের মতের, দেশের ও ভাষার মানুষ মাত্রকেই পর ও সম্ভাব্য শত্রু বলে জানে ও মানে। আস্তিক মানুষ শাস্ত্র-সমাজ মানে বলেই তার উদারতাও নিতান্ত সংকীর্ণ পরিসরেই আবর্তিত হয় মাত্র। যেমন মুসলিম তার জাকাত-ফিৎরা অমুসলিমকে দিয়ে কিংবা হিন্দু অহিন্দু-কাঙাল বা মোল্লা ভোজনে বাঞ্ছিত পুণ্য মেলে বলে বিশ্বাস করতে পারে না। এ কারণেই আস্তিক মানুষ বিভিন্ন প্রয়োজনে হাটুরে লোকের মতো ভিন্ন ধর্মবলম্বীর সঙ্গে একত্রিত হয় বটে,

কিন্তু মিলিত কিংবা সমন্বিত হয় না। সমাজতান্ত্রিক শাসনে জাত-বর্ণ ধর্ম ভাষাভেদে দাঙ্গার কারণ প্রায় অপসৃত কিংবা নেই কিন্তু দুনিয়ার অন্যত্র জাত-বর্ণ ধর্ম ভাষাভিত্তিক দ্বেষ-দ্বন্দ্ব আজো প্রবল—কোথাও কোথাও মুখ্য সমস্যা।

আস্তিকের সবচেয়ে বড় দোষ দলছুট বলে তারা নাস্তিকের প্রতিসক্রিয় কিংবা নিষ্ক্রিয়ভাবে অসহিষ্ণু। তারা সমাজে চোর-ডাকাত-গুণ্ডা লম্পট-মাতাল-জালিয়াত -প্রতারক প্রভৃতি যে কোনো আস্তিক দুষ্ট -দুর্জন দুর্বৃত্ত দুষ্কর্মাকে সহ্য করতে এমনকি কৃপা-করুণা বশে ক্ষমা করতেও রাজি, কিন্তু নাস্তিকের প্রতি ঘৃণা-বিদ্বেষ পরিহার করতে অক্ষম। যদিও নাস্তিক এমন কোন নতুন পাপ বা অপরাধ করে না যা আস্তিকে দুর্লভ। বাস্তবে নাস্তিকের ন্যায়-নীতি-আদর্শনিষ্ঠা ও বিবেকানুগত্য বেশিই থাকে, জগতের প্রসিদ্ধ নাস্তিকরাই তার প্রমাণ।

অথচ সহনশীলতা হচ্ছে সংস্কৃতির একটি মৌল শর্ত। আমি যা জানি, যা বুঝি যা ভাবি তা সাধারণে জানে না, বোঝে না, ভাবে না, আমার জ্ঞান-বুদ্ধি-রুচি-বিচার-বিবেক অন্যদের চেয়ে উন্নত— এমনি এক উত্তম্মন্যতা এবং অপরকে অযাচিত উপদেশ-পরামর্শ দেয়ার ধৃষ্টতা যে অপরিশীলিত বর্বর রুচি-বুদ্ধিরই পরিচায়ক, তা তথাকথিত শিক্ষিত-সংস্কৃতিবানেরাও উপলব্ধি করেন না। যে কোনো মানুষের যে কোন বিষয়ে স্বমত ও মন্তব্য প্রকাশের ও অন্যের বিবেচনার জন্যে নিবেদন করার অধিকার নিশ্চয়ই আছে, কিন্তু সর্বোৎকৃষ্ট মত-মন্তব্য বলে আস্ফালন বা দাবি করা যে অন্যের জ্ঞান বুদ্ধি-রুচি-বিবেককে তাচ্ছিল্য কিংবা অস্বীকার করার ঔদ্ধত্যের নামান্তর, তা বোঝার মতো সংস্কৃতিবান মানুষ কোটিকেও গুটিকে মেলে না।

এ সূত্রে এ-ও উল্লেখ্য যে বিদ্বানমাত্রই সুশিক্ষিত সংস্কৃতিবান সজ্জন নয়। জ্ঞান বোধশক্তির বিকাশ ঘটায়, বুদ্ধি বাড়ায়, চরিত্র গড়ে না। শাস্ত্রানুনত্যও মানুষকে যান্ত্রিক রোবট করে, মনুষ্যত্ব দান করে না। বাস্তবে পাপভীতি বা শাস্তির আশঙ্কা নয়, তীক্ষ্ণ আত্মবোধ তথা আত্মমর্যাদা চেতনাই মানুষকে ভাব-চিন্তা-কর্ম-আচরণে ভালোমন্দ সম্বন্ধে বিবেকী বিবেচক করে তোলে। আত্মসম্মান সচেতন আত্মপ্রত্যয়ী স্বশিক্ষিত নাস্তিকরা জীবনে যতটা ন্যায় ও নীতিনিষ্ঠ হয় ও থাকে, ততটা তেমনটি যান্ত্রিকতায় অভ্যস্ত শাস্ত্র-মানা নীতিবিদের ও নীতিবানদের মধ্যে দুলর্ক্ষ্য । সমাজস্বাস্থ্য রক্ষার জন্যে তাই শাস্ত্র-মানামানুষ নয়—নীতিনিষ্ঠ মানুষই কাম্য। নীতিনিষ্ঠ মানুষমাত্রই দেশ-কাল-জাত-বর্ণ-ধর্মের উর্ধ্বে স্বসৃষ্টি নিঃসঙ্গ একক মানুষ— অনন্য ব্যক্তিত্ব। বিবেকচালিত এ মানুষ জ্ঞাতসারে কখনো সহজে অন্যায় অপকর্ম পীড়ন শোষণ জুলুম করে না, হয় না দুষ্ট-দুর্জন-দুর্বৃত্ত-দুঃশাসক আত্মসম্মানহীন আশঙ্কায় আত্মঅবমাননার ভয়ে মনুষ্য চেতনার এমনি আনুভূতিক সাংস্কতিক উৎকর্ষই ব্যক্তির আত্মচেতনার বাঞ্ছিত সর্বোচ্চস্তর।

সাধারণভাবে সত্য, ন্যায়, জুলুম প্রভৃতি অবশ্যই আপেক্ষিক তত্ত্ব। সাধারণত শ্রেয়সচেতনাই হচ্ছে এ সবের মাপকাঠি। আবার 'শ্রেয়স'-ও স্বয়ং আপেক্ষিক। শ্রেয়সের যে-ধারণা নিয়ে সন্তানের কল্যাণকামী পিতা সন্তান-শাসন করেন, তা অন্যের চোখে সন্তানের পক্ষে ক্ষতিকর দুঃশাসনও হতে পারে। সাধারণভাবে কোন ব্যক্তির, দলের, সমাজের বা রাষ্ট্রের পক্ষে শ্রেয়স্কর বলে বাঞ্ছিত জীবনাচারের বা স্বার্থের প্রতিকূল যে ভাবচিন্তা-কর্ম-আচরণ, তাই অসত্য অন্যায় বা জুলুম বলে চিহ্নিত। এ তাৎপর্যে মানুষের সদুদ্দেশ্যজাত ভাব চিন্তাকর্ম আচরণ মাত্রই স্বরূপে পক্ষপাতদুষ্ট। সংস্কৃতি-অপসংস্কৃতি তত্ত্বের সাক্ষ্যে এ বিষয়ে আমাদের ধারণা স্পষ্ট হতে পারে। স্যুটপরা মোল্লা- পুরুতের মসজিদেমন্দিরে ইয়ামতি পূজা হবে অপসংস্কৃতির

দৃষ্টান্ত। আবার শহুরে পর্ষদ সভায় শিক্ষিত সদস্যের সগেঞ্জি উপস্থিতিও হবে তেমনি অপসংস্কৃতির নিদর্শন। তাহলে চালু নিয়ম আচার-নীতি তথা বাঞ্ছিত আচরণ ভাঙা বা বিরোধিতাই হচ্ছে অপসংস্কৃতি। নিরপেক্ষ দৃষ্টিতে অবশ্য অপসংস্কৃতি বলে কিছু নেই। অনভ্যস্ত রক্ষণশীলের কাছে যা অপসংস্কৃতি, নতুন প্রজন্মের নয়া রুচির মানুষের কাছে তা-ই প্রগতির ও প্রাগসরমানতার ফসল— নবসৃষ্ট-নবসংস্কৃতিচর্যা। প্রত্যেকের স্ব স্ব রুচির ও স্বার্থের প্রতিকূল সব কিছুই অপকর্ম, অপসংস্কৃতি ও অনাচার।

এবার নাস্তিকের কথা বলি। নাস্তিক্য কোন নতুন তত্ত্ব নয়, —সুপ্রাচীন, সবাই বলে সব কিছুরই স্রষ্টা আছে, গাড়ি-বাড়ির, জামা-কাপড়ের, বই-পত্রের যেমন নির্মাতা আছে, তেমনি জগতেরও স্রষ্টা থাকার কথা। এ কথাগুলো যুক্তিগর্ভ। কিন্তু তারা স্রষ্টাকে স্বয়ম্ভু বলে। বিজ্ঞান বলে— সবকিছু একাধিক উপাদানে গঠিত। তাই যদি হয়, স্বয়ম্ভু স্রষ্টায় সম্ভবত একাধিক উপাদানের সমষ্টি। তা হলে তার আগেও কিছু উপাদান ছিল, তা ছাড়া খালি-খোলা স্থান ও কাল পরিসরও ছিল নইলে স্রষ্টার স্বয়ম্ভু হওয়ার ঠাঁই মিলত কোথায়! স্রষ্টার অস্তিত্ব লাভের আগেই যদি স্বয়ম্ভু হবার প্রতিবেশ স্বয়ং তৈরি হয়ে থাকে, তাহলে অন্য কিছুরও স্বয়ম্ভু হবার পথে বাধা কি! কাজেই স্রষ্টাতত্ত্ব টেকে না। অনেকটা এমনি যুক্তিতেই নিরাত্ম আজ বীক বৈশেষিকরা, চার্বাক বৌদ্ধরা নাস্তিক।

তাছাড়া স্রষ্টা থাকলেই যে শাস্ত্রও বানাতে হবে, তার কোন ন্যায়সম্মত যুক্তি বা ভিত্তি নেই। আসলে অজ্ঞ অসহায় মানুষের মনোভূমেই জন্ম এ স্রষ্টা, সৃষ্টি ও শাস্ত্রতত্ত্বের। আদি মানুষ দেখেছে প্রতিবেশ তার জীবন-জীবিকার প্রতিকূল। তাছাড়া, তার চাওয়া-পাওয়ার মধ্যেও রয়েছে বহু ও বিচিত্র দৃশ্য-অদৃশ্য বাধা। তার অবাঞ্ছিত ঝড়-বৃষ্টি বন্যা-খরা-রোগ নয় শুধু রয়েছে প্রবলতর হিংস্র ও প্রাণবিনাশী সব প্রাণী। অদৃশ্য শক্তির অস্তিত্বে বিশ্বাস অজ্ঞ অসহায় বলেই তাকে করেছে নিয়তিবাদী এবং ভয়ের কারণ অরি ও ভরসার অবলম্বন মিত্র শক্তির কল্পনায় পেয়েছে সে প্রবর্তনা। এবং দুষ্ট শত্রুর কবলমুক্তির জন্যেও মিত্রশক্তির আশ্রয় ও আবেক্ষণ তার পক্ষে আবশ্যিক ছিল। ওই অদৃশ্য মিত্র শক্তিকে স্রষ্টা ও নিয়ন্তা রূপে আর অরিশক্তিকে প্রতিদ্বন্দ্বী অপশক্তিরূপে কল্পনা করা ও তার অজ্ঞ অসহায় অবস্থায় আত্মশক্তি ও স্বস্তিলাভের সহায়ক ছিল। আমরা জানি বিপন্ন মানুষই কেবল ভয়ত্রাতা ও ভরসাদাতা আল্লাহ-ভগবানকে স্মরণ করে। স্রষ্টার ও শত্রুশক্তির উদ্ভব এ ভয়-ভরসার কারণেই। এজন্যেই আল্লাহ-ভগবানের সঙ্গে দেও-দেবতা-দরবেশের সঙ্গে মানুষের সম্পর্ক ঘটে সাধারণ-ভাবে সর্বপ্রাণ-জাদু ট্যাবু-টোটেম বিশ্বাসজাত তুক্‌তাক্ জাদুটোনা বান উচ্চাটন তাবিজ-কবচ-মন্ত্র মাদুলী-ঝাড়ফুঁক মাধ্যমেই। আবার স্রষ্টা স্বীকার করলেই তাঁর সঙ্গে ক্ষতিভীরু ও প্রাপ্তিকামী মানুষের একটা সম্পর্ক চেতনা জাগে। এভাবে ভয়-ভরসার অনুভূতি থেকে জন্মে দায়িত্ববোধ ও কর্তব্যবুদ্ধি। আর দায়িত্ব চেতনার ও কর্তব্যবোধের প্রসারে ও বিকাশে বিশ্বাস-সংস্কার, রীতি-রেওয়াজ, নীতি আদর্শ, আচার-আচরণ, শাস্ত্র-সমাজ প্রভৃতি নানা স্বেচ্ছাবৃত নিয়ম-নিগড় ও শাস্ত্র-শাসন কালে অক্টোপাস হয়ে উঠেছে। যেখানে অজ্ঞতা, সেখানেই কল্পনার আশ্রয়, কল্পিত ধারণা প্রশ্রয় পেয়ে পরিণত হয় সংস্কারে, আর সংস্কার দৃঢ়মূল হতে তা বিশ্বাস রূপে পায় স্থিতি। পুরোনো শাস্ত্র বর্জন করে অভিজ্ঞতা জ্ঞান-প্রজ্ঞা-বুদ্ধি বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে স্থান-কালের চাহিদানুগ শাস্ত্র যুগে যুগে স্থানে স্থানে বারবার গড়ে উঠেছে। শাস্ত্র যে অলৌকিক নয়— এ পরিবর্জন ও পরিবর্তনই তার প্রমাণ। বিশ্বাসকে যুক্তিগ্রাহ্য করার অপপ্রয়াস পুতুলকে দেবতাজ্ঞানে পূজা করারই নামান্তর মাত্র

এবং ওই বিশ্বাস আর ওই পূজা-দুটোই রসুনের মতো অভিন্ন মূল। আদি অজ্ঞ মানবের মনে যার উদ্ভব সংস্কারপুষ্ট ভীরুচিত্তে যার লালন এবং গোষ্ঠী জীবনে শাস্ত্ররূপে যার স্থায়ী প্রতিষ্ঠা— শৈশবেই ঘরোয়া পরিবেশে লব্ধ বলে এ বিশ্বাস-সংস্কার-শাস্ত্র সত্তার গভীরে জগৎ ও জীবন চেতনার সঙ্গে অভিন্ন অস্তিত্বে বিরাজ করে আমৃত্যু। আবার মানুষ হচ্ছে অমরত্বকামী। কাজেই মৃত্যুতেই হয় না জীবনের অবসান, এ কারণেই ইহ-পরলোকে প্রসারিত জীবনে সুখ-স্বস্তি লক্ষ্যে স্রষ্টার ও ইষ্টশক্তির প্রসন্ন দৃষ্টি লাভের জন্যে ভয়-ভরসা-ভক্তি নামে তোয়াজ-স্তুতি-তোষামোদের চর্যা বরণ করে। এবং বয়োধর্মে ভীরুতার মাত্রাভেদে ওই ধার্মিকতার তথা উপাসনারও মাত্রাভেদ থাকে। সবটাই হচ্ছে মতলব প্রসূত যান্ত্রিক আচরণ। তাই ধার্মিক আস্তিকরা স্ব স্ব বিশ্বাসানুগ নিষ্ঠ হিন্দু, মুসলিম, খ্রিস্টান, বৌদ্ধ বা ইহুদি থাকতে চায়—মনুষ্যত্বের যথাসাধ্য বিকাশ সাধন করে নিবর্ণ-নির্বিশেষ মানুষ হতে চায় না কখনো। কিন্তু ধার্মিকমাত্রই স্বাতন্ত্র্যকামী হয় এবং অন্তরে পোষে বিধর্মে অবজ্ঞা ও বিধর্মী-বিদ্বেষ। ফলে বিভিন্ন ধর্মের আস্তিক মানুষ জীবনের কোন ক্ষেত্রেই কখনো মানুষের জন্যে অকৃত্রিম মিলন-ময়দান তৈরি করতে পারে না।

ঐহিক জীবনসম্পৃক্ত মত, পথ ও দল সময় ও সুযোগ মতো বদলানো যায়— পাপভীতি নেই বলেই। কিন্তু শৈশবে-বাল্যে লব্ধ সংস্কারে লালিত ধর্ম পরিহার করা যায় না বলে ধর্ম মতবাদী মানুষ স্বধর্মী নিয়েই সমাজ করে এবং বিধর্মীর সঙ্গে তাদের ভৌগোলিক, আর্থিক ও রাষ্ট্রিক অবস্থানে সম্বন্ধ থাকে নিঃসম্পর্ক প্রতিবেশীর, প্রতিদ্বন্দ্বীর ও প্রতিযোগীর— যা স্থান কাল বিশেষে দ্বন্দ্ব-সংঘর্ষ-সংঘাতসঙ্কুল। এর সমাধান মিলবে নাস্তিক্যে কিংবা আরোপিত সমাজতন্ত্রে।

কিন্তু জীবনে ও জীবিকায় নিরাপত্তা ও সুখকামী আত্মশক্তিতে আস্থাহীন মানুষ কখনো নাস্তিক হবে না। তাদেরই ভীরু হৃদয়ের ভিখারী বাসনা' পূর্তি লৌকিক-অলৌকিক শক্তির ভয়-ভরসা, কৃপা করুণা ও দান-দাক্ষিণ্য সাপেক্ষ। তাদের আশা-আকাঙ্ক্ষা সংকল্প-সিদ্ধান্ত সবটাই দৈব-ইচ্ছা নির্ভর। 'ইন্‌শাল্লাহ, মাশাল্লাহ, ঈশ্বরেচ্ছায়' —প্রভৃতি উচ্চারণেই তাই তাদের বাঞ্ছা-বাসনা পরিব্যক্ত হয়। কাজেই এমন দুর্বলচিত্ত সদাশঙ্কিত মানুষ নাস্তিক হতেই পারে না। তবু সমাজ-স্বাস্থ্য উন্নত করার জন্যেই এদের গোঁড়ামি ও দৈবনির্ভরতা কমানো এবং শিক্ষার ও সংস্কৃতির প্রসারে পরমতসহিষ্ণুতা বাড়ানো অবশ্যই সম্ভব।

এ সূত্রেই বলতে হয় যে আর্থসামাজিক পীড়ন-শোষণ থেকে তথা সর্বপ্রকার জুলুম থেকে মানুষকে মুক্ত করার ও রাখার আজ অবধি উদ্ভাবিত শ্রেষ্ঠ উপায় হচ্ছে সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠা। এটাই যে মানবমুক্তির চরম ও পরমপন্থা, তা নয়, এতেও ব্যক্তির বা পরিবারের স্বাধীন সচ্ছল ও স্বচ্ছন্দ জীবনযাপনে বাধা রয়েছে— অর্থসম্পদের ক্ষেত্রেও যোগ্যতর উদ্যোগী ব্যক্তির আত্মোন্নয়নের পথ রুদ্ধ।

তবে অশনে বসনে নিবাসে নিদানে অনিশ্চয়তা ঘুচে যায়, —অপুষ্টি-অনাহার অপমৃত্যুর কবলমুক্তি ঘটে। যেখানে জীবনযাত্রার সামগ্রী প্রচুর পর্যাপ্ত নয়, সেখানে শ্রমে-উৎপাদনে সহযোগিতায় ও বণ্টনে বাঁচার-বাঁচানোর ব্যবস্থায় সম্মত থাকাই বাঞ্ছনীয় এবং আবশ্যিক।

বিরুদ্ধবাদীরা বলে, এতে ব্যক্তি মানুষের মন-মানসের স্বচ্ছন্দ লালন ও বিকাশ ব্যাহত হয়, যোগ্যের উদ্বার্তন হয় প্রতিরুদ্ধ। সামন্ত বুর্জোয়ার সমাজে অবাধ শিল্পপুঁজির ও বাণিজ্যপুঁজির প্রসাদই কি সর্বস্তরের সব মানুষের আয়ত্তে আসে, এ চালু সমাজের কি সব আত্মপ্রত্যয়ী মানুষ অবাধে আত্মবিকাশের এবং অর্থ-বিত্ত-বেসাতের ক্ষেত্রে আত্মোন্নয়নের সুযোগ

পায়, পেয়েছে, পাচ্ছে? এ সমাজে অর্থ-বিত্ত-বেসাত থাকে গুটিকয় চালাক চতুর-দক্ষ মানুষের অধিকারে, আর কোটি কোটি মানুষ থাকে অন্নে-বস্ত্রে অনিশ্চয়তার শিকার। আর সুযোগ ও স্বাধীনতা থাকলেও কয়জনই বা পরার্থে ভাবে আর কাজ করে! পাঁচ-দশজন বাক্‌স্বাধীনতা থেকে বঞ্চিত হয় বটে, কিন্তু আর সব সাধারণ মানুষ নিশ্চিন্ত জীবনে মানসদ্বন্দ্বে রুদ্ধ আবেগে ভোগেই না। কেননা আমরা জানি, ক্বচিৎ কেউ জগৎ ও জীবন নিয়ে তত্ত্ব চিন্তা করে, পরের কথা ভাবে।

তাছাড়া নতুন চিন্তা, তত্ত্ব বা তথ্য কেই বা সহ্য করে! নতুন সত্য, নতুন তথ্য বা নতুন তত্ত্ব উচ্চারণ করে কে কোথায় কবে লাঞ্ছিত কিংবা নিহত হয়নি যে সমাজতান্ত্রিক দেশকে বা সমাজকে 'এ্যানিমেল ফার্ম' বলে বিদ্রূপ করা হবে! কাজেই নতুন চিন্তা, সত্য, তথ্য বা তত্ত্ব প্রকাশ-প্রচার করে সব যুগেই সব সময়েই যেমন স্বকালের স্বসমাজের স্বদেশের মানুষের কাছে উপহাস, নিন্দা, বাধা, লাঞ্ছনা, পেয়েছেন জ্ঞানী-বিজ্ঞানী তাত্ত্বিক-মনীষীরা, সমাজতান্ত্রিক দেশে তার অতিরিক্ত কিছু নির্যাতন পান কি? অতএব, বিরুদ্ধপক্ষের অসার যুক্তি উপক্ষেণীয়ই।

নতুন সত্যের, তথ্যের তত্ত্বের সন্ধান যিনি পাবেন, তিনি মৃত্যুর ঝুঁকি নিয়েই তা সানন্দে সগর্বে উচ্চকণ্ঠে উচ্চারণ করে কিংবা লিখে গোপনে বেনামে প্রচার করবেনই। ব্যক্তি লাঞ্ছিত কিংবা নিহত হতে পারেন। কিন্তু তাঁর উচ্চারিত বাণী, আবিষ্কৃত তথ্য, উপলব্ধ তত্ত্ব চিরকালের মানবসম্পদ হয়ে থাকে। কাজেই সমাজতান্ত্রিক দেশেরও মানব মনীষার আবিষ্কার-উদ্ভাবনজাত ফসল থেকে মানবসমাজ বঞ্চিত থাকেনি, থাকবে না। বরং অর্থ-বিত্ত-শিক্ষা-সুযোগের অভাবে কোটি কোটি মানুষের সম্ভাব্য সুপ্তশক্তি প্রয়োগ-প্রকাশ-বিকাশের পথ না পেয়ে চিরকাল নষ্ট হয়েছে ও হচ্ছে। মানবসমাজ বঞ্চিত হচ্ছে তাঁদের কাছে প্রত্যাশিত অবদান থেকে।

আমার ধারণা যুদ্ধের অভিজ্ঞতা ও অনুশোচনা মানুষকে বিবেকী-বিবেচক করে এবং মানুষের মানবিক গুণের, মানুষের প্রতি দায়িত্ব ও কর্তব্য বোধের এবং সহিষ্ণুতার ও সহাবস্থানের প্রবর্তনা দান করে। দুটো বিশ্বযুদ্ধ তার প্রমাণ। এসূত্রে লোকবিনাশীযুদ্ধ শেষে পাণ্ডবদের ও অশোকের অনুশোচনার বৃত্তান্ত স্মর্তব্য। ওই দুটো যুদ্ধে কেবল পৃথিবীর মানচিত্র পরিবর্তিত হয়নি, মানুষের মন ও বুদ্ধি-চেতনা শ্রেয়োপ্রবণ হয়েছে। কার্যত না হোক আন্তরিক না হোক অন্তত নীতিগতভাবে জাতিসংঘের মাধ্যমে বিশ্ব শান্তির জাতিসমূহের সহাবস্থানের সহযোগিতার ও বিশ্বমানব সংহতির অঙ্গীকার ও মানুষ নির্বিশেষে মৌল মানবাধিকার দানের ও রক্ষণের স্বীকৃতি-প্রভৃতি যুদ্ধোত্তর অনুতপ্ত মানুষেরই অবদান। তাই আমার বিশ্বাস জীবন ও সম্পদ বিনাশী ভীষণ ও ব্যাপক তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধ মানুষকে মনে-মননে মনুষ্যত্বের উচ্চতর স্তরে উন্নীত করবে এবং আন্তরিক সমঝোতার মাধ্যমে পৃথিবীর মানব ও মানবিক সমস্যার সমাধানে এগিয়ে আসবে দেশ-জাত-বর্ণ-ধর্ম নির্বিশেষে সব মানুষ। এমনকি হয়তো ভারত-বাংলাদেশ-চীনের বাড়তি লোককে অধিবাস দানেও রাজি হবে অস্ট্রেলিয়া, নিউজিল্যাণ্ড, আফ্রিকা ও আমেরিকার নানা দেশ। বিশ্বব্যাপী দ্বেষ-দ্বন্দ্ব-সংঘর্ষ-সংঘাত সঙ্কুলতা বৃদ্ধি পেয়েছে। পুরোনা নীতি-নিয়মের বিলুপ্তিতে। সামাজিক বন্ধনে ও সমাজানুগত্যে শৈথিল্য, বিশ্বাস-সংস্কারেরও প্রভাব হ্রাসজাত ছল-চাতুরী প্রতারণা বৃদ্ধি সত্ত্বেও তবু সামগ্রিক সামূহিক ও সামষ্টিকভাবে মনুষ্য রুচি, সংস্কৃতির বিকাশ, সংবেদনশীলতার বৃদ্ধি, মনুষ্যবিবেকের প্রাধান্য, যুক্তবাদে আস্থা, ন্যায়বোধের প্রসার, মানবতার বিস্তার এবং মানবিক দায়িত্ব ও কর্তব্যচেতনায় উৎকর্ষ সাধিত হয়েছে ও হচ্ছে বলেই আমার ধারণা। একই দেশে সরকারের অভিপ্রায়ক্রমে মারণাস্ত্রের

উৎকর্ষ সাধনে যেমন মানুষ আগ্রহী, তেমনি একটি প্রাণ বাঁচানোর জন্যে রোগের স্বরূপ নিরূপণে প্রতিষেধক ঔষধ আবিষ্কারে ও অস্ত্র-উপচার কৌশল উদ্ভাবনেও নিষ্ঠ। বিপক্ষনিধনে নিয়োজিত সৈন্যরাই ধৃত আহত শত্রুর চিকিৎসায় নিরত। তাছাড়া একালে প্রায় সব-সচেতন মানুষই যুদ্ধবিরোধী ও বিশ্ব মানবের মঙ্গলকামী। এমন দিনও হয়তো আসবে কারণ ও প্রয়োজন বিচার-বিশ্লেষণ না করে সৈন্যরা কারুর হুকুমে যুদ্ধ করতে রাজি হবে না। এ যুগের গণমানবের আর্থসামাজিক মুক্তির সংগ্রামের যোগ দিয়ে ধনী-সন্তানও স্বেচ্ছায় প্রাণ দিচ্ছে। দুস্থ রুগ্ন মানবতার সেবায় করছে আত্মোসর্গ।

আমি তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধ কামনা করি এ বিশ্বাসে যে অনুতপ্তের অপরাধ বোধ থেকেই সহজেই দ্রুত জাগ্রত হয় বিবেক এবং জাগ্রতবিবেক সদ্বুদ্ধি ও সদিচ্ছা যোগায়। বিশ্বব্যাপী মানবমঙ্গল চিন্তার প্রসারে ও বিকাশেরই ঘটবে মানবতার, মানবিকতার ও মানববাদের বিস্তার। ব্যতিক্রম থাকলেও বিশ্বের মানব মনীষা আজ-বিশ্বমানবের কল্যাণ চিন্তায় নিয়োজিত। জুলুম ও যন্ত্রণা বিরল শান্তি-স্বস্তি ও সুখময় ভাবি মানব জীবন ও সমাজ সম্বন্ধে স্বস্থ ও সুস্থ জীবন প্রত্যাশায় আমি তাই আশ্বস্ত। বাস্তবে পৃথিবীর বিভিন্ন রাষ্ট্রের মধ্যে চালু স্থানিক যুদ্ধে এবং রাষ্ট্রান্তর্গত সরকার ও দ্রোহী জনগণের গেরিলা যুদ্ধেও মরছে লক্ষ লক্ষ মানুষ। তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধান্তে এসব যুদ্ধের কারণ বিলুপ্ত হওয়ারই কথা।

শিক্ষা সম্বন্ধে আমার ধারণা সরল। শিক্ষায় মানুষের জন্মগত অধিকার আমি অবশ্যই স্বীকার করি। তবে সবার বিদ্বান হবার মতো মেধা ও আগ্রহ যে থাকে না তাও অবশ্য স্বীকার্য এবং সমাজ বাঞ্ছিত সুশিক্ষিত সজ্জন মানুষমাত্রই যে স্বশিক্ষিত—এ তত্ত্বেও রয়েছে আমার পূর্ণ আস্থা। তবে সমাজে লক্ষ লক্ষ বিদ্বান বুদ্ধিমান ও হাজারে হাজারে মনীষী মনস্বী থাকলে ভাব-চিন্তা-কর্ম-আচরণের ক্ষেত্রে সমাজ মানে, মাপে ও মাত্রায় কাম্য আদর্শ রূপ পায়। আমি এ জানি যে তাৎপর্যবিরহী জ্ঞান বন্ধ্যা। জ্ঞান তাৎপর্যচেতনা যোগে প্রজ্ঞায় উন্নীত না হলে তা প্রয়োজন মতো প্রবৃত্তি নিয়ন্ত্রণে সমর্থ হয় না। তাই জ্ঞান বুদ্ধি বাড়ায়, অভিজ্ঞতা মানুষকে সতর্ক ও কুশালী করে, কিন্তু চরিত্র গড়ে না। সমাজ ও জীবিকাসম্পৃক্ত জীবন একহারা ঋজু নয়। তাই অনেক শাখার ও প্রশাখার অনেক বিদ্যার কিছু কিছু মৌলিক, প্রাথমিক কিংবা পাল্লবিক জ্ঞান মানুষের জীবনযাত্রায় জীবনপথে জীবিকাক্ষেত্রে আবশ্যিক। আজ কাল উচ্চশিক্ষার ক্ষেত্রে প্রশাখাভিত্তিক গবেষণামূলক বিদ্যায় বিশেষজ্ঞ সৃষ্টির প্রবণতা ক্ষতিকরভাবে বেড়ে গেছে। এতে প্রযুক্তি প্রকৌশল কৃৎকৌশল বিজ্ঞান বাণিজ্য প্রভৃতি শাখায় 'কুশল নিপুণ দক্ষ' কর্মী মেলে বটে কিন্তু মানস অনুশীলন ও মানস পরিচর্যার অভাবে জীবনবোধ ও সংস্কৃতিচেতনা থেকে যায় জড়। এটি একপেশে বা একাঙ্গী শিক্ষা বলে অনেকের অনভিপ্রেত। কৃৎকৌশল-বিজ্ঞান-বাণিজ্য শিক্ষার্থীদের পাঠ্যসূচিতে এক এক বছুরে মাপের ঋজুমানের ও স্বল্প-মাত্রার সমাজতত্ত্বের, ইতিহাসের ও দর্শনের ইতিহাস কিংবা সভ্যতা সংস্কৃতি বিকাশের ধারাবাহিক সংক্ষিপ্ত ইতিবৃত্ত অবশ্য পাঠ্য হিসেবে অন্তর্ভুক্ত রাখা এবং মানববিদ্যা ও সামাজিক বিজ্ঞান শিক্ষার্থীদের জন্যে বিজ্ঞানে বিভিন্ন শাখার বিকাশের ঋজু তথ্যনির্ভর ইতিহাস অবশ্য পাঠ্য করে দেয়া জরুরি বলেই মনে করি। ইতিহাসের সাক্ষ্যে বোঝা যায় মানববিদ্যাই মন-মননের দ্রুত বিকাশ ও চিত্ত-চেতনার উৎকর্ষ ঘটায়।

কেবল রাজনীতিতে নয়, যে- কোন ক্ষেত্রে নেতা ও নেতৃত্ব সম্বন্ধে আমার ধারণা নেতার মনীষা ও চরিত্রবল থাকা আবশ্যিক। নইলে নেতৃত্ব টেকে না। নীতজনের চেয়ে নেতার

বুদ্ধিমত্তা, প্রত্যুৎপন্নমতিত্ব ও দ্রুত ঠিক সিদ্ধান্ত গ্রহণের সামর্থ্য, সময়মতো হুকুম-হুমকি উচ্চারণ করার যোগ্যতা এবং দলীয় দুষ্টজনকে দমন ও দলিত করার সাহস ও কৌশল সর্বোপরি লোকবরেণ্য নেতার ব্যক্তি চরিত্রে শ্রদ্ধেয় গুণাবলী — সত্যপ্রীতি, ন্যায়নিষ্ঠা, সংযম, সাহস, সততা, ক্ষতি স্বীকারের শক্তি, ধৈর্য এবং লক্ষ্য নিষ্ঠা, অবিচল আত্মবিশ্বাস ও তীক্ষ্ণবুদ্ধি থাকা জরুরি। সে নেতাই আদর্শ নেতা যিনি যে-যন্ত্রণা, যে-ক্ষতি, যে -ঝুঁকি নিজের জন্যে কামনা করেন না, তা তাঁর অনুগত জনের জন্যেও বাঞ্ছিত মনে করেন না। যিনি এগিয়ে দিয়ে লেলিয়ে দিয়ে নিজে সরে দাঁড়ান না। যে মানুষের ওপর বিশ্বাস-ভরসা-নির্ভর রাখা যায়, যে মানুষ স্ব স্বার্থে ছল-চাতুরী-প্রতারণার আশ্রয় নিয়ে অনুগত অনুরাগীর আস্থা নষ্ট করবেন না, আগে নিজের ক্ষতি না করে অনুগত জনের ক্ষতির কারণ হবেন না, সে-মানুষই যথার্থ নেতা।

যেহেতু সব ভাব-চিন্তা-কর্ম-আচরণের উৎসে রয়েছে ভোগ-উপভোগের স্থূল সূক্ষ্ম কাঙ্ক্ষা এবং যেহেতু আকাঙ্ক্ষামাত্রই বাস্তবে পূর্ণ হয় না বলে ব্যর্থতার বেদনা, ক্ষতি ও দুর্ভোগ থাকে, সেহেতু কাঙ্ক্ষ্যফল লাভের জন্যে প্রয়োজনের গুরুত্বানুসারে নির্বিচারে ভালো-মন্দ-মাঝারি নীতি ও পন্থা অবলম্বনে মানুষ দ্বিধা করে না। ফলে মানুষ সহজেই নীতিভ্রষ্ট হয়। যে যত বেশি সাফল্যকামী বা লোভী সে তত বেশি তদ্‌বির তক্‌দির বদলের তত্ত্বে আস্থা রাখে এবং দ্বিগুণ উৎসাহে মতলব হাসিল লক্ষ্যে আত্মমর্যাদা পরিহার করে সর্বপ্রকার জঘন্য পন্থায় ও দুর্নীতির আশ্রয়ে কাঙ্ক্ষ্য ফল পেতে চায়। এমন মতলবাজ মানুষ সুযোগসন্ধানী ও সুবিধেবাদী না হয়েই পারে না। শিক্ষিত-অশিক্ষিত বিদ্বান-বুদ্ধিমান পদ ও পদবী যশ ও মান, বিত্ত ও বৃত্তি নির্বিশেষে সমাজে এমন মানুষের সংখ্যাই বেশি। তাই শ্রদ্ধা করার মতো নাম উচ্চারণ বা দেখিয়ে সন্তানকে অনুপ্রাণিত করার মতো ব্যক্তি সমাজে 'লাখে না মিলয় এক'। এ ক্ষেত্রে 'মা গৃধঃ — এ আপ্তবাক্য আজো কেজো এবং মূল্যবান।

আমি নিজের জীবনেই উপলব্ধি করেছি যে পাওয়ার জন্যে প্রলুব্ধ না হয়ে না-চাওয়ার ও না-পাওয়ার ক্ষতি স্বীকারের জেদ ও শক্তি অর্জন করতে পারলেই কেবল বিদ্যাসাগরের মতো শির সমুন্নত রেখে অটুট আত্মমর্যাদা নিয়ে নীতিনিষ্ঠ শ্রদ্ধেয় জীবন-যাপন সম্ভব। এমন মানুষ সম্পদে রিক্ত হলেও অন্তরে থাকে ঋদ্ধ। যারা পরের পদলেহনে তোয়াজে স্তুতিতে তোষামোদে বিত্ত-বেসাত অর্জন করে সমাজে যশ-মান প্রতিষ্ঠা পায়, তাদের চেয়ে কি ওই জেদী অহঙ্কারী মানুষ, অসুখী? তাই বলি, সুখ ও সম্মান কেউ কাউকে দিতে পারে না। সুখ ও আনন্দ পেতে জানতে হয়।

দেখতে শুনতে বলতে করতে যা কুৎসিত, তা পরিহার করে চলা, নিজের জ্ঞান-বুদ্ধি-বিশ্বাসের মাপে যা অসত্য, অন্যায়, অসততা, অসঙ্গত, অবাঞ্ছিত, চিন্তা-কর্ম আচরণে তা এড়িয়ে চলা, সমাজ-সদস্য হিসাবে যথাস্থানে যথাসময়ে যথাপ্রয়োজনে যথাযোগ্য ও যথাসাধ্য নৈতিক-সামাজিক-মানবিক দায়িত্ব ও কর্তব্য পালন করাই সংস্কৃতি। এমনি চেতনাসম্পন্ন মানুষই সংস্কৃতিবান। সর্ব অর্থেই সৌজন্যই সংস্কৃতির নির্যাস।

আর একটি কথা। শুনে শুনে প্রতীচ্যের একশ্রেণীর মানুষের সুখ-স্বস্তি আনন্দ-আরাম-সঙ্কট সম্বন্ধেও আমার একটা মত গড়ে উঠেছে। আমার ধারণা ওরা সত্তার গভীরে জীবনসঙ্কটে তথা চেতনাসঙ্কটে ভুগছে। এ সঙ্কটের মূলে রয়েছে কৌতূহলশূন্যতা ও আসক্তিচ্যুতি। সবটাই যেন জানা-বোঝা-শোনা গেছে, জগৎ ও জীবন সম্বন্ধে তাদের যেন আর কোন জিজ্ঞাসা নেই, তাদের আসক্তি-আকর্ষণও যেন জাগে না কোন কিছুর প্রতি। বলেছি জাগ্রত মুহূর্তগুলোতে

কাঙ্ক্ষাই জীবন-প্রেরণা। এক একটা কাঙ্ক্ষাপূর্তি-অপূর্তির আশা-আকাঙ্ক্ষাই মানুষের দেহ-মনের চালিকাশক্তি। যখন কোন কারণে এ আকাঙ্ক্ষার ও আসক্তির অবসান ঘটে, কোন সুখ-স্বস্তি-আনন্দ আরামের আশ্বাস কোনদিক থেকেই মেলে না, তখন সেই আশা-আশ্বাস-আসক্তিরিক্ত মানুষ আত্মহননে অসহ্য জীবনের ইতি ঘটায়। জিজ্ঞাসাশূন্য, কৌতূহলানন্দরিক্ত, সুন্দর অনুভূতিহৃত বিকৃত রুচি অসুস্থ মানষের লোকের আজ বাঞ্ছিত সব কিছুতে অরুচি ও অনীহা। নিরুদ্দিষ্ট জীবনে অধৈর্য এ মানুষ সর্বক্ষণ কিন্তু আত্মসুখ-স্বস্তি-আনন্দ-আরাম সন্ধানী। তাদের মনেও প্রশ্ন-সুখ তুমি কি, তুমি কোথায় এবং তুমি কেমন। তারাও ভাবে-জীবন কি, জীবন কেন, জীবন নিয়ে কি করতে হয় কি করা উচিত!

কিন্তু তারা আস্থাশূন্য অসুস্থ লোক বলে সাগ্রহে প্রশ্নের উত্তর সন্ধানে উদাসীন। তাই নিত্যকার যন্ত্রণামুক্তির অবচেতন বাঞ্ছা বশে নীতি- নিয়ম ভাঙা পন্থায় অসুস্থ মন ও বিকৃত বুদ্ধি নিয়ে সমকামিতায় ও সিদ্ধিসেবনে স্বস্তি খোঁজে।

বাল্যে কৈশোরে গড়া সুখস্বপ্ন ভেঙ্গে এ রোগ ধীরে বা দ্রুত বিশ্বের শিক্ষিত হৃতোদ্যম দুস্থ বেকার তরুণ সমাজে ছড়িয়ে পড়বেই। এর প্রতিকার নীতিধর্মে বা অধ্যাত্মচিন্তায় মিলবে না। কেন না এ হচ্ছে বাস্তব কারণেই জীবনের ছন্দপতন। প্রাকৃতির নিয়মেই দেহ-মনের স্বাস্থ্য নির্ভর করে নিয়মিত ও পরিমিত কায়িক ও মানসিক শ্রমের উপর। সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রে প্রত্যেক মানুষের নিত্য শ্রমের ও দায়িত্ব-কর্তব্য চেতনার জীবন সুনির্দিষ্ট থাকার কথা। কাজেই দেহ মনের বাঞ্ছিত স্বাস্থ্য অর্জন ও রক্ষণ ওই সমাজেই সম্ভব। আমরা জানি, চিন্তারোগের দারু নেই, স্বস্তির মতো সুখ নেই। আনন্দ-সুন্দর দেহমনের স্বাস্থ্যের লাবণ্য প্রকাশ পায় চিন্তায় কর্মে -আচরণেও।

আমার শেষ কথা এই, আমরা প্রতীচ্য মানুষের জীবনাচারকে সর্বোৎকৃষ্ট জেনে এবং আদর্শ মেনে জীবন-জীবিকার সর্বক্ষেত্রে প্রতীচ্য আদলে ব্যবহারিক ও মানসজীবন রচনায় আগ্রহী এবং অন্ধ -অনুকরণ আর অনুসরণ— যোগ্যতাকেই ব্যক্তিক ও জাতিক উন্নতি বলে বিশ্বাস করে তৃপ্ত ও তুষ্ট। অথচ অনুকরণ দিয়ে নয়, উন্নতির মানের ও মাত্রার মূল্যায়ন হয় মৌলিকতার, স্বাতন্ত্র্যের, বিশিষ্টতার ও উৎকর্ষজাত অনন্যতার মাপে। দেশের প্রাকৃতিক প্রতিবেশের ও সম্পদের পরিপ্রেক্ষিতে চিন্তা চেতনায় কর্মে -আচরণে কালানুগত জীবন-জীবিকার ক্ষেত্রে সময়ের চাহিদা মিটিয়ে জীবনাচারের ও সামগ্রিক পরিবেশের উৎকর্ষ সাধনই উন্নতি।

অতএব, আমার জীবনে দার্শনিক উপলব্ধির নির্যাস এই :

১. ব্যক্তির চেতনায় তার জগতের জীবনের ও সমাজের বাঞ্ছিত রূপস্বরূপই তার জীবনদর্শন।

২. জন্ম-মৃত্যুতেই জীবনের আদি-অন্ত সীমিত। জাগ্রত মুহূর্তগুলোতে অনুভূত চেতনার সমষ্টিই জীবন। মানুষের দেহে মনে সুপ্ত থাকে অপরিমেয় শক্তি ও সম্ভাবনা। সচেতন অনুশীলনের মাধ্যমে তার বিকাশসাধন না করলে জীবনের পূর্ণ রূপ প্রকট হয় না। বৃথা ও ব্যর্থ হয় সম্ভাবনাময় জীবন।

৩.মানুষের ভালত্ব মন্দত্ব আপেক্ষিক। যে খুনি ডাকাত নরহত্যায় অর্থসম্পদ সংগ্রহ করে, সেও প্রেমময় স্বামী, স্নেহময় পিতা, পিতামাতার অনুগত সেবক। তার এ দুটো রূপই তো সত্য।

৪.সমাজ সদস্য মাত্রেরই সমস্বার্থে স্বাধিকারে সহিষ্ণুতায় সহযোগিতায় সহাবস্থানের আগ্রহ ও অঙ্গীকার থাকা আবশ্যিক। নইলে দুষ্ট প্রবলের হুকুম -হুমকি -হামলায় দুষ্ট- দুর্জন দুর্বৃত্ত- দুঃশাসকের অনাচারে অত্যাচারে জনজীবন বিপন্ন থাকে। সমাজতন্ত্রই আপাতত শ্রেষ্ঠ সমাজ ও রাষ্ট্র ব্যবস্থা।

৫. নতুন চিন্তাচেতনা, অবিষ্কার উদ্ভাবনমাত্রই ব্যক্তি মানসের প্রসূন। অতএব, সংস্কৃতিরও স্রষ্টা ব্যক্তি। ব্যক্তিক সৃষ্টিই দেশের জাতির, মানুষের সম্পদ। একের মানসসৃষ্টি অনুকারক অনুসারকের দৈশিক, জাতিক কিংবা মানবিক আচার-সংস্কৃতি রূপে চালু হয়। বহু একক ব্যক্তির অবদানে গড়ে ওঠে বিশেষ ধরনের জীবনাচার ও জীবনদর্শন।

৬. আস্তিক্য ও ধর্মমত বা শাস্ত্র মানব সভ্যতার উন্মেষকালে অতি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে। ধর্মমত, গোষ্ঠী, গোত্র, কৌমকে অভিন্ন মতের ও জীবনাচারের একক সম্প্রদায় গঠন করে স্বধর্মীর জাতি চেতনায় মানুষকে জাগ্রত ও ঐক্যবদ্ধ করেছিল। কালান্তরে আজ বিকশিত সমাজের এ স্তরে আস্তিক ও শাস্ত্রমানা মানুষ নির্বিশেষ মানুষের মিলনে মুখ্য বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছে। আত্মবিশ্বাসহীন কাঙ্ক্ষী মানুষ অবশ্য চিরকালই থাকবে দৈবনির্ভর। কাজেই আস্তিক্য ঘুচানো যাবে না, তবে তাদের সহিষ্ণুতায় ও সহাবস্থানে অভ্যস্ত করাতে হবে। সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থায় ধর্মবোধকে অগ্রাহ্য করা কিংবা ঐহিক জীবনবাদে গুরুত্ব দিয়ে ধর্মমতকে ব্যক্তিক বলে লঘু করে দেখা এখনকার সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রে ও জনকল্যাণকামী রাষ্ট্রে কমবেশি স্বীকৃত নীতি।

৭.শাস্ত্র নয়, আত্মবোধ ও আত্মমর্যাদা চেতনাই মানুষকে বিবেকী বিবেচক তথা নীতিনিষ্ঠ রাখে। এ মানুষই হয় চরিত্রবান। কেননা, এ মানুষ জ্ঞান বুদ্ধি-বিশ্বাসের মাপে যা অন্যায় অসঙ্গত, তা তার চিন্তা -কর্ম আচরণে পরিহার করে চলে। এক হিসেবে সংস্কৃতিবান সুজন ও চরিত্রবান অভিন্নাত্মক ও অভিন্নার্থক।

৮. জ্ঞানকে প্রজ্ঞায় উন্নীত করাই শিক্ষার লক্ষ্য, অন্য কথায় মানসোৎকর্ষসাধনই শিক্ষার মূল আদি উদ্দেশ্য। বৃত্তিমূলক শিক্ষা সমাজ -বিকাশের ধারায় পরবর্তী যোজনা। চিত্তবৃত্তির বিকাশ সাধনই লক্ষ্য বলে সুশিক্ষা মাত্রই স্বশিক্ষা।

৯. মানুষ চালু নিয়মনীতির ও রীতিপদ্ধতির ছকে বাঁধা নিস্তরঙ্গ নিশ্চিন্ত জীবনাচারে অভ্যস্ত বলে, সে নতুন ভাব-চিন্তা কর্ম -আচরণ ও নীতি নিয়ম প্রভৃতিকে অকারণ উপদ্রব বলে মনে করে। তাই সাধারণ মানুষ নতুন ভীরু এবং নতুনের প্রতিরোধক। ফলে দুনিয়ার কোথাও কোন রাষ্ট্রে বা সমাজেই বাক্-স্বাধীনতা ছিল না, আজো নেই। সরকার সয় তো জনগণ সয় না। একদল, এক সম্প্রদায় শুনতে রাজি তো অন্য দল অন্য সম্প্রদায় মারমুখো হয়ে ওঠে। বাস্তবে অভ্যস্ত শাস্ত্র সমাজ নীতি-নিয়ম বিরোধী নতুন সত্য, নতুন তথ্য বা নতুন তত্ত্ব উচ্চারণ করে কেউ কোথাও কখনো অভ্যর্থিত হন নি, যদিও কোন নতুন সত্য, তত্ত্ব, তথ্য বা আবিষ্কার -উদ্ভাবন মানুষের অ-কল্যাণ করে নি বরং সভ্যতা সংস্কৃতির বিকাশ সাধন করেছে, হয়েছে প্রগতির সহায়ক ও পরিচায়ক। পুরানো নিয়ম নীতি পথ -পদ্ধতি, হাতিয়ার-কৌশল, জীবনাচার প্রভৃতির উপযোগে সন্দিহান, বিরক্ত, জিজ্ঞাসু আত্মপ্রত্যয়ী, আবিষ্কার, উদ্ভাবন প্রবণ দ্রোহীই পিতৃধর্মের ও সমাজের নিয়ম নীতি আচার আচরণ পরিহার করে স্বকালের মানুষের কালিক প্রয়োজনে নতুন নিয়ম নীতি আদর্শ প্রবর্তন করে। তাই শাস্ত্র ও সমাজ, সংস্কৃতি ও সভ্যতা, জীবনচেতনা ও জীবিকা-পদ্ধতি মাত্রই দ্রোহজাত।

১০. নির্লোভতা ও প্রয়োজনে ক্ষতি স্বীকারের শক্তিই ব্যক্তিজীবনে অপরাজেয় শক্তি।

১১. নিজের জ্ঞান-বুদ্ধি -বিশ্বাস অনুসারে চিন্তায়-কর্মে-আচরণে জীবনের সর্বক্ষেত্রে যে পরের প্রতি জুলুম পরিহার করে চলে এবং পরিজন-প্রতিবেশীর প্রতি বাঞ্ছিত বা প্রত্যাশিত দায়িত্ব ও কর্তব্য যথাসাধ্য পালন করে, সে যুগপৎ সংস্কৃতিবান, চরিত্রবান ও সুজন। অতএব, সর্বাত্মক সৌজন্যই সংস্কৃতি।

১২. কৌতুহলহীনতা ও আকাঙ্ক্ষাশূন্যতা থেকেই আধির উৎপত্তি।

১৩. অনুকরণে নয়, জীবনের প্রয়োজনে সজ্ঞান সৃষ্টিই উন্নতির লক্ষণ।

১৪. স্বামীর কর্তৃত্ব থেকে, পারিবারিক বাধ্যতামূলক শ্রমজীবিতা ও দাসীবৃত্তি থেকে এবং চালু যৌনজীবন সংস্কার থেকে নারীকে অবশ্যই মুক্ত করতে হবে। স্ব স্ব ও যৌথ প্রয়োজনে নারীপুরুষ উভয়কেই অর্থকর শ্রমে, যৌনমিলনে, সন্তান প্রজননে ও পালনে স্বেচ্ছা-সম্মত থাকতে হবে। বাঞ্ছিত সামাজিক মনুষ্যত্বের সম্ভাব্য বিকাশ ও উৎকর্ষ কেবল তখনই বাস্তবায়িত হবে। এর জন্যে প্রয়োজন ইহবাদের তথা ঐহিক জীবনতত্ত্বের আনুগত্য।

১৫. প্রাণী হিসেবে মানুষের জীবন স্থানের, কালের, কর্মের, আচারের ও আচরণের সীমায় নিবদ্ধ বটে, তবে তার মা বাপ-ভাই বোন-সন্তানের প্রতি মমতায়, দায়িত্বচেতনায় ও কর্তব্যবোধে যেমন, তেমনি মানুষ নির্বিশেষের প্রতি চিন্তায়-চেতনায় অনুভবে বিশ্বমানবিক আত্মীয়তা বোধ ও ঐহিক কল্যাণকামিতা অনুশীলনের যন্ত্র যুগে ও যন্ত্রজগতে ব্যক্তিক জীবন ও বৈশ্বিকচেতনা সম্পৃক্ত আন্তর্জাতিক সম্বন্ধনির্ভর। ব্যক্তি মানুষকে তাই ইহবাদী তথা ঐহিক শ্রেয়ো ও শান্তিবাদী হতেই হবে।

স্বাতন্ত্র্য, সংস্কার, সংস্কৃতি ও রাষ্ট্রিক জাতীয়তা

পণ্ডিত ডক্টর সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় [রবীন্দ্রনাথও] বলতেন, বিশ্বাস করতেন এবং চালু করবারও চেষ্টা করতেন যে ভারতবর্ষের মানুষ দেশগত পরিচয়ে হিন্দু এবং ধর্মমতগত পরিচয়ে মুসলিম, বৌদ্ধ, খ্রিস্টান, শৈব, শাক্ত প্রভৃতি। সিন্ধু [নদ] থেকে হিন্দু > হিন্দ্> ইন্দ্>ইন্দো [হিন্দুকুশ, হিন্দুস্তান, হিন্দু,, [Indies, India]। কাজেই হিন্দু, হিন্দুস্তান, হিন্দু কোন ধর্ম বা শাস্ত্র সম্পৃক্ত শব্দ নয়। সুনীতি চট্টোপাধ্যায়ের কথাটায়, যৌক্তিক হলেও, কেউ কান দেয়নি। কেবল ডক্টর মুহম্মদ শহীদুল্লাহ-ই শেষ বয়সে ভাষা -পরিচয়ের ক্ষেত্রে হিন্দু ইউরোপীয়ান 'পরিভাষাটি ''ইণ্ডো-ইউরোপীয়ান -এর পরিবর্তে সাগ্রহে চালু করেন। অথচ প্রভু ইংরেজ -উচ্চারিত 'ইন্ডিয়া, ও ইন্ডিয়ান নামে দেশ ও বাসিন্দা পরিচয়ে কারো আপত্তি বা সংকোচ ছিল না কখনো-যদিও দুটোই হিন্দুর ও হিন্দুর [সিন্ধুর] বিদেশির মুখে বিকৃত উচ্চারণজাত শব্দমাত্র।

বিদ্যায়বিত্তে-মানে- মর্যাদায় যারা বড়, মানুষ তাদের অনুকরণে আত্মোন্নয়ন করে ধন্য হতে চায়। সেজন্য প্রায় নির্বিচারে বড় ব্যক্তির ও জাতির অনুকরণে -অনুসরণে আগ্রহী হয় হীনমন্য ব্যক্তি ও জাতি। অবশ্য সে-বড় জাতি বা সম্প্রদায় প্রতিবেশী হলে আত্মাভিমান ও আত্মসম্মান বশে তথা স্বাতন্ত্র্যচেতনার দরুন তার সঙ্গে সাদৃশ্য সর্বক্ষণ পরিহার করেই চলে হীনমন্যরা।

ব্রিটিশ আমলে আমরা সাধ্যমতো ব্রিটিশের তথা ইউরোপের আচার আচরণপোশাকাদির অনুকরণ করেছি, এখনো করি। আবার স্বাধীনতাকামী দেশপ্রেমীরা ব্রিটিশ বিদ্বেষ বশে সে সব আচার-আচরণ পোশাক পরিহারও করেছিলেন। ব্রিটিশ আমাদের শাসক ছিল, প্রতিবেশী ছিল না ! রাজধানী ব্যতীত অন্যত্র ব্রিটিশ নারী -পুরুষ ছিল দুলর্ভ-দর্শন। সাহেব -মেম জীবনে দেখেনি তেমন লক্ষ লক্ষ নারীপুরুষ ছিল আমাদের অজপাড়াগাঁয়ে। এ সব নানা কারণে বিজাতি বিদেশি -বিভাষী -বিধর্মী শাসক -শোষক প্রাক্তন প্রভু হওয়া সত্ত্বেও আমাদের মনের মর্মের গহনে আজো রয়ে গেছে ব্রিটিশ প্রীতি।

ভারতে শাসক তুর্কী-মুঘল ও তাদের স্বধর্মীরা ছিল শাসিতদের প্রতিবেশী। তাই মনস্তাত্ত্বিক কারণেই শাস্ত্রের, সমাজের, সংস্কারের, সংস্কৃতির,আচারের, আচরণের প্রতিবেশীসুলভ স্বাতন্ত্র্য চেতনা ছিল শাসক শাসিতদের মনে অত্যন্ত প্রবল। তবু শাসিতের হীনমন্যতাজাত উচ্চাকাঙ্ক্ষার ফলে শহরে বন্দরে শাসিতজন ছোঁয়াছুঁয়ির শঙ্কা-সংকোচ ত্যাগ করে বিদ্যায় বিত্তেমানে সম্মানেসংস্কৃতিতে শ্রেষ্ঠ বলে প্রতীয়মান শাসকের আচারেপোশাকে সামান্য অনুকরণ করেছে বটে, কিন্তু সাধারণ ভাবে শাসিত জনেরা স্বাতন্ত্র্য রক্ষায় ছিল সচেতন এবং গাঁয়ে -গঞ্জে এ স্বাতন্ত্র্যচেতনা ছিল প্রবল ও দুর্লঙ্ঘ্য। আবার শাসকগোষ্ঠীর দেশজ স্বাধর্মীরাও অজ্ঞতা -অক্ষমতার এবং উনজন হিসেবে প্রতিবেশিক কারণে অমুসলিম পূর্বপুরুষের আচার-আচরণের ও বিশ্বাস -সংস্কারের, ঐতিহ্যের ও অভ্যাসের কবলমুক্ত হতে পারেনি বাঞ্ছিত ও প্রত্যাশিত মাত্রায়। তবু সংস্কৃতজ শব্দ হওয়া সত্ত্বেও বাঙালী হিন্দুরা পানি উচ্চারণ করবেই না, স্পর্শ করে অনার্য জল। মুসলমানও জল খেলই না কখনো। অসুবিধা সত্ত্বেও হিন্দুরা নলহীন লোটা -ডাবা সমতল থালা আঁকড়ে রাখল, বদনা বাসন-হুঁকা লুঙ্গি নিলই না।

কলাপাতা ব্যবহারেও ঐকমত্য হল না হিন্দু -মুসলিমের। ঘর-দোর নির্মাণেও রাখল তারা স্বাতন্ত্র্য চিহ্ন। এমনকি পাগড়িউষ্ণীষেও পার্থক্য রয়েছে বিভিন্ন সম্প্রদায়ের। সবাইকে টেক্কা দিয়ে কনিষ্ঠ শিখ সম্প্রদায়ই উদ্ভাবন ও নির্মাণ করেছে সুন্দরতম পাগড়ি। মধ্য এশীয় কুশান-পোশাক ইজার কুর্তা সালওয়ার-কামিজ এবং তহ্‌বন মধ্য এশিয়া ও ইরান হয়ে তুর্কী -মুঘল আমলে পুনরায় ভারতে চালু হলে শিখ, কিছু রাজপুত আর রাজধানীবাসীরা তা বরণ করলেও এবং উত্তরীয় পরিহার করে কুর্তা -কামিজ পরলেও সে সব ক্ষেত্রেও সাদৃশ্য এড়িয়ে চলার ও পার্থক্য সৃষ্টির প্রয়াস ছিল অবিরল। যেমন পার্থক্য ও স্বাতন্ত্র্য প্রকট ছিল দাড়ি-গোঁফের আকারে -প্রকারেও। এগুলো এবং ইত্যাকারের আরো বহু আপাততুচ্ছ শাস্ত্রিক-সামাজিক আচারিক-সাংস্কৃতিক সংস্কারেবিশ্বাসে অনড় আস্থাই এদের পার্থক্য ও স্বাতন্ত্র্য চিহ্ন বা জীবনের দার্শনিকআদর্শিক অভিব্যক্তি হওয়া সত্ত্বেও ব্রিটিশ আমলে কংগ্রেস এগুলোকে তুচ্ছ পার্থক্য জেনে একক জীতয়তাবোধ জাগানোর চেষ্টা করেছিল। কিন্ত এগুলোই পরিণামে কংগ্রেসী জাতীয়তাবোধ বৃথা ও ব্যর্থ করে দিয়েছিল। ভারত-বাসীর স্বধর্মীচেতনা ও স্বাতন্ত্র্য বুদ্ধি যেখানে ছিল, সেখানেই রয়ে গেল। এর মধ্যেই ভাঙা-গড়ার মাধ্যমে রক্তাক্ত স্বাধীনতা এল বটে, কিন্তু জাতিবৈর থেকেই গেল। রয়ে গেল আচরের বাধা ও আত্মীয়তার ব্যবধান। স্বাতন্ত্র্যের দুর্গ আজো অজেয়। থেকেই গেল শোষিত মানবতার নিঃস্বতা, জীবনেজীবিকায় অনিশ্চয়তা ও নুন ফেনের, ডালভাতের অভাব, অনাহার, মৃত্যু, অপুষ্টিজাত রোগের ও অকালে অপমৃত্যুর বাহুল্য।

বোঝা গেল, গোঁজামিলে গোল মেটে না সমাধান মেলে না কোন সমস্যার। শুকায় না কোন মর্মমূলের ক্ষত, পরিহার করে না শ্রেয়ো-চেতনা বশেও কোন ঐতিহ্য। আজকের দুনিয়ায়

যেহেতু স্বৈররাজার রাজ্য নেই, রাষ্ট্রে সমনাগরিকত্বে অধিবাসী নির্বিশেষের অধিকার আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃত, কোথাও কোথাও ব্যতিক্রম থাকলেও নাগরিকের সমাধিকার প্রতিষ্ঠা অঙ্গীকার করে বঞ্চিত মানুষ স্বাধিকার আদায়ের সংগ্রামে নিরত এবং যেহেতু আজকের যন্ত্রনিয়ন্ত্রিত বিশ্বে অভিন্ন ভাষার, রক্তের, ধর্মের, বর্ণের মানুষের একক রাষ্ট্র অসম্ভব, সেহেতু সাম্প্রত-কালের প্রাগ্রসর চিন্তা-চেতনার ও জ্ঞান-প্রজ্ঞা-যুক্তি-বুদ্ধি-বিবেকের অনুগত হয়ে অভিন্ন স্বার্থে রাষ্ট্রিক জাতীয়তা মনে মননে অঙ্গীকার ও বরণ করা আজকের মানুষের পক্ষে আবশ্যিক। আজকের দিনে প্রত্যেক মানুষের শাস্ত্রিক ও সামাজিক বিশ্বাস-সংস্কার ও আচার -আচরণ একান্তভাবে ব্যক্তিক ও ঘরোয়া পর্যায়ে সীমিত রাখা রাষ্ট্রিক ও যৌথ জীবনে মানস-স্বাস্থ্যের জন্যে দরকার। কিন্তু মানুষ স্ব স্ব গোষ্ঠীর ঐতিহ্য সচেতন ও স্বাতন্ত্র্যপ্রিয় বলেই এ ব্যবস্থা উদারতম বুর্জোয়া গণতন্ত্রেও যে সম্ভব নয়, তার নজির প্রতীচ্য গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রেও প্রকট। তাই নাস্তিক্য না হলেও সর্বক্ষেত্রে সেক্যুলার দৃষ্টিভঙ্গি গ্রহণ আবশ্যিক এবং সমাজবাদ অঙ্গীকার করলে তার বাস্তবায়নও সহজ ও স্বাভাবিক হবে। কিন্তু নিতান্ত সামান্য সেক্যুলার চেতনার অভাব যে বিচ্ছেদের, বিচ্ছিন্নতার, বিভেদের ও অনাত্মীয়তার দেয়াল অলঙ্ঘ্য করে রাখে, একটি তুচ্ছ দৃষ্টান্তই তার সাক্ষ্যপ্রমাণ হিসেবে উপস্থাপন করছি।

জনাব জাহাঙ্গীর ও শ্রী কনক —এ দুটো নামের একটায় 'জনাব, উচ্চারিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই এক ব্যক্তির বিশ্বাস- সংস্কার, শাস্ত্র-সমাজ, আচার-আচরণ-পোশাক তথা ব্যবহারিক জীবনাচার এবং তেমনি শ্রী উচ্চারিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই অপর ব্যক্তির শাস্ত্র-সমাজ -বিশ্বাস-সংস্কার ও প্রাত্যহিক জীবনাচার মানসচক্ষে জাজ্জ্বল্যমান হয়ে ওঠে। ফলে এ দুটো ব্যক্তি যে মনে মতে এবং আদর্শে ও লক্ষ্যচেতনায় ভিন্ন, তা কোন প্রকারেই ভুলে থাকা যায় না।

শ্রী ও জনাব উচ্চারণ মাত্রই বক্তার মনের মধ্যে যে উভয়ের সর্বাত্মক স্বাতন্ত্র্য স্বীকৃত, —তা অভিব্যক্তি পায়। এটি রাষ্ট্রবাসী সব মানুষকে সমান ও অভিন্নজাতিভুক্ত ভাবার পরিপন্থী। রেললাইনের মতো বিভিন্ন ধর্মাবলম্বী মানুষ যে- চিরবিচ্ছিন্ন এবং স্বাতন্ত্র্যে ও লক্ষ্যে পৃথক তা এমনি তুচ্ছ শব্দেও প্রকট হয়ে ওঠে। ভারতে তাই শ্রী-কে সর্বজনীন করেছে, বাঙলাদেশেও জনাব বা শ্রীকে গ্রহণ করা চলে। অভিপ্রায়যুক্ত প্রয়োগই বোবা শব্দকে অভিধা দান করে। এ বিষয়ে কারো মনে দ্বিধা-দ্বন্দ্ব থাকা উচিত নয়। জনাব [মাননীয়/মহাশয়] আরবী শব্দ হলেও আরবী ভাষীরা ব্যবহার করে না, করে ইরানীরা, তেমনি শ্রী, এখন আর লক্ষ্মী সরস্বতী নন। তুচ্ছ একটি কণা জড়িত আগুন যেমন গোটা পাড়া পোড়াতে পারে, দাবানল যেমন পারে গোটা অরণ্য ভস্ম করতে, তেমনি এসব মানস-সংস্কার ও রাষ্ট্রিক জীবনে বিপর্যয় ঘটাতে পারে—আজকের বিশ্বে দক্ষিণ আফ্রিকায়, যুক্তরাষ্ট্রে, পাকিস্তানে, শ্রীলঙ্কায় কিংবা ভারতে বর্ণ ধর্ম বিদ্বেষ প্রসূত সে -সমস্যাই প্রকট এবং সে সমস্যার মূলে রয়েছে মানুষকে পর করার ও পর -ভাবার আপাত তুচ্ছ কারণ—বিষম আচরণের শিকড়।

সাধারণভাবে বলতে গেলে রাষ্ট্রে প্রবলপক্ষের তথা অধিজনের অবিবেক-সুলভ কথা ও কর্মই উনজনের মন ভাঙে। যেমন রাষ্ট্রিক বা সরকারি নীতিতেনিদর্শনে কিংবা ঐতিহ্য স্মরণে যদি অধিজনের গৌরবগর্বের ঐতিহ্য কিংবা শাস্ত্রের বিষয় বা প্রতীক প্রাধ্যান্য পায়, তাহলে তার সঙ্গে উনজনের সম্বন্ধ সূত্রের বন্ধন থাকে না। ফলে অভিন্ন আবেগঅনুভব উপলব্ধি জাগে না। এ কারণেই ইউরোপীয় রাষ্ট্রে ইহুদীরা চিরকালই নিজেদের স্বদেশে প্রবাসী বলেই জানত,

পাকিস্তানে অমুসলিমরা চাঁদ-তারা লাঞ্ছিত পতাকা ইসলাম প্রতীক বলেই নিজেদের বলে ভাবতে পারে না। একই কারণে, অশোক স্তম্ভ ও চক্র ভারতীয় অহিন্দুকে অনুপ্রাণিত করে না। কজেই আধুনিক রাষ্ট্রে কারো গৌত্রিক -শাস্ত্রিক ঐতিহ্য ও প্রতীক পরিহার করে সর্বজনগ্রাহ্য ও সেক্যুলার নীতি -আদর্শ ও প্রতীক গ্রহণই জাতীয়তাবোধ ও জাতিচেতনা জাগানো ও দৃঢ়মূল করার প্রকৃষ্ট পন্থা। নানা বর্ণের, ধর্মের, গোত্রের, ভাষার নাগরিক অধ্যুষিত আধুনিক রাষ্ট্রে রাষ্ট্রিক, সরকারি ও প্রাশাসনিক নীতি -নিয়ম ঐতিহ্য-আদর্শ ও প্রতীক গ্রহণের ক্ষেত্রে রাষ্ট্রে নাগরিকের মধ্যে অভিন্নমূল রশুনের সংহতি ও স্বার্থ চেতনা জাগানো ও রক্ষণ লক্ষ্যে ভাব-চিন্তা -কর্ম -আচরণ নিয়ন্ত্রিত ও নিয়মিত করা আবশ্যিক ও জরুরি। এভাবেই কেবল অভিন্ন জাতি -চেতনা এব'ং জাতীয় স্বার্থ ও দায়িত্ববোধ ভিত্তিক রাষ্ট্রিক জাতীয়তার বন্ধন সুদৃঢ় করা সম্ভব।

সংস্কৃতি ও অপসংস্কৃতি

সহজাত বৃত্তি-প্রবৃত্তিচালিত প্রকৃতিনির্ভর প্রাণীর অর্জিত আচরণই সংস্কৃতি। সচেতন অবচেতন, জ্ঞাত-অজ্ঞাত, দৃশ্য -অদৃশ্য প্রয়োজনে যা কিছু অনুকরণে অনুসরণে এবং আবিষ্কারে উদ্ভাবনে অর্জিত ও আয় হয় তাই সংস্কৃতিজ সম্পদ। এ তাৎপর্যে সংস্কৃতি মানসচাহিদা ও উপলব্ধিজাত সম্পদ। প্রয়োজন-চেতনা ও উপলব্ধি মাত্রই যেহেতু মানস প্রক্রিয়াজাত, সেহেতু সংস্কৃতি মানসপ্রসূন। সংস্কৃতির যে অংশ ব্যবহারিক জীবনে কর্ম -আচরণ ও বস্তু-যন্ত্র-হাতিয়াররূপে বাস্তব ও দৃষ্টি-গ্রাহ্য, তাও ওই মানস চাহিদা, কল্পনা ও পরিকল্পনা প্রসৃত। অতএব, সংস্কৃতির প্রকাশবিকাশ অন্তরে বাইরে সমভাবেই ঘটে। অন্তরে যা অনঙ্গ ভাব-চিন্তারূপে মনোজগতের দিগন্ত প্রসারিত করে, বাইরে তা নব নব নির্মিত বস্তু-যন্ত্র এবং উদ্ভাবিত উপায়— পদ্ধতিরূপে জীবনাচারে স্বাচ্ছন্দ্য ও সাচ্ছল্য আনে। কাজেই সংস্কৃতির দুই রূপ— আন্তঃসংস্কৃতি ও বহিঃসংস্কৃতি। আবার সংস্কৃতির প্রসার, উৎকর্ষ ও বৈচিত্র্য ঘটে দুভাবে : সৃজনে ও গ্রহণে। আবিষ্কারে ও উদ্ভাবনে যা লব্ধ ও লভ্য সে -সংস্কৃতি সৃষ্ট, আর যা অপর থেকে অনুকৃত ও অনুসৃত, যা অনায়াসে লব্ধ বা প্রাপ্ত সে সংস্কৃতি বৃত। বৃত সংস্কৃতি আত্মীকৃত হয় না বলে ব্যক্তির বা জাতির বন্ধ্যাত্ব ঘুচায় না, সংস্কৃতি ক্ষেত্রে সৃষ্টিশীলতাই চলমান জীবনে প্রগতিপ্রবাহ প্রবল রাখে।

এ-ও লক্ষণীয় যে সংস্কৃতির, -সৃষ্টির উন্মেষ ব্যক্তিমনেই। ব্যক্তির আবিষ্কার উদ্ভাবনসৃজন, এমনকি অনুকৃত কর্ম-আচরণই পরিবারের, গোত্রের, সমাজের ও জাতির অন্তর্ভুক্ত লোকেরা অনুকরণ -অনুসরণ করে বলে তা গোত্রীয়, জাতীয় বা দেশীয় সংস্কৃতি নামে পরিচিত হয়। অতএব, একের সৃষ্টি অন্যদের পক্ষে অনুকৃত কিংবা অনুসৃত আচার-আচরণ মাত্র। এ তাৎপর্যে ব্যক্তিক সৃষ্টি জনগ্রাহ্য ও জনপ্রিয় হয়ে কালক্রমে জাতীয় সংস্কৃতি নামে হয় অভিহিত। এভাবে একের সংস্কৃতি অন্যের কাছে আচার মাত্র। সুতরাং সংস্কৃতির স্থিতি লোকাচারে এবং এ তাৎপর্যেই সংস্কৃতি ও জীবনাচার অভিন্ন এবং নব নব যন্ত্রের উদ্ভাবনে ও উৎকর্ষে জীবিকা-পদ্ধতির পরিবর্তন, উন্নয়ন, উৎকর্ষ ও শ্রমের লাঘব এবং মানুষের কর্মকৌশলের, শক্তির ও

পদ্ধতির পরিবর্তন, উন্নয়ন, উৎকর্ষ ও শ্রমের লাঘব এবং মানুষের কর্মকৌশলের, শক্তির ও সাধ্যের প্রসার ঘটে বলেই বিদ্বানরা হাতিয়ারের, উৎপাদনের ও সংস্কৃতির ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক, অন্তরঙ্গ অবস্থান বা অঙ্গাঙ্গী সম্বন্ধ স্বীকার করেন। হাতিয়ারের তথা যন্ত্রের উৎকর্ষে পরিবর্তনে জীবনযাত্রায় ও জীবনাচারে পরিবর্তন আবশ্যিক হয়ে পড়ে। তাই সামাজিক সম্পর্কে, আচারে, আচরণে, মনেমানসে, রুচিতে পরিবর্তনও হয় অবশ্যম্ভাবী।

২। বুনো-বর্বর-ভব্য মানব প্রজাতিমাত্রেরই কিছু না কিছু অর্জিত আচরণ তথা সংস্কৃতি রয়েছে। কিন্তু তা বাঞ্ছিতমাত্রায় কালিক উৎকর্ষ না পাওয়ায় প্রত্যাশিত মানের না হওয়ায় আমরা সে-সব সামান্য মাত্রার তুচ্ছ সংস্কৃতি হিসেবে ধরি নে। চলমান জীবনে যে সংস্কৃতি শহুরে শিক্ষিত মানুষের স্বকালের স্বদেশের স্ব-সমাজের মানুষের স্থান-কাল রুচিগত জীবনে নব উদ্ভূত সমস্যার সমাধানে, নব অনুভূত প্রয়োজন পূরণে, নবলব্ধ চেতনার রূপায়ণে কিংবা নব আবিষ্কৃত তথ্যের ও নব উদ্ভাবিত হাতিয়ারের বাস্তবায়নে সঙ্কট সৃষ্টি করে, অনুকরণে অনুসরণে যে সংস্কৃতির অসঙ্গতি উৎকট হয়ে ওঠে, কিংবা আকাঙ্ক্ষার ও সামর্থ্যের সমতা ব্যাহত করে, তখনই সে -'সংস্কৃতির সংকট' সমাজমনকে করে আলোড়িত; জিগির ওঠে অবক্ষয় ও অপসংস্কৃতি প্রতিরোধের। বলেছি, একের চিন্তা-চেতনার প্রসূন, আবিষ্কার উদ্ভাবনের ফল, অন্যদের ব্যবহারের, আচারের ও আচরণের বিষয় ও বস্তু মাত্র। এ সৃষ্টিশীলতা এবং শ্রেয়ঙ্কর নব নব যন্ত্রের ব্যবহার এবং আচার -আচরণের, আর অনুভবের সূক্ষ্মতা, গভীরতা, ব্যাপকতা ও উৎকর্ষই যদি সংস্কৃতির লাক্ষণিক পরিচিতি হয়, তাহলে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত প্রাণী মাত্রেরই কিছু না কিছু অর্জিত -অনুকৃত -অনুসৃত সংস্কৃতি রয়েছে। বানর,শিম্পাঞ্জি, গরিলা, বাঘ, সিংহ, কুকুর, ঘোড়া, হাতি, বাজ, পায়রা, ময়না, ডলফিন প্রভৃতি প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত প্রাণীর বিস্ময়কর আনুগত্য,বোধশক্তি, আচরণ ও প্রভুর অভিপ্রায় অনুগত কর্মক্ষমতা তাদের অনুকৃত বা অনুসৃত সংস্কৃতিই কেননা ওই অনুশীলনলব্ধ গুণ, কৌশল, বোধবুদ্ধি ও আচরণ ওদের জীবনানুভূতির ও জীবনাচারের অবিচ্ছেদ্য অংশ ও অঙ্গ হয়ে যায়।

একালে আমরা বুঝি এবং জানি যে প্রাণীমাত্রেরই দেহ ও মন সুপ্তশক্তির আকর। অনুশীলনে ওই জড়শক্তির সক্রিয় প্রকাশ ও বিকাশ ঘটানো সম্ভব। উদ্যোগী মানুষ স্ব স্ব দেহের ও মনের শক্তির বিচিত্র বিকাশ ও প্রয়োগ সম্ভব করে তুলতে পারে সযত্ন অনুশীলনেও পরিচর্যায়। কিন্তু অন্যান্য প্রাণী আজো সহজাত বৃত্তি-প্রবৃত্তি চালিত। মানুষের প্রয়োজনে মানুষ কোন কোন প্রাণীকে যতটুকু প্রশিক্ষণ দান করে ততটুকু শেখে এবং কর্মে আচরণে বাস্তবায়িত করে। আর মানুষ যে স্বচেষ্টায় মানসানুশীলনে ঘরে বসে নিখুঁত গাণিতিক হিসেবে গ্রহের দূরত্ব পরিমাপ করতে কিংবা নভঃযান তৈরি এবং ঘরে বসে নভস্থ যান মেরামত ও নিয়ন্ত্রণ করতে পারে এবং কায়িক ব্যায়ামে দেহের শক্তি ও সাধ্য যে বিস্ময়করভাবে বৃদ্ধি ও বিচিত্রভাবে প্রয়োগ করতে পারে, তা আমরা পারমাণবিক যন্ত্রে-অস্ত্রে এবং ক্রীড়াকৌশলে প্রত্যক্ষ করছি।

৩। সৃষ্টিশীলতা ও গ্রহণ প্রবণতা চলমান-গতিশীল সংস্কৃতির একাধারে উৎস ও প্রাণ। সব মানুষ সৃষ্টিশীল নয়, গ্রহণপ্রবণ মানুষও বিরল। তাই বুনো -বর্বর প্রাকৃত মানুষ আজো সুলভ। আজকের এ মুহূর্তের দুনিয়ায়ও সবচেয়ে বিকশিত সভ্যতা ও উৎকর্ষপ্রাপ্ত সংস্কৃতিও কয়েক হাজার বছরের মধ্যেকার কয়েকজন মনীষীর মৌল আবিষ্কার উদ্ভাবন ভিত্তি করেই পেয়েছে বিকাশ-বিস্তার।

ব্যবহারিক জীবন আবিস্কৃত যন্ত্রের বাস্তব উপযোগ প্রত্যক্ষ বলে তা গ্রহণে প্রয়োগে কারো কখনো দ্বিধা থাকে না। কিন্ত ওই যন্ত্র বা বস্তু যে মনমনীষার সৃষ্টি, তারই অপর অদৃশ্য দান

নতুন ভাব-চিন্তা, নিয়ম-নীতি,তত্ত্ব-তথ্য, মতপথ সত্য ও শ্রেয়ঙ্কর বলে কেউ বিশ্বাস -ভরসা করে গ্রহণ বরণ করতে চায় না। অথচ চলমান জীবনে তুলনায় সমকালীনতা বা স্বাকালিকতা চালু করার ও রাখার জন্যে সৃষ্টিশীলতা, কিংবা গ্রহণপ্রবণতা আবশ্যিক। এ দুটোর কোনটাই যাদের নেই, তারা আজো আরণ্য মানব। আমাদের শহুরে সভ্য শিক্ষিত সংস্কৃতিবান মানুষও যন্ত্রের ও বস্তুর ব্যবহারে আপাত প্রগতিশীল বটে, কিন্তু মনে মননে এ যন্ত্রের ও যুক্তির জগতের সঙ্গে তাঁদের সমকালীনতা নেই। আস্তিক ইহুদি বিচরণ করে সাঁইত্রিশ শ' বছর আগেকার তার বিশ্বাসের ভাবলোকে, একজন ব্রাহ্মণ্যবাদী বিহার করে তিন হাজার বছর পূর্বেকার বিশ্বাসের জগতে, একজন বৌদ্ধ বা জৈন মানস পথিক আড়াই হাজার বছরের প্রাচীন ভারতে, একজন খ্রীস্টান বাস করে দু হাজার বছরের পুরোনো ভুবনে এবং একজন মুসলিমের অনুভবে ও বিশ্বাসে রয়েছে সাড়ে তেরোশ বছর আগেকার এক অটলঅরূপ, অব্যয়-অক্ষয় দুনিয়া। অতএব, এ সব আস্তিক ও রক্ষণশীল মানুষের সংস্কৃতিতেই নেই সমকালীনতা। অথচ কালাধীন জীবনে দেশকালের প্রতিবেশে যন্ত্র বা হাতিয়ার নিয়ন্ত্রিত জীবিকাপদ্ধতির ও জীবিকাক্ষেত্রের চাহিদা অনুগ জীবনাচার উদ্ভাবন ও গ্রহণই হচ্ছে সংস্কৃতির বিকাশমানতার ও প্রবহমানতার প্রমাণ। গতিশীল সংস্কৃতিই জীবনের চলমানতার সাক্ষ্য। ভাত-কাপড়ের নিশ্চয়তার আর জীবন-জীবিকার নিরাপত্তার ব্যবস্থা থাকলে সংস্কৃতির স্বাস্থ্য সহজে বিকৃতি পায় না, পাবে না।

অতীত স্মৃতির বন্ধন ও প্রীতির আকর্ষণই মানুষকে শাস্ত্রে ও ঐতিহ্যে আস্থাবান ও নির্ভরশীল রাখে। আশৈশব লালিত এসব বিশ্বাস -সংস্কারের দুর্গে আবদ্ধ আস্তিক মানুষের মানস-মুক্তি কোন বিদ্যায়-বিত্তে, জ্ঞানেপ্রজ্ঞায় ঘুচাতে পারে না। গোটা দুনিয়ায় বিশ শতকের এ প্রান্ত-পর্বেও বিশ্বাস-সংস্কার চালিত যুক্তিভীরু অতীতাশ্রয়ী বন্ধ্যা-বুদ্ধির মানুষ লাখে নিরানব্বই হাজার নয়শ নিরানব্বই জন। এই বিশ্বাসী মানুষেরা পরিচ্ছন্ন বুদ্ধির অভাবে যুক্তি মানে না, প্রমাণে গুরুত্ব দেয় না, তাই তাদের জীবনানুভূতি স্থূল ও বিশ্বাসদুষ্ট ;শ্রেয়োচেতনা প্রজ্ঞাশূন্য, স্বার্থবুদ্ধিও ক্রুর লালসা -লগ্ন—যৌথ জীবননীতি সম্মত নয়।

সভ্যতা সংস্কৃতি যে দেশে কালে জাতে বর্ণে গোত্রে ধর্মে আর শাস্ত্রে স্বতন্ত্র এবং শিক্ষা, অর্থ, বিত্ত, নৈতিক চেতনা, ভৌগোলিক অবস্থান ও আবহাওয়া ভেদে গুণেমানে মাত্রায় ও মাপে পৃথক ও বিচিত্র, তার কারণ সংস্কৃতির অঙ্গের ও অন্তরের অপূর্ণতা বা ত্রুটি। শ্রেয়সঅন্বেষাজাত নিরপেক্ষ যুক্তি বুদ্ধি প্রসূত মানব-সংস্কৃতির আন্তঃরূপ হত অভিন্ন। তার প্রমাণ এ যুগে জ্ঞান-প্রজ্ঞা কল্যাণ ও ন্যায়বুদ্ধি সম্পন্ন বৈশ্বিকচেতনাপুষ্ট যুক্তিনিষ্ঠ মানবিকতা ও মানবতাবাদী কিছু মানুষে অভিন্ন চিন্তা-চেতনা ও শ্রেয়োবুদ্ধি অভিব্যক্তি পেয়েছে ও পাচ্ছে। দেশগত কাল-নিয়ন্ত্রিত ও যন্ত্রনির্ভর চলমান জীবনে পথের নব নব বাঁকে উদ্ভূত মানসিক ও ব্যবহারিক প্রয়োজন মেটাতে ব্যর্থ এবং সমকালীন সমস্যার সমাধানে অসমর্থ সংস্কৃতি মাত্রই বন্ধ্যা ও আচারিক, তাই পরিহার্য। ব্যবহারিক জীবনে মানুষ যন্ত্রাদি বস্তুর ব্যবহারে যুক্তি ও শ্রেয়োচেতনা চালিত। মনে মননেও এ যুক্তির ও শ্রেয়োবোধের অনুগত হতে পারলে মানুষ তার বিশ্বাস-সংস্কার জীর্ণ ও অপরিচ্ছন্ন বস্ত্রের মতোই মুহূর্তে বর্জন করত। স্নানের পরে অজুর, প্রভুর তুষ্টির জন্যে প্রভুসৃষ্ট প্রাণী বলিদানের, গঙ্গা-জমজম-জর্ডান নদীর পানির পবিত্রতার, মানুষের বা খাদ্যের অস্পৃশ্যতার অযৌক্তিকতা যুক্তি- বুদ্ধিচালিত মানুষ সহজেই করত উপলব্ধি।

৪. শাস্ত্রনিয়ন্ত্রিত, সমাজ-শাসিত ও বিশ্বাস-সংস্কারচালিত জীবনে প্রত্যেক মানুষেরই স্ব স্ব শাস্ত্রানুগ, সমাজসম্মত, রুচি-বুদ্ধিগ্রাহ্য, দেশকালের প্রতিবেশ পুষ্ট ভিন্ন সংস্কৃতি থাকে। আস্তিক মানুষের তাৎপর্যবিরহী শ্রেয়োচেতনাশূন্য নির্লক্ষ্য চালু সংস্কৃতি আসলে অনুকৃত, বন্ধ্যা ও বদ্ধ

আচারমাত্র। এ প্রাণহীন জীর্ণ ও জড় আচার সাধারণভাবে বহুলব্যবহৃত বদ্ধজল পুকুরের মতো বিকৃতির ও অবক্ষয়েয় শিকার। এমনি রক্ষণশীল আস্তিক মানুষ শাস্ত্রের ও সমাজসত্তার স্বাতন্ত্র্য অটলতা বা স্থিরতা কামী হয়। এদের চোখে গ্রহণ-বর্জনহীন স্ব স্ব আচারনিষ্ঠার অন্য নামই হচ্ছে বিশুদ্ধ সংস্কৃতি চর্চা। তাই এদের স্ব স্ব রুচি-বুদ্ধি- বিশ্বাসের প্রতিকূল ভাব-চিন্তা কর্ম-আচরণ হচ্ছে অপসংস্কৃতির প্রসূন বা লক্ষণ। এ কারণেই সেক্স-ক্রাইমকমিক সাহিত্য, যৌন আবেদনমূলক নাচ গান চিত্র সিনেমা গল্প উপন্যাস কবিতা, পপ-ডিসকো ভঙ্গির সঙ্গীতাদি ও সচিত্র সিনেমা পত্রিকা, যৌন চেতনামূলক রচনা কোন কোন শ্রেণীর মানুষের চোখে অপসংস্কৃতিজাত। যদিও অসংখ্য মানুষ এ সবের সমঝদার এবং তারা সবাই চরিত্রভ্রষ্ট অমানুষ নয়। আমরা যদি স্বীকার করি যে পৃথিবীতে বিভিন্ন রুচির মানুষ, তাহলে নিন্দার কিংবা আশঙ্কার কারণ থাকে না। সংস্কৃতি সম্বন্ধে এদের ধারণা মেনে নিলে স্বীকার করতে হবে যে দেশ-কাল গোত্র ও ধর্ম ভেদে জগতে অসংখ্য প্রকার সংস্কৃতি রয়েছে। কেবল একদলের এক সম্প্রদায়ের, এক গোত্রের, একদেশের ও এক-কালের সংস্কৃতি ভিন্নদলের, সম্প্রদায়ের, গোত্রের, দেশের ও কালের অপসংস্কৃতি। যন্ত্র বা বস্তু নয়, পরের আচার আচরণ গ্রহণমাত্রই কিংবা নতুন প্রজন্মের মানুষের, দেশকালের পরিবর্তিত পরিবেশে উদ্ভূত অদৃশ্য মানসিক ও ব্যবহারিক প্রয়োজনে সৃষ্ট নতুন আচার-আচরণ মাত্রই সাধারণের চোখে অপসংস্কৃতি। সব কার্যেরই কারণ থাকে। এ নতুন আচার-আচরণের, এ নতুন প্রবণতার কারণগুলো সমকলের মানুষের চিন্তায় চেতনায়-অনুভবে ধরা পড়ে না বলেই নতুন মাত্রই রক্ষণশীল নিয়মানুরাগী মানুষের চোখে-চেতনায় ও রুচিতে প্রতিভাত হয় অপসংস্কৃতিরূপে। যেমন, হিন্দু বা মুসলিম বর হেট স্যুট পরে বিয়ের আসরে বসলে, মোল্লা-পুরুত স্যুট পরে ইমামতিপূজা করলে, মেয়েরা স্কার্ট বা প্যান্ট সার্ট পরে ঘুরে বেড়ালে, চেয়ার-টেবিলে বসে মিলাদ পড়লে, অনাত্মীয় নরনারীরা নিঃসঙ্কোচ মেলামেশা করলে, টোল-মাদ্রাসার শিক্ষার্থীরা স্যুট পরলে, খেলার মাঠে মেয়েরা জাঙিয়া পরলে, কিশোরেরা গাঁজা চণ্ডু হাসিস হিরোইন সেবন করলে, পপ-ডিসকো সঙ্গীতে আসক্ত হলে, নারীরা বিশেষ ধরনের শাড়ি-চুড়ি পরলে এবং কেশকর্তন ও বিন্যাস করলে আমরা এগুলোকে অপসংস্কৃতির লক্ষণ ও আক্রমণ বলে মানি। মৌলবীর কাছে নাচ গান অভিনয় চিত্রকলা, আমাদের চোখে 'বলনাচ' অপসংস্কৃতি। অথচ এসব যারা করে বা করবে, এভাবে চলে বা চলবে, রেওয়াজ তরক করে যারা মুরুব্বিদের সঙ্গে সপ্রতিভ আচরণ করে বা করবে, তারা সবাই এদেশের একালের এ মুহূর্তের শিক্ষিত শহুরে কিশোর-কিশোরী, যুবক-যুবতী, প্রৌঢ়-প্রৌঢ়া। আমাদের যদি ইতিহাস চেতনা থাকত, দেশ-কালগত জীবিকা সম্পৃক্ত জীবনের বিবর্তন পরিবর্তন ধারার ধারণা থাকত, তাহলে আবিষ্কার-উদ্ভাবনজাত যন্ত্র ও বস্তু এবং আকাঙ্ক্ষা ও জিজ্ঞাসাজাত চিন্তা-চেতনা যে জীবিকাপদ্ধতি, জীবনদৃষ্টি ও জীবনাচার পরিবর্তিত করে, সে বিষয়ে আমাদের জ্ঞান থাকত। প্রতি প্রজন্মেই মানুষের জীবনে সমাজে যে নতুন নতুন নিয়ম-নীতি, রীতি পদ্ধতি দৃশ্য বা অদৃশ্যভাবে, সচেতন বা অবচেতন প্রয়োজন-প্রণোদনায় গৃহীত ও সংযোজিত হয় এবং পুরোনো প্রথা-পদ্ধতি অবচেতন ঔদাসীন্যে বর্জিত হয়, সে-বিষয় যদি আমাদের বোধগত থাকত, তা হলে সব পরিবর্তন কালিক, আবশ্যিক ও অবশ্যম্ভাবী বলে মানতাম। ফলে নতুন কিছু দেখলেই আমরা অপসংস্কৃতির আক্রমণ আশঙ্কায় আঁতকে উঠতাম না। কিছুই অকারণে আকস্মিকভাবে উদ্ভূত হয় না। কারণ তৎক্ষণাৎ খুঁজে পাওয়া যায় না বলেই আমরা বিভ্রান্ত ও বিমূঢ় হই।

আমাদের আশৈশব লালিত যুক্তি-বুদ্ধি-বিশ্বাসের ও রুচির এবং শ্রেয়াবোধের মাপে ভাব-

চিন্তা-কর্ম-আচরণের যা কিছু নতুন ও অবাঞ্ছিত, তা-ই অপসংস্কৃতি নয়। মানুষের স্থিরতা ও স্থায়িত্বকামী নিশ্চিন্ত নিরাপত্তাকাঙ্ক্ষী মন সাধারণভাবে নিরুদ্যম ও অতীতাশ্রয়ী বলেই, মানুষের মনোজগতে নতুনভীতি ও পুরোনো-প্রীতি সহাবস্থান করে। এমনি মানুষের চোখে নতুন মাত্রই উপপ্লব ঘটানো উপদ্রব মাত্র। আর বাহ্যত সর্বাত্মক মন্দের ও সর্বজনীন ক্ষতির নজির ক্বচিৎ কখনো মেলে হয়তো, কিন্তু সাধারণভাবে নদীর এ-কূল ভেঙে ও-কূল বাড়ানোর মতো একের অবক্ষয়, অপরের বৃদ্ধির কারণ হয়। এক শ্রেণীর পতনে বেড়ে ওঠে অপর শ্রেণী।

ইতিহাসের সাক্ষ্য স্মরণ থাকলে আমরা মানব যে সংস্কৃতি-সভ্যতার বিকাশ-বিবর্তন আবিষ্কার-উদ্ভাবনপ্রসূন। যারা আবিষ্কারে-উদ্ভাবনে অসমর্থ, তারা অপরের আবিষ্কার-উদ্ভাবনের অবদান গ্রহণ-বরণ করেই সংস্কৃতি সভ্যতায় সমকালীনতা রক্ষা করে। আমরা বাঙালীরা আবিষ্কারে উদ্ভাবনে নয়, সন্দেহ-জিজ্ঞাসা-উদ্যম চালিত হয়ে, সৃষ্টি করে নয়, পরের ভাব-চিন্তা যন্ত্র বস্তু গ্রহণ-বরণ, অনুকরণ-অনুসরণ করেই পুরোনো বর্জনে ও নতুন বরণেই সংস্কৃতি-সভ্যতার ধারক বাহক রয়েছি। আমাদের ভাষা, ধর্মশাস্ত্র, প্রশাসনপদ্ধতি, পালা-পার্বণ, নীতিশাস্ত্র, দর্শন এবং পোশাকাদি নানা কিছুই বিদেশি থেকে নিয়েছি। কাজেই নতুন-ভীতি আমাদের মানায় না। ওই নতুনকে বরণের আগ্রহই আমাদের জরা-জীর্ণতামুক্ত রাখে, রাখে গতিশীল, যোগায় প্রাণরস।

নতুন হাতিয়ার বা যন্ত্র যেমন উৎপাদন ক্ষেত্রে পুরোনো জীবিকা প্রথা পদ্ধতির ক্ষেত্রে সাময়িকভাবে বিপর্যয় ঘটায়, তেমনি নতুন ভাব-চিন্তার অভিঘাত প্রথানিষ্ঠ মানুষকে ও সমাজকে সাময়িকভাবে বিব্রত বিচলিত করে। কিন্তু পরিণামে কোন নতুন মানুষের জন্যে অকল্যাণকর হয়নি। সুতরাং আপাতদৃষ্টে কোন কোন স্থানে-কালে ও কোন কোন মনের, মতের, নতুন ভাব-চিন্তা, কর্ম-আচরণ, সাজ-সজ্জা, নিয়ম-নীতি, রীতি-পদ্ধতি অপসংস্কৃতির প্রসূন বলে প্রতীয়মান হলেও তা পরিণামে মানুষের পক্ষে ক্ষতিকর হবে এমন সিদ্ধান্ত করা চলে না। কিন্তু আস্তিক মানুষের কাছে বিশ্বাসের স্থান যুক্তির উপরে। তাই তারা বিশ্বাস-নির্ভর, তাদের কাছে বিশ্বাসের বিপ্রতীপ কোন যুক্তির মূল্য-মর্যাদা আদর-কদর নেই। এ জন্যই আস্তিক কখনো নিঃশর্ত উদার ও গ্রহণশীল হতে পারে না। তার শ্রেয়োচেতনাও তাই সীমিত, তার পরিবর্তন বরণজাত নয়, স্খলন প্রসূত। তাই তা রূপান্তর মাত্র, প্রাণবন্তের প্রবৃদ্ধি নয়, নয় গতি প্রগতির প্রসাদ। এতে সে কারণেই থাকে না আত্মোৎকর্ষ কিংবা মনীষার বিকাশ। আস্তিক তাই বিপন্ন বোধ করলেই অতীতের অনুধ্যানে অনুশীলনে হয় আগ্রহী।

পুরোনো হাতিয়ারে, প্রথা-পদ্ধতিতে, নিয়মে-নীতিতে, বিশ্বাসে-সংস্কারে শাস্ত্রে-সত্যে অশ্রদ্ধা, সন্দেহ, অবিশ্বাস জাগলে কিংবা কারো মনে নতুন জিজ্ঞাসা ও কৌতূহল জাগলে অথবা নতুনের আকাঙ্ক্ষা জাগলে, নবজীবন-তৃষ্ণার আবেগজাত কল্পনা, পরিকল্পনা ও নতুন যন্ত্রের প্রয়োগজাত জীবিকা-পদ্ধতি পরিবর্তনে ঘরোয়া, সামাজিক ও কর্ম জীবনে অবস্থা ও অবস্থানগত নিয়ম-নীতিতে যে পরিবর্তন অবশ্যম্ভাবী ও আবশ্যিক হয়ে পড়ে, তার প্রভাবে ও ফলে মনে-মেজাজে ও জীবনাচারে ক্রমে ফুটে ওঠে পরিবর্তন। এমনি পরিবর্তনপ্রবাহই ঘটায় জীবন-জীবিকায় তথা সমাজে সংস্কৃতিতে যুগান্তর। এ যুগান্তর সূচিত ও রূপায়িত-বাস্তবায়িত হয় প্রজন্মধারায়। যারা মানুষের বিশ্বমানবিক উত্তরাধিকারে আস্থা রাখে, অর্থাৎ বিশ্বের যে-কোন মানুষের আবিষ্কারে-উদ্ভাবনে-সৃষ্টিতে যে কোন মানুষের মানবিক উত্তরাধিকার রয়েছে বলে জানে এবং মানে, তারাই সব সময়ে শ্রেয়োবোধে না হোক, নতুনের আকর্ষণে নতুনকে অনুকরণে-

অতএব, নব নব মানব-সম্পদ গ্রহণে-বরণে রক্ষণশীল আস্তিক মানুষ দ্বিধাদ্বন্দ্বের বন্ধুর পথ অতিক্রম করে, এগোয় ভীরু কূর্মের সতর্কতায় শম্বুক গতিতে। অবশেষে নতুন যখন শত বছরের পুরোনো হয়ে যায়, তখন গ্রহণ বরণ করে হয় ধন্য। যেমন হেকিমি-কবিরাজী ছেড়ে অবশেষে ডাক্তারি বরণ করলই। আর নাস্তিক কেবল চেতনা ও রুচিবুদ্ধি চালিত বলে সহজেই নতুন প্রাগ্রসর চিন্তা-চেতনাকে জীবনের পুঁজি পাথেয় করে নেয়। স্বীকার করতেই হবে যে নতুনকে যারা সহজে বরণ করে তারা জীবনে যুক্তিকে শ্রেয়োবুদ্ধিকে ও রুচিকেই কেবল গ্রহণ-বর্জনের নিয়ামক হিসেবে গ্রহণ করেছে।

হাতিয়ারের উৎকর্ষে ও উৎপাদন ব্যবস্থার বিবর্তনে, জীবন-জীবিকা পদ্ধতির অমোঘ বা অবশ্যম্ভাবী বিবর্তন ধারায় জীবন-চেতনায় ও জীবনাচারে যে পরিবর্তন আজকের স্তরে উপনীত হয়েছে, তাকে ইউরোপীয় জ্ঞানী-মনীষারাও অপসংস্কৃতি বলে না। ওই জীবন-জীবিকা প্রতিবেশে এ-ই স্বাভাবিক বলে তারা মানে। আর আমাদের অনভ্যস্ত আকস্মিক দৃষ্টিতে ও রুচিতে প্রতীচ্য জীবনাচারের অনেকখানিই ন্যক্কারজনক অপসংস্কৃতি। যে কোন ব্যক্তির, পরিবারের, দলের সম্প্রদায়ের, গোত্রের, শ্রেণীর কায়েমী স্বার্থ-রুচি, বুদ্ধি-বিশ্বাসের পুরো প্রতিকূল বা আংশিক বিপরীত নতুন চিন্তা-চেতনা-কর্ম-আচরণ-জীবনাচার মাত্রই যে সে ব্যক্তির, পরিবারের, দলের, সম্প্রদায়ের, গোত্রের ও শ্রেণীর চোখে নিত্যকালের শাস্ত্র-সমাজ-নিয়ম-নীতি ভাঙ্গা অপসংস্কৃতি প্রসূন।

অতএব, 'অপসংস্কৃতি' একটি আপেক্ষিক শব্দ ও অভিধা। আমাদের জ্ঞানপাপী শাসক-প্রশাসক গোষ্ঠী সরকারি প্রয়োজনে মাঝে মাঝে হায়া-শরম পরিহার করে বিদেশী সংস্কৃতি ও তত্ত্বচিন্তা প্রতিরোধের হুঙ্কার ছাড়েন। কিন্তু আমাদের শাস্ত্র, গণতন্ত্র, প্রশাসন ব্যবস্থা, আইন-কানুন, নিয়ম-নীতি, অস্ত্র, রণকৌশল, মন্ত্রী আমলা সেনানীর পোশাক এবং প্রাত্যহিক জীবনে ব্যবহার্য সামগ্রী, সর্বপ্রকার যন্ত্র এবং শিক্ষার বিষয়, গ্রন্থ ও পদ্ধতি— সবটাই যে বিদেশীর, বিজাতির, বিধর্মীর ও বিভাষীর তা কেউ সেই মুহূর্তে সাহস করে সরকারকে স্মরণ করিয়ে দেয় না।

বিরোধী রাজনীতিক দল, সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠান শহুরে বুদ্ধিজীবী মহল মাঝে মধ্যে 'হিং টিং ছট'-এর মতো অপসংস্কৃতির বিরুদ্ধে জেহাদ ঘোষণা করেন। কিন্তু অপসংস্কৃতি কি এবং কোন্ ক্ষতির কারণ, কোন্ সর্বনাশের সূচক, শাস্ত্র-সমাজের কোন্ নীতি-নিয়ম ভাঙা এর লক্ষ্য, তা ব্যাখ্যা করেন না। যারা এদের অনুসরণে অপসংস্কৃতি বিধ্বংসী জিগির তোলে, তারা স্বরূপে কিছুই উপলব্ধি করে না— ফেরু স্বভাবের লক্ষণ দেখায় মাত্র।

সংস্কৃতি চলমান মানুষের প্রাত্যহিক জীবন-জীবিকা সম্পৃক্ত। সেজন্যেই সংস্কৃতিও গতিশীল এবং প্রতি মুহূর্তে বিকাশমান। হাতিয়ারের তথা যন্ত্রের উৎকর্ষের প্রয়োগ-বৈচিত্র্যের ও বহুধা উৎপাদন পদ্ধতির ও ব্যবস্থার সঙ্গে সংস্কৃতি অঙ্গাঙ্গী ও দেহাত্ম সম্বন্ধে সম্পৃক্ত। এ কারণে সমাজে আর্থিক, শৈক্ষিক, নৈতিক অবস্থান ভেদে এবং জীবিকাক্ষেত্রে শ্রমের প্রকারভেদে সংস্কৃতি-চেতনায় ও সাংস্কৃতিক আচরণে মাত্রাভেদ ও অভিব্যক্তিভেদ ঘটে। তাছাড়া, বদ্ধচিত্ত আস্তিকের বিশ্বাস নিয়ন্ত্রিত জীবনে সংস্কৃতি সহজে স্বাভাবিক বিকাশ-বিস্তার পায় না। আবার ওই হাতিয়ারও জীবিকাপদ্ধতি সম্পৃক্ত বলেই আমরা লোক-সংস্কৃতি, গণ-সংস্কৃতি, বুর্জোয়া ও সামন্ত সংস্কৃতি নামে সংস্কৃতির রূপ-স্বরূপ চিহ্নিত ও ব্যাখ্যা করি।

সংস্কৃতির সর্বজনগ্রাহ্য কোন সংজ্ঞা নেই। তবে আভাষে-ইঙ্গিতে পরিব্যক্ত আকুলি-ব্যাকুলি থেকে বোঝা যায়— বাঞ্ছিত সংস্কৃতি হচ্ছে সমাজে স্বাধিকারে সমস্বার্থে সহিষ্ণুতায়

সহযোগিতায় সহাবস্থানের আগ্রহ নিয়ে আবিষ্কারে উদ্ভাবনে, নির্মাণে কিংবা গ্রহণে বর্জনে নব নব চিন্তা-চেতনার অনুশীলনে মানব-সম্পদ বৃদ্ধির এবং যন্ত্রের ও বস্তুর উৎকর্ষযোগে ব্যবহারিক জীবনে স্বাচ্ছন্দ্য-সাচ্ছল্য-সুরুচি-সৌন্দর্য বৃদ্ধির প্রয়াস চালানো এবং ভাব-চিন্তা-কর্ম-আচরণে-হিংসা-ঘৃণা-ঈর্ষা-অসূয়া-জুলুম-প্রবৃত্তির প্রভাব মুক্ত থাকা। এ অর্থে সক্রিয় সৌজন্যই সংস্কৃতি। যুক্তিনিষ্ঠ ন্যায়বানই সুজন এবং সুজন মাত্রই তাই সংস্কৃতিবান।

সাধারণভাবে নৈতিক-চেতনার বিকৃতি, লঙ্ঘন বা চালু নীতি-নিয়ম পরিহারজাত আচার-আচরণই অপসংস্কৃতি নামে অভিহিত। পৃথিবীর সব দেশেই পূর্ব প্রজন্মের আস্তিক রক্ষণশীল মানুষের চোখে তরুণ-তরুণীর কিছু কিছু নতুন আচার-আচরণ ফ্যাশন ও রুচি অশ্লীল ও সমাজ স্বাস্থ্যের পক্ষে ক্ষতিকর বলে প্রতীয়মান হয়। এ কারণে সব দেশেই তথাকথিত অপসংস্কৃতির উপদ্রব রয়েছে। আজকের প্রতীচ্যদেশে বিকৃত রুচির হতাশাগ্রস্ত, দুঃখবাদী নেশাখোর এবং অপরাধ, সমকামিতা ও ধর্ষণপ্রবণ তরুণ-তরুণীরা অপসংস্কৃতির শিকার। অতএব, অপসংস্কৃতি সমাজ-সদস্যে প্রত্যাশিত নৈতিক চেতনার অপহৃতজাত। তবে সংস্কৃতি সভ্যতার, সমাজের ও নীতিধর্মের বিবর্তন ধারার ইতিহাসের সাক্ষ্যে বলা যায়, চালু নৈতিকতার মাপে আপাত বিকৃতি, কুরুচি, অশ্লীলতা অপহৃতি চোখসহা মনসহা রুচিসহা হয়ে হয়ে বেশ্যাসক্তির ও বেশ্যাবৃত্তির মতো, জুয়ার মতো, পানাসক্তির মতো, সমকামিতার মতো ক্রমে জীবনাচারভূত হয়ে সমাজের রীতি-রেওয়াজের অন্তর্ভুক্ত হয়ে সমাজকে দেশ-কালোপযোগী বাঞ্ছিত স্বাস্থ্য দান করে — সব ব্যতিক্রমই যেমন কালে নিয়ম রূপে স্বীকৃতি পায়। উল্লেখ্য, জীবন্ত-বাড়ন্ত গাছে যেমন মরা ডাল থাকে, তেমনি চোর-ডাকাত-খুনি-লম্পট-প্রতারক নিয়েই চিরকাল সংস্কৃতি-সভ্যতা এগিয়েছে। তাছাড়া, শ্রেণী উপদ্রুত ও শোষণদুষ্ট বিষম সমাজে বাঞ্ছিত সুষম সংস্কৃতি কখনো মিলবে না।

শিক্ষা ও সংস্কৃতি

শেখা, জানা আর বোঝা সমার্থক নয়। যা শেখা হয় তাই শিক্ষা, যা জানা যায়, তাই বিদ্যা বা জ্ঞান। আর যা বোঝা যায় তাই বোধি বা প্রজ্ঞা। হাতেখড়ির পরে যে-শিশু 'কাননে কুসুম কলি সকলি ফুটিল' শেখে, সে কিন্তু 'কানন', 'কুসুম', 'কলি' কি জানে না। সে কেবল মুখস্থ করে, এই তার কাজ। যে শিক্ষার্থী 'বরিশালে ধান ও পাট জন্মে' বলে জানে, সেও বোঝে না ধান ও পাট উৎপন্ন না হলে বরিশালের কি ক্ষতি হত। বুঝবার জন্য শেখার, জানার ও বয়সের প্রয়োজনে— সবচেয়ে বড় প্রয়োজন বোঝার আগ্রহের।

সমাজে বাস করে বলেই নিরক্ষর মানুষও জীবনযাত্রার প্রয়োজনে দেখে ও শুনে অনেক কিছুই শেখে, জানে ও বোঝে। কিন্তু তাতে নিতান্ত ঘরোয়া ও সামাজিক নিয়ম-নীতির মধ্যে রীতিপদ্ধতি মেনে প্রাণী হিসেবে দেহে বাঁচাই মাত্র সম্ভব হয়, মনে বাঁচার অপূর্ণতা ও স্থূলতা থেকেই যায়। মানুষ হিসেবে বিপুল জগতে বিচিত্র অনুভবের মধ্যে মনে বাঁচার জন্যে মানুষকে প্রাত্যহিক জীবনের চাহিদার অতিরিক্ত অনেক কিছুই শিখতে, জানতে ও বুঝতে হয়।

অপরের থেকে যা জানা হয়, তাই জ্ঞান, আর ব্যক্তিগত ভাব-চিন্তা-কর্ম-আচরণের মধ্যে দিয়ে যা জানা হয় তার নাম অভিজ্ঞতা। এক হিসেবে অভিজ্ঞতাই পূর্ণজ্ঞান— যা বোধিতে বা

প্রজ্ঞায় পরিণতি পায়। স্বঘরে স্বগাঁয়ে থেকে মানুষ একজীবনে কয়টা অভিজ্ঞতাই বা লাভ করতে পারে। কিন্তু সাক্ষর মানুষ ঘরে বসেই বইয়ের মাধ্যমে সারা দুনিয়ার মানুষের অতীতের ও বর্তমানের জ্ঞান-বিজ্ঞানের, চিন্তা-চেতনার, কৃতি-কীতির ও আবিষ্কার-উদ্ভাবনের খবর জানতে পারে। আজকাল অবশ্য নিরক্ষর মানুষও রেডিও-টেলিভিশন প্রভৃতির বদৌলত বিভিন্ন বিষয়ে জ্ঞানের ভাণ্ডার বৃদ্ধি করতে পারে। জ্ঞান অনুভবের ও উপলব্ধির জগৎ প্রসারিত করে।

আমরা শিখি জ্ঞানের সঞ্চয় বাড়াবার জন্যই, জ্ঞান দিয়েই আমরা অভিজ্ঞতার অভাব পূরণ করি। আমরা এ ও জানি জ্ঞানই শক্তি। কারণ কোন্ প্রয়োজনে কোন্ অবস্থায় ও অবস্থানে আমাদের কি কর্তব্য, কোন্ বিপদ এড়ানোর জন্যে কোন্ উপায় বা ব্যবস্থা গ্রহণ করা উচিত, কার সঙ্গে কোন্ পরিস্থিতিতে কিরূপ ব্যবহার করা সমীচীন, তা আমরা অতীতের অপরের অভিজ্ঞতা থেকে তথা আমাদের অর্জিত জ্ঞান থেকে বুঝতে পারি। আমাদের আত্মরক্ষার ও আত্মপ্রসারের প্রয়াসে ও জীবন-জীবিকার নিরাপত্তার ব্যবস্থায় সহায়তা করে বলেই জ্ঞান শক্তি। আজকাল এ জ্ঞান অর্জন করতে হয় বই পড়ে।

স্কুল-কলেজে শিখে ও জেনে জ্ঞানী হওয়াকে সাধারণ লোকের ভাষায় বলা হয় শিক্ষিত হওয়া। যে শিক্ষিত বা জ্ঞানী হয়, সে ভদ্রলোক হবে—সুজন হবে—এটাই লোকে আশা করে। যে ভদ্রলোক হবে সে জেনে-বুঝে কোন অন্যায় অপকর্ম করবে না, কারণ সে ন্যায়-অন্যায়, সত্য-মিথ্যা, লাভ-ক্ষতি, ভালো-মন্দ, মিত্রতা-শত্রুতা, প্রীতি-ঘৃণা প্রভৃতির পার্থক্য ও পরিণাম বোঝে।

সে যে-ক্ষতি, যে আঘাত নিজের জন্যে বাঞ্ছিত বলে মনে করে না, অন্যের জন্যেও সে তা কামনা করবে না— এটাই মানুষ শিক্ষিত লোক থেকে প্রত্যাশা করে। উপলব্ধির স্তরে উন্নীত না হলে জ্ঞান মাত্রই বন্ধ্যা এবং নিজের কর্মে ও আচরণে প্রযুক্ত না হলে— প্রয়োগ না করলে জ্ঞানার্জন বৃথা।

২.

'সংস্কৃতি' শব্দের আক্ষরিক অর্থ পরিমার্জনা, উৎকর্ষ, পরিশীলন প্রভৃতি। 'সংস্কৃতি' অর্থে তাই শুভের-কল্যাণের ও সুন্দরের সাধনা ও প্রতিষ্ঠা বোঝায়। যা কিছু দেখতে, শুনতে, বলতে ও করতে কুৎসিত এবং যা কিছু অন্য ভালো ও নির্দোষ মানুষের পক্ষে ক্ষতিকর ও কায়িক, মানসিক বা আর্থভিত্তিক জুলুম-বিশেষ, তা থেকে বিরত থাকা, সমস্বার্থে, গণহিতে ও গণসুখ-লক্ষ্যে কল্যাণকর যৌথকর্মে সহাবস্থান করাই সংস্কৃতিবানতা। সংস্কৃতিবান মানুষ মাত্রই সুনাগরিক, সুপ্রতিবেশী, দায়িত্বশীল, সহিষ্ণু, কল্যাণকামী ও হিতবাদী সজ্জন। সংস্কৃতিবান মানুষ মাত্রই সৎস্বভাব এবং ভদ্রলোক না- হয়েও ভালোমানুষ। আমরা সবাই জানি ভদ্রলোক মাত্রই ভালোমানুষ হয় না। অন্যভাবে বলতে গেলে, যা কিছু ন্যায়, বিশুদ্ধ, শ্রীমান, উপকারী ও নির্দোষ তাই সংস্কৃতির পরিচায়ক ও উপকরণ।

মানুষের মনের, আত্মার ও জীবনাচারের সৌন্দর্যবর্ধক ও প্রকাশক যা-কিছু তাই সংস্কৃতি। প্রত্যক্ষে বা পরোক্ষে জালিম না হয়ে সমাজে সবার সঙ্গে যে সহিষ্ণুতার সঙ্গে সমস্বার্থে ও সমহিতে সহযোগিতায় সহাবস্থান করতে জানে সেই সংস্কৃতিবান। অনুভবে, কথায়, কাজে ও আচরণে অভিব্যক্ত সৌজন্যই সংস্কৃতি। সংস্কৃতির সর্বজনগ্রাহ্য নিখুঁত ও সর্বাত্মক সংজ্ঞা দেওয়া সম্ভব নয় বলেই আরো কিছু ব্যাখ্যা দেওয়ার চেষ্টা করছি।

সংস্কৃতিবান কোন মানুষ অকারণে অন্যের প্রতি ঘৃণা-বিদ্বেষ পোষণ করে না। সম্প্রীতি, সহানুভূতি ও সৌজন্যই তার ব্যক্তিক আচরণে, সামাজিক ব্যবহারে অভিব্যক্ত হয়; সংস্কৃতিবান মানুষ মানুষের প্রীতিকেই শ্রদ্ধাকেই জীবনের শ্রেষ্ঠ সঞ্চয়, সম্পদ ও পাথেয় বলে মানে। সংস্কৃতিবান মানুষ সর্বপ্রকার জুলুম বিরোধী এবং মজলুমের বন্ধু আর জালিমের প্রতিপক্ষ। সংস্কৃতিবান কখনো পরমত-অসহিষ্ণু কিংবা সংকীর্ণ বা বদ্ধচিত্তের মানুষ হতে পারে না, সে বিশ্বকে আপন বলে জানে, নির্বিশেষ মানুষকে মানে আত্মীয় বলে। সে শ্রেয়সকে, কল্যাণকে দ্বিধাহীন চিত্তে অসংকোচে বরণ করতে জানে, দেশ-জাত-বর্ণ-ধর্মের বাধা বিভেদ সে মানে না, মানব-মহিমায়, মনীষায় ও মনস্বিতায় এবং মানব-উত্তরাধিকারে তার আস্থা ও আকর্ষণ অশেষ ও গভীর! দেশ কাল-জাত-বর্ণ-ধর্ম নির্বিশেষে মানবের আবিষ্কৃত ও উদ্ভাবিত সম্পদেরও চিন্তা-চেতনার উত্তরাধিকারে আস্থাবান বলেই কল্যাণকরতা, উপযোগ ও সৌন্দর্যই তার গ্রহণ-বরণের মাপকাঠি।

নানা প্রভাবে ও প্রয়োজনে কিছু আচারিক সংস্কৃতি দেশে-কালে বিশ্বাস-সংস্কাররূপে বিশিষ্ট হয়ে চালু থাকে বটে, কিন্তু সংস্কৃতির প্রাণস্বরূপ যে-চলমানতা বা নিত্যাবিকাশমানতা-গুণ তা হারায় বলেই স্বকালে বর্তমান বা সৃজ্যমান সংস্কৃতি কালান্তরে আচার এবং দেশান্তরে অনুকৃত ফ্যাশন হয়ে দাঁড়ায়।

তাই সে জানে গভীর ও ব্যাপক অর্থে সংস্কৃতি দৈশিক, কালিক কিংবা জাতিক হয় না। বলেছি, সংস্কৃতিতে দেশ-কাল-জাত-বর্ণ-ধর্ম নির্বিশেষে উৎকর্ষকামী গতিপ্রিয় মানুষের অবাধ অধিকার। সংস্কৃতি বিশ্বমানবের সাধারণ সম্পদ। মানুষের কল্যাণকর সর্বপ্রকার আবিষ্কারে ও উদ্ভাবনে রয়েছে বিশ্ব মানবের জন্মগত অধিকার। কারণ এগুলো যে দেশের বা কালের মানুষই আবিষ্কার বা উদ্ভাবন করুক-না কেন, এগুলোকে মানুষ মাত্রেরই সাধারণ সম্পদ বলে আমরা জানি এবং মানি। তাই জ্ঞানে-বিজ্ঞানে মননে-যন্ত্রে-কৌশলে-ঔষধে আমরা বিদেশী-বিজাতি-বিধর্মীর ভেদ মানি নে।

সংস্কৃতিবান মানুষ মাত্রই মনে স্বাধীন। তার চিন্তা-চেতনার জগতে দেশ কালের মানুষের প্রয়োজন ও কল্যাণকামিতা থাকলেও রাজভয় ও লোকনিন্দা তাকে সহজে কাবু করতে পারে না। সংস্কৃতিবান মানুষ হয় জিজ্ঞাসু ও নতুনের প্রত্যাশী, কারণ ক্রমোৎকর্ষই তার কাম্য।

দুনিয়ায় মনুষ্যত্বহীন, পশু-প্রায় লোভী ও আত্মস্বার্থ সর্বস্ব মানুষ দুর্লভ ছিল না কখনো, নেই, ভবিষ্যতেও থাকবে এরা বহুজন। তবু এসব সত্ত্বেও মানুষের সভ্যতা-সংস্কৃতির অগ্রগতি হয়েছে, হচ্ছে ও হবে। এ সভ্যতা সংস্কৃতি হচ্ছে জিজ্ঞাসু, জিগীষু, সাহসী, আত্মপ্রত্যয়ী মানবকল্যাণকামী সংস্কৃতিবান, জ্ঞানী ও প্রজ্ঞাবান মানুষের চিন্তার ও কর্মের প্রসূন।

সংস্কৃতি বদ্ধকূপের জিয়েল মাছ নয়, সংস্কৃতি নদীর প্রবহমান স্রোতের মতো প্রতি মুহূর্তে প্রাত্যহিক জীবনের ও সমাজের প্রয়োজনে অভিব্যক্ত হচ্ছে। এ তাৎপর্যেই সংস্কৃতি হচ্ছে গোটা জীবনাচারের লাবণ্যময় অভিব্যক্তি। তাই সংস্কৃতি দেশে কালে নির্বদ্ধ কোন সঞ্চিত সম্পদ নয়। প্রভাতীফুলের মতো সংস্কৃতি প্রায় প্রতিদিনই নব নব রূপে সৌন্দর্যে ও উৎকর্ষে আত্মপ্রকাশ করে দুনিয়ার কোথাও না কোথাও। দেশ কাল-জাতের আকস্মিক-সাময়িক প্রয়োজনের ছাপমুক্ত নির্বর্ণ মানবিক সংস্কৃতি হচ্ছে বিশ্বমানবের ঐতিহ্য ও সম্পদ। এ জন্যেই সব শিল্পী-সাহিত্যিক-বৈজ্ঞানিক-দার্শনিক, আবিষ্কারকম মানব-মনীষার মানব শক্তির প্রতীক ও প্রতিভূরূপে লোকপ্রিয়। সংস্কৃতির প্রসূনেও তাই বিশ্বমানবের উত্তরাধিকার স্বীকৃত। আমাদের হালের চালু সংস্কৃতি মুখ্যত গ্রহণ-বরণ ও অনুকরণ ভিত্তিক-স্বসৃষ্ট নয়।

বীজ-বৃক্ষ-ফলের মতোই সংস্কৃতির উৎস ও প্রসূন হচ্ছে শাস্ত্র, সমাজ ও রাষ্ট্র। সংস্কৃতির প্রকাশ দ্বিবিধ : আন্তর ও বাহ্য। আন্তর সংস্কৃতি অভিব্যক্তি পায় শিল্পে-সাহিত্যে, নিয়ম নীতিতে, দর্শনে ও সৌন্দর্যবুদ্ধির বিকাশে আর বাহ্য প্রকাশ স্থাপত্যে ভাস্কর্যে, ব্যবহার্য দ্রব্যের উৎকর্ষে, যন্ত্রের সৌকর্যে ও প্রযুক্তির প্রসারে। মনীষার সৃষ্টিশীলতার বিরলতার কারণে লোকসংস্কৃতি সাধারণভাবে বন্ধ্যা, অনুকৃতিমূলক ও আচারিক বলেই তার রূপান্তর দুর্লক্ষ্য, গতি মন্থর এবং আবর্তনেই তার স্থিতি। অতীত সংস্কৃতির সঞ্চয়ই সভ্যতা নামে পরিচিতি।

সংস্কৃতির সংজ্ঞারূপে 'শেষের কবিতা'য় রবীন্দ্রনাথ-উচ্চারিত কমল হীরের রূপক স্মরণে রাখলে সংস্কৃতির কেজো সংজ্ঞা হবে এইরূপ : 'নির্মিত সামগ্রীতে শ্রী, যন্ত্রে উৎকর্ষ, চিন্তায় শ্রেয়োবুদ্ধির দীপ্তি, কর্মে কল্যাণচেতনার ব্যঞ্জনা, আচরণে সৌজন্যের আভা, সজ্জায় সৌন্দর্য, কথায় মাধুর্য, চোখে প্রীতির প্রভা এবং জীবনাচারে সমস্বার্থে, সহিষ্ণুতার, সহযোগিতার ও সহাবস্থানের আগ্রহ আর সুরুচির ও সৌজন্যের সামগ্রিক লাবণ্যই সংস্কৃতি।'

সংস্কৃতির উৎকর্ষের ও বিকাশের গতি অব্যাহত রাখার জন্যে যে কোন অবস্থানে জীবন-জীবিকার ক্ষেত্রে আর্থিক নিরাপত্তার প্রতিবেশ ও মানসিক স্বস্তির পরিবেষ্টনী প্রয়োজন।

নৈতিকতা বনাম অবক্ষয়

সমাজ-সদস্যবাঞ্ছিত ব্যবহারবিধির তথা মানুষের ভাব-চিন্তা-কর্ম-আচরণের বিধি-নিষেধের সমষ্টিই হচ্ছে শাস্ত্র। স্থান-কাল-পাত্রের পরিপ্রেক্ষিতে যথাবিহিত বা যথাযোগ্য কর্মের ও আচরণের দিশা দানই শাস্ত্রের মুখ্য লক্ষ্য এবং শাস্ত্রের অনুগত রাখার জন্যেই ইহ-পরলোকে প্রসৃত জীবনে পাপ-পুণ্যের পরিণাম-চেতনা দানের চেষ্টাও রয়েছে শাস্ত্রে। দুঃখ-যন্ত্রণার ভয় ও সুখ-আনন্দের ভরসা জাগিয়ে শাস্ত্রানুসরণে মানুষকে প্রবর্তনা দিয়ে মূলত সমাজের স্বাস্থ্য-শৃঙ্খলা রক্ষার চেষ্টাই হয়েছে আবহমান কাল ধরে। কিন্তু কোন ভাব-চিন্তা-কর্ম-আচরণের উপযোগ উপলব্ধিগত না হলে, জ্ঞান -বুদ্ধি-বিবেক-বিচার-বিবেচনা প্রসূত না হলে মানুষ কর্মে-আচরণে রূপায়িত করে না। এটি সামাজিক শ্রেয়োনীতির ও রাষ্ট্রিক বিধিনিষেধের ক্ষেত্রেও সমভাবে সত্য। তাই সাধারণ মানুষ আস্তিক হয়েও পাপ-পুণ্য উপেক্ষা করে নিন্দা ও শাস্তি এড়িয়ে সংগোপনে সব অপকর্ম করে।

অতএব বাঞ্ছিত চরিত্রের নাগরিক মাত্রই স্বসৃষ্ট, স্বশিক্ষিত, স্বদীক্ষিত। শাস্ত্র নয়, সামাজিক শ্রেয়োনীতি নয়, সরকারি বিধি-নিষেধও নয়, ব্যক্তির জ্ঞান-যুক্তি-বিবেক বিবেচনা প্রসূত আত্মমর্যাদাবোধ, সুরুচি, লৌকিকতা, সৌজন্য, স্বলব্ধ জীবনদৃষ্টি এবং স্বঅর্জিত ন্যায়বুদ্ধিই মানুষকে নির্দিষ্ট জীবনাদর্শ গ্রহণের ও নীতিনিষ্ঠ থাকার প্রেরণা যোগায়। এ নীতিনিষ্ঠা পাপভীতি, নিন্দা-কুণ্ঠা কিংবা শাস্তি-ভয় জাত নয়, এ হচ্ছে অহম-চেতনার, আত্ম-সম্মানবোধের ও সুরুচিশীলতার যৌথ ফসল। এ জন্যই আচারনিষ্ঠ আস্তিকের চেয়ে নীতিনিষ্ঠ নাস্তিকই হয় বাঞ্ছিত চরিত্রের মানুষ। প্রলোভন প্রবল হলে সাধারণ আস্তিক হেন পাপ নেই যা করে না। এ নীতিনিষ্ঠা, অকৃত্রিম ও অটল নৈতিকচেতনা বিজড়িত বলেই, নীতিনিষ্ঠ মানুষ সর্বজন শ্রদ্ধেয় হয়ে সমাজকাঠামোতে স্তম্ভের ভূমিকা পালন করে। তার নৈতিকশক্তি, আত্মসংযম, সত্যপ্রীতি,

ন্যায়নিষ্ঠা এবং কর্মে ও আচরণে নির্ভীকতা অন্যদের ভাবায়, তার মনুষ্যত্ব অন্যদের মনে মনে হার মানায়, ক্বচিৎ কিশোর-তরুণদের ওইসব গুণানুশীলনে অনুপ্রাণিতও করে।

যেহেতু শাস্ত্রের তাৎপর্যরিক্ত গতানুগতিক ও আচারিক অনুসরণ কোন মানুষেরই প্রাত্যহিক জীবনের ভাব-চিন্তা-কর্ম-আচরণ প্রভাবিত বা নিয়ন্ত্রিত করে না, যেহেতু আত্মমর্যাদার গুণ ও মান বোধগত না হলে মানুষের ঘৃণা-লজ্জা-ভয়শূন্য মনে নিন্দা-গ্লানি অপমান-অপরাধ চেতনা জাগে না, যেহেতু লোভী-সুচতুর-সতর্ক মানুষই বৈষয়িক ক্ষেত্রে সরকারি বিধি নিষেধ লঙ্ঘন করে, ঘুষ-ভেজাল জাল-জুয়া-শাঠ্য প্রভৃতি দুর্নীতি-দুর্বৃত্তি আশ্রিত হয়, সেহেতু শাস্ত্রের, সমাজের ও সরকারের নিয়ম নীতির অনুগত থাকে মাত্র নীতিনিষ্ঠ মানুষেরাই। অতএব, সমাজে যত বেশিসংখ্যক নীতিবান মানুষ থাকবে, সমাজের স্বাস্থ্য এবং দেশের আইন-শৃঙ্খলা ততবেশি দৃঢ় থাকবে। কাজেই সামন্ত-বুর্জোয়া ঔপনিবেশিক সমাজে ব্যক্তিক মানুষের স্বাধিকারে-নিরুপদ্রব নিরাপদ জীবন নিশ্চিত করার জন্যেই অধিকসংখ্যক নৈতিকচেতনা সম্পন্ন নাগরিক আবশ্যিক। স্ব স্ব স্বার্থে স্বাধিকারে সহযোগিতায় সহাবস্থান সম্ভব কেবল নৈতিকতাপুষ্ট মানুষের আধিক্যে।

যেখানে শাস্ত্র তাৎপর্যশূন্য ও আবেদনরিক্ত আচারমাত্র, সমাজের শাসন বিলুপ্ত, সমাজের নিন্দা উপেক্ষিত, রাষ্ট্রের প্রশাসনপদ্ধতি 'দুর্জনেরে রক্ষা করে এবং দুর্বলেরে হানে।' দুষ্ট-দুর্জন-দুবৃত্ত আর দুর্নীতি-দুর্বৃত্তি-দুষ্কৃতি প্রশ্রয় পায় যে প্রশাসনিক ব্যবস্থায়, যেখানে শতকরা আশিজন মানুষের অন্ন-বস্ত্রের সঙ্কট নিত্যকার, অনাহার-অর্ধাহার-নিঃস্বতা-দারিদ্র্য মানুষের নিত্যসঙ্গী, যেখানে শতকরা নিরানব্বইজনের আর্থিক জীবন অনিশ্চয়তার ও সঙ্কটের শিকার, সেখানকার ব্যক্তি, পরিবার, গোষ্ঠী, সমাজ গাঁ-গঞ্জ শহর বন্দর নির্বিশেষে নিশ্চিতই-নৈতিক, আদর্শিক, শাস্ত্রিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও বৈষয়িক ক্ষেত্রে চিন্তায়-চেতনায় লক্ষ্যে বিশ্বাসে, কর্মে ও আচরণে অবক্ষয়-কবলিত না হয়েই পারে না। তখন মানুষ অন্নেবস্ত্রে প্রাণরক্ষার জন্যে মরীয়া হয়ে ওঠে এবং যেহেতু অভাব স্বভাব নষ্ট করেই, অভাব ঘুচলেই অভ্যাস পরিহার করে স্বভাবে কেউ আর ফিরে আসে না।

সৎমানুষ যে সরল হয়, নীতিনিষ্ঠ মানুষ যে কূটকৌশল বিরোধী, সততা যে বুদ্ধিহীনতা নয়, ভীরুতাও নয়, দারিদ্র্যমাত্রই যে অক্ষমতা-অযোগ্যতাজাত নয়, নির্লোভতা যে অসামর্থ্য নয়, ভেজালে-চোরাচালানে ঘুষে-জালে-জুয়ায়-প্রত্যারণায়-অনীহা যে সাহসের ও বুদ্ধির অভাবজাত নয়, পরার্থপরতা যে আত্মহনন নয়, চালাকি চাতুরি যে গুণ নয়, নয়, পরার্থপরতা যে আত্মহনন নয়, চালাকি চাতুরি যে গুণ নয়—তা অবক্ষয় কবলিত দেশে কেউ বিশ্বাস করতে চায় না।

তা হলে সামন্ত-প্রবৃত্তিদুষ্ট বুর্জোয়া ঔপনিবেশিক প্রতিবেশে দারিদ্র্য কবলিত দেশে-কালে-সমাজে বাঞ্ছিত সংখ্যক মানুষের মধ্যে নৈতিক-চেতনা পুনঃপ্রবর্তনের উপায় কি? একটি উপায় হচ্ছে চালু নিয়ম নীতি, শাস্ত্র সমাজ এবং জীবিকাক্ষেত্রে উৎপাদন-বণ্টন-বাণিজ্য প্রভৃতির সর্বাত্মক পরিবর্তন তথা সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠা। অর্থাৎ সব মানুষকে রাষ্ট্রিক নিয়ম-নীতির ও আইনের অনুগত করে প্রাশানিক ব্যবস্থার মাধ্যমে সংযত রাখা ও স্বাধিকারে সহাবস্থানে ও সহযোগিতায় দীক্ষা দেয়া। এটি দার্শনিক কান্টের 'Categorical Imperative' নীতির অনুগত ব্যবস্থাও বটে। অন্য উপায় হচ্ছে— যেহেতু মানুষ শৈশবে-বাল্যে-কৈশোরে পরিবার পরিজনের বিশ্বাস-সংস্কার-আচারের ও ভাব-চিন্তা-কর্ম-আচরণের প্রভাবে জগৎ জীবন জীবিকা সম্বন্ধীয় মত-পথ-নীতি-আদর্শ বরণ গ্রহণ করে, সেহেতু পরিবারে বয়স্কদের মধ্যে নৈতিকচেতনা ও আচরণ অনুশীলিত হলে নতুন প্রজন্মের মানুষের সমাজ সাধারণভাবে বাঞ্ছিত মাত্রায় নীতিনিষ্ঠ হবে। কিন্তু যে-দেশে শতকরা নিরানব্বই জন মানুষ প্রাত্যহিক জীবনে কেবল খেয়ে পরে বাঁচার

সংগ্রামে পরিশ্রান্ত ও পর্যুদস্ত, সে-দেশে দার্শনিক কান্ট [১৭২৪-১৮০৪] কথিত কামনা-বাসনার আবেগরিক্ত নৈতিকতা ও যুক্তি কিংবা তাত্ত্বিক শুভবুদ্ধি বা সদিচ্ছা কি মানুষের মন-মত-নীতি-আদর্শের পরিবর্তন ঘটাতে পারে!

তৃতীয় পন্থা হচ্ছে, প্রত্যহিক জীবনে ভাত-কাপড়ের অনিশ্চয়তামুক্ত ন্যূনতম আর্থিক সচ্ছল সমাজ গড়ে তোলা— যাতে স্বাধীনভাবে অনেকেই পরার্থে তথা দেশ জাতি-সমাজ সংস্কৃতি ও মানুষ সম্বন্ধে হিতকর মহৎ ও সুন্দর চিন্তা-চেতনার অনুশীলন করতে পারে। জগৎ ও জীবন, মানুষ ও সমাজ, শ্রেয়স ও প্রেয়স, নীতি ও আদর্শ, বিবেক ও বিচার ও সম্বন্ধে মানুষের চিন্তা চেতনা গভীরতায় ও ব্যাপ্তিতে উৎকর্ষ লাভ করে এভাবেই। এমনি সমাজেরই ভিত্তি হয়ে ওঠে শুভ ও সূক্ষ্মবুদ্ধি, যুক্তি ও নৈতিকতা। এর জন্যে চাই ব্যক্তির ও পারিবারিক জীবনের মতো রাষ্ট্রিক স্বনির্ভরতা ও কৃচ্ছতা—ঋণ-দান-অনুদান নির্ভরতা নয়। কিন্তু এমনি বিবেক-বিচার-যুক্তি-বুদ্ধি-নৈতিকতা নির্ভর দেশ ও সমাজ গড়ার জন্যে চাই দেশানুরাগী মানবপ্রেমী গুণ-জ্ঞান বুদ্ধিসম্পন্ন যোগ্য রাষ্ট্রনায়ক এবং নীতিনিষ্ঠ কর্মঠ কর্তাগোষ্ঠী— যাঁরা আইনকানুন ও প্রাশাসনিক নীতি-নিয়ম ঢেলে সাজাবেন মানুষ নির্বিশেষের কল্যাণ লক্ষ্যে।

গণ মুক্তির পূর্ব শর্ত

প্রকৃতির জগতে কিছুই বৃথা পড়ে থাকে না। শূন্য থাকে না কোন স্থান। কেউ না কেউ, কিছু না কিছু তা ভোগ করে, কারো না কারো ব্যবহারে লাগে। লঘু-গুরু-উপযোগ থাকে সব কিছুর। পতিত জমিতে যেমন আগাছা জন্মায়, তেমনি জ্ঞান-যুক্তিশূন্য মনে জাগে কল্পনা ও কৌতূহল—আর তা থেকেই উদ্ভব সংস্কারের এবং সংস্কার দৃঢ়মূল হলে তা বিশ্বাসরূপে পায় স্থায়িত্ব এবং এ বিশ্বাস-সংস্কারই নিয়ন্ত্রণ করে অজ্ঞ মানুষের ভাব-চিন্তা-কর্ম-আচরণ। এমনি ব্যক্তির, সমাজের কিংবা জাতির বন্ধ্যা জীবনে আবর্তন থাকে, থাকে বিকৃতি, থাকে অবক্ষয়—বৃদ্ধি-বিকাশ কিংবা গতি-প্রগতি থাকে না। অথচ বিবর্তনই হচ্ছে কাম্য, কেননা বিবর্তন গতির, অগ্রসরমানতার, উৎকর্ষের ও প্রগতির লক্ষণ।

তরুলতার বৃদ্ধির জন্যে যেমন নব নব কিশলয়ের উদ্ভব আবশ্যিক এবং পুরোনো পাতার ভার কমানো প্রয়োজন, এবং সে-কাজ প্রকৃতিই করে সময়মতো পুরোনো পাতা ঝরিয়ে ও নব পল্লব গজিয়ে প্রয়োজন সম্মত ও যুক্তিসঙ্গত নিয়মের নিয়ন্ত্রণ চালু রেখে, মানুষের স্বরচিত জীবনাচারে প্রকৃতির শাসন অচল বলেই মানুষের বিকাশ-বৃদ্ধির জন্য তেমনি সব প্রয়োজনীয় ও আবশ্যিক কাজ মানুষকেই সচেতনভাবে করতে হয়, পালন করতে হয় জীবন ধারণের সব দায়িত্ব ও কর্তব্য।

> যেহেতু প্রকৃষ্ট জ্ঞান কখনো কাউকে প্রতারিত করে না, যুক্তির আশ্রয় মানুষকে আত্মপ্রত্যয়ী করে এবং বুদ্ধি মানুষকে সতর্ক সিদ্ধান্ত গ্রহণে সাহায্য করে, সেহেতু জ্ঞান-যুক্তি-বুদ্ধির সার্বক্ষণিক অনুশীলনই মানুষের জীবনযাত্রার নির্ভরযোগ্য পুঁজি ও পাথেয়।

যেহেতু প্রকৃষ্ট জ্ঞান কখনো কাউকে প্রতারিত করে না, যুক্তির আশ্রয় মানুষকে আত্মপ্রত্যয়ী করে এবং বুদ্ধি মানুষকে সতর্ক সিদ্ধান্ত গ্রহণে সাহায্য করে, সেহেতু জ্ঞান-যুক্তি-বুদ্ধির সার্বক্ষণিক অনুশীলনই মানুষের জীবনযাত্রার নির্ভরযোগ্য পুঁজি ও পাথেয়।

মানুষের ভাব-চিন্তা-কর্ম-আচরণের কিংবা হাতিয়ার প্রভৃতি জীবন-যাত্রার অবলম্বনগুলোর বিকাশ বিবর্তন ধারাও ব্যক্তি মানুষের শৈশব বাল্য কৈশোর যৌবন প্রৌঢ়ত্ব প্রভৃতির সঙ্গে তুলনীয়। কাজেই ইতিহাসের ধারায় রত অতীতের দিকে তাকায় ততই মানুষের কাঁচা মনের, অপরিণত বুদ্ধির, অপটু হাতের, আনাড়িপনার, অজ্ঞতার, আত্মপ্রত্যয়হীনতার, ভীরুতার, কল্পনাপ্রিয়তার, স্থূলতার, অক্ষমতার, জাদু-ট্যাবু-টোটেম-বিশ্বাস-সংস্কার-নির্ভরতার সাক্ষ্য প্রমাণ পাব। অতএব অতীতে লব্ধ-জ্ঞান-অভিজ্ঞতা-প্রজ্ঞা, উপলব্ধ ও অনুভূত সত্য ও শ্রেয়স্ স্থূল, ত্রুটিবহুল, অপূর্ণ এবং তথ্য ও তত্ত্বগত ভ্রান্তিজড়িত।

মানুষের মানসিক ও ব্যবহারিক বিকাশধারার তথা সভ্যতা-সংস্কৃতির বিকাশ-বিবর্তন প্রবাহে কিছু কিছু জিজ্ঞাসু, কৌতূহলী, সংশয়-সন্দেহ পরায়ণ মানুষ স্বীকৃত পুরোনো সত্যে ও শ্রেয়সে আস্থা হারিয়ে চালু বিশ্বাস সংস্কারের যাথার্থ্যে সন্দিহান হয়ে, প্রচলিত হাতিয়ারে ও জীবন-যাপন পদ্ধতিতে তুষ্ট না থেকে নতুন জিজ্ঞাসা, কৌতূহল, সংশয়, উদ্যম নিয়ে আবিষ্কারে উদ্ভাবনে এবং জ্ঞান-যুক্তি-বুদ্ধি দিয়ে বিচার বিশ্লেষণে একদিকে নতুন তথ্য, তত্ত্ব, বস্তু, হাতিয়ার, নিদান আবিষ্কার-উদ্ভাবন করেছে, অন্যদিকে অযৌক্তিক, অসঙ্গত বিশ্বাস-সংস্কার ও আচার-আচরণ নিয়ম-নীতি ও রীতি-পদ্ধতি বর্জন করে, জ্ঞান-যুক্তি-বুদ্ধির সমর্থন নিয়ে প্রয়োজন মতো নতুন নতুন নীতি-নিয়ম গ্রহণ-বরণ করেছে।

নতুন সত্যের ও তথ্যের কিংবা বস্তুর বা কৌশলের আবিষ্কারক উদ্ভাবক পৃথিবীতে চিরকালই দুর্লভ এবং আজ অবধি নগণ্য সংখ্যক মনীষী বিজ্ঞানীর দানেই সভ্যতা-সংস্কৃতি, যন্ত্র ও কৃৎকৌশল-প্রকৌশল প্রযুক্তি, রোগ নিরূপণ ও প্রতিষেধক ওষুধ আবিষ্কার-উদ্ভাবন পৃথিবীর সব মানুষেরই সম্পদ।

বৈষয়িক ব্যবহারিক জীবনে নতুন আবিষ্কৃত উদ্ভাবিত যে যন্ত্র, ওষুধ, বস্তু আমরা সাগ্রহে গ্রহণ ও ব্যবহার করি, তাতে দ্বিধা সংকোচ থাকে না, প্রয়োজন হয় না কোন শাস্ত্রিক সামাজিক কিংবা রাষ্ট্রিক ফতোয়ার। কিন্তু মানসক্ষেত্রে কোন নতুন চিন্তা, চেতনা, যুক্তি, সত্য ও শ্রেয়স, তথ্য ও তত্ত্ব গ্রহণে আমাদের যত বাধা বিপত্তি ও আপত্তি। চক্ষু গ্রাহ্য নয় বলেই নতুন চিন্তার, চেতনার, যুক্তির, সত্যের, শ্রেয়সের তথ্যের ও তত্ত্বের উপযোগ আমাদের বোধগত হয় না। কেননা, মনে-মননে আমরা সাধারণ মানুষেরা প্রায়ই পরবুদ্ধি, পরচিন্তানির্ভর নিষ্ক্রিয় মানুষ। পুরোনো শাস্ত্রবিধি, সমাজনীতি, আচার-নিষ্ঠা আমাদের মন-মনন নিয়ন্ত্রণ করে, জ্ঞান-প্রজ্ঞা-যুক্তি-বুদ্ধিকে রাখে আড়ষ্ট। এর ফলেই ধার্মিক ইহুদি সাঁইত্রিশ শত বছর পূর্বেকার মানস পরিমণ্ডলে, জৈন-বৌদ্ধ আড়াই হাজার বছর আগেকার সত্যের ও শ্রেয়সের ভুবনে, হিন্দু তিন হাজার বছর পূর্বেকার জগতে, মুসলিম সাড়ে তেরোশ বছর আগেকার নিয়ম-নীতির পৃথিবীতে মানস তুষ্টি ও তৃপ্তি নিয়ে ইহ-পরলোকে প্রসৃত জীবনযাপন করে। তাই আমাদের যন্ত্রনিয়ন্ত্রিত আজকের জীবনে যেমন স্ব ও সমকালীনতা রয়েছে, আমাদের মানস জগতে তেমনটি নেই। তার ফলেই শাস্ত্রিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক, আর্থিক, নৈতিক, আদর্শিক, আচারিক ও রাষ্ট্রিক জীবনে আমাদের দেশে জাতে-জাতে, বর্ণে বর্ণে, জীবন-জীবিকার সর্বক্ষেত্রেই মতের পথের

স্বার্থের উদ্দেশ্যের ও লক্ষ্যের পার্থক্য রয়েছে, রয়েছে কাড়াকাড়ির ঠোকাঠুকির, মারামারির, হানাহানির হাজারো কারণ।

প্রাণী হিসেবে বৃত্তি-প্রবৃত্তি পরবশ মানুষে মানুষে লোভ-লালসা, ঈর্ষা-অসূয়া রিরংসা ও অন্য নানা স্বার্থজাত প্রতিযোগিতা-প্রতিদ্বন্দ্বিতা এবং তজ্জাত সংঘর্ষ-সংঘাত কখনো এড়ানো যাবে না বটে, তবে জ্ঞান-প্রজ্ঞা-যুক্তি-বুদ্ধির অনুশীলনে ও প্রয়োগে কমানো অবশ্যই যাবে, বিরল করে তোলাও হবে সম্ভব। অতীতমুখী ও অতীতাশ্রয়ী বন্ধ্যা মন-মননের কারণে পুরোনো শাস্ত্রিক নিয়ম নিগড় সামাজিক রীতি-নীতি, আচারিক প্রথা-পদ্ধতি প্রয়োজন মতো সচেতনভাবে পরিহার করা সাধারণ মানুষের পক্ষে সম্ভব না হলেও জীবন-জীবিকার ক্ষেত্রে হাতিয়ারের পরিবর্তনে ও উৎকর্ষে এবং ব্যবহার্য নানা যন্ত্রের ও বস্তুর বৃদ্ধিতে আর প্রকৌশল-কৃৎকৌশলের প্রসারে মানুষ মন্থর গতিতে হলেও প্রায় অবচেতন-অজ্ঞাত ভাবেই এগুচ্ছে। তাই শাস্ত্রের, সমাজের, আচারের, নিয়ম-নীতির, রীতি-পদ্ধতির অনেক কিছুরই সে স্বেচ্ছায় পরিহার করেছে, করছে ও করবে, তেমনি তার অজ্ঞাতেই তার বিশ্বাস সংস্কারের দুর্গের জীর্ণ দেয়ালও ভেঙেছে, ভাঙছে ও ভাঙবে, সংস্কারের শিকড় যাচ্ছে মরে, বিশ্বাসের ভিত টলছে জ্ঞান-বিজ্ঞান-যন্ত্রের প্রভাবে কিংবা অভিঘাতে। সূতিকা, এনিমিয়া, হিস্টিরিয়া, কলেরা, বসন্ত রোগের প্রতিষেধক ওষুধ বের হওয়ায় ঝাড়ফুকে, দারুটোনায়, তুকতাকে, মন্ত্রে মাদুলিতে মানুষের নির্ভরতা কমেছে। আজ আর দেও-দৈত্য-দানুর, ভূত-প্রেত-পিশাচের জীন-পরী-ডাইনির, শীতলা, ওলা, যক্ষ প্রভৃতি দেবতার অস্তিত্বে বাঘ-সিংহ-সর্পের দেবত্বে মানুষের আস্থা নেই। গানে বাজনায় অভিনয়ে, যাত্রায় নাটকে সিনেমায়, নারী-পুরুষের সহ-শিক্ষায়, অফিসে-বিমানে কারখানায় সহ-কর্মে, দোকানে-বাজারে পথে প্রান্তরে বিনা বোরখা-অবগুণ্ঠনে ঘুরে বেড়ানোতে, ক্রীড়ায় অভিনয়ে পুরুষের সহযোগী হওয়াতে কারো পাপ-ভয় নেই আজকাল। এমনি করে ব্যক্তি ও সমাজ পুরোনো বিশ্বাস-সংস্কার-আচারের খোলস পরিহার করে কালের ও প্রয়োজনের দাবি মিটিয়েছে, মেটাচ্ছে ও এমনিভাবে মেটাতে থাকবে। জ্ঞান-যুক্তি-বুদ্ধির অনুগত এবং দেশকাল প্রতিবেশ নিয়ন্ত্রিত জীবনের ও জীবিকার প্রয়োজন সচেতন মানুষই পুরোনো পরিহার করে নতুনকে গ্রহণ করে। এভাবেই পুরোনো শাস্ত্রের প্রভাব, সমাজনীতির শাসন, সংস্কারের বাঁধন ও বিশ্বাসের নিগড় থেকে মানুষ মুক্তি পাচ্ছে প্রতিদিন। জ্ঞান-প্রজ্ঞা-যুক্তি-বুদ্ধির প্রয়োগে মানুষ ক্রমে প্রতিবেশী মানুষের প্রতি তার মানবিক দায়িত্ব ও কর্তব্য সম্বন্ধে হবে সচেতন। তখন প্রতি মানুষের মৌল মানবিক অধিকার ও প্রত্যেক ব্যক্তির স্বাধিকার প্রতিষ্ঠার আগ্রহ জাগবে। জ্ঞান-যুক্তি-বুদ্ধির অনুগত মানুষ শোষিত-পীড়িত মজলুম মানুষের মুক্তির জন্যে একালে সংগ্রাম করছে, উৎপাদনে বণ্টনে নির্বিশেষ মানুষের ন্যায্য অধিকার স্বীকার করে তার প্রতিষ্ঠার জন্যে লড়াই করছে। পুরোনো বিশ্বাস-সংস্কারের ও শাস্ত্র-সমাজের নিয়ম-নীতির শাসনমুক্ত মানুষ সমাজতন্ত্র ও সাম্যবাদ অঙ্গীকার করে বাঞ্ছিত নতুন সমাজ গড়ে তুলবে। সে-সমাজে মানুষ সমস্বার্থে স্বাধিকার সহিষ্ণুতায় সহযোগিতায় সহাবস্থানে জীবন-জীবিকার নিশ্চয়তায় ও নিরাপত্তায় আশ্বস্ত থাকবে। এ ক্ষেত্রে মানুষের মানস-মুক্তি তথা জ্ঞান-প্রজ্ঞা-যুক্তি-বুদ্ধি-নিষ্ঠাই সাফল্য ত্বরান্বিত করবে। তেমন দিন আসবেই। আপাতত মানুষের মানস-মুক্তিই জরুরি। মুক্তবুদ্ধিই সমাজ পরিবর্তনের সহায়। অতএব মানস-মুক্তিই মজলুম মানব মুক্তির পূর্বশর্ত।

গনমুক্তিযোদ্ধার যোগ্যতা

এ পুরোনো পৃথিবী প্রতিবছরে একবার আবর্তিত হলেও প্রতি মানুষের জীবনে তা নতুন করে হয় প্রতিভাত। শিশু চোখ মেলে বিস্ময় ও কৌতূহল নিয়ে প্রত্যক্ষ করে এ রূপের জগৎ, হৃদয়ে অনুভব করে এর বৈচিত্র্য, আগ্রহ জাগে তার একে ঘনিষ্ঠভাবে দেখবার, জানবার ও বুঝবার। বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে তার জিজ্ঞাসা যায় বেড়ে, জ্ঞান পায় বৃদ্ধি, অনুভূতি হয় গভীর, আকাঙ্ক্ষা জাগে তার এ জগৎকে ও জীবনকে সাধ্যানুসারে মনোগত করে জানতে, বুঝতে ও আয়ত্তে আনতে। ক্রমে চাওয়া পাওয়ার, আশা-হতাশার মধ্যকার বাধা-বিঘ্ন তাকে জানিয়ে দেয়, সচেতন করে তোলে জগতের ও জীবনের স্বরূপ সম্বন্ধে। তখন সে উপলব্ধি করে যে এখানে ভোগ-উপভোগের সামগ্রী, সুখ ও আনন্দ অনায়াসে প্রাপ্য নয়। এ জীবনে প্রায় সবকিছুই আকাঙ্ক্ষা, আগ্রহ, উদ্যম, শ্রম, যোগ্যতা, প্রতিযোগিতা ও প্রতিদ্বন্দ্বিতার মাধ্যমে লভ্য। এ জগতে প্রকৃতি ও মানুষ কেউ অজ্ঞের, অক্ষমের, নিষ্কর্মার নির্বোধের বন্ধু নয়। সবকিছুই জ্ঞান-বুদ্ধি-সাহস-আত্মপ্রত্যয়-প্রজ্ঞাযোগে মনোবল বাহুবল ও ধনবল প্রয়োগে অর্জন করতে হয়। সুখ-সম্মান-সম্পদ শূরেরই প্রাপ্য। এখানে তাই সবকিছু যোগ্যতাবলে জয় করে নিতে হয়। সেটা নৈতিক যোগ্যতা নাও হতে পারে। ধূর্তের ছল-চাতুরি, চালাকি, জাল-জুয়া-প্রতারণায় পটুতাও —নিন্দনীয় আর ঘৃণ্য হলেও— যোগ্যতা। যোগ্যের, যোগ্যতরের ও যোগ্যতমের উদ্বর্তন তত্ত্বও স্মর্তব্য। বসুন্ধরা যে বীরভোগ্য তা তো আদিকালেই আদিমানবগোষ্ঠীই টের পেয়েছিল। শক্তি ও কৌশল প্রয়োগে প্রকৃতির হামলাও যায় এড়ানো। আর প্রকৃতিকে সুকৌশলে বশে এনে দাসের মতোই ভোগ-উপভোগের বস্তু ও যোগানদার করেছে মানুষ।

দুনিয়ার জীব উদ্ভিদ কারো অস্তিত্ব নিরাপদ-নির্বিঘ্ন নয় বলেই অস্তিত্বের রক্ষণ-পোষণ দ্বন্দ্ব-সংঘাত-সঙ্কুল। এখানে প্রতিকূল পরিবেশে জীব উদ্ভিদ নির্বিশেষে সবাই স্বপ্রজাতির ও ভিন্ন প্রজাতির সঙ্গে প্রতিযোগিতা প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে অস্তিত্ব রক্ষার প্রয়াসে ও সংগ্রামে জয়ী হয়েই কেবল টিকে থাকতে পারে। কেন না, ভালো ও মন্দ, শত্রু ও মিত্র, সবল ও দুর্বল, সুজন ও দুর্জন, সুবৃত্তি ও দুর্বৃত্তি, ধনাত্মক ও ঋণাত্মক, অধি ও উন এ দুই বিপরীত শক্তির দ্বান্দ্বিক সংযোগ-সংঘাত ও ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া জগতের জীবনের গতিশীলতার চলমানতার মূল কারণ। এ অনেকটা তড়িৎ তারের পজেটিভ নেগেটিভের সংযোগ-সংঘর্ষ জাত ক্রিয়াশীলতার মতোই। স্রষ্টা ও শয়তান, সুর ও অসুর, সৎ ও অসৎ, জড়-জীব-প্রকৃতি ও প্রবৃত্তি খাদ্য ও খাদক তত্ত্বের উদ্ভব মানুষের জীবনে অনুভূত উপলব্ধ অভিজ্ঞতা থেকেই।

জগৎ ও জীবন, সৃষ্টি ও স্রষ্টা, জন্ম ও মৃত্যু, প্রকৃতির রূপবৈচিত্র্য আর্তব পরিবর্তন, ঝড়-ঝঞ্ঝা খরা, রোদ-মেঘ-বৃষ্টি সম্বন্ধে মানুষের আদি ও আদিম কৌতূহল ও জিজ্ঞাসা, বিস্ময় ও বিশ্বাস, ভয় ও ভরসাজাত নানা কাল্পনিক কারণ-কার্য সম্পৃক্ত সংস্কার ও প্রত্যয় হাজার হাজার বছর ধরে মানুষের জগৎ-জন্ম-জীবন-মৃত্যু চেতনা নিয়ন্ত্রিত ও নিয়মিত করেছে। এসব বিশ্বাস সংস্কার কল্পনাজাত শাস্ত্রের বিধি নিষেধেও সমাজের নীতি ও নিয়মে অতৃপ্তি, সন্দেহ ও অনাস্থা জাগার ফলে, ভাবপ্রবণেরা উদ্ভাবন করেছেন মননে-চিন্তনে নতুন নতুন দার্শনিক তত্ত্ব এবং কারণ। সন্ধিৎসু বৈজ্ঞানিকরা আবিষ্কার করে চলেছেন নতুন নতুন তথ্য। এভাবে জ্ঞান-প্রজ্ঞা-বুদ্ধি-কৌশলযোগে একদিকে প্রকৃতিকে— বিরুদ্ধ শক্তিকে বশ করে কিংবা তোয়াজে, তোষামোদে, তুকেতাকে, তাবিজে কবচে, ঝাড়ে-ফুঁকে, মন্ত্রে-মাদুলিতে প্রাকৃতিক অরিশক্তিকে

কাবু বা অনুগত করে মানুষ নির্বিঘ্নে নিশ্চিন্তে বাঁচার সাধনা করছে, অন্যদিকে ওই জ্ঞান-বুদ্ধি-সাহস-সাধনা বলে দৃশ্য-অদৃশ্য-প্রাকৃতিক শক্তির রীতি-নিয়ম রহস্য স্বরূপে আবিষ্কার করে মানুষ আত্মরক্ষার ও আত্মবিকাশের পথ পদ্ধতি উদ্ভাবন করেছে। এখন মানুষ গগনের, গ্রহলোকের, জলের, স্থলের, ঋতুর আবর্তনের, জীব-জীবনের ও প্রাকৃত জগতের নানা রূপ রহস্য, জন্ম-জীবন-মৃত্যুর কারণ-ক্রিয়া, পৃথিবীর সর্বাত্মক বৃত্তাবদ্ধনিয়মের বেড়াজালে জীব-উদ্ভিদের স্ব স্ব বিচিত্র ভূমিকা বিজ্ঞানী মানুষ বহু সাধনায় আবিষ্কার করে আজ প্রকৃতি ও প্রাকৃতিক নিয়মের ওপর অনেকখানি প্রভূত্ব করতে সমর্থ হয়েছে। আদিকাল থেকে মানুষের প্রজন্মক্রমিক জ্ঞান-প্রজ্ঞা-যুক্তি-বুদ্ধি-বৃদ্ধির এবং অভিজ্ঞতা প্রসূত কৌশলে ও হাতিয়ারে উৎকর্ষ ঘটার ফলেই মানুষের কল্পনার, বিশ্বাসের, জ্ঞানের ও যুক্তির ভিত বারবার বদল হয়েছে। ফলে তাদের মনগড়াশাস্ত্রের বিধি-নিষেধ, সমাজের নীতি-নিয়ম, সংস্কারচালিত রীতি-পদ্ধতি এবং সামগ্রিকভাবে তাদের জগৎ-চেতনা ও জীবন-ভাবনা পরিহারে, পরিশোধনে, পরিগ্রহণে পুনঃ পুনঃ পাল্টাতে হয়েছে। তাই জগতের সর্বত্র নতুন নতুন ধর্মশাস্ত্রের ও সমাজের নীতি-নিয়মের উদ্ভবের ও বিলোপের ইতিহাস সুদীর্ঘ ও সুবিস্তৃত। এভাবে জানার ও বোঝার, যুক্তির ও বুদ্ধির কার্য-কারণ সম্বন্ধ-চেতনার ও প্রাকৃতিক নিয়মজ্ঞানের প্রসারের ফলে দুনিয়ার সর্বত্র ভূত প্রেত পিশাচ-দেব -দৈত্য-নিয়তি নিয়ন্ত্রিত মানব সমাজের পুরোনো বিশ্বাস-সংস্কার আচার-ট্যাবু-টোটেম বর্জনে নতুনতর দেবতা-দানব-নিয়তি বরণে আবর্তন-বিবর্তন ঘটেছে। এভবেই পরবর্তীকালের প্রবর্তিত ধর্মের প্রভাবে গ্রিস রোম মিশর প্রভৃতি দেশের দেবতা গোষ্ঠীর বিলুপ্তি ঘটেছে। কেবল ভারতেই জৈন-বৌদ্ধ- এই দুটো ব্যক্তি প্রবর্তিত মতবাদের প্রসার সত্ত্বেও কাল্পনিক নানা গুণগত বিবর্তন পেয়েও অমূর্ত সুরাসুর নিয়ন্ত্রিত শাস্ত্রে আনুগত্য মানুষের প্রাত্যহিক জীবনের ভাবচিন্তা-কর্ম-আচরণে রয়ে গেছে।

অবশ্য ভূত-প্রেত-পিশাচ-দেব-দৈত্য প্রভৃতি পৃথিবীর বিভিন্ন সমাজে সম্প্রদায়ে ভিন্ন ভিন্ন নামে অমূর্ত-অদৃশ্য অরি বা মিত্র শক্তিরূপে আজো পূজা-সিন্নি মানত পেয়ে থাকে। এ তথ্যের সাক্ষ্যে বলা চলে যে মানুষ মাত্রই কোন না কোন প্রকারের পৌত্তলিক —এ তার সহজাত স্বভাব। তবু মানুষ যুক্তি বুদ্ধি বলে ভিরু প্রাণীসুলভ ওই দুর্বলতা পরিহার করে একক অর্মৃত উপাস্যের অনুগত হয়েছে, সাহসী আত্মপ্রত্যয়ী ও যুক্তিনিষ্ঠ মানুষেরা নাস্তিকও হয়েছে, একালে নাস্তিক্য যুক্তিপ্রবণ মানুষের নির্ভীক চিত্তে প্রশ্রয়ও পাচ্ছে। কল্পনার, বিশ্বাসের, শাস্ত্রের, ন্যায়-অন্যায়ের ও পাপ-পুণ্যের ধারণার পৃথিবীব্যাপী এই কালিক ও স্থানিক পরিবর্তনই নিঃসংশয়ে প্রমাণ করে যে ভূত-প্রেত-পিশাচ, জীন-পরী, দেবতা-দানব-আসমানি দিন-ক্ষণ-তিথি নক্ষত্র-রাশিচক্র, ভাগ্য, নিয়তি প্রভৃতি দৃশ্য-অদৃশ্য পূজ্য-উপাস্য, অরি-মিত্র শক্তি নিতান্তই আত্মপ্রত্যয়হীন অজ্ঞ অসহায় ভীরু মানুষের কল্পনাপ্রসূত। স্রষ্টা ও সৃষ্টি, জগৎ ও জীবন, জন্ম ও মৃত্যু জিজ্ঞাসা এবং অরি-মিত্র শক্তির জীবন-জীবিকা নিয়ন্ত্রণ-চেতনা প্রভৃতি ভরসাকামী ভীরু মানুষের অনিশ্চিত জীবনে জীবিকায় আত্মপ্রবোধ প্রাপ্তির মানসিক অবলম্বন রূপেই কল্পিত।

আজকের বিজ্ঞানের অচিন্তনীয় আবিষ্কার উদ্ভাবনের ফলে এবং মর্ত্য ও মহাশূন্য, দেহ ও মন সম্বন্ধে বৈজ্ঞানিক জ্ঞানের প্রসারে ও উৎকর্ষে আমাদের পুরোনো অনেক বিশ্বাস, সংস্কার, যুক্তি ও কার্যকারণ জ্ঞান অলীক প্রমাণিত হয়েছে, তাসের ঘরের মতো ভেঙে পড়েছে আমাদের বিশ্বাস-সংস্কারের, আচারের ও নীতি-নিয়মের দুর্গ। রোগের কারণ, নিদান ও প্রতিষেধক ওষুধ আবিষ্কারের ফলে ওলা-শীতলা প্রভৃতি অনেক দেবতাই অস্তিত্ব হারিয়েছে— হারাচ্ছে, বিশ্বাস

সংস্কার যাচ্ছে উবে, তুক-তাক-মন্ত্র-মাদুলি-ঝাড়-ফুঁক হচ্ছে অকেজো। এভাবে পৃথিবীতে জ্ঞানমার্গী, যুক্তিবাদী বিজ্ঞানবুদ্ধিসম্পন্ন মানুষের সংখ্যা দ্রুত বাড়ছে বটে, তবু অজ্ঞ ও স্বল্প জ্ঞানের দুর্বলচিত্ত মানুষের সংখ্যা বেশি বলেই তারা পুরোনো শাস্ত্র-শাসনের কবলমুক্ত হতে পারেই না মানসিকভাবে। তাই ব্যক্তিতে, পরিবারে, সমাজে, রাষ্ট্রে ও সরকারে আজো জ্ঞান-বিজ্ঞান যুক্তির প্রভাব সর্বাংশে স্বীকৃত নয়। এ কারণেই পৃথিবীর সর্বত্র আজো শোষণ-দলন-বঞ্চনামুক্ত গণমানবসমাজ দুর্লভ।

গণমুক্তির লক্ষ্যে সমাজ পরিবর্তন করতে হলে পুরোনো বিশ্বাস-সংস্কার ও নিয়ম-নীতি মুক্ত, যুক্তি ও বিজ্ঞানমনস্ক বাঞ্ছিত সংখ্যক আদর্শবান কর্মনিষ্ঠ মানুষপ্রেমী নাগরিক প্রয়োজন। কেননা পুরোনো বিশ্বাসে সংস্কারে শাস্ত্র-বিধিতে, সমাজনীতিতে রয়েছে প্রবলশ্রেণীর স্বৈরসামন্ত ব্যবস্থার বৈধকৃত জুলুমের ও নির্বিশেষ মানুষকে মৌলমানবিক অধিকার থেকে বঞ্চিত রাখার অভিসন্ধিজাত বিধি-বিধান। দেহে-মনে-মননে-আদর্শে স্বস্থ ও সুস্থ থেকে দেশ-জাতি-মানুষের জীবনে জীবিকায় স্বাধিকার প্রতিষ্ঠা লক্ষ্যে তারাই করবে আপসহীন বিরামহীন সংগ্রাম। যুক্তিনিষ্ঠ আত্মসম্মান-সচেতন বিবেকবান মানুষ জেনে বুঝে কোন অন্যায় অপকর্ম করতে দশবার ভাবে। এমন মানুষেরাই মানুষের জীবন-জীবিকার নিশ্চিত নিরাপত্তা সামাজিক ন্যায় প্রতিষ্ঠা, স্বাস্থ্যের উন্নতি, শিক্ষার বিস্তার, সংস্কৃতির বিকাশ, সম্পদের প্রাচুর্য, স্বস্তি-সুখের ব্যবস্থা ও আনন্দের আয়োজন লক্ষ্যে ত্যাগ-তিতিক্ষা-ধৈর্যশীল হয়ে কাজ করে যায়। কাজেই সমাজ পরিবর্তনের জন্যে প্রথমেই প্রয়োজন বিভিন্ন সামাজিক ও আর্থিক অবস্থানে পূর্ব সংস্কারমুক্ত, বিজ্ঞানমনস্ক, জ্ঞানমার্গী, যুক্তিবাদী ন্যায়নিষ্ঠ বাঞ্ছিত সংখ্যার মানুষ। এমনি মন-মননের, রুচি-বুদ্ধির মানুষই আমাদের পচনধরা মস্তান-দুষ্ট বদ্ধসমাজ থেকে উদ্ধার করতে পারে। আমরা আশাবাদী, তাই তেমন মানুষের, যুবশক্তির প্রতীক্ষারত।

অবক্ষয় কবলিত বাঙলাদেশ

একজন সাধারণ স্বস্থ ও সুস্থ মানুষের কিছু পরিমাণে দায়িত্ব ও কর্তব্যবোধ, নীতিনিষ্ঠা ও শ্রেয়োচেতনা, আত্মপ্রত্যয় ও জীবনস্বপ্ন থাকা স্বাভাবিক। সবার মধ্যে নৈতিকচেতনা, আত্মবিশ্বাস ও শ্রেয়োবোধ সমান থাকে না, কারো কারো মধ্যে এসব গুণ সুপ্তই থেকে যায়। তাই কোন সমাজেই কোন কালেই মানুষের বৌদ্ধিক, নৈতিক, শৈক্ষিক, আর্থিক ও চারিত্রিক বিকাশ সমভাবে হয় না। সর্বপ্রকার দোষে দুষ্ট মানুষ কোন সমাজেই তাই অপ্রতুল নয়। পারিবারিক, সামাজিক ও রাষ্ট্রিক সমস্যা তখনই তীব্র হয়ে ওঠে, যখন কোন দেশে ও কালে অধিকাংশ মানুষ নৈতিকচেতনা ও শ্রেয়োবোধ রিক্ত হয়ে, দায়িত্ব ও কর্তব্যবুদ্ধি ভ্রষ্ট হয়ে, আত্মপ্রত্যয়, জীবনস্বপ্ন হারিয়ে সমাজে সহাবস্থানের আবশ্যিকতা ভুলে নির্লক্ষ্য, নিরানন্দ বেপরওয়া জীবনে অভ্যস্ত হয়ে পড়ে। এমনি অবস্থায় সমাজে কোন নিয়ম-নীতি, রাষ্ট্রে শাসন-প্রশাসনে কোন আইন-শৃঙ্খলা, কায়-কারবারে শিল্পে-বাণিজ্যে সততা, বিচারে-বিবেচনায় ন্যায়নিষ্ঠা, ব্যক্তির জীবনে-জীবিকায় নিশ্চয়তা, আয়ে ব্যয়ে স্থিতিশীলতা, রাজনীতিতে লক্ষ্য-

নির্দিষ্টতা, সরকারে সদিচ্ছা, চাকুরের দায়িত্ব-কর্তব্য চেতনা, মানবিক সম্পর্কে সৌজন্য-সীমা আর অলঙ্ঘ্য থাকে না। দেশে সমাজে চালু এমনি জীবনাচার-লক্ষণের নাম অবক্ষয়।

এ মুহূর্তে আমাদের বাঙলাদেশে জীবন-জীবিকার সর্বক্ষেত্রে ভাব-চিন্তা-কর্ম-আচরণে এ অবক্ষয় লক্ষণ প্রকট। দুষ্ট ক্ষতের দগ্দগে ঘায়ের মতো সমাজে রাষ্ট্রে ও অবক্ষয় চোখে দেখা, মনে ভাবা বা হৃদয়ে অনুভব করা নীতিনিষ্ঠ, শ্রেয়োকামী মানবদরদী দেশপ্রেমী নিক্রিয় মানুষের পক্ষে অসহ্য হলেও প্রতিকার-প্রতিরোধ প্রয়াসী শক্তিমান ব্যক্তির বা দলের অভাবে তা থেকে কারো নিষ্কৃতি মিলছে না।

যদিও একক কারণে কিছু ঘটে না, আনুষঙ্গিক কারণ নিহিত থাকে সমকালীন প্রতিবেশে, তবু আমাদের এ অবক্ষয়ের মূল কারণ অন্নবস্ত্র সম্পৃক্ত আর্থিক জীবনে ত্রাসকর অনিশ্চয়তা। ক্ষেতমজুর থেকে ভূমিহীন নিম্ন-মধ্যবিত্ত চাকুরে অবধি সবাই নিতান্ত উদরপূর্তির পরিমাণ ডালভাত যোগাড়ের অনিশ্চয়তার শিকার হয়ে রয়েছে বলতে গেলে পাকিস্তান আমল থেকেই। মুদ্রাস্ফীতির দরুণ আয়ে-ব্যয়ে সমতা রক্ষা করা কারো পক্ষেই সম্ভব হয় নি, হয় না। এ আর্থিক বিপর্যয় মানস-স্বাস্থ্য করেছে বিনষ্ট, নৈতিক-চেতনা করেছে বিকৃত। ব্রিটিশ-বিতাড়নের ফলে গাঁয়ে-গঞ্জেও সবশ্রেণীর মানুষের মধ্যে স্বস্তিকর জীবনের আকাঙ্ক্ষা জেগেছিল, সবাই সচ্ছল জীবনের স্বপ্ন দেখেছিল। আকাঙ্ক্ষা অপূর্তির ক্ষোভ, আশাভঙ্গের বেদনা, কর্মের ও যথাযোগ্য কর্মসংস্থানের অভাব, স্বপ্নভঙ্গের আঘাত জীবনে সমাজে চালু মূল্যবোধের প্রতি ঘৃণা-দ্রোহ জাগিয়েছে মানুষের মনের গভীরে। ফলে বিরক্ত বিক্ষুব্ধ আশাহত দ্রোহী মানুষ বিচার-বিবেক উপেক্ষা করে, পূর্বেকার নিয়ম-নীতি-সৌজন্য অকেজো জেনে, নিন্দা-পাপ-অপরাধবোধ বেঁচে থাকার প্রতিকূল চেতনা বলে মেনে, নীতিনিষ্ঠা ও শ্রেয়োচেতনা এযুগে অচল ভেবে তারা বেদেরেগ বেপওয়া বেসামাল ছল-চাতুর্য প্রতারণাকে, ঘুষ-জাল-জুয়াচুরিকে, ভেজাল-চোরাচালান-বঞ্চনাকে, কাড়া-মারা-হানাকে, নিজে বাঁচার ও পরিবার বাঁচানোর উপায় বলে জেনেছে। এরা দেশের প্রায় তিন-চতুর্থাংশ মানুষ। অবক্ষয়ের নমুনাস্বরূপ কিছু উদাহরণ দিচ্ছি, সবরকমের অবক্ষয়ের নমুনা দেয়া আমার পক্ষে সম্ভব নয়, তার প্রয়োজনও নেই।

১. ব্রিটিশ আমলে গাঁয়ের মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের ছাত্ররা প্রবেশিকা পরীক্ষায় মেধার ও পড়ার জোরে ভালো ফল করত। এখনকার দিনে সরকারি স্কুলের কেবল শহুরে শিক্ষিত ও ধনী চাকুরদের সন্তানই পরীক্ষায় একচেটে ভাল ফল করে। গাঁয়ের স্কুলের ছাত্রদের বাঞ্ছিত মানের পড়াশোনা না হলেও শিক্ষকরা পড়িয়ে ছাত্রদের ক্লাস করে নাকি ভালই রোজগার করেন। পরীক্ষা ঘরের বাইরে পরীক্ষার্থীর আত্মীয়-স্বজনেরা জনতা হয়ে নাকি উচ্চকণ্ঠে বা মাইকেই নকল সরবরাহ করে, আর গণটোকাটুকি তো আছেই। নজরদারিতে নিযুক্ত শিক্ষকও নাকি নকল করান। এমনকি মাদ্রাসার মৌলবি পরীক্ষার্থীরা কোরআন-হাদিসের পাতা গায়ের-পায়ের অবাঞ্ছিত স্থানে রেখে নকল করে। সারাবছর পড়াশোনার সঙ্গে ধর্মশিক্ষার্থীদেরও সম্পর্ক নেই। তাই পরীক্ষার সময়ে নকলই ভরসা। বিদ্যালয়ে পরীক্ষা পাসজাত যোগ্যতাই জীবিকাক্ষেত্রে পুঁজি। তাই নকলে বাধা দিলে ওরা শ্বাপদের হিংস্রতা নিয়ে আক্রমণ করে নজরদারিতে নিযুক্ত শিক্ষককে। ফলে শিক্ষক-পাহারাদারের চোখের সামনেই হয় নকল। বোর্ডের-বিশ্ববিদ্যালয়ের জাল পাশ সার্টিফিকেটও নাকি দেশে বিদেশে দেদার ব্যবহৃত হয়। ভর্তির সময়ে নম্বরপত্রও নাকি জাল করে ভর্তি হয়ে যায় ছাত্র, তাহলে বাকি থাকল কি!

২. জীবন ধারণের জন্যে কায়িক, শৈক্ষিক, প্রাযুক্তিক শ্রমের বিনিময়ে অর্থোপার্জনে রয়েছে প্রত্যেক মানুষের জন্মগত মৌল মানবিক অধিকার। কর্মসংস্থানের অভাবে তথাকথিত সাদা-

কুর্তার (white collar) পাস-ফেল করা বিভিন্ন স্তরের বেকার যুবকরা এখন সরকারের ও রাজনীতিক দলের হয়ে জনসেবক রূপে বিভিন্ন প্রাতিষ্ঠানিক কিংবা সমিতি-সঙ্ঘের সদস্য হিসেবে গুণ্ডা-বৃত্তিতে নিযুক্ত। তাছাড়াও ব্যক্তিগতভাবে ক্ষুদ্র দলবদ্ধ হয়ে বাঁচবার গরজেই বেকাররা খুন-জখম রাহাজানি -ছিনতাই-ডাকাতি-চুরিতে নিযুক্ত দেশের গাঁয়ে-গঞ্জে-শহরে-বন্দরে সর্বত্র। কোথাও মাস-মাইনে পাওয়া স্থায়ী চাকুরে হলে দেশে এদের এ উপদ্রব বিরল হত। কেন না বেকারের নিতান্ত খোরপোষের অর্থের প্রয়োজনই এসব ত্রাসকর উপদ্রব-অপকর্মের উৎস।

৩. আবার এমনি অভাবে স্বভাবনষ্ট, জীবন স্বপ্নভ্রষ্ট, আশাহত কিশোর যুবকেরাই নানা নেশাশ্রিত হয়ে নির্লক্ষ্য জীবনে খুনে-ছিনতাইয়ে-ধর্ষণে যন্ত্রণাদুষ্ট মনের সুখ ও আনন্দ খুঁজে বেড়ায়। অন্যদিকে মুদ্রাস্ফীতির দরুন বিয়ে দেয়ার ও করা-করানোর খরচ যোগানো অসম্ভব জেনেই অনন্যোপায় অভিভাবকরা অনিশ্চয়তার ও প্রত্যারণার আশঙ্কা নিয়েই ছেলে-মেয়েদের অবাধ প্রেমাভিনয়কে প্রশ্রয় দিচ্ছে। একে উদারতা ও প্রগতিশীলতা বলে ব্যাখ্যা করা ক্বচিৎ সম্ভব হবে। আর একদিকে অভাবগ্রস্ত পরিবারের পণে-যৌতুকে ভাগ্য-পরিবর্তনের আশায় কেউ কেউ অমানুষ ও নির্মম ঘাতক।

৪. আবার এ বেকারত্ব, দারিদ্র্য ও জীবিকাক্ষেত্রে অনিশ্চয়তা মানুষকে করে আত্মপ্রত্যয়রিক্ত ও আত্মশক্তিত আস্থাহীন। তাই তারা ভাগ্যনির্ভর, নিয়তিবাদী এবং তদবিরে তকদির বদলানোর তত্ত্বে আস্থাবান । এমন মানুষ তুকে তাকে, দারুটোনায়, ঝাড়-ফুকে, তাবিজ কবচে, মন্ত্র-মাদুলির শক্তিতে, লোহা-তামা-নিকেল-রূপা-সোনা-হীরা-প্ল্যাটিনাম প্রভৃতি ধাতুগুণে ও নানা মূল্যবান রত্নের-পাথরের প্রভাবে আস্থা রাখে, ভরসা রাখে সাধু-সন্ন্যাসী-ফকির-দরবেশের দোয়ায়। ফলে এসব লোকের আঙুলের নানা রঙের ও আকারের অঙ্গুরী, কণ্ঠের কোমরের বাহুর তাগা-তাবিজ, আর ভাগ্যগণকের কাছে তাদের অসহায় আত্মসমর্পণই প্রমাণ করে যে তারা স্বস্থ ও সুস্থ নয়। ভাগ্যনির্ভর অসহায় যান্ত্রিক জীবন তাদের। তাদের যুক্তি বুদ্ধি আত্মবিশ্বাস আশ্রিত নয়—তাদের আত্মার ও আত্মশক্তির অপমৃত্যু ত্বরান্বিত করছে ভাগ্য ও রাশি গণক, সাধু-সন্ন্যাসী দরবেশ-মোল্লা-মৌলবি-পরী-ফকির প্রভৃতি তথাকথিত অলৌকিক শক্তিধারী বুজুরকী গর্বী প্রতারকরা। এমনকি সংবাদপত্রগুলোও—কার পয়সায় প্রণোদনায় জানিনে—লক্ষ লক্ষ শিক্ষিত শহুরে মানুষের মনেও ভূত-প্রেত-জীন-পরীর মতো দিন-ক্ষণ-তিথি-নক্ষত্রের ভয়-ভরসা জাগিয়ে গোটা জাতিকে আত্মপ্রত্যয়হীন দুর্বলচিত্ত নিয়তিনির্ভর নিষ্ক্রিয় কাপুরুষে পরিণত করেছে। আবার গুরু মেরে জুতাদান' নীতিপন্থী নানা ছদ্ম পরার্থপর তথাকথিত দুস্থমানবদরদী সেবা সমিতি, ক্লাব ও N.G.O.গুলো দেশের মানুষকে আত্মসম্মানহীন কৃপাকরুণা, দান-দাক্ষিণ্য-কামী-জীবী চরিত্রভ্রষ্ট পরনির্ভর পঙ্গুমনের মানুষে পরিণত করেছে।

৫. বাঙালী মুসলিমরা সাধারণভাবে চিরকাল ধনবঞ্চিত দরিদ্র-নিঃস্ব ছিল বলেই এবং শিল্প-বাণিজ্য-ঠিকেদারি ও চাকুরিক্ষেত্রে ভুঁইফোড় বলেই তাদের ধন-মান-প্রতিপত্তি লোভ বেশি ও উগ্র। এর গভীর ও ব্যাপক প্রভাব পড়েছে তাদের ভাব-চিন্তা-কর্ম আচরণে। তাই পাকিস্তান আমলে বাঙালীর কেবল 'ব্রিফকেস' ব্যবসাই ছিল মুখ্য যার অপর নাম সহজ-সাধন যার অশ্লীল নাম প্রতারণা। এ কারণেই এখানে সাধারণভাবে কারখানায় ভেজাল, বাণিজ্যে চোরাচালান, দোকানদারিতে অসাধুত্ব, মজুতদারিতে বাজারে সঙ্কটসৃষ্টির প্রবণতা, ঠিকেদারিতে ঠকানো, আমলাতে ঘুষ, বেচা-কেনায় প্রতারণা প্রভৃতি সর্বত্র সুলভ। তাছাড়া জাল-জুয়া জোচ্চুরির, ছল-

চাতুরি-বঞ্চনার ফাঁদ রয়েছে প্রায় সর্বত্র পাতা। ঘুষ, বকশিস, কমিশন ছাড়া আজকাল নাকি কোথাও কোন চাকুরেই তার দায়িত্ব পালন করে না, তার কর্তব্য স্মরণে। সর্বত্র অকারণে ও অন্যায়ভাবেই

ফেল কড়ি মাখ তেল' নীতি কার্যকর।

কথায় বলে 'অভাবে স্বভাব নষ্ট'। অভাব মিটে গেলেও, সম্পদে প্রাচুর্য এলেও হৃতস্বভাব আর ফিরে আসে না, তখন মানুষ হয় অভ্যাসের দাস। কাজেই বাইরে কাঙালি ঘুচলেও মনের কাঙালপনা দুর্নীতি ও অপরাধপ্রবণতা কয়লার ময়লার মতোই অবিমোচ্য হয়ে থেকেই যায়। কল-কারখানা বাণিজ্যে কোথাও এখনো পুরো দ্বিতীয় প্রজন্মের মালিকের হাতে না আসায় আমাদের কলে কারখানায় যেমন জিঞ্জিরা রয়ে গেছে, তেমনি রয়েছে ব্যবসা-বাণিজ্যে চোরা-কারবারি, তেমনি রয়েছে অফিসে আদালতে প্রতিষ্ঠানে ঘুষ-জাল-প্রতারণা। কোন কোন সদ্যোজাত শিশু কিংবা উদ্গত অঙ্কুর রুগ্ন থাকে যেমন, তেমনি আমাদের রাষ্ট্রও জন্মমুহূর্ত থেকেই নানাভাবে রুগ্ন।

৬. ব্রিটিশ আমলে ১৯৩৭ সনেই আমাদের সর্বজননী সংসদীয় ভোট দান গ্রহণ শুরু হয়েছিল। তা লঘু গুরুভাবে ১৯৪৬, ১৯৪৫ সনে এবং পরে আইয়ুব খানী বুনিয়াদির অবসান হয়ে ১৯৭০ সনে নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়েছে। কিন্তু এ বছরের নির্বাচন ছিল সব দিক দিয়ে অনন্য। রাখালের যেমন পাঁচন, তেমনি শাসকের দণ্ড। সে দণ্ড থেকে ডাণ্ডার উদ্ভব। সামরিক শাসনের স্বৈর ডাণ্ডাতন্ত্র এবারকার নির্বাচনে তথাকথিত গণতন্ত্রকে যথার্থই ডাণ্ডাযোগে গুণ্ডাতন্ত্রের রূপ দিয়েছে।

৭. জীবনে জীবিকার অনিশ্চয়তা মনুষ্যত্বের ভিতেও ফাটল ধরায়। ভাত-কাপড়ের নিত্যঅভাব ও অনিশ্চয়তা নষ্ট করে মানবিকগুণ। দীন-দুঃখী মানুষ হারায় দেশের, সমাজের ও রাষ্ট্রের প্রতি তার দায়িত্ববোধ ও কর্তব্যবুদ্ধি। এমনি মানুষ কেবল স্ত্রী-সন্তানের জন্যেই বাঁচে। আত্মরতিতে ও স্বার্থপ্রীতিতেই এমনি মানুষের চিন্তা-চেতনা থাকে সীমিত। আমাদের দেশে তাই আজ দেশ ও মানুষ প্রেমী লোক করগণ্য। এজন্যই এখানে আত্মোন্নয়নকামী রাজনীতিক অসংখ্য, নীতিনিষ্ঠ চরিত্রবান রাজনীতিক দুর্লভ। জনহিতকামী সক্রিয় শিক্ষিত মানুষ বিরল। একাধারে মনীষা ও চরিত্র সম্পন্ন নির্লোভ জননেতা সুদুর্লভ।

এ মুহূর্তে দেশের কয়েক কোটি মানুষের নিঃস্বতা, অন্নবস্ত্রের প্রাত্যহিক অনিশ্চয়তা, বেকারত্ব, মুদ্রাস্ফীতি, নিরক্ষরতা, এবং নতুন করে গড়ে ওঠা শিল্প বাণিজ্য চাকুরি ঠিকেদারিতে ভুঁইফোড় শিক্ষিত শহুরে মানুষের আধিক্য ও প্রাধান্য প্রভৃতিই আমাদের নাগরিকসুলভ গুণবিকাশের অন্তরায় হয়েছে। আমরা আজ স্বাধিকারে স্ব স্ব স্বার্থে সততায়, সহিষ্ণুতায়, সৌজন্যে, সহযোগিতায় সহাবস্থানের আবশ্যিক আগ্রহ হারিয়েছি। আমাদের এখন বড়ো অভাব চরিত্রের ও মানবপ্রেমী নেতার। আজ এমন কিছু চরিত্রবান নীতিনিষ্ঠ আদর্শপুষ্ট মানুষপ্রেমী লোক চাই যারা পরার্থে সমস্যা-তরঙ্গ-তাড়িত রাষ্ট্রনৌকার ধরবে হাল, তুলবে পাল, টানবে গুণ, চালাবে বাঞ্ছিত পথে। এখন তেমন গুণ-জ্ঞান-বুদ্ধি-ব্যক্তিত্ব সম্পন্ন নায়ক চাই, যিনি দেশ-জাতি মানুষের নামে ডাক দেবেন, সে-ডাক নাড়া দেবে গণমন, সে-আহ্বানে সাড়া দেবে দেশের জনগণ, এগিয়ে আসবে দুঃশাসন, দুর্নীতি বিলোপে ও দুষ্ট দুর্জন দুর্বৃত্ত বিনাশে। আজ তেমন নেতা-নায়ক চাই, যিনি রবীন্দ্রনাথের ভাষায় ডাক দেবেন, আশ্বাস যোগাবেন, সাহস সঞ্চার করবেন :

বাধা দিলে বাধবে লড়াই, মরতে হবে,
পথ জুড়ে কি করবি বড়াই, সরতে হবে।
লুট করা ধন করে জড়ো কে হতে চাস সবার বড়ো—
এক নিমেষে পথের ধূলায় পড়তে হবে,
নাড়া দিতে গিয়ে তোমায় নড়তে হবে।
নীচে বসে আছিস কেরে, কাঁদিস কেন?
লজ্জা ডোরে আপনাকে রে বাঁধিস কেন?
ধনী যে তুই দুঃখ ধনে, সেই কথাটি রাখিস মনে —
ধূলার পরে স্বর্গ তোমায় গড়তে হবে —
বিনা অস্ত্র, বিনা সহায় লড়তে হবে।

কে ধরবে হাল, কে উড়াবে পাল

দেশ বা রাষ্ট্র হচ্ছে জাহাজ, বিমান কিংবা রেলগাড়ীর মতো। স্বসার্থে, লোভে, ক্ষোভে কিংবা ক্রোধে কেউ যদি দেশের, রাষ্ট্রের বা মানুষের বিরুদ্ধে কিছু করে, তা'হলে গোটা দেশ, রাষ্ট্র, সমাজ সামগ্রিকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে এবং সে-ক্ষতি অপূরণীয় অথবা বহুকাল ব্যাপী অপূরণীয় থেকে লোকসাধারণের দুর্দশা-দুর্ভোগের কারণ হয়ে দাঁড়ায়। পরাধীনতা রূপ ক্ষতি তেমন একটি। এ ক্ষতিপূরণ করতে শত শত বা কয়েকশ' বছর লেগে যেত। স্বাধীনতা অর্জনের জন্যে জানে-মালে ক্ষয়ক্ষতি স্বীকার করতেই হয়, বহাতে হয় রক্তস্রোত। লড়াই চলে সুদীর্ঘকাল।

আবার স্বাধীন দেশে দেশ-রাষ্ট্র পরিচালনার দায়িত্বে কর্তৃত্বে যারা থাকে, তাদের মধ্যে ওই বিমান-জাহাজ-রেলগাড়ীর চালকের মতো দায়িত্ব চেতনা-জ্ঞান-যুক্তি-বুদ্ধি-বিবেক-বিবেচনা ও নৈপুণ্য যদি না থাকে, স্বস্বার্থের উপরে যদি সামগ্রিক, সামষ্টিক ও সামূহিক কল্যাণ-চেতনা ঠাঁই না পায়, তাহলে তাদের হাতে দেশ-রাষ্ট্র-মানুষের স্বার্থ নিরাপদ থাকে না।

ভালোবাসা, বিশ্বাস, ভরসা ও নির্ভরতাই ব্যক্তি জীবনের পুঁজি ও পাথেয়। কাউকে ভালোবেসে, কারো ওপর বিশ্বাস, ভরসা ও নির্ভরতা রেখে চলা সম্ভব বলেই জীবন এতো প্রিয়, পৃথিবী এমন আকর্ষণীয়। এ সবের অভাব ঘটলে জীবন হয় অসহ্য যন্ত্রণার আধার, তখন মানুষ আত্মহননে মুক্তি খোঁজে।

যে মানববাদী নয়, মানবতার অনুশীলন যার নেই, যে মানুষের প্রতি প্রীতিমান নয়, সে মানুষের হিতকামী হতে পারে না, মানবসেবী হওয়ার যোগ্যতা তার থাকে না। কাজেই তেমন মানুষ দেশ-রাষ্ট্র-মানুষের কৃত্রিম বা ছদ্ম উপায়ে নেতৃত্ব-কর্তৃত্ব পেলে মানুষের কোন সমস্যার, কোন দুঃখ যন্ত্রণার অবসান ঘটতে পারে না, তেমন মানুষ আত্মরতিবশে কেবলই ক্ষমতার অপপ্রয়োগে ধন-মান-খ্যাতি অর্জনে থাকে নিরত। এ মানুষ স্বভাবেই মতলববাজ, ফলে জুলুমবাজ। এ শতকের দ্বিতীয় ও বিশেষ করে তৃতীয়পাদে আফ্রো-এশিয়া-লাতিন আমেরিকার যেসব দেশ স্বাধীন হয়েছে, সেসব দেশে ধনে মনে কাঙাল ব্যক্তিরাই শিল্পে-বাণিজ্যে-প্রশাসনে

ও রাজনীতি ক্ষেত্রে ভিড় করে রয়েছে। তাদের মধ্যে মানবপ্রীতি ও পরার্থপরতা কৃচিৎ কখনো ক্ষণপ্রভার মতো দেখা যায় মাত্র।

মাটি দখলের সাম্রাজ্যবাদ আজ আর নেই বটে, কিন্তু বাণিজ্যিক সম্পর্কের মাধ্যমে এবং উন্নয়নকর্মে সহায়তার নামে ঋণে দানে অনুদানে অনুগত ও নির্ভরশীল রেখে অর্থ-সম্পদ লুটের নতুনতর ব্যবস্থায় তৃতীয় বিশ্বের দরিদ্র ও অনুন্নত বা তথাকথিত উন্নয়নশীল দেশকে অজগরের মতো দেশের ব্যবসা-বাণিজ্য-বাজার ও শিল্পকারখানা ক্ষেত্রে আষ্টে-পৃষ্ঠে জড়িয়ে পেঁচিয়ে হাড়-মাংস গুঁড়ো করে দিয়ে চির-নির্ভরশীল রেখে অদৃশ্য হুকুম-হুমকি-হামলার মাধ্যমে দেশ-জাত-মানুষের প্রতি প্রেম ও দায়িত্ববিরহী মুৎসুদ্দী-সরকারযোগে শাসন-শোষণ ও নিয়ন্ত্রণ করে পৃথিবীর বৃহৎ পুঁজিবাদী রাষ্ট্রগুলো। এদের কবল থেকে মুক্তির প্রয়াসে ও সংগ্রামে পৃথিবীর শোষিত দেশের গণমানব নিষ্ঠ হলেও মুৎসুদ্দী সরকারের ও রাজনীতিকদের দলন-দমননীতির ফলে সাফল্য বিলম্বিত হচ্ছে ও হবে। যদিও পরিণামে গণমানবের জয় ও মুক্তি অবশ্যম্ভাবী।

জনবহুল বাঙলাদেশ দুনিয়ার দরিদ্রতম রাষ্ট্র। তাই এখানে পরা শক্তির ও পুঁজিবাদী রাষ্ট্রগুলোর কবল ও ছোবল বেশি। ফলে ধনে মনে কাঙাল শহুরে শিক্ষিত মানুষেরা এখানে কেবল সুযোগসন্ধানী ও সুবিধেবাদী হয়, আত্মমর্যাদাবোধ থাকে না বলে তারা কেবলই লোভ লিপ্সা চালিত হয়ে বিবেক-বিবেচনা এড়িয়ে বেচাকেনার শিকার হয়। শোনা যায়, অনুভবও করা যায়, এমনকি দেখাও যায় আজীবন রাজনীতি করেও যথা সময়ে গাড়ি-বাড়ির মালিক হয়ে যান রাজনীতিকরা, মন্ত্রী হয়েই ক্ষমতার টনিকের স্পর্শে স্বাস্থ্যে যেমন স্থূল ও চিক্কণ হয়ে ওঠেন, তেমনি অর্থে-বিত্তেও হয়ে ওঠেন স্ফীত।

ব্যক্তিগত সততায় ব্যতিক্রম ব্যক্তি অবশ্যই রয়েছেন, এমনকি জন সম্পর্কবিহীন দপ্তরও রয়েছে কিছু, অন্যত্র চাকুরেরা অদৃশ্য আয়ে হয় ঋদ্ধ। এমনও শোনা যায়, বড় আমলারা মোটা কমিশন কিংবা আন্তর্জাতিক সংস্থায় চাকুরি প্রাপ্তির লোভে এমন সব ক্ষতিকর বা অপ্রয়োজনীয় প্রকল্প পরিকল্পনা বানান, এমন সব ঋন-দান-অনুদান গ্রহণের ব্যবস্থা করেন, যার ফলে দাতা রাষ্ট্রের অর্থ সে-রাষ্ট্রেই প্রায় তিন-চতুর্থাংশ ফিরে যায় যন্ত্রাদির দাম, কৃৎকৌশলীর বেতন ও পরামর্শ-দাতার পারিশ্রমিকরূপে, অপচিতও হয়। সবটাই যে ভোজবাজি কিংবা আধুনিক জাদুর চোখ-ধাঁধানো, মনভোলানো প্রাতিভাসিক বাস্তবতা যা সাধারণের পক্ষে মেনে নেয়া কঠিন, অস্বীকার করাও অসম্ভব। ওদের ইঙ্গিতেই সর্বজনীন সাক্ষরতা কিংবা প্রাথমিক শিক্ষা চালু হয় না, কিন্তু অপ্রয়োজনে নানা এন. জি. ও সংস্থা ও কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয় সরকারি উদ্যোগে। মাদ্রাসার বাইরে ইসলামী শাস্ত্রীয় শিক্ষা দানের গ্রহণের বাকি কিছু না থাকলেও সৌদি-মার্কিন অভিপ্রায়ে ইসলামী গবেষণাকেন্দ্র ও বিশ্ববিদ্যালয় গড়ে তোলা হয়। যদিও তা শিক্ষিত সাধারণের কোন প্রয়োজনে লাগে না। কিন্তু বিজ্ঞান ও কৃৎকৌশল শিক্ষা দানে ও প্রসারে, যন্ত্র নির্মাণে, প্রযুক্তি বিস্তারে সরকারি আগ্রহ সামান্যই।

ফলে দেশ, দেশের সম্পদ, দেশের মানুষের লাভ ক্ষতি নিয়ন্ত্রণের শক্তি দেশের সরকারেরও পুরো নেই, সবটাই যেন বিদেশীর স্বার্থে, ইঙ্গিতে, পরামর্শে ও নির্দেশে চলে। দিশেহারার নির্লক্ষ্য গতি শ্রমের অপচয়, নীতিও বন্ধ্যা হয়ই। ফলে টাকার মূল্যাঙ্ক কমছে, মুদ্রাস্ফীতি নিয়ন্ত্রণাতীত বলেই বাড়ছে, ক্রয়ক্ষমতা দ্রুত হ্রাস পাচ্ছে। দুর্নীতিবাজ ঠিকেদারের, দোকানদারের, আড়তদারের, সওদাগরের, কারখানাদারের, আমলার, মন্ত্রীর আয় বাড়ছে। এর মধ্যেও চালবাজ-মতলববাজদের জাল-জুয়া-জোচ্চুরির ফলে অর্থ-বিত্ত-বেসাত একটা শ্রেণীর হাতে চলে যাচ্ছে, অন্যরা হচ্ছে আরো গরিব, রিক্ত ও নিঃস্ব। সিলেটে তেলও মিলেছে,

গ্যাসতো আগেই পাওয়া গেছে, কিন্তু গণমানবের নিঃস্বতা ঘুচবে কি! বরং সমাজতন্ত্র ঠেকানোর লক্ষ্যে সৌদি-ইয়াঙ্কি ইঙ্গিতে রাজনীতিক-নিদান হিসেবে ইসলাম প্রীতির সরকারি জিগিরে বাঙলাদেশের আকাশ-বাতাস মুখরিত। যদিও রাজনীতিকদের ও সরকারি লোকদের শাস্ত্রানুগত্যের সাধারণভাবে কোন নিন্দা নেই। বরং তাদের ভিন্ন ধরনের সুনামে দেশের মানুষের কান ঝালাপালা, মন-মেজাজ ঘৃণাদুষ্ট। এদের মুখে ইসলামের ও আল্লাহর নাম, কিন্তু ভাব-চিন্তা-কর্ম-আচরণে এরা শয়তানের চেলা। তাছাড়া কম-বেশি সব ধর্মের নাগরিক অধ্যুষিত আধুনিক রাষ্ট্রে অধিজনের [সংখ্যাগুরুর] ধর্ম রাষ্ট্র ধর্ম ও ঐতিহ্য হলে অন্যদের দেশপ্রেমের ও রাষ্ট্রানুগত্যের গাঢ়তা বিনষ্ট হয়— প্রেরণার অবলম্বন-চ্যুতির ফলে। কাজেই যে-গ্যাস জ্বলছে, যে-তেল জ্বলবে, তাতে অর্থবিত্ত-বেসাতওয়ালাদের, শাসক-প্রশাসক গোষ্ঠীর চেকনাই ও রোশনাই বাড়বে অবশ্যই, কিন্তু গণমানব অন্তত গ্যাস-তেলের দাহ্যপদার্থের মতো জ্বালা-যন্ত্রণার আধারে পরিণত হবে না– ওই গ্যাস তেলজাত তাপে ও চাপে তাদের ক্ষীণ দেহদীপের তেল বের হয়ে উবে যাবে না, অকালে-অসময়ে তাদের প্রাণ-প্রদীপ নিভবে না— আপাত আশ্বাসটুকু পেলেই তারা-নিশ্চিত থাকবে।

২.

কিন্তু এ আশ্বাস আজ কে বা কারা দেবে, গণমানব শুধু প্রাণ ধারণের জন্যে ভাত-কাপড়ের জন্যে কার ওপর ভরসা রাখবে, কোন্ প্রকারের সরকারের উপর, কোন্ শ্রেণীর রাজনীতিক দলের উপর? একদিন লক্ষ্য ছিল দেশের মাটিকে বিদেশির অধিকার মুক্ত করা, বিধর্মীর প্রভাব-প্রতাপ খর্ব করা, বিভাষীর শোষণ রোধ করা। সে-পর্ব শেষ। কিন্তু গণমানব ও পরিবর্তন, এ মুক্তি অনুভব করল না কেন, এর স্বাদ ও সুবিধে পেল না কেন? এ প্রশ্ন আজ জনগণের মনে সঙ্গত কারণেই তীব্র ও তীক্ষ্ণ।

সরকারের কোন অঙ্গীকার নেই, তাই কোন লক্ষ্যও নেই। রাজনীতিক দলগুলোরও লক্ষ্য ক্ষমতা দখল করে সরকারি দলের মতো সম্পদ লুট করে ধনী-মানী হয়ে নিশ্চিন্তে বিলাসবহুল জীবন ভোগ উপভোগ। একদিন যারা ছিল গণমানবের মুক্তিসংগ্রামী, আজ তাদের মত-পথের ভেজালবাহুল্য ও আত্মরতি প্রবণতা জনগণকে তাদের প্রতি আস্থাহীন ও নিরাশ করেছে। যে বাঙালীসত্তা-চেতনা ১৯৭১ সনে তাদের জীবন-পণ-সংগ্রামে ঝাঁপিয়ে পড়ার প্রেরণা দিয়েছিল, তা আজ দুর্লক্ষ্য। তারই ফলে আজ বাঙলাদেশ রাজাকার, অঙ্গীকারভ্রষ্ট মতলবাজ ও অব-সৈনিক কবলিত। হতাশ-নিরাশ দিশাহারা নিঃস্ব জনগণ আজ বাঁচার ও স্বজনকে ভাতে-কাপড়ে বাঁচাবার গরজে ন্যায়-নিয়ম-নীতি, ঘৃণা-লজ্জা-ভয় পরিহার করে বেপরোয়াভাবে ছল-চাতুরী প্রতারণা আশ্রয়ী হয়ে জোর-জুলুম-খুন। জাল-জুয়া-জোচ্চুরি প্রভৃতিকেই টিকে থাকার উপায় বলে মানছে। এতে শিগ্‌গিরই বিশৃঙ্খল দেশে-সমাজে সরকারে সর্ব শ্রেণীর মানুষেরই জীবন-জীবিকা, ঘর-ঘাট, মাঠ-বাট হবে বিপন্ন, স্বস্তি হবে বিপর্যস্ত। সেই আরণ্য নীতি-নিয়ম ও জীবনাচার এখনি সুপ্রকট। প্রতিরোধ ব্যবস্থা গড়ে না উঠলে পরিণাম হবে মারাত্মক।

৩

এক হিসেবে এ অনুন্নত ও অনক্ষর-বহুল দেশে বা রাষ্ট্রে বুর্জোয়া সংগ্রাম সমাপ্ত। তারা প্রতিযোগী-প্রতিদ্বন্দ্বী, বিদেশি-বিধর্মী-বিজাতি-বিভাষী তাড়িয়ে নিশ্চিন্ত। এখন তাদের লক্ষ্য স্বার্থসিদ্ধি-কেড়ে মেরে হননে লুটে, জাল-জুয়া-জোচ্চুরি যোগে জোর-জুলুম-খুনে, অর্থে-বিত্তে

বেসাতে ঋদ্ধ হওয়া, মান-খ্যাতি-ক্ষমতা অর্জন। কাজেই এদের কাছে প্রত্যাশা করার কিছুই নেই। এদের ওপর বিশ্বাস-ভরসা-নির্ভরতা রাখা বিড়ম্বনা বৃদ্ধির নামান্তর মাত্র। রাজনীতিক ও রাজনীতিক দল হিসেবে এদের উচ্চারিত বুলি, অঙ্গীকার ও আশ্বাস-আস্ফালন প্রবঞ্চনা মাত্র। গণমানবের উপচিকীর্ষা এদের অন্তরে থাকতে পারে না। কেননা এরা উঠতি বুর্জোয়া-সুস্থির সন্তুষ্ট উদার বুর্জোয়া নয় এরা। তাই কৃপা-করুণা-দান-দাক্ষিণ্য এদের স্বভাবসিদ্ধ হয় নি এখনো। এরা এ স্তরে কেবল পাই-পাই, খাই-খাই মতলব-চালিত, এরা ধন-মান-খ্যাতি ক্ষমতা লিপ্সু কাঙাল-ভিক্ষুক কিংবা দস্যু। তাই এদের কাছে জনগণের প্রত্যাশার বা পাবার কিছুই নেই, এ মুহূর্তে এরা ভাব-চিন্তা-কর্ম-আচরণে ও মতলবে সমাজ-শত্রু।

সংগ্রাম অসমাপ্ত কেবল বামপন্থীদের, যারা স্বদেশীর, স্বধর্মের, স্বজাতির স্বভাষীর রাষ্ট্রিক স্বাধীনতায় তুষ্ট নয়, যারা গণমানবকে শোষণ-পীড়ন বঞ্চনামুক্ত করাকেই স্বাধীনতা বলে জানে ও মানে। মৌল মানবিক স্বাধিকার প্রতিষ্ঠিত সর্বপ্রকার জুলমমুক্ত জনগণের সমাজেই সত্যিকার তাৎপর্যে স্বাধীন। এমনি সমাজ গড়তে পারে কেবল সামাজিক-সাম্যবাদীরা, এজন্যে বিপ্লব আবশ্যিক। আগের বামপন্থীরা যে-কোন কারণেই হোক জনগণের আস্থা হারিয়েছেন। এখন নতুন অঙ্গীকার ও সঙ্কল্পবদ্ধ তরুণেরাই, তাদের মধ্যকার কারো নেতৃত্বে সঙ্ঘবদ্ধ হয়ে মত-সংহতির ও ঐক্যের ভিত্তিতে দলবদ্ধ হয়ে একযোগে সংগ্রাম শুরু করলে সাফল্য অবশ্যই সম্ভব হবে। যেভাবেই হোক, কিছু একটা হতে হবে, কিছু একটা করতে হবে। এভাবে চলে না, চলবে না। কতকাল আর এভাবে জোর-জুলুমের নৈরাজ্য চলবে।

শুধু দিন যাপনের, শুধু প্রাণ ধারণের গ্লানি
শরমের ডালি,
নিশি নিশি রুদ্ধ ঘরে ক্ষুদ্র শিখা স্তিমিত দীপের
ধূমাঙ্কিত কালী,
লাভক্ষতি টানাটানি, অতি সূক্ষ্ম ভগ্ন অংশ ভাগ
কলহ সংশয়—
সহেনা সহেনা আর জীবনেরে খণ্ড খণ্ড করি
দণ্ডে দণ্ডে ক্ষয়।

আজ উৎকণ্ঠিত অধৈর্য জনতার জিজ্ঞাসা ও আহ্বান এ নির্লক্ষ্য রাষ্ট্রতরীর কে ধরবে হাল, কে উড়াবে পাল। একে কে চালাবে অভীষ্ট লক্ষ্যে, পৌঁছে দেবে গন্তব্যে। এর উত্তর আমাদেরই যোগাতে হবে। এড়িয়ে গেলে বিপর্যয় অবশ্যম্ভাবী।

আমাদের অবশ্যই মনে রাখতে হবে যে গণমানবের প্রতি মানবতার খাতিরেই আমরা আমাদের দায়িত্ব এড়াতে পারি নে, উদাসীন থাকতে পারি নে কর্তব্যে। কবির ভাষায় যারা—

ওই যে দাঁড়ায়ে নতশির
মূক সবে, ম্লান মুখে লেখা শত শতাব্দীর
বেদনার করুণ কাহিনী; স্কন্ধে যত চাপে ভার
বহি চলে মন্দগতি যতক্ষণ থাকে প্রাণ তার—
তারপরে সন্তানেরে দিয়ে যায় বংশ বংশ ধরি
নাহি ভর্ৎসে অদৃষ্টেরে, নাহি নিন্দে দেবতারে স্মরি,
মানবেরে নাহি দেয় দোষ, নাহি জানে অভিমান,
শুধু দুটি অন্ন খুঁটি কোনোমতে কষ্টক্লিষ্ট প্রাণ

রেখে দেয় বাঁচাইয়া?

তাদের প্রতি আমাদের দায়িত্ব এই :

এই-সব মূঢ়ম্লান মূক মুখে
দিতে হবে ভাষা, এই-সব শ্রান্ত শুষ্ক ভগ্ন বুকে
ধ্বনিয়া তুলিতে হবে আশা; ডাকিয়া বলিতে হবে—
'মুহূর্ত তুলিয়া শির একত্র দাঁড়াও দেখি সবে;
যার ভয়ে তুমি ভীত সে অন্যায় ভীরু তোমা-চেয়ে,
যখনি জাগিবে তুমি তখনি সে পলাইবে ধেয়ে।
যখনি দাঁড়াবে তুমি সম্মুখে তাহার তখনি সে
পথকুক্কুরের মতো সংকোচে সত্রাসে যাবে মিশে।

এ শতকের বিশ্বের নানা দেশ এ সত্য প্রমাণ করে দিয়েছে। অতএব গণসংগ্রাম আবশ্যিক।

এবং আরো ইত্যাদি

কোন কিছুরই একটি শব্দে, একটি বাক্যে সংজ্ঞা, টীকা, ভাষ্য, বিশ্লেষণ সম্পন্ন করা যায় না। রূপে, রঙে, গুণে, মানে, মাত্রায় রকমফের নির্দেশ করতে হলে 'এবং, আরো, ইত্যাদি' যোগে অনেক কথাই বলতে হয়। তার পরেও পূর্ণাঙ্গ চিত্র দেয়া যায় না। সমস্যার আলোচনায়ও দোষ ত্রুটি থাকে। তবু আলোচনা করতেই হয়। ব্যক্তি, পরিবার, সমাজ, রাষ্ট্র ও জাতি সবাই সমস্যাজর্জরিত। দরিদ্রের দেশে ধনীরও থাকে শত্রুর ভয়, ডাকাতের ভয়-তাদেরও শঙ্কা-ত্রাসক্লিষ্ট জীবন। সুখ নেই কোথাও, সুখ নেই কারো। সুখ তুমি কে, তুমি কি এবং তুমি কেমন— এ জিজ্ঞাসা সব অতৃপ্ত এবং সুখকাঙ্ক্ষী সুখ-তৃষ্ণ মানুষের। তবু দুর্বার যৌবন ও জীবন ধর্মের প্রবলতাবশে মানুষ বাঁচার আকাঙ্ক্ষা পরিহার করে না, হয় না জীবন জীবিকার প্রতি বীতশ্রদ্ধ। অশন-বসন-নিবাস-নিদানের প্রায় স্থায়ী অভাবের মধ্যেও দুঃখ-যন্ত্রণা-অনাহারের ফাঁকে ফাঁকে মেঘ-ভাঙা রোদের মতো ক্ষণ-হাসির, ক্ষীণ-খুশির, তড়িৎ-আনন্দের, জৈব-পুলকের ছোঁয়াচে উল্লাসের পারিবেশিক হুজুগের সুখ ঘন ঘনই পেয়ে থাকে। এ সব সম্বলই তাকে বাঁচিয়ে রাখে জ্বালা-যন্ত্রণার ও ভয়-ত্রাসের বিরুদ্ধ প্রতিবেশে।

প্রাণী হিসেবে বাঁচার জন্য প্রয়োজনীয় ন্যূনতম উপকরণের ও প্রতিবেশের অভাব, —অশন-বসন-নিবাস-নিদানের ভয়ঙ্কর অনিশ্চয়তা— মানুষকে সাহস ও সংকল্প ভেদে চুরি-ডাকাতি-ভিক্ষাজীবী করে— প্রবর্তনা দেয় কেড়ে-মেরে হেনে বাঁচতে। ভাত-কাপড়ের আশ্বাসবিরহী বিপন্ন জীবনে অনিশ্চিত জীবিকা মানুষকে দুষ্ট-দুর্জন-দুর্বৃত্ত-দুষ্কর্মা করেছে। দরিদ্রদেশে বিদেশির মুৎসুদ্দীর দুর্নীতিপ্রবণ দুঃশাসনের জুলুম কবলিত মানুষ বাঁচার তাকিদেই আতঙ্কজনক সংখ্যায় দুধর্ষ-দুষ্ট-দুর্জন-দুর্বৃত্ত -খুনি-বাটপার হয়, আর অন্যরা হয় জালে-জুয়ায়-জুলুমে-জোচ্চুরিতে সিদ্ধ। এভাবে জোর জুলুম- বঞ্চনা কবলিত হয় গাঁ-গঞ্জ-শহর-বন্দরের মানুষ, তখন সমাজ দুর্জনে-দুর্বলে-জালিমে-মজলুমে, ধনী-দরিদ্রে, দুঃশাসকে-দুঃশাসিতে, শোষকে-শোষিতে, পীড়কে-পীড়িতে সুপ্রকটভাবে বিভক্ত হয়ে যায়। তখন বিদেশির অর্থপুষ্ট

তেমন দরিদ্র-দেশে নিরীহ নিরপেক্ষ, যুক্তি-বুদ্ধি-বিবেক-বিবেচনা চালিত, বিশ্বাস-ভরসার যোগ্য কোন তৃতীয় দলে থাকে না। উকিল-ডাক্তার-শিক্ষক-ছাত্র-আমলা-সাংবাদিক-সাহিত্যিক-শিল্পী-বিজ্ঞানী প্রভৃতি তথাকথিত বুদ্ধিজীবীরাও হয় দোলাচলবৃত্তির শিকার। তখন জনসমাজ যেন স্রোতের কচুরিপানা সংলগ্ন অথচ সঙ্ঘবদ্ধ নয়। তখন তারা স্ব স্ব স্বার্থে মানবিক ও গুণ ও আচরণ পরিহার করে নিতান্ত প্রাণীরূপেই যখন যেখানে যা এবং যেমন প্রয়োজন তা এবং তেমনই করে। বদলায় মন-মতি, পাল্টায় বোল ও ভোল, ভাঙে নিয়ম-নীতি, ভোলে আদর্শ-উদ্দেশ্য, সরকারি দলের সবাই তো বটেই, পরিবারে, সমাজে সরকারে, রাজনীতিক দলে, শিক্ষাঙ্গনে, ব্যবসা বাণিজ্য ক্ষেত্রে, কলে-কারখানায় সর্বত্র প্রায় সবাই প্রয়োজনে বহুরূপী।

দুষ্ট-দুর্জন-দুর্বৃত্ত-দুষ্কর্মা সবদেশেই, সবকালে কমবেশি থাকেই, তাতে সমাজ স্বাস্থ্য নষ্ট হয় না। কারণ অধিকাংশ লোক থাকে ন্যায় নিয়ম- নীতিনিষ্ঠ এবং লোকগ্রাহ্য আদর্শ ও সমাজসম্মত উদ্দেশ্য-চালিত। বিদেশির অর্থপুষ্ট দুর্নীতিবাজ মুৎসুদ্দীর দুঃশাসনে ও লুণ্ঠনে বিপর্যস্ত দেশে জীবন-সংগ্রামী প্রায় সব মানুষই ঠকে ঠকে, জীবনযুদ্ধে মার খেয়ে খেয়ে, অন্যন্যোপায় হয়ে জালে-জুয়ায়-জোচ্চুরিতে-কেড়ে মেরে-হেনেজোরে-জুলুমে বাঁচার পথ গ্রহণ-বরণ করেছে বেপরোয়া হয়ে। কাজেই এ মুহূর্তে আমাদের দেশও অবক্ষয় কবলিত। এখানে কেউ কাউকে বিশ্বাস করে না, প্রতি দ্বিতীয় ব্যক্তি শুধু প্রতিদ্বন্দ্বী-প্রতিযোগী নয়— শত্রুও। আস্থা নেই, ভরসা নেই কারো উপর কারো। নিয়ম-নীতি, আইন-শৃঙ্খলা বিপর্যস্ত। প্রাশাসনিক বিধি-নিষেধ প্রয়োগ-শৈথিল্যের কারণে উপেক্ষিত। ঘরে বাইরে পথে-ঘাটে জান-মালের নিরাপত্তা অনিশ্চিত। ফলে আরণ্য-জীবনের শঙ্কা-ত্রাস সর্বত্র সর্বঘটে বিরাজমান। এমনি অবস্থায় ব্যক্তিমনের স্বাস্থ্য, সমাজ-সরকারের নিয়ম-নীতির অবিকৃতি প্রত্যাশা করা যায় না। এমনি প্রতিবেশে ন্যায়-নীতি-আদর্শে আনুগত্য, সততা, মানবিকতা, মানবতা, পরার্থপরতা, সেবা, পরহিতৈষণা, বহুজনসুখ বহুজনহিত লক্ষ্যে ভাব-চিন্তা কর্ম আচরণ অবাস্তব, নির্বুদ্ধিতা কিংবা পরিহাস্যকর বলেই বিবেচিত হয়।

দুর্নীতিদুষ্ট বলেই ব্যক্তির, পরিবারের সমাজের, সরকারের, রাষ্ট্রের ও জাতির কোন সমস্যাই সরল নয়। তাই সমস্যার কোন ঋজু সমাধানও নেই। সব সমস্যাই জটিল কারণ ও সম্পর্ক পরম্পরায় গ্রথিত বা শৃঙ্খলিত। শিকল সোনার নয় যে, অটুট রাখতে আরাম, কিংবা ছিঁড়তে চাইলে ছেঁড়া যাবে—এ যেন কঠিন লোহার শিকল, প্রতি ছোঁয়ায় বড্ড লাগে-প্রতি অভিঘাতে জ্বালা বাড়ে, যন্ত্রণা অসহ্য হয়। ক্ষতও দুষ্ট এবং বিষাক্ত— প্রতিষেধক হচ্ছে অর্থ বিত্ত এবং সামাজিক প্রভাব ও প্রতিষ্ঠা এসব যার নেই, তার সিদ্ধিও নেই—উদ্ধারও নেই। সর্বত্রই অবশ্য নগদ অর্থে মুশকিল মাত্রেরই আহসান মেলে। লোহার ভারী শিকলের আঙটাগুলো তখন হাল্কা সোনার আঙটা হয়ে অর্থের জাদু স্পর্শে খুলে যায়।

সমস্যার কারণ ও সম্পর্ক পরম্পরার শিকলির আঙটাগুলো রূপকথার উপকথার কিংবা ন্যায় শাস্ত্রের মতোই।

যেমন ভাতের জন্যে চাউল, চাউলের জন্যে ধান, তার জন্যে জমি, জমি বানাবে রাজা, রাজার থেকে জমি নেবে প্রজা, প্রজার থেকে চাষী, চাষী বুনবে ধান, তার জন্য চাই জল, সার আর বীজ। তবে মিলবে ভাত। অথবা, জলে-পড়া পিঁপড়ের উদ্ধারের জন্যে চাই গাছের পাতা, পাতা ছেঁড়ার জন্যে চাই কাক, কাক রাজি যদি দিতে পার ধান, ধান দিতে রাজি গোলা, যদি ইঁদুরের উপদ্রব বন্ধ হয়, ইঁদুর গোলা ছাড়তে রাজি যদি বিড়ালের ভয় ঘোচে, বিড়াল অভয়

দিতে রাজি যদি পায় দুধ. গরু দুধ ছাড়তে রাজি যদি পায় ঘাস। অতএব জলে-পড়া পিঁপড়ের উদ্ধার নির্ভর করছে এতোগুলো শর্ত পালিত হওয়ার ওপর।

নৈয়ায়িক যুক্তিতেও এ স্তর-পরম্পরা সমর্থিত। দেশরক্ষার জন্যে সৈন্যদল দরকার, সৈন্যদল রাখার জন্যে অর্থের প্রয়োজন, অর্থের জন্য রাজকর চাই, রাজকরের জন্যে প্রজা চাই, প্রজার জন্যে জমি চাই, জমির জন্যে বীজ-জল, সার, মজুর চাই। তবে সে রাজকোষে মিলবে অর্থ।

কোন কাজ আদায়ে বাবা-মামা-শ্বশুরের তদ্বির চাই। ক্ষমতাবান আত্মীয়-বন্ধু-স্বজনের সুপারিশ চাই। তদ্বির ও সুপারিশের বিকল্প হচ্ছে অনাত্মীয় অপরিচিতের দেয় ঘুষ।

তদ্বীর, সুপারিশ ও ঘুষ আবার দু'প্রকার—প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ। যে চাকরি দেবে, চোরাচালান ধরবে কিংবা আবিষ্কার করবে, অথবা যে ঠিকেদারি, দোকানদারী, কারখানাদারি, সদাগরী, আমদানী-রফতানী প্রভৃতির আদেশ-অনুমতি-নিয়োগ দানের কর্তা, তার কাছে তদ্বির, সুপারিশ করা, বা তার হাতে ঘুষ দেয়া হচ্ছে প্রত্যক্ষ সম্পর্কের দুর্নীতি। আর এসব কর্তা ব্যক্তির ওপর প্রভাব আছে তেমন প্রতাপ-প্রতিপত্তিসম্পন্ন ব্যক্তিকে ঘুষ দিয়ে কিংবা আত্মীয়তার বন্ধুত্বের সূত্রে তাকে দিয়ে কাজ হাসিল করানো অথবা কর্তার শ্যালক-বোনাই-জামাইকে ঘুষ দিয়ে কিংবা অন্য কোন প্রকারে বশ করে তাদের দিয়ে তদ্বির-সুপারিশে কাজ আদায় করা হচ্ছে পরোক্ষ দুর্নীতি। অতএব, আফ্রো-এশিয়া-লাতিন আমেরিকার অনুন্নত দরিদ্রদেশে যে-কোন ন্যায়নীতি-নিয়ম-বিধি-বিধান সম্মত কাজেও হয় প্রভাবশালী ও ঘনিষ্ঠ আত্মীয় বন্ধুসূত্রে অথবা 'ফেল কড়ি মাখ তেল' নীতি মেনে ঘুষ দিয়ে কাজ আদায় করতে হয়। আর অদৃশ্য-আধার জগতের লেনদেনের তো কথাই নেই, ওখানে তো ওটিই নীতি-নিয়ম। ঘুষেরও প্রকারভেদে নামভেদ রয়েছে। যেমন পরোক্ষ ঘুষ ভক্তি-শ্রদ্ধা প্রীতি প্রতীক উপহার, প্রত্যক্ষ ঘুষ নজর, উপঢৌকন, সম্মানী, আবওয়াব, সালামী এবং কাজে সাহায্য পেয়ে এবং কাজ করে দেয়াতে মক্কেল খুশি হয়ে অর্থ-সামগ্রী দিয়ে কর্মকর্তাকে খুশি করার নাম 'বখশিস'। এ এখন হাটকর [হাসিল], ঘাটকর [পারানি], পথকর [সেস্‌কর] কোর্ট ফি প্রভৃতির মতো বিধি ও নীতিসম্মত হয়ে উঠেছে। লোকজন পারস্পরিক লাভে লোভে পরস্পরের সম্মতিক্রমে এসব তদ্বীর, সুপারিশ অর্থসামগ্রী আকারের নজর, উপঢৌকন, সম্মানী, আবওয়াব, সালামি, বখশিস, কমিশন, পাওন [পাওনা √ প্রাপ্য], মার্ভলি, টিপস পাপকর্ম কিংবা দুষ্কর্ম দুর্নীতি বলে বিবেচিত হয় না। এ যেন সামাজিক মানুষ হিসেবে মানবিক সৌজন্য-সহায়তা কিংবা দান-প্রতিদান মাত্র। হাটকর, ঘাটকর, বাটকরের মতোই যে কোন কাজের জন্য অফিসের বাঁকে বাঁকে আমলা-ফয়লার টেবিলে-টেবিলে দেঁতো হাসিযোগে ওই সৌজন্য-কর আদায় করতেই হয়। এ ঘুষ আদায়ের জন্যে যাদের পদ্ধতিগত জটিলতা, সিদ্ধান্তগত সমস্যার অনেকতা সময় সাপেক্ষতা, প্রাপ্তির জন্য যোগ্যতাগত অপ্রতুলতা, প্রতিযোগীর আধিক্য ও প্রতিযোগিতার তীব্রতা প্রভৃতি এবং আরো ইত্যাদি যোগে বহুতর অজুহাত ও অখণ্ডনীয় যুক্তি উপস্থাপিত করা হয়।

এ ব্যক্তি কিন্তু সর্বত্র শহুরে শিক্ষিত বা স্বল্পশিক্ষিত লোকের, যারা অফিস-আদালত-ব্যবসা-বাণিজ্য-হাট-বাজার-কলকারখানা-স্কুল-কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়-হাসপাতাল-রেল-জাহাজ-বিমান-আবগারি-শুল্ক প্রভৃতি হাজারো ক্ষেত্রে কাজ করে। দেখা গেছে প্রাথমিক মাধ্যমিক উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষকের, কলেজের অধ্যক্ষের এমনকি বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য

পর্যন্ত অনেকের বিরুদ্ধেই অর্থ আত্মসাতের অভিযোগ ওঠে। কাজেই প্রায় সবাই স্ব স্ব ক্ষেত্রে স্বাধিকারে যে কোন রকমের দুর্নীতির নীতি-নিয়ম লঙ্ঘনের, পক্ষপাতিত্বের দায়ে দায়ী; সবাই পাপী-অপরাধী, সবাই কাঁচের ঘরে বাস করে। তাই কেউ কাউকে সাহস করে উচ্চকণ্ঠে স্পষ্ট ভাষায় বলতে পারে না, —আমার কাজ করে দেয়া, আমার চাহিদা পূরণই তো নিযুক্তিসূত্রে আপনার দায়িত্ব, কর্তব্য ও বাধ্যতা। পয়সা চাওয়া কেন? হয়রানি কেন? —কাজেই দুর্নীতি জীবন-জীবিকার সর্বক্ষেত্রে প্রকাশ্য অলিখিত নিয়ম-নীতির রূপ পেয়েছে।

অভাব কেবল চরিত্রের

ব্যক্তিভেদে মানুষের স্বভাবে রয়েছে ভিন্ন ভিন্ন প্রবণতা। কেউ ত্যাগে, কেউ ভোগে, কেউ রাগে, কেউ বিরাগে, কেউ ক্ষমায়, কেউ প্রতিহিংসায় আসক্তি রাখে। কেউ কোমল, কেউ কঠোর, কেউ আবেগপ্রবণ, কেউ ধীর শান্ত, কেউ আনুগত্যপ্রবণ, কেউ বা দ্রোহী।

তাই বোধ হয় আস্তিক্যশাস্ত্রে আস্থাবান মাত্রই স্বভাবে চরিত্রে কর্মে আচরণে ন্যায়-সত্য-বিশ্বাসনিষ্ঠ ও প্রত্যাশিত মাপের সদাচারী নয়। কেউ কেউ কৈশোর যৌবনকাল থেকেই গার্হস্থ্য সুখ-ভোগ তুচ্ছ জেনে স্বর্গ মোক্ষ-নির্বাণ প্রাপ্তি লক্ষ্যে ফরিক-দরবেশ-সাধু-সন্ন্যাসী-ব্রহ্মচারী-শ্রমণ-ভিক্ষু-শ্রাবক হয়ে বিরাগীর জীবনে স্বস্তি খোঁজে। কেউ কেউ গৃহী বিষয়ী হয়েও শাস্ত্রীয় আচার-বিচার মেনেই ইহ পরলোকে প্রসৃত জীবন সার্থক ও সফল করতে চায়। সাধারণভাবে শতকরা অন্য নিরানব্বই জনেরই বার্ধক্যপূর্বজীবনে স্রষ্টায় ও শাস্ত্রে আনুগত্য থাকে শিথিল, আচারে থাকে ঔদাসীন্য। প্রয়োজন তীব্র ও প্রলোভন প্রবল হলে এরা পারে না এবং করে না হেন শাস্ত্রিক পাপ, নৈতিক অপকর্ম, সামাজিক অন্যায় এবং রাষ্ট্রিক অপরাধ নেই। এরা দুঃস্বপ্ন দেখে, রোগে পড়ে, আসন্ন ও আপন্ন বিপদের মুখে কাঙ্ক্ষিত ও প্রত্যাশিত প্রাপ্তির জন্যে কবচ ধারণ করে, মন্ত্র-মাদুলির প্রয়োজন বোধ করে, তুক তাক-দারুটোনার আশ্রয় নেয়, মসজিদে মন্দিরে দরগায় তীর্থক্ষেত্রে মানত করে, ফকির সন্ন্যাসী-পীর-গুরুর আশ্রয় নেয় আর নিতান্ত বিপদ-তারক ও প্রত্যাশাপূরক রূপে আল্লাহ-ভগবানকে স্মরণ ও শরণ করে। এদের ধর্মবুদ্ধি ও শাস্ত্র-সংলগ্নতা এরকমই। শাস্ত্রাচার তাদের তাদের সাময়িক সম্বল, আল্লাহ ভগবান তাদের সাময়িক প্রয়োজনে অবলম্বন। স্রষ্টার ও শাস্ত্রের সঙ্গে মানুষের সম্পর্ক যেখানে বৈষয়িক ও সাময়িক, বাহ্যিক ও ব্যবহারিক স্রষ্টা ও শাস্ত্র সেখানে ব্যক্তিক ও সামাজিক মানুষের ভাব-চিন্তা-কর্ম আচরণের সার্বক্ষণিক নিয়ন্তা হিসাবে কেজো আনুগত্য পেতেই পারেন না।

অতএব, এ ধরনের মানুষের মধ্যে কাম্য মানবিক গুণের উন্মেষ-বিকাশ সম্ভব নয়, যে-গুণ মানুষের সামাজিক নৈতিক দায়িত্বচেতনা, কর্তব্যবুদ্ধি, কৃপা-করুণাবৃত্তি জাগায়, বৃহত্তর পটে জগৎ জীবন-জীবিকার তাৎপর্য সচেতন করে, মনে-মননে সে গুণের অনুশীলন এ মানুষের মধ্যে বিরলতায় দুর্লভ। এমনি মানুষ কোন কিছুর আকাঙ্ক্ষা বোধ কিংবা অভাব অনুভব করলে তা সহজে পূরণের জন্যে ছল-চাতুরী-বঞ্চনার কিংবা কাঁড়া-মারা-হত্যার আশ্রয় নেয়। আস্তিক মানুষের স্রষ্টায় বিশ্বাস এবং শাস্ত্রে আস্থা থাকা সত্ত্বেও এসব মানুষ শাস্ত্রের বিধি নিষেধের,

নৈতিক ন্যায়-নিয়মের, রাষ্ট্রিক আইন কানুনের ও সামাজিক প্রথা-পদ্ধতির অনুগত থাকতে চায় না, প্রয়োজনবোধে সুযোগ পেলেই বেড়া ভাঙে। সুতরাং স্রষ্টায় বিশ্বাস আর শাস্ত্রে আস্থা সমাজসদস্য মানুষকে ন্যায়-নিয়ম-নীতির অনুগত, বিধি-নিষেধ-রীতি পদ্ধতির অনুসারী সৎ সংযত সদাচারী সুজন করে না। অর্থাৎ আস্তিক মানুষ মাত্রই প্রচলিত অর্থে প্রত্যাশিত গুণ-মান-মাত্রার চরিত্রবান হয় না। এমন মানুষ যে কেবল বিধর্মী বিদেশি বিভাষীকেই পর ও শত্রু ভাবে, তা নয়, পর প্রতিবেশীকেও আপন করতে অক্ষম, কুটুম্বকেও আত্মীয় মানতে অসমর্থ। এ আস্তিক মানুষই অর্থ সম্পদ লোভে ও রাজনীতির স্বার্থে সারা পৃথিবীর সর্বত্র দেশ জাত-গোত্র-বর্ণ-ধর্ম-ভাষা-মত পথভেদের অজুহাতে দাঙ্গা বাধায়, দেশ ছড়ায়-হত্যা করে!

আস্তিক্যের পরেই মানুষকে বাঞ্ছিত লক্ষ্যনিষ্ঠ রাখে স্ব-সৃষ্ট ও স্ব-অঙ্গীকৃত নীতিবোধ বা নৈতিক চেতনা।

এ চেতনার উদ্ভব 'অহং সচেতনতায়', আত্মমর্যাদাবোধে নিন্দা-ঘৃণা ভীরুতায়, যুক্তি-বুদ্ধি-বিবেক-বিবেচনা-সংযম-সুরুচি-সৌজন্যে, ন্যায়বুদ্ধিজাত দায়িত্বচেতনায় ও কর্তব্যবোধে, আর সমাজ-সদস্য হিসেবে সহস্বার্থে স্বাধিকারে সহিষ্ণুতায় সহযোগিতায় সহাবস্থানের আগ্রহ থেকে। নেহাত শাস্ত্রানুগত্য থেকে এ নৈতিক চেতনার উদ্ভব ঘটে না কখনো। তাই সবাই আস্তিক হলেও নীতিনিষ্ঠ আদর্শানুগত সৎ বিবেকবান সুজন লাখে না মিলয়ে এক। অতএব ধার্মিক নয়, নীতিবান আর চরিত্রবান সমার্থক কিংবা অভিন্নার্থক। এমনি নীতিনিষ্ঠ মানুষ অধিক সংখ্যায় সমাজে সরকারে কর্তৃপদে থাকলে বুর্জোয়া সমাজে শোষণ চললেও পীড়ন ও নির্যাতন কমে।

এ-ও সত্য যে সব মানুষ কখনো নাস্তিক হবে না অদূর ভবিষ্যতে জীবনে জীবিকায় নিরাপত্তাকামী স্বল্পবুদ্ধির আবেগপ্রবণ ভীরু মানুষ ভয়-ভরসার অবলম্বন খুঁজবে কাল্পনিক ও গতানুগতিক অদৃশ্য দৈব শক্তির মধ্যে। এরা অন্তরের মধ্যে মর্ত্যমানুষের জীবন জীবিকায় ঐহিক বাস্তবতার ও ইহসর্বস্বতার সীমাবদ্ধতা স্বীকার করে না, —অলৌকিক-অপার্থিক শক্তির কাল্পনিক অযৌক্তিক প্রভাবেও লীলা অনুভব করে অন্তরের গভীরে। কেবল মর্ত্য-জীবনে আস্থাবান নাস্তিক হলেই মানুষ শুধু স্বাধিকারে সহিষ্ণুতার সহযোগিতায় সহাবস্থানের অঙ্গীকারে যুক্তি-বুদ্ধি বিবেক-বিবেচনানির্ভর সুরুচি-সৌজন্য সুন্দর জীবনাচারের অনুশীলন করত। প্রাচীন ভারতে নাস্তিক চার্বাক, আজীবিক, আদি সাংখ্য-যোগ তন্ত্রাচারী নাস্তিক প্রভৃতি এমনি একপ্রকারের নীতিনিষ্ঠ জীবনযাপনে ছিল অভ্যস্ত। আপাতত আমাদের মতো অর্থে বিত্তে বিদ্যায় সংস্কৃতিতে বিকাশমান অথচ বিদেশি অর্থনির্ভর মুৎসুদ্দি-সরকার শাসিত উঠতি বুর্জোয়া প্রভাবিত রাষ্ট্রে নৈতিক চেতনাপুষ্ট মানুষের নেতৃত্ব প্রয়োজন সমাজে সরকারে ও শিল্প-বাণিজ্য ক্ষেত্রে। নইলে একদিকে দুর্জন দুর্বৃত্তের সংখ্যা যেমন বেড়ে যাবে, অন্যদিকে সমাজে দুর্বল, অসহায় ভীরু মানুষের সংখ্যাও তেমনি পাবে অবাঞ্ছিতভাবে বৃদ্ধি। ফলে দুর্নীতি দুর্বৃত্তি গ্রাস করবে মানুষের নৈতিক, আর্থিক, সামাজিক, প্রাশাসনিক জীবন ও জীবিকা।

ইতোমধ্যেই গাঁয়ে-গঞ্জে নগরে-বন্দরে অশাসন-দুঃশাসনের ফলে সাধারণ মানুষের জীবন-জীবিকা বিপন্ন, অনিশ্চিত কিংবা দুর্নীতি-নিপীড়ন কবলিত হয়ে পড়েছে। দুষ্ট-দুর্জন-দুর্বৃত্ত-লম্পট-খুনি লুটেরা অধ্যুষিত গ্রামে-নগরে জনসাধারণ ও গণমানব সমভাবে ভীত-সন্ত্রস্ত। গাঁয়ে-গঞ্জে-নগরে-বন্দরে দুষ্ট-দুর্জন দুর্বৃত্তের অধিকাংশ হচ্ছে বিত্তবান কিংবা উঠতি বিত্তবান ঠিকাদার, কারখানাদার, আড়তদার, সওদাগর, গ্রামীণ ও শহুরে প্রশাসক-দল আর কেড়ে-মেরে-হেনে অর্থোপার্জনকামী মস্তান-গুণ্ডারা। সমাজে সরকারে-ব্যবসায়ে-বাণিজ্যে লুটে-হননে এদের রয়েছে

পারস্পরিক আঁতাত। এ শ্রেণীর মানুষদের মধ্যে হাজারে একজন নীতিনিষ্ঠ চরিত্রবান লোক মেলে না।

মন্ত্রীরা, সরকারি আমলারা, গাঁয়ে ও শহরে নির্বাচিত প্রশাসকরা চলনে বলনে সর্বক্ষণ-লোকসেবক ও লোকহিতকামী অথচ তাদের মহৎ বুলির ও নিষ্ঠসেবার বদৌলত দেশের মানুষের দারিদ্র্য দুখ-দুর্দশা বাড়ে আর তারা নিজেরা সপরিবারে দ্রুত স্বাস্থ্যে, অর্থে বিত্তে বেসাতে স্ফীত হয়ে ওঠে। আফ্রো-এশিয়ার লাতিন আমেরিকার বিদেশির অর্থপুষ্ট মুৎসুদ্দি শাসিত সব রাষ্ট্রে জনগণের অবস্থা ও অবস্থান তাই অভিন্ন।

দ্রুত আমূল সমাজ পরিবর্তনই তথা সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠাই এ শোষণ-পীড়ন বঞ্চনার ও দুঃশাসন-দুর্নীতি-দুর্ভোগের আশু অবসান ঘটাতে পারে। আপাতত জনগণের জীবনে-জীবিকায় নিরুপদ্রব নিরাপত্তার স্বস্তিশান্তি লক্ষ্যে সমাজে সরকারে-শিল্পে-বাণিজ্যে-রাজনীতিতে কর্তৃ ও নেতৃপদে বেশ কিছুসংখ্যক চরিত্রবান লোক আবশ্যিক।

এ লোক তৈরি হবে সামাজিক, রাজনীতিক, সাংস্কৃতি, নৈতিক ও শৈক্ষিক আন্দোলনের ফলে। গোটা সমাজে অধিকাংশ লোকের মনে যদি অন্যায়-অন্যায়কারীর প্রতি তীব্র ঘৃণার ও প্রতিরোধের ভাব সঞ্চারিত হয়, ঘৃণ্য-নিন্দনীয় কর্ম-আচরণের জন্যে চিহ্নিত ব্যক্তি ও আইনের চোখে অপরাধী ব্যক্তিরা যদি ব্যক্তিগত জীবনেও আত্মীয়-স্বজনের ও পরিচিতি জনের কাছে ঘৃণ্য হয়েছে বলে অনুভব করে, তাহলে তারাও যেমন আত্মশোধনে উদ্যোগী হবে, তেমনি অন্যরাও সচেষ্ট হবে ঘৃণা নিন্দা-অপরাধ এড়িয়ে চলবার জন্যে।

আমরা জানি 'অহম্'-সচেতন ব্যক্তি আত্মসম্মান রক্ষার জন্যেই সব সময়ে যুক্তি-বুদ্ধি-বিবেক বিবেচনা লব্ধ নীতি-নিয়মে চালিত হয় এবং সংযম সততা সুরুচি সৌজন্য বজায় রাখতে সচেষ্ট হয়। এসব গুণসম্পন্ন মানুষই 'চরিত্রবান' বলে আখ্যাত হয়।

সমাজ পরিবর্তন লক্ষ্যে সফল বিপ্লব না ঘটা পর্যন্ত আফ্রো-এশিয়া লাতিন আমেরিকার উন্নয়নকামী রাষ্ট্রে মুৎসুদ্দি নয়, নেতৃ ও কর্তৃপদে চরিত্রবান লোক আবশ্যিক। নইলে শোষণ-পীড়ন দুঃশাসন কবলিত দুস্থ মানুষের জীবন-যন্ত্রণায় জীবিকা-সমস্যায় স্বস্তি-শান্তি মিলবে না।

ব্যক্তিত্ব

পথে মানুষের ভীড়ে আমি আমার অস্তিত্বই যেন হারিয়ে ফেলি, কেন না, তখন আমি অজ্ঞাতপরিচয় নিঃসম্পর্কিত এক পথিক, কারো কাছেই আমার কোন মূল্য-মর্যাদা নেই আমি তখন গুণ-মান মাহাত্ম্যরিক্ত এক পথিক মাত্র, আমার প্রতি কারো আকর্ষণ নেই, নেই কারো জিজ্ঞাসু বা কৌতূহলী দৃষ্টি। তাই আমি যে-প্রীতি-প্রেম-শ্রদ্ধা-ভক্তির কিংবা হিংসা-ঈর্ষা-ঘৃণার পাত্র, তা আমার পথিক জীবনে থাকে অজ্ঞাত ও অস্বীকৃত। অসহায় অবহেলিত উপেক্ষিত পথিকের তখন হুকুম-হুমকি হামলার পাত্র থাকে না কেউ। কাজেই ঘরের বাইরে, পরিচিতের বৃত্তের বাইরে আমি কেউ নই, আমি কিছু নই।

অথচ ব্যক্তি-সত্তার অস্তিত্ব অনুভূত ও প্রকাশিত হয় কথায়, কাজে ও আচরণে তার মনোভাবের অভিব্যক্তির মাধ্যমে। যার ব্যক্তিত্ব যত প্রবল, তার কথার, কাজের ও আচরণের গুরুত্ব তত বেশি। ব্যক্তিত্বের প্রকাশ হুকুম শোনার আগ্রহের মধ্যে নয়, হুকুম করার শক্তির মধ্যে, জুলুম সহ্য করায় নয়, জুলুম চালানোর শক্তিতে, ক্ষমতা দেখানোর সাহসে, স্নেহ-মমতা পাওয়ায় নয়, স্নেহ-মমতা-প্রীতি-প্রেম দেওয়ার উদারতায়, শ্রদ্ধা-ভক্তি-আনুগত্য নিবেদনে নয়—প্রাপ্তিতেই। অতএব সত্তার বাঞ্ছিত সুপ্রকাশ ও প্রতিষ্ঠা শক্তিনির্ভর। সেশক্তি যথাযোগ্য আচরণের, সংযমের, স্থান-কাল-পাত্র চেতনার, সাহসের, আত্মপ্রত্যয়ের, বিদ্যা-বুদ্ধি-জ্ঞান-প্রজ্ঞা-বিবেক-বিবেচনার। এক কথায় স্থান-কাল-পাত্রভেদে যথা সময়ে যথা প্রয়োজনে যথাযোগ্য ত্বরিত সিদ্ধান্ত নিয়ে কথায়, কাজে এবং আচরণে তা পরিব্যক্ত করার শক্তিই হচ্ছে ব্যক্তিত্ব। সুতরাং সত্তার বাঞ্ছিত ব্যক্তিতে সুপ্রকাশের ও সুপ্রতিষ্ঠার উৎস হচ্ছে আত্মিক তথা মানসিক শক্তি, যা আত্মপ্রত্যয় প্রসূত।

অকবির, অশিল্পীর, অচিত্রীর, অদার্শনিকের ব্যক্তিত্ব দেশ-কালের সীমায় থাকে নিবদ্ধ। এ অনেকটা 'স্বদেশে পূজ্যতে রাজার' মতো আপ্তবাক্য সম্পৃক্ত। কালান্তরে কিংবা স্থানান্তরে ক্ষীণ-শ্রুত কিংবা বিলুপ্ত হওয়াই এর নিয়তি। কবি-শিল্পী-চিত্রী-শাস্ত্রী-দার্শনিক তাঁদের সৃষ্টির মধ্যে দীর্ঘকাল বেঁচে থাকেন এবং স্থানান্তরে, কালান্তরে আর ভাষান্তরেও থাকেন স্মরণীয়। আর অসামান্য শক্তির অনন্য মানুষেরা লোকস্মৃতিতে চিরকাল ভাস্কর হয়ে বিরাজ করেন। এদের মধ্যে সন্ত-দরবেশ, ইতিহাসস্রষ্টা লোকপাল-নায়ক-মহানায়ক-মার্কস-লেনিন-মাও যেমন আছেন, তেমনি রয়েছেন চেঙ্গিস্ হালাকু-এটিলা-আলেকজাণ্ডার-নেপোলিয়ন-হিটলার-মুসোলিনীও। এঁদের কেউ কেউ লোকবন্দ্য, কেউবা লোকনিন্দ্য, কিন্তু স্বসত্তার প্রকাশে ও প্রতিষ্ঠায় সবাই বিভিন্নভাবে সফল। এসব ব্যক্তিত্ব তাই শংসায় কিংবা নিন্দায় অবশ্য স্মরণ্যে। তাঁরা তাঁদের জীবনের প্রতিটি মুহূর্তে চারদিককার স্বকালের মানুষকে হাড়ে হাড়ে মর্মে মর্মে অনুভব করিয়েছেন। তাঁরা যথার্থই বলতে পারতেন ও পারেন ভেনি-ভিডি-ভিসি-দুনিয়াতে এলাম, দেখলাম ও জয় করলাম। তারা সবাই কীর্তিমান। কু বা সু আপেক্ষিক মত, মান ও মাত্রা জ্ঞাপক প্রয়োগ মাত্র। সত্তার এমনি প্রকাশে ও প্রতিষ্ঠায় জীবন হয় সার্থক।

শিল্প-সাহিত্য-দর্শনের মধ্যে যারা আত্মপ্রকাশ করেন, তাদের অন্যরা অতি ঘনিষ্ঠ সান্নিধ্য থেকে মন-মনন, রুচি-বুদ্ধি-যুক্তি-বিবেক প্রয়োগে চাক্ষুষ বা সাক্ষাৎ-পরিচয় ছাড়াই দেশ-কাল-ভাষার বাধা অতিক্রম করে অন্তরঙ্গভাবে জানতে, চিনতে ও বুঝতে পারে। তাদের মন-মত-আদর্শ-উদ্দেশ্য এবং তাদের সামগ্রিক জীবন-ভাবনা ও জগৎ-চেতনা সমেত জীবন্ত মানুষের সন্ধান মেলে তাদের পরিব্যক্ত ভাব-ভাবনায়।

যাঁরা অন্য সাধনায়, কৃতিত্বে, কীর্তিতে, বাণীতে, কৃপায়, করুণায়, দানে, দাক্ষিণ্যে, সেবায় লোকশ্রুত ও লোকপ্রিয় হয়ে কিংবা ইজমের দৌরাত্ম্যে শোষণে-পীড়নে গণশত্রু ও লোকপ্রিয় হয়ে কিংবা ইজমের দৌরাত্ম্যে শোষণে-পীড়নে গণশত্রু ও গণধিকৃত রূপে জনগণের স্মৃতিতে ঠাঁই পান, তারা স্ব-প্রভায় প্রভাবিত স্বকালের মানুষের বিভ্রান্তি জাত নানা প্রবন্ধে বৃত্তান্তে-কিংবদন্তীতে মিথ্ ও লিজেণ্ড হয়েই বিশ্বাসপ্রবণ স্বল্পবুদ্ধি মানুষের সমাজে কাহিনীর নায়ক হয়ে চিরকাল স্থানিকভাবে বেঁচে থাকেন, উৎসাহী লোকের লেখার বিষয় হয়ে দেশান্তরেও কেউ কেউ পরিচিত ও স্মরণীয় হয়ে ওঠেন। লক্ষ লক্ষ কোটি মানুষের ইতোমধ্যে জন্ম-মৃত্যু হয়ে গেলেও স্বসত্তার প্রকাশে-বিকাশে প্রতিষ্ঠায়-প্রচারে প্রভাবে অনন্য ব্যক্তিত্বরূপে স্বীকৃত হয়েছেন তেমন

মানুষের সংখ্যা দুনিয়ায় আজো বেশি নয়। তাই স্থানিক, দৈশিক, জাতিক কিংবা বৈশ্বিক ইতিহাসের-ইতিবৃত্তের কলেবর আজো তেমন স্ফীতি পায়নি, হয়ে ওঠেনি প্রত্যাশিত কৃতি-কীর্তি বৈচিত্র্যে ভাস্বর ও চমকপ্রদ।। নগণ্য সংখ্যক শাহ-সামন্তের শাসন-শোষণ-পীড়ন-দাসত্ব কবলিত এবং নিঃস্বতা, নিরন্নতা নিরক্ষরতা-নিজ্ঞানতার শিকার ছিল বলে এবং এখনো পৃথিবীর অধিকাংশ মানুষ অজ্ঞ-অনক্ষর-দরিদ্র-দুর্বল বলে বিশ্বাস-সংস্কারের, শাস্ত্রের-সমাজের, শাসকের-শোষকের কবলমুক্ত নয় বলে মানুষের আত্মবিকাশের সত্তার স্বরূপে অভিব্যক্তি দানের, ব্যক্তিত্বের প্রভাবিকিরণের সুযোগ আজো কৃচিৎ কেউ পায় বলেই ইতিহাসের কলেবর বিশাল নয়, মানুষের কাহিনী বিচিত্র নয়। ছোট ছোট প্রকাশের-বিকাশের স্বাভাবিক পরিবেশ থাকে না বলেই সাহসীর ব্যক্তিত্ব বিকৃত হয়ে দুষ্ট-দুর্বৃত্ত-দুষ্কর্মা-দুঃশাসকের রূপ গ্রহণ করে, তবু এর মধ্যেই কৃচিৎ কেউ কোথাও কোন কালের স্পার্টাকাস কিংবা চেগুয়েভারাও হয়ে ওঠে।

মুদ্রা ও মুদ্রাযন্ত্র

মুদ্রামাত্রই কোনকিছুর প্রতীক। মুদ্রা মূলত ভাবপ্রতীক। অব্যক্ত ধ্বনিপ্রতীকও। ভাব মুখে উচ্চারিত ধ্বনিতে প্রকাশ না করে অঙ্গ ও অঙ্গুলির ভঙ্গিতে ব্যক্ত করার উৎকৃষ্ট ও সুপ্রাচীন মাধ্যম হচ্ছে মুদ্রা। তাই মুদ্রা একাধারে আভাস ও আভাষ। মানুষের ও দেবতার অভিপ্রায় বিনিময়ের মাধ্যম হিসেবেই মুদ্রার উদ্ভব। সেই মুদ্রাই ক্রমবিকাশের ধারায় হল দেবতার কাছে প্রার্থনার ও আত্মনিবেদনের বিচিত্র অভিব্যক্তির মনমাতানো, চোখজুড়ানো, চমকলাগানো বাহন।

আর এক মুদ্রা হচ্ছে ধন-প্রতীক। বিনিময় মাধ্যম হিসেবে স্মারক নিদর্শন কিংবা অভিজ্ঞানরূপে এর ব্যবহার শুরু। অঙ্গীকারকারীর, দাতার কিংবা পালক-পোষক-শাসক রাজার ধনরূপ প্রাপ্য তথা প্রাপ্যধন পরিশোধের অঙ্গীকার ও দায়িত্ব পালনের স্বীকৃতি স্বাক্ষর হিসেবে নাম ও দাম অঙ্কিত ধাতুই মুদ্রা নামে পরিচিত বা অভিহিত হল। অঙ্কিত উৎকীর্ণ অর্থে মুদ্রিত বা ছাপযুক্ত ধাতুই মুদ্রা। সেই মুদ্রা কালক্রমে সোনা-রূপা-তামা-পিতল নিকেল অতিক্রম করে এখন কাগুজে মুদ্রায় উত্তীর্ণ। তাও আবার হুণ্ডি-চেক-ড্রাফটে বিচিত্র। মানুষ একদা অনেক উঁচুদরের সূক্ষ্মবুদ্ধির বলে ধন আদান-প্রদানের, পণ্য ক্রয়-বিক্রয়ের সহজতম ও সরলতম মাধ্যম হিসাবে সর্বজনস্বীকৃত, সর্বজনগ্রাহ্য করার লক্ষ্যে সর্বজনমান্য ও সর্বজন আস্থাভাজন রাজার অঙ্গীকার প্রতীক করে নামের ও দামের ছাপযুক্ত তথা মুদ্রিত নাম-দাম সম্বলিত ধাতুকে বিনিময় মাধ্যম মুদ্রারূপে চালু করে। সেই মুদ্রাই সঞ্চয়ের, পাচারের, করের, বঞ্চনার, লুটের, প্রতীক-প্রতিভূ ও মন্ত্রপূত জাদু-কবচ-মাদুলি হয়ে দৈশিক ও বৈশ্বিক শোষণের-পীড়নের-বঞ্চনার-লাঞ্ছনার-অনাহারের ও অপমৃত্যুর শিকার করে রেখেছে বিশ্বের সরল-সুজন স্বল্পসমর্থ মানুষকে। দুর্বৃত্ত-দুর্জন-প্রবল-পামরেরা দীন-দুর্বলকে দলনে-দমনে-হুকুমে-হুমকিতে-হামলায় করেছে পীড়িত-শোষিত-বঞ্চিত। এ ধন-প্রতীক মুদ্রার নাম অর্থ। অর্থ-এর নানা মানের মধ্যে কাম্য বা প্রয়োজনীয় কিংবা লক্ষ্য বস্তুর ধনও রয়েছে। এ অর্থ ভাগাভাগি, কাড়াকাড়ি, দেয়া-নেয়া নিয়েই দুনিয়াব্যাপী জনে জনে, ঘরে ঘরে, গাঁয়ে গাঁয়ে, দেশে দেশে চলেছে প্রতিযোগিতা,

প্রতিদ্বন্দ্বিতা, মারামারি হানাহানি। এ মুদ্রা বা অর্থ লোভের ও ভাগের চরম পরিণতি হচ্ছে রাষ্ট্রে রাষ্ট্রে শান্তি, স্বস্তি, সংস্কৃতি, সভ্যতা, মানুষ ও মনুষ্যত্ব বিনাশী যুদ্ধ। এ মুদ্রার তথা অর্থের প্রাপ্তি-অপ্রাপ্তির, হ্রাস-বৃদ্ধির, থাকা না থাকার ওপরই নির্ভর করছে ব্যক্তিক, পারিবারিক, সামাজিক ও রাষ্ট্রিক জীবনের সুখ-দুঃখ, আনন্দ-যন্ত্রণা, সুস্থতা স্বস্থতা, এক কথায় বাঁচা-মরা। আজকের এ মুহূর্তে যেমন মুদ্রাস্ফীতিই আমাদের যন্ত্রণার, অস্বস্তির, সমাজে দুর্বৃত্ত-দুর্জন-দুষ্কৃতী বৃদ্ধির, দুশমন-দুর্নীতি দুঃশাসন ব্যাপ্তির, জনজীবনে আইন-শৃঙ্খলার ও নিয়মনীতির অবলুপ্তিজাত নিরাপত্তাহীনতার সর্বপ্রধান কারণ। সর্বত্র তাই জোর-জুলুমই প্রকট। সমাজ তাই বুনো-বর্বরের আরণ্য সমাজের মতো জালিমে মজলুমে বিভক্ত—বিদ্যা-বুদ্ধি-জ্ঞান-প্রজ্ঞা-সংস্কৃতি-সভ্যতা, মানবতা মানুষ্যত্ব আজ মূল্য-মর্যাদাহীন, ধার-ভার হৃত, প্রভাব-প্রতাপচ্যুত।

অঙ্কিত, উৎকীর্ণ বা ছাপ অর্থে মুদ্রা ব্যবহৃত বলেই ছাপানোর কলের বা যন্ত্রের নাম মুদ্রাযন্ত্র। একালে লোকে বলে মুদ্রণযন্ত্র। এ মুদ্রা হচ্ছে বাক-প্রতীক। বাক ও বাণীকে উৎকীর্ণ হরফের খাঁচায় পুরে তার ছাপ কাগজে তুলে ইচ্ছেমতো প্রয়োজনমতো বিশ্বময় ছড়িয়ে দেয়ার এ বুদ্ধি যেদিন ব্যক্তিমনে জাগল, সেদিন সে কৌশলে কল বানালো। কৃৎকৌশলের ও যন্ত্রের উৎকর্ষে বিদ্যুৎচালিত বিভিন্ন যন্ত্রের প্রয়োগে ছাপানোর কিংবা প্রতিচ্ছবি তৈরি করার জাদু এল মানুষের আয়ত্তে। আজ বিশ্বের এক প্রান্তের একজন মানুষের মনের কথা, ভাবের কথা, জ্ঞান-প্রজ্ঞার কথা প্রয়োজনবোধে ইচ্ছেমতো বিশ্বমানবের ঘরে ঘরে পৌঁছে দেয়া সম্ভব হচ্ছে। কাগজে মুদ্রিত বাক-বাণীতে বিশ্বমানবের অধিকার আজ প্রতিরোধ্য। চেষ্টা করেও সহজে লুকোনো-ছাপানো যায় না। এক সংস্কৃত নাটকের নাম মুদ্রারাক্ষস। মুদ্রাযন্ত্র রাক্ষস নয়, তবে রাহু। মানুষের লিপিবদ্ধ অভিব্যক্তিকে কুক্ষিগত করে স্থায়িত্ব দেয়, প্রচার করে, অনুপস্থিত মানুষের চিন্তা-চেতনার বৈশ্বিক জগৎ অবিরত গড়ে তুলছে ও তুলবে বইপত্র।

অবশ্য মুদ্রাযন্ত্রের এখন প্রতিদ্বন্দ্বী অনেক। রেডিও টেলিভিশন ভি, সি, আর, সিনেমা দিবারাত্রি সর্বক্ষণ বইয়ের ও দৈনিক সাময়িক পত্রের অধিকারে উপদ্রব সৃষ্টি করছে বটে, এদের খপ্পরে পড়ে কেউ কেউ বইপত্রের প্রতি সাময়িকভাবে অবহেলাও দেখায় বটে, ক্যাসেট-কম্প্যুটারও হুমকি হামলার আশঙ্কা জাগায়। কিন্তু মুদ্রাযন্ত্র থাকবে অটল-অক্ষত।

এ যন্ত্রের ও যুক্তির যুগে ও জগতে মানুষের ঐহিক জীবন নিয়ন্ত্রণ করছে ও করতে থাকবে কাগুজে মুদ্রা ও মুদ্রাযন্ত্র।

ধারণ করে বলে পৃথিবীর নাম হচ্ছে ধরা, ধরণী, ধরিত্রী। মা জন্ম দেয়, মাটি আমাদের লালন করে। আমাদের দেহও নাকি স্বরূপে মাটির তৈরি, মাটি গর্ভস্থ সম্পদ ও মাটিজাত জীব-উদ্ভিদেই আমাদের জীবন-জীবিকার অবলম্বন। অতএব আমাদের জীবন মাটি ও মাটিজাত সম্পদনির্ভর। আগেই বলেছি, এ সম্পদ-প্রতীক মুদ্রাই আমাদের জীবন নিয়ন্ত্রক আর হরফ-ধৃত মুদ্রিত বাক-বাণীরূপ চিন্তা-চেতনার প্রসূনই আমাদের মানস জীবনের নিয়ামক।

অপরিকল্পিত বিশৃঙ্খল উৎপাদনপদ্ধতি ও মুদ্রার আকারে সম্পদের বঞ্চনাভিত্তিক অসম বণ্টনরীতিই রয়েছে শ্রেণীশোষণের ও শ্রেণীদ্বন্দ্বের মূলে। অস্তিত্ব বজায় রাখার ও নিরাপত্তার গরজে মানুষের ঐহিক জীবনে অবল-প্রবলের, দুর্জন-দুর্বলের, পীড়ক-পীড়িতের, দাস-প্রভুর, সেবক-সেবিতের, শোষক-শোষিতের সম্পদ নিয়ে এ অবচেতন-চেতন দ্বন্দ্ব-সংঘাতের বৃত্তান্তই হচ্ছে মানব-অস্তিত্বের ও মানবসভ্যতার ইতি-বৃত্তান্ত। জীবন কখনো নির্দ্বন্দ্ব-নির্বিঘ্ন ছিল না বলেই কোন শ্রেণীই বাঞ্ছিত সুখ পায়ওনি, দেয়ওনি। মানুষ প্রকৃতির দেয়া দুঃখ-বিপর্যয়

অনেকাংশে ঘুচিয়েছে-ঘুচাচ্ছে, ঝড়-ঝঞ্ঝা-খরা-বৃষ্টি-রোগ-তাপ-শৈত্য থেকে আত্মরক্ষার উপায় খুঁজে পেয়েছে ও পাচ্ছে। বাকি রয়েছে মানুষের ওপর মানুষের চাপানো দুঃখ-যন্ত্রণা-অভাব-পীড়ন-শোষণ-নির্যাতন।

মানুষের চিন্তা-চেতনার, মানবিকবোধের ও মনুষ্যত্বের বিকাশ-বিস্তার উৎকর্ষ বলে এ যাবৎ যা কিছু অভিহিত হয়েছে, তা, চেতন-অবচেতনভাবে শ্রেণীস্বার্থে শ্রেণীগত জীবন-ভাবনার ও জগৎচেতনার ফল, এর থেকেই শ্রেণীগত জীবনের ঐহিক-পারত্রিক আদর্শ-উদ্দেশ্য, লক্ষ্য, নীতি-নিয়ম, রীতি-পদ্ধতি, পাপ-পুণ্য, ন্যায়-অন্যায় প্রভৃতি সম্বন্ধে ধারণা গড়ে উঠেছে।

ফলে বহুজনহিতে ও বহুজনসুখ লক্ষ্যে কেউ কিছু ভাবতে ও করতে চাইলেও সার্থকভাবে পারেনি। কাজেই এতকাল কাড়াকাড়ির মাধ্যমে সম্পদের বেতালা-বেপরওয়া ব্যবহারই ছিল চালু, তাতে জীবন-যন্ত্রণা বেড়েছে, কমেনি। এ যুগে যন্ত্রের ও যুক্তির শক্তি স্বীকার করে এবং যন্ত্রের ও যুক্তির অনুগত থেকে আপসে যৌথজীবন তথা সামাজিক রাষ্ট্রিক জীবন নির্দ্বন্দ্বে ও নির্বিঘ্নে যাপন করা সম্ভব, সঙ্গত এবং বাস্তব বুদ্ধিসম্মত।

আমরা যদি ব্যক্তিক কিংবা শ্রেণীগত বিশৃঙ্খল মন-মনন, মত-পথ পরিহার করে সর্বমানবের কল্যাণমুখী চিন্তা-চেতনায় উদ্বুদ্ধ হয়ে সম্পদের উৎপাদনে বণ্টনে নির্বিশেষ মানবাধিকার ও প্রয়োজন স্বীকার করি, তাহলে মাটির সম্পদপ্রতীক মুদ্রার এবং বাক ও বাণী প্রতীক মুদ্রাযন্ত্রের ও মুদ্রিত বাকের ব্যবহার মানুষের জীবনে সার্থক হবে। এজন্য অনন্ত অধিকাংশ মানুষের একটি সংকল্প ও অঙ্গীকার উচ্চারণ প্রয়োজন। তা এই-সমস্বার্থে স্বাধিকারে সহিষ্ণুতায় সহযোগিতায় সহাবস্থানের সঙ্কল্প ও অঙ্গীকার। এ সঙ্কল্প ও অঙ্গীকার গৃহীত হলে মাটি, মুদ্রা ও মুদ্রাযন্ত্র কোন মানুষেরই দুঃখ-যন্ত্রণা-দুশ্চিন্তার কারণ হবে না কখনো।

রবীন্দ্র সাহিত্য ও গণমানব

আত্মপ্রত্যয়হীন হীনমন্য কৌতূহলী মানুষের মনে গোড়ার দিকে যখন জগৎ জীবন সম্পর্কে জিজ্ঞাসা জাগে, তখন তা জাগে কল্পিত ও অদৃশ্য মহাশক্তিমান ভয়-বিস্ময়কর দেব-দৈত্য-রাক্ষস-জীন-পরী-ভূত-প্রেত নামের কল্পলোকের বিচিত্র কর্ম-আচরণের প্রাণীকে জড়িয়ে। ক্রমে জ্ঞান-যুক্তি বুদ্ধি-মনের বিকাশে ও প্রসারে এবং সমাজবদ্ধ জীবনে বাস্তব অভিজ্ঞতার ফলে তাদের চেতনায় গণ-শাসক ও গণ-ভাগ্য নিয়ন্তা হিসেবে গুরুত্ব পেতে থাকে শাহ-সামন্ত ও সদাগর। অজ্ঞ-অসহায় মানুষের চেতনা আচ্ছন্ন করে এসব দেব-দৈত্য-মানবই স্থিতি পেয়েছিল মানুষের মনে। এসব কাল্পনিক ও বাস্তব দেব-দৈত্য-মানবের প্রতি ভয়-আনুগত্য থেকেই উদ্ভূত হয়েছিল স্বস্তি ও নিরাপত্তাকামী অজ্ঞ-অসহায় মানুষের শাস্ত্র-বিশ্বাস-সংস্কার-নিয়ম-নীতি। এ কারণেই আদিকালের রূপকথা, উপকথা, ব্রতকথা প্রভৃতি সবকিছু রচিত হয়েছিল দেব-দৈত্য আর শাহ্ -সামন্ত সদাগর নিয়ে। বহু বহু কাল ধরে মানুষের মন-মনন আটকা পড়েছিল সভ্যতা-সংস্কৃতি বিকাশের এ স্তরেই। রবীন্দ্রনাথ মানুষের মন-মননের এ স্তরকে প্রভাত সূর্যের পর্বতশীর্ষে প্রথম কিরণ পাতের সঙ্গে তুলনা করেছেন।

তারপর যখন রূপকথা, উপকথা ও শাস্ত্রকথা কিস্‌সা-কাহিনী আকারে কাব্য-নাটক হিসেবে সাহিত্য-শিল্প রূপে লিখিত রূপ পাচ্ছিল, তখনো সাধারণ মানুষের সামাজিক ভাব-চিন্তা-কর্ম-আচরণ কিংবা তাদের কৃতিকীর্তি সাহিত্য জগতে পাত্তা পায়নি। তাই সাহিত্যে ইদানীং পূর্বকালে দাস ভূমিদাস-চাষী-মজুর শ্রেণীর মানুষের উল্লেখ ও বিচরণ দেখি দেবতা-দানব-রাজা-উজির-কোটালের ভোগ-উপভোগের সামগ্রীর যোগানদার কিংবা সেবক বাহক হিসেবেই। দাস প্রভৃতি সাধারণ নির্বিত্ত বা স্বল্পবিত্ত ক্ষুদ্র ও তুচ্ছ বৃত্তিজীবী মানুষের জন্ম-জীবন-মৃত্যু ছিল গুরুত্বহীন। অন্য প্রাণীদের চেয়ে তাদের জীবনের ও সেবার মূল্যও ছিল না অধিক। তাদেরও যে সুখ-দুঃখের, অনুভব-উপলব্ধির জীবন ও জগৎ রয়েছে, সে তথ্য ও তত্ত্ব উচ্চ কোটির, এমন কি, স্বশ্রেণীর সাধারণ কবি-শিল্পীর মনেও জাগেনি কখনো। তাই রাজপুত্র নায়ক যখন সামুদ্রিক-ঝড়ে আক্রান্ত হয়ে তক্তা-সম্বল করে আরণ্য সৈকতে আশ্রিত হয়, তখনো তার হাজার হাজার লোকলস্কর ডুবে মরে। কিন্তু কবি-কথক কিংবা শ্রোতা-পাঠক তাতে বিচলিত হয় না। ওরাও যে মানুষ, ওরা মরলে যে ওদের সন্তানেরা অনাথ হয় ওদের স্ত্রীরা বিধবা হয়, তা কবি-কথকের কিংবা পাঠক-শ্রোতার মনে পড়ে না। যেন অপমৃত্যুর জন্যই ওদের জন্ম। কাজেই শাহ সমস্ত রাজা উজির কোটাল-সদাগর শাসিত শোষিত সেকালের সমাজে-সাধারণ মানুষের জন্ম জীবন-মৃত্যুর কিংবা সুখ-দুঃখের অনুভব-উপলব্ধির কোন গুরুত্বই ছিল না। সাধারণ মানুষ ছিল পশু-পাখির মতোই উপেক্ষিত। আঠারো শতক অবধি মধ্যযুগ মোটামুটি এভাবেই চলেছে শাস্ত্রিক, সামাজিক ও সাহিত্যিক অঙ্গনে ও চেতনা-জগতে। ব্যতিক্রম কেবলনীতি-নিয়মেরই আকস্মিক বিচ্যুতিমাত্র।

প্রতীচ্য প্রভাবিত উনিশ শতকের বাঙালী জীবনেও শাহ-সামন্তের এবং দেবতার প্রতি শ্রদ্ধা-ভক্তি কমে নি, তাদের পাশে অর্থাৎ উচ্চ কোটির মানুষের পাশে শিক্ষিত মধ্যবিত্তের ঠাঁই হল মাত্র। এর আগে প্রাচীন ও মধ্যযুগে সংস্কৃত পালি, [জাতকে] প্রাকৃত, অবহটঠ, বাঙলা আর্যায় গাথায়, শ্লোকে, পদে, প্রবচনে, পাঁচালীতে গণমানবের দারিদ্র্য-দুঃখের, জীবন-যন্ত্রণার, নির্যাতন-জ্বালার কিছু কিছু আভাষ ও উল্লেখ পেয়েছি বটে, তবে তা নিতান্ত অপ্রত্যাশিত ও প্রাসঙ্গিক মাত্র, বর্ণির্তব্য মূল বিষয় নয়। অথচ দাসত্বের অমানবিক জীবন-যন্ত্রণা, দরিদ্রের অনাহার মৃত্যু, দুর্ভিক্ষ, ভিক্ষাবৃত্তি, নিঃস্বের চৌর্যবৃত্তি, দরিদ্র গাঁয়ে মহামারী, ঝড় খরা-বন্যায় দরিদ্রের অনাহার অপুষ্টি-জাত অপমৃত্যু, অভাবদুষ্ট মানুষের নৈতিক চেতনাবিকৃতি, অর্থাভাবে বিনা চিকিৎসায় সামান্য রোগে অকাল মৃত্যু প্রভৃতি ছিল গণমানবের প্রাত্যহিক জীবনে নিত্যসঙ্গী। এসব প্রাচীন ও মধ্যযুগের সাহিত্যের এবং অনেকাংশে আধুনিক শিল্প ও রস কৈবল্যবাদী রচিত সাহিত্যের অবলম্বন তথা বর্ণিতব্য বিষয়ে হয়নি। এবং উনিশ-বিশ শতকের কোন রচনায় নিঃস্ব-নিরন্ন-নিরক্ষর-নিপীড়িত গণ-মানুষের আর্থিক-সামাজিক দুঃখ-দুর্দশার চিত্র অঙ্কিত হলেও [শরৎচন্দ্র-বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়-যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত-জসীমউদ্দীন অবধি], এ নিঃস্বতার ও দুস্থতার কারণ নিরূপণের ও প্রতিকারের উপায় উদ্ভাবনের চেষ্টা হয়নি সামন্ত-বুর্জোয়া লেখকদের রচনায়। মানতেই হবে যে এ কাজে এগিয়ে এসেছেন কম্যুনিস্ট তথা সমাজবাদী ও সাম্যবাদী লেখকরাই।

বাঙলাসাহিত্য ক্ষেত্রে রবীন্দ্রনাথকে বাদ দিয়ে এ বিষয়ে আলোচনা হতে পারে না, কেননা তিনি ছিলেন বিশ্বের অমিত প্রতিভাবান কবি শিল্পী-সাহিত্যিক। বলাকা-পূর্ব রচনার মধ্যে আমরা তাঁকে পাই একজন অন্তমুর্খী চেতনায় রোমান্টিক আত্মভাবনিমগ্ন কবি হিসেবে, তাঁর সেই স্বসৃষ্ট

ভুবনে রয়েছে সর্বপ্রকার মহিমায় ও মাহাত্ম্যে স্বর্গোপম প্রাচীন ভারতবর্ষ ও আর্য মনীষা, জীবনদেবতা নামে তাঁর জীবননিয়ন্ত্রী এক দেবী, আর বহির্মুখী জীবনে তখন তিনি নিরাকার ব্রহ্মবাদী নিষ্ঠ ব্রাহ্ম এবং ব্রহ্মসঙ্গীত রচয়িতা হয়েও একজন জাতীয়তাবাদী ঐতিহ্যগর্বী আর্য হিন্দু ও ব্রাহ্মণ, হিন্দুর সামাজিক, বৈষয়িক, সাংস্কৃতিক ও নৈতিক জীবনে প্রাচীন ভারতীয় ঔপনিষদিক ও পৌরানিক জীবনাদর্শের ও জীবনচারের-রূপায়ন স্বপ্নে বিভোর এবং সে-জীবনের ও আদর্শের মহিমা মাহাত্ম্য ও উপযোগ প্রচার লক্ষ্যে প্রবন্ধকার। সেসব রচনায় পরিব্যক্ত তথ্যে তত্ত্বের, যুক্তির ও প্রতিতুলনার মোকাবেলায় প্রতীচ্য সভ্যতা-সংস্কৃতি-জীবনাচার প্রভৃতির অপকর্ষ ও গ্লানিমা প্রকট হয়ে উঠেছে। ১৯০৮ সনে বঙ্গ-ভঙ্গ প্রতিরোধ আন্দোলন থেকে সরে দাঁড়ানোর পূর্বাবধি রবীন্দ্রনাথ ছিলেন সুপ্রাচীন আর্য-ঐতিহ্যাগর্বী ভারতীয় বাঙালী ব্রাহ্মহিন্দু। তখন পর্যন্ত অন্তরে বাইরে তাঁর বিচরণ ছিল দৈশিক ও গৌত্রিক চেতনার সংকীর্ণ সড়কে। এ সময় পরিসরে রচিত কবিতাবলী ও প্রবন্ধগুলো-এমনকি নাটক-গল্প-উপন্যাস ও আমাদের এ ধারণার সমর্থক। তবু অনুভূতির গভীরতায়, মননের ব্যাপকতায় এবং শৈল্পিক উৎকর্ষে পাঠককে এসব রচনা অভিভূত রাখে।

এরপরে কবি-মনীষীর চেতনা বিশ্বমুখী হতে থাকে। নোবেল পুরস্কার প্রাপ্তি-উত্তর জীবনে তিনি হন একান্তভাবে দেশ-কাল-মত-জাত-বর্ণ-ধর্ম নির্বিশেষে উদারতম মানবতার এবং পরিশীলিত ও উৎকর্ষীকৃত সর্বজনীন মানব স্বভাবের সাধক। তখন তিনি চিন্তায় কর্মে আচরণে বৈশ্বিক-বিশ্ববাসীর আত্মীয় এবং বিশ্বের নাগরিক। জীবনের শেষ আটাশ বছর তিনি পূর্ব জীবনের আর্যভারতসর্ব, জীবনদেবতার আনুগত্য এবং ঔপনিষদিক ব্রহ্মের ধারণা পরিহার করে এক সর্বজনীন বিশ্বেশ্বরে তাঁর আস্থা ও আনুগত্য স্থাপন করেন। আস্তিক মানুষের এই নিরূপ-নির্বিশেষ অশাস্ত্রীয় বিশ্বেশ্বরের সঙ্গে ব্যক্তির একান্ত আত্মিক সম্পর্ক গড়ে তোলাই হচ্ছে শ্রেয়োবাদী মানুষের ধর্ম মানবধর্ম। ঔপনিষদিক অদ্বৈততত্ত্বভিত্তিক ব্রাহ্মমতে শাস্ত্র-শাসন গড়ে ওঠে নি বলে রবীন্দ্রনাথের পক্ষে প্রথম জীবনে জীবনদেবতার পরে নির্গুণ বিশ্বেশ্বরের আস্থা স্থাপন সহজও ছিল। স্বদেশ স্বজাতি চেতনা থেকে রবীন্দ্রনাথের এ বৈশ্বিক-বৈশ্বেশ্বরিক-বিশ্ব মানবিক ও সার্বভৌমিক চেতনায় উত্তরণের মূলে রয়েছে তার প্রতিভার, কৃতির ও কীর্তির নোবেল পুরস্কার প্রাপ্তিরূপ আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি। শৈশবে-বাল্যে-কৈশোরে গ্রামে বেড়ে ওঠা মানুষ যখন কর্মোপলক্ষে শহরবাসী হয়ে ধনে-মানে শহুরে সমাজে প্রতিষ্ঠা লাভ করে, তখন তার পক্ষে গ্রামে ফিরে যাওয়ার চিন্তা মাত্রই যেমন বিভীষিকা জাগায়, এ-ও অনেকটা তেমনি। মানস বিচরণের ওই অনন্ত আকাশ ছেড়ে, মানবিক অনুভূতির ওই অতল-গভীর দিগন্ত বিসারী মহাসমুদ্র-সাঁতার পরিহার করে স্বদেশের স্বজাতির সংকীর্ণ সীমায় নিজেকে ফিরিয়ে আনা ছিল রবীন্দ্রনাথের পক্ষে অসম্ভব।

এ বৈশ্বিকচেতনায় উত্তরণ সত্ত্বেও রবীন্দ্রনাথ তাঁর অন্তরের গভীরে প্রোথিত সামন্ত-বেণে-বুর্জোয়াচেতনা ও স্বার্থবোধ শেষাবধি পরিহার করতে সমর্থ হননি। একজন কারখানা মালিক যেমন তার শ্রমিকদের দাবি আদায়ের মিছিলে শামিল হতে পারে না, সামন্ত বেণে-বুর্জোয়া-জমিদার রবীন্দ্রনাথও তেমনি পারেননি দুস্থ-দুঃখী-চাষী-মজুরের শোষণ-পীড়ণ জর্জরিত জীবনের আলেখ্য আঁকতে। এ হচ্ছে শ্রেণীক ও ব্যক্তিক স্বার্থ চেতনার বন্ধন। নইলে যে রবীন্দ্রনাথ প্রমত্তা পদ্মায় জেলে-মাঝিকে ডুবে মরতে দেখেছেন, পদ্মার যমুনার তীর ভাঙনে হাজার হাজার গরিব চাষী-মজুরকে নিঃস্ব হতে উদ্বাস্তু হতে দেখেছেন, দেখেছেন সচ্ছল চাষীকে

সপরিবার পথে দাঁড়িয়ে ভিক্ষা করতে, প্রত্যক্ষ করেছেন দুর্ভিক্ষে অনাহারে-অপুষ্টিতে-তুচ্ছ রোগে ভুগে ভুগে অকালে অপমৃত্যু কবলিত হতে হাজার হাজার নিঃস্ব-নিরন্ন-নিরক্ষর-নির্বিরোধ মানুষকে। আরো দেখেছেন তাঁরই হুকুমে বা সম্মতিতে তাঁরই গোমস্তাদের খাজনার দায়ে তাঁরই গরিব প্রজার ঘটি-বাটি ক্রোক করতে, প্রজাকে ভিটে-ছাড়া করতে, বারবার দেখেছেন ঝড়-খরা-বন্যা তাড়িত মানুষের চরম দুঃখ-দুর্দশা ও অপমৃত্যু— সেই রবীন্দ্রনাথের বিপুল-বিচিত্র রচনায় এদের নাম-নিশানা মাত্র নেই কেন! বোঝা গেল, শোষক তিনি যত বড়ো মহাপুরুষই হোন, শোষিতের পক্ষে লড়াই দূরে থাক, তার প্রতি সহানুভূতি প্রকাশেও অনীহ।

ভর-যৌবনে আকস্মিক-আবেগ-তাড়িত কবি একবার দুস্থ মানবাতার সেবায় তাঁর মন ফেরাবার জন্যে [এবার ফিরাও মোরে] জীবন দেবতার কাছে আকুল আবেদন জানিয়েছিলেন। জীবনদেবতা তাঁর সে প্রার্থনা গ্রাহ্য করেননি, কবিও তারপরে বহু বহুকাল সেই মহৎ-বাসনা ভুলে গিয়েছিলেন। কলকাতায় মার্কসবাদীর সংখ্যা বৃদ্ধি পেতে থাকলে কাল সচেতন রবীন্দ্রনাথ হাওয়া বুঝে ষাটোত্তর বয়সে [বলাকা, পরিশেষ, পুনশ্চ, মহুয়া, সেঁজুতি, প্রান্তিক, রোগশয্যায়, আরোগ্য, জন্মদিনে থেকে শেষলেখা অবধি] মাত্র আঙুল গোণা কয়েকটি কবিতায় মাঝে মাঝে দেশ-কাল-মানুষ-নারী-যুদ্ধ-বিশ্বশান্তি, রাষ্ট্রিক দ্বেষ-দ্বন্দ্ব, আফ্রিকার নির্যাতিত মানবতা, বিজ্ঞান - বুদ্ধি, স্বদেশী সমাজ প্রভৃতি সম্বন্ধে তাঁর মন-মতগত এক প্রকারের সচেতনতার পরিচয় ও স্বাক্ষর রেখেছেন। এ সময়কার প্রবন্ধগুলোও স্মর্তব্য এবং যদিও তিনি 'কৃষাণের জীবনের শরিক যে-জন, যে জন রয়েছে মাটির কাছাকাছি, সে কবির বাণী লাগি' কান পেতে আছি' বলে - জানার আকুল আগ্রহ প্রকাশ করেছেন, যদিও তিনি 'মোর নাম এই বলে খ্যাত হোক, আমি তোমাদেরই লোক' [পরিচয় : সেঁজুতি] বলে আন্তরিক বাসনা পরিব্যক্ত করেছেন, যদিও তিনি 'ওরা কাজ করে' বলে চাষী-মজুরকে তোয়াজ জড়িত উচ্চকণ্ঠে স্বীকৃতির সনদ দিয়েছেন, যদিও এ আনন্দবাদী-সুখকামী সামন্ত-বুর্জোয়া মনের আস্তিক কবি গণমানবের সঙ্গে তাঁর একাত্ম হওয়ার অক্ষমতার কথা সবিনয়ে নিবেদন করেছেন :

বাধা হয়ে আছে মোর বেড়াগুলি জীবন যাত্রার
অতি ক্ষুদ্র অংশে তার সম্মানের চিরনির্বাসনে
সমাজের উচ্চমঞ্চে বসেছি সংকীর্ণ বাতায়নে।
মাঝে মাঝে গেছি আমি ও পাড়ার প্রাঙ্গণের ধারে।
ভিতরে প্রবেশ করি সে শক্তি ছিল না একেবারে।

[ঐকতান : জন্মদিনে]

এবং যদিও অভিভূত ভক্তরা তাঁর সেই অপ্রত্যাশিত স্বীকৃতি ও শোচনা বাক্য শুনে ভক্তি-শ্রদ্ধায় একেবারে বিগলিত হয়ে সে অক্ষমতাকে ও সত্যভাষণকে মহত্ত্বের মহিমার ও মাহাত্ম্যের প্রকাশ ভেবে ভক্তিতে গদগদ আবেগে আন্দোলিত এবং ক্ষত ও ক্ষতি পূরণের উল্লাসে উদ্বেলিত, তবু স্বীকার করতেই হবে যে রবীন্দ্রনাথের ও ধরনের চেতনাও বিপুল বিচিত্র রবীন্দ্র সাহিত্যে বিরলতায় দুর্লভ। তাই কৃত্রিম ও আকস্মিক বলে সন্দেহ হয়। কেন না তার গল্প উপন্যাস-নাটকেও নেই গণজীবনচিত্র। ভৃত্য-প্রজা-পরিচারিকা প্রভৃতিরূপে চাষী-মজুর-বৃত্তিজীবী মানুষের সাক্ষাৎ মেলে বটে তাঁর রচনায়, কিন্তু উদ্দেশ্য ও প্রতিপাদ্য বিষয় ভিন্ন বলে তা গণমানব জীবন সম্পৃক্ত থাকেনি। এ ক্ষেত্রে পোস্টমাস্টার, খোকাবাবুর প্রত্যাবর্তন, হালদারগোষ্ঠী, সমস্যা পূরণ প্রভৃতি স্মর্তব্য। এমনকি 'শাস্তি'ও থাকেনি দারিদ্র্য চিত্র।

শ্রেণীস্বার্থের অচেতন কিংবা সচেতন বাধাই সাহিত্যে রবীন্দ্র ভূমিকা সীমিত রেখেছিল। রবীন্দ্রনাথের স্বীকারোক্তির দরুন তাঁর প্রতি আমাদের ক্ষোভ-ক্রোধ-অনুযোগ প্রশমিত হতে পারে। কিন্তু ভক্তিতে গদগদ হওয়ার কোন কারণ ঘটে না।

ইদানীংপূর্ব কালে জুতো থাকত কেবল প্রভুদের পায়ে। তাই ওরা ক্রুদ্ধ হলে দাস-ভৃত্য-প্রজা প্রভৃতি শাসনপাত্রদের করত জুতোপেটা। লঘু অপরাধে গুরু শাস্তি হয়ে গেল ভেবে কোন কোন হৃদয়বান প্রভু লাঞ্ছিতের রক্তাক্ত স্ফীত পিঠে হাত বুলিয়ে সান্ত্বনা দিত। তখন প্রভুর দুর্লভ হাতের স্পর্শে মারের জ্বালা-যন্ত্রণা ভুলে নিজেকে ভাগ্যবান বলে মনে করত সে দাস। রবীন্দ্রনাথ-উক্ত ওইসব শ্রোত্র রসায়ন বুলি স্মরণ করে একালে দুস্থ-নিঃস্ব-নিরন্ন শিক্ষিত ও সমাজবাদী পাঠকও রবীন্দ্রনাথের পরমভক্ত ও স্তাবক হয়ে পড়েন। কাজেই জয়তু রবীন্দ্রনাথ।

রবীন্দ্রনাথের শক্তির ও রচনার অসামান্য গুণমান-মাত্রা ও মাহাত্ম্য কেউ অস্বীকার করে না। রচনা যে জীবনদৃষ্টির প্রসূন তার স্বরূপ ও রচনার উপযোগ নিরূপণ ক্ষেত্রে অভিভূত ভক্তে ও যুক্তিপ্রবণ রুচিবান পাঠকে পার্থক্য রয়েছে অবশ্যই। এ হচ্ছে মুগ্ধ ও মুক্ত দৃষ্টির রবীন্দ্রবিতর্ক।

রবীন্দ্রনাথসম্পৃক্ত আবেগের কাল অপগত। এখনো যাঁরা আবেগে, ভক্তিতে, শ্রদ্ধায় কিংবা গৌরবে গর্বে অভিভূত, রবীন্দ্রনাথ নাম উচ্চারণের সঙ্গে সঙ্গে বৈষ্ণবসুলভ আবেগে-ভক্তিতে বিগলিত হন, রবীন্দ্রত্রুটি কেউ উচ্চারণ করলেই ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠেন, তাদের মন-বুদ্ধি, রুচি-চিন্তা-চেতনা-বিবেক-বিবেচনার পরিপক্বতায় আস্থা অটল রাখা সম্ভব হয় না। আজ আত্মকল্যাণেই, আত্মবিকাশের ও প্রগতির প্রয়োজনেই ব্যক্তি নিরপেক্ষ ও অনাসক্ত মন নিয়ে যুক্তি-বুদ্ধি-চিন্তা-চেতনা প্রয়োগে সমাজ-সৃদস্য ব্যক্তি রবীন্দ্রনাথের মন-মেজাজ, সামাজিক-নৈতিক কর্ম ও আচরণ, বিশ্বাস-সংস্কার চালিত রুচি ও স্বভাব ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ যোগে জানতে ও বুঝতে হবে। বুঝতে হবে কবি রবীন্দ্রনাথের কল্পজগতের রূপ-স্বরূপ, জানতে হবে রবীন্দ্রঅভিজ্ঞতাজাত গল্প-উপন্যাসের জগৎকে, রবীন্দ্র নাটকে দেখতে হবে রবীন্দ্র-বাঞ্ছিত জীবন-ভাবনাকে ও জগৎ প্রতিবেশকে। সন্ধান নিতে হবে সমাজ-সম্প্রদায় স্বাধীনতা সম্বন্ধে এবং রাজনীতিক ও আর্থ-সামাজিক বিষয়ে চিন্তানায়ক ও মনীষী প্রবন্ধকার রবীন্দ্রনাথের মনের মতের মন্তব্যের ও রবীন্দ্র-নির্দেশিত পথের। তখন ব্যক্তি কবি স্রষ্টা ও চিন্তানায়ক মনীষী রবীন্দ্রনাথের দোষ-ত্রুটি-অপূর্ণতা-সীমাবদ্ধতাও দেখতে পাব, তখন তিনি দোষে-গুণে-শক্তিতে-সামর্থ্যে আমাদের ধরা-ছোঁয়ার মধ্যেকার আপনজন হয়ে উঠবেন ও হবেন প্রিয় ও পরিচিত। দোষগুণে মানুষ। অমিত শক্তি ও মনীষাধর রবীন্দ্রনাথও ইন্দ্রিয়চালিত মানুষ। নানা প্রয়োজনে তারও দোষগুণ নানা প্রসঙ্গে উচ্চারণ করতে হয়, হবে। তা হলেই কেবল যুক্তি-বুদ্ধি চিন্তা-চেতনা-বিবেক-বিবেচনা প্রয়োগে আমরা রবীন্দ্র-রচনা থেকে মনোজগতের ও ব্যবহারিক জীবনের পক্ষে কল্যাণকর ভাব-অনুভব গ্রহণ করে, তত্ত্ব-তথ্য উপলব্ধিগত করে স্ব স্ব জীবনে শ্রেয়স-প্রেয়স পন্থা অনুসরণ করে হব ঋদ্ধ। মানতেই হবে যে ব্যক্তিরও ভাব-চিন্তা-কর্ম-আচরণ মানুষ, সমাজ ও প্রয়োজন নিরপেক্ষ নয়, তাই সাহিত্যও মাটি, মানুষ, কাল, শাস্ত্র, সমাজ, বিশ্বাস, সংস্কার, জীবনাচার ও জীবনের প্রয়োজন নিরপেক্ষ হাওয়াই কিছু নয়, সাহিত্যও প্রাণ-মন-মনন থেকে উৎসারিত। জীবন যদি দেশ-কালের প্রতিবেশে প্রয়োজনানুগ পথে সম্মুখ পানে গতিশীল না হয়, তা হলে জীবন তথা সমাজ রাষ্ট্র ও সংস্কৃতি থাকে বন্ধ্যা।

নাটকের গোড়ার কথা

প্রাণী মাত্রেরই ভাব-চিন্তা-কর্ম-আচরণ জীবন ধারণ ও রক্ষণ চেতনা থেকেই উৎসারিত। মানুষও প্রাণী বটে, তবে তার আঙ্গিক গঠন তাকে কেবল সঞ্চয়ী স্বয়ম্ভর নয়, স্বসৃষ্ট ও স্বশিক্ষিত হবার সুযোগ ও সুবিধে দিয়েছে। হাত দুটো তার সম্পদ ও পুঁজি ও দুটোর বিচিত্র-বিবিধ ব্যবহারে তার আত্মবিকাশ ও বহুধা আত্মপ্রসার সম্ভব হয়েছে, আজো হচ্ছে। এই বিকাশ-প্রসার কেবল আগুনাদির বিচিত্র ব্যবহারে, বস্তু নির্মাণে সীমিত নয়, মানসোৎকর্ষেও অভিব্যক্ত। ভাষা সৃষ্টিতে, সমাজ গঠনে, যৌনজীবনে, সমস্বার্থে সহিষ্ণুতায়, সহযোগিতায় সহাবস্থানের প্রয়োজনে নিয়ম-নীতি রীতি-পদ্ধতি প্রভৃতি উদ্ভাবনে, শাসনসংস্থা-সরকার ও রাজ্যরাষ্ট্র প্রতিষ্ঠায় মানুষের আবিষ্কার-উদ্ভাবনে, ক্ষমতার ঘটেছে ক্রমবিকাশ। মানুষ স্বসৃষ্ট কৃত্রিম জীবন ও জীবিকা ব্যবস্থা করে জীবনাচারে প্রকৃতিকে করেছে বহুলাংশে দাস ও বশ।

প্রাণী মাত্রেরই জন্মমুহূর্ত থেকেই প্রয়োজন হয় থাকার ঠাঁই ও খাওয়ার বস্তু। আদিম মানুষেরা ছিল ফল-মূল মৃগয়াজীবী। খাদ্য সংগ্রহের বাঞ্ছা সিদ্ধির প্রয়োজন-পূর্তির অনুকূলে যাদু পরিবেশ সৃষ্টির জন্যে তারা উচ্চারণ করত বাঞ্ছানুগধ্বনি শব্দমালা যার নাম মন্ত্র। আর আঁকত সন্ধানী সহাতিয়ার মানুষ ও শিকার্য প্রাণী, তার বাঞ্ছা প্রমূর্ত করতে যাদু শক্তির সুস্পষ্ট ও সুনির্দিষ্ট সহায়তা লাভের উদ্দেশ্যে।

কাজেই সিদ্ধি লক্ষ্যে বাঞ্ছাকে ও প্রয়োজনকে প্রমূর্ত করে দেখা-দেখানোর এ অভ্যাস মানুষের মনুষ্যরূপে প্রাপ্তির সমকালীন ও সহজাত। রেখার অঙ্কন আধার, যন্ত্র, সময় ও শ্রমসাপেক্ষ বলে মানুষ ভাষায় মুখে মুখে বর্ণনার মাধ্যমে ভাবমূর্তি তৈরি করতে চেয়েছে, জ্ঞান-বুদ্ধির ক্রমবিকাশের ধারায়। তখন থেকেই শুরু হয়েছে বাস্তব অভিজ্ঞতা ভিত্তিক কিন্তু কল্পনার রঙ ছড়ানো জীবন জীবিকা সম্পৃক্ত বাঞ্ছিত কিন্তু অলভ্য-অপ্রাপ্ত, কিংবা অবাঞ্ছিত কিন্তু আকীর্ণ ও আপন্ন ভয়-বিপদ বিষয়ক রূপকথা, উপকথা, ব্রতকথা, ইতিকথা প্রভৃতির বর্ণনা ও বিবৃতি। পরে লেখায় তা কাব্য নাটকরূপে সহজ ও স্থায়ীরূপ লাভ করে জীবন্ত কাহিনী ও বৃত্তান্ত হয়ে। আড়াই হাজার বছর আগের গ্রিক কাব্য ও নাটক, ইরানি হাজার আফসানা, কিংবা গিলগামিশ, মিশরিয় উপকথা, আলেফ লায়লা, ভারতীয় কাব্য ও নাটক এ অনুমানের সাক্ষ্য।

অ্যারিস্টটল কথিত অনুকরণ প্রবণতা থেকেই মানুষ পেয়েছে সৃষ্টিশীলতা অর্থাৎ চারদিককার জীব-উদ্ভিদের, মানুষের ও প্রকৃতির প্রাবৃত্তিক রীতি-নিয়মের স্বাভাবিক আচরণের আবর্তিত রূপ তীক্ষ্ণদৃষ্টির কৌতূহলী ও সংবেদনশীল মানুষকে তার অনুকরণে ও বর্ণনায় দিয়েছে প্রবর্তনা। পরিবেষ্টনী ও জীবন-জীবিকা সম্পৃক্ত কল্পনা, বিশ্বাস, জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা মূর্ত করে দেখা দেখানো বোঝা-বোঝানো লোকশিক্ষার জন্যও ছিল অভিপ্রেত।

ভাষা দিয়ে ভাবমূর্তি গড়ে বাক্প্রতিমা নির্মাণ করে অর্থাৎ বর্ণনা বিবৃতি যোগে কল্পনায় প্রত্যক্ষ করানোর রীতিটা হচ্ছে আসলে বিকল্প উপায়, অনন্যোপায়ের অবলম্বন।

নিজের অঙ্গ, অবয়ব ও বাক্ভঙ্গি প্রয়োগে অন্যের মন-বুদ্ধি-কর্ম প্রত্যক্ষ করানোই হচ্ছে প্রত্যাশিত বাস্তব ও সার্থক উপায়। বানর যেমন, তেমনি মানুষও অনুকরণপ্রিয়। বিশেষ করে কোন মানুষের চলায় কথায় কাজে অসঙ্গতি বা অপ্রত্যাশিত অনন্যতা থাকলে তার ব্যঙ্গ, বিদ্রূপ ও ভ্যাংচি-ভ্যাঙানি মস্করা-ঠাট্টা-উপহাস ও পরিহাস প্রভৃতির মাধ্যমে অনুকৃত রূপ প্রকাশ করে অন্যদের আনন্দ দেয়া ও অবহিত করানোই লক্ষ্য। সাধারণত নিন্দা-কলঙ্ক প্রচারের জন্যেই এই

পন্থা অবলম্বিত হলেও নির্মল হাস্যরস সৃষ্টির ও ব্যক্তিস্তুতির জন্যেও এ উপায় কাজে লাগানো হয়। সমাজ-স্বাস্থ্য রক্ষার গরজে ব্যক্তির চরিত্র সংশোধন লক্ষ্যে ও কোন ব্যক্তির ভাব-চিন্তা-কর্ম-আচরণের অনভিপ্রেত অসঙ্গতি লোকসমক্ষে তুলে ধরে ওই ব্যক্তিকে লজ্জিত নিন্দিত করে বাঞ্ছিত আচার-আচরণ গ্রহণে বাধ্য বা অনুপ্রাণিত করাই থাকে লক্ষ্য। আমাদের দেশে ঢাকার মোহররমের, ঈদের ও জন্মাষ্টমীর মিছিলে, উত্তর বঙ্গের গাজন উৎসবে ও গম্ভীরা গানের আনুষ্ঠানিক আসরে এরূপ সমাজ নিন্দিত মানুষের কর্ম-আচরণের সঙচিত্র তুলে ধরা হয় বা হত। এ সূত্রে ক্যারিকেচার, মিমিক প্রভৃতি নিশ্চয়ই মনে পড়বে।

কাজেই কথকতায় মুখোস ধারণের, পুতুল নাচের, ছৌনৃত্যের যাত্রায় ও নাটকের গোড়ায় রয়েছে সম্ভবত ওই 'সঙ' সাজার নীতি। সন্ধির বিকল্প নিয়মে সম+অঙ্গ স+অঙ্গ অথবা স্ব+অঙ্গ থেকেই 'সঙ' শব্দের উৎপত্তি। 'সঙ' পেশা পরে বহুরূপী পেশার বিবর্তন পেয়েছে! অতএব Caricature mimic আর 'সঙ' একই রূপ কৌতুকবোধের ও প্রয়োজনের সৃষ্টি। মানুষের জীবনে সমাজে প্রাত্যহিকতার মধ্যে স্বভাবে-আচরণে অবাঞ্ছিত ক্ষতিকর, অরুচিকর নীতি ও রীতিবিরুদ্ধ যা ঘটেছে, এবং জীবনে, সমাজে, সংস্কৃতিতে ও সরকারে যা থাকা অভিপ্রেত এবং জীবন-জীবিকা ক্ষেত্রে যা যা প্রয়োজনীয় তা বাস্তবে চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দেয়া এবং লাভক্ষতি ভালমন্দ প্রত্যক্ষে উপলব্ধি করার সুযোগ দেয়াই নাটক রচনার ও অভিনয়ের উদ্দেশ্য।

অতএব, ব্যক্তিচরিত্র শোধনের, সমাজস্বাস্থ্য রক্ষার এবং সমাজের ও সংস্কৃতির বাঞ্ছিত বিকাশ ত্বরান্বিত করার ও অভিপ্রেত নতুন নিয়ম-নীতি প্রতিষ্ঠার জন্যে মানুষের দোষত্রুটি, সমাজের গলদ, রাষ্ট্রগত জীবনে অন্যায় শাসন-শোষণ-পীড়ন-বঞ্চনার রূপ দেখিয়ে নাটক রচিত ও অভিনীত হতে পারে মানুষকে-সমাজকে ও সরকারকে সচেতন করার লক্ষ্যে। ভালো যা আছে তা রক্ষার জন্যে মন্দ যা, তা পরিহার করার প্রণোদনা দানের জন্যে এবং দেশ-কালের প্রতিবেশে মানুষের জন্যে যা কাম্য তার প্রাপ্তিতে ও প্রতিষ্ঠায় আগ্রহ জাগানোই নাট্য সাহিত্যের মুখ্য লক্ষ্যে নাট্য-আন্দোলন গড়ে তোলা আবশ্যিক।

সভ্যজগতে নাটকের এ গুরুত্ব গ্রিক ভারতীয়রা গোড়া থেকে উপলব্ধি করেছিল। লোকশিক্ষার এমন কেজো মাধ্যম আর নেই, সঙ, ছৌ, গাজন-গম্ভীরা-যাত্রা হয়ে বাঙলা নাটকও আজ গ্রিক-ভারতীয় শেক্সপিরীয় আর মেটারলিঙ্ক-ইবসেন-বার্নাডশ-ব্রাখট প্রভৃতির বৈশ্বিক ঐতিহ্যের ধারক-বাহক হয়ে আধুনিকতম অঙ্গ ও অন্তর লাভ করে চিন্তা চেতনায়, বিষয়ের রূপায়নে এবং গণসেবার ও গণশিক্ষার লক্ষ্যে সমকালীনতা অর্জন করেছে। এসেছে জনগণের আটপৌরে মনের ও বারোমেসে জীবনের কাছাকাছি। এটি নিশ্চয়ই শুভ লক্ষণ।

আমাদের দেশেও রেডিও-টেলিভিশনে সম্প্রচার সরকার নিয়ন্ত্রিত, আমাদের সিনেমা-শিল্পের উপরও রয়েছে সরকারের কড়া নজর ও নিয়ন্ত্রণ। ফলে ছায়াছবি যোগেও গণমানবের জীবনের কথা, আশা-আকাঙ্ক্ষার কথা, প্রয়োজনের কথা উচ্চারণ করা সম্ভব হয় না। এখানেও সরকারি বিধিনিষেধের ছোবল থাকা সত্ত্বেও যাত্রাদল ও গণনাট্যগোষ্ঠীর মধ্যেমেই কেবল দুঃশাসন-দুর্নীতি ও দুর্জন দুর্বৃত্ত থেকে আর চিরকেলে শোষণ-পীড়ন-বঞ্চনা থেকে জনগণের মুক্তির বাণী ও উপায় ঘরে ঘরে জনে জনে জানিয়ে দেয়া সম্ভব। এ জন্যে অবশ্য মাটি ও মানুষ প্রেমী গণসেবক সাহসী দ্রোহী-বিপ্লবী তরুণ-তরুণীর, কিশোর-কিশোরীর নিষ্ঠা এবং লোক হিতব্রতীর ও বঞ্চনাক্ষুব্ধ মানবতাবাদীর সক্রিয় সহযোগিতা, সহানুভূতি ও সমর্থন প্রয়োজনে। ডরে ও ডলারে নিষ্ক্রিয় থাকা স্বার্থের প্রতিকূলতা করার নামান্তর।

আজকের নাট্যকার, নাট্যধর্মী ও অভিনেতাদের এ-ই দায়িত্ব ও কর্তব্য। এ ধরনের মানুষের সংখ্যাধিক্যেই সম্ভব হবে সমাজ ব্যবস্থার বাঞ্ছিত পরিবর্তন। আমরা আশ্বাসে ও প্রত্যাশায় নতুন দিনের নতুন সমাজের প্রতীক্ষায় থাকব।

গ্রন্থপরিচিতি

বাঙলা ভাষা-সংস্কার আন্দোলন

পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার আগে থেকেই বাংলা ভাষা নিয়ে পাকিস্তান-পন্থীদের নানা অপতৎপরতা ও ষড়যন্ত্র শুরু হয়। প্রথম আঘাতটা আসে বাংলা ভাষাকে রাষ্ট্র ভাষার স্বীকৃতি দানের প্রশ্নে। পাকিস্তানের সংখ্যাগরিষ্ঠ অধিবাসীর ভাষা বাংলা, অথচ সে ভাষা রাষ্ট্রভাষার মর্যাদা পাবে না এরকম ঘোষণার প্রতিবাদে পূর্ব বাংলায় যে আন্দোলন হল তাতে রক্ত দিতে হল কয়েকজন ছাত্র ও যুবককে। বায়ান্নোর ভাষা আন্দোলন বাংলাদেশের মানুষকে বাংলা ভাষা, বাংলা সাহিত্য ও বাঙালি সংস্কৃতির প্রতি আরও প্রত্যয়ী করে তুলল। পাকিস্তানের অন্যতম রাষ্ট্রভাষা হিসেবে বাংলার স্বীকৃতি মিলল বটে, কিন্তু ষড়যন্ত্র অন্যদিকেও ছিল। পাকিস্তান রাষ্ট্রের তাহজীব-তমদ্দুনের কথা বলে এবার বাংলা ভাষার সংস্কারের নামে বাংলা ভাষার হরফ, শব্দ, বাক্যবন্ধ এবং সামগ্রিক রূপ কাঠামোর বিকৃতি ঘটানোর অপপ্রয়াস চলতে লাগল। এ অপপ্রয়াসের বিরুদ্ধে তৎকালীন বাংলাদেশের বুদ্ধিজীবী, শিক্ষাবিদ ও ভাষা প্রেমিকদের প্রতিবাদ ও প্রতিক্রিয়াও দেখা গেল। ভাষা-কমিটির নানা সোপারেশও বিতর্কমূলকও হল। এ সবের বিবরণ আছে বদরুদ্দীন উমরের *পূর্ব বাংলার ভাষা আন্দোলন ও তৎকালীন রাজনীতি* মুনীর চৌধুরীর *বাংলা গদ্যরীতি* ইত্যাদি গ্রন্থে। ডক্টর আহমদ শরীফও বাংলাভাষা বিকৃতির সাক্ষী, প্রতিবাদ-প্রতিক্রিয়া তাঁরও ছিল। বাংলাদেশের স্বাধীনতা লাভের পর তিনি অপেক্ষাকৃত একটু দূরবর্তী সময়ে এসে পাকিস্তানী আমলের বাংলা ভাষা বিকৃতির অপতৎপরতাকে অবলোকন করলেন তাঁর *বাঙলা ভাষা সংস্কার আন্দোলন* নামের ছোট গ্রন্থে। বইটি কেন লিখলেন সে কথা ভূমিকাতে বললেনও —

> বাঙলা ভাষার বর্ণ ও বানান-সংস্কার আন্দোলন দুই দফায় দুই উদ্দেশ্যে শুরু হয়। আবুল হাসনাত মোহাম্মদ ইসমাইল, আবুল কাসেম চেয়েছিলেন হিন্দু বাঙলার সঙ্গে মুসলিম যবানের পার্থক্য সৃষ্টি করতে যাতে মুসলিম রাষ্ট্রে তমদ্দুন-তাহজীবের বাহনরূপে ভাষা ইসলামী স্বাতন্ত্র্য পায়। আর অন্য দফায় আন্দোলনের লক্ষ্য ছিল বর্ণে, বানানে লিখনে জটিলতা, অসঙ্গতি ও অনিয়ম দেখিয়ে একে শেখার শেখানোর ও ব্যবহারের তথা শিক্ষার ও প্রশাসন কাজের বাহনরূপে প্রয়োগের অযোগ্য প্রমাণ করে রাষ্ট্রভাষা করার দাবি পরিহার করানো বা বাতিল করা। কাজেই দুটো আন্দোলনই ছিল দুষ্টবুদ্ধিপ্রসূত ষড়যন্ত্র ও অন্তর্ঘাতমূলক

অতএব, এ বিষয়ে টীকাভাষ্যসম্বলিত তথ্যবহুল মোটা বই লেখা যায়। কিন্তু যেহেতু ওই আন্দোলন দুটো পরিণামে বৃথা ও ব্যর্থ হয়েছে, সেহেতু সজলঘটমুখে আকাশ দেখানোর মতই আমি ওঁদের মতলবের নমুনা ধরে রাখলাম এ বইয়ে।

বইটি প্রকাশ করেছে বাংলাদেশ ভাষা সমিতি এবং এটি ভাষা সমিতির প্রথম গ্রন্থ। ডক্টর আহমদ শরীফ বাংলাদেশ ভাষা সমিতির প্রথম ও আমৃত্যু সভাপতি। সভাপতিকে দিয়ে আগের বইটি লেখানোর ও প্রকাশের উদ্যোগ নিয়েছিলেন আহমদ কবির ও মুহম্মদ হাবিবুল্লাহ, ভাষা সমিতির দুই সময়ের দুই সচিব। বইটির প্রথম প্রকাশ ২১শে ফেব্রুয়ারি, ১৯৮৬ সালে। প্রকাশক-মুহম্মদ হাবিবুল্লাহ, সম্পাদক, বাংলাদেশ ভাষা সমিতি, ঢাকা; প্রচ্ছদ – উৎপল দত্ত, মূল্য – কুড়ি টাকা ॥ ড. শরীফ *বাঙলা ভাষা ও সংস্কার আন্দোলন* গ্রন্থটি উৎসর্গ করেন তাঁর মেঝো ভাই প্রয়াত এডভোকেট আহমদ সোবহানের স্মরণে, তাঁকে বেরুবাড়ি মামলার নির্ভীক কৌসুলি সুপ্রীম কোর্টের প্রখ্যাত আইনজীবী হিসেবে সম্বোধন করে।

ইদানীং আমরা

নামেই বোঝা যায়, *ইদানীং আমরা* বইটি সমকালের বাংলাদেশকেন্দ্রিক। বাংলাদেশের শিক্ষা, সংস্কৃতি, রাজনীতি, অর্থনীতি, উন্নয়ন, গণমানবের দুর্ভোগ এবং অন্যান্য সাংস্কৃতিক ভাবনা, একুশ প্রসঙ্গ ইত্যাদি বইটির নানা নিবন্ধে আলোচিত হয়েছে। এগুলোর কিছু কিছু তাৎক্ষণিক রচনা পত্রপত্রিকায় প্রকাশার্থ নিবন্ধ। সঙ্গে আছে মধুসূদন, রবীন্দ্রনাথ ও শরৎচন্দ্রকে নিয়ে কয়েকটি লেখা। 'রবীন্দ্রনাথ বিষয়ে স্মৃতিচারণ', '১৩৯০ সালে আমার চেতনায় রবীন্দ্রনাথ' এবং 'রবীন্দ্রোত্তর তৃতীয় প্রজন্মে রবীন্দ্র মূল্যায়ন' প্রবন্ধ তিনটি একসূত্রে গাঁথা এবং এগুলো বাংলাদেশের স্বাধীনতা-পরবর্তী কালে বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের প্রধান পুরুষ রবীন্দ্রনাথকে নিয়ে মূল্যায়নগত ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়াজাত। পাকিস্তানী আমলে রবীন্দ্রনাথকে নিয়ে লেখালেখির প্রকাশের কালে ডক্টর আহমদ শরীফ ছিলেন রবীন্দ্রনাথের শিল্পোৎকর্ষের অনুরাগী প্রধান লেখক; কিন্তু বাংলাদেশের স্বাধীনতার পরে বাংলাদেশ টেলিভিশনের এক অনুষ্ঠানে সেই রবীন্দ্রনাথকে প্রেরণা হিসেবে গ্রহণ করতে পরাঙ্মুখ হলেন ডক্টর শরীফ, কেননা বাংলাদেশের রাষ্ট্রীয় মূলনীতির সমাজতান্ত্রিক আদর্শে ভাববাদী রবীন্দ্রনাথ ঐতিহ্য হিসেবে থাকতে পারেন, কিন্তু তিনি সম্পদ নন। সেদিন ডক্টর শরীফের বক্তব্য রবীন্দ্রানুরাগীদের মধ্যে তীব্র প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করেছিল। অনেকে তাঁর বিরুদ্ধে লিখলেনও। সেদিনের কথা স্মরণ করেছেন ডক্টর শরীফ 'রবীন্দ্রনাথ বিষয়ে স্মৃতিচারণ' প্রবন্ধে, তৃতীয় প্রজন্মের পাঠক রবীন্দ্রনাথকে কীভাবে গ্রহণ করতে পারে সেটিও বললেন 'রবীন্দ্রোত্তর তৃতীয় প্রজন্মে রবীন্দ্র মূল্যায়ন' প্রবন্ধে। বলাবাহুল্য, রবীন্দ্রনাথকে নিয়ে ডক্টর আহমদ শরীফের একাধিক প্রবন্ধ আছে তাঁর লেখক জীবনের প্রথম থেকেই এবং সেগুলোতে রবীন্দ্রনাথ বিষয়ে তাঁর মনোভাবের ও মূল্যায়নের রূপান্তরও বোঝা যায়। তবে ডক্টর আহমদ শরীফ সামাজিক রবীন্দ্রনাথের নন, শিল্পী রবীন্দ্রনাথের গভীর অনুরাগী।

ইদানীং আমরা গ্রন্থে সংকলিত প্রবন্ধাবলি

বিদ্যা দানের ও গ্রহণের রূপান্তর ধারা –১৫/১৬.৪.১৯৮৪ (দর্শন বিভাগের সেমিনারে পঠিত)

বিদ্যার ক্রমবিকাশ ও নারীশিক্ষা – ১১.৬.১৯৮৪ (কলকাতার প্রতাপ মুখোপাধ্যায়ের স্ত্রীর জন্য লিখিত)

শিক্ষাক্ষেত্রে মূল্যবোধের সঙ্কট – ১২/১৩.৮.১৯৮২ (অধিকাঠামো পত্রিকায় প্রকাশিত)

আজকের শিক্ষা-ভাবনা – সম্ভবত এই রচনাটি প্রকাশিত হয়েছিল ১৯৭৩ সালে, জনকণ্ঠ পত্রিকায়। অথবা পদধ্বনি পত্রিকায় ১৯৭৮ সালে।

শিক্ষা ও সংস্কৃতি – ১০.১২.১৯৮০ (অধ্যাপক আলী আসগর ভূঁইয়ার অনুরোধে তার পাঠ্য বইয়ের জন্য লিখিত)

বাংলাদেশ অনুন্নত কেন? উন্নতির উপায় কি? – ১১.২.১৯৮৫ (অধ্যাপক আবুল কাসেম ফজলুল হক প্রদত্ত প্রশ্নের উত্তর)

কালের দাবি ও রাজনীতি – ১১.৭.১৯৮২ (লোকায়ত পত্রিকায় মুদ্রিত)

উন্নয়নশীল দেশে রাজনীতি ও গণমানব – ২৮/২৯.১১.১৯৮৩

দেশ ও রাজনীতি – সমসময়ে রচিত

আজকের বাঙলার রাজনীতি – ৯.৪.১৯৮৪

ইদানীং সংবাদে বিম্বিত বাংলাদেশ – ১৪.৮.১৯৮৩

নেতৃত্ব–সঙ্কট – ১৬/১৭.৮.১৯৮৪ (লোকায়ত পত্রিকায় প্রকাশিত)

তেমন মানুষ চাই – ২৮.৭.১৯৮২

গণনেতার প্রতীক্ষায় – সমসময়ে রচিত

বুর্জোয়া সমাজে বুদ্ধিজীবী – ১৮.৬.১৯৮২

সেকাল ও একাল – সমসময়ে রচিত

সেই পুরোনো কথাটি – ৩.৭.১৯৮২ (সন্ধিক্ষণে প্রকাশিত)

প্রবৃত্তিবশ্যতা ও শ্রেয়োচেতনা – ৫.৪.১৯৮৩

একাশির একুশের ভাবনা – ২২.২.১৯৮১

জুলুম প্রতিরোধের একুশ – ৫.২.১৯৮৪

একুশের ঐতিহ্য – ২৮.১১.১৯৮৪

মধুসূদন ও আধুনিকতা – সম্ভবত ১৯৭৯ এর দিকের রচনা

'রবীন্দ্রনাথ' বিষয়ে একটি স্মৃতিচারণ –

১৩৯০ সালে আমার চেতনায় রবীন্দ্রনাথ – ৮.৫.১৯৮৩

রবীন্দ্রোত্তর তৃতীয় প্রজন্মে রবীন্দ্র মূল্যায়ন – ২২/২৫.৮.১৯৮৫

কালান্তরে শরৎ-বীক্ষা – ৮.৫.১৯৭৬

কালিক প্রত্যয়ের আলোকে শরৎচন্দ্র – ৫.৫.১৯৭৬

শরৎচন্দ্রের পথের দাবী – ১৪.৬.১৯৭৬

'মনের বনে' শিরোনামে ছয়টি ব্যক্তিগত প্রবন্ধও যুক্ত।

ক. আনন্দ – ১৫.১২.১৯৮২

খ. কীর্তিমান – সমসময়ে রচিত

গ. জীবনের প্রান্তপর্বের ভাবনা – ১৯/২০.৮.১৯৮২ (লোকায়ত পত্রিকায় মুদ্রিত)

ঘ. হৃতজীবনের কান্না – সমসময়ে রচিত

ঙ. শ্রাবণে – ৩১.৭.১৯৮২

চ. সিফৎ-ই-দানদান – ১৯.৮.১৯৮২, দাঁত পড়ে যাওয়ার ব্যক্তিগত অনুভূতি।

– সংকলনভুক্ত প্রবন্ধের সংখ্যা সব মিলিয়ে চৌত্রিশটি

–*ইদানীং আমরা* বইটির প্রথম প্রকাশ ২৫শে বৈশাখ, ১৩৯৩, প্রকাশক– চিত্তরঞ্জন সাহা, মুক্তধারা, ৭৪ ফরাশগঞ্জ, ঢাকা-১১০০, প্রচ্ছদ শিল্পী– আবুল বারক আলভী, মূল্য – ৪৫ টাকা।

ডক্টর আহমদ শরীফ বইটি উৎসর্গ করেন কয়েকজোড়া আত্মীয়-দম্পতিকে –

সেলিনা– শাহাদাৎ হোসেন চৌধুরী

চেমন আরা – আবুল বখতিয়ার

আমিনা – হাবিবুর রহমান

কোহিনুর – লুৎফে আহমদ

জাহান আরা – দলিলুর রহমান চৌধুরী।

বাঙালীর চিন্তাচেতনার বিবর্তন ধারা

বাঙালীর চিন্তাচেতনার বিবর্তনধারা ডক্টর আহমদ শরীফের উল্লেখযোগ্য একটি গ্রন্থ। প্রকৃতপক্ষে, গ্রন্থভুক্ত লেখাগুলো তিনটি বিদ্বৎসভায় প্রদত্ত তিনটি বিদগ্ধ বক্তৃতা।

প্রথম বক্তৃতা হল, 'মধ্যযুগের বাঙলা সাহিত্যে চিন্তা-চেতনার বিবর্তন ধারা।' এটি তিনি দিয়েছিলেন ১৯৮৪ সালে, বাংলা একাডেমীতে। তিনদিন বক্তৃতা দিয়েছিলেন – ১৬.২.১৯৮৪, ৫.৩.১৯৮৪, ১৮.৩.১৯৮৪।

দ্বিতীয় বক্তৃতার বিষয় – 'মধ্যযুগের বাঙলায় জীবন ও জগৎ জিজ্ঞাসার স্বরূপ'। এ বক্তৃতা তিনি দিয়েছিলেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উচ্চতর মানববিদ্যা গবেষণা কেন্দ্রে, ১৯৮৫ সালে। রচনাকাল ৬/১২.১.১৯৮৫।

তৃতীয় বক্তৃতাটি দিয়েছিলেন বাঙলাদেশ লেখক ইউনিয়নের সভায়, ১৯৮৬ সালে।

বক্তৃতার শিরোনাম–বাঙলা সাহিত্যে প্রগতিশীল চিন্তা-চেতনার ধারা। রচনা ২৫.১.১৯৮৬ থেকে ২.২.১৯৮৬। তিনটি বক্তৃতাই ছিল লিখিত। এবং উল্লেখ্য, তিনটি বক্তৃতা একটি যোগসূত্রে গ্রথিত। মধ্যযুগের বিশেষজ্ঞ হিসেবে ডক্টর আহমদ শরীফের যে সুখ্যাতি তারই অভিব্যক্তি ঘটল বক্তৃতা তিনটিতে। বাংলা সাহিত্যের মধ্যযুগ নিয়ে দীর্ঘদিনের অধ্যয়ন, অনুসন্ধান, গবেষণা ও লেখালেখির সূত্র যে প্রজ্ঞা, পাণ্ডিত্য ও বৈদগ্ধ্যের অধিকারী ডক্টর আহমদ শরীফ, তাতে নির্দ্বিধায় বলা যায়, বাঙালীর ভাবসাধনার বিবর্তনের একটি চমৎকার বিবরণ

তিনটি বক্তৃতায় ফুটে উঠেছে। ধর্ম, দর্শন, ভাব-চিন্তা-কর্ম, ভাষা-সাহিত্য-সংস্কৃতি সব মিলিয়ে বাঙালির চিন্তা-চেতনার বিকাশ-বিবর্তন আলোচ্য গ্রন্থে পূর্ণরূপে বিবৃত হয়েছে।

বাঙালীর চিন্তাচেতনার বিবর্তনধারা প্রকাশ করেছে ঢাকার সুখ্যাত প্রকাশনা-সংস্থা ইউ পিএল ফেব্রুয়ারি ১৯৮৭তে (ফাল্গুন ১৩৯৩), প্রকাশক–মহিউদ্দিন আহমেদ, দি ইউনিভার্সিটি প্রেস লিমিটেড, ঢাকা, প্রচ্ছদ শিল্পী – সমর মজুমদার, মূল্য – ৮০ টাকা।

আহমদ শরীফ গ্রন্থটি উৎসর্গ করেছেন তাঁর স্ত্রীর বড় ভাই বুলবুল ললিতকলা একাডেমীর প্রতিষ্ঠাতা প্রখ্যাত সংস্কৃতিকর্মী মাহমুদ নুরুল হুদাকে।

আবদুল করিম সাহিত্যবিশারদ

আবদুল করিম সাহিত্যবিশারদ আহমদ শরীফের পিতৃব্য এবং প্রকৃত অভিভাবক। সাহিত্যবিশারদের স্নেহে আদরে ও প্রযত্নে আহমদ শরীফ বড় হয়েছেন। আবদুল করিম সাহিত্যবিশারদ পুথি সংগ্রাহক হিসেবে বাংলা সাহিত্যে কিংবদন্তিতুল্য ব্যক্তি। চট্টগ্রাম অঞ্চল থেকে বিপুল পরিমাণ পুথি সংগ্রহ করে তিনি মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যে মুসলমানদের অবদানের এক বিশদ পরিচয় তুলে ধরেন। তাঁর আবিষ্কার না হলে শাহ মুহম্মদ সগীর, দৌলত উজির রাহরাম খান, কাজী দৌলত, আলাউল, সৈয়দ সুলতান, মুহম্মদ খান, মুহম্মদ কবীর, নওয়াজিস খান, মীর ফয়জুল্লাহ, সাবিরিদ খান প্রমুখ বিখ্যাত কবিদের নাম জানাই যেত না। আহমদ শরীফ আবাল্য আবদুল করিম সাহিত্য বিশারদের এই সংগ্রহ-কর্ম ও ঐতিহ্য-অনুসন্ধানের আবহেই বড় হয়েছেন। উত্তরকালে সাহিত্যের অধ্যাপক ও মধ্যযুগের সাহিত্য বিশেষজ্ঞ ও বিশ্লেষক হিসেবে আহমদ শরীফ যে সুনামের অধিকারী হলেন তার মূলে আবদুল করিম সাহিত্যবিশারদের প্রণোদনা ও প্রেরণা প্রভাবক হিসেবে কাজ করেছে। এর ফলে আহমদ শরীফের পক্ষে বাংলা সাহিত্যের পূর্ণাঙ্গ ও যথাযথ ইতিহাস গ্রন্থ *বাঙালী ও বাঙলা সাহিত্য* এবং এ-বিষয়ের অন্যান্য গ্রন্থ ও রচনা লেখা সম্ভব হল। সুতরাং আহমদ শরীফের পক্ষে আবদুল করিম সাহিত্য বিশারদের জীবনী লেখাই সমীচীন। সেই কাজটি তিনি করলেন বাংলা একাডেমীর আমন্ত্রণ পেয়ে। আশির দশকের মধ্য পর্যায়ে বাংলা একাডেমী বাংলা সাহিত্যের গবেষক, ইতিহাস-রচয়িতা ও কবি-সাহিত্যিকদের জীবন-বৃত্তান্ত রচনার প্রকল্প গ্রহণ করে। এরই ফসল আহমদ শরীফ প্রণীত আবদুল করিম সাহিত্য বিশারদের জীবনী গ্রন্থ। বাংলা একাডেমীর পরিকল্পনা অনুযায়ী জীবনী গ্রন্থ বৃহৎ আকারের না হলেও আবদুল করিমের জীবন, কর্ম, কৃতি ও কীর্তি, পুথিসংগ্রহের পূর্ণ বৃত্তান্ত, অবদান এবং স্বভাববৈশিষ্ট্যের পূর্ণ পরিচয় এতে পাওয়া গিয়েছে। জীবনী গ্রন্থটি বাংলা একাডেমীর প্রথম পর্যায়ের জীবনী গ্রন্থমালার একটি সার্থক প্রকাশ।

আবদুল করিম সাহিত্যবিশারদ জীবনী-গ্রন্থটির প্রথম প্রকাশ, ২২শে মাঘ ১৩৯৩। ৫ই ফেব্রুয়ারি ১৯৮৭; প্রকাশক – শামসুজ্জামান খান, পরিচালক, গবেষণা সংকলন ও ফোকলোর বিভাগ, বাংলা একাডেমী, ঢাকা; প্রচ্ছদ - সমর মজুমদার, মূল্য– পনের টাকা।

এবং আরো ইত্যাদি

এবং আরো ইত্যাদি প্রবন্ধ সংকলনটি প্রথম প্রকাশিত হয় ফাল্গুন ১৩৯৩, ফেব্রুয়ারি ১৯৮৭ সালে। প্রকাশক–আহমেদ মাহমুদুল হক, মাওলা ব্রাদার্স, ৩১ বাংলাবাজার, ঢাকা, প্রচ্ছদ শিল্পী- খালিদ আহসান, মূল্য–পঞ্চান্ন টাকা। গ্রন্থটি উৎসর্গ করেন আবদুল করিম সাহিত্যবিশারদের কন্যা-জামাতা মরহুম আলতাফুননিসা- আবদুল মুনাএম-এর তিন সন্তান সৈয়দ নুরুন নাহার, সৈয়দ আবু তাহের জিয়াউল হক, সৈয়দ মাহবুবুল আলমকে।

এবং আরো ইত্যাদি মোট উনিশটি প্রবন্ধের সংকলন-গ্রন্থ। এ সংকলনের বিষয় বাংলা সাহিত্য, বাঙালি জাতি, শিক্ষা, সংস্কৃতি, জাতীয়তা, অবক্ষয় কবলিত বাংলাদেশ, নৈতিকতা ইত্যাদি। বাংলার ভাবসাধনার এক অমর পুরুষ চৈতন্যদেব বিষয়ে দুটি রচনা এতে আছে – চৈতন্য মতবাদ ও ইসলাম এবং চৈতন্যদেবের ভাব বিপ্লব : তার তাৎপর্য ও পরিণাম। দুটি প্রবন্ধই উল্লেখযোগ্য, ডক্টর শরীফের জ্ঞানবুদ্ধি ও প্রজ্ঞার পরিচয়। 'আমার চেতনায় জীবন ও জগৎ' আহমদ শরীফকে বোঝার জন্য সহায়ক হবে। বইটির নামকরণ নিয়ে কৌতূহল হতে পারে, সেটি অবশ্য মিটিয়ে দিয়েছেন আহমদ শরীফ, 'নিবেদন' অংশে —

> এই গ্রন্থের সব প্রবন্ধের বিষয়ই পুরোনো ও বহুল আলোচিত। স্থান-কাল-প্রয়োজন ও ব্যক্তিভেদে দৃষ্টির –সে-কারণে ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণের মত-মন্তব্যের বিচার-বিবেচনার পার্থক্য ঘটেই। একের চোখে নিখুঁত সর্বাত্মক আলোচনাও অপরের দৃষ্টিতে ত্রুটিবহুল ও অসম্পূর্ণ ঠেকতে পারে। ফলে একের পরিব্যক্ত চিন্তা-চেতনার ও সিদ্ধান্তের সঙ্গে ঐকমত্যথাকা সত্ত্বেও অপরে 'এবং আরো ইত্যাদি' প্রয়োগে নতুন তথ্য, তত্ত্ব ও যুক্তি যোগ করতে পারেন। ভিন্নমতবাদীরাও – 'এবং আরো ইত্যাদি' যোগে নতুন নতুন তথ্য, তত্ত্ব ও যুক্তি উপস্থাপিত করেন।
>
> এ প্রবন্ধগুলোতে চালু মত-মন্তব্য ধারণা-সিদ্ধান্তের কোথাও পক্ষে কোথাও বিপক্ষে তত্ত্ব-তথ্য-যুক্তি যোগ করেছি। তাই বইয়ের নাম 'এবং আরো ইত্যাদি' রাখলাম।

গ্রন্থভুক্ত প্রবন্ধগুলোর তালিকা

আঠারো উনিশ শতকের বাঙলা ও বাঙালী সম্বন্ধে

দু'একটি ধারণার পুনর্বিবেচনা – ১৯৮৬

জনজীবন ধারার ইতিহাস চাই – ৯/১২.৭.১৯৮৫

চৈতন্যমতবাদ ও ইসলাম –২৪/৩১.৩.১৯৮৫ (চৈতন্যের পাঁচশ বার্ষিকী উপলক্ষ্যে কলকাতার একটি সংকলনের জন্য লিখিত। প্রথমে নাম ছিল গৌড়ীয় বৈষ্ণবধর্ম ও ইসলাম)

চৈতন্যদেবের ভাববিপ্লব : তার তাৎপর্য ও পরিণাম – মে ১৯৮৬ (কলকাতার চতুরঙ্গ পত্রিকায় প্রকাশিত)

আমার চেতনায় জীবন ও জগৎ – ২/২৩.১১.১৯৮৫ (শিবনারায়ণ রায়ের জিজ্ঞাসা পত্রিকার জন্য রচিত)

স্বাতন্ত্র, সংস্কার সংস্কৃতি ও রাষ্ট্রিক জাতীয়তা – ১০.৭.১৯৮৬
সংস্কৃতি ও অপসংস্কৃতি – ১০/১২.৩.১৯৮৬
নৈতিকতা বনাম অবক্ষয় – ১৭.৬.১৯৮৬
গণমুক্তির পূর্বশর্ত – ২/৩.৪.১৯৮৬
গণমুক্তির যোগ্যতা – ২৫.৬.১৯৮৬
অবক্ষয় কবলিত বাংলাদেশ – ৮.৬.১৯৮৬
কে ধরবে হাল কে উড়াবে পাল – ২৪.১২.১৯৮৬
এবং আরো ইত্যাদি – ১.১০.১৯৮৬
অভাব কেবল চরিত্রের – ১৩.৯.১৯৮৬
ব্যক্তিত্ব – ২৯.৯.১৯৮৬
মুদ্রা ও মুদ্রাযন্ত্র – ১৬.৬.১৯৮৫ (জনম জনম ধরে পত্রিকায় প্রকাশিত)
রবীন্দ্র সাহিত্য ও গণমানব – ৬.৯.১৯৮৬
নাটকের গোড়ার কথা – ১২.৩.১৯৮৫